পুজো ১৪২৯

পু জো ১ ৪ ২ ৯

# সানন্দা

## সূ চি প ত্র

### পু জো স্পে শ্যা ল

শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতির মহামিলনই বোধহয় জীবনচক্রের নিয়ন্ত্রক। তারই মধ্যে কোথাও যেন নিহিত হয়ে থাকে নারী ক্ষমতায়নের বীজও! যে কোনও উৎসবই তাই ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে জীবনদর্শনের প্রতিরূপ।

### উ প ন্যা স ১

একটি বহুতল আবাসন ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্ট। বাসিন্দাদের বিচিত্র জীবনের উত্থান-পতনের সাক্ষী কেয়ারটেকার কালাচাঁদ। সে ভালবাসে আবাসনেরই এক আয়া মেনকাকে। কিন্তু মেনকা কি ভালবাসে তাকে? কালাচাঁদ কি খুঁজে পাবে তার জীবনের মোক্ষ?

### উ প ন্যা স ২

শহর কলকাতার বুকে বনেদি ডাক্তারবাড়ির বউয়ের আকস্মিক মৃত্যু যে ঠিক স্বাভাবিক নয়, সে কথা মানতে নারাজ মৃত মহিলার ডাক্তার স্বামী নিজেই। তা-ই যদি হবে, তবে মহিলাকে খুন করল কে? কী তার উদ্দেশ্য?

উপন্যাস ৩

২২৬

## ঈশ্বরের অলৌকিক সন্তানেরা

নন্দিনী নাগ

ঝিল, রুপু, কুট্টি— তিনজনেই বিশেষভাবে সক্ষম। ছোট থেকেই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এদের মানুষ করছে মা-বাবারা। কিন্তু এরা কি ফিরবে স্বাভাবিক ছন্দে? কোন পথে হাঁটবে জাগরী, বিন্দি মিতশ্রী, এই তিন মায়ের গল্প?

উপন্যাস ৪

৩০২

## যারা পরিযায়ী

অনীক চক্রবর্তী

কলেজের একদল ছেলেমেয়ে। হাতের পাঁচটা আঙুলের মতোই তারাও প্রত্যেকে ভিন্ন। তবু ওরা একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে, দৃশ্য-অদৃশ্য কত সূত্র দিয়ে। উচ্ছল গতিতে মুখর তাদের গল্পের শেষ পাতা কই? কী লেখা তাতে?

গল্প ১

১০৮

## প্রত্নশিলা

বিপুল দাস

সতুপাগলের পাগলামি এমনিতে বোঝা যেত না। বাবা-মায়ের অনেক সাধের সন্তান সতু হঠাৎ কী এমন পাগলামি করে বসল? শীলাই বা কে?

গল্প ২

২১২

## গায়ক

সিজার বাগচী

গানপাগল অর্ণবের গলায় সুর নেই। কিন্তু সে গান গেয়ে নাম করতে চায়। একটা অ্যাপ কীভাবে বদলে দেয় অর্ণবের জীবন?

সৌন্দর্য ১

## মেক-আপে ষড়ঋতু ৬৮

ঋতুপ্রধান আমাদের দেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, বৈশিষ্ট্যে, প্রকৃতিতে প্রত্যেক ঋতু অনন্য, স্বতন্ত্র। উৎসবের মেক-আপ প্যালেটে সেই বিশেষত্বই তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। বিশেষ ফোটোফিচার।

সৌন্দর্য ৩

## ১৯০ পুরানো সেই চুলের কথা...

চারের দশকের ভিক্টরি কার্লস, বি-হাইভ থেকে ছয়ের দশকের জনপ্রিয় ‘সাধনা’ কাট... পুরনো হলেও, এই সব চুলের স্টাইল আজও সমান জনপ্রিয়। ভিন্টেজ হেয়ারস্টাইল নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

সৌন্দর্য ২

## ৯৬ রুখে দিন ডিজিট্যাল এজিং

কম্পিউটার বা মোবাইলের ব্লু লাইট থেকে ত্বকে আসতে পারে অকাল-বার্ধক্য। ত্বক হতে পারে ডিহাইড্রেটেড। কীভাবে রুখবেন ডিজিট্যাল এজিং? বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

সৌন্দর্য ৪

## রূপচর্চায় ‘গ্রিন’ মুভমেন্ট ২৮৬

রূপচর্চার দুনিয়ায় সম্প্রতি সাড়া ফেলেছে প্ল্যান্ট-বেসড উপাদান। এই ধরনের উপাদানের বিশেষত্ব কী? চুল এবং ত্বক ভাল রাখতেই বা কতটা কার্যকরী? বিশেষজ্ঞের মত।

ফ্যাশন ১

## শারদ সাজে 'আনন্দ'রং

২০

শরতের ঝলমলে প্রকৃতি সেজে উঠছে উৎসবের সাজে। উৎসবের দিনগুলিতে চারিদিকে সাজোসাজো রব। খুশির হাওয়া, আকাশে আনন্দের রং। প্রকৃতির মতো মর্ত্যবাসীও মেতে উঠে উৎসবের আমেজে। পুজোয় 'আনন্দ' শাড়ির সাজে নারী অপরূপা!

ফ্যাশন ২

## ফ্যাশন ক্যানভাসে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

১২০

ফ্রিডা কাহলো, অড্রে হেপবার্ন থেকে এদেশের গায়ত্রী দেবী, গওহার জান... ফ্যাশন স্টেটমেন্টে প্রত্যেকেই নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন বরাবর। ছকভাঙা মহিলা আইকনদের নিয়ে এক্সক্লুসিভ ফোটোশুট।
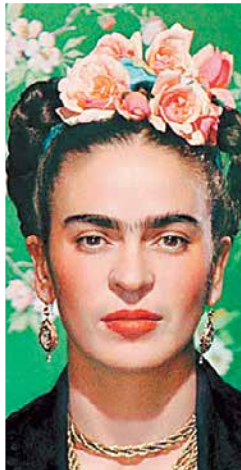
## ফ্যাশন ৩

### Aerial Inspiration ১৪৪

লং ফ্লোয়ি গাউন, অ্যাসিমেট্রিক্যাল ড্রেসে অরগ্যানজ়া, স্যাটিনের মতো ফ্যাব্রিকের ব্যবহার। অভিব্যক্তিতে বাতাসের উচ্ছ্বাস। এক্সক্লুসিভ ফ্যাশনচিত্র।

## ফ্যাশন ৫

### সকল রসের ধারা... ২২২

সঙ্গীতের নির্জন সাধক আমান আলি খান। তাঁর সরোদের সুর আপ্লুত করে শ্রোতাদের। সারা বিশ্ব তাঁর ঘর হলেও ভালবাসেন বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। বাংলার সেরা উৎসবে স্টাইল স্টেটমেন্টের এক্সক্লুসিভ লুকবুক।

## ফ্যাশন ৪

### ২০০ অরণ্যের অনন্য আবেদন

সবুজ ব্যাকড্রপে সতত রঙিন ওয়েস্টার্নওয়্যার। সাহসী, সপ্রতিভ এবং স্বতন্ত্র স্টেটমেন্ট। জমকালো সাজপোশাকের বিশেষ ফ্যাশন লুকবুক।

## ফ্যাশন ৬

### পুজোয় Popup Trend ২৯২

পুজোর দিনগুলোতে প্রকৃতির মতো ফ্যাশনেও থাকুক হরেক রঙের ছোঁয়া! এমনই কিছু পপআপ কালার ট্রেন্ডে সাজলেন অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র।

ফ্যাশন ৭

## কলকাতা ক্যানভাস

৩৫০

স্ট্রিটস্মার্ট পোশাক থেকে শিক আউটফিটসে শহর কলকাতা ভ্রমণ। পোশাক থেকে আবহ, সবেতেই ঐতিহ্য, আভিজাত্য এবং আধুনিকতার অনবদ্য মিশেল। ফ্যাশনচিত্রে কুর্নিশ জানানো কল্লোলিনী তিলোত্তমাকে।

ফ্যাশন ৯

## আকাশে আজ রঙের মেলা...

৩৭২

দেবীর মর্ত্যে আগমনে মর্ত্যবাসী তার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম দিয়ে দেবী শক্তির আরাধনা করে। প্রকৃতির বিভিন্ন রং যেন মানবপ্রকৃতিরই বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রতীক। 'আনন্দ' শাড়িতে হরেক রঙের বাহার নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

ফ্যাশন ৮

## Glamarous western...

৩৫৮

পুজো মানে শুধুই সাবেকি সাজ এমনটা একেবারেই নয়! পুজো মানে কমপ্লিট ফ্যাশন ফাইল। শারদোৎসবে সকাল, সন্ধ্যার সাজে গ্ল্যামারাস ওয়েস্টার্ন পোশাকের লুকবুক রইল 'সানন্দ'-য়।

ফ্যাশন ১০

## পুজো হোক আনন্দময়

৩৭৬

বাঙালির সেরা উৎসবে ঐতিহ্যবাহী 'আনন্দ' শাড়ির এক্সক্লুসিভ কালেকশন নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন রইল 'সানন্দা'-য়।

NO
SMOKING

## অন্দর

## সাহিত্য

## ফিটনেস ১

## ফিটনেস ২

# আমাদের তুর্কিনাচন ২৬০

ইতিহাস সেখানে ভীষণভাবে জীবন্ত। স্থাপত্য থেকে রোজকার জীবন, গুহার মধ্যে প্রাচীন শহর থেকে কাবাব-বাকলাভার সুস্বাদ, রুক্ষ বাস্তব থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে তুরস্ক ভ্রমণ...

# খেলা

**প্রচ্ছদ:** সৌরসেনী মৈত্র

**মেক-আপ:** বাবুসোনা সাহা, **ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪, **হেয়ার:** গিনি হালদার ,**ফোন:** ৭৪৩৯৭০৩৬২০
**স্টাইলিং ও গয়না:** মাধব, **ফোন:** ৯৮৭৫৩৭৬৯৭৮, **পোশাক:** কোমল সুদ, **ফোন:** ৯১৬৩৪৬৯৯৮৬
**ছবি:** সোমনাথ রায়

---

**সম্পাদক:** পায়েল সেনগুপ্ত

---

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

**RNI NO. 44046/86**

**Pujo 2022**

*বাজিল কাহার বীণা, মধুর স্বরে...*

হৃদয়তন্ত্রীতে যেন হঠাৎ করে একটা টান পড়ল। আকাশে নীল বিদ্যুৎ খেলে গেল কি?

শ্রাবণ হয়ে আসে শেষ। কিন্তু বর্ষা ফুরোয় না। বাইরের আকাশে কিউমোলোনিম্বাস ফিকে হয়ে এলেও মনের ভিতরে বৃষ্টি পড়তে থাকে। আসলে বছরের একটা সময় মায়ের চলে যাওয়া এবং পরের বছর আবার ফিরে আসার মধ্যে যে সময়, তাতে অনেক ক্লেদ, গ্লানি জমে যায়। বর্ষা শেষের আকাশের মতো এক পরিষ্কার আয়নায় চারপাশকে দেখতে ইচ্ছে করে, মনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে। যেন বরিষণ মুখরিত রাতের শেষে সব দুঃখ যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। বর্ষার প্রসঙ্গ আসে, কারণ প্রতি বছর এই বৃষ্টিস্নাত দিনগুলো থেকেই শুরু হয় মায়ের আবাহন। গত দু'বছরে মারণ রোগের প্রকোপের পর আমাদের শৃঙ্খল এখন কিছুটা শিথিল। নিজেরাই খুঁজে নিয়েছি মুক্তি। কিন্তু সত্যিই কি মুক্ত হতে পেরেছি আত্মার কাছে? মূল্যবোধের কাছে? এত ক্ষোভ, এত রক্তপাত তবে কোথা থেকে আসে? সহিষ্ণুতা, উদারতা, মাত্রাজ্ঞান, অধিকারবোধ, সব কিছুরই সীমানা লঙ্ঘন করে আজ কোন লাইন অফ কন্ট্রোলের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ছি আমরা? যুদ্ধ ভারাক্রান্ত পৃথিবী, পরিবর্তন আনতে না পারা ভারাক্রান্ত মন। বৃষ্টি শেষের মিঠে রোদ লাগা আকাশ যদি না থাকে, মায়ের শাসন, মায়ের আশীর্বাদের অপেক্ষা যদি না থাকে, তা হলে কীভাবে নেমে যাবে এই ভার? কীভাবেই বা বলব যে অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া? আমাদের এই নিরন্তর আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, দৈনন্দিন অহমিকা, মরীচিকার পিছনে সম্মোহিতের মতো হেঁটে যাওয়া... এর শেষ কোথায়।

মা, তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, আমাদের নিয়ে চলো সমস্ত সংকীর্ণতার ওপারে! আমাদের মুগ্ধ বিহ্বল মন যেন গেয়ে ওঠে, দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া!

# শিব দুর্গার সংসার

শিব এবং শক্তি, পুরুষ এবং প্রকৃতি...মহামিলনের গল্পই বোধহয় নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের জীবনচক্র। উঠে আসে কখনও ক্ষমতায়নের গল্পও। তাই যে কোনও উৎসবই শেষ পর্যন্ত আর কোনও ধর্মে আবদ্ধ থাকে না, নিজেই হয়ে ওঠে একটি সম্পূর্ণ দর্শন। লিখেছেন পায়েল সেনগুপ্ত

বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাট ঘিরে অনেক গল্প। বারাণসীর প্রায় ৮৪টি ঘাটের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুরাণ কথা। মণি এবং কর্ণিকা মানে কানের দুল। ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করেন শিব। কিন্তু শিবের বাউন্ডুলে স্বভাব এবং আড়ম্বরহীন জীবনযাপন একেবারেই পছন্দ ছিল না দক্ষর।

ফলে নিজের গৃহের যজ্ঞে কন্যা ও জামাতা ছিলেন অনিমন্ত্রিত। এর পরেও জেদ করে সতী সেখানে উপস্থিত হন এবং পিতার মুখে পতি শিবের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দেন। ক্রুদ্ধ শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে করে সারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় সৃষ্টি করলে শ্রী বিষ্ণু তাঁর চক্রের সাহায্যে সতীর শবদেহ টুকরো টুকরো করে ফেলেন। ৫১টি ভাগে বিভক্ত সতীর দেহ ৫১টি সতী পীঠের জন্ম দেয়। তার মধ্যে এখানে সতীর কর্ণকুণ্ডল পড়েছিল বলে মনে করা হয়। পুরাণ অনুযায়ী, গঙ্গার ধারে রয়েছে দুই শক্তিপীঠ, বিশালাক্ষী এবং মণিকর্ণি। কিন্তু মণিকর্ণিকা ঘাটের কথা এল কেন? আসলে সতীপীঠের এই কাহিনি সূচনামাত্র। আসল কুশীলব হলেন শিব-পার্বতী। সতীর মৃত্যুর পর হিমালয় কন্যা পার্বতী হলেন শিবের ঘরণী। সে এক বহুমাত্রিক প্রেমকাহিনি। প্রেমের কাহিনির প্রসঙ্গ পরে, আগে মণিকর্ণিকা। বিবাহের পরে শ্রী বিষ্ণু নাকি শিব ও পার্বতীর স্নানের জন্য একটি জলাধার নির্মাণ করেন, তার নাম হয় মণিকর্ণিকা কুণ্ড। এই কুণ্ডেই শিব হারিয়ে ফেলেন তাঁর কর্ণকুণ্ডল। সেখান থেকেই ঘাটের নাম হয় মণিকর্ণিকা। আবার উলটোটাও কথিত রয়েছে যে, স্বয়ং মাতা পার্বতীরই কানের দুল হারিয়ে যায় এই ঘাটে এবং শিবকে তিনি তা খুঁজে দিতে বলেন। গল্প যা-ই হোক না কেন, কাশীর মানুষের বিশ্বাস এই ঘাট শিব এবং পার্বতীর প্রিয়তম স্থান এবং শিব যেহেতু কাশীর অধিষ্ঠিত দেবতা, এই স্থানে হর-গৌরী সর্বদা বিরাজমান।

আসলে এইভাবেই বাঙালি শিব ও দুর্গার আরও একটি সংসার হয়ে ওঠে বারাণসী। বাংলার প্রথম নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র যে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্রাঙ্কন করেছিলেন এই সাংসারিক জীবনের, তাই যেন একটি জাতীয় এবং অন্তর্দেশিয় বিস্তৃতি লাভ করেছে বারাণসীতে এসে। অভাব-অনটনের সংসারে মানুষ একদিন যেমন শিকড় ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভাল থাকার কথা ভাবে, ঠিক তেমনই হর-গৌরীর নিত্য অভাবের সংসারে একদিন বাউন্ডুলে মহাদেবের মাথায় এল কাশীতে গিয়ে থাকলে কেমন হয়!

"পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ কানন নাথ কেবল কৈবল্যধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত।।
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণি পুষ্করিণী মোক্ষপদবিধায়িনী
সারবস্তু অসারসংসারে।।
শাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টিযোগিনীপাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে একক্ষণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান।।
...
সর্বসুখময় ঠাঁই সবে মাত্র অন্ন নাই
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেক হইল বাস সকলের অন্ন আশ
কিপ্রকারে অন্ন জোগাইব।।"
*(শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা, অন্নদামঙ্গল, কবি ভারতচন্দ্র রায়)*

অতএব চলো বারাণসী। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নির্মিত হল অন্নপূর্ণাপুরী। পার্বতীর অন্নপূর্ণারূপ বাংলা থেকে উত্তরভারতে পদার্পণ করল। কিন্তু হর-গৌরীর সংসারের তাৎপর্য চিরন্তন, তা কিন্তু কেবল বাংলা থেকে উত্তরপ্রদেশের ভৌগোলিক বিস্তার নয়, একেবারে ঘরে-ঘরে প্রতি দম্পতির জীবনচর্যার প্রতিফলন। হর-পার্বতীর সংসার আসলে আমাদেরও সংসার। দাম্পত্য জীবন বলতে এখনও প্রতিটি মধ্যবিত্ত সংসারের যে ছবি ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে ভারতের সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সম্ভবত হর-পার্বতীর সংসারেরই সবচেয়ে বেশি মিল পাই। পূর্বরাগ, প্রেম, বিবাহ এবং বিবাহোত্তর জীবনের টানাপড়েন...সব মিলিয়ে এই জীবন কিন্তু বহুবল্লভা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় কোনও অংশেই। বরং অনেক বেশি বাস্তব। পরিবারের অন্নসমস্যা মেটাতে পার্বতীর অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ এবং ভিক্ষুক শিবকে ভিক্ষাপ্রদানের মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের ছবিও সুপ্ত রয়েছে। অন্ন জোগানোর চিন্তা পুরুষের, কিন্তু অন্ন দান করার ক্ষমতা নারীর। পুরাণকাহিনির সৃষ্টি, এমনকী তার অনেক পরে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সময়ে দাঁড়িয়েও নারীর এই আপাতক্ষমতায়নের চিত্র অভিনব। সেই কারণেই শিব-গৌরীর সংসারযাপনের নানা শেডের মধ্যে অন্নপূর্ণা অংশটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী।

বারাণসীর অন্নপূর্ণা মন্দিরও কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য বহন করে। সামনে পুজো, কৌতূহলবশত অন্নপূর্ণা মন্দিরে এই উৎসবের প্রভাব কতখানি পড়ে, সে বিষয়ে জানতে গিয়ে শোনা গেল নানা অজানা তথ্য। হয়তো সম্পূর্ণ অজানা নয়, তবে কম প্রচলিত তো বটেই। বাংলার শিব যেমন নিজের এবং ভক্তদের অন্নাভাব দূরীকরণের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে গিয়ে কাশীতে চলে আসার ভেবেছিলেন, তেমনই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু বাঙালি যুগ-যুগ ধরে ভিড় জমিয়েছে কাশীতে। তার আধ্যাত্মিক কারণ যদি শৈব মহিম হয়, অন্যটি অবশ্যই বিকল্প জীবনযাত্রার সন্ধান। কিন্তু কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রধান মহান্ত শ্রী শঙ্কর পুরি মহাশয় জানালেন, আগে ৭০ শতাংশ মানুষ কাশীতে আসতেন বাংলা থেকে, বিগত দশবছরে সেটা কমে গিয়ে হয়তো ৩০ শতাংশ হয়েছে। আবার একইভাবে কাশীতে বেড়ে গিয়েছে দক্ষিণভারতীয় মানুষের সংখ্যা। অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের সম্মেলন থেকে এই আন্দাজ করা যায়। বাঙালিদের আনাগোনা কমল না বাড়ল, সেটা তেমন চিন্তার বিষয় কিনা, সেই ধারণা ঠিক স্পষ্ট নয় এখনও। কিন্তু শিব-অন্নপূর্ণার আদ্যন্ত বাঙালি একটি কনসেপ্টের জনপ্রিয়তা সুদূর দক্ষিণকেও স্পর্শ করছে, সেকথা ভাবতে ভালই লাগে। প্রসঙ্গত অন্নপূর্ণা মন্দিরের অন্নকূট উৎসবের কথাও একটু বলা যাক। বাঙালিদের মতো

চৈত্রমাসে এই উৎসব হয় না। এখানে উৎসব হয় কালীপূজার ঠিক আগে। ধনতেরস থেকে শুরু করে পরপর চারদিন খুব বড় করে এই উৎসব পালন করা হয়। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে যাওয়ার পথেই ডানদিকে পড়ে এই মন্দির। সেখানে নিত্যকার যে মায়ের মূর্তি রোজ পূজা হয়, তা ছাড়াও ওই চারদিনের জন্য মন্দিরে একেবারে ভিতরে অবস্থিত মায়ের সোনার মূর্তির গর্ভগৃহের দরজা খুলে যায় ভক্তসাধারণের জন্য। চারদিন ধরে দর্শন এবং ভক্তরা একটি মুদ্রা লাভ করেন। কথিত আছে যে, ধনতেরসের দিন বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষুকের বেশে আসেন। তিনি নিজের এবং ভক্তসাধারণের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করেন এবং মা অন্নপূর্ণা মুক্তহস্তে অন্নপ্রদান করেন। ধনতেরসের দিন যাঁরা দর্শনে আসেন, তাঁদের প্রত্যেককে মন্দিরের পক্ষ থেকে প্রসাদ দেওয়া হয়। তবে বিনামূল্যে যে ভোগ দেওয়া হয়, তাতে ভাত, ডাল ও মিষ্টি থাকে। কিন্তু এই বিশেষ চারদিন সম্পূর্ণ মন্দির ভোগপ্রসাদে পূর্ণ থাকে। মন্দিরের সর্বত্র আনাচে-কানাচে থরে থরে মিষ্টি বা অন্যান্য ভোগপ্রসাদ সাজানো থাকে। মহান্তজির মতে, তিলমাত্র জায়গা ফাঁকা থাকে না। এই চারদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভোগ বন্টন করা হয়। পুরীর মন্দিরের মতো এখানেও ছপ্পন ভোগ খুব বিখ্যাত। নোনতা ও মিষ্টি মিশিয়ে সাধারণত ৫৬ রকমের ভোগ প্রস্তুত করা হয়, কখনও কখনও তার বেশিও হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিষ্টি পদের সংখ্যা বেশি থাকে। কাঁচা চালের পাহাড়ের মতো স্তূপ তৈরি হয়, তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পকোড়া থাকে। রান্না করা হয় সাতপ্রকার ডাল, অরহর ডাল, ছোলা, মুগ, মটর, রাজমা, মুসুর ও বিউলির ডাল তৈরি করা হয়। তা ছাড়া প্রচুর ধরনের মিষ্টি থাকে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বালুসাই, খুরমা, পর্বলকাঁদ, বেসনের মিষ্টি ও লাড্ডু, ময়দার লাড্ডু, খোয়া, মাওয়া, গুলাবজামুন, ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, চমচম...এই তালিকার কোনও শেষ নেই মনে হয়। অন্নকূট উৎসবের দিন কাঁচাভোগের প্রসাদ মন্দির চত্বরেই সকলের জন্য বিলিয়ে দেওয়া হয়। বাকি ভোগপ্রসাদ কুপন দিয়ে কেটে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকে। অনেক আগে থেকেই এই প্রসাদ বুকিং শুরু হয়ে যায়। ধনতেরস, হনুমানজয়ন্তী, অমাবস্যা এবং প্রতিপদ অন্নকূট...চারদিনের পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান পালিত হয় এইভাবেই। মায়ের সোনার মূর্তি বা স্বর্ণমাইয়ের দর্শনও হয় সারা বছরে মাত্র এই চারদিনই। অন্নকূট উৎসবের সময় মন্দির প্রঙ্গণে জমায়েত হওয়া ভক্তদের জন্য প্রায় ১৫টন প্রসাদ প্রস্তুত করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই ভোগপ্রসাদ সকলের জীবনের সকলরকম রোগ নিরাময় করে এবং যাঁরা এই প্রসাদ গৃহে নিয়ে যান, তাঁদের ঘরেও সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতি হয়। অন্নপূর্ণা মন্দির বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন হলেও স্বতন্ত্রভাবেই কাজ করে। মন্দিরের ট্রাস্টও আলাদা এবং অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজে বিশেষত মহিলাদের স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে মন্দির ট্রাস্ট অনেক অর্থ ব্যয় করেন। অন্নপূর্ণার যথার্থ প্রতিমূর্তি যেন তৈরি হয়ে যায় পূজায় ও কর্মে।

যাঁকে ঘিরে এই মন্দির, সেই অন্নপূর্ণা কিন্তু আবার নিজের সংসারে আমার আপনার মতোই বীতশ্রদ্ধ হয়ে যান প্রায়ই। ভোলানাথের মতো তাঁরও বৈরাগ্য আসে। পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো তাঁর মনে ধাক্কা দিয়ে যায় প্রেমকথা। শিব-পার্বতীর শিহরণ জাগানো প্রেমবিলাস।

"ন কেবলং যো মহতোঅপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্!"
কুমারসম্ভব কাব্য, ৫ম সর্গ, ৮৩)

মণিকর্ণিকা ঘাট

অন্নকূট উৎসবের ভোগ

শিব এবং পরমাপ্রকৃতি আসলে জীবনচক্রেরই রূপক। রিপ্রডাকশন কাল্ট বা প্রজনন তত্ত্ব যেভাবে প্রোথিত লিঙ্গকে ব্যাখ্যা করে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। জন্ম-মৃত্যু-মিলন-বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলন আমাদের জীবনের চলমান ছায়াচিত্র শিব-দুর্গার অভিন্নতাতেও। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী, শিবলিঙ্গের নীচের অংশে আছেন ব্রহ্মা এবং মাথার দিকে রয়েছেন বিষ্ণু, আবার স্বয়ং পার্বতীতেই তিনি অধিষ্ঠিত। কোথাও যেন এই বহুরূপের আধার হয়ে ওঠা অতিক্রম করে যায় জেন্ডার বায়াসকেও। সকলকে নিয়ে এই সম্পূর্ণতা আমাদের সমাজেও অস্তিত্বশীল, কিন্তু আমরা পূজা করলেও তার আসল গুরুত্বকে অবহেলা করি। শিব হলেন আত্মা এবং শক্তি তাঁর এনার্জি, শৈবিজ়মের আরও একটি বাস্তবতত্ত্ব। শৈবিজ়ম নিয়ে আরও কিছু কথা নিশ্চিতভাবেই অন্য একটি লেখার পরিসর দাবি করে। কিন্তু আপাতত সুরেশবাবুর কথা দিয়ে শেষ করি। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই তাঁর শাড়ির দোকান, সীতা শাড়ি স্টোর। কথায় কথায় একদিন বললেন, ‘‘বাবার (বিশ্বনাথ) কাছে এত মানুষ ভিড় করে টাকাপয়সা চায়, এটা চায়, ওটা চায়...বাবা কোথা থেকে দেবে এসব! সে তো নিজেই ভিখারি!’’ একেই কি বলে প্রত্যাশা? সুরেশবাবুর এই কথার মতো বাস্তব জীবনসত্য আর কী-ই বা আছে! চাওয়া এবং না পাওয়ার গল্পই জীবন! প্রত্যাশা কি চাইলেই পূরণ হয়? গৌরীরও কি হয়েছিল?

যিনি পূর্বজন্মে পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তিনি আবার সেই যন্ত্রণা কেন সহ্য করবেন! মহাপ্রেমিক মহাদেব পার্বতীকে সহাস্যে ধারণ করলেন।
ভারতচন্দ্র যেমন লিখেছেন দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত দম্পতির কথা, তেমনই আর-এক কবি লিখেছেন কুমারসম্ভবম্। প্রেমের মহাকাব্যে সিদ্ধহস্ত মহাকবি কালিদাস মূর্ত করে তুলেছেন ভালবাসাকে। দক্ষযজ্ঞে সতীকে হারিয়ে যখন শিব পাগল পারা, ক্রোধোন্মত্ত, জগৎ-সংসারে বীতশ্রদ্ধ, ঠিক তখনই পর্বতকন্যা এলেন ঘর আলো করে। দেবতারা চাইলেন পার্বতী ও মহাদেবের সংসার হোক। পরস্পরের প্রেম ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁদের আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু পুরাণ যা বলে, কবিও কি একেবারে তাই লিখতে পারেন? বাস্তবেও কি তাই ঘটে! কবি লিখলেন হর-গৌরীর প্রেম থেকে বিবাহ, কার্তিকেয়র জন্ম। সেখানে কোনও দেবতাদের মন্ত্রণা প্রাধান্য পায়নি। তা শুধুই প্রেমের আলেখ্য, চিরন্তনতায় সম্পূর্ণ। শিব-দুর্গার সংসার যতখানি বাস্তব, তাদের ভালবাসার

অন্নপূর্ণা মন্দিরে পুজোয় প্রধান মহান্ত

আখ্যানও ততটাই সত্য। কিংবা পুরোটাই হয়তো অলৌকিক, যেমন আমাদের জীবন। একরকমভাবে শুরু হয়ে বাঁক নিতে-নিতে এমন কোথাও হয়তো পৌঁছয়, যেন সব লৌকিকতার সীমা অতিক্রম করে যায়।

তথ্যসূত্র; Shiva and the Primordial Tradition
আনন্দবাজার পত্রিকা আর্কাইভ

**অলংকরণ:** রৌদ্র মিত্র

# শারদ সাজে ‘আনন্দ’রং

শরতের ঝলমলে প্রকৃতি সেজে উঠছে উৎসবের সাজে। মা আসছেন। ষষ্ঠী থেকে বিসর্জন, উৎসবের দিনগুলিতে চারিদিকে সাজোসাজো রব। খুশির হাওয়া, আকাশে আনন্দের রং। প্রকৃতির মতো মর্ত্যবাসীও মেতে উঠেছে উৎসবের আমেজে। সারা বছর যেমন-তেমনভাবে কাটালেও পুজোর দিনগুলিতে বারোহাত শাড়ির সাজে বাঙালি নারী হয়ে ওঠে অপরূপা। এই শারদোৎসবে ‘আনন্দ’ শাড়ির সাজে নিজেদের ভিন্নরূপে প্রকাশ করলেন রোজা পারমিতা দে ও বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়। এই সাজকাহনের সাক্ষী রইলেন মৌমিতা সরকার।

স্পেশ্যাল ব্লক প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ি। জমি জুড়ে কালো ও রাস্ট কালার হরাইজ়ন্টাল স্ট্রাইপ। আঁচলে ফ্লোরাল ডিজাইন। সবমিলিয়ে আধুনিকতায় অনন্য।

ফিরে দেখা সাতের দশক। গোলাপি ও কালোর কম্বিনেশনে সিল্ক শাড়িতে আনন্দের সিগনেচার শেভরন, স্ক্রোল ও জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। পাড় ও আঁচলেও একই প্রিন্ট।

ব্লাউজ়:
ভি কাট, দ্য ব্লাউজ় এক্সপার্ট, ফোন: ৯৮৩১০৯৮৮৩০

গোলাপি রঙের জর্জেট শাড়ি। পাড় ও আঁচলে কনট্রাস্টে মাল্টিকালার্ড ফ্লোরাল ডিজ়াইন।

কালো ভেঙ্কটগিরি সিল্ক শাড়িতে কনট্রাস্টিং ম্যাজেন্টা পাড় ও আঁচল। আঁচলে সূক্ষ্ম ফ্লোরাল মোটিফওয়র্ক। জমিতে আকর্ষণীয় গোল্ডেন ইয়েলো ও ম্যাজেন্টা কম্বিনেশনে বুটির কাজ।

**গয়না:** অ্যাডরস জুয়েলরি

হালকা অনিয়ন পিঙ্ক খাদি কটন শাড়ি। পাড় ও আঁচলে আকর্ষণীয় সিলভার ও গোল্ডেন কম্বিনেশনে পাখি ও ফুলের ডিজ়াইন।

গোলাপি রঙের কাতান
বেনারসি শাড়ির জমি
জুড়ে গোল্ডেন ও
মাল্টিকালার কম্বিনেশনে
গাছ ও পাখির মোটিফ।
পাড় ও আঁচলেও একই
ডিজ়াইন।
গয়না: নিকিস আর্টিশিয়ান
জুয়েলরি
ফোন: ৯৮৭৪৩২৩২০১

কমলা তানচোই
বেনারসি শাড়ির জমি
জুড়ে সূক্ষ্ম সিলভার
ফ্লোরাল ডিজ়াইন।
শাড়ির পাড়ে চওড়া
টিসু বর্ডার, সঙ্গে
ফুলের মোটিফওয়র্ক।

জুয়েলরি: অ্যাডরস
জুয়েলরি
ফোন: ৮৯৮১০১১৯৮৭

মাল্টিকালার্ড চেক্স ডিজ়াইনের তসর শাড়ি। চেক্সের উপর ফ্লোরাল মোটিফ বুটির কাজ। সঙ্গে রুপোর গয়নার সাজে কনটেম্পোরারি লুক।

টেক্সচার জ়রি চেকস প্যাটার্নের ট্র্যাডিশনাল তসর শাড়ি। পাড় ও আঁচলে লাল, নীল, সবুজ কম্বিনেশনে আনন্দের ক্লাসিক ফ্লোরাল প্রিন্ট।
*(ডানদিকের পাতা)*

**গয়না:** নিকিস আর্টিশিয়ান জুয়েলরি
**ইনস্টাগ্রাম:** nikissartisan

শাড়িতে অলওভার লাইলাক ও গোল্ডেন ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে লেপার্ড প্যাটার্ন প্রিন্ট। সঙ্গে হল্টার নেক ব্লাউজ়ে স্টাইলিশ লুক।

**শাড়ি: আনন্দ**
কুইন্‌স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫,
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

ছবি: সোমনাথ রায়
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
সহযোগী: সাহিল
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: দীপশিখা রায়
ব্লাউজ়: ভি কাট, দ্য ব্লাউজ় এক্সপার্ট, হিন্দুস্থান পার্ক
ফোন: ৯৮৩১০৯৮৮৩০
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়,
৮৬৯৭১১৩৩৬৭
লোকেশন ও হসপিট্যালিটি পার্টনার: ক্লাউড সোশ্যাল রুফটপ লাউঞ্জ
ফোন: ০৩৩ ৬৮১১০৯৪৪

# বসতি

নন্দিতা বাগচী

সূর্যোদয় হয়নি এখনও। তবে একটা আঁধার-ছেঁড়া আলোর ফিকে আভায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে চরাচর। গাছকে গাছ, রাস্তাকে রাস্তা, গাড়িকে গাড়ি বলে চেনা যাচ্ছে।

"কালা!" বলে হাঁক পাড়লেন তিন তলার আদিদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর আধিকারিক মেজাজে। সুরা-তামাকে জারিত মন্দ্রস্বরটা তীক্ষ্ণ একটা আলোকতরঙ্গের মতো গিয়ে আছড়ে পড়ল ঘুমন্ত কালাচাঁদের কর্ণকুহরে।

কালাচাঁদের মনে হল অনেক দূরে একটা ট্রেন যেন হুইস্‌ল বাজাচ্ছে সিগনালটা সবুজ হয়নি বলে। কিন্তু আদিদেবের গলার আওয়াজটা চিনতে পেরেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে। চোখ দুটো রগড়ে উঠতে গিয়েই বুঝতে পারল ফেলনা তার ডান হাতটা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে আছে কালাচাঁদকে।

"ব্যাটা গাঁজায় দম দিয়ে ঘুমোচ্ছে! এদিকে আমার তো একনাগাড়ে দুটো ঘণ্টাও ঘুমোবার জো নেই। চার তলার রাজীবদা অফিস থেকে ফিরল রাত তিনটেয়। সেই সময়ে একবার উঠে গেটের তালা খুললাম। আবার ভোর পাঁচটা বাজতে না-বাজতেই তিন তলার মুখার্জিসাহেবের পায়ের তলা সুড়সুড় করছে মর্নিং ওয়াকে বেরোনোর জন্য," শার্টের বোতামটা লাগাতে-লাগাতে বিড়বিড় করে কালাচাঁদ, "তবে ছয়তলার সরকারবৌদির ছেলে বিক্রমদা আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে।"

চোখ-মুখ কুঁচকে চাবির গোছাটা থেকে সদর দরজার চাবিটা খুঁজতে-খুঁজতে সে বলল, "গুড মর্নিং স্যর।"

লেকের ধারে পৌঁছে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন আদিদেব। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কাউকে দেখতে পাননি এখনও। মিনিট দশেক দেরিতে পৌঁছেছেন আজ তিনি, তাই হয়তো এগিয়ে গিয়েছেন ওঁরা। কৃষ্ণভক্ত দলটা খোল-করতাল
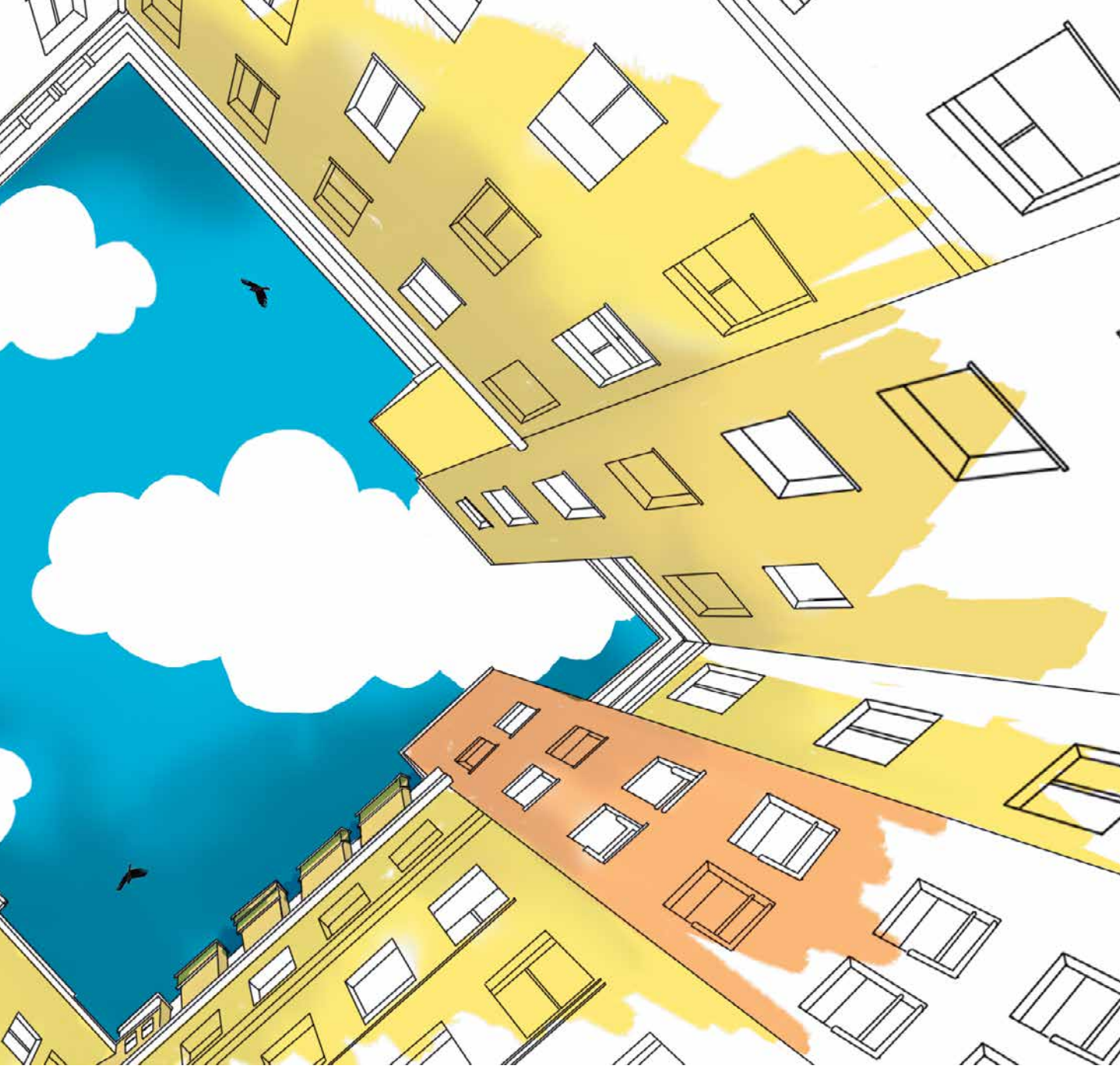
বাজিয়ে 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ...' গাইতে-গাইতে চলে গেল উল্টোদিকে।

লেকটাকে এক চক্কর কেটে কোণের দিকের একটা রট আয়রনের বেঞ্চে বসলেন আদিদেব। হাঁপ ধরে যায় আজকাল। শরীরটা ভারী হয়ে যাচ্ছে। কী যে কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা বলে আজকাল ডাক্তাররা! এ দিকে বলছে ওজন কমাও, ওদিকে বলছে বেশি হাঁটা চলবে না। তবে ওজনটা কমবে কী করে? দুই ভুরুর মাঝখানে কুচি-কুচি ভাঁজ ফুটে ওঠে আদিদেবের।

লেকের চারপাশটা একটু চোখ বোলালেন আদিদেব। এই ভোরবেলাতেও দূরের বাইপাস দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে ছোট-বড় গাড়ি। লেকটার চার পাশে পিচ-বাঁধানো রাস্তা, ফুলের গাছ, রট আয়রনের বেঞ্চ। বেঞ্চগুলোর পিছনে একটা করে বাহারি ল্যাম্পপোস্ট। সন্ধের পর এ রাস্তা দিয়ে গেলে মনে হয় কোনও রাজার রাজত্বে ঢুকে পড়েছেন বুঝি পথিক। যে রাজ্যে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, অভুক্ত মানুষ নেই।

এ অঞ্চলে অনেক মাছের ভেড়ি ছিল আগে। আর ছিল কিছু হতদরিদ্র মানুষদের অস্থায়ী আস্তানা। সেই ভেড়িগুলো বুজিয়ে বড়-বড় বহুতল উঠেছে এখানে। দু'পা এগিয়ে গেলেই ফাইভ স্টার আর সেভেন স্টার হোটেল। তেমনি দু'পা পিছিয়ে গেলে আবার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড়-বড় বিল্ডিং, মাল্টিকুইজ়িন রেস্তরাঁ আর মাল্টিস্পেশ্যালিটি হসপিটাল। বাইপাস ধরে, উড়ালপুলগুলোর উপর দিয়ে হাওয়ায় ভর করে উড়ে যাওয়া যায় এয়ারপোর্টের দিকে। সময় লাগে সাকুল্যে কুড়ি মিনিট। তাই এ অঞ্চলের জমির দাম আকাশছোঁয়া এখন।

তবে লেকের ধারের এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টটা যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন জলের দরে তিন তলার জোড়া ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছিলেন আদিদেব। তখন অবশ্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী বেঁচে ছিলেন। তাঁর পছন্দেই কেনা। বারবার বলতেন, "একটা নদীর ধারে বাড়ি বানাব আমরা।" আসলে বহু বছর উত্তরবঙ্গে

কাটানোর ফলে অমনই একটা ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। কিন্তু অবসর নেওয়ার পরে ওখানে আর মন টেকেনি আদিদেবের। তবে স্ত্রীর ইচ্ছেটাকেও মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি। জলের ধারেই কিনেছিলেন এই জোড়া ফ্ল্যাট। ভেড়িটাকে আরও গভীর ভাবে খুঁড়ে তৈরি করা কৃত্রিম হ্রদ। কুলকুল করে বয়ে যায় না বটে, তবে হাওয়া দিলে ঝিলমিলে ঢেউ ওঠে জলে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে ছোট-বড় বৃত্ত তৈরি হয়। কচুরিপানার উপরে জলপিপিদের সহবাস চলে। সেই লেক আর ওঁদের এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্ট্স-এর মাঝে শুধু একটা নিচু প্রাচীর আর একটা সরু পিচবাঁধানো রাস্তা।

বছর দশেক আগে যখন এই ফ্ল্যাট দুটো কিনেছিলেন আদিদেব, তখন পাঁচ তলার ময়ূখ আর শর্মিষ্ঠা সবে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে রয়্যাল কলেজের ফেলোশিপ করে। ময়ূখ সার্জারিতে আর শর্মিষ্ঠা অ্যানাস্থেশিওলজিতে। ওদের মেয়ে পমপমের তখন বছর দুয়েক বয়েস। দেখতে-দেখতে সে মেয়েও টিনএজে পা দিতে চলল। মৈত্রেয়ীর ভারী ন্যাওটা ছিল মেয়েটা। ওকে নিয়েই সময় কেটে যেত তাঁর। তবে সে সুখ বেশি দিন সয়নি তাঁর। কর্কট রোগের ছোবলে বৈতরণী পেরিয়ে ছিলেন তিনি বছর সাতেক আগেই। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আদিদেবের পাঁজর ফুঁড়ে।

একটা পানকৌড়ি মাথাটাকে জলের ভিতরে ডুবিয়ে খাবার খুঁজছে। পা আর পাখনাজোড়া জলের উপরে। অমনি করেই অতীত খোঁজে আদিদেবের মন। স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে।

পাঁচ তলার অমলাদিও ওই সময়েই দিল্লির আর্মি স্কুল থেকে রিটায়ার করে এসেছিলেন এখানে। ছেলে অর্চিষ্মান ডিফেন্স কোটায় পড়তে এসেছিল খড়্গপুর আইআইটি-তে। তাই ছেলের কাছাকাছি থাকবেন বলে দিল্লি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কার্গিল যুদ্ধে স্বামীকে হারানোর পর ছেলেকে আর দূরে যেতে দিতেন না। অথচ সেই ছেলেই কয়েকবছর আগে ইংল্যান্ড চলে গেল কোম্পানির কাজে।

"গুড মর্নিং মিস্টার মুখার্জি। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন দেখছি। আজ কি হাঁটার মুড নেই?" শর্টসের উপরের কিম্ভূতকিমাকার ভুঁড়িটা এগিয়ে এনে বললেন মিস্টার চাকী।

আদিদেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নট অ্যাট অল। আসলে আপনাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না তো, তাই। আপনারা তো হাঁটছেনই, আমিও যদি হাঁটতে থাকি তবে তো আমাদের দেখাই হত না।"

"তা যা বলেছেন। আমাদের সকলেরই তো স্পিড এক। রিলেটিভ ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করার বালাই নেই," বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার চাকী।

"আমাদের আর দু'জন ওয়াকারকে দেখছি না তো!" এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আদিদেব।

কয়েক গজ দূরের বকুল গাছটার দিকে তর্জনী তুলে মিস্টার চাকী বললেন, "ওই দেখুন আমাদের প্রেমিকপ্রবরের কাণ্ডখানা!"

"উবু হয়ে বসে কী করছেন মিস্টার তলাপাত্র?" অনুসন্ধিৎসু আদিদেব।

"প্রেম, মশাই প্রেম। গিন্নির জন্য বকুল ফুল কুড়োচ্ছেন।"

"এক্সেলেন্ট!" বুকের ভিতরে একটা চিনচিনে ব্যথা নিয়ে বললেন আদিদেব। মৈত্রেয়ীও খুব ফুল পছন্দ করতেন।

একটু থেমে মিস্টার চাকী বললেন, "আমাদের ফোর্থ ওয়াকার একটু উৎফুল্ল হয়ে আছেন আর-এক ওয়াকারকে নিয়ে।"

"বুঝতে পারলাম না ঠিক। একটু ক্ল্যারিফাই করুন।"

"আরে মশাই, মিস্টার দস্তিদারের ছেলে এসেছে আমেরিকা থেকে। বাবার জন্য একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের অ্যালকোহল নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গেই দোস্তি পাতিয়েছেন মিস্টার দস্তিদার।"

"বেল পাকলে কাকের কী?" বলে এক চোখ টিপে হাসলেন আদিদেব।

"না-না অত ডিজ়াপয়েন্টেড হবেন না মিস্টার মুখার্জি। কাকস্নানেরও ব্যবস্থা আছে।"

"কাকস্নানে কী হবে? কাকভেজা হওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা বলুন।"

"হাফ বোতল আছে শুনেছি। আমার কাছে সেটা পজিটিভ ভাইব্স। আই মিন হাফ বট্ল ফুল দেখতে পাচ্ছি। আপনি যদি সেটা হাফ বট্ল এম্পটি দেখেন তবে অন্য কথা।"

"ভুলে যাবেন না আমরা দলে চার জন। হাফ বট্ল তো নস্যি মশাই। তা কবে আসছেন মিস্টার দস্তিদার?"

"আজ-কালের মধ্যেই আসবেন বললেন।"

"তবে অনুপানের ব্যবস্থা করি আজ?"

"আমি কিছু আনব? বাদাম বা চিজ় জাতীয় কিছু?"

"ডোন্ট ওয়ারি। বিচ্ছুকে বলছি চিকেন পকোড়া বানাতে। ওর হাতে বেশ খোলে ব্যাপারটা।"

মিস্টার তলাপাত্র মুঠোভর্তি বকুল ফুল এনে জিজ্ঞেস করলেন, "কার হাতে কী খোলে বলুন তো?"

আদিদেব মুচকি হেসে বললেন, "নানা মানুষের হাতে নানা রকমের কাজ খোলে মিস্টার তলাপাত্র। এই যেমন আপনার হাতে বকুল ফুল। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি আপনি গিন্নির খোঁপায় মালাটা জড়িয়ে দিচ্ছেন।"

"আপনি রসিক লোক মশাই। আপনার মুখেও এ ধরনের ইরোটিক কথাগুলো বেশ খোলে," লজ্জিতভাবে বললেন মিস্টার তলাপাত্র।

কপট রাগ দেখিয়ে আদিদেব বললেন, "এর ভিতরে ইরোটিজ়মের কী দেখলেন? আমি তো আপনার আর আপনার স্ত্রীর প্লেটোনিক লাভের কথা বলছি।"

আদিদেবের মুখের কথাটা লুফে নিয়ে মিস্টার চাকী বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর নিষ্কাম ভালবাসা? ইউ মাস্ট বি জোকিং মিস্টার মুখার্জি।"

মিস্টার চাকীর হাসিটা সংক্রমিত হল বাকি দু'জনের মধ্যেও। হাহা-হিহি শব্দে ভরে উঠল একটা ছোট্ট বৃত্ত।

দক্ষিণ দিগন্তে আকাশছোঁয়া ইট-কাঠের জঙ্গল থাকলেও এ অঞ্চলের পূর্ব দিগন্তটা এখনও সবুজ। সেই সবুজের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা আগুনের গোলা। যাঁর-যাঁর বাড়িতে ফেরার সময় হল ওঁদের। আবার দেখা হবে সন্ধে ছ'টায়। সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই। আদিদেবের বাড়িতে ব্রিজের আসর বসে রোজ।

দূর থেকে মুখার্জিসাহেবকে দেখতে পেয়েই বাঁশি ফেলে বাগানের গাছের গোড়ার আগাছাগুলো তুলতে লাগল ফেলনা। মুখার্জিসাহেব খুব রাশভারী মানুষ। এ বিল্ডিংয়ের সবাই খুব সমীহ করে। বিল্ডিংয়ের ভাল-মন্দ দেখেন উনিই। তাই তাঁকে খুশি রাখতে চায় ফেলনাও।

ছোট্ট এক চিলতে বাগানটার পরেই কারপার্কিং। পিলারগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে গাড়িগুলোও যেন ঘুমোচ্ছে এখন। লাট্টু আসবে সাতটা নাগাদ। একে-একে ধোবে গাড়িগুলো। তখন ঘুম ভাঙবে তাদের। সকলের আগে ধোবে ময়ূখের গাড়িটা কেননা সকাল আটটাতেই বেরিয়ে যায় ময়ূখ-শর্মিষ্ঠা।

কার পার্কিংয়ের এক কোণে একটা লম্বা কাঠের টেবিল আর একটা চেয়ার। কালাচাঁদের জন্য। টেবিলটার একপাশে চার-পাঁচটা ড্রয়ার। টুকিটাকি জিনিস রাখে সেখানে সে। কিছু দিন হল একটা সস্তা কাঠের বেঞ্চেরও আমদানি হয়েছে। এ বিল্ডিংয়েরই কোনও রেসিডেন্টের বদান্যতায়। নামটা উহ্য রেখেছেন তিনি, কিন্তু কারণটা সকলের জানা। এ ধরনের ছোটখাটো লগ্নিতে প্রতিদান পাওয়া যায় ভাল। ওই বেঞ্চটায় বসে আড্ডা দেয় এ বাড়ির কাজের লোকেরা, ড্রাইভারেরা। কখনও কখনও বহিরাগতরাও। তবে আজকাল এ সব দেখেও না দেখার ভান করেন আদিদেব। এককালে যে দুঁদে সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন তিনি, সেকথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বুড়ো সিংহেরও যখন তেজ কমে আসে, পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে সে।

কালাচাঁদের টেবিলটার উপরে অনেক পাট না-ভাঙা খবরের কাগজ রাখা। তার ভিতর থেকে নিজের ইংরেজি কাগজটা তুলে নিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকটায় গিয়ে গলা চড়ালেন আদিদেব, "কালা! তুমি কোথায়?"

ফেলনা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে বলল, "কালাদা একটু বাইরে গেছে স্যর।"

"সে তো সব সময়েই বাইরে থাকে, তালে আর এখানকার চাকরিটা করার কী দরকার। বাইরেই কোথাও কাজ খুঁজে নিক।"

"আসলে চায়ের দোকানে গেছে কালাদা। এখনও কারও চা খাওয়া হয়নি তো," মাথাটা নিচু করে বলল ফেলনা।

"কারও মানে? আর কার-কার চা আনতে গেছে সে?"

নিজের কথার জালে নিজেই আটকে গিয়েছে ফেলনা। সে বোঝে না কী বলা উচিত আর কী নয়। আপাতত তো তিন জনের জন্য চা আনতে গেছে কালাদা। তারা দু'জন তো আছেই, লাট্টুও এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু এত কথা কি বলা উচিত হবে মুখার্জিসাহেবকে?

তবে দুধওয়ালা ছেলেটা এসে বাঁচিয়ে দিল ফেলনাকে। দুধওয়ালা এসে তার সাইকেলের ঘন্টিটা ক্রিং ক্রিং করে বাজাতেই ম্যাজিকের মতো ছ'তলা থেকে একটা মোটা চটের ব্যাগ নেমে এল গলায় নাইলনের দড়ি বেঁধে। তার ভিতরে পটাপট গোটা ছয়েক ফুল ক্রিম মিল্কের পাউচ ভরে দিতেই ব্যাগটা বিল্ডিংয়ের গা বেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করল। তবে শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য আরোহণের গতিটা একটু মন্থর। যেন বালতিভরা জল তোলা হচ্ছে কুয়ো থেকে।

দৃশ্যটা মনোযোগ দিয়ে দেখলেন আদিদেব। ছ'তলায় লেক-ফেসিং দুটো ফ্ল্যাট আছে। একটাতে থাকেন সরকাররা, অন্যটাতে লোহিয়ারা। ওটাই হেভি ট্র্যাফিক জ়োন বিল্ডিংয়ের। সরকাররা ছেলে-বৌ-শ্বশুর-শাশুড়ি মিলিয়ে জনা চারেক আর লোহিয়াদের জনা আটেক। শ্বশুর-শাশুড়ি-বড় ছেলে-বড় বৌ-তিনটে নাতি-নাতনি আর ছোট ছেলে পুনিত। কী করে যে থাকে একটা টু বিএইচকে ফ্ল্যাটে কে জানে! উপর দিকে তাকিয়ে ভাবলেন আদিদেব।

ছ'তলার পিছন দিকে আরও দুটো ফ্ল্যাট আছে। তবে সেগুলো এখন পায়রার বাসা। জমির মালিকের বড় ছেলের মালিকানা সেখানে। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে ফ্ল্যাট দুটো এখনও বিক্রি হয়নি। তবে সিঁড়ির কমন স্পেস আর ছাদটা বেআইনি ভাবে দখল করে নিয়েছেন সরকাররা। শাশুড়ি আর বৌমা মিলে একটা হোম ডেলিভারির ব্যবসা করছেন সেখানে। নাম দিয়েছেন 'দুই সখীর হেঁসেল'। তবে নামে আর স্বভাবে কোনও মিল নেই। শাশুড়ি আর বৌমার চেঁচামেচিকে ভয় পায় এ পাড়ার কাক-চিলেরাও। আর তাঁদের কলহের স্বরক্ষেপণ সীমাবদ্ধ নয়। মাঝে-মাঝেই ওভার বাউন্ডারি চাল চালেন তাঁরা। লোহিয়ারাও কম যান না, ছক্কা আসে তাঁদের তরফ থেকেও।

আদিদেব ভাবলেন দুধওয়ালা ছেলেটাকে ডেকে বলবেন যে, এইরকম প্রিমিটিভ সিস্টেমে দুধ ডেলিভারি করছ কেন? লিফটে চেপে ছ'তলায় গিয়ে দিয়ে এলেই তো হয়। পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হল, উঁহু, তা হলে এ বিল্ডিংয়ের ইলেকট্রিক বিল আর-একটু বেড়ে যাবে। অমনিতেই সার্ভিস চার্জ দিতে চায় না কেউ। বেচারা কালাচাঁদ দোরে-দোরে গিয়ে ভিক্ষে করার মতো সার্ভিস চার্জ নিয়ে আসে। নইলে তো মাইনে পাবে না ওরা। বিলটিলও আদিদেবকে নিজের পকেট থেকেই দিতে হয় অনেক সময়। কিছু রিইমবার্স হয়, কিছু হয় না। আজ পর্যন্ত একটা রেজিস্টার্ড অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হল না এ বিল্ডিংয়ের রেসিডেন্টদের। একটা 'নো ম্যান্‌স ল্যান্ড' যেন।

## ২

পৌনে সাতটা বাজে। কালাচাঁদ ফেরেনি এখনও। ফেলনার বুকটা ঢিপঢিপ করছে। কালাচাঁদের পায়ের তলার মাটিটা শক্ত থাকা জরুরি। তার নিজের জন্য তো বটেই, ফেলনার জন্যও। কালাচাঁদই তো তাকে আশ্রয় দিয়েছে। দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেয়, তার বাথরুম ব্যবহার করতে দেয়, মায় রাতে তার তক্তপোশের একটা কোনায় গুটিসুটি মেরে শুতেও দেয়। প্রতিদানে তার অবসর সময়ে কালাচাঁদকে সাহায্য করে ফেলনা। ফাই-ফরমাশ খাটে। সকাল-সন্ধে বাঁশি বাজিয়ে কৃষ্ণ-ভজনের ধুন শোনায়। ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন মুখার্জিসাহেব। তাঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ফেলনা। কী সুন্দর ইস্তিরি করা খাকি রঙের হাফপ্যান্ট পরেছেন তিনি। সঙ্গে লাল টুকটুকে কলারওয়ালা গেঞ্জি। পায়ে ছাই রঙের হাঁটার জুতো। ফেলনার সবচেয়ে ভাল লাগে ওঁর ওই সাদা ধবধবে ছাগল দাড়িটা। ঠিক যেন অমিতাভ বচ্চন। তবে তাঁর মতো লম্বা নন মুখার্জিসাহেব। আর বেশ মোটা। ভুঁড়িটাও বাগিয়েছেন জবরদস্ত। হবে না? সন্ধেবেলায় বসে খালি তাস খেলা আর ওই ছাইপাঁশ গেলা! বিচ্ছুর কাছ থেকে সব খবর পায় ওরা। কিন্তু মুখার্জিসাহেব এমন 'নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু' হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কালাচাঁদকে হাতে-নাতে ধরবেন বলে? মাকুর টানাপড়েন ফেলনার মনে।

লিফটের কোলাপসিব্‌ল গেট দুটোতে ঘটাং ঘটাং করে আওয়াজ হল। পাঁচ তলার ডাক্তারবাবুদের কাজের মাসি মিনু নেমে এসেছে। তার কাঁধে মস্ত বড় একটা বইয়ের ব্যাগ আর হাতে জলের বোতল। পিছন-পিছন আসছে ডাক্তারবাবুর মেয়ে পমপম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে ফেলনা। ফর্সা টুকটুকে মেয়েটাকে সাদা ধবধবে স্কুলের জামা পরে মনে হচ্ছে যেন একথোকা দোলনচাঁপা ফুল।

মুখার্জিসাহেব এগিয়ে গিয়ে পমপম দিদিকে জড়িয়ে ধরলেন। গালে গাল লাগিয়ে 'হায়-হায়' করলেন। তার পর ইংরিজিতে আরও অনেক কিছু বললেন। ফেলনা শুধু 'সুইটহার্ট' কথাটা বুঝতে পারল, আর কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই তার। তবে কালাচাঁদের অনুপস্থিতিতে তার কর্তব্যগুলো সম্পাদন করার চেষ্টা করে সে। তাই ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে একটা পাল্লা সরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পমপমের স্কুলবাসটা তাকে নিয়ে চলে যেতেই আদিদেব লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন। মিনুও তাঁর পিছন-পিছন যাচ্ছিল, ফেলনা তার হাত ধরে একটা আলতো টান মেরে বলল, "অ মাসি, চা খাবা না? কালাদা চা নিয়ি এল বলে।"

মিনু দু'হাত নেড়ে বলল, "না রে ল্যাংড়া, এখন আর চা-টা খাওয়া যাবে না। দাদা-বৌদিকে জলখাবার দিতে হবে, টিফিন কৌটোয় দুপুরের খাবার ভরে দিতে হবে, অনেক কাজ বাকি। সব কাজ সেরে বেলায় আসব'খন।"

লাট্টু এসে গেছে। সে সাইকেল থেকে নামতে না-নামতেই কালাচাঁদও হাজির। হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেটলি, যার শরীরময় বহু বছরের কালো ছোপ। হাতলের উপরটায় একটা বেতে বোনা আস্তরণ ছিল হয়তো বা। কিন্তু সেখানে এখন একটা ছেঁড়া গামছার টুকরোতে সুতলি পেঁচিয়ে রাখা।

সাইকেলটাতে তালা লাগিয়ে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকটায় যাচ্ছিল লাট্টু, সেখানেই আছে তার গাড়ি ধোওয়ার বালতি আর দড়িতে টাঙানো আছে গাড়ি মোছার ন্যাতাটা। তার পিছন থেকে হাঁক পাড়ল কালাচাঁদ, "অ্যাই লাট্টু চা-টা খেয়ে নিয়ে কাজে লাগ। নইলে চা ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

ফেলনা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে কালাচাঁদের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। ড্রয়ার খুলে গুনে-গুনে তিনটে খেলনার সাইজ়ের প্লাস্টিকের গ্লাস বের করে টেবিলে সাজাল। তার পর কেটলিটা থেকে চা ঢেলে কালাচাঁদ ও লাট্টুকে দিল। নিজেও নিল একটা গ্লাস। কালাচাঁদ প্যান্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া তিনটে সস্তার বিস্কুট বের করে বলল, "খালি পেটে চা খাস না। লিভার খারাপ হয়ে যাবে।"

যে চা দু'চুমুকে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, সেটাই বহুক্ষণ ধরে তারিয়ে-তারিয়ে খেল ওরা সুখ-দুঃখের গল্প করতে-করতে। তার পর কালাচাঁদের টেবিলের উপরের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল লাট্টু। বলল, "উরিব্বাস, সাড়ে সাতটা বেজে গেল তো! ডাক্তারবাবুর কাছে ঝাড় খাব আজ। এই ল্যাংড়া, আমার বালতি আর ঝাড়নটা এনে দে না। আমি উপর থেকে চাবিটা নিয়ে আসি যাই।"

লিফটের দিকে যেতে-যেতে দাঁত কেলিয়ে হেসে একটা চার অক্ষর ঝাড়ল লাট্টু। বলল, "বালতিটা জল ভরে আনিস। যা একটা বোকা** তুই, খালি বালতি নিয়ে আসিস না যেন।"

গাড়ি ধোবার ন্যাতাটা আর আধবালতি জল এনে পাঁচ তলার ডাক্তারবাবুর গাড়িটার কাছে রেখে দিয়ে নিজেও বাথরুমে ঢুকে পড়ল ফেলনা। প্রাতঃকৃত্য সেরে, হাতমুখ ধুয়ে, বাবরি চুলটাকে টেনে একটা রবারব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিল সে। জায়গায়-জায়গায় ফেটে যাওয়া বারমুডা প্যান্টটা আর রংচটা গোলগলা গেঞ্জিটা পরে নিল। বাঁশিটা কোমরের ইলাস্টিকে গুঁজে কালাচাঁদের ঘর থেকে লাঠিটা নিয়ে এল। লম্বা পথ হাঁটতে হলে লাঠিটা প্রয়োজন হয়। এক পায়ে ল্যাংচাতে বড় কষ্ট।

বাঁ পায়ে একটা সেফটিপিন লাগানো হাওয়াই চটি পরে লিকলিকে ডান পা-টা দিয়ে লাঠিটা জড়িয়ে নিল ফেলনা। একটা লতার মতো। তার পর বাইপাসের মোড়ের ট্র্যাফিক সিগনালের দিকে হাঁটতে লাগল। বেলা দেড়টা-

দুটো পর্যন্ত সেখানেই থাকবে সে। বাঁশিতে কৃষ্ণ-ভজনের ধুন বাজিয়ে ভিক্ষে করবে। ট্র্যাফিক সিগনালটা লাল হতেই গাড়িগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে নদীর মতো বয়ে যাবে সে। আর সিগনাল সবুজ হওয়ার সংকেত পেলেই রাস্তার ধারের ফুটপাথে চলে এসে বাঁশি বাজাবে। এ সব মিনিট-সেকেন্ড গণনার অঙ্কে বেশ পাকা সে। হবে না-ই বা কেন, ফুটপাতেই তো জন্মেছে সে, বড়ও হয়েছে ফুটপাথেই। পোকা-মাকড়ের মতো। তবে তার খিদে পায়, বর্জ্য ত্যাগ করে, যৌন উত্তেজনাও হয়।

ফুটপাতবাসীদের মধ্যে কেউ একজন দয়া করে একটা নামও দিয়েছিল তাকে। ফেলনা। ঠিকই তো। তাকে তো তার মা ফুটপাতেই ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। আবর্জনার মতো। তবে বেশিরভাগ লোকই তাকে ল্যাংড়া বলে ডাকে। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে ডান পা-টা অপুষ্ট রয়ে গিয়েছে। তবে কোনও ডাকেই কোনও আপত্তি নেই তার। কী-ই বা ফেলনা, কী-ই বা ল্যাংড়া! গুয়ের এ পিঠ আর ও পিঠ বই তো নয়। তবে কালাচাঁদ যখন তাকে ফেলু বলে ডাকে, তখন কিছু একটা গলতে থাকে তার বুকের ভিতরে। বর্ষাকালের লেকটার মতোই কানায়-কানায় ভরে ওঠে মনটা। পারিবারিক একটা বন্ধনের সুবাস ঘিরে ধরে তাকে তখন। উপরের পাটির উঁচু দাঁত চারটেও বেরিয়ে আসে খুশির ঝলকে।

ঝটপট ডাক্তারবাবুর গাড়িটা ধুয়ে ফেলে আজ লাট্টু। মগভর্তি জল দিয়ে ঝাপটা মেরে-মেরে পুরো গাড়িটা ধুয়ে শুকনো ঝাড়নটা দিয়ে মুছে দেয়। ঝাড়নটা ভিজিয়ে চাকাগুলো রগড়ে দেয়। শর্মিষ্ঠাম্যাডাম একটা পালিশের বোতল দিয়েছেন ওকে। কিন্তু আজ আর সময় হবে না পালিশ করার। গাড়ির সিটগুলো আর ড্যাশবোর্ডের উপরে ভেজা ন্যাতা বুলিয়ে ফুটম্যাট চারটেও ধুয়ে মুছে রেখে দেয় ফটাফট। শর্মিষ্ঠাম্যাডাম ভীষণ খুঁতখুঁতে। ফুটম্যাটগুলো নোংরা থাকলেও বিরক্ত হন।

ডাক্তারবাবুর ড্রাইভার দেবু এসে গিয়েছে। তার হাতে গাড়ির চাবিটা দিয়ে একছুটে বিল্ডিং-এর সামনের বাগানটায় গেল লাট্টু। বৈশাখ মাস পড়তে না-পড়তেই ঝাঁকে-ঝাঁকে বেল ফুল ফুটছে সেখানে। পটাপট কয়েকটা বেল ফুল তুলে নিয়ে ডাক্তারবাবুর গাড়ির ড্যাশবোর্ডের গণেশের মূর্তিটার সামনে রেখে দিল সে। শর্মিষ্ঠা ম্যাডামের হাসিমুখটা দেখতে খুব ভাল লাগে তার। কালাচাঁদের এগিয়ে দেওয়া ছোট্ট প্লাস্টিকের গ্লাসটা গলায় উপুড় করে দিয়ে দেবু বলল, "চা-টা ঠান্ডা জল হয়ে গেছে কালাদা। একটু গরম করে দিলে পারতে।"

সার্বজনীন অর্থ-তহবিলে দানের কারণে অধিকারবোধের প্রাবল্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কালাচাঁদ ফ্যাকাসে হেসে বলল, "স্টোভে তেল নেই দেবুদা।"

দেবু কর্কশ গলায় বলল, "তালে আর কী? তেলের দামটাও চাঁদা করে তুলে নাও।"

এ সব কথা গায়ে মাখে না কালাচাঁদ। তা হলে আর দশ বছর ধরে এ বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকারগিরি করতে পারত না। দশ জনের দশ রকমের বায়না সামলে চলতে হয় তাকে।

কালাচাঁদের মোবাইল ফোনটা বাজছে। সব ফোন তোলে না সে। পরে দেখে নেয় কে ফোন করেছিল। জরুরি হলে নিজে থেকেই ফোন করে নেয়। বিল তো তার দিতে হয় না, মুখার্জিসাহেবই নিজের ফোনের বিলের সঙ্গে কালাচাঁদের ফোনের বিলও মিটিয়ে দেন। আসলে মুখার্জিম্যাডাম না থাকলেও ছাদে তাঁর গাছগুলো রয়ে গেছে। সেগুলোতে রোজ বিকেলে জল দেয় কালাচাঁদ। প্রয়োজনে সারটারও এনে গাছের গোড়ায় দেয়। ফুলটুল তেমন ফোটে না, তবুও গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চান মুখার্জিসাহেব।

কাঁটায়-কাঁটায় আটটায় বেরিয়ে গেল ময়ূখ আর শর্মিষ্ঠা। প্রথমে যাবে মুকুন্দপুরের সবচেয়ে বড় হাসপাতালটায়। থাকবে বেলা দুটো পর্যন্ত। সেখানকার ইন-হাউস সার্জেন আর অ্যানাস্থেসিস্ট তারা। তার পর লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে পড়বে সারা কলকাতায় চক্কর কাটতে। প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলোতে অজ্ঞান-জ্ঞান-কাটা-ছেঁড়া-সেলাইয়ের পর্ব চলবে সন্ধে ছ'টা অবধি। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা সল্টলেকের চেম্বার সেরে রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি। একে অন্যের পরিপূরক তারা। তবে সল্টলেকের চেম্বারে শর্মিষ্ঠাকে বসতে হয় না। সে তার কাজের বরাত পায় ময়ূখের কাছ থেকে। অ্যানাস্থেসিস্ট বিনা এক জন সার্জেন ঠুঁটো জগন্নাথ। অনেক ভেবেচিন্তেই নিজেদের প্রফেশনগুলো বেছেছিল তারা।

ডাক্তারবাবু আর শর্মিষ্ঠা ম্যাডাম বেরিয়ে যেতেই ফোনটা অন করল কালাচাঁদ। হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। ছ'তলার সরকারবৌদির ফোন ছিল ওটা। সে ভাবল, থাক, দরকার নেই আগ বাড়িয়ে হাঁড়িকাঠে গলা দেওয়ার। সব ফোনের জবাব দিতেই হবে তার কোনও মানে আছে?

পরক্ষণেই তার মনে হল, যা রাগী ওই সরকারবৌদি, কী বলতে কী বলবেন, তার পর মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হবে। গাধার মতো খাটান ঠিকই উনি, তবে দু'বেলার ডাল-ভাত-তরকারিটাও উনিই দেন তাকে। সে আবার সেই খাবার ভাগ করে খায় ফেলনার সঙ্গে। তাই ফোনের সবুজ বোতামটা টিপেই ফেলল সে।

"কে কালা?" জিজ্ঞেস করলেন সরকারগিন্নি।

"হ্যাঁ বৌদি। ফোন করলেন কেন?"

"একটা ছোট্ট কাজ আছে কালা।"

"এখন আমার অন্য কাজ আছে বৌদি। ডেলিভারি তো বারোটায়, ঠিক সময়মতো এসে যাব।"

"না-না, ডেলিভারির কথা বলছি না। বলছি যে এত গরম পড়েছে, একটু টক ডাল করব ভাবছিলাম। ডাল সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। সরষে-শুকনো লঙ্কার ফোড়নও রেডি। শুধু একটু কাঁচা আম দরকার। দ্যাখো না আশপাশে কোথাও পাও কিনা।"

"আশপাশে আর কোথায় পাবো বৌদি, যেতে হবে বাইপাসের মোড়ে।"

"কেন, আমাদের লেকের আশপাশে কোনও আমগাছ নেই?"

"সে থাকবে না কেন, কিন্তু সে গাছে কি আর বাকি আছে কিছু? আশপাশের বস্তির বদমাইশ বাচ্চাগুলো আছে না?"

"তবে একটু কষ্ট করে বাইপাসের মোড়েই যাও তুমি। সকলেই ফোন করে বলছে টক ডাল পাঠাতে।"

কালাচাঁদ ভাবে, এখন বাইপাসের মোড়ে গেলে মুখার্জিসাহেব ঠিক বুঝতে পারবেন। যা মিলিটারির মতো মেজাজ তাঁর, পান থেকে চুন খসলেই চেঁচামেচি করেন। এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে যত খুশি ফাই-ফরমাশ খাটো, বাইরে বেরোনো চলবে না। আর ছ'তলার পুনিতভাইয়াও খুব চালাক। ঠিক জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবে। পরে যখন নীচে নামবে তখন পানমশলা চিবোতে-চিবোতে বলবে, "কেয়া কালাচাঁদ, পয়ের পে পাঁইয়া লাগাকে রাখ্‌খা কেয়া? সারা দিন ঘুমতে রহতে হো।"

লাট্টু বেরিয়ে গেছে তার সাইকেল নিয়ে। নইলে তার সাইকেলটা নিয়ে বাইপাসের মোড়ে যেতে পারত কালাচাঁদ। দূরত্বটা হাঁটাপথের হলেও কাজের সময় সেটাই কয়েক যোজন মনে হয়। একটা সাইকেল কালাচাঁদেরও আছে, তবে সেটা থাকা আর না থাকায় কোনও ফারাক নেই। সাইকেলটা সরকারবৌদির দেওয়া। সরকারবাবু কোনও সেকেন্ড হ্যান্ড সাইকেলের দোকান থেকে কিনে এনেছিলেন। ওঁদের হোম-ডেলিভারির টিফিন কেরিয়ারগুলো খদ্দেরদের কাছে পৌঁছনোর জন্য। কিন্তু সে সাইকেল চালাতে গেলেই চেন পড়ে যায়, ব্রেকটাও কাজ করেনা। আর টায়ার-টিউবের জায়গায়-জায়গায় তাপ্পি মারা। একটা লিক সারিয়ে নেয় তো আর-একটা লিক গজায়।

বকবক করতে-করতে সেই ভাঙাচোরা সাইকেলটা নিয়েই বেরোবার তোড়জোড় করছিল কালাচাঁদ, তখনই মুখার্জিসাহেবের ড্রাইভার ছোটন এসে হাজির তার ঝকঝকে সাইকেলটা নিয়ে। তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ছোঁ মেরে তার সাইকেলের হ্যান্ডেল দুটো কেড়ে নিল কালাচাঁদ। একলাফে সিটে বসেই বলল, "দু' মিনিটে আসছি।"

ছোটন পিছন-পিছন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "শালা, তোর দু' মিনিট আমি জানি না? কাকে লাইন মারতে যাচ্ছিস? মেনকা নামুক, বলছি ওকে।"

ডান প্যাডেলে পা রেখে আর বাঁ পা-টা মাটিতে ঠেকিয়ে সব ক'টা দাঁত বের করে হেসে উঠল কালাচাঁদ। বলল, "যা না, বলগে। তোর মতো চুকলিবাজের কথা মেনকা বিশ্বাস করবে ভেবেছিস?"

ছোটন কাঠের বেঞ্চটায় বসতে-বসতে বলল, "মেলা বকিস না, তাড়াতাড়ি যা। কেটলিটা নিয়েছিস?"

"নিতে আর পারলাম কোথায়? তুই তো

ঢুকেই ঝগড়া বাধিয়ে দিলি।"

কালাচাঁদের টেবিলের তলা থেকে কেটলিটা বের করে এগিয়ে দিল ছোটন। এক চোখ টিপে বলল, "চা-উলিকে বলিস দুধটা একটু বেশি করে দিতে।"

আকর্ণ হেসে কালাচাঁদ বলল, "তোর নাম করে বলব?"

"হ্যাঁ, তাই বলিস। বলবি অত কালো চা খাওয়া যায় না।"

"ঠিক আছে, তোর দুধের ব্যবস্থা করছি আমি, তুই একটু এ দিকটা দেখিস। মুখার্জিসাহেব জিজ্ঞেস করলে বলিস আমি বাথরুমে আছি। আর পুনিতভাইয়াকে কিছু বলার দরকার নেই। যা-ই বলিস বিশ্বাস করবে না। সরকারবৌদিও কিছু জিজ্ঞেস করবেনা। তবে তিন তলার প্রিয়াদিদি যদি ওলা-উবের না পায় তো একটা ট্যাক্সি ডেকে দিস ..."

"ভাগ শালা। দু' মিনিটের জন্য যাবি বলে এত ফিরিস্তি দিচ্ছিস কেন? দেব পোঁদে এক লাথ..."

কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। ছোটন রুটিনমাফিক গাড়ির চাবিটা আনতে মুখার্জিসাহেবের ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে বেল বাজাতেই বিচ্ছু এসে চাবিটা দিয়ে বলল, "সাহাব বোল রহেঁ হ্যাঁয় কালাচাঁদকো থোড়া বুলা দো।"

ছোটন বিচ্ছুর দিকে এক চোখ টিপে তাকিয়ে হাসল। তার পর গলা চড়িয়ে বলল, "কালা বাথরুমে গেছে। বেরোলে বলে দেব।"

বয়ঃসন্ধির পাতলা গোঁফের রেখাটায় ঢেউ খেলিয়ে নিঃশব্দে হাসল বিচ্ছু। কালো কারে বাঁধা গলার মাদুলিটা ঘোরাতে-ঘোরাতে গুনগুন করল, "ঝুট বোলে কউয়া কাটে, কালে কউয়ে সে ডরিও..."

সে কিচেনের দিকে চলে যেতেই খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন মুখার্জিসাহেব। চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, "কালাচাঁদের পেটটা ঠিক আছে তো?"

ছোটন হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "কেন স্যর?"

একই ভাবে চোখে চোখ রেখে মুখার্জিসাহেব বললেন, "আজকাল খুব ঘন ঘন বাথরুমে যাচ্ছে কালাচাঁদ। ওকে বলিস পাঁচ তলার ডাক্তারবাবুকে যেন একটু দেখিয়ে নেয়। ওষুধপত্র যা প্রয়োজন, আমি কিনে দেব।"

ঘাড়টা যথাসম্ভব হেলিয়ে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যায় ছোটন।

## ৩

রাত দশটা থেকে সকাল সাতটা অবধি তাদের ভঙ্গুর শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে দোতলার ফ্ল্যাট চারটে। তবে সকাল সাতটা বাজতেই জ্বলে ওঠে সেখানকার সব আলো। তখন মস্ত-মস্ত স্বচ্ছ কাচের দেওয়ালের ওপারে দেখা যায় নানা রকম মেশিনের বাহার। ট্রেডমিল, স্টেশনারি বাইক আর রোয়িং মেশিনগুলো সাজানো আছে বিল্ডিংটার সামনের দিকের কাচের দেওয়ালের গা ঘেঁষেই। দোতলার চারটে ফ্ল্যাটের মালিকানাই জমির মালিকের ছোট ছেলের। পরিবার নিয়ে তিনি নিজে থাকেন ভবানীপুরে। তবে এই ফ্ল্যাট চারটে বিক্রি না করে একটা জিমকে ভাড়া দিয়েছেন তিনি। জিমটার নাম 'লেকভিউ ফিটনেস'। লেকভিউ ফিটনেস যেন একটা দ্বীপ-রাষ্ট্র। তাদের নিজেদের হাইভোল্টেজ মিটার আছে। একটা আলাদা সিঁড়িও আছে। ফলে রাস্তা থেকেই সোজা উঠে যায় তারা। এই বিল্ডিং-এর কার পার্কিং বা লিফ্‌টের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই। যোগাযোগের সূত্র শুধু দু'টি। যার একটা হচ্ছে এ বিল্ডিংয়ের ওয়াটার সাপ্লাই আর দ্বিতীয়টা চার তলার পুনম ট্যান্ডন। পুনম ট্যান্ডনের স্বামী রোহিত ট্যান্ডন পেশায় একজন পাইলট। একটা প্রাইভেট

পুনম ট্যান্ডনের স্বামী রোহিত ট্যান্ডন পেশায় একজন পাইলট। একটা প্রাইভেট এয়ারলাইনের প্লেন চালায়। সাউথইস্ট এশিয়ার নানা দেশে ঘোরাঘুরি করে।

এয়ারলাইনের প্লেন চালায়। সাউথইস্ট এশিয়ার নানা দেশে ঘোরাঘুরি করে। সপ্তাহে একদিন বাড়িতে আসে। বছর দুয়েক হল বিয়ে হয়েছে তাদের। এই লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্টসটা থেকে ফ্লাইওভার দিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে যেমন এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাওয়া যায়, তেমনি দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে শহরের কেন্দ্রেও পৌঁছে যাওয়া যায়। তাই আশি লাখ টাকা দিয়ে একেবারে জোড়া ফ্ল্যাটই কিনে ফেলেছে রোহিত। কয়েক বছর পরে এই ফ্ল্যাট দুটো বিক্রি করে দিল্লির কোনও অভিজাত পাড়ায় উঠে যাওয়ার পরিকল্পনা তার। কিন্তু দিল্লির বসন্তবিহারের মেয়ে পুনমের সময় কাটে না এখানে। তাই সকাল ন'টা থেকে এগারোটা এই লেকভিউ ফিটনেস জিমে ওয়ার্ক আউট করে সে। আজও সকাল ন'টা নাগাদ নেমে এল সে। পরনে একটা নেভি ব্লু বডিহাগিং ক্যাপ্রি আর সি গ্রিন ট্যাঙ্ক টপ। হাতে একটা ঢাউস ক্যারি ব্যাগ। এই মুহূর্তটার অপেক্ষাতেই বসে ছিল ছোটন। ভারী ভাল লাগে তার এই পুনম ম্যাডামকে। পূর্ণিমার চাঁদের মতোই রূপ তার। যেমন গায়ের রং, তেমনি তার শারীরিক সম্পদ। আর গায়ের গন্ধটাও কেমন যেন বিবশ করে তাকে। আজ আবার সে এগিয়ে এসে ছোটনকে জিজ্ঞেস করল, "কালাচান্দ নেহি হ্যায়?"

পুনম ম্যাডামের জলতরঙ্গের মতো গলার আওয়াজে ঘোর ভাঙে ছোটনের। তবে এমন সৌন্দর্যের সঙ্গে কপটতা করা যায় না। তাই সত্যি কথাটাই বলে ফেলে সে, "থোড়া বাহার গয়া হ্যায়, আভি আ যায়গা। কুছ বোলনা হ্যায় ম্যাডাম?"

"হাঁ, কুছ কাপড়া প্রেসবালাকো দেনা থা। বলে ক্যারিব্যাগটা কালাচাঁদের টেবিলের উপরে রাখে সে।"

"হিঁয়া রাখিয়ে, হাম বোল দেগা উসকো," ছোটনের জবাব।

"ঠিক হ্যায়," বলে ব্যাগটা টেবিলের উপরে রেখে সদর দরজা পেরিয়ে জিমের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় পুনম।

ব্যাগটা কাছে টেনে নিয়ে নিজের নাকটা ডুবিয়ে দেয় ছোটন। চোখ দুটো বুজে বুক ভরে টেনে নেয় সেই কস্তুরী-গন্ধ।

"কী করছিস?" সাইকেলটা একটা পিলারের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল কালাচাঁদ।

ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলে ছোটন। বলে, "কী মাখে বল তো?"

"কে?" অবাক প্রশ্ন কালাচাঁদের।

"ওই পুনম ম্যাডাম। দ্যাখ না, কাপড়-জামাগুলোয় কী দারুণ গন্ধ।"

"তুই এগুলো দিয়ে কী করছিস?"

"কী আবার করব, ইস্তিরিওয়ালাকে দিতে বলে গেল। তাই গন্ধ শুঁকছিলাম। আমার বউটার গায়ে তো শুধু বদ গন্ধ।"

কালাচাঁদ বলল, "শুধু গন্ধ শুঁকলে হবে? যা না ইস্তিরিওয়ালাকে দিয়ে আয় কাপড়গুলো। আমি আর কত দিকে ছুটব বল তো?"

ছোটন খেপে গিয়ে বলল, "লোকের কাপড়জামা বয়ে বেড়ানো কি আমার কাজ? ডেরাইভারি ছেড়ে এখন এই কাজ করব নাকি?"

"কত যে ড্রাইভারি করিস জানা আছে। সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত বসে থাকিস শুধু।"

"তো? তাতে তোর বাপের কিছু এসে যায়? মাস গেলে দশ হাজার টাকা মাইনে পাই। সাহেবের টাকা আছে, আমাকে বসিয়ে রেখে মাইনে দেয়। তোর এত ফাটছে কেন রে শালা?" বলেই একদলা থুথু ফেলে ছোটন।

আর কথা না বাড়িয়ে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যায় কালাচাঁদ। সরকারবৌদি বসে আছেন কাঁচা আমের জন্য। ছ'তলা থেকে নেমে এসে কালাচাঁদ দেখল মেনকা বসে আছে বেঞ্চটার উপরে আর প্রিয়া ম্যাডামের

যমজ ছেলে দুটো ছুটে বেড়াচ্ছে কার পার্কিংটায়। কালাচাঁদ মেনকার পাশে বসে বলল, "কখন এলি?"

মেনকা কিছু বলার আগেই ছোটন বলে উঠল, "কী পেরেম মাইরি!"

মেনকা লজ্জা পেয়ে আঁচলটা দিয়ে পিঠটা ঢাকতে যেতেই ছোটন একপাক নেচে গেয়ে উঠল, "মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা ..."

"তবে রে," বলে ছোটনের দিকে ছুটে গেল কালাচাঁদ। আর তক্ষুনি লিফ্‌ট থেকে নেমে এল মিনু। হাতে একটা জাম্বো সাইজ়ের স্টিলের গ্লাস, তার শাড়ির আঁচল দিয়ে জড়ানো। আর পিছনে পমপমের পমেরানিয়ান কুকুর স্নোয়ি। মিনুর হাতের গ্লাসটায় উঁকি দিয়ে ছোটন জিজ্ঞেস করল, "চায়ে বেশি করে দুধ দিয়েছ তো মাসি?"

পান-জর্দার ছোপ ধরা দাঁতগুলো মেলে মিনু বলল, "হ্যাঁরে বাপু, বেশি করে দুধ দিয়েচি, বেশি করে চিনি দিয়েচি। আর একটা চানাচুরের প্যাকেটও নিয়ে এসেচি। নেহাত বৌদি ভাঁড়ারের দিকে তাকিয়ে দেকেন না, অন্য বাড়ি হলে এত দিনে হাতকড়া পড়ে যেত আমার হাতে।"

প্রিয়ংবদার দুই ছেলে আহির ও ইমন ছুটে এল স্নোয়িকে দেখে। তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তার পর তাকে বল ছুড়ে দিল। স্নোয়িও বাধ্য সঙ্গীর মতো ছুট্টে গিয়ে বলটা নিয়ে এল দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে। দু'ভাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।

চায়ে চুমুক দিয়ে ছোটন বলল, "ওদের বাবা কোথায় থাকে রে মেনকা?"

মুঠোর চানাচুরটা মুখে ছুড়ে দিয়ে মেনকা বলল, "জানি না।"

পাকা কৌঁসুলির মতো ছোটন প্রশ্ন করল, "জানি না মানে? বাচ্চাদুটোকে কি মা ষষ্ঠী এসে প্রিয়া ম্যাডামের কোলে দিয়ে গেছেন?"

একটা জর্দাপান মুখে ঠুঁসতে-ঠুঁসতে মিনু বলল, "অত কতার দরকার কী আমাদের? কাজ করতে এসেচি, কাজ করব, মাইনে নেব, ব্যস।"

কালাচাঁদেরও ভাল লাগছে না এসব প্রসঙ্গ। মেনকা যতক্ষণ নীচে থাকে তার সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে চায় সে। সুযোগ পেলে একটু হাতে হাত রাখে, দুটো ভালবাসার কথা বলে। ছোটনটা বড্ড অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়। তাই সে প্রসঙ্গটাতে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বলে ওঠে, "হয়তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।"

"তাই বলে বাচ্চা দুটোকে এক বারও দেখতে আসবে না?" পালটা জবাব ছোটনের।

"থালে হয়তো বাইরে কোথাও দেখা করে," নিস্পৃহ ভাবে বলল কালাচাঁদ।

"তাই-ই যদি হত, মেনকা জানত না? ও তো সব সময়েই থাকে বাচ্চা দুটোর সঙ্গে।"

"অত কথা জানি না, তুই যা না প্রিয়া ম্যাডামকে জিজ্ঞেস কর।"

"জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা বলবে ভেবেছিস? নিশ্চয়ই কোনও লাফড়া আছে।"

সাদাসিধে কালাচাঁদ বলে, "থালে হয়তো দত্তক নিয়েছে।"

কালাচাঁদের কথা শুনে খিকখিক করে হেসে ওঠে ছোটন। বলে, "তুই-ও যেমন বোকা, একসঙ্গে যমজ বাচ্চা দত্তক নেওয়া যায় বুঝি?"

পান চিবোতে-চিবোতে মিনু বলল, "তোরা থাম তো, হয়তো বাচ্চা দুটোর বাবা মরে গ্যাচে। মানুষের সমসারে কত দুঃখ আচে জানিস? কী বলিস মেনকা?"

এত ক্ষণ চুপ করে বসে থাকা মেনকা বলল, "না গো মাসি, আমার মনে হয় না, ওদের বাবা মরে গেছে।"

"তুই কী করে জানলি?" চটজলদি বলে ওঠে ছোটন।

"আহা, তালে একটা ফটো থাকত না ঘরে? মালা-চন্দন দেওয়া। সে সব তো কিছু নেই!"

পানের পিকটা গিলে ফেলে মুখ খুলল মিনু। জর্দার গন্ধে ভুরভুর করে উঠল কারপার্কিংটা। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে সে বলল, "নারে, এ কষ্টের কথা সবাই বোঝে না। আমার বরটা যখন লিভার পচে মরে গেল, তখন আমার মেয়ে দুটোও তো একেবারে কচি ছিল। তাদের কত পোশনো। বাপটা কোতায় গেল? ভাত খেতে ঘরে আসে না কেন?"

"তা তুমি কী বলতে?" জিজ্ঞেস করল মেনকা।

"ওই কিছু একটা বলে দিতাম বানিয়ে। কাজ নিয়ে অন্য শহরে গ্যাচে বা অন্য কিছু।"

"তবে আমাদের আহির আর ইমন তো এখনও ছোট, ওসব কথা জিজ্ঞেস করে না। আসলে জানেই না বাবা কী জিনিস।"

"তুই কী করে জানলি? হয়তো মাকে জিজ্ঞেস করে।"

"ধুস, মায়ের কাছে থাকে নাকি ওরা? চব্বিশ ঘণ্টাই তো আমার ল্যাংবোট হয়ে ঘুরছে।"

"আর রাতে? রাতে তো মায়ের কাচেই থাকে?"

"উঁহু। রাতে ওদের নিজেদের ঘরেই ঘুমোয়। কী সুন্দর করে ওদের ঘর সাজিয়ে দিয়েছেন দিদি। দু'জনের দুটো আলাদা খাট, দেওয়াল জুড়ে কত রূপকথার ছবি আর ঘরময় কত খেলনা। জানলায় নীল রঙের পর্দা, মেঝেতে নীল কার্পেট, নীল ছাপের বিছানার চাদর ..."

"কেন, সব নীল কেন? শনির দোষ আচে নাকি ওদের?" গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল মিনু।

হেসে গড়িয়ে পড়ে মেনকা বলে, "নাগো মাসি, দিদি বলেন, নীল নাকি ছেলেদের রং।"

"আর মেয়েদের?" তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে মিনু।

মেনকা চিন্তিত হয়ে বলে, "ঠিক জানি না, তবে গোলাপি হতে পারে।"

মেনকার জবাব শুনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মিনুর মুখখানা। বলে, "হতে পারে না রে, গোলাপিই। আমাদের পমপমকে দেখিস না? ওর বেশির ভাগ জামা-ই তো গোলাপি। গোলাপি রবার ব্যান্ড, গোলাপি কিলিপ, মায় ওর বিছানার উপরেও একটা মস্ত বড় গোলাপি রঙের ভল্লুক,"

একটা আবিষ্কারের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে মিনু।

"তোমাদের ওসব মেয়েলি কথা বাদ দাও তো।" বিরক্ত মুখে বলে ওঠে ছোটন।

মিনু রেগে গিয়ে বলে, "তবে কি তোর মতো ডেরাইভারির কতা বলব? গাড়ির চাকা পামচারের কতা?"

"ওকথা বোলো না মাসি। এখন ছেলেতে-মেয়েতে নাকি সমান সমান। খবরের কাগজে দ্যাখো না আজকাল ওলা, উবের এমনকি বাসও চালাচ্ছে মেয়েরা," দার্ঢ্যে ঋজু হয়ে বলল মেনকা।

"তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচি, আরও কত কিচু যে দেকার বাকি আচে কে জানে!"

একটা ফিচেল হাসি হেসে ছোটন বলল, "আরও অনেক কিছু তোমার জানতে বাকি মাসি।"

"কী বেপারে বলো তো?" আর-একটা জর্দাপান মুখে ঠুঁসে বলে মিনু।

"ওই বাচ্চার বাপের ব্যাপারে। আজকাল কত মেয়ে বিয়ে না করে বাচ্চা নিচ্ছে," একচোখ টিপে বলল ছোটন।

"কী বলিস? সে তো বেবুশ্যেরা করে," বিরক্ত মিনু।

"নাগো মাসি, বাজার থেকে বীজ কেনে ওরা।"

"কেন, ধান চাষ করবে নাকি?"

"ওইরকমই কিছুটা। মানুষের বাচ্চার চাষ। আজকালকার মেয়েগুলো বিয়ে করতে চায় না। বলে, ওসব অনেক ঝামেলা। বরের মন জুগিয়ে চলো, শ্বশুড়-শাশুড়ি-ননদের মন জুগিয়ে চলো। তার চাইতে এই ভাল। বাজার থেকে বীজ কিনে নাও। বিয়ে না করলেও মা হতে তো অসুবিধে নেই," জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দেয় ছোটন।

মিনু পুচুৎ করে একটা পিক ফেলে বলে, "ছিঃ! বিনা বিয়ের মা হতে লজ্জা করেনা? লোকে কী বলবে?"

"কেন, প্রিয়া ম্যাডামকে কেউ কিছু বলে?" দাঁত কেলিয়ে বলল ছোটন।

মিনু মুখটা বিকৃত করে বলে, "তা'লে তো এই বাচ্চাদুটো জারজ।"

মেনকা ফুঁসে ওঠে। বলে, "তোমরা আমার আহির আর ইমনের ব্যাপারে আর একটাও কথা বলবে না বলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু দিদিকে সব বলে দেব।"

মিনুর পাশে বসে থাকা কালাচাঁদ তাকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, "অত মাথা গরম করছিস কেন? এগুলো তো সব কথার পিঠে কথা।"

ছোটন হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, "লে হালুয়া, পেরেম করার চান্স পেয়ে গেছে কালা ..."

লিফ্‌টের কোলাপসিব্‌ল গেট দুটোর

ঘটাং ঘট আওয়াজটা সচকিত করে তোলে ছোটনকে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে হাতে একটা মস্ত ব্যাগ নিয়ে লিফ্‌ট থেকে নেমে আসছে ছ'তলার পুনিত লোহিয়া। পরনে ধোপদুরস্ত শার্ট-প্যান্ট, পরিপাটি করে আঁচড়ানো ভেজা চুল, মুখ ভর্তি পানমশলা। তাকে দেখেই স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল কালাচাঁদ। হাতজোড় করে বলল, "নমস্তে পুনিত ভাইয়া।"

পুনিত পানমশলার পিকটা লিফ্‌টের গেটের পাশে ফেলে বলল, "নমস্তে কালাচান্দ, আজ রামু নেহি আয়া?"

কালাচাঁদ তটস্থ হয়ে বলে উঠল, "হাঁ, আয়া হ্যায় তো, ওই গলি দুটো ঝাঁট দেতা হ্যায়।"

"বুলাও উসকো, বাত করনি হ্যায়।"

কালাচাঁদ হন্তদন্ত হয়ে গলির দিকে যেতে-যেতে গলা চড়াল, "রামু, এই রামু, এদিকে আয়। পুনিত ভাইয়া ডাকছে।"

একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর লালরঙের স্যান্ডো গেঞ্জি পরে গলির মুখের দরজাটায় এসে দাঁড়াল রামু। গেঞ্জিটার তলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তার ধামার মতো ভুঁড়িটা। লাল টকটকে চোখ দুটোর তলাটা ফুলো-ফুলো। কাঠের খিল লাগানো নারকেল শলার ঝাঁটাটা ক্ষয়ে গেছে তেরছা ভাবে। সেটাকে বগলদাবা করে ঠান্ডা গলায় সে বলল, "হাঁ, বোলিয়ে।"

মোটর বাইকটার পিছনে নিজের ব্যাগটা রাখতে-রাখতে পুনিত বলল, "আজকাল ছাতপে ঝাড়ু-আড়ু লাগাতে হো কেয়া?"

"লাগাতে হ্যায় না," পুনিতের চোখে চোখ রেখে বলল রামু।

"যা-কে দেখো, কাচরে কে ডিব্বা বানাকে রাখখা। আম কে গুঠলি, মছলি কে ছিলকা, মুরগি কে হাড্ডি কেয়া নেহি হ্যায়!"

"যো ফেঁকতে হ্যায় উনকো বোলিয়ে না।" ধমকে ওঠে রামু।

সরকারদের সঙ্গে এই ময়লা ফেলার ব্যাপারটা নিয়ে রোজই ঝগড়া হয় লোহিয়াদের। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে এত রান্নার সরঞ্জাম ছড়িয়ে থাকে বলে ময়লাগুলো ছাদেই ফেলতে হয় তাদের। প্লাস্টিকের ব্যাগে গিঁট মেরে ফেলেও তারা। কিন্তু এ পাড়ার কাকেদেরও তো খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকতে হবে। এমন তৈরি উচ্ছিষ্ট হাতের কাছে পেলে ছেড়ে দেওয়া যায়? তাই একটু ফেলেছড়িয়ে উচ্ছিষ্ট ভোজন করে তারা।

তবে সেসব কথায় না গিয়ে আদেশের সুরে পুনিত বলে, "জাদা মত বোলো। অচ্ছিতরাসে সাফ করো উপর যা কে, শাম কো ওয়াপস আকে দেখেঙ্গে হাম," বলেই মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায় পুনিত।

আর বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খইনিটা ডলতে ডলতে রামু বলল, "সালা হারামি কা বাচ্চা!"

## ৪

সাড়ে বারোটা নাগাদ আহির ও ইমনকে নিয়ে উপরে চলে গেল মেনকা। তাদের স্নান করাতে হবে, লাঞ্চ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। আহিরের খাবার খেতে কোনও ঝামেলা নেই। আলুসেদ্ধ আর মাখন দিয়ে ফেনাভাত খেতে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে মিষ্টি দই আর ভাত। ব্রেকফাস্টেও একটা গোটা কলা, ডিমসেদ্ধ আর ওট্‌স বা সুজির পরিজ খায়। যত ঝামেলা ইমনকে নিয়ে। কিছুতেই খেতে চায় না সে। ভাতের থালা নিয়ে তার পিছন-পিছন ছুটোছুটি করতে হয়।

চাবি ঘুরিয়ে দরজার গা তালাটা খুলতেই ভিতরে ঢুকে গেল আহির। তাদের বাথরুমের সামনে গিয়ে ইলাস্টিক লাগানো প্যান্টটা টেনে-টেনে খুলে ফেলল। তবে গোলগলা টি শার্টটা খুলতে গিয়ে নাজেহাল সে। কোনও রকমে চোখ-কান পর্যন্ত উঠেই আটকে গেল সেটা। ও দিকে ইমনকে নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে মেনকার। বারবার সিঁড়ি বেয়ে চার তলায় উঠে যাচ্ছে সে আর মেনকা তাকে জাপটে ধরে তিন তলায় নামিয়ে আনছে। শেষমেশ তাকে ঘরে ঢুকিয়েই দরজাটা ঠেলে দেয় মেনকা। অটোমেটিক লক লাগানো দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই জব্দ ইমন। তার হাত ধরে হিড়হিড় করে বাথরুমের সামনে টেনে আনে মেনকা।

এদিকে আহির লাফাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, "ও মাসি, আমার জামাটা খুলে দাও। আমি কিচ্ছু দেকতে পাচ্চি না তো!"

দু'জনকে স্নান করিয়ে, ধোওয়া কাপড়-জামা পরিয়ে, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে খাবার টেবিলে নিয়ে এল মেনকা। আজ ওদের জন্য ঝাল ছাড়া চিকেনের কিমা কারি বানিয়েছে সে, আলু দিয়ে। ভাত-আলু-কিমা চটকে মেখে একটা বাটিতে দিয়ে চামচটা আহিরের হাতে দিয়ে দিল মেনকা। তার গলায় এপ্রন বেঁধে দিয়ে বলল, "তুমি তো সোনা ছেলে আমার, গপগপ করে খেয়ে নাও দিকিনি।"

তার পর ইমনের বাটি আর চামচ নিয়ে তার পিছন-পিছন, "কে খায় কে খায়" করে হয়রান মেনকা। কখনও সে মস্ত খেলনাগাড়ির ভিতরে বসে "ভ্রুম ভ্রুম" করে এ ঘর ও ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে, কখনও বা জানলার গ্রিল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। খুদে-খুদে দাঁতগুলো বের করে হিহি করে হাসছে আর বলছে, "মাসি আমাকে ধত্তে পারে না।"

ওদিকে মিনিট পনেরোর মধ্যেই নিজের বাটিটা চেটেপুটে সাফ করে ফেলেছে আহির। চামচ দিয়ে বাটির গা-টা চাঁছতে-চাঁছতে সে বলল, "চাঁচি পুঁচি সঙ্গোবাসী ..."

মেনকা পা টিপে-টিপে এসে আহিরের গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, "যে খায় তারে ভালবাসি।"

হাত-মুখ ধুয়ে নিজের বিছানায় চলে যায় আহির। ভারী নিয়মানুবর্তী সে। তুলোভরা মস্ত ব্যাঙটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরে দেয়। মেনকা এসে উঁকি দিয়ে দেখে যায় একবার। সে জানে ওই বুড়ো আঙুল চুষতে-চুষতেই ঘুমিয়ে পড়বে আহির। তার ঘুম ভাঙবে সেই সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে নাগাদ।

কিন্তু ইমনকে নিয়ে অস্থির মেনকা। ছড়া কেটে, নেচে-কুঁদে নাজেহাল সে। মাংস-ভাতের একটি গ্রাসও খাওয়াতে পারে না তাকে। অগত্যা দুধ গরম করে তার ভিতরে প্রোটিন পাউডার গুলে বোতলে ভরে দেয়। দুধের বোতলে অবশ্য কোনও আপত্তি নেই ইমনের। বোতলটা হাতে নিয়েই বিছানায় গিয়ে চিতপটাং হয় সে। চোঁ চোঁ করে দুধটা শেষ করে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর পাশ ফিরে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে থাকে।

ওদের ঘরের মেঝের উপরেই শুয়ে পড়ে বিধ্বস্ত মেনকা। ভাবে, এই কাজটা ছেড়ে দেব। এত পরিশ্রম আর পোষাচ্ছে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, 'সব বাড়িতে তো আর যমজ বাচ্চা নেই যে দু'গুণ মাইনে পাব। তার উপরে প্রিয়াদিদিও অনেক সাহায্য করেন। সকলের উপরে আছে একটা মায়া। সেই ওদের জন্ম থেকে নাড়াচাড়া করছি বাচ্চাদুটোকে। ওদের ছেড়ে কি থাকতে পারব আমি?'

মেনকা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ছতলার সরকারদের ফ্ল্যাটে গেল কালাচাঁদ। সরকারগিন্নি একগাল হেসে বললেন, "কালাচাঁদ, আজ আরও দুটো নতুন অর্ডার এসেছে। বেশি দূরে নয়, এই সেক্টর ফাইভ থেকেই। তোমার একটু কষ্ট হবে জানি, কিন্তু কী করব বলো?"

কালাচাঁদ ভাবে, 'দেব নাকি তোড়ে সব আবর্জনা সাফ করে? টিফিন কেরিয়ারের পর টিফিন কেরিয়ার বাড়িয়ে যাচ্ছেন, এ বার একটু পয়সা-টয়সা ছাড়ুন। নয়তো মাছ-মাংস দিন। ওই ডাল-ভাত আর পোষাচ্ছে না। এই একটা ধ্যাদধেড়ে সাইকেল নিয়ে এমাথা-ওমাথা চষে বেড়াতে বেড়াতে শরীরটা কাহিল হয়ে গেল আমার। একটু মাছ-মাংস না খেলে গায়ে বল থাকে?'

কিন্তু বশংবদতায় আবদ্ধ কালাচাঁদের জিভের ডগায় সুড়সুড়ি দিলেও কথাগুলো নিঃসৃত হয় না। তবে ঝালটা ঝাড়ে সে অন্য ভাবে। রাগত ভাবে বলে, "আর বলবেন না বৌদি, সকাল থেকে ঝাড় খেয়ে-খেয়ে মন-মেজাজ বিগড়ে আছে।"

খপ করে বলটা ধরে ফেলেন সরকার গিন্নি। মাটিতে পড়তে দেন না। টিফিন কেরিয়ারগুলো বন্ধ করতে-করতে বলেন, "কে আবার কী বলল গো তোমায়? সারা দিনই তো ফাই-ফরমাশ খাটছ সকলের।"

"ওই আপনাদের পাশের ঘরের পুনিতভাইয়া নীচে গিয়ে খুব দাবড়াচ্ছিলেন রামুকে আর আমাকে।"

"কেন, কেন, কেন? আবার কী হল?"

"বলছিলেন, ছাদটা একেবারে ভাগাড় হয়ে আছে। এখানে মাছের আঁশ, ওখানে মুরগির হাড়।"

"বেশ করেছি, একশো বার ফেলব, ছাদটা কি ওদের একার? এ দিকে আমাদের সিঁড়ির দেওয়ালটা যে পানমশলার পিকে-পিকে

ছয়লাপ হয়ে আছে, তার বেলা?"

টিফিন কেরিয়ারগুলো লিফ্‌টে তুলতে তুলতে মনে-মনে হাততালি দেয় কালাচাঁদ। মুখে বলে, "আসছি বৌদি।"

কালাচাঁদের সাইকেলের কেরিয়ারটার উপরে একটা বড়সড় লোহার খাঁচা ওয়েল্ডিং করে বসানো। গোটা দশ-বারো টিফিন কেরিয়ার দিব্যি এঁটে যায় তার ভিতরে। আর ডালাটা এঁটে দিলে একেবারে খাপে খাপ। টিফিন কেরিয়ারগুলো নড়াচড়া করে না বলে ডাল-ঝোলও চলকায় না। যত সমস্যা তার সাইকেলটা নিয়ে। কত আর এর-ওর সাইকেল নিয়ে টানাটানি করবে?

ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল কালাচাঁদ। ফোঁৎ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিনু। বলল, "বেচারা!"

ভুরু দুটো কুঁচকে ছোটন জিজ্ঞেস করল, "কেন, বেচারা কেন?"

"এ বিল্ডিংয়ের প্রতিটি ঘরে যেন দাসখত লিখে দিয়েচে গা," মাড়ি আর দাঁতের মাঝখানে ডান হাতের কড়ে আঙুলটা চালিয়ে বলল মিনু। তার পর চিবোনো পানের জমে থাকা অবশেষটুকু আর-একবার চিবোতে-চিবোতে তাকিয়ে রইল কালাচাঁদের গমনপথের দিকে।

"ও শালা বহুত চালু মাল," খিক খিক করে হেসে উঠে বলল ছোটন।

জিভে আর টাকরায় চুক চুক আওয়াজ তুলে মিনু বলল, "আহা, অমন কতা বলিস না। বড় সাদাসিধে মানুষটা।"

"কে বললে তোমায়? শেয়ালের মতো ধুত্ত ও ব্যাটা। সকলের খিদমতগিরি করে কি আর অমনি-অমনি?"

"থালে?" চোখদুটো কপালে ওঠে মিনুর।

"দেখছ না সরকারদের বাড়ি থেকে দু'বেলা খাবার পায়, পাঁচ তলার মাসিমার ছেলে মাসে পাঁচশো টাকা দেন, ওদিকে মুখার্জিসাহেব ওর ফোনের বিল ভরে দেন, পাঁচ তলার ডাক্তারবাবুরা ওর ওষুধপত্র দেন, প্রিয়া ম্যাডামের বাজার-হাট করে দেয় বলে তিনিও পয়সা দেন, পুনম ম্যাডামও নিশ্চয়ই কিছু দেন। ব্যাটার তো মাইনেতে হাতই পড়ে না।"

"সেসব কি আর ওমনি ওমনি দিচ্ছেন তেনারা? ও গতর খাটিয়ে রোজগার করচে," মুখ ঝামটে বলে উঠল মিনু। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, "আমি যাই, চান-খাওয়া করি। পমপমের জন্য চাউমিনও বানাতে হবে সে আসার আগে। তুই ভাত খেতে বাড়ি যাবি না?"

আড়মোড়া ভেঙে ছোটন বলল, "কালা ফিরে আসুক, তার পরে যাব। নইলেই তো আবার এ বিল্ডিংয়ের সাহেব-মেমসাহেবদের হম্বিতম্বি শুরু হবে। শুদুশুদু গাল খেয়ে মরবে খচ্চরটা।"

মিনু লিফ্‌টের দিকে যেতে-যেতে বাঁকা হেসে বলল, "এই তো গালমন্দ করছিলি ওকে, এখন আবার দরদ উথলে উঠল দেখি!"

"কী যে বলো না মাসি!" কান এঁটো করা একটা হাসি হেসে বলল ছোটন।

সদর গেটটা খুলে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এগিয়ে আসছে ফেলনা। হাঁফাতে -হাঁফাতে সে বলল, "আমি এসে গিইছি তো, তুমি কোথায় যাবা যাও ছোটনদা।"

ফেলনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় ছোটন। সাইকেলটার দিকে এগিয়ে গিয়েও ফিরে আসে আবার। ফেলনার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, "একটা বিড়ি ঝাড় তো ল্যাংড়া।"

বারমুডার পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বের করে এগিয়ে দেয় ফেলনা। নিজেও একটা বিড়ি ধরিয়ে মৌজ করে ধোঁয়া ছাড়ে। বিড়িটা ফুঁকতে-ফুঁকতে ছোটন বলল, "আজ কত টাকা রজগার করলি রে ল্যাংড়া?"

ফেলনা লাজুক মুখে বলে, "সে কী আর বলার মতো? তোমরা কত-কত টাকা কামাও, তোমাদের কাছে বলতি লজ্জা করে।"

"তবুও বল না, সারা দিনে শ'খানেক তো হয়?"

"তা হয়। তবে খরচা আছে না? এই তো ডিম, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর লেবু নিয়ি এলাম। সন্ধেবেলায় জলখাবারের পিছনেও যায় কিছু।"

"আর রাতের খরচা? গাঁজার পিছনেও তো কম খরচা হয় না তোর!"

"চুপ করো ছোটনদা। সাহেবরা শুনলে আমারে আর থাকতি দেবেন না এখানে।"

"জয় বাবা ভোলানাথ," বলে মিচকে হেসে সাইকেলে গিয়ে বসে ছোটন, "বউটা না খেয়ে বসে থাকবে।"

লাঞ্চগুলো ডেলিভারি করে ফিরে এসেছে কালাচাঁদ। সাইকেলটা রাখতে না-রাখতেই পমপমের স্কুলবাসটা এসে যায়। কালাচাঁদ দৌড়ে গিয়ে তার হাত থেকে ব্যাকপ্যাক আর ওয়াটার বটলটা নিয়ে নেয়। লিফ্‌টের কোলাপসিব্‌ল গেটদুটো খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। পমপম লিফ্‌টে ওঠার পর সে-ও লিফ্‌টে উঠে সন্তর্পণে একটা কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার পর চার নম্বর বোতামটা টিপে দেয়। কেউ বলেনি তাকে এই কাজগুলো করতে। না ময়ূখ, না শর্মিষ্ঠা, না মিনু। তবুও করে সে। রোজ।

পমপমকে পাঁচ তলায় পৌঁছে দিয়েই ছ'তলায় উঠে যায় কালাচাঁদ। সরকারদের ফ্ল্যাটের বেলটা বাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটাও একটা অলিখিত নিয়ম। হয় সরকার গিন্নি নয়তো তাঁর পুত্রবধূ মৌটুসি দরজাটা একটু ফাঁক করে একটা তিন বাটির ছোট টিফিন-ক্যারিয়ার গলিয়ে দেন। সেটা হাতে নিয়ে নীচে নেমে আসে কালাচাঁদ। আড়াইটে বাজে, খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে তার।

এদিকে ফেলনা সুগৃহিণীর মতো দুটো থালা ধুয়ে, থালার কোনায় কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, লেবুর টুকরো, নুন আর একখানা করে ডিমসেদ্ধ সাজিয়ে বসে থাকে। সরকাররা কালাচাঁদকে শুধু ভাত-ডাল আর একটা তরকারি দেন। মাছ-মাংস দেন না। ফেলনা ভাবে, এত খাটাখাটি করে কালাদা, একটু মাছ-ডিম না খেলে শরীর ভেঙে যাবে না? তাই সে নিজের ভিক্ষের পয়সা থেকে রোজ দুটো ডিম, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর লেবু কিনে আনে। কেরোসিন স্টোভে ডিম দুটো সেদ্ধ করে খোলা ছাড়িয়ে রাখে। কালাচাঁদ নীচে নেমে আসতেই ফেলনা বলে, "যাও তো এ বার হাতমুখ ধুয়ে একটু সুস্থির হয়ে বোসো তুমি। আমি ভাত বাড়ছি।"

সকালে ভিক্ষে করতে বেরোবার আগেই কালাচাঁদের বিছানাটা ঝেড়ে তোশক-বালিশ গুটিয়ে যায় ফেলনা। তাই তক্তপোশটার উপরেই থালা দুটো রেখে ভাত-তরকারি সাজায় সে। কালাচাঁদ এসে বসতেই পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বলে, "এ বার দুটো মুখে দাও দিকিনি। সকাল থেকে খেটে খেটে হাড়-মাসে কালি পড়ে গেল যে!"

কালাচাঁদ হেসে বলে, "তুই আমার এত যত্ন করিস কেন রে ফেলু? তুই আমার কে?"

তোবড়ানো গালদুটোয় লালচে আভ ধরে ফেলনার। লাজুক মুখে বলে, "তুমিই তো আমার সব কালাদা। আমার আর আছেটো কে? আমিও অনাথ, তুমিও অনাথ।"

"কথাটা মন্দ বলিসনি," মৃদু হেসে বলে কালাচাঁদ।

"আর দুটো ভাত দিই তোমারে?" তৎপর হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলনা।

কালাচাঁদ দু'হাত নেড়ে বলে, "আমাকে সব দিয়ে দিলে তুই খাবি কী?"

"আমার পেটটা ভরে আছে গো কালাদা। ওই মোড়ের মিষ্টির দোকানটা থেকে দুটো কচুরি আর ছোলার ডাল খেতে দিইছিল আজ।"

কালাচাঁদ জানে যে, এটা ফেলনার বানানো গল্প, তাই সে নিজের থালায় জল ঢেলে দিয়ে বলে, "আমারও পেট ভরে গেছে। যা বাকি আছে খেয়ে নে তুই।"

খাওয়া শেষ হলে থালা-গ্লাস-টিফিন-ক্যারিয়ার মেজে কালাচাঁদের ঘরের সিমেন্টের তাকের উপরে উল্টো করে রেখে দেয় ফেলনা। ঘরটা ঝাঁট দিয়ে মুছে দেয়। বিছানাটা ঝেড়ে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে। তার পর বিছানায় বসে আয়েস করে একটা বিড়ি ধরায়।

কালাচাঁদ ফিরে গেছে তার ডিউটিতে। এই দুপুরবেলাটা বড় বিপজ্জনক। কোনও উটকো লোক ঢুকে পড়তে কতক্ষণ? তার উপরে খাঁ খাঁ করছে কার পার্কিংটা। সাহেব-মেমসাহেবরাও সব বিশ্রাম করছেন এখন। তাই কালাচাঁদকেই সজাগ থাকতে হয়। তাকে দেখে বুকটা ফেটে যায় ফেলনার। বেচারার কপালে একটুও আরাম নেই। কিন্তু সে-ই বা কী করতে পারে এ ব্যাপারে? তাকেও তো উপার্জন করতে হবে জীবনধারণের জন্য। তাই সাড়ে তিনটে নাগাদ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বাইপাসের মোড়ের সিগন্যালের দিকে এগিয়ে যায় ফেলনা।

## ৫

দুপুরের খাবার খেয়ে চারটে নাগাদ ফিরে এসেছে ছোটন। থাকে বড় রাস্তার ওপারের পাগলাডাঙা বস্তিতে। এটাই তার রুটিন। আসে

সকাল ন'টায়, দুপুরের খাবার খেতে যায় দুটো নাগাদ, ফেরে চারটেয়। মুখার্জিসাহেব বড় একটা বেরোন না বলে এই কার পার্কিংয়ে বসেই কালাচাঁদ ও অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। উত্তর কলকাতার প্রাচীন বাড়িগুলোর রোয়াকের মতোই রকবাজি চলে এখানে।

তবে মাসে দু'-চারবার ব্যাঙ্কে যান মুখার্জিসাহেব। কখনও-সখনও ডাক্তার দেখাতেও যান। কিন্তু সন্ধের পর কোথাও বেরোন না তিনি। কেননা আসরটা বসে তাঁরই বাড়িতে। তাসখেলা তো আছেই, সঙ্গে থাকে সুরাপান। ওই সময় বিচ্ছু নীচে নামতে পারে না। তবে সিগারেট বা দেশলাই ফুরিয়ে গেলে অন্য কথা।

তবুও ছোটনকে রাত ন'টা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়। যদি কোনও প্রয়োজন হয়, তাই। আগে ম্যাডাম বেঁচে থাকতে কেনাকাটা করতে যেতেন, আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতেও যেতেন। কিন্তু সাহেব কোথাও যান না, ভোরবেলায় হাঁটতে যাওয়া ছাড়া। সেখানেই কিছু বন্ধু জুটিয়েছেন, তাঁরাই এসে তাস খেলেন আর মদ গেলেন। বিচ্ছুই বলেছে এ সব গপ্পো, নইলে আর ছোটন কী করে জানবে ভিতরের কথা।

আর-একটা গোপন কথাও বলেছে বিচ্ছু। সাহেব নাকি খুব কামুক। বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর রাতের খাবার খেয়ে দরজা বন্ধ করে বুলু ফিলিম দেখেন তিনি। তবে এ সব কথা শোনার আগে দিব্যি গালতে হয়েছে তাকে। নইলে দু'জনেরই চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। তাই কালাচাঁদকেও বলেনি সে। তবে নিজের বউটাকে বলেছে একদিন। এই ধরনের কথা শুনলে বউটাও বেশ গা ঘেঁষে শোয়। একা বসে নানা কথা ভাবছে ছোটন। মেয়েটা বড় হচ্ছে। তাকে একটা ভাল ইশকুলে ভর্তি করতে হবে কেলাস নাইনে উঠলে। মেয়ের মা তো পয়সা জমাচ্ছে মেয়ের বিয়ের জন্য। বলে, 'কিছু সোনা তো দিতেই হবে। গলার হার, কানের দুল, হাতের চারগাছা ব্রোঞ্জের চুরি। আর জামাইয়ের জন্য আংটি। একটা সাইকেলও দিতে হবে হয়তো।' তবে নগদ যদি কিছু না চায় তবে একটা ইশকুটি দেওয়ার ইচ্ছে তার। মোটরবাইকের দামে পোষাবে না। তিন বাড়ি রান্না করে ন'হাজার টাকা রোজগার করে সে প্রতি মাসে। তার শখ-আহ্লাদ পূর্ণ করতেই পারে সে। কিন্তু ছোটনের শখ-টা একটু অন্য ধরনের। তার ইচ্ছে ইশকুল পেরিয়ে কলেজে পড়বে তার মেয়ে। কলেজ পাস দিয়ে কম্পুটার টেরেনিং নেবে। তার পর কোনও বড় অফিসে চাকরি করবে। বর নিজে খুঁজে নেওয়াই ভাল, মায়ের পছন্দের ছেলের সঙ্গে বনিবনা না-ও হতে পারে... হঠাৎ একটা সাইকেলের আওয়াজে চমক ভাঙে ছোটনের। কালাচাঁদ গেছে ছাদে। পাঁচ তলার দাশগুপ্তমাসিমার কাপড়-জামা, চাদর-তোয়ালে মেলা আছে সেখানে। মাসিমার আয়া বাসন্তীদি তাঁকে ছেড়ে এক মিনিটের জন্যও নড়তে পারে না। চুক্তিতে তাই-ই লেখা আছে। তাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা, বাজার-হাট করে দেওয়া, ছাদে ভিজে কাপড়-জামা মেলা, শুকিয়ে গেলে সেগুলো তুলে আনা সবই করতে হয় কালাচাঁদকে।

তাই কালাচাঁদের অনুপস্থিতিতে নিজের আধিপত্য দেখায় ছোটন, "কী চাই?"

তত ক্ষণে কালাচাঁদও নেমে এসেছে ছাদ থেকে। লোকটা বোধহয় নতুন। তাই হাতে সেন্টারের নাম লেখা স্লিপটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালাচাঁদ স্লিপটা নিয়ে ছোটনের হাতে দিয়ে বলল, "যা দিয়ে আয়।"

ছোটনের বুকের ভিতর রিনরিন নূপুর নিক্কণ। তবুও না বোঝার ভান করে বলল, "কাকে?"

কালাচাঁদও চার অক্ষর ঝাড়ে।

"ভাজা মাছটা এগিয়ে দিলাম, এ বার উল্টে-পাল্টে খা দিকিনি।"

কালাচাঁদের হাত থেকে স্লিপটা ছোঁ মেরে

> সাহেব নাকি খুব কামুক। বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর রাতের খাবার খেয়ে দরজা বন্ধ করে বুলু ফিলিম দেখেন তিনি। তবে এ সব কথা শোনার আগে দিব্যি গালতে হয়েছে তাকে।

নিয়ে লিফ্টের দিকে এগিয়ে যায় ছোটন। তিন তলায় ট্যান্ডনদের ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করে সে। মিনিট পাঁচেক বাদে দরজাটা খোলে পুনম। একটু লজ্জিত ভঙ্গিমায় বলে, "সরি, বাথরুম মে থি।"

ছোটন আকণ্ঠ-পিপাসা নিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। অন্তর্বাসের উপরে একটা পাতলা হাউসকোট পরে দাঁড়িয়ে আছেন তার পুনমম্যাডাম। সেন্টারের স্লিপটা দিতে ভুলে যায় সে। পুনম বলে, "কুছ বোলোগে?"

সংবিত ফেরে ছোটনের। বলে, "হাঁ, সেন্টারসে আপকো ডেরাইভার আয়া হ্যায়।"

ছোটনের হাত থেকে স্লিপটা নিয়ে পুনম বলল, "ঠিক হ্যায়, আ রহি হুঁ থোড়ি দের মে।"

নীচে নেমে এসে খেপে যায় ছোটন। মুখার্জিসাহেবের উপরে খুব রাগ হয় তার। সেন্টারের ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে গজগজ করে, "পুনমম্যাডামের কী দরকার সেন্টার থেকে ডেরাইভার আনার?"

কালাচাঁদ ফিকফিক করে হেসে বলে, "থালে পুনমম্যাডামের গাড়িটা চালাবে কে? ট্যান্ডনসাহেব কি প্লেন চালিয়ে এসে আমাদের বিল্ডিংয়ের ছাদে নামবেন?"

ছোটন মুখটা বিকৃত করে বলে, "কেন, আমি রয়েছি কী করতে? সারা দিন তো বসেই থাকি এখানে।"

কালাচাঁদ চোখ দুটো কপালে তুলে বলে, "তুই পুনমম্যাডামের গাড়ি চালালে মুখার্জিসাহেব তোকে আস্ত রাখবেন ভাবছিস?"

"যা বলেছিস কালা। ওই খিটখিটে বুড়োটাকে সহ্য করতে পারি না আমি। তার চাইতে পুনমম্যাডামের সেন্টের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে আর আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে-দেখতে গাড়ি চালাবার মজাই আলাদা। সব মজা লুটে নেয় ওই সেন্টারের ডেরাইভারগুলো।"

ফোঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ বলে, "যার যেমন কপাল!"

"খিল্লি মারিস না তো!" তেড়ে ওঠে ছোটন।

মেনকা নেমে এসেছে আহির আর ইমনকে নিয়ে। সাড়ে চারটে বাজে। পৌনে ছ'টা পর্যন্ত এখানেই আড্ডা দেবে সে। আহির আর ইমন ছুটোছুটি করবে, বল দিয়ে খেলবে। ছোটন আর কালাচাঁদও যোগ দেবে সে খেলায়। আর-এক খেলাও খেলবে কালাচাঁদ মেনকার সঙ্গে। একটু ভালবাসার কথা, একটু খুনসুটি আর বেশ কিছু ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। তার পর প্রিয়ংবদার বাড়ি ফেরার মিনিট পনেরো আগে ফিরে যাবে মেনকা।

তবে আজ পরিবেশটা একটু গরম হয়ে আছে। ছোটনের মুখখানাও বেজার। সে দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল মেনকা। বলল, "কার উপরে রাগ করছ গো ছোটনদা? তোমাকে একটুও মানায় না এ সব। তোমার মুখের খিস্তিগুলো না শুনলে যে পেটের ভাত হজম হয় না আমার।"

মেনকার বলা কথাগুলো আবার হাসি ফেরায় ছোটনের মুখে। কিন্তু কালাচাঁদের পছন্দ হয় না মেনকার হাবভাব। পরপুরুষের সঙ্গে এ সব ছেনালি একটুও পছন্দ নয় তার। তবে বিয়েটা এখনও হয়নি বলে জোরও ফলাতে পারে না। খুশি-খুশি মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল ছোটন। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝিমধরানো গন্ধে বিবশ হয় সে। পুনম ট্যান্ডন নেমে এসেছে নীচে। পরনে হালকা গোলাপি রঙের শিফন শাড়ি, হল্টারনেক ব্লাউজ। মোমপালিশ করা পিঠটা খোলা, বুকটাও উপচে পড়ছে ঐশ্বর্যে। দু'চোখ ভরে দ্যাখে ছোটন বাকরুদ্ধ হয়ে। পুনম ট্যান্ডনের গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই একটা অ্যাপ-ক্যাব এসে থামল ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্ট্স-এর সামনে। টাইট ব্লু জিন্স আর কালো টি শার্ট পরা ছিপছিপে মেয়েটা কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে নেমে পড়ল গেটের

সামনে। ভাড়া মিটিয়ে গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই ফিসফিসিয়ে ওঠে ছোটন, "ওই এলেন তিনি।"

মেনকা তাকে না দেখার ভান করে আহির আর ইমনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কালাচাঁদ এ বিল্ডিংয়ের আবাসিক ও তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে দায়বদ্ধ। তাই সে এগিয়ে যায়। ব্যাকপ্যাকটা তার হাত থেকে নিয়ে বলে, "শুচিদি, অয়নদা বলে গেছেন আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে।"

মেয়েটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি জানি, চাবিটা রেখে গেছে তো?"

কালাচাঁদ তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবিটা এনে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল, "কিছু দরকার হলে বলবেন।"

লিফটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল শুচি। বলল, "হ্যাঁ, ওই হোম ডেলিভারির ভদ্রমহিলাকে বলে দিয়ো আজ রাতের খাবারটা পাঠাতে হবে না অয়নের জন্য। আমি পিৎজ়া অর্ডার করে দিচ্ছি।"

ঘাড়টা কাত করল ঠিকই কালাচাঁদ। কিন্তু সে জানে এখন এই কথাটা সরকারবৌদিকে বলতে গেলে ঝাড়টা খাবে সে নিজেই। তাই চুপচাপ থাকাই ভাল। বোঝাপড়াটা করুক অয়নদা আর সরকারবৌদি। পরে যদি কথাটা ওঠে, সে নয়তো বলে দেবে নানা কাজের তালে ভুলে গিয়েছিলাম। এত লোকের নানান বাহানা সামলানো কি চাট্টিখানি কথা! তা ছাড়া অয়নদার খাবারটা তো আর ফেলা যাবে না, পর দিন দুপুরে অন্য কারও টিফিন কৌটোয় ঠিক ভরে দেবেন সরকারবৌদি।

শুচি চলে যাওয়ার পর ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে ছোটন। কালাচাঁদ বিরক্তিমাখা গলায় বলে, "বোকার মতো হাসছিস কেন?"

"হাসব না তো কী? একটা খানকির নাম যদি শুচি হয় তো হাসি পাবে না? শুচি মানে জানিস?"

"না জানার কী আছে? শুচি মানে শুদ্ধ।"

"ও কি শুচি, না অশুচি? দিনের পর-দিন ছেলে বন্ধুর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাচ্ছে। শুক্কুরবার হল কি না হল তিনি এসে হাজির। তার পর তিন রাত্তির ধরে যা খুশি তাই করে সোমবার সকালে ফিরে যান। ওই ফ্যালাটে আরও তো তিনটে ছেলে রয়েছে, তাদের সামনে ওইসব করতে লজ্জা করে না?"

"যে যা করে করুক। তোর কী এসে যায়?" বিজ্ঞের মতো বলল কালাচাঁদ।

"মেয়েটার বাপ-মায়েরও বলিহারি যাই মাইরি! মেয়েটাকে কী শিক্ষা দিয়েছে! আমার মেয়েটা এ সব করলে ধড়-মুন্ডু আলাদা করে দেব একেবারে।"

ছোটনকে শান্ত করার জন্য মেনকা বলল, "তোমার মেয়ে এ সব করবে নাগো ছোটন দা। এই মেনকা বলছে, লিখে রাখো।"

"তুই কী করে জানলি?" জিজ্ঞেস করল ছোটন।

"ওসব বড় ঘরের মেয়েরা করে গো ছোটনদা। আজকাল এই এক ফ্যাশান হয়েছে। ব্যাটাছেলে আর মেয়েদের একসঙ্গে থাকা। বাপ-মায়েরাও কিছু বলে না। আর মেয়েগুলো বোধহয় ওষুধ খায়, নইলে বাচ্চা এসে যাবে না পেটে?"

কালাচাঁদ এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল মেনকার বলা কথাগুলো। এ বারে তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, "চলনা থালে আমরাও একসঙ্গে থাকি। ঘর তো আছেই আমার।"

মুহূর্তে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে মেনকা। বলে, "তালে তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব।"

কালাচাঁদ নিভে গিয়ে বলে, "বিয়ের আগেই বরের মৃত্যু কামনা করছিস? আমি ম'লে যে তুই বেধবা হয়ে যাবি সেকথা ভেবেছিস?"

মেনকা কালাচাঁদের ঠোঁটের উপরে নিজের ডান হাতটা চেপে বলে, "অমন কথা বোলো না তো! আমি কি তাই বলেছি নাকি?"

"তবে কী বলেছিস তুই, স্পষ্ট করে বল," রাগত ভাবে বলে কালাচাঁদ।

"আরে বাবা বলছিলাম যে আমাদের মতো ঘরের মেয়েরা একটু-আধটু পেরেম করে ঠিকই কিন্তু শরীর বেচে দেয় না। আমাদের মান-সম্মান আছে, ইজ্জত আছে।"

কথাগুলো বলেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে থাকে মেনকা আর ওড়না দিয়ে নাক-চোখ মুছতে থাকে। তাকে দেখে বিব্রত বোধ করে কালাচাঁদ। তুতলিয়ে বলে, "আহা, কাঁদছিস কেন? তোর চোখে জল দেখলে আমার কষ্ট হয়, সে কথা বুঝিস না? তোদের মতো কাঁদতে পারি না আমরা ..."

চোখের জল মুছে, ঘাড় বেঁকিয়ে কালাচাঁদের দিকে তাকায় মেনকা। গলায় ঝাঁঝ ঢেলে বলে, "এই আমরা-তোরাটা কী জিনিস?"

সহজ-সরল কালাচাঁদের সোজাসাপটা জবাব, "তোরা মেয়েরা আর আমরা ছেলেরা। আবার কী?"

"আর কখনও বোলো না এ কথা," কর্কশ গলায় বলল মেনকা।

"কেন, বললে কী হবে? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ হবে। মহাভারত, লক্ষ্মীর পাঁচালী সব নতুন করে লেখা হচ্ছে জানো না?"

"কে বলল তোকে?"

"কেন, দিদি। দিদি বলে, কখনও মাথা নিচু করে থাকবি না। কম রোজগার তো করিস না তুই, কেন মাথা নিচু করে থাকবি? এখন সে সব দিন আর নেই বুঝলি তো?"

কালাচাঁদ থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। সত্যিই তো, তার চাইতে বেশি-ই রোজগার করে মেনকা। তার বলা কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। এমন একটা রোজগেরে বউ পেলে তাকে আর দেখে কে! দু'জনে মিলে সুন্দর ভাবে কাটিয়ে দেবে জীবনটা। ছোটন একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছে আর ভাবছে, ভাগ্যিস ওর বউটা এই বিল্ডিংয়ে কাজ করে না। নইলে মেনকার মতো মেয়ের সঙ্গে বন্ধু পাতালে ওর কপাল পুড়ত। ওর বউটা কচুর লতির মতো বেশ নরম স্বভাবের। পতিব্রতাও। সেই ভোর চারটেয় উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করে, রান্নাবান্না করে কাজের বাড়ি যায়। ফিরেও আসে বেলা একটার মধ্যে। নিজে হাতে ভাত বেড়ে ছোটনকে খেতে দেয়। আবার বিকেল চারটে নাগাদ মেয়েকে টুইশনে দিয়ে কাজের বাড়ি যায়। ফেরে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। রোজগারও করে পেরায় সমান-সমান, কিন্তু দেমাক নেই। শুধু একটাই দোষ বউটার। ছোটনকে আজকাল কাছে ঘেঁষতে দেয় না। বলে, "মেয়ে বড় হচ্ছে, যদি দেখে ফেলে?" যদিও মেয়েকে খাটে শুইয়ে ওরা মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। মশারিও টাঙায়। দেখবে কোথা থেকে? তবুও সিঁটিয়ে থাকে বউটা।

ও দিকে বেঞ্চের উপরে বসে প্রেম করছে কালাচাঁদ আর মেনকা। হাত ধরাধরি করে বসে আছে তারা। কালাচাঁদ বলছে, "ঘাট হয়েছে আমার, আর কখনও বলব না একসঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু বিয়েটা কবে করবি বল?"

মেনকা বলছে, "দেখি, আরও কিছু পয়সা জমাই আগে। একটা ঘর তো তুলবে, না কি?"

"ঘর তো আছেই আমার," হেসে বলল কালাচাঁদ।

মেনকা খেপে গিয়ে বলল, "বিয়ের পর ওই ঘরে থাকব নাকি? আমার নিজের একটু মাটি চাই। একটা ঘর আর একটা বাথরুম। রান্নাটা দাওয়ায় বসেও করে নিতে পারব। তবে দু'-চারটে গাছ লাগাবার মতো জায়গা থাকতে হবে।"

কালাচাঁদ মুখ নামিয়ে বলে, "এক্ষুনি তো হবে না সেসব। ধীরে-ধীরে হবে। আগে বিয়েটা হোক।"

আহির আর ইমন বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে। ছোটন তার মোবাইল ফোনটা ঘেঁটে নানা ভিডিয়ো দেখছে। কালাচাঁদ আর মেনকার কথাগুলো শুনতে পেলেও কিছু বলছে না। কাবাব মে হাড্ডি হতে ভাল লাগে না তার। কিন্তু কালাচাঁদকে দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে। এমন একটা মিনমিনে স্বভাবের পুরুষ মানুষ আগে দেখেনি সে। ছোটন নিজে যদি থাকত ওর জায়গায় তবে মেনকাকে টেনে-হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার উপরে চড়াও হত। মাথাটা দপদপ করছে ছোটনের। বিকেলের চা-টা খাওয়া হয়নি বলে গা-টাও ম্যাজম্যাজ করছে। মস্ত একটা হাই তুলে সে বলল, "কীরে কালা, চা-টা খাওয়াবি না নাকি আজ?"

কালাচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "তুই যা না নিয়ে আয়। আমার সঙ্গে কি চুক্তি হয়েছে তোদের যে রোজ আমি-ই চা আনব? আমি এখন ছাদে যাচ্ছি মুখার্জিসাহেবের গাছগুলোতে জল দিতে।"

## ৬

ম্যাগি আর ওমলেট খেয়ে হোমওয়র্ক করতে বসেছে পমপম। তার চেয়ারের পাশে লক্ষ্মী মেয়ের মতো বসে আছে স্নোয়ি। সে জানে পমপমকে এখন বিরক্ত করা চলবে না। মাঝে-মাঝে খালি তার চামরের মতো ল্যাজটা

নাড়িয়ে ফেলছে। কেননা মনে একটা অস্থিরতা তো আছেই তার। সাড়ে পাঁচটা বাজে, বিচ্ছু হয়তো বল নিয়ে অপেক্ষা করছে ছাদে। ঘড়ি দেখতে জানে না সে ঠিকই, কিন্তু পড়ন্ত রোদ দেখেও তো আন্দাজ করা যায় কতটা বেলা হল। সে কি আর বাচ্চা মেয়ে, আট বছর বয়স হতে চলল। অভিজ্ঞতার একটা দাম নেই?

পমপমের মনটা উসখুস করছে ছাদে যাওয়ার জন্য। এই বদ্ধ ঘরে এক মিনুমাসির সান্নিধ্যে থাকতে কি ভাল লাগে? ছাদে গেলে লেকটা দেখা যায়। দূরে বাইপাস দিয়ে গাড়ির আসা-যাওয়া দেখা যায়। আর দেখা যায় ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখির আনাগোনা। বর্ষাটা আসার ফলে গাছগুলো বেশ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। মায় লেকের কচুরিপানাগুলোও।

"ও মাই গড!" চেঁচিয়ে ওঠে পমপম। বাংলার হোমওয়র্কটা তো করাই হয়নি এখনও। এই বর্ষা আর গাছের কথায় মনে পড়ে গেল। বনমহোৎসবের উপরে বাংলায় একটা রচনা লিখতে দিয়েছেন তো মিস! ইস, রাত ন'টার আগে তো মা-ও বাড়িতে ফিরবে না। তবে কি একবার মুখার্জিদাদুর কাছে ঢুঁ মেরে আসবে? গাছ সম্বন্ধে অনেক জানেন উনি। এখনও তো ওঁদের তাস খেলার সময় হয়নি, ছ'টা নাগাদ আসেন ওঁর বন্ধুরা। পরক্ষণেই মনে হল, উঁহু, মা বলে, একা-একা ছেলেদের কাছে না যেতে। আর মুখার্জিদাদুও তো ছেলে-ই।

তবে কি ঋতজাকে একটা ফোন করবে? যদিও ঋতজা ভাল বাংলা জানে কিন্তু ভীষণ হিংসুটে। হয়তো ভুলভাল ইনফরমেশন দেবে যাতে পমপম কম নম্বর পায়। কিন্তু আর কোনও উপায়ও তো নেই।

পমপমের কোনও মোবাইল ফোন নেই। ওর বাবা-মা পছন্দ করে না। বলে, 'ওটা নাকি অপ্রয়োজনীয় জিনিস'। অগত্যা। রাফ খাতা আর পেন হাতে নিয়ে ঋতজাদের নম্বরটাতেই ডায়াল করল ও।

প্রথমে ঋতজার মা ধরলেন। ঘুম-ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে বলছ?"

ঋতজার মা-কে একটু ভয় পায় পমপম। তাই তুতলিয়ে বলল, "আমি পমপম, আই মিন তন্নিষ্ঠা বলছি। ঋতজা আছে?"

নামটা শুনে ওপাশের গলার আওয়াজটা একটু নরম হল। বললেন, "ধরো, ডেকে দিচ্ছি।"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হাওয়াই চপ্পলের ফটফটানি শুনতে পেল পমপম। তার পরই অনেকগুলো কালিপটকার মতো আওয়াজ, "হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ়!"

"কেন, সারপ্রাইজ কেন?" গলায় একটু বিরক্তি ঢেলে দেয় পমপম।

"মিস তন্নিষ্ঠা দত্তরায় ফোন করেছেন আমাকে!"

"ইজ় ইট আ সারকাজ়ম?" পমপমও কম যায় না।

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। ঋতজার গলার স্বরটা বদলে গেল। হিহি করে হেসে বলল, "তুই কি আমাকে কখনও ফোন করিস?"

পমপম একটু লজ্জা পায়। ঋতজার বলা কথাটা একশো ভাগ সত্যি। ফোন করা তো দূরের কথা, ঋতজাকে একটু এড়িয়েই চলে ও। এই বাংলা রচনাটার জন্যই ওকে ফোন করতে হল। ওর মা একটা স্কুলে বাংলা পড়ান। তাই ঋতজাও ভাল জানে ভাষাটা।

নিজের প্রয়োজনে ফোন করেছে বলে পমপম কুণ্ঠিত ভাবে বলল, "আসলে তুই তো বাংলা ভাল জানিস, তাই ভাবলাম তোকেই ফোন করি।"

"কী ব্যাপারে বল তো?"

"ওই বনমহোৎসব রচনাটা লিখেছিস তুই?"

দু'দিন আগেই মাকে জিজ্ঞেস করে রচনাটা লিখে ফেলেছে ঋতজা। কিন্তু সেকথা বুঝতে না দিয়ে অবাক গলায় বলল, "এ মা! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি তুই। ওটা কি কালকেই সাবমিট করতে হবে?"

"হ্যাঁ তো।" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল পমপম।

একটু চুপ করে থেকে ঋতজা বলল, "একটা কাজ কর, গুগ্‌ল সার্চ করে নে। উইকিতে অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবি।"

একটু ক্ষুণ্ণ হলেও পমপম বলল, "ঠিক আছে, দেখি কিছু পাই যদি।"

বাবার স্টাডিতে গিয়ে ল্যাপটপটা লগইন করল পমপম। বাংলা টাইপ করতে জানেনা ও, তাই রোমান অক্ষরেই লিখল Bonomahotsab। হ্যাঁ, অনেক সাইট এল বটে, অনেক ইনফরমেশনও এল। কিন্তু তাই দিয়ে কি একটা রচনা লেখা যায়? কিংকর্তব্যবিমূঢ় পমপম।

তবুও কিছু ইনফরমেশন আর স্লোগান নোট করে নিল সে। 'Plant trees, save the Earth'-কে বাংলায় ট্রান্সলেট করতে পারল সে নিজেই। লিখল, 'গাছ লাগাও, পৃথিবী বাঁচাও'। কে, কবে, কোথায় এই বনমহোৎসব শুরু করেছিলেন, মানুষের জীবনে গাছের ভূমিকা কী, ইত্যাদি তথ্যগুলো ইংরেজিতেই নোট করে নিল। মা ফিরলে ট্রান্সলেট করে নেবে সেসব। তবে 'চিপকো মুভমেন্ট'-এর কথা জেনে চমৎকৃত সে। উত্তরাখণ্ডের কোনও গ্রামে একজন মহিলা একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে সে গাছটাকে কাটতে দেননি। সেটাই পরে সারা ভারতবর্ষে একটা মুভমেন্টের আকার নেয়। এই চিপকো মুভমেন্টের কথা পড়তে-পড়তেই পমপমের মাথার ঘিলুটা নড়ে ওঠে। ক'দিন আগেই একটা খবর পড়েছে সে। মণিপুরের একটা গ্রামে একটা ছোট্ট মেয়ে একটা গুলমোহর গাছ লাগিয়েছিল। একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখে সেই গাছটা কারা যেন গোড়া থেকে কেটে ফেলেছে। তাই দেখে বুকটা ফেটে যায় তার। হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে সে। ওই গাছটাকে যে সে পুষেছিল। পমপমেরও বুকের ভিতরটা চিনচিন করে ওঠে। স্নোয়িকেও তো সেই ছোট্টবেলা থেকে পুষেছে পমপম। তার গায়ে কেউ যদি হাত তোলে সেই হাতটা মুচড়ে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে পমপমেরও। নাঃ, রচনাটা একা-একা লিখতে পারবে না পমপম। মা এলে তবেই সম্ভব হবে। একটু রাত জাগতে হবে বই তো নয়। হ্যাঁ, বাবার কাছে একটু বকুনিও খাবে। শেষ মুহূর্তে কেন হোমওয়র্কের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে পমপমের। তাই স্নোয়ির দিকে তাকিয়ে ও বলল, "লেট্স গো স্নোয়ি।"

স্নোয়ি তার সামনের পা দু'খানা মেলে তার উপরে নিজের মুখখানা রেখে পমপমকে লক্ষ করছিল। এই ডাকটা শুনেই লাফিয়ে উঠল সে। জিভ লকলকিয়ে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে পমপমের পিছু নিল। গন্তব্য তার জানা। স্নোয়ির বলদুটো হাতে নিয়ে গলা চড়াল পমপম, "মাসি, আমি স্নোয়িকে নিয়ে ছাদে যাচ্ছি।"

কোনও জবাব না পেয়ে মিনুর ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল পমপম। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছে মিনু। তেল জবজবে চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বালিশের উপরে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। খুব হাসি পায় পমপমের। চেঁচিয়ে বলে, "ও মাসি, মুখটা বন্ধ করো। মাছি ঢুকে যাবে তো!"

মিনু ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে বলে, "কে ঢুকেছে? হ্যাঁ, কে ঢুকেছে? চলো তো দেখি ..."

তার ঘরের দরজার পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখা লাঠিটা হাতে নিয়ে ছুটে যায় মিনু। আর খিলখিল করে হেসে উঠে পমপম বলে, "কেউ ঢোকেনি। তোমার মুখে মাছি ঢুকে যাবে বলছিলাম।"

চুলটা জড়িয়ে হাতখোঁপা বাঁধতে-বাঁধতে মিনু বলল, "এমন ভয় পাইয়ে দাও না তুমি!"

"আর ভয় পেয়ে কাজ নেই, দরজাটা বন্ধ করে নাও, আমি স্নোয়িকে নিয়ে ছাদে যাচ্ছি," ছ'তলার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বলল পমপম। স্নোয়ি তার আগেই ছ'তলায় উঠে গিয়ে সিঁড়ির রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে।

দরজা বন্ধ করতে-করতে মিনু বলল, "বেশি দেরি কোরো না। ছ'টা নাগাদ নেমে এসো কিন্তু।"

ঘাড়টা কাত করে এগিয়ে গেল পমপম।

ছাদে পৌঁছে অবাক হয়ে যায় পমপম। রোজকার মতোই মুখার্জিদাদুর টবের গাছগুলোতে জল দিচ্ছে কালাচাঁদকাকু। কীকরে এটা সম্ভব হয় বুঝতে পারেনা পমপম। চাঁদ-সূর্যের যেমন উদয় হওয়ার আর অস্ত যাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে, কালাচাঁদকাকুরও কি তেমনি গাছে জল দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে? নাকি ওকে ফলো করে সে? কিন্তু কেন? থ্রিলার-পড়া পমপমের মনে রহস্য ঘনায়। তবে আর-একজন যে ওকে ফলো করে সেকথা জানে পমপম। ও ছাদে পৌঁছনোর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ছাদে পৌঁছে যায় সে। তার মাথায় যেন সেন্সার লাগানো আছে। তবে সেটা হয়তো স্নোয়ির জন্য। স্নোয়িকে বড্ড ভালবাসে

বিচ্ছু। গ্রামের ছেলে, সেই বিহারের মধেপুরা থেকে এসেছে কাজ করতে। খুব নাকি গরিব ওরা। মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো ছেলেটার কি চার দেওয়ালের মাঝখানে আটকে থাকতে ভাল লাগে?

বিচ্ছু ছাদের দরজাটা ঠেলে ঢুকতেই কালাচাঁদ গলা চড়িয়ে বলে, "কীরে তোর অ্যালার্ম বেজে গেছে?"

"কেয়া?" দাঁতগুলো সব বের করে বলে বিচ্ছু।

"বলছি ঘড়িটায় ক'বার দম দিস?"

"সমঝা নেহি।"

"তোর আর সমঝে কাজ নেই। যা স্নোয়ির সঙ্গে খেল।"

"ইসিলিয়ে তো আয়া," বলে পমপমের হাত থেকে একটা বল নিয়ে ছাদের দেওয়াল বরাবর ছুড়ে দেয়। আর স্নোয়িও প্রাণপণে ছুটতে থাকে বলটার পিছনে।

পমপম দু'হাতে তালি বাজিয়ে লাফাতে-লাফাতে বলে, "গুড জব স্নোয়ি ..."

আর তার বাড়ন্ত শরীরের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে বিচ্ছু। তার মনে হয় যেন তাদের গাঁয়ের ছোটি পোখরিতে দুটো জল-কুমুদিনী দোল খাচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে কালাচাঁদ, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত সেটা বুঝতে পারেনা। মেয়েটা বড় হয়ে উঠছে, শিয়াল-কুকুর তো লাগবেই তার পিছনে। মিনুমাসিরই উচিত তার সঙ্গে ছাদে আসা। কিন্তু দিন-দিন কেমন যেন আলসে হয়ে যাচ্ছে মাসিটা। তাই তো কালাচাঁদই ছাদে উঠে এসে গাছে জল দেয় এই সময়টায়। ডাক্তারবাবু বা ম্যাডাম কেউ-ই অবশ্য বলেননি তাকে। তবুও, কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে তো। অসুখেবিসুখে ওষুধপত্র দেন ডাক্তারবাবু। শর্মিষ্ঠা ম্যাডামও এটা ওটা দেন। এই তো গত মাসেই নিজেদের স্টিলের আলমারিটা ওকে দিয়ে দিয়েছেন ম্যাডাম। নিজেরা দুটো নতুন আলমারি কিনেছেন, তাই। বললেন, "এটা বিক্রি করে আর ক'টা টাকা পাব কালাচাঁদ? হাজার টাকার বেশি তো নয়। তার চাইতে তুমি রাখো, কাজে দেবে। সার্ভিস চার্জের টাকাগুলোও তো তোমার কাছেই থাকে, চুরিটুরি হয়ে গেলে সমস্যায় পড়বে।"

রোজ এই এক দায় কালাচাঁদের। সব কাজ ফেলে ছ'টা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে ছাদে। এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের ভরসা কী? আর বিচ্ছুটা বড় পাকা ছেলে। কী করতে কী করে বসবে! তাই বিচ্ছুর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুটা থেকে তাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে কালাচাঁদ। জিজ্ঞেস করে, "অ্যাই বিচ্ছু, আজ সন্ধেবেলা কী খাবার বানাবি সাহেবদের জন্য?"

বিচ্ছু টলে না। একই ভাবে বল ছুড়তে-ছুড়তে বলে, "উওহি।"

"উওহিটা কী জিনিস রে?" অবাক প্রশ্ন কালাচাঁদের।

এ বারে বিচ্ছু হেসে ফেলে। বলে, "উওহি মতলব চিক্কন পকোড়া। উও একই চিজ় রোজ বানানা পড়তা হ্যায়।"

কালাচাঁদ প্রলম্বিত করতে চায় বাক্যালাপটাকে। তাই বলে, "কী করে বানাস? তেলে ভাজিস?"

বিচ্ছু শহরে এসে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। আর কিছু জেনেছে স্বাভাবিক জৈবিক কারণে। কিন্তু কালাচাঁদ তার সঙ্গে রোজ বিকেলে এত কথা বলে কেন সেক থা বুঝতে পারেনা। তাই গর্বের সঙ্গে বলে, "হাঁ, ভেজিটেব্‌ল অয়েল মে।"

"মশলাটশলা মাখাস নাকি নুন মাখিয়েই ভেজে দিস?" কালাচাঁদের যেন চিকেন পকোড়ার রন্ধনপ্রণালীটা জেনে নেওয়া জরুরি এই মুহূর্তে।

আকর্ণ হেসে বিচ্ছু বলে, "কালাদা, তুম ভি না!"

"কেন, ভুল বললাম কিছু?"

"অওর কেয়া?"

"থালে বল না কী করে বানাস। আমিও বানাব একদিন।"

"হাঁ সুনো। পহলে পিয়াজ, আদরক, নমক, মিরচি অওর নিমবু লাগাকে রাখ দে তে হ্যায় ঘণ্টা ভর। ফির আন্ডা অওর বেরেড কারাম লপেটকে ফেরাই করতে হ্যায়। ব্যস।"

কিন্তু বিচ্ছু ব্যস বললেই তো কালাচাঁদ তাকে অত সহজে রেহাই দেবে না। সে বলে, "তুই বাটার ফেরাই করতে পারিস?"

"উও কেয়া হোতা হ্যায়? মাখ্খন সে ফেরাই করতে হ্যায় কেয়া?"

"নারে আমি সরকারবৌদিকে করতে দেখেছি। দুধ আর ডিমের মধ্যে ময়দা না কী যেন গুলে নিয়ে ভাজে। আমাকে খেতে দিয়েছিল একদিন। খুব ভাল খেতে। ভিতরে নরম ভেটকি মাছ আর বাইরে মুচমুচে ময়দার গোলা। তোর সাহেবের বন্ধুদের খাওয়াস, ধন্যি-ধন্যি করবে তোকে।"

"ঠিক হ্যায়, বানায়েঙ্গে একদিন। পহলে পতা লাগাও উও ময়দামে অওর কেয়া কেয়া দেতে হ্যাঁয়।"

"ঠিক আছে, সরকারবৌদিকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু যদি আমাকে এক পিস্ খাওয়াস, তবেই।"

বিচ্ছু এক চোখ টিপে বলল, "ফিকর মত করো, লে আয়েঙ্গে। ইঁহা ব্যায়ঠকর খা লেনা, কিসি কো পতা নেহি চলেগা।"

কথাগুলো বলেই আবার স্নোয়িকে বল ছুড়তে থাকে বিচ্ছু।

কালাচাঁদ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। ঈশান কোণে জমা মেঘটা ধীরে-ধীরে ঢেকে ফেলছে সারা আকাশ। অল্প-অল্প বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কালাচাঁদকে একটা ভয় গ্রাস করছে। একটা ভয়ানক কষ্টদায়ক স্মৃতি উঠে আসছে যেন বহু যুগের ওপার থেকে। ফালা-ফালা করছে তার মনটাকে।

হ্যাঁ, সেদিনও ফালা-ফালা হচ্ছিল সারা আকাশ। একটা আলোর গাছ শিকড়বাকড় ডালপালা সমেত ফুটে উঠছিল কুচকুচে কালো আকাশের গায়ে। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুল থেকে ফিরে মুড়ি খাচ্ছিল কালাচাঁদ। ওদের একমাত্র ঘরের তক্তপোশটার উপরে বসে। মা বলে দিয়েছিল, মেঘ ডাকলে যেন তক্তপোশে বসে থাকে সে। মাটির মেঝেতে যেন পা না ঠেকায়। তাই তো করেছিল কালাচাঁদ। খড়ের চাল বেয়ে তক্তপোশটার উপরে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছিল, তাও। বাঁশের বাতা দিয়ে বোনা পাল্লাটা সরিয়ে দেখছিল প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ আর একা ঘরে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। তার পর এক সময়ে ঝড় থেমে গেল। কিন্তু ছোট্ট কালাচাঁদের জীবনে ঘনিয়ে এল এক তুমুল ঝঞ্ঝা। গাঁয়ের লোকেরা ধরাধরি করে দুটো লাশ এনে রাখল কালাচাঁদদের বাড়ির উঠোনে। ধানের খেতে চারা রুইতে গিয়ে বাজ পড়ে মারা গিয়েছে নাকি তারা। কালাচাঁদ অবাক হয়ে দেখল সেই লাশ দুটোর মুখ একেবারে তার বাবা আর মায়ের মতো দেখতে।

আশপাশের বাড়ির মাসি-পিসি-কাকিমা-ঠাকুমারা এগিয়ে এসে আড়াল করল কালাচাঁদকে। বলল, 'তার বাবা-মা মুনিষ খাটতে গেছে বহু দূরে। ফিরতে সময় লাগবে'। কিন্তু কালাচাঁদের আর বাড়ি ফেরা হল না। কে বা কারা যেন তাকে দিয়ে এল শক্তিগড়ের অনাথ আশ্রমটায়।

বৃষ্টিটা নামল কী? কালাচাঁদের দু'গালে দু'ফোঁটা পড়ল মনে হচ্ছে যেন। গরু-ছাগল তাড়াবার মতো হ্যাট-হ্যাট করে ওঠে কালাচাঁদ, "অ্যাই বিচ্ছু, নীচে চল, বৃষ্টি নেমে গেছে। পমপমদিদি, তুমিও স্নোয়িকে নিয়ে ঘরে যাও। ভিজে যাবে।"

পমপম খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, "বৃষ্টি কোথায় গো কালাচাঁদকাকু, তোমার মুখে হোসপাইপের জল ছিটকে লেগেছে বোধহয়।"

## ৭

তাসগুলো শাফ্‌ল করছেন মিস্টার চাকী। ঠোঁটে চেপে ধরে আছেন একটা জ্বলন্ত সিগারেট। ঠোঁট দুটো একটু চেপে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী, ইউজুয়াল পার্টনারশিপেই হবে তো খেলাটা?"

দোদুল্যমান সিগারেটটির দিকে তাকিয়ে মিস্টার দস্তিদার বললেন, "প্রশ্নটা তো আমি আর মিস্টার তলাপাত্র আপনাকে করব। অন্য কোনও পার্টনারের সঙ্গে কি আপনি খেলবেন?"

মুখটা একটু বেঁকিয়ে হাসতে গিয়ে সিগারেটের ডগায় জমে থাকা ছাইটা টুক করে খসে পড়ল টেবিলের উপরে। টিস্যু পেপারের বাক্স থেকে একটা টিস্যু পেপার টেনে নিয়ে সেটা মুছতে লাগলেন মিস্টার চাকী। সিগারেটটা সন্তর্পণে অ্যাশট্রের উপরে রেখে বললেন, "এমন প্রশ্ন কেন?"

গুবগুব করে হেসে মিস্টার তলাপাত্র বললেন, "আসলে আপনাদের দু'জনের পার্টনারশিপটা ভাল জমে তো।"

“অন্য কিছু মিন করছেন না তো আপনি?” তলাপাত্রের চোখে চোখ রেখে বললেন চাকী।

তলাপাত্র ঠোঁটের কোনায় হাসিটা বজায় রেখে বললেন, “অন্য আর কী মিন করব বলুন? আসলে আপনারা দু’জনেই তো চিটিংবাজ ...”

“এ বার কিন্তু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়াটা শুরু করছেন আপনি,” রাগতভাবে বললেন চাকী।

দস্তিদার তাঁদের দু’জনকে থামাবার জন্য বললেন, “আমি একটা কথা বলি?”

মুখার্জি মনোযোগ দিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালছিলেন, পরিমাণমতো জল মেশাচ্ছিলেন আর বরফের টুকরোগুলো দিয়ে সাজাচ্ছিলেন চারটে গ্লাস। মৃদু হেসে বললেন, “অত ফর্মালিটি কীসের? বলে ফেলুন যা প্রাণ চায়। বন্ধুত্বে ও সব চলে না।”

“অভয় দিচ্ছেন?”

“অবশ্য।”

“আসলে আপনারা দু’জনেই উইডোয়ার তো। আই মিন সেমি ব্যাচেলর ...”

“সো হোয়াট? আমরা কি গে? তবে আর এখানে কী করছি? চলুন মিস্টার মুখার্জি, আপনার বেডরুমে চলুন,” গোঁফটা মুচড়িয়ে বললেন চাকী।

এ বারে চার জনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। আর তাসগুলো তলাপাত্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে চাকী বললেন, “নিন কাটুন। ভাল করে কেটে দিন। চাইলে আর-এক বার শাফ্‌ল করে দিন। যদি কোনও চিটিংবাজি করে থাকি। বলা তো যায় না।”

খোঁচাটা হজম করলেন তলাপাত্র। হাসিমুখে কেটেও দিলেন। আর মনোযোগ দিয়ে তাসগুলো বাঁটতে লাগলেন চাকী। বাহান্ন নম্বর তাসটা টেবিলে পড়তেই ওঁরা চার জনে চারটে গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে সমস্বরে বলে উঠলেন, “চিয়ার্স।”

প্রথম ঢোকটা গলাধঃকরণ করেই চাকী দস্তিদারকে বললেন, “নিন কল দিন।”

মনোযোগ দিয়ে নিজের তাসগুলো সাজাচ্ছিলেন দস্তিদার। লালের পাশে কালো, তার পরে আবার লাল, তার পরে কালো। মনে একটা গুনগুনানি। স্পেডের টেক্কা, বিবি আর গোলাম তাঁর হাতে। দহলাও আছে, আছে আরও কিছু ছোট-ছোট তাস। তবে বাদশাটা বাইরে আছে। তলাপাত্রর হাতে থাকলে ভাল, তবে না থাকলে বিপদ। তাই কোনও রিস্ক না নিয়ে টেক্কা দিয়েই খেলতে হবে। এছাড়া হার্টের সাহেব, ডায়মন্ডের গোলাম আর ক্লাবের টেক্কাও আছে। তাই তিনি কল দিলেন, “ওয়ান স্পেড।”

খেলা এগোচ্ছে তার নিজস্ব গতিতে। গ্লাসের তরলও নীচে নামছে দ্রুত। বরফের টুকরোগুলো তাদের চারচৌকো ত্রিমাত্রিক গড়ন হারিয়ে দ্বিমাত্রিকে পরিণত হচ্ছে। কিচেন থেকে ভেসে আসছে চিকেন পকোড়ার সুঘ্রাণ। একটা তূরীয় আনন্দে মশগুল হয়ে আছেন ওঁরা চারজন। ভুলে যাচ্ছেন কার স্ত্রী গত হয়েছেন বলে জীবনে খরা নেমে এসেছে। কার সন্তান বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য বাৎসল্যের আর্দ্রতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে তাঁর সংসারে। কার পেনশন আটকে আছে বলে দিন গুজরান করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এ ধরাধাম যেন শুধুই আনন্দপূর্ণ। সেখানে উড়ে বেড়ায় হালকা-হালকা খুশির বুদবুদ। সাতরঙের ঝিলিক মেরে।

স্পেডের খেলা দু’রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। এক রাউন্ড হার্টের খেলাও হয়ে গেছে। আবার হার্টের দান চেলে বসলেন অতি বুদ্ধিমান চাকী। মুখার্জি তাঁর উল্টো দিকে বসে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। এখন দস্তিদার যদি ট্রাম্প করেন!

যা ভেবেছেন মিস্টার মুখার্জি। দস্তিদার স্পেডের একটা কার্ড ফেলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, “ট্রাম্প!”

থতমত খেয়ে যান চাকী। বলেন, “কেন ট্রাম্প কেন? হার্ট নেই আপনার?”

রেগে যান দস্তিদার। চোখ-মুখ লাল করে

> খেলা এগোচ্ছে তার নিজস্ব গতিতে। গ্লাসের তরলও নীচে নামছে দ্রুত। বরফের টুকরোগুলো তাদের চারচৌকো ত্রিমাত্রিক গড়ন হারিয়ে দ্বিমাত্রিকে পরিণত হচ্ছে।
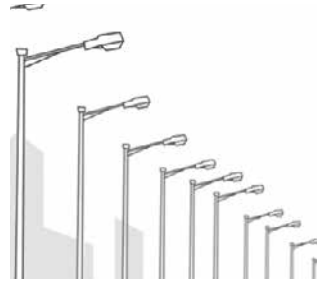
বলেন, “না নেই। আপনার মতো চিটিংবাজ নই আমি। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ধড়িবাজও নই।”

তলাপাত্র নির্বিবাদী মানুষ। দস্তিদার ট্রাম্প কার্ডটা ফেলাতে ভয়ানক খুশিতে হাঁটু দু’খানা দোলাচ্ছেন তিনি আর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, “ওয়েল প্লেড মিস্টার দস্তিদার। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রসঙ্গটা কেন এল বুঝতে পারলাম না।”

রাগতভাবটা বজায় রেখে দস্তিদার বললেন, “বুঝতে না পারার কী আছে? তিনি চললেন গ্রিনল্যান্ড কিনতে আর সেখানে ট্রাম্প টাওয়ার বানাতে! এদিকে আমাদের ইন্ডিয়ান ছেলে-মেয়েগুলোকে গ্রিনকার্ড দিচ্ছেন না।”

তলাপাত্র হেসে বললেন, “সে গ্রিন নিয়ে আপনার মনে যতই নেগেটিভিটি থাক, এই মুহূর্তে আপনি কিন্তু শেন ওয়ার্নের মতো বোল্ড আউট করে দিয়েছেন আমাদের অপোনেন্টকে।”

মিস্টার চাকীর মিস ক্যালকুলেশনে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন মিস্টার মুখার্জি। তাই বলেই ফেললেন, “আর আমাদের রেপুটেড প্লেয়ার মিস্টার চাকী আজ ধোনির মতো খেললেন।”

মুহূর্তে ফোকাসটা তাস থেকে চলে গেল ক্রিকেটে। আর তলাপাত্রও অপোনেন্ট পার্টির মুখার্জিকে সমর্থন করে বললেন, “আই এগ্রি উইথ ইউ। সেমি ফাইনালে গিয়ে ধোনিটা কী কাণ্ড করল বলুন তো! অমন একজন দুর্ধর্ষ প্লেয়ার রান আউট হয়ে গেল! এটা কি বিশ্বাস করা যায়?”

একটা ভুল দান চেলে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন চাকী। তলাপাত্রকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, “লাক ফেভার না করলে অমনিই হয়।”

“আপনি চুপ করুন তো। লাক-ফাক কিছু হয় না বুঝলেন? আসল ব্যাপার হচ্ছে ক্যালকুলেশন,” গলা চড়িয়ে বললেন মুখার্জি।

“হোয়াট! হচ্ছে ক্রিকেটের কথা, তার ভিতরে ক্যালকুলেশনটা এল কী করে?” বললেন চাকী।

দস্তিদার ওঁদের দু’জনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “আসলে মাত্র পঞ্চাশ রানেই আউট হয়ে গেল তো ধোনি, সেটাই বোধহয় বলতে চাইছেন মিস্টার মুখার্জি। বাহাত্তর বলে পঞ্চাশ রানটা একেবারেই এক্সপেক্ট করা যায়না ওর কাছে।”

চাকীর মেজাজ এখনও তুঙ্গে। তিনি একই ভাবে বললেন, “ওটা আম্পায়ারের দোষ ছিল। হি শুড হ্যাভ কলড ইট ‘নোবল’। তা ছাড়া রিং-এ পাঁচজন ফিল্ডার থাকার কথা,তিরিশ গজের সার্কেলে ছ’জন ফিল্ডার ছিল কেন? তিন জন আম্পায়ারই ওভারলুক করে গেল ব্যাপারটা? দিস ইজ় ইনজাস্টিস। অথবা ইন্ডিয়ার ব্যাডলাক।”

“ব্যাডলাকই বলা যায়, নয়তো কোহলি আর রোহিত শর্মা এক-এক রান করে? কোহলির ব্যাটিং স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে সারা পৃথিবীতে এত শোরগোল ...”

তলাপাত্রকে থামিয়ে দিয়ে দস্তিদার বললেন, “আর রোহিত শর্মা? একটা ওয়ার্ল্ড কাপে পাঁচটা সেঞ্চুরি করে যে রেকর্ড করল?”

চাকী নিজের কথার পোঁ ধরে বললেন, “ওই জন্যই তো বলছি, লাক ফেভার করাটাও জরুরি। ধাওয়ানকেই দেখুন, ব্যাডলাক না হলে কি ওয়ার্ল্ড কাপের মাঝখানে থাম্ব ফ্যাকচার হয়? বেচারার তো কেরিয়ারটাই বরবাদ হয়ে গেল। একেবারে একলব্যের কেস!”

মুখার্জি লেখাপড়া করা মানুষ। সারা পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোল তাঁর হাতের মুঠোয়। নানা দেশের পুরাণ নিয়েও চর্চা করেন। তাই তিনি বললেন, “একটু ইন্টারাপ্ট করছি। ওই একলব্যের ব্যাপারটা কিন্তু কন্ট্রোভার্সিয়াল।”

“মানে? ব্যাসদেবের মহাভারতকেও কি চ্যালেঞ্জ করতে চান আপনি?” গলায় ঝাঁজ ঢেলে বললেন চাকী।

গলাটা ঝেড়ে মুখার্জি বললেন, “তা ঠিক নয়। তবে বহুকাল আগে লেখা তো এ সব এপিক, তাই ইনফরমেশনগুলোও পুরনো। ফ্যাক্টসগুলো মাঝে-মাঝে আপডেট করা প্রয়োজন।”

“যেমন?” চ্যালেঞ্জটা এল চাকীর তরফ থেকেই।

“যেমন তির ছুড়তে বুড়ো আঙুলটা না হলেও চলে।”

“কী বলছেন মিস্টার মুখার্জি? মানছি বিস্তর পড়াশুনো আপনার, তাই বলে এমন একটা স্টেটমেন্ট কিন্তু আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে,” উৎকণ্ঠিত চাকী।

“না, ফেলবে না, প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। আসলে আমাদের তির ছোড়ার টেকনিকটা হল মঙ্গোলিয়ান, যেটাতে বুড়ো আঙ্গুলটা জরুরি। যেহেতু আমরা এশিয়া মহাদেশে বাস করি, তাই ওই টেকনিকটাই ফলো করি। ব্যাসদেবও সেটাই ফলো করেছিলেন সম্ভবত।”

“আর অন্যটা?” তর সয়না চাকীর।

“অন্যটাকে বলে মেডিটেরিয়ান টেকনিক, যেটাতে বুড়ো আঙুলের কোনও রোলই নেই। নামেই বুঝতে পারছেন পৃথিবীর কোন-কোন দেশে এভাবে তির ছোড়া হয়। তবে ধাওয়ানের কেসটা আলাদা। হয়তো ফ্র্যাকচারটা ঠিক হয়ে যাবে, দাপিয়ে ব্যাট করবে আবার। নয়তো উল্টোটা হবে। এক্ষেত্রে লাকটা একটা বড় ফ্যাক্টর।”

“আপনার খুরে-খুরে নমস্কার মশাই। আনলিমিটেড স্টোরেজ পাওয়ার। মেগাবাইট-গিগাবাইট ফেল করে যায়,” মৃদু হেসে বললেন তলাপাত্র।

হা হা করে হেসে উঠে মুখার্জি বললেন, “আপনি কি আমাকে ছাগল-ভেড়া ঠাউরেছেন, নাকি গরু-গাধা? এই খুরটা কোথা থেকে এল?”

“আপনি স্ট্যালিয়ন মশাই, স্ট্যালিয়ন। একেবারে রোবাস্ট। এই সত্তর ছুঁইছুঁই বয়েসেও যা অ্যাপিল না আপনার!” তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করে দেখালেন তলাপাত্র।

চিকেন পকোড়া ভর্তি প্ল্যাটারটা টেবিলের উপরে এনে রাখল বিচ্ছু। এটা দ্বিতীয় কিস্তি। এক প্লেট আগেই উড়ে গেছে গরমাগরম যুক্তিতর্কের সঙ্গে। গ্লাসগুলোও দ্বিতীয় বার ভরে দিলেন মিস্টার মুখার্জি। বরফের টুকরোগুলো যত্ন করে সাজাতে না-সাজাতেই পাওয়ার কাট।

“ওহ নো!” বলে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার মুখার্জি। “এই এক জ্বালা হয়েছে! কত সরকার এল-গেল, কিন্তু আমাদের এদিকটা নেগলেক্টেডই রয়ে গেল। ভি আই পি রোড আর ফ্লাইওভারগুলো আলোর মালায় সেজে আছে। রাজারহাট-নিউটাউনে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। অথচ চিংড়িহাটার আর কোনও উন্নতিই হল না! অ্যাই বিচ্ছু, কোথায় গেলি তুই?”

“জি সাব,” বলে আরব্য রজনীর গোলামের মতো এসে দাঁড়াল বিচ্ছু।

“ক্যান্ডল আছে বাড়িতে?”

“নেহি সাব। ম্যাঁয় লে আঁয়ু?”

“কোথা থেকে আনবি রে হারামজাদা? দোকান তো সেই মোড়ে।”

“হাঁ, মোড়পেই যানা পড়েগা।”

“না, তোর আর মোড়ে গিয়ে কাজ নেই, এ দিকটা কে দেখবে তা হলে? দেখি কালাচাঁদকে ফোন করে বলি।”

তলাপাত্র বলেন, “আমরা বরং আজ আসি। এই অন্ধকারে তো খেলা যাবে না।”

“আর অন্ধকারে বুঝি সিঁড়ি দিয়ে নামা যাবে? লিফ্ট তো চলছেনা। বুড়ো বয়েসে হাড়গোড় ভেঙে আমাকে দায়ে ফেলবেন নাকি? মিসেস তলাপাত্র আমাকে স্যু করে দেবেন তো তা হলে,” হাসতে-হাসতে বললেন মুখার্জি।

ফোনটা একবার বাজতেই কালাচাঁদ বলল, “বলুন স্যার।”

যেন সে একজন সৈনিক আর মিস্টার মুখার্জি সেনাপতি। তাঁর আদেশের অপেক্ষারত কালাচাঁদ।

“মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট ক্যান্ডল এনে দিতে পারবে?” গলায় বিনয়ের সুর থাকলেও কালাচাঁদ জানে এটা মুখার্জিসাহেবের আদেশই। তাই কালবিলম্ব না করে সে বলল, “আমার কাছে এক প্যাকেট মোমবাতি আছে স্যার। আনব?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ,নিয়ে এসো। জলদি।”

“দেশলাই আছে স্যর?”

“হ্যাঁ, দেশলাই আছে। তাড়াতাড়ি এসো।”

ফোনের লাল বোতামটা টিপে দিয়ে মুখার্জি বললেন, “এই কালাচাঁদ ছেলেটা আমাদের একটা অ্যাসেট। যে-কোনও সমস্যারই সমাধান আছে ওর কাছে। একেবারে বিপত্তারণ মধুসূদন। ও যদি কখনও এ বিল্ডিং ছেড়ে চলে যায় তবে অথৈ জলে পড়ে যাব আমরা।”

মোমবাতির প্যাকেটটা দিয়ে গেছে কালাচাঁদ। বিচ্ছু চারটে খালি হুইস্কির বোতলের মুখে সেগুলো ঢুকিয়ে জ্বালিয়ে এনে রাখল টেবিলের উপরে। মিস্টার চাকী দু'হাতে তালি বাজিয়ে বললেন, “ব্রাভো! কী সেট-আপ মশাই আপনার! এ বলে আমায় দ্যাখ, তো ও বলে আমায়। এমন সিচুয়েশনে তো ল্যাজে-গোবরে অবস্থা হয় আমাদের।”

তার পর বিচ্ছুর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, “তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি আছে রে বিচ্ছু।”

বিচ্ছু লাজুক মুখে হেসে আবার কিচেনে চলে গেল। আর তার কান বাঁচিয়ে মুখার্জি বললেন, “একটু বেশি-ই বুদ্ধি ওর। আই মিন, দুষ্টুমি বুদ্ধি।”

সে যাহোক, চাকী মশাই বিচ্ছুর বুদ্ধির তারিফ করাটাই সমীচীন মনে করলেন এই পরিস্থিতিতে। গ্লাস ভরা পানীয় পড়ে আছে টেবিলে, যদিও বরফগুলো তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেনা আর। অন্ধকারকে উজ্জ্বল করতে অনেকটা সময় বয়ে গেছে। আর-এক রাউন্ড চিকেন পকোড়া এলে আর ডিনার খাবার প্রয়োজন হবে না আজ। তা ছাড়া কেউ তো তাঁর অপেক্ষায় বসেও থাকবে না বাড়িতে। স্ত্রী গত হয়েছেন বহুকাল আগে। একমাত্র মেয়ের সুখের সংসার দিল্লি লাগোয়া গুরুগ্রামে। সপ্তাহে এক বার ফোনে কথা হয় শনি বা রোববার সকালে। তাই যতটা সময় এখানে কাটানো যায় আর কী। চিকেন পকোড়া এসে গেছে। বরফগুলো গলে গিয়ে কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে আছে গ্লাসগুলো। তাই গ্লাসটা হাতে তুলে নেওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো নিজের মুখটাকেই গ্লাসের সমতলে নিয়ে গেলেন চাকী। এক চুমুক পান করে বললেন, “টু দ্য লাইট ফ্রম ডার্কনেস!”

তলাপাত্র উসখুস করছেন। গিন্নি বসে থাকবেন ডিনার না খেয়ে। কিন্তু এঁদের সামনে সেকথা বলা যাবেনা। বললেই মুখার্জি আর চাকী বলবেন, পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক। ওঁরা তো মুক্ত বিহঙ্গ, যা খুশি তাই করতে পারেন। কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু তলাপাত্রর যে নিজের বাড়ির সদর দরজার বেলটা বাজাতেও পিঠ সুড়সুড় করে। গিন্নির বাক্যবাণগুলোর তীব্রতা চাবুকের চাইতে কিছু কম নয়।

মুখার্জি তলাপাত্রের হাঁটুতে চাপ দিয়ে বললেন, “কী হল, আউট হয়ে গেলেন নাকি? এমন থম মেরে বসে আছেন কেন? নামে তলাপাত্র আপনি, কিন্তু আপনার পাত্রের তলা পর্যন্ত তো পৌঁছচ্ছেই না ড্রিঙ্কটা।”

দস্তিদার ঢকঢক করে গ্লাসটা খালি করে বললেন, “আমি উঠছি, ছেলে ফোন করবে আমেরিকা থেকে। অফিস যাওয়ার সময় ড্রাইভ করতে করতে কথা বলে। তা ছাড়া আর সময় কোথায় ওদের!”

“পুলিশে ধরে না?” জিজ্ঞেস করলেন চাকী।

“না-না, গাড়ির স্পিকার ফোনে কথা বলে তো। তা ছাড়া ড্রাইভারকেও ছাড়তে হবে। অনেক রাত হয়ে গেল।”

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন দস্তিদার। তলাপাত্রও গেলেন তাঁর সঙ্গে। এটাই নিয়ম হয়ে গেছে। তলাপাত্রর একটু আর্থিক অনটন চলছে, তাই গাড়ি বের করেন না। তবে চাকী এ আসর ত্যাগ করার পাত্র নন। যৌবন থেকেই সুরাপানে অভ্যস্ত তিনি। তবে তখন পান করতেন রাম আর এখন হুইস্কি, এই যা তফাত। থাকেনও কাছাকাছিই। নেভাল অ্যান্ড এয়ারফোর্স হাউজ়িং-এ। কিন্তু শোবার ঘরটা হাতছানি দিচ্ছে মুখার্জিকে। আজ একটু বেশি-ই উত্তপ্ত হয়ে আছেন তিনি। তলাপাত্র আজ তাঁকে স্ট্যালিয়ন বলেছেন। লিলিথকে ডাকতেই হবে আজ। নয়তো সাক্কুবুসকে।

## ৮

বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এসে গেছে। সারা কলকাতায় এখন সাজো-সাজো রব। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারেরা।

রোড রোলারের ঘটাং ঘট আওয়াজ চলছে। গলিতে-গলিতে নো এন্ট্রির সাইন বোর্ড। গ্রাম থেকে কারিগরেরা এসে উপস্থিত হয়েছে নানা শিল্পকলায় প্যান্ডেল সাজাবার জন্য। প্রকৃতিও সেজে উঠেছে। বর্ষাস্নাত গাছগুলোর ভিজে সবুজ পাতায় মোমপালিশের ঝিলিক। নীল আকাশেও ধুনুরিরা এসে উপস্থিত হয়েছে। তুলো ধোনা চলছে ইন্দ্রের সভায়। বারোটি ঘণ্টা ধরে একটি গোলার্ধকে আলোকিত করে সূর্যদেবের মনে একটা পাপবোধ। তাই তিনি টুক করে পাড়ি দিলেন পশ্চিমি দুনিয়ায়। তারা ফোটার মতো টুকটুক করে জ্বলে উঠল এল ই ডি আলোগুলো। ঝলমল করে উঠল পূর্ব কলকাতার দিগন্ত। বাইপাসের মোড় থেকে ফিরে আসছে ফেলনা। পুজোর আগে কলকাতার মানুষগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে বাজার করতে। বন্যার কবলে পড়া নদীর মতো গাড়ির ঢেউ রাস্তায়-রাস্তায়। কিছু গাড়ি বড় বেপরোয়া। সিগনালের লাল চোখকে ভয় পায় না। কিন্তু ফেলনা ভয় পায়। যদি তার স্বাভাবিক পা-খানাও অস্বাভাবিক হয়ে যায়! তাই সন্ধের পর পরই ফিরে আসে সে। কালাচাঁদ নেই কার পার্কিং-এ। হয়তো কারও খিদমতগিরি করতে গেছে। তাই ছোটনের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে কালাচাঁদের বাথরুমে ঢুকে পড়ে ফেলনা। গুড়াকু দিয়ে দাঁত মেজে স্নানটা সেরে নেয়। সারা দিনের পরে থাকা বারমুডা আর গেঞ্জিটা কেচে নেয় সস্তার গুঁড়ো সাবান দিয়ে। গামছা পরে বেরিয়ে এসে সেগুলো মেলে দেয় বিল্ডিং-এর পিছনের দড়িটায়, যেখানে গাড়ি ধোওয়ার ন্যাতাগুলো টাঙিয়ে রাখে লাট্টু। ধোওয়া কাচা লুঙ্গি আর একটা ফতুয়া পরে লম্বা চুলটা আঁচড়ে নেয় ফেলনা। ভেজা চুলগুলো ভিজিয়ে দেয় তার ফতুয়ার পিঠটা। কার পার্কিং-এ এসে সে বলে, "অ ছোটনদা, চায়ের কেটলিটা দাও দিকিনি।"

ছোটন কেটলিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "পয়সা আছে তোর কাছে, নাকি আমি দেব?"

"আছে গো আছে," দাঁতগুলো ছড়িয়ে বলে ফেলনা।

ছোটন বলে, "তোর হাসি দেখে মনে হচ্ছে ভাল কামিয়েছিস আজ।"

"তা হয়েছে। আসলে পুজোমুখী মানুষের হাত দরাজ হয়ে যায়, বুঝলে তো ছোটনদা।"

"কথাটা ঠিকই বলেছিস তুই ল্যাংড়া। মোটা বোনাস পায় তো সবাই।"

"হ্যাঁ। বোধহয় ভাবে, বেচারা ল্যাংড়া ভিখারি, ওর তো কোনও বোনাস-টোনাস নাই। তা ছাড়া দশ-বিশ টাকা তো হাতের ময়লা যাদের, তাদের কাছে বলো?"

"সে তো বটেই। যারা লাখ-লাখ টাকা রোজগার করে মাসে, লাখ-লাখ টাকা বোনাসও পায়। দশ-বিশ টাকা তো হাতের ময়লাই তাদের কাছে। কিন্তু সেই ময়লাই বা পরিষ্কার করে ক'জন?"

"করে গো করে। তুমি তো ভিক্ষে করো না, তাই জানো না। কত লোক ডেকে ডেকে টাকা দেয়। গরিবরে দান করে তাদেরও পুণ্যি হয় বলো?"

"তুই থাম তো, কত লোক ভিখিরিদের হ্যাট হ্যাট করে তাড়িয়ে দেয়। আমি দেখিনি বুঝি?"

"তা দেয়। তবে তাদের দোষ দিয়েই বা কী হবে? আমাদের তো কোনও হক নাই ভিক্ষে করার। বলো?"

ছোটন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ফেলনার দিকে। ভাবে ভগবান কী দিয়ে গড়েছেন ওকে? কোনও কিছুতেই কি বিরক্তি নেই ওর? ছোটন তো নিজে চোখে দেখেছে মুখার্জিসাহেব ভিখিরি দেখলেই জানলার কাচ তুলে দেন। পুজো এসে গেল, সবাই বোনাস পেয়ে কেনাকাটা করছে। অথচ মুখার্জিসাহেবের মুখে কোনও রা নেই। সেই ষষ্ঠীর দিন বোনাস দেবেন। অথচ নিজে গেলাসের ইয়ারদের রোজ নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে চিকেন পকোড়া খাওয়াচ্ছেন। যত্তোসব! মোড় থেকে ফিরে এসেছে ফেলনা। একহাতে লাঠি, অন্যহাতে কেটলি। কেটলির নলটার মুখে একটা পলিথিন দিয়ে প্যাঁচানো কাগজের ছিপি। নইলে চলকে পড়ে যায় চা, ঠান্ডাও হয়ে যায় হাওয়া লেগে। কালাচাঁদ এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে কেটলিটা নিয়ে নেয়। কাঁধের পেটমোটা ঝোলা ব্যাগটা হাতে নিয়ে ফেলনা বলে, "তোমরা একটু বোসো, আমি মুড়িটা মেখে নিয়ি আসছি।"

কালাচাঁদের ঘরে গিয়ে একটা স্টিলের গামলার মধ্যে মুড়িটা ঢালে সে। তক্তপোশের উপরে বসে পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা কুচোয় ছুরি দিয়ে। তাকের উপর থেকে সরষের তেলের শিশিটা এনে খানিকটা তেল ঢেলে দেয় মুড়ির উপরে। কাগজের ঠোঙা থেকে আলুর চপ চারটে বের করে ভেঙে ছড়িয়ে দেয়। একটু নুনও ছড়ায়। তার পর যত্ন করে মাখে। এক মুঠো মুখে দিয়ে স্বাদটার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়। গোটা ছয়েক কাঁচালঙ্কা মুড়ির স্তূপের উপরে গেঁথে দিয়ে মুখে হাসি ফোটে তার। বাঁ হাতে মুড়ির গামলা আর ডান হাতটা ডান পায়ের হাঁটুর উপরে রেখে এগিয়ে যায় কা রপার্কিং-এর দিকে। এই সময়টা ওদের আড্ডায় শুধু তিন জন। ফেলনা, কালাচাঁদ আর ছোটন। মিনু বিকেলের দিকে আর নীচে নামে না। ঘরের কাজকর্ম থাকে, তাছাড়া পমপমকেও পাহারা দিতে হয়। মেনকা নামে সাড়ে চারটে নাগাদ। ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে আহির ও ইমনকে নিয়ে উপরে চলে যায়। বিচ্ছু সুযোগ পেলে পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য নেমে আসে। দু'-এক মুঠো মুড়ি খেয়েই ছুট লাগায়। মুখার্জিসাহেবের মাথার পিছনেও দুটো চোখ আছে। আর একখানা ডিশ অ্যান্টেনা লাগানো আছে চাঁদির উপরে। ওদের আড্ডার জন্য উপযুক্ত সময় এটা। আবাসিকরা যে যার ঘরে ফিরে রাতের খাবার তোড়জোড় করছেন আর টিভি দেখছেন। তিন তলার তাসের আসর থেকে কখনওসখনও কথা কাটাকাটি আর 'ট্রাম্প' দেওয়ার উল্লাস ভেসে আসছে। যেটা চলবে রাত দশটা পর্যন্ত।

তিন তলার প্রিয়ংবদা ফেরে সন্ধে ছ'টা নাগাদ। স্কুল ছুটির পরে কয়েকটা প্রাইভেট টিউশন থাকে তার। ছ'তলার পুনিত আর তার দাদা বিনীত ফেরে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। কলেজ স্ট্রিটে স্যানিটারিওয়্যারের ব্যবসা তাদের। মস্ত শোরুম। তবে বিকেল পাঁচটার পর থেকে দোকান সামলায় কর্মচারীরা। সন্ধের পরপরই ডিনার খায় তারা। তারপর পুনিত রাত জেগে কম্পিউটারে শেয়ারের কাজকর্ম করে। তবে তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা কিংবা বিনীতের বউ কখনওই নীচে নামে না। পালাপার্বণ কিংবা বিয়েশাদি থাকলে অন্য কথা। সরকাররা ব্যস্ত তাদের হোম ডেলিভারি নিয়ে। সরকার মশাই সকাল-বিকেল নামেন বাজার-হাটের জন্য। তবে তাঁদের ছেলে যে কী করে কেউ জানে না। নিয়ম করে বেরিয়ে যায় রাত এগারোটা নাগাদ। ফিরতে-ফিরতে ভোর। সাইলেন্সার ছাড়া মোটর বাইকের আওয়াজে সারা পাড়া কাঁপতে থাকে। চার তলার অয়নের বেশ দশটা-পাঁচটার ডিউটি। সকাল ন'টা নাগাদ বেরোয় আর ফেরে সন্ধে সাতটা নাগাদ। তবে কোনও-কোনও দিন শুচিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলে কিংবা রেস্তরাঁ গেলে ফিরতে দেরি হয়। আর উইকএন্ডে তো শুচি-ই এখানে চলে আসে। টেক অ্যাওয়ে থেকে খাবার অর্ডার করে। আর বাকি তিন জনের অদ্ভুত অফিসটাইম। কেউ দুপুর তিনটেয় বেরিয়ে ফেরে রাত তিনটেয়, কেউ রাত আটটায় বেরিয়ে ফেরে সকাল আটটায়। সারা পৃথিবীর সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে চলতে হয় তাদের। শরীর-ঘড়িও অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওই একই ছন্দে।

চারতলার পুনম ট্যান্ডনও দিনে দু'বার নিয়ম করে নীচে নামে। সকাল ন'টা নাগাদ দোতলার জিমে যায় সে। এগারোটা নাগাদ ঘরে ফেরে কেননা তার কাজের লোক নির্মলা আসে তখন। ঘণ্টা তিনেক ধরে ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করে রুটি-সব্জি বানায় নির্মলা। পুনমকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে বেলা দুটো নাগাদ ফিরে যায় সে। পুনম একটু বিশ্রাম করে, স্নান সেরে তৈরি হয়ে নেয়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ সেন্টার থেকে ড্রাইভার আসে। শহরের একটা নামজাদা ক্লাবে যায় সে তখন। ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা। তখন একটু টলোমলো অবস্থা থাকে তার। তবে সেই দৃশ্যের সাক্ষী শুধু কালাচাঁদ। প্রয়োজনে ধরে নিয়ে যেতে হয় তাকে, চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিতে হয়। কখনও-সখনও বিছানায় শুইয়েও দিতে হয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দু'-একটা চুমুও উপহার পায় সে ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে। তবে এ সব ছোট-ছোট স্মৃতি দিনের আলোয় ভুলে যায় পুনম। কালাচাঁদও তার মনের চোরাকুঠুরিতে মাটি চাপা দেয় তাদের। তবে অবসর সময়ে বসে স্মৃতি রোমন্থন করে পুলকিত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু সে দিবাস্বপ্নে পুনমম্যাডাম থাকেন না, তাঁর জায়গায় মেনকাকে স্থাপন করে কালাচাঁদ। পাঁচ তলার অমলা দাশগুপ্ত শয্যাশায়ী। তাই তাঁর নীচে নামার কোনও প্রশ্ন নেই। তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার আয়া বাসন্তীও

কখনও নীচে নামে না। যা প্রয়োজন তা মেটায় কালাচাঁদ। এমনই চুক্তি তার অর্চিষ্মানের সঙ্গে। মাসে পাঁচশো টাকা পায় সে এইসব ছুটকোছাটকা কাজগুলোর জন্য। আর ময়ূখ ও শর্মিষ্ঠা তো বেরিয়ে যায় সকাল আটটাতেই। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। তাই সন্ধে সাতটা থেকে ন'টা ওদের বাক্যালাপে আড়ি পাতবার অপেক্ষায় বসে থাকে না কেউ।

এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে ছোটন বলল, "কীরে কালা, বোনাসটোনাস পেলি?"

একটা কাঁচা লঙ্কায় কামড় বসিয়ে কালাচাঁদ বলল, "এখনই কী? মহালয়াটা কাটুক।"

"তুই তো তাও মহালয়ার পরই বোনাস পাস, আর আমাকে মুখার্জিসাহেব বোনাস দেন ষষ্ঠীর দিনে। বুড়োটা একেবারে হাড় কেপ্পন।"

ফেলনা বলে, "কেন, কিপটে বলতিছো কেন? বোনাসটা দেন তো তিনি তোমারে। এমন তো নয় যে দিচ্ছেনই না বা কম দিচ্ছেন। ক'দিন আগে-পরে বই তো নয়।"

"তুই চুপ কর তো ল্যাংড়া। বেজন্মা কোথাকার একটা। তুই কি বুজবি বোনাসের কথা? চাকরিবাকরি করেছিস কখনও? ভিক্ষে করেই তো জীবন কাটালি।"

এ সব কথায় দুঃখ পায় না ফেলনা। সে ভাবে এমন ব্যবহারই প্রাপ্য তার। তাই সে হেসে বলে, "তা ঠিকই বলেছ তুমি ছোটনদা। মুক্কু-সুক্কু মানুষ আমি, তার উপরে এক পা খোঁড়া, কে আর চাকরি দিবে আমারে বলো?"

কালাচাঁদের খারাপ লাগে। সে বলে, "খোঁড়া তো তুই নিজে থেকে হোসনি, ভগবান তোকে রোগ দিয়ে খোঁড়া করেছেন। তোর বাবা-মা থাকলে ঠিক পোলিওর ওষুধ খাওয়াত তোকে।"

ফেলনা ফ্যাকাসে হেসে বলে, "তা আর কী করা যাবে। রাস্তার কুকুরগুলোরে কি বাবা-মা দেখে?"

"তুই কি কুকুর?" রেগে যায় কালাচাঁদ।

"কুকুর না হলিও কুকুরের মতোই আর কী!" মুখের হাসিটা বজায় রেখে বলে ফেলনা।

"থামা তো তোর কুকুর-কেত্তন," ধমকে ওঠে ছোটন। নুন খাওয়া জোঁকের মতো কুঁকড়ে যায় ফেলনা। মনে রক্তক্ষরণ হলেও বুঝতে দেয় না ওদের।

চপের টুকরোগুলো খুঁটতে-খুঁটতে ছোটন বলল, "মেয়েটা কান্নাকাটি করছে পুজোর জামা কেনা হয়নি বলে। ওর বন্ধুদের সকলের নাকি কেনা হয়ে গেছে। বউও মুখ ভার করে রয়েছে। কোনদিক সামলাই বল তো?"

তার পর হঠাৎ করেই কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে ছোটন বলল, "তুই বোনাসের টাকা দিয়ে কী করিস রে কালা? মেনকাকে শাড়ি কিনে দিস?"

"ভাগ শালা," বলে বাঁ হাত দিয়ে ছোটনের পিঠে আলতো করে একটা চাপড় মারে কালাচাঁদ।

ছোটন দাঁত কেলিয়ে বলে, "শোন-শোন, আমি হলাম গিয়ে অভিজ্ঞ মানুষ, আমার কথা শোন। শাড়ির সঙ্গে একটা বডিসও কিনে দিস। মাপ জানিস তো মেনকার?"

হেসে গড়িয়ে পড়ে ফেলনা। বলে, "ছোটনদা, তুমি না বড্ড অসভ্য।"

"অসব্যতার কী দেখলি এতে? পুনম ম্যাডামকে দেখিস না পাতলা শাড়ির তলায় কেমন দু'খানা টসটসে বাতাবি লেবু নিয়ে ঘোরে? আমার না খুব ইচ্ছে করে একদিন কামড়ে দেখি টক না মিষ্টি।"

কালাচাঁদ ভাবে, আমার জায়গায় ছোটন থাকলে কবে পুনম ম্যাডামের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হত!

ফেলনা ভাবে, ইস, কখন যে নামেন ওই পুনম ম্যাডাম! আমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না কখনও। লেবু ফুলের গন্ধে ম ম করে ওঠে তার শরীর-মন। প্রাণবন্ত হয়ে মাথাচাড়া দেয় তার আপাত ঘুমিয়ে থাকা প্রত্যঙ্গটা। অপুষ্ট ডান পায়ের উপরে বাঁ পা-টা তুলে বসে সে।

চা-মুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। মুড়ির গামলা আর চায়ের কেটলিটা নিয়ে কালাচাঁদের বাথরুমে চলে যায় ফেলনা। সেগুলো মেজে-ঘষে সিমেন্টের তাকের উপরে উপুড় করে রাখে। তার পর কার পার্কিং-এ ফিরে আসে বিড়ির প্যাকেট, দেশলাই আর বাঁশিটা হাতে নিয়ে।

তিনজনেই মৌজ করে তিনটে বিড়ি ধরায়। কালাচাঁদ বলে, "তোর দেশলাইটা দে তো ফেলু, মশার ধূপ জ্বালাব। বড্ড মশা বেড়েছে আজকাল।"

বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে ছোটন। ফেলনা বলে, "হাসছ যে!"

"আসল কথাটা কী জানিস? ওসব মশা মারা তেল-ফেল ছড়িয়ে কিসসু হবে না। সব ছেলে মশাগুলোকে ধরে নাসবন্দি করে দিলে আর মশাই জন্মাবে না।"

"নাসবন্দি কী জিনিস গো ছোটনদা?" অবাক প্রশ্ন ফেলনার।

"তোর ওসব জেনে কাজ নেই, তোর কপালে কি আর বিয়ে-থা আছে? তবে কালার জেনে রাখা ভাল। মেনকাকেও বলে দিস। একটা-দুটো বাচ্চা হওয়ার পরেই হয় তুই নাসবন্দি করিয়ে নিস নয়তো মেনকাকে কপার টি পরিয়ে দিস। তার পর মজাই মজা। আমি তো বউটাকে কপার টি পরিয়ে দিয়েছি। মোজাফোজা পরতে আমার ভাল লাগে না।"

আর কোনও প্রশ্ন করে না ফেলনা। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। তবে এটুকু বোঝে যে এ সব আলোচনায় সে অপাঙক্তেয়। নীরবে বাঁশিটা হাতে তুলে নেয় সে। কৃষ্ণ ভজনের ধুন তোলে, "শাম তেরি বংশী পুকারে রাধা নাম, লোগ করে মীরা কো ইয়ুঁহি বদনাম ..."

ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে ফেলনার দু'গাল বেয়ে তার নিজেরই অজান্তে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে আছে সে।

ময়ূখ আর শর্মিষ্ঠা ফিরে এসেছে তাদের চেম্বার থেকে। ফেলনা বাঁশি বাজানো বন্ধ করে বিল্ডিংয়ের পিছনে কালাচাঁদের ঘরে চলে যায়। কালাচাঁদ এগিয়ে গিয়ে ময়ূখ ও শর্মিষ্ঠার হাতের ব্যাগগুলো নিয়ে নেয় নিজের হাতে। দেবু গাড়ির দরজাগুলো লক করে চাবিটা তুলে দেয় ময়ূখের হাতে। তার পর নিজের সাইকেলটার দিকে এগিয়ে যায়।

ছোটন মুখার্জিসাহেবের গাড়ির চাবিটা কালাচাঁদের হাতে দিয়ে বলে, "বিচ্ছুকে দিয়ে দিস চাবিটা। আমি আর উপরে যাচ্ছি না।"

কালাচাঁদের ঘরে গিয়ে নিজের লম্বা চুলটা যত্ন করে আঁচড়ায় ফেলনা। পরিপাটি করে বিনুনি বাঁধে। চোখে কাজল পরে। তার পর গাঁজার কল্কেটায় টান দিয়েই সে অন্য জগতে চলে যায়। বিছানায় শুয়ে গুনগুন করে, "পগ ঘুঁঙরু বাঁধ মীরা নাচি রে। ম্যাঁয় তো মেরে নারায়ণ কী আপহি হো গয়ে দাসী রে। পগ ঘুঁঙরু বাঁধ মীরা নাচি রে।"

তিন তলার তাসের আড্ডা ভেঙে গেছে। মিস্টার মুখার্জির বন্ধুরা ফিরে গেছেন যে যার বাড়িতে। পুনম ট্যান্ডনও ফিরে এসেছে ক্লাব থেকে। মেন গেটে তালা দিয়ে সিকিউরিটি লাইটগুলো চেক করল কালাচাঁদ। ফ্লাডলাইটটাও জ্বালিয়ে দিল। আপাতত রাত তিনটের আগে আর কেউ ঢুকবেনা। সরকারগিন্নির কাছ থেকে রাতের খাবারটা এনে হাত-মুখ ধুয়ে নিল কালাচাঁদ। সারা দিনের পরে থাকা প্যান্ট-শার্ট বদলে একটা চেককাটা বারমুডা আর গোল গলা গেঞ্জি পরে নিল। তার পর ঘুমন্ত ফেলনাকে ডাকাডাকি করতে লাগল, "অ্যাই ফেলু ওঠ, ভাত খাবি না? উঠে পড়, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

কিন্তু ফেলনার কোনও সাড় নেই। নেশার ঘোরে অচেতন সে।

## ৯

"এই টুসি, কোথায় গেলি তুই?" যেন একসঙ্গে তিনখানা কাঁসর বেজে উঠল।

শাশুড়ির বাজখাঁই গলার আওয়াজটা শুনে তিরতির করে কেঁপে উঠল মৌটুসির হালকা শরীরটা। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না সে। বিক্রমের বলিষ্ঠ উরু দু'খানির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। এ কাহিনি রোজকার। রোজই শেষরাত নাগাদ বাড়ি ফেরে বিক্রম নেশায় চুর হয়ে। তার পর ভোররাত পর্যন্ত চলে তার প্রলম্বিত রতিক্রিয়া। তাই 'দুই সখীর হেঁসেল'-এ রোজই মৌটুসি লেট কামার। কিন্তু সেকথা তার শাশুড়ি বুঝলে তো! ছেলে তো তাঁর কাছে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীপাতা। এদিকে মৌটুসি শ্যাম রাখে না কুল রাখে? বরের আদর খেতে কার না ভাল লাগে? ওই একটিই তো বিনোদন তার জীবনে। কিন্তু সে ব্যাপারে মানা করার উপায় নেই। নইলেই তো কিল-চড়-লাথি-ঘুষি জুটবে কপালে। কিল-চড় খাওয়ার চাইতে আদর খাওয়াটা যে ঢের সুখদায়ক সেকথা বিলক্ষণ জানে মৌটুসি। কিন্তু শাশুড়িকে কি সে কথা বলা যায়? অনেক কসরত করে বিক্রমের দু'পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল মৌটুসি। ঘর লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা কাচা নাইটি পরে নিল। বাসি কাপড়-জামা পরে শাশুড়ির হেঁসেলে ঢোকা মানা। দরজার ছিটকিনি খুলে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে আবার ফিরে এল মৌটুসি। একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল বেহুঁশ বিক্রমের শরীরটা। এখন বেলা বারোটা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে সে। বারোটা নাগাদ উঠে প্রথমে চা খাবে। তার পর স্নান করে, ভাত খেয়ে আবার ঘুমোবে। সারাটা দিন নিজের ঘরে শুয়ে-বসেই কাটিয়ে দেবে। ফোনে-ফোনেই জরুরি কথাবার্তা সেরে নেবে। তার পর রাতের খাবার খেয়ে এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়বে ডিউটিতে।

কাল রাতে একটু বেশিই আদর করেছে বিক্রম। মোবাইল ফোনে মৌটুসিকে নানারকম ছবি দেখিয়েছে। মৌটুসিও সমান তালে সঙ্গত করেছে তাই। খুশি হয়ে বিক্রম একটা ভারী সোনার হার দিয়েছে কাল মৌটুসিকে। তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে আছে সে। তবে সেকথা শাশুড়িকে বলা যাবে না। হারটা গলা থেকে খুলে আলমারির লকারে রেখে দিয়েছে মৌটুসি।

মৌটুসিকে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে গজগজ করতে লাগলেন সরকারগিন্নি, "বরের সোহাগ আমরা যেন খাইনি কোনওদিন ..."

শাশুড়িকে আর-একটু তাতিয়ে দেওয়ার জন্য মৌটুসি লাজুক মুখে বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল আজ মামণি। কী করবো বলো, তোমার ছেলে ছাড়তেই চায় না ..."

"হয়েছে, হয়েছে, আর আমার ছেলের দোহাই দিতে হবে না। তোর শরীরটা তো ঠান্ডা হয়েছে, এ বার মাথা ঠান্ডা করে কাজে লাগ। কত বেলা হয়েছে খেয়াল আছে? বারোটা বারো রকমের টিফিন ক্যারিয়ার সাজাতে হবে," তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন সরকারগিন্নি।

"তো? কালকের লাউঘন্ট আর পরশুদিনের ছোলার ডাল তো রয়েইছে। শুধু মাছটা বানাতে হবে," মৌটুসির সহজ সমাধান।

"অতই যদি সোজা হত একটা হোম ডেলিভারির ব্যবসা চালানো, তবে তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবাই করত এ কাজ।"

"কেন, আজ হঠাৎ কী এমন হল যে, এত কঠিন মনে হচ্ছে কাজটা? রোজই তো তুমি ইধার কা মাল উধার করে চালিয়ে দিচ্ছ।"

"আস্তে বল, দেওয়ালেরও কান আছে।"

"দেওয়ালের দরকার নেই, এর পরে তোমার খদ্দেররাই ঝামেলা করবে। ডিপ ফ্রিজে রাখা পনেরো দিনের বাসি তরকারি নতুন করে সম্বরা দিয়ে তাজা করছ। সেগুলো খেয়ে পেটখারাপ হল বলে।"

"তা তোর বরের পয়সা দিয়ে রোজ টাটকা বাজার করে দিলেই পারিস। বুড়ো শ্বশুরটার শুদুসুদু খেটে মরতে হয় না তা হলে।"

এ কথা শোনার পর আর কিছু বলার জো থাকে না মৌটুসির। বিক্রম যে একটি পয়সাও সংসার খরচের জন্য দেয় না সেকথা তার জানা। শ্বশুরের পেনশন আর শাশুড়ির পরিশ্রমে সংসার চলে। তাই মৌটুসিও শ্রম দান করে ঘাটতিটা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

শাশুড়ি-বৌমার বাগবিতণ্ডার মাঝখানেই সরকারমশাই বাজার থেকে ফিরে ব্যাগটা মৌটুসির হাতে দিয়ে বললেন, "বাজারে আগুন লেগেছে।"

সরকারগিন্নি চমকে উঠে বললেন, "কোন বাজারে আবার আগুন লাগল? জোড়ামন্দির না সুকান্তনগর?"

"সব বাজারে," ধাঁ করে গলার আওয়াজটা চড়ে গেল সরকার মশাইয়ের।

"মানে?"

"মানে তোমার হোম ডেলিভারির ব্যবসা এ বার লাটে উঠবে।"

"সকাল-সকাল এমন অলুক্ষুনে কথা বলছ কেন?"

"বাজারের লক্ষণ দেখে। একবার ফণির তাণ্ডবে বাজার চড়ল, সে ফণা গুটোতে না-গুটোতে চলে এল দুর্গা পুজোর তাণ্ডব। এখন সামলাও তার প্রলয়নাচন। পটল-ঝিঙে আশি টাকা কেজি, লাউ পঞ্চাশ টাকা কেজি, পেঁয়াজের কথা তো মুখেও এনো না..."

"মুখে আনব না মানে? পেঁয়াজ ছাড়া মাছের কালিয়া হয়? আনবে তো ওই অন্ত্রের গন্ধওয়ালা কাটাপোনা, পেঁয়াজ-রসুন না দিলে সে গন্ধ যায়?"

মৌটুসি ততক্ষণে বাজারের ব্যাগটা উপুড় করে দিয়েছে রান্নাঘরের মেঝেতে। কেজি

দুয়েক আলু, গোটা ছয়েক কাঁচাকলা আর আধখানা কুমড়োর সঙ্গে কাঁচালঙ্কাগুলো গড়াগড়ি যায় সেখানে। সরকারগিন্নি মুখ ঝামটে বলেন, "কোন পুরুতের সিধেয় দেব এগুলো? মাছ কোথায়?"

"আজ মাছ নেই বাজারে," গলার স্বর নামিয়ে বললেন সরকারমশাই।

"কেন, মাছওয়ালাদের কি কালাশৌচ চলছে?"

"উহুঁ, মাছওয়ালাদের নয়, তোমার ছেলের কালাশৌচ এল বলে।"

"আমার মৃত্যু কামনা করছ?"

"বালাই ষাট, তুমি কেন মরবে? মরবো আমি। দেড় হাজার টাকা কেজির ইলিশ মাছ কিনতে গেলে ফোরফর্টি ভোল্টের শক খেয়ে মরব আমি।"

"কেন, পুঁটি, তেলাপিয়া কিচ্ছু ছিল না?"

"বললাম তো, ছিল না।"

মৌটুসি তার ওড়নাটা কষে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে রেফারির ভূমিকায় নেমে পড়ে। বলে, "ব্যস, আর কোনও কথা না, আজ আমি রাঁধব।"

সরকারগিন্নি ঠোঁট উল্টিয়ে বলেন, "হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!"

মৌটুসি চোখ পাকিয়ে বলে, "একদম বাজে কথা বলবে না। তার চাইতে বঁটিটা পেতে আনাজ কাটতে বসে পড়ো। আর বাবা, তিনশো টাকা ঝাড়ো দিকি।"

সরকারমশাই চমকে উঠে বলেন, "কেন তিনশো টাকা দিয়ে কী করবে তুমি?"

"কালাদাকে দিয়ে মুরগির মাংস আনাব মোড় থেকে। হাড় ছাড়িয়ে ফিলে করে দিতে বলব। তার পর আমার নতুন কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ আভেনে গ্রিলড্ চিকেন বানাব।"

"ও মাগো, এ মেয়ে তো আমাদের ফতুর করে ছাড়বে গো। একটু ঝোল-ঝাল না থাকলে কি আয় হয়? পেঁয়াজ-আদা-রসুন-টমেটোর থকথকে ঝোল হবে, সঙ্গে বড়-বড় আলু থাকবে, তবে না মন ভরবে খদ্দেরদের।" সাফ জবাব সরকার গিন্নির। কড়ার বালি গরমই ছিল। ধান পড়তেই ফটফট করে ফুটতে লাগল খই, "হ্যাঁ, পেঁয়াজ দিয়ে থকথকে ঝোল হবে! শুনলে না, বাবা কী বলল? ঠিক আছে, আলু দিয়ে ঝোলই করে দেব। অল্প পেঁয়াজ দেব আর আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কা-ধনে পাতা বেটে দেব। উপর থেকে লেবুর রস আর গোটা কাঁচালঙ্কা। আঙুল চেটে খাবে তোমার খদ্দেররা।"

"হুঁ, আঙুল চেটে খাবে! ও তো রুগির পথ্যি রে! আমার ব্যবসা সত্যিই লাটে উঠবে এ বার।"

এ কথাগুলো কানে যায় না মৌটুসির। সে ততক্ষণে সরকারমশাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কালাচাঁদকে ফোন করছে।

আটটা থেকে ন'টা সময়টা কার পার্কিংয়ে একাই বসে থাকে কালাচাঁদ। মুখার্জিসাহেব মর্নিং ওয়াক শেষে ফিরে এসে উপরে চলে গেছেন। পমপম স্কুলে চলে গেছে। ডাক্তারবাবু ও শর্মিষ্ঠা ম্যাডামকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেছে ড্রাইভার দেবু। লাটু গাড়িগুলো ধুয়ে, চা খেয়ে চলে গেছে। এমনকি ফেলনাও ভিক্ষে করতে বেরিয়ে গেছে। এর পর ন'টা নাগাদ আসবে মুখার্জিসাহেবের ড্রাইভার ছোটন। তখন আর-এক প্রস্থ চা হবে।

প্রিয়ংবদার জমজ ছেলে আহির ও ইমনের আয়া মেনকা তাদের নিয়ে সাড়ে ন'টা নাগাদই নেমে আসে নীচে। আর পমপমদের কাজের মাসি মিনু নামে দশটা নাগাদ। সঙ্গে আনে বড় এক গ্লাস দুধ-চা আর কিছু টুকিটাকি খাবারদাবার। পমপমের পমেরানিয়ান কুকুর স্নোয়িও আসে তার সঙ্গে। বিশেষ করে কালাচাঁদের মনে থইথই করে আনন্দ। ঘণ্টাতিনেক ধরে প্রেম করে সে মেনকার সঙ্গে। মিনুমাসি আর ছোটন ওদের এই ভালবাসার কথাটা জানে বলে কোনও অসুবিধে হয় না। বাচ্চা দুটোও কুকুরটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিকেলেও এক বার নামে মেনকা। তবে মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য। মন ভরে না কালাচাঁদের। ফোনের পরদায় বিক্রমের নামটা ফুটে ওঠাতে তটস্থ হয় কালাচাঁদ। এই বিল্ডিংয়ের এই একটি মানুষকেই যমের মতো ভয় পায় সে। রাত এগারোটায় বেরিয়ে ফেরে তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ। সরকারবৌদি বলেন, পার্টির কাজ করে তাঁর ছেলে। দেশের জন্য, দশের জন্য খেটে খেটে প্রাণপাত করছে বেচারা। বেশি রাতে পার্টির গোপন মিটিংয়ে যায়, বিরোধী পক্ষের গুন্ডাদের কাবু করে। সে যখন মস্ত মোটর সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে যায়, পুরো পাড়াটা গমগম করে ওঠে। সাইলেন্সার ছাড়া মোটর সাইকেল চালানোতেই আনন্দ তার। তবে আর-একটা যন্ত্রও থাকে তার সঙ্গে। সেটাতে সাইলেন্সার লাগানো আছে কিনা জানে না কালাচাঁদ। তবে বেরোবার আগে পকেট থেকে বের করে খুটখাট করে, নলটাতে ফুঁ দিয়ে দেখে। তাই ফোনটা একবার বাজতেই কালাচাঁদ বলল, "হ্যাঁ দাদা, বলুন।"

"আমি দাদা না, বৌদি। কালাদা, আমার যে একটা জিনিস খুব দরকার, একটু বাজারে যেতে হবে।"

ফোনটা বিক্রমের হলেও কথা বলছে মৌটুসি, তাই কালাচাঁদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। সাহস করে বলে ফেলে, "বৌদি, আমি তো এখন একা আছি, তাই এক্ষুনি যেতে পারব না। ন'টা নাগাদ মুখার্জিসাহেবের ড্রাইভার ছোটন আসবে, তখন গেলে হবে তো?"

"হ্যাঁ কালাদা, তুমি সুবিধেমতো এসো, আমি ততক্ষণে অন্য কাজ সারি।"

মৌটুসির নির্দেশমতো ডুমো করে আলু আর কুমড়ো কেটে রেখেছেন সরকারগিন্নি। কিন্তু ছোলা তো ভেজানো নেই। আর কালো ছোলা ছাড়া কুমড়োর ছক্কা জাতে ওঠে না। তাই কাঁচকলার কোফতার জন্য আলু আর কাঁচাকলা সেদ্ধ করার সময় একমুঠো ছোলা পুঁটুলি বেঁধে প্রেশার কুকারে দিয়ে দিল মৌটুসি। পাঁচফোড়ন-শুকনো লঙ্কা-তেজপাতার সঙ্গে মশলাটা কষাচ্ছে যখন মৌটুসি, তখনই দরজার বেলটা বেজে উঠল। সরকারগিন্নির দুটো হাতই জোড়া, কাঁচাকলা আর আলু চটকে তার ভিতরে ভাজা মশলার গুঁড়ো আর বেসন দিয়ে মেখে নিয়ে কোফতা গড়ছেন তিনি। সরকারমশাই বাথরুমে আর বিক্রম ঘুমের দেশে। তাই মৌটুসি কুমড়োর টুকরোগুলো কড়াইয়ে ঢেলে দিয়েই ছুটল দরজা খুলতে। হ্যাঁ, কালাচাঁদই ফিরে এসেছে বাজার থেকে। তার হাতের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেটে রক্ত-মাংসের উপস্থিতি। কিন্তু আর-একটি জাগতিক উপাদানের উপস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলনা মৌটুসি। সংহারবিদ্যায় পারদর্শী উপাদানটি প্রথম নজরে এল কালাচাঁদেরই। মুহূর্তের মধ্যে মুরগির মাংসের প্যাকেটটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে মৌটুসিকে প্রাণপণে জাপটে ধরল সে। হতচকিত মৌটুসি উপলব্ধি করল তার শিফন জর্জেটের ওড়নাটার অবশেষটুকু খসে পড়ল তার কোমর থেকে। টেরিকটের নাইটিটাতেও খাবলা-খাবলা ফুটো। কালাচাঁদের হাতদুটো ঝলসে গেছে। তার প্যান্ট আর শার্টেও পোড়া দাগ।

সরকারগিন্নি রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী করছ কালা? কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললে নাকি?"

সরকারমশাই বেরিয়ে এসেছেন বাথরুম থেকে। ঠান্ডা মাথায় তিনি বললেন, "ওর কাণ্ডজ্ঞান আছে বলেই বৌমা আজ বেঁচে গেল। থ্যাঙ্ক ইউ কালাচাঁদ। একটু অপেক্ষা করো, আমি বার্নল নিয়ে আসছি। তোমার হাতের কিছু-কিছু জায়গায় ফোস্কা পড়েছে মনে হচ্ছে।"

মৌটুসি ঠকঠক করে কাঁপছে আর বলছে, "কালাদা, তুমি বোধহয় আগের জন্মে আমার নিজের দাদা ছিলে, নইলে অন্যকে বাঁচাতে এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ?"

কালাচাঁদ বোকা-বোকা মুখ করে হাসছে আর বলছে, "আমি কিচ্ছু করিনি বৌদি, আপনার কপালে বেঁচে যাওয়া ছিল তাই বেঁচে গেছেন। ভগবানই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এখানে।"

আবেগে জল এসে যায় মৌটুসির চোখে। সে বলে, "তোমার শার্ট-প্যান্ট দুটো পুড়ে গেছে, এগুলো আর পরবে না। আমি বিক্রমকে বলব পুজোর সময় তোমাকে এক জোড়া নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দিতে।"

এ কথার কোনও জবাব দেয় না কালাচাঁদ। তবে তার মনেও আবেগের ঢেউ ভাঙে ছলাৎ ছলাৎ। লিফ্‌টে চেপে নামতে-নামতে মনে হয়, এর চাইতে সুখের আর কী আছে জীবনে? এই বিল্ডিংয়ের মানুষগুলোর বিপদে-আপদে, দুঃখ-সুখে শামিল হতে পারাটাই যেন ভবিতব্য তার। নইলে আজ এই ঘটনাটা ঘটল কেন? কেনই বা আগুন ধরে গেল মৌটুসিবৌদির ওড়নায়, আর কেনই বা সে নিজে উপস্থিত ছিল সেখানে? ভগবানের লীলা ছাড়া আর কী বলা যায় একে? মৌটুসিবৌদি কেমন নিজের দাদা বলল তাকে! পুজোর সময় নতুন জামা-প্যান্ট কিনে দেবে বলল। তার মতো একজন অনাথের এর

চাইতে আর বেশি কিছু কি চাইবার আছে? নীচে নেমে কালাচাঁদ দেখে কারপার্কিং সরগরম হয়ে আছে। মেনকা তো আছেই আহির ও ইমনকে নিয়ে, মিনুও হাজির চায়ের গ্লাস ও কুচো নিমকিসহ। তবে তারা অপেক্ষা করছে কালাচাঁদের জন্য। এখনও চা ঢালা হয়নি, খোলা হয়নি নিমকির প্যাকেটও। সংঘবদ্ধ হয়ে থাকাটাই তাদের বন্ধুত্বের মূলমন্ত্র।

কালাচাঁদের পোড়া শার্ট-প্যান্ট আর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আঁতকে উঠল মিনু, "এই কালা, তোর কী হয়েছে রে?"

মেনকা ছুটে গিয়ে কালাচাঁদকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, "জ্যান্ত মানুষের গায়ে এমন করে আগুন দেয় কেউ? কোথায় গিয়েছিলে মরতে?"

ছোটন খুব চতুর মানুষ। সে কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছে। কিন্তু মেনকাকে খেপিয়ে দেওয়ার জন্য বলে, "তা আর কী করবে বল? তোর অপেক্ষায় আর কতদিন বসে থাকবে? তাই নিজেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্তহত্তা কত্তে গিয়েছিল বোধহয়।"

মেনকার আর-এক প্রস্থ কান্না সামলে, চা-নিমকি খেতে-খেতে সব কথা খুলে বলল কালাচাঁদ। মেনকার সামনে নিজের বীরত্ব ঘোষণা করতে গিয়ে বলল, "আজ আমি না থাকলে বিক্রমদার বৌটা পুড়ে মরেই যেত। ঠিক সময়ে জাপটে ধরেছিলাম বলে আগুনটা নিভে গেল। ভগবানই আমাকে পাঠিয়েছিলেন যেন ..."

ছোটন খিকখিক করে হাসতে-হাসতে বলল, "সত্যি রে কালা তোর মতো ভাগ্যবান লোক কমই আছে এ পিথিবিতে।"

"কেন, এ কথা বলছিস কেন?" চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কালাচাঁদ।

একটা চোখ টিপে ছোটন বলল, "রোজ রাতে পুনম ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরে ঘরে পৌঁছে দিস তুই। আজ আবার বিক্রমদার ডবকা বৌটাকে জড়িয়ে ধরে আগুন নেভালি তুই-ই। এদিকে আমার শরীরে যে আগুন জ্বলছে সেদিকে তাকিয়ে দেখেন না ভগবান।"

"তবে রে," বলে রামুর ঝাঁটাটা হাতে নিয়ে তেড়ে গেল কালাচাঁদ। আর হাহা-হিহি-হোহো শব্দে ভরপুর হয়ে উঠল কার পার্কিংটা।

## ১০

মাসে এক বার বাড়ি যায় কালাচাঁদ। দু'দিনের জন্য। বাড়ি মানে শক্তিগড়ের অনাথ আশ্রম। সেটাকেই বাড়ি বলে মনে করে সে। সেখানে যিনি সব দেখাশুনো করেন, তাঁকে বড়দা বলে ডাকে। তিন কুলে কেউ নেই। সেই ছোট্টবেলায় বাবা-মা মরে গেছে। ধানখেতে মুনিষ খাটতে গিয়ে একইসঙ্গে বাজ পড়েছিল তাদের দু'জনের উপরে। শক্তিগড়ের অনাথ আশ্রমটাতেই মানুষ হয়েছে কালাচাঁদ। সেখানকারই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে। তাই সেখানকার আবাসিক এবং আধিকারিকরাই তার আপন জন। তবে এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্ট্স-এর মানুষগুলোর সঙ্গেও একটা অদ্ভুত বন্ধন তৈরি হয়েছে তার। সবাইকেই কাছের মানুষ মনে হয়। দশটা বছরের সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে। আর ছোটন-লাট্টু-বিচ্ছু-মিনু-মেনকারা তো তার ইয়ার দোস্ত। দেবু আর রামুর সঙ্গে তেমন বনে না কালাচাঁদের। তবে দোস্তি না থাকলেও দুশমনি নেই। আর ফেলনার সঙ্গে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে তাকে কী নাম দেবে কালাচাঁদ? বন্ধুত্ব নাকি ভ্রাতৃত্ব? নাকি তারও উপরের কিছু? সে তো কালাচাঁদের কাছে নিজেকে নিবেদন করে বসে আছে। না, সে সমকামী নয়, তার ভালবাসা নিষ্কাম এবং নিঃস্বার্থ। যেমন মীরার ছিল কৃষ্ণের প্রতি, কৃষ্ণের ছিল সুদামার প্রতি, হনুমানের ছিল রামের প্রতি। কিন্তু ফেলনাকে কি তেমন কিছু দিয়েছে কালাচাঁদ? কোনও রকমের সুরক্ষা? তাকে কি কখনও বলেছে কালাচাঁদ যে, তার ভিক্ষে করার প্রয়োজন নেই। কালাচাঁদই তার দায়িত্ব নেবে, ভরণ-পোষণ দেবে। না বলেনি। কেননা কালাচাঁদ স্বপ্ন দেখে মেনকাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে। কিন্তু ফেলনা তো নিজেকে কালাচাঁদের সেবাদাস বানিয়ে রেখেছে। তার যাবতীয় কাজকর্ম করে দেয়, সে দু'মুঠো ভাত বেশি খেলে খুশিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে ফেলনার চোখ। রাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের প্রতিদান এতখানি? জানে না কালাচাঁদ।

মুখার্জিসাহেবকে তো বাবার স্থান দিয়েছে কালাচাঁদ। বকাবকি করেন ঠিকই উনি, তবে স্নেহও করেন খুব। খুব দরাজ মনের মানুষ, খোলামেলা স্বভাব। যা বলার সোজাসুজি বলেন, কারও পিছনে চুকলি করেন না। ছোটন অনেক নিন্দে করে ওঁর, কিন্তু কালাচাঁদ খুব শ্রদ্ধা করে মুখার্জিসাহেবকে। ম্যাডাম মারা যাওয়ার পর একটু ভেঙে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে এখন বন্ধুদের সঙ্গে তাসখেলায় মশগুল হয়ে থাকেন। মদ-টদও খান, তবে মাতলামি করেন না। আর ডাক্তারবাবুর মেয়ে পমপমদিদি তো তাঁর প্রাণ। এই বিল্ডিংয়ের সমস্ত দায় যেন তাঁর। সবাই তো সময়মতো সার্ভিস চার্জ দেননা, মুখার্জিসাহেবই নিজের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে বিলটিল মিটিয়ে দেন, মাইনেটাইনে দিয়ে দেন। নইলে কি আর এত সহজে চলত সবকিছু। তবে মুখার্জিসাহেব এমন কিছু দানসত্রও খুলে রাখেননি, সব পাওনাগন্ডা বুঝে নেন পুনিতভাইয়ার কাছে থেকে। পুনিতভাইয়াই তো হিসেবপত্র রাখেন এ বিল্ডিংয়ের। ডাক্তারবাবু মানুষটাকেও খুব ভাল লাগে কালাচাঁদের। তার চাইতেও বেশি ভাল লাগে শর্মিষ্ঠাম্যাডামকে। এ বিল্ডিংয়ের সকলের অসুখবিসুখের খেয়াল রাখেন তাঁরা। বিনে পয়সায় ওষুধপত্র দেন, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু বিল্ডিংয়ের অন্য কোনও ব্যাপারে নিজেদের জড়ান না। সময়-ই বা কোথায় ওঁদের? তাই তো পমপমদিদির সমস্ত দায়িত্ব মিনুমাসির। তবে কালাচাঁদও স্বেচ্ছায় তার সুরক্ষার ভার তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। পুনমম্যাডামের জন্য অপেক্ষা করছে কালাচাঁদ। ডাক্তারবাবু ও শর্মিষ্ঠাম্যাডাম ফিরে এসেছেন, চার তলার অয়নদাদাও ফিরে এসেছে। মুখার্জিসাহেবের বন্ধুরা বাড়ি ফিরে গেছেন। পুনিতভাইয়া তো সন্ধের আগেই ফিরে আসেন। প্রিয়াম্যাডামও কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টায় ঢুকে পড়েন। এখন বিক্রমদা বেরোবে রাত এগারোটা নাগাদ আর ওই সময়েই পুনমম্যাডামও ফিরে আসবেন। তাই অপেক্ষা করছে কালাচাঁদ আর নানা কথা ভাবছে। ফেলনা গাঁজায় দম দিয়ে স্বপ্নের জগতে আছে এখন। আজকাল প্রায়ই রাতের খাবার খায় না সে। সন্ধেবেলার চপ-মুড়িই তার রাতের খাবার হয়ে গেছে।

পুনমম্যাডামের জন্য কষ্ট হয় কালাচাঁদের। এত সুন্দর দেখতে, অথচ বিয়ে করেও সুখ পেলেন না তেমন। রোহিতস্যার আগে নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন বাড়ি আসতেন। এখন তো মাসে একদিনও আসেন কি না সন্দেহ। একদিন নেশার ঘোরে কালাচাঁদকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলেন পুনমম্যাডাম। বলেছিলেন, রোহিতস্যার নাকি নানা দেশের এয়ারহোস্টেসদের সঙ্গে হোটেলে-হোটেলে রাত কাটান। তবে পুনমম্যাডাম কেন সতী-সাবিত্রী হয়ে থাকবেন? কালাচাঁদ তো তাঁর ঘরে রাতে থাকতেই পারে। এই কথাটা শিল-নোড়া দিয়ে ছেঁচে-ছেঁচে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে কালাচাঁদ। ছোটন জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে। আর মেনকার কানে গেলে তো তাদের সম্পর্কের ইতি হয়ে যাবে।

পুনমম্যাডামের লম্বা আয়ু। তাঁর কথা ভাবতে না-ভাবতেই তাঁর গাড়ি এসে হাজির। কালাচাঁদও তৎপর হয়। তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রায় কোলে করে নিয়ে যেতে হবে চার তলায়। তবে নীচে নামতে না-নামতেই ছ'তলার বিক্রমদাও নেমে এল। পকেট থেকে যন্ত্রটা বের করে দুটো ফুঁ দিল। কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তার পর সশব্দে বেরিয়ে গেল মোটর সাইকেলটা নিয়ে। কালাচাঁদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নিজের ঘরে গিয়ে ঠান্ডা কড়কড়ে ভাত-তরকারি গোগ্রাসে গিলে, ঢকঢক করে জল খেয়ে শুয়ে পড়ল সে। আবার রাত তিনটে থেকেই শুরু হয়ে যাবে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি।

পুনিতের সঙ্গে একটা গুপ্ত লেনদেন আছে কালাচাঁদের। ফেলনা ছাড়া আর কেউ জানে না কথাটা। পুনিত যেহেতু শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার তাই পুনিতের মাধ্যমে শেয়ারে টাকা খাটায় কালাচাঁদ। তেমন জ্যাকপট না পেলেও ভালই লাভ হয়। হাজার পাঁচেক টাকা মাইনে পায় সে। যদিও এই মাগ্গি-গন্ডার বাজারে নগণ্য সে টাকা। কিন্তু অনেক অনুনয়-বিনয় করেও কিছু ফল হয়নি। কাজটা ছেড়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে কয়েক বার কালাচাঁদ। কিন্তু কানেই তোলেন না কেউ। তবে কালাচাঁদও কি পারবে এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্ট্স ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে? সম্ভবত না। এক তো মেনকা আছে এখানে, তার উপরে ফেলনাও আছে। ওদের ছেড়ে কোথায় যাবে কালাচাঁদ? আর এই বিল্ডিংয়ের মানুষগুলোই

কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? আত্মতুষ্টির অনুভূতিটা এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তোলে কালাচাঁদের ঠোঁটের কোনায়।

তাই সে মানিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। এক হাজার টাকা রাখে নিজের হাতখরচার জন্য। থাকা-খাওয়ার খরচা বিশেষ কিছুই নেই। ঘর-বাথরুম আছে। দু'বেলার ডাল-ভাত-তরকারি পায় সরকারবৌদির কাছ থেকে। ফেলনাকে থাকতে দিয়েছে বলে সে-ও খাবার পিছনে অনেকটা খরচা করে। আর চায়ের টাকা তো কমন ফান্ড থেকে আসে। বাকি চার হাজারের মধ্যে এক হাজার টাকা সে দান করে শক্তিগড়ের অনাথ আশ্রমটায়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। ছোট্টবেলা থেকে তাকে খাইয়ে-পরিয়ে, পড়াশুনো করিয়ে মানুষ করেছে তো ওই অনাথ আশ্রম-ই। তবে শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, কালাচাঁদের দূরদৃষ্টিও তাকে দিয়ে এই দানটা করিয়ে নেয়। আজ যদি তার চাকরি না থাকে কিংবা কোনও বিপদ-আপদ হয়, তবে সে যাবে কোথায়? সে জানে একবার বড়দার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি বুকে টেনে নেবেনই।

প্রতি মাসে দু'হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রাখে কালাচাঁদ। রেকারিং ডিপোজ়িটে। সুদ বেশি পায় না ঠিকই, তবে জমে থাকে টাকাটা। ভবিষ্যতে মেনকার সঙ্গে ঘর বাঁধার ইচ্ছে তার। দু'জনে মিলে রোজগার করে দিব্যি চালিয়ে নেবে। তাই বাকি হাজার খানেক টাকা নিয়ে ফাটকাবাজি করে সে।

ফেলনা জানে কথাটা। সে কালাচাঁদকে বলে, "কী দরকার ওসব করার? ভগবান আমাদের সকলের জন্যিই কিছু না-কিছু লিখে রেখেছেন। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতি হয়। এই দ্যাকো না, আমার বাপ-মায়ের ঠিক-ঠিকানা নাই। একটা জারজ সন্তান। আমারে তো খালের জলে ভাসায়ে দিতে পারতো আমার মা, বলো? অথচ তা না করে ফুটপাথে রেখে দিয়ি গেল। দিব্যি বেঁচে গেলাম আমি। ফুটপাতের মানুষগুলা কেউ দুধ খাওয়াল, কেউ গু-মুত পরিষ্কার করল। আমার মায়ের সমাজের ভয় ছিল, কিন্তু তাদের তো সে ভয় ছিল না। তাই তারা বাঁচায়ে তুলল আমারে। কেমন খেয়ি-পরি বেঁচে আছি বলো তো? আর আমারে দেখাশুনার জন্য তোমারে পাঠায়ে দিয়িছেন ভগবান। এইটাই আমার নিয়তি," কথাগুলো বলে একগাল হাসে ফেলনা। কিন্তু ফেলনার দর্শন আর কালাচাঁদের দর্শন আলাদা। কালাচাঁদ বিয়ে করে সংসার করতে চায়। একটা সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে সে। আর তার জন্য চাই টাকা। সাধে কি পাঁচ তলার অমলা দাশগুপ্তের সব কাজ করে দেয়? প্রতি মাসে অর্চিষ্মান ওকে পাঁচশো টাকা দেয়। আয়া বাসন্তীই সে সব হিসেব রাখে। তিন তলার প্রিয়ংবদার বাজার-হাট করে দেয় বলে তার কাছ থেকেও কিছু পায়। মুখার্জিসাহেব যে কী করেন আর না-করেন, তার কোনও হিসেব নেই। মোবাইল ফোনের বিল তো দেনই, কিছু কিনতে দিলে খুচরোও ফেরত নেন না। তবে সবচাইতে মুক্তহস্ত হচ্ছে চারতলার পুনম ট্যান্ডন। প্রতি রাতেই কিছু না-কিছু দেয় সে। কখনও একশো, কখনও পাঁচশো। তাকিয়েও দেখে না কত দিল। আসলে দেখার মতো অবস্থায় থাকে না। এ সব কথা আর কেউ জানে না। জানলেই ছোটন বলবে, "তোর তো ডবল লাভ। বাতাবি লেবুও খাচ্ছিস, টাকাও কামাচ্ছিস।"

আজই বোনাস পেয়েছে কালাচাঁদ। তাই কাল ভোরের ট্রেনেই শক্তিগড়ে যাবে। আরও হাজার খানেক টাকা দিয়ে আসবে বড়দাকে। যদিও অত ছেলের জন্য এ অনুদান নস্যি। তবুও বিন্দু-বিন্দু করেই তো সিন্ধু তৈরি হয়। আরও অনেক মানুষ দান করেন সেখানে। সব মিলিয়ে সকলের জন্যই নতুন কাপড়-জামা হয়ে যায়। কালাচাঁদও ছোটবেলায় নতুন জামা-প্যান্ট পেয়েছে পুজোর সময়। তবে কে দিতেন জানে না সে। বড়দা বলতেন, ভগবানের দূত এসে নাকি দিয়ে গেছেন।

প্রতি মাসে দু'হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রাখে কালাচাঁদ। রেকারিং ডিপোজ়িটে। সুদ বেশি পায় না ঠিকই, তবে জমে থাকে টাকাটা। ভবিষ্যতে মেনকার সঙ্গে ঘর বাঁধার ইচ্ছে তার।

এখন বোঝে কালাচাঁদ যে ভগবানের দূত বলে কিছু হয় না। মানুষই দূতের রূপ ধরে দিয়ে যেতেন। শক্তিগড় থেকে ফেরার পথে ধর্মতলায় একটু নামবে কালাচাঁদ। নিজের জন্য দুটো টি শার্ট কিনবে, প্যান্ট যা আছে তাতেই চলে যাবে। তা ছাড়া বিক্রমদার বউ তো বলেইছে যে একজোড়া শার্ট-প্যান্ট কিনে দেবে পুজোর সময়। যদিও এরা সব 'কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরোলে পাজি', তবুও ও বাড়ির বউটার একটু মায়া-দয়া আছে। বর বা শাশুড়ির মতো নয়। ধর্মতলায় নামার অবশ্য আরও দুটো কারণ আছে। ফেলনার জন্য একটা বারমুডা প্যান্ট আর একটা গোলগলা গেঞ্জি কিনবে। ওর তো বোনাসটোনাস নেই, বাপ-মা-ভাই-বোনও নেই, কে দেবে ওকে পুজোর জামা? তা ছাড়া মেনকার জন্যও কিছু কিনতে হবে। এমন জিনিস যেটা মাপ ছাড়াও কেনা যায়। বডিস-টডিস কিনতে পারবে না কালাচাঁদ। তিন-চারশো টাকার মধ্যে একটা শাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

নানা কথা ভাবতে-ভাবতে সদর দরজায় তালা দিল কালাচাঁদ। সিকিউরিটি লাইটগুলো চেক করে ফ্লাডলাইটটাও জ্বালিয়ে দিল। রাতের খাবার খেয়ে ফেলনার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফেলনা তার বাঁ পা-টা দিয়ে কালাচাঁদকে আঁকড়ে ধরে বলল, "শক্তিগড় থেকে আমার জন্যি ক'টা ল্যাংচা এনো কালাদা। বড় ভাল লাগে খেতি।"

কালাচাঁদ বলে, "আনব-আনব। সকলের জন্যই আনব," তার পর হঠাৎ করেই ফেলনার তোবড়ানো গালদুটো টিপে সে বলে, "ল্যাংড়ার খুব ল্যাংচা খাবার শখ হয়েছে দেখছি!"

কালাচাঁদের এই অভিব্যক্তিতে ফেলনার বুকের ভিতরে কিছু যেন গলতে থাকে। তার পরিতৃপ্তির পাত্রখানি ভরে ওঠে কানায়-কানায়। কালাচাঁদের মুখের 'ল্যাংড়া' ডাকটাও যেন কানে মধু ঢালে তার। এ ডাকে তার অঙ্গবৈকল্যের প্রতি লাল কালির আঁচড় নেই। আছে ভালবাসার উত্তাপ।

ঘরের পাশের গলি থেকে কাচের জানলা গলে আলো এসে পড়েছে ফেলনার মুখে। সামনের উঁচু দাঁত চারটে দিয়ে ঝোল টেনে, আকর্ণ হেসে সে বলে, "তো? ল্যাংড়া বলে কি কোনও শখ-আল্লাদ থাকতি নাই?"

চিংড়িঘাটা থেকে ভোর পাঁচটায় রওনা হয়ে পৌনে ছ'টাতেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল কালাচাঁদ। শক্তিগড়ের টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল বর্ধমানগামী তিন-তিনটে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছাড়বে সকাল ছ'টা পাঁচ মিনিটে, অন্য দুটো ছ'টা দশ আর পনেরো মিনিটে। ছ'টা পাঁচ আর ছ'টা পনেরোর ট্রেন দুটো এক্সপ্রেস ট্রেন, তাই কোনও লাভ নেই কালাচাঁদের। শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল হয়ে সেই বর্ধমানে গিয়ে থামবে, শক্তিগড়ে স্টপ নেই। তাই গুটি-গুটি পায়ে ছ'টা দশের বর্ধমান লোকালে গিয়ে বসল সে। সকাল আটটা নাগাদই পৌঁছে যাবে শক্তিগড়ে।

লেবু-লজেন্সওয়ালাকে দেখেই কালাচাঁদের মনে হল, মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। দু'প্যাকেট লেবু আর কমলালেবু লজেন্স আনবে ভেবেছিল অনাথ আশ্রমের ছেলেগুলোর জন্য। কিন্তু ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এর সাহেব-মেমসাহেবদের ফরমায়েশের ঠেলায় নিজের কাজগুলো আর মনে রাখতে পারে না সে। এই লেবু-লজেন্সওয়ালার বয়ামে আর ক'টা লজেন্স আছে! ওর তো চাই শ'দুয়েক লজেন্স। যাক গে, শক্তিগড় স্টেশনের আশপাশের দোকান থেকে কিছু কিনে নেবে নয়তো।

স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে সাড়ে আটটা নাগাদই আশ্রমে পৌঁছে গেল কালাচাঁদ। খাবার ঘরটা থেকে হইহল্লা ভেসে আসছে। তার মানে ক্লাসে যাওয়ার আগে সকালের

জলখাবার খাচ্ছে সবাই। কালাচাঁদকে দেখেই ছেলেগুলো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "কী এনেছ কালাদা?"

কালাচাঁদ মনে-মনে নিজের পিঠ চাপড়ায়। ভাগ্যিস স্টেশনের কাছের দোকানটা থেকে গোটা পনেরো ছোট-ছোট কেক-এর প্যাকেট কিনে এনেছে। ছোটবেলায় এই কেকগুলো খেতে খুব ভাল লাগতো কালাচাঁদের। হলুদ রঙের ছোট- ছোট স্লাইসের মাঝে লাল টুকটুকে নকল চেরির টুকরো। তাই সে হাতের মস্ত ক্যারিব্যাগটা তুলে ধরে বলল, "আছে-আছে, ভাল জিনিস আছে। তবে এখন পাবি না, বিকেলের চায়ের সঙ্গে দিয়ে দেবে দিদিরা। এখন ক্লাসে যা, মন দিয়ে পড়া কর।"

ছেলেগুলো হইহই করে ক্লাসরুমের দিকে চলে যেতেই বড়দার ঘরে গেল কালাচাঁদ। তাঁকে প্রণাম করে দুটো পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বলল, "পুজোর খরচা দিতে এলাম বড়দা। খুবই সামান্য, তবুও ..."

তাকে থামিয়ে দিয়ে বড়দা বললেন, "এই সামান্যটুকুই ক'জন দেয় রে কালা। আজকাল মানুষ বড় স্বার্থপর হয়ে গেছে। নিজেরা ফুর্তি করে টাকা ওড়াবে, বিদেশে বেড়াতে যাবে, কিন্তু গরিবদের জন্য দান দেবে না।"

তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "অনাথ কি আর ইচ্ছে করে হয় মানুষ? ভাগ্যই তাদের অনাথ করে দেয়। শুনেছি বিদেশে অনাথদের জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধে আছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের সেদিকে কোনও নজর নেই। নেতারা সব নিজের-নিজের চেয়ার সামলাতেই ব্যস্ত।" দেশের সরকারের কথা বা নেতাদের কথা অতশত জানে না কালাচাঁদ। ভোট দিতে হয়, তাই পছন্দসই কাউকে দিয়ে দেয়। তার পৃথিবী আবর্তিত হয় ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টসকে ঘিরেই।

## ১১

পুজো-কালীপুজো কেটে গেছে। দিন ছোট হয়ে আসছে। পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটাতেই সূর্যাস্ত হয়ে যাচ্ছে। রাতের হাওয়াতেও হিমের পরশ। মাঙ্কি ক্যাপ না বেরোলেও মাফলারগুলো বেড়িয়ে এসেছে ন্যাপথ্যালিনের গন্ধ মেখে। শীত এসে গেল কলকাতায়। অগ্রহায়ণের শেষ। শহরতলির আকাশে-বাতাসে সানাইয়ের সুর। বিয়ের মরশুম চলছে। আজ তাসের আসর বসেনি আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে। আজ তিনি এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়েতে যাবেন ব্যারাকপুর। ফিরতে রাত হবে।

তসরের লাল টুকটুকে ধাক্কাপাড় ধুতি আর সাদা গরদের পাঞ্জাবি পরেছেন আজ আদিনাথ। পায়ে জরির ফুল-তোলা নাগরা। কার পার্কিংটায় পায়চারি করছেন তিনি। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে কালাচাঁদ। তার মনে হচ্ছে যেন রাজবেশ পরে রাজামশাই চলেছেন তাঁর রাজত্ব পরিদর্শনে। সাইকেলের ঘন্টির টিং টিং আওয়াজ শুনে কালাচাঁদ এগিয়ে গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিল। হ্যাঁ, ছোটন এসে গেছে। সাদা ধপধপে প্যান্টের উপরে ইস্তিরি করা গাঢ় কমলা রঙের ফুল শার্টটা দেখে কালাচাঁদ ফিসফিস করে বলল, "টিকেয় আগুন লাগিয়েছিস দেখি আজ।"

মুখার্জিসাহেবের কান বাঁচিয়ে একটা চার অক্ষর ঝাড়ল ছোটন। তার পর বলল, "আজ ছেড়ে দিলাম, কাল জবাব পাবি শালা।"

আদিনাথ গলা চড়িয়ে বললেন, "এত দেরি করে বিয়েবাড়িতে গেলে তো পাত কুড়োতে হবেরে।"

সাইকেলটা রাখতে রাখতে ছোটন বলল, "আপনিই তো বললেন, ভাল কাপড়-জামা পরে আসতে।"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাই বলে সিনেমার হিরো সেজে আসতে তো বলিনি।"

কথাটা ব্যঙ্গাত্মক হলেও 'হিরো' শব্দটা শুনে ডগমগিয়ে উঠল ছোটনের মন। দৌড়ে গিয়ে গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল বশংবদ দাসের মতো।

মুখার্জিসাহেবের গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই বিচ্ছু নেমে এল কারপার্কিংয়ে। এখন তিন-চার ঘণ্টার জন্য মুক্ত বিহঙ্গ সে। রোজ ওই চিকেন পকোড়া ভাজতে আর কাঁহাতক ভাল লাগে?

ফেলনা গেছে মুড়ি আর তেলেভাজা আনতে। কালাচাঁদ বলল, "মুড়ি খাবি বিচ্ছু?"

"হাঁ, খায়েঙ্গে," উৎসাহিত হয়ে বলল বিচ্ছু। যেন এক অমৃতের সন্ধান দিয়েছে কালাচাঁদ। ঘরের গরুকে যতই সুস্বাদু জাবনা দেওয়া হোক না কেন, তার যে চরে খাওয়াতেই আনন্দ। তারপর কী ভেবে বিচ্ছু বলল, "ম্যাঁয় চায় বানাকে লাতা হুঁ। জাদা দুধ অওর চিনি ডালকে।"

কালাচাঁদ একটু মনমরা হয়ে বলল, "ইস, ছোটন থাকলে ভাল হত। বেশি দুধ-চিনির চা ভারী পছন্দ ওর।"

বিচ্ছু রেগে গিয়ে বলল, "ছোড়ো উসকি বাত। উও আভি সাহাবকে সাথ ব্যায়ঠকে বিরিয়ানি খায়গা।"

কালাচাঁদ বুঝতে পারে না বিচ্ছুর আপত্তিটা কোথায়। বিরিয়ানি খাওয়ায় নাকি সাহেবের সঙ্গে বসায়। কেননা ছোটনের কাছে শুনেছে কালাচাঁদ যে নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে মুখার্জিসাহেব তাকে পাশে বসিয়ে খাওয়ান।

যত ক্ষণে মুড়ি-চপ এনে মেখে নিয়ে এল ফেলনা, তত ক্ষণে বিচ্ছুও হাজির একটা মস্ত বড় স্টিলের ফ্লাস্ক নিয়ে। কালাচাঁদ ও ফেলনার দু'জোড়া চোখ চকচক করে উঠল তাই দেখে। একে তো বেশি দুধ-চিনি, তার উপরে পরিমাণে বেশি। আর সকলের উপরে হল ওই চকচকে, সুদৃশ্য ফ্লাস্কটা।

"তুই খুব ভাগ্যবান রে বিচ্ছু," এক চুমুক চা খেয়ে বলল কালাচাঁদ।

বিচ্ছু মুড়ি চিবোতে-চিবোতে বলল, "কিঁউ, অ্যায়সা কিঁউ বোলা?"

"আরে, কত দামি-দামি জিনিসপত্র ব্যবহার করিস তুই।"

"তো? উও তো সব সাহাবকে হ্যায়।"

"তবুও।"

"তব ভি কেয়া? ম্যাঁয় তো সাহাবকে নওকর।"

মুড়ি খেতে-খেতেই গুনগুন করে ওঠে ফেলনা, "শ্যাম ম্যায়নে চাকর রাখো জি, গিরিধারী লালা চাকর রাখো জি..."

ফেলনার গান শুনে হোহো করে হেসে ওঠে বিচ্ছু। বলে, "মুখার্জিসাহাবকা নওকর বনেগা তু? নাক মে দম করকে রাখেঙ্গে তুঝে।"

ফেলনা বলে, "কেন, এ কথা বলতিছ কেন? তোমারে কত ভালবাসেন মুখার্জিসাহেব। কত ভাল-ভাল খাবার খেতি দেন, কত সুন্দর সুন্দর জামা-প্যান্ট কিনি দেন।"

"অ্যায়সা লাগতা হ্যায় তেরা?"

"নয়তো কী?"

"মাগনা দেতে হ্যাঁয় কেয়া? গাধা য্যায়সা কাম করতা হুঁ।"

"মাগনা?"

চমকে ওঠে বিচ্ছু। যতটা সাদাসিধে মনে হয় ল্যাংড়াকে, ততটা নয়তো? তবে বিচ্ছুও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়, সে বলে, "অওর তু তো মোড় পে যা কর মাংতা হ্যায় ..."

কালাচাঁদ তটস্থ হয়। এই বুঝি লেগে গেল চুলোচুলি! তাই সে প্রসঙ্গটা বদলে দেয়। বলে, "অ্যাই বিচ্ছু, তুই ছট পুজোয় বাড়িতে গেলি না?"

কালাচাঁদের প্রশ্নটা শুনে মনমরা হয়ে পড়ে বিচ্ছু। ডান হাতের মুঠোয় মুড়িটা নিয়ে বসে থাকে। কালাচাঁদ বিচ্ছুর পিঠে হাত ঠেকিয়ে বলে, "কীরে, বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছে?"

চোখভরা জল নিয়ে বিচ্ছু বলে, "হাঁ।"

কালাচাঁদ একটা চপের টুকরো বিচ্ছুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, "থালে গেলি না কেন বাড়িতে?"

এ বার গলাটা চড়ে যায় বিচ্ছুর। ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বেশ কিছু মুড়ির দানা।

"সাহাব যানে নেহি দিয়া।"

"কেন?"

"অওর কেয়া? ম্যাঁয় চলা যানে সে কৌন বানায়গা চিক্কন পকোড়া?"

কালাচাঁদ বড় দাদার মতো বিচ্ছুর মন ভোলায়। বলে, "নারে, তা নয়। মুখার্জিসাহেব আসলে তোকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসেন তো, তাই তোকে ছাড়া থাকতে পারেন না।"

কালাচাঁদের মোসাহেবিতে আরও রেগে যায় বিচ্ছু। বলে, "নওকর কভি বেটা নেহি হোতা। ইয়ে মিঠি-মিঠি বাঁতে সির্ফ কাম করানে কা মতলব।"

কালাচাঁদ প্রমাদ গোনে। ভবি তো ভোলার নয় মোটেই। তাই সে প্রসঙ্গান্তরে যায়। বলে, "অ্যাই বিচ্ছু, তুই ঠেকুয়া বানাতে পারিস? একদিন বানা না।"

ফেলনা এতক্ষণ চুপ করে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। বিচ্ছুর বলা কথাগুলো ভাল লাগেনি তার। যাক গে, ও নিজেও তো দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে। সোজাসুজি বলে দিয়েছে, যে কাজগুলো সে করে তার জন্য মাইনে পায়।

মাগনা করে না।

পরিবেশটা সহজ করার জন্য ফেলনা বলল, "হ্যাঁ বিচ্ছু ভাই, একদিন বানাও না ঠেকুয়া। খুব ভাল লাগে খেতি।"

ফেলনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বিচ্ছু দাঁত ছড়িয়ে হেসে বলল, "তেরা তো সব কুছই আচ্ছা লাগতা হ্যায়। লালচি কাঁহি কা!"

তার পর সহজ গলায় বলল, "ঠিক হ্যায়, বানায়েঙ্গে একদিন। সাহাবকো ভি আচ্ছা লাগতা হ্যায় ঠেকুয়া। লেকিন লিট্টি অওর চোখা নেহি বানা সাকতা ম্যাঁয়।"

"সেটা আবার কী জিনিস?" একসঙ্গে বলে উঠল কালাচাঁদ আর ফেলনা। কার পার্কিং-এর অল্প আলোয় চকচক করে উঠল দু'জোড়া চোখ।

"হ্যায় এক বঢ়িয়া চিজ়। আটা মে সাত্তু অওর মশালা ডালকে বানাতে হ্যায়। কচৌরি য্যায়সা। লেকিন তেল মে ফেরাই নেহি করতা। চুলাকে আগমে পাকাতে হ্যাঁয়। ধীরে-ধীরে।"

"তুই পারিস বানাতে?" উদগ্রীব কালাচাঁদ।

"নেহি, মেরে কো নেহি আতা। মেরি মা বানাতি হ্যাঁয়। বহুত ..."

ওদের কথার মাঝখানেই এক বিকট আওয়াজ। সঙ্গে এক পুরুষকণ্ঠের আর্ত চিৎকার। মুড়ির গামলাটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ওরা তিনজনেই।

তিন তলা থেকে মেনকা চেঁচিয়ে ওঠে, "কী হয়েছে গো কালাদা? এত আওয়াজ কিসের? তোমরা ঠিক আছ তো?"

পাঁচতলা থেকে স্নোয়ি তার সরু গলায় ভৌ ভৌ করে চলেছে ক্রমাগত। ছ'তলা থেকে পুনিত বলল, "কেয়া হুয়া কালাচান্দ? ম্যাঁয় আউ কেয়া নীচে?"

কিন্তু কালাচাঁদ, ফেলনা বা বিচ্ছু কেউই কোনও জবাব দেওয়ার অবস্থায় নেই। পুরো বাড়িটার সব ক'টা আলো জ্বলে উঠেছে। মায় ফ্লাডলাইটগুলোও। যেন দেওয়ালি আজ।

শব্দটার উৎস অনুসরণ করে ওরা তিনজনেই বিল্ডিংটার পিছন দিকে কালাচাঁদের বাথরুমটার কাছে গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখল ফুট চারেক উঁচু কংক্রিটের ওয়াটার ট্যাঙ্কটার উপরে আলো-আঁধারিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। তার ক্ষত-বিক্ষত শরীর থেকে নেমেছে অসংখ্য রক্তধারা। গড়িয়ে পড়ছে ট্যাঙ্কের দেওয়াল বেয়ে। ওরা ভয় পায়। দেহটাকে শনাক্ত করতে গেলে তাকে উল্টে দেওয়া প্রয়োজন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আছে কিনা দেখতে গেলেও ছুঁতে হবে। কিন্তু পুলিশ যদি ওদের হাতের ছাপ পেয়ে যায়! অমনিতেই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে হামেশাই। ফেলনাই সকলের আগে এগিয়ে যায়। কালাচাঁদ ফিসফিস করে বলে, "ছুঁস না ফেলু। হয়তো লোকটা মরে গেছে। পুলিশ আসুক, তারাই যা করার করবে।"

ফেলনার অত নিজের প্রাণের মায়া নেই। নেই পুলিশের ভয়ও। ছোট থেকেই তাদের তাড়া খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একটা মানুষের প্রাণটা যদি ধুকপুক করে, তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য যা-যা করা প্রয়োজন, সব কিছুতেই রাজি সে। তাই সে বলল, "পুলিশ আসার আগেই যদি মইরে যায় লোকটা?"

"হাঁ, ঠিকই বোলা কালাচান্দ, মত ছুয়ো। পুলিস আ রহি হ্যায়। ম্যাঁয়নে ফোন কর দিয়া," ওদের পিছন থেকে বলে উঠল পুনিত। সে যে কখন ছ'তলা থেকে নেমে এসেছে বুঝতে পারেনি ওরা। বিল্ডিং-এর পিছন দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে বলে লিফ্টের আওয়াজও শুনতে পায়নি।

পুনিত নীচে নেমে আসার আগেই উপরে চলে গেছে বিচ্ছু। এ সব ঝুট-ঝামেলা ভাল লাগে না তার। বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব বাবা-মায়ের ছেলে। শহরে এসেছে রোজগার করতে। সে যদি পুলিশের হাতে পড়ে, তবে তো তার বাবা-মা-ভাই-বোনেদের দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে। আর সাহেবই বা কী বলবেন? সাহেব বেরিয়ে গেলেই ও যে নীচে চলে আসে সেকথা তো জানেন না তিনি। পুনিত ট্যাঙ্কটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। অত রক্ত দেখে তার বমি পাচ্ছে। তবুও দাঁড়িয়ে আছে। কেননা এই বিল্ডিংয়ের ভাল-মন্দের ব্যাপারে যত না উৎসাহী সে, তার চাইতেও বেশি উৎসাহী ক্ষমতার ব্যাপারে। একই কারণে বিল্ডিংয়ের হিসেবপত্রগুলো করে দেয়, টাকা-পয়সার লেনদেনগুলোরও খেয়াল রাখে। কর্মীরা তো বটেই, আবাসিকরাও সমীহ করে চলেন তাকে।

গলার স্বরে বিরক্তি ফুটিয়ে পুনিত বলল, "কৌন হ্যায় ইয়ে আদমি? ক্যায়সে গয়ে উপর? তুম গেট পে নেহি থে কেয়া?"

ভয়ে থতমত খেয়ে তোতলাতে থাকে কালাচাঁদ। বলে, "আ-আ-মি তো এখানেই বসে আছি সেই সন্দে থেকে। লিফ্টে বা সিঁড়িতে কেউ উঠলে কি দেখতে পেতাম না পুনিতভাইয়া?"

ফেলনাও এগিয়ে এসে বলল, "আমিও তো সিঁড়ির গোড়াতেই বসি ছিলাম। কেউ ওঠেনি গো পুনিতভাইয়া।"

ফেলনাকে সহ্য করতে পারে না পুনিত। কিন্তু একটা কারণেই তাকে কিছু বলে না। সন্ধের পর থেকে ঠায় বসে থাকে সে এই কার পার্কিং-এ। কালাচাঁদ এদিক-ওদিক গেলেও ঠাঁইনাড়া হয় না ফেলনা। কিন্তু পুনিত ভেবে পায় না এ লোকটা সাততলার ছাদে উঠল কী করে?

ময়ূখ-শর্মিষ্ঠার গাড়ির পিছন-পিছনই সাইরেন বাজিয়ে এসে গেল পুলিশের জিপ। পুনিত সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ঘটনাটার বিবরণ দিলেও সন্তুষ্ট হলেন না পুলিশ অফিসার। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন তিনি কালাচাঁদ ও ফেলনাকে। ময়ূখ এগিয়ে গিয়ে পুলিশকে বলল, "আগে চেক করা দরকার লোকটা বেঁচে আছে কি না।"

পুলিশ অফিসার বিরক্তিমাখা গলায় বললেন, "আপনি? আপনি কে?" যেন মৃত মানুষের কোনও শুভানুধ্যায়ী থাকতে নেই। সে শুধু এখন একটা লাশ। আর ওই মানুশটির লাশ হওয়ার পিছনের কারণটাকে যেন-তেন প্রকারেণ খুঁজে বার করতে হবে। সেটাই এখন তাঁর একমাত্র ফোকাস। যদি একটা কারণের মতো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তো ভাল, নয়তো তৈরি করতে হবে সম্ভাব্য একটা কারণ। সরকার তো অমনি-অমনি পারিশ্রমিক দিচ্ছেন না তাঁকে। প্রোমোশনও দেবেন না বিনা কারণে। গল্প তৈরি করতে হবে মাথা খাটিয়ে।

কালাচাঁদের খুব খারাপ লাগে। অত বড় একজন নামজাদা ডাক্তারকে এই পুলিশের লোকটা বলছে কিনা আপনি কে? তাই সে এগিয়ে গিয়ে বলে, "উনি মস্ত ডাক্তার ..."

"শাট আপ! তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি আমি?"

ঠকঠক করে কেঁপে উঠে চুপ করে যায় কালাচাঁদ। আর ময়ূখ আলতো হেসে বলল, "ওকে বকছেন কেন? ঠিকই বলেছে ও। আমি এক জন ডাক্তার। তবে মস্ত নই, এই সাধারণ একজন সার্জেন আর কী। কলকাতার সুপারস্পেশ্যালিটি হসপিটালগুলোতে প্র্যাকটিস করি। আমি কি দেখতে পারি লোকটা বেঁচে আছে কি না?"

পুলিশ অফিসারের গলার আওয়াজটাই বদলে যায় এ বার। তৎপর হয়ে তিনি বলেন, "ইয়েস, অফকোর্স, হোয়াই নট? আসলে আপনি তো আমাদের উপকারই করে দিচ্ছেন।"

ময়ূখ এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাল্স দেখল। গলার কাছেও টিপে দেখল। কোথাও কোনও স্পন্দন না পেয়ে বলল, "চোখদুটোও একটু দেখা প্রয়োজন। এখানে তো আলো কম, আপনার কনস্টেবলরা কি ধরাধরি করে আমাদের কার পার্কিংটায় নিয়ে আসতে পারবে? ওখানে জোরালো আলো আছে, গেটম্যানের কাছে টর্চও আছে।"

পুলিশ অফিসারের নির্দেশে দেহটিকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা। চিৎ করে শুইয়েও দিল। আর জোরালো ফ্লাডলাইটের আলোয় কালাচাঁদ দেখল লাশটার মুখটা অবিকল অয়নদার মতো। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির উপরে বসে পড়ল সে। ছোট্টবেলার একটা স্মৃতি এসে তাকে তোলপাড় করতে লাগল। অয়নের রুমমেটরা ফিরবে মাঝরাতে বা শেষরাতে। তাই দরজার তালা ভেঙেই পুলিশ অফিসার ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লেন। অয়নের ঘরে ঢুকে দেখলেন পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা ঘরখানা। জানলাগুলো বন্ধ করা। বিছানার উপরে পড়ে আছে ওর মোবাইল ফোনখানা। সদর দরজার চাবিটাও রয়েছে ডাইনিং টেবলের উপরে। তার মানে ছাদে ওঠার সময়ে অটোমেটিক লকওয়ালা দরজাটা টেনে দিয়ে গিয়েছিল সে।

তার ফোনের কনট্যাক্টগুলো ঘেঁটে দুটো নম্বর পাওয়া গেল যে দুটো নম্বরে ঘনঘন ফোন করত সে। একটা শুচি নামের একটি মেয়ের, আর-একটি নম্বর সেভ করা আছে 'মা' নামে। দু'টি নম্বরেই ফোন করে অফিসার ভদ্রলোক বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এ চলে আসতে। কেননা অয়নের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

অয়নের মা মালদায় থাকেন। তিনি হাউমাউ

করে কেঁদে উঠে বললেন, “কী করে হল? হাত-পা ভাঙেনি তো? জ্ঞান আছে তো? কোন হাসপাতালে আছে? আমি কাল সকালের ট্রেনেই রওনা হচ্ছি।”

শুচি বলল, “অ্যাক্সিডেন্ট অর সুইসাইড?”

পুলিশ অফিসার শকুন হয়ে যান। ভাগাড়ের সুগন্ধ এসে নাকে লাগে তাঁর। চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে বলে ওঠেন, “আপনি জানলেন কী করে?”

শুচি তার নাকটা টেনে বলল, “আজই পিঙ্ক স্লিপ পেয়েছে ও অফিস থেকে। আমাকে মেসেজ করেছিল বিকেলে। ওর ফোনের ইনবক্সে যান, মেসেজটা আছে হয়তো।”

## ১২

মাসখানেক লেগে গেল অয়নের মৃত্যুটা থিতু হতে। একটা আপাতশান্ত সমুদ্রে যখন ঘূর্ণিঝড় ওঠে, তখন তার চার পাশের পরিবেশকে তছনছ করে দেয়। কিছু উৎপাটন হয়, কিছু ভাঙচুর হয়, কিছু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবারও নিজেদের চেষ্টায় কিংবা অনুদানে সেসব গড়ে তোলে মানুষ। ধীরে-ধীরে তার স্মৃতি থেকে আবছা হতে থাকে সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের দিন-রাত্রি যাপনগুলোর কথা। নতুন করে বাঁচতে শেখে সে।

খুব কষ্ট হলেও শুচি মেনে নিয়েছে অয়নের আত্মহত্যার ঘটনাটাকে। পুলিশের সব অনুসন্ধানে সহায়তা করেছে। ভয়ানক শীতের রাতগুলোতে হাউহাউ করে কেঁদেছে। একটা ছোট্ট স্বপ্ন দেখেছিল তারা। একসঙ্গে। কিন্তু কুঁড়িটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠার আগেই খসে পড়ে গেছে। শুচি বুঝতে শিখেছে যে, সব কুঁড়ি ফুলে রূপান্তরিত হয় না। এ কথাও অনুভব করেছে যে, পরের বসন্তেই আবার নতুন কুঁড়ি গজাবে। এটাই শেষ বসন্ত নয়।

কিন্তু একমাত্র সন্তানহারা বিধবা মায়ের শোক কি কোনও সান্ত্বনার অপেক্ষা রাখে? নাকি থাকে কোনও ঋতু পরিবর্তনের অপেক্ষা? হাসপাতালের মর্গে ছেলের মৃতদেহটি শনাক্ত করতে গিয়েই হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাঁর। পুত্রশোক আর ভোগ করতে হয়নি তাঁকে।

ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টসও একটু-একটু করে ভুলে যাচ্ছে অয়ন নামের ছেলেটাকে। শুধু সন্ধে সাতটা নাগাদ এখনও কালাচাঁদের মনটা কেমন করে। সদর দরজার আওয়াজ হলে মনে হয়, ওই বুঝি অয়নদা এল। কালাচাঁদ যেন এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এর হৃদয়। যে এই বাড়িটার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। সে রক্ত সরবরাহ করে বলেই যেন অক্সিজেন পায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো। একে অন্যকে ভালবেসে, ঝগড়া করে বেঁচে থাকে তারা। তাদের আঘাতে যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে ওঠে কালাচাঁদ। রক্তক্ষরণ হয় তার মনে। কিন্তু কালাচাঁদের মনের দেওয়ালে যদি জমাট বাঁধে রক্ত, তার সন্ধান কি পায় অন্যেরা? জানে না কালাচাঁদ। তবে না পেলেই বা কী? কালাচাঁদ তো একজন কর্মীমাত্র এখানে, রক্তের সম্পর্ক তো নেই কারও সঙ্গে।

আজ রোববার। প্রিয়ংবদার ছুটির দিন আজ। আজ নিজে হাতে আহির আর ইমনের পছন্দের খাবার বানায় সে। আহিরকে নিয়ে অসুবিধে নেই, মেনকা যা বানিয়ে দেয়, তাই চেটেপুটে খায়। যত মুশকিল ইমনকে নিয়ে। রেস্তরাঁয় গিয়ে পিৎজ়া-পাস্তা খাবে সে, কিন্তু বাড়ির ঝোল-ভাত ছুঁয়েও দেখবে না। ওইসব ফাস্ট ফুড খাওয়ানোর ব্যাপারে ভয়ানক আপত্তি প্রিয়ংবদার। সে চায় সুস্থ-সবল হোক ওরা। শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, মানসিক ভাবেও। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে প্রিয়ংবদা যে ওদেরকে কখনও লেখাপড়ার ব্যাপারে কিংবা কেরিয়ারের ব্যাপারে চাপ দেবে না। ওদের যা ইচ্ছে পড়বে, যেমন ইচ্ছে কেরিয়ার গড়ে নেবে। আজকালকার ইঁদুর দৌড়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়েগুলো। কেউ ড্রাগ নিচ্ছে, কেউ সুইসাইড করছে। এই তো চারতলার অয়ন নামের ছেলেটা কী কাণ্ডটাই না করল! আরে বাবা, একটা চাকরি গেছে, আর-একটা পেতিস। আইটি তে আজকাল চাকরির অভাব? একবার বিধবা মায়ের কথাটা ভাবলি না?

আহির আর ইমনের কাপড়-জামাগুলো গোছাতে-গোছাতে নিজের মনেই গজগজ করছে প্রিয়ংবদা। অয়নের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয়নি কখনও তার, অয়নের মাকেও কখনও দেখেনি। তবুও মনের ভিতরে কেমন একটা কষ্ট দলা পাকাচ্ছে। অয়নের জায়গায় যদি আহির আর ইমন হত! আর ভাবতে পারছে না প্রিয়ংবদা। অমনিতেই ওদের জন্মের আগেই ওদের বাবা জুনিয়র কলিগের সঙ্গে এক্সট্রা ম্যারিটাল চালাতে লাগল। তার আঁচ অবশ্য ছেলেদের গায়ে লাগতে দেয়নি প্রিয়ংবদা। এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছিল। তবে জোড়া ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে বাবাগিরি ফলাতে এসেছিল সে। কিন্তু প্রিয়ংবদা তাকে ঢুকতে দেয়নি। বাবা-মায়ের কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল প্রিয়ংবদা। তবুও।

তবে মেনকা এসে বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাকে। নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করছে দু'টিকে। সবচাইতে বড় কথা বাবা-মায়ের কাছেও হাতজোড় করে থাকতে হয়নি প্রিয়ংবদাকে। প্রতি রবিবার দুপুরে বেহালায় তাঁদের কাছে চলে যায় সে মেনকাকে সঙ্গে নিয়ে। সারাটা দিন হইচই করে, খেয়ে দেয়ে রাতে ফিরে আসে। কারও কোনও দায় নেই। না প্রিয়ংবদার, না তার বাবা-মায়ের। কেউ কাউকে দোষারোপ করারও সুযোগ নেই। “বুড়ো হাড়ে কি এত সয়” যেমন শুনতে হয় না প্রিয়ংবদাকে, তেমনি “নাতিদের জন্য এটুকুও করতে পারো না তোমরা” শুনতে হয় না তার বাবা-মাকেও।

বেশ তো লাইনে উঠে পড়েছিল গাড়ি, চলছিলও গড়গড়িয়ে, এখন এ কি বিনা মেঘে বজ্রপাত! এ ধাক্কা কী করে সামলাবে প্রিয়ংবদা? বোমাটি ফাটিয়ে দিয়ে সে তো নীচে চলে গেছে, আর পাহাড়টা একটু-একটু করে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে প্রিয়ংবদার মাথায়।

ডোরবেলটার আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেল প্রিয়ংবদা। নিশ্চয়ই কালাচাঁদ এসেছে। সপ্তাহের বাজারটা করে দেয় সে। লিস্ট লিখে টাকা দিয়ে দেয় প্রিয়ংবদা, বেশ গুছিয়ে বাজার করে কালাচাঁদ। সারা সপ্তাহ আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয় না। দরজাটা খুলে দিতেই ব্যাগ দুটো নিয়ে কিচেনে চলে গেল কালাচাঁদ। কোথায় কী রাখতে হবে সে কথা তার জানা।

সব্জিগুলো সিঙ্কের ভিতরে ঢালতে-ঢালতে প্রিয়ংবদা বলল, “খবরটা শুনেছ কালাচাঁদ?”

ব্যাগ দুটো ঝেড়ে কিচেনের দরজার পিছনের হুকটায় ঝুলিয়ে রাখছিল কালাচাঁদ। সেখান থেকেই সে জবাব দিল, “কী খবর দিদি?”

“মেনকা তো অ্যামেরিকায় চলল,” গলার স্বরে শ্লেষ ঝরে পড়ে প্রিয়ংবদার।

“কী বলছেন দিদি!” মিচকে হেসে বলল কালাচাঁদ। যেন এমন বিস্ময়কর, এমন হাস্যকর কথা আগে কখনও শোনেনি সে।

কিন্তু হাসি পায় না প্রিয়ংবদার। রাগতভাবে সে বলে, “হেসো না কালাচাঁদ। এটা মজার কথা নয়, সত্যি কথা।”

কালাচাঁদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কী বলবে বুঝতে পারে না। তুতলিয়ে বলে, “তা-তা কী করে সম্ভব দিদি?”

“কেন, সম্ভব নয় কেন? ও তো সেন্টারের আয়া। বাচ্চা দেখার কাজ করে। এখানেও বাচ্চা দেখছে, ওখানেও তাই করবে। তবে পয়সাটা হয়তো আট-দশ গুণ বেশি পাবে,” কর্কশ সুরে কথাগুলো বলল প্রিয়ংবদা। মেনকা যে সেন্টারের আয়া, সে কথাটা আগে কখনও এভাবে উচ্চারণ করেনি সে।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কালাচাঁদ। নির্বাক। ভাবছে, এ সব কী বলছেন প্রিয়াদিদি! এ-ও কি সম্ভব! দিল্লি-বম্বে নয়, একেবারে অ্যামেরিকা! তবে ওদের স্বপ্নটার কী হবে? ওরা যে একসঙ্গে ঘর বাঁধবে ভেবেছিল!

প্রিয়ংবদা গলা চড়িয়ে বলে, “সাহসটা ভাবো ওর! একেবারে সাতসমুদ্র ডিঙিয়ে চলল অ্যামেরিকায়! তুই কি কাউকে চিনিস ওখানে! বাচ্চা দেখার কাজ বলে নিয়ে গিয়ে যদি অন্য খপ্পরে ফেলে দেয়? বাঘ-সিংহের মতো যখন তোর শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে তখন বুঝবি ঠ্যালা!”

শিউরে ওঠে কালাচাঁদ। এ সব কী বলছেন প্রিয়াদিদি? তিনি কি সত্যিই ভালবাসেন মেনকাকে? তার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে আছেন? নাকি আহির ও ইমনের ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন? ভয় পাচ্ছেন যে, মেনকা যদি ওদেরকে ছেড়ে চলে যায়!

একটা টিসু পেপার টেনে নিয়ে নাকটা ঝাড়ল প্রিয়ংবদা। দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলটুকুকেও মুছে ফেলল চটপট। তার পর ভাঙা গলায় বলল, “মেয়েটার শরীরে কি মায়া-দয়া নেই এতটুকু? সেই জন্ম থেকে দেখাশুনো করছে বাচ্চা দুটোকে। ওদেরকে ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হবে না ওর?”

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কালাচাঁদ। সে কী বলবে? এমন পরিস্থিতিতে তার কি কিছু

বলা শোভা পায়? সে-ও তো একজন কর্মী-ই। এই বিল্ডিংয়ের দারোয়ান। সে যতই গালভরা 'গেটম্যান' বা 'সিকিউরিটি' বা 'কেয়ারটেকার' বলে ডাকুন না কেন সাহেব-মেমসাহেবরা।

কিন্তু সাপের মতো হিস হিস করে ওঠে প্রিয়ংবদা। বিষ ঢালে। সে ভুলে যায় তার নামের অর্থ। বলে, "নেমক হারাম, বুঝলে তো নেমক হারাম। কত করেছি ওর ফ্যামিলির জন্য। সব ভুলে গেল? হাতে মাংসের হাড় নিয়ে যেই না "তু তু" করে ডাকল অন্য কেউ, অমনি ল্যাজ তুলে দৌড় লাগাল?"

কালাচাঁদেরও বুকে আগুন জ্বলছে, চোখ ফেটে জল আসছে। কিন্তু মেনকার সঙ্গে সরাসরি কথা না বলে কোনও মন্তব্য করতে চায় না। তাই অটোমেটিক নাইটল্যাচওয়ালা দরজাটা টেনে দিতে-দিতে বলে, "আমি আসছি দিদি।"

কার পার্কিংয়ে নেমে এসে কালাচাঁদ দেখল, বেঞ্চটার উপরে একা বসে আছে মেনকা। আহির আর ইমন গাড়িগুলোর ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। আজ রোববার বলে ছোটনের ছুটির দিন। লাট্টুও গাড়ি ধুতে আসে না আজ। ডাক্তারবাবু আর শর্মিষ্ঠাম্যাডামও রোববারে বাড়িতেই থাকেন, তাই মিনুমাসিও নীচে নামতে পারে না আজ। তবে দেবু না এলেও বিকেলের দিকে ডাক্তারবাবু নিজেই গাড়ি চালিয়ে বেরোন। সিনেমা দেখতে যান বা মলেটলে যান তিন জনে মিলে।

তাই গলাটা একটু ঝেড়ে কালাচাঁদ বলল, "কীরে, কী শুনছি সব?"

"কী শুনছ?" ওড়নাটা বুকের উপরে পাট করতে-করতে বলল মেনকা।

তার ভরন্ত বুকের আভাস আর নাকের লাল পাথরের ঝিলিমিলি ঝিলিক তোলে কালাচাঁদের মনে। কয়েক মুহূর্তের জন্য খেই হারিয়ে ফেলে সে। অভিমুখ বদলে যায় কথোপকথনের। বলে, "তোর জন্মদিন কবে রে?"

"কেন, আমার জন্মদিন জেনে কী করবে তুমি?" গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল মেনকা।

চট করে মেনকার গাল দুটো টিপে কালাচাঁদ দাঁত ছড়িয়ে হাসল। বলল, "কারণ আছে।"

কালাচাঁদের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ ঝামটে উঠল মেনকা, "কী যে করো না, কেউ যদি দেখে ফেলে!"

"তো? আমার হবু বউয়ের গাল টিপতে পারি না আমি? বিয়ের পর আরও কত কিছু করব দেখিস," কালাচাঁদের হাসিটা এ বার তার কান দুটো ছুঁয়ে ফেলে।

"মুখ সামলে কথা বলো। আমি কি তোমার বিয়ে করা বউ?"

"সে আর হতে কতক্ষণ? বলিস তো আজই কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারি তোকে। ছোটনকেও ফোন করে ডেকে নিচ্ছি সাক্ষী দেওয়ার জন্য। সে তো বরকত্তা হওয়ার জন্য মুখিয়েই আছে।"

"না-না, এখন বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না আমি।"

"কেন শুনি? তোর মতলবটা কী খোলসা করে বল দেখি।"

"মতলব আবার কী? এখন বিয়ে করতে পারব না, ব্যস।"

"থালে এত দিন ধরে তাতালি কেন আমাকে? একটা ঘর চাই, বাথরুম চাই, একটু মাটি চাই গাছ লাগাবার জন্য। বলিসনি এ সব?"

"বলেছিই তো। তোমার কি আছে সে সব যে, বড় মুখ করে বিয়ের কথা বলতে এসেছ।"

"বুঝেছি-বুঝেছি, তোর পাখনা গজিয়ে গেছে। আমাকে আর ভাল লাগছে না। এখন তোর বিলেত-অ্যামেরিকা যাওয়ার শখ হয়েছে।"

চমকে উঠে মেনকা ভাবে, দিদিরও বলিহারি! খবরটা পাকলই না, এর ভিতরেই চুকলি করা হয়ে গেছে! তবে এখুনি কথাটা সাত কান করা ঠিক হবেনা। তাই মুহূর্তের মধ্যে

কিন্তু সাপের মতো হিস হিস করে ওঠে প্রিয়ংবদা। বিষ ঢালে। সে ভুলে যায় তার নামের অর্থ। বলে, "নেমক হারাম, বুঝলে তো নেমক হারাম।

ধোওয়া তুলসীপাতা হয়ে যায় সে। মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলে, "দিদি বলল বুঝি?"

"নয়তো কী?" মেনকার চোখে চোখ রেখে বলল কালাচাঁদ।

"তোমাকে বলতামই আজ," নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের বৃথা চেষ্টা করে মেনকা।

"ছাড়-ছাড়, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। তুই ধরা পড়ে গেছিস। মিথ্যেবাদী কোথাকার ..."

"ধরা পড়ার কী আছে? আমি কি চুরি করেছি নাকি?"

"ঘরের লোকের কাছে কথা লুকিয়ে রাখা আর চুরি করা একই সমান বুঝলি তো।"

মেনকার গা জ্বলে যায়। ভাবে, ভারী এসেছে ঘরের লোক! মেনকা ওকে বিয়ে করবে কি না তারই কোনও ঠিকঠিকানা নেই, এখনই এসেছে ভাতারগিরি ফলাতে! কিন্তু আপাতত কালাচাঁদকে প্রয়োজন ওর, তাই তার গা ঘেঁষে বসে বলল, "অ্যাই শোনো না, রাগ কোরো না, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।"

কালাচাঁদের মনে পুলক লাগে, শরীরে শিহরন। মেনকাকে জাপটে ধরে তার বুকের খাঁজে নাক ঘষতে ইচ্ছে করে। দৃঢ় হয়ে উঠে মেনকার শরীরের প্রবেশপথ খুঁজতে চায় তার শরীর। কিন্তু এই প্রকাশ্য দিবালোকে নিজেকে সংযত করে সে। ভাবে, সে দিনটাও বেশি দূরে নেই যেদিন মেনকার মোমগলা শরীরের ভিতরে হারিয়ে যাবে তার নিজের শরীর ...

"কী গো ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?" আলতো হাতে সম্মোহিত কালাচাঁদকে ঠেলা মারে মেনকা।

একগাল হেসে কালাচাঁদ বলে, "ধুস, ঘুমোব কেন? ওই একটা কথা ভাবছিলাম।"

"অন্য কথা ভাবা বন্ধ করে আমার কথা ভাবো এখন।"

"তুই-ই তো আমার সব রে, শুধু হুকুম কর।"

"তবে মন দিয়ে শোনো আর বলো আমি কী করব। অনেক টাকা দেবে ওরা বুঝলে তো?"

"অনেক মানে কত?"

"বলছে তো ওদেশের এক হাজার টাকা।"

"সেটা আমাদের দেশের কত টাকা হয় জানিস কিছু?"

"সেন্টারের দিদি বলছিলেন সত্তর হাজার টাকার একটু বেশি।"

"মানে?"

"হ্যাঁ, তাই-ই তো বললেন।"

বেঞ্চটা থেকে লাফিয়ে উঠে কালাচাঁদ বলে, "তুই নিশ্চয়ই করে জানিস তো যে ওটা বাচ্চা দেখার কাজ?"

"নয়তো কী?" বিরক্তি মেনকার চোখে-মুখে।

"না মানে, বাচ্চা বানানোর কাজ না তো?"

"মানে?"

"মানে বাচ্চার বাবার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানোর কাজ না তো?"

কালাচাঁদের পিঠে একটা জব্বর ঘুষি মেরে মেনকা বলল, "তুমি একটা গুয়ের মাছি। যতই ভাল-ভাল খাবারদাবার রাখো না কেন তার সামনে, সে খাবে না। সেই ঘুরে-ফিরে ভনভন করতে-করতে গুয়ের উপরে গিয়েই বসবে।"

উদাস চোখে দূরের সদর দরজাটার দিকে তাকিয়ে কালাচাঁদ বলল, "সে তোর যা খুশি বল গে যা। কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বাচ্চা দেখার জন্য অত টাকা দেয় কেউ?"

"আরে বাবা, ও দেশের অমনই মাইনে হয়। ওদেশের লোক রাখতে গেলে এর ডবল মাইনে দিতে হয়। তাই তো পেলেনের ভাড়াও ওরাই দেবে। থাকার জায়গা দেবে, খাওয়াও ফিরি।"

"তা এত টাকা দিয়ে করবি কী তুই? তোর দাদা-বৌদিকে দিবি?"

"ইস, আমার বয়ে গেছে! ছোট বোনটাকে

ঘরে বসিয়ে খাওয়াতে পারে না যারা, তাদের কেন টাকা দেব? নিজে গতর খেটে রোজগার করছি কি ওদের জন্য?"

"তবে কাকে দিবি শুনি?"

"কেন, নিজেদের জন্য ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখব," দু'চোখে ঝিলিক হেনে বলল মেনকা।

মেনকার হাবেভাবে আর চোখের ভাষায় আশ্বস্তবোধ করে কালাচাঁদ। এই 'নিজেদের' শব্দটার মধ্যে নিজেকেও খুঁজে পায় সে। তাই খোশমেজাজে বলে, "তা আমাকে কী করতে হবে?"

আহির আর ইমনকে ডেকে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে নিয়ে গেল মেনকা। তাদের হিসি করিয়ে হাত ধুয়ে এল। তার পর দুটো ম্যাঙ্গো জুসের প্যাকেটে স্ট্র ঢুকিয়ে বলল, "চোঁ চোঁ করে খেয়ে নাও দিকিনি লক্ষ্মী ছেলের মতো।" আর কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তোমার একটা বড় কাজ আছে। অ্যামেরিকায় যে দাদার বাচ্চা দেখতে যাব, তার বাবা থাকেন সল্টলেকে। মাসের এক তারিখে তিনি আমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে দেবেন। তুমি শুধু আমার বইটা নিয়ে গিয়ে মেশিনে দিয়ে দেখে নেবে টাকাটা জমা হল কি না।"

কালাচাঁদ গম্ভীর মুখে বলে, "আমি কেন? আমি তোর কে? ওই বুড়োকেই বল না।"

নাক ফুলিয়ে, ঘাড়ে ঝটকা মেরে মেনকা বলল, "তুমিও য্যামন! তারপর বুড়ো যদি মিথ্যে কথা বলে? পুরো টাকা যদি জমা না দেয়?"

"আর আমি যদি তোর টাকাগুলো মেরে দিই?" খিকখিক করে হেসে বলল কালাচাঁদ।

মেনকাও হিহি করে হেসে উঠে বলল, "আমি কি ব্যাঙ্কে খোঁজ নিইনি ভেবেছ? আমার নামে জমা টাকা কেউ মারতে পারবে না আমার পিন নম্বর না জানলে।"

"তুই খুব চালু আছিস মাইরি। শালি, এক নম্বরের খচ্চর একটা," বলে হাহা-হোহো-হিহি করে হাসতে লাগল কালাচাঁদও।

## ১৩

আর হাসিঠাট্টা নয়, সত্যি করেই আমেরিকায় চলে যাচ্ছে মেনকা। কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্কে যাওয়ার প্লেনের টিকিট আর এক মাসের অগ্রিম মাইনে পেয়ে গেছে সে। পাসপোর্ট এসে গেছে। ভিসাও পেয়ে গেছে। এ বিল্ডিংয়ের কর্মীদের কাছে তো বটেই, আবাসিকদের কাছেও তার সম্মান বেড়ে গেছে। সাহেব, মেমসাহেবরা ডেকে কথা বলেন। নবম মেঘে সওয়ার হয়েছে এখন সে। আজ সকালে আহির আর ইমনকে নিয়ে যখন লিফটের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের মুখার্জিসাহেব দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন। আহির আর ইমনকে আদর করতে-করতে বলেছিলেন "কি গো মেনকা, তুমি নাকি অ্যামেরিকায় চলে যাচ্ছ?"

লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল মেনকা। অত রাশভারী, সম্মাননীয় একজন মানুষ মুখার্জিসাহেব। কোনওদিন ওকে ডেকে কথা বলা তো দূরের কথা, ওর দিকে তাকিয়েও দেখেননি। তিনি বলছেন এই কথা! আর এই একটু আগে ছ'তলার পুনিত লোহিয়া যখন নেমে এল, কী কাণ্ডটাই না হল! কালাচাঁদ, ছোটন, মিনু আর মেনকা বসে গল্প করছিল। পুনিত তার মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়েই বলল, "নমস্কার মেন্‌কা ম্যাডাম, সুনা আপ অমরিকা যা রহেঁ হ্যাঁয়। ম্যাডাম, মেরে লিয়ে ভি এক নওকরি কো বন্দবস্ত কিজিয়ে না।"

লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়ে মেনকা বলল, "হাম কাঁহাসে বন্দোবস্তো করেঙ্গে। আপ কোই এজেন্টকে পাস যাইয়ে।"

"আপকো এজেন্টকা ফোন নাম্বার দিজিয়ে না।"

"হমারা তো আয়া সেন্টার হ্যায় ভাইয়া ..."

"আরে ডোমেস্টিক হেল্প ভি তো ভেজতে হ্যায় য়হাঁসে। উঁহা যাকে সাফাই-আফাই কর লেঙ্গে ..."

পুনিতকে থামিয়ে দিয়ে ছোটন বলল, "হাম ভি যায়গা আমেরিকা। ডেরাইভার লোগ বহুত পয়সা কামাতা হ্যায় উধার।"

মুখে একটা জর্দা-পান ঠুঁসে মিনু বলল, "মরণ!"

পুনিত তার মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে গেছে। হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়ে আছে মেনকা, মিনু আর ছোটন। কিন্তু কালাচাঁদের মুখে কোনও কথা নেই। মেনকার পাসপোর্ট আর ভিসা এসে যাওয়ার পর থেকে তার মুখে হাসি নেই। এক মাসের যে মাইনেটা অগ্রিম হিসেবে পেয়েছে মেনকা, তার থেকে কিছু কেনাকাটার জন্য রেখে বাকিটা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছে। গত সপ্তাহে কালাচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে গিয়েছিল সে। একটা সুটকেস কিনেছে, একটা ব্যাগ কিনেছে আর লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে কিছু কাপড়-জামা। কালাচাঁদের জন্য একটা ট্র্যাকপ্যান্ট আর টি-শার্টও কিনেছে। ও নিতে চায়নি, তবুও জোর করে কিনে দিয়েছে।

কালাচাঁদ রাগ দেখিয়ে বলেছিল, "আমার জন্য এ সব কিনছিস কেন? আমি তোর কে?"

কালাচাঁদের কাঁধে মাথা রেখে মেনকা বলেছিল, "জানো না তুমি আমার কে? আমার ভালবাসার মানুষ।"

লোকে লোকারণ্য লিন্ডসে স্ট্রিটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল কালাচাঁদ। মেনকার মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "যাত্রাপালায় নাম লিখিয়েছিস নাকি?"

গাল ফুলিয়ে মেনকা বলেছিল, "কেন, তুমি আমার ভালবাসার মানুষ নও?"

হিসহিসিয়ে কালাচাঁদ বলেছিল, "ভালবাসার মানুষকে ছেড়ে কেউ অত দূরে চলে যায়?"

অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল মেনকাকে সেদিন। বিয়ে করুক না করুক কালাচাঁদকে হাতে রাখতেই হবে তার। দাদা-বৌদির হাতে ব্যাঙ্কের পাসবুক দেওয়া যাবে না। টাকাগুলো হাতাতে পারবে না ঠিকই, তবে চেয়ে বসতে কতক্ষণ? ছোট থেকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার দোহাই দিয়ে তো বসতেই পারে। মালিকের বাবার কাছেও রাখতে পারবে না সেটা। যদি তিনি সময়মতো টাকাটা জমা না দেন? মেনকা তো জানতেই পারবে না। তাই কালাচাঁদই একমাত্র ভরসা। মেনকাকে বিয়ে করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে সে। মেনকার অ্যাকাউন্টে টাকাটা যখন লাফে-লাফে বাড়তে থাকবে, তখন সে নিশ্চয়ই আরও উৎসাহী হয়ে উঠবে বিয়ের ব্যাপারে। টাকাটা যাতে সুরক্ষিত থাকে, সে ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হয়ে উঠবে। তাই মেনকা সেদিন জোর করে চিকেন রোল খাইয়েছিল কালাচাঁদকে। তার পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে ঘাসের জমির উপরে পা ছড়িয়ে বসেছিল সন্ধে পর্যন্ত। ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা করেছিল। বছর খানেক ওখানে কাজ করলেই সাত-আট লাখ টাকা জমে যাবে মেনকার। ফিরে এসে সে কাঠা দুয়েক জমি কিনবে কোনও গাঁ-গঞ্জে। ঘর তুলবে। কালাচাঁদকে একটা ছোটখাটো মুদিখানা খুলে দেবে। এই দারোয়ানের কাজ কি সারা জীবন করবে সে? মেনকাও এই বাচ্চা দেখার কাজ আর করবে না। নিজের বাচ্চাদের নিয়েই তো হিমশিম খাবে তখন। কথাগুলো বলে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সে।

সাড়ে বারোটা বেজে গেলেও আজ গড়িমসি করে মেনকা। আর তো মাত্র দুটো দিনের ব্যাপার। অত নিয়ম না মানলেও চলবে। পরশু থেকে প্রিয়াদির বাবা-মা এসে থাকবেন এখানে। আর-এক জন পছন্দমতো আয়া না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবেন তাঁরা।

মেনকা হঠাৎ আহ্লাদে গলায় বলল, "ও ছোটনদা, তোমার সাইকেলটা নিয়ে একটু বাইপাসের মোড়ে যাও না।"

"কেন বল তো?" দাঁত কেলিয়ে বলল ছোটন।

"বেশি করে দুধ-চা নিয়ে এসো আর কিছু খাবার।"

"পয়সাটা কে দেবে? তোর আমেরিকার মালিক?"

মেনকা খিলখিল করে বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে উঠল। বলল, "আবার তেনাকে টানো কেন? ও পয়সা আমিই দেব।"

"খুব ডলারের গরম হয়েছে মনে হচ্ছে তোর।"

"তা একটু হয়েছে বলতে পারো। প্রিয়াদিদিও দিনে দশ বার করে ডলারের খোঁটা দিচ্ছেন আমাকে," ঠোঁটের কোনায় চতুর হাসি খেলা করে মেনকার।

পানের পিকটা গিলে ফেলে মিনু বলে, "ডলা-ডলা কী বলচিস রে তোরা? ডলা-টা কী জিনিস? শরীর গরম রাখার কিছু?"

আবারও হেসে গড়িয়ে পড়ে মেনকা। বলে, "ও মাসি, ডলা না ডলার। আমেরিকার টাকাকে ডলার বলে।"

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে মিনু বলে, "তাই বল। আমি ভাবচিলাম শরীর গরম রাখার জিনিস।"

ছোটন বলল, "তা ঠিকই বলেছ মাসি, শরীর

গরম রাখার জিনিসই বটে, দেখছ না আমাদের মেনকার শরীর কেমন গরম হয়ে উঠেছে।"

হিহি হিহি করে হাসতে থাকে মেনকা। হাসির দমকে ফুলে-ফুলে উঠে বলে, "তুমি কী করে জানলে ছোটনদা?"

মুখটা বেজার করে ছোটন বলে, "আমি আর কী করে জানব বল? ভগবান কী আর তেমন ভাগ্য দিয়েছেন আমাকে?"

"কিসের ভাগ্য ছোটনদা?" ভ্রুভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করে মেনকা।

"তোর শরীরের তাপ মাপার। আবার কী?" উদাস ভাবে বলে ছোটন।

মেনকা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিনু বলে, "থালে, তুই জানলি কীকরে? তোর কাচে কি থাম্মোমিটা আছে?"

"কালার কাছে আছে গো মাসি। ও-ই আমাকে বলেছে যে মেনকার শরীরের তাপ বেড়ে গেছে আজকাল।"

এ কথায় আজ আর কিছু মনে করে না মেনকা। মিনুর কোলে মাথা রেখে হো হো হো করে হাসতে থাকে সে। কিন্তু নিজের একপাটি হাওয়াই চটি খুলে নিয়ে ছোটনের পিছনে ছুটোছুটি করে কালাচাঁদ আর বলে, "তোর বড্ড বাড় বেড়েছে রে ছোটন। আগে তোর মুখটা নদ্দমা ছিল, এখন একেবারে সেপটি ট্যাঙ্ক হয়ে গেছে।"

আহিরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ইমন। মেনকা ছুটে গিয়ে আহিরের জামা-প্যান্ট ঝেড়ে দিয়ে বলল, "ইস! এই সাদাসিদে ছেলেটা ছোট ভাইয়ের হাতের মার খেয়েই জীবন কাটাবে মনে হচ্ছে। আমি চলে গেলে কী যে হবে ওদের..."

গলাটা বুজে আসে মেনকার। চোখের কোণ দুটো ভিজে ওঠে। কালাচাঁদ হঠাৎ ছোটনকে ছেড়ে তেড়ে আসে মেনকার দিকে। গলা চড়িয়ে বলে, "নৌটঙ্কি করছিস কেন? এতই যদি দরদ ওদের জন্য, থালে যাস না।" উপস্থিত সবাই জানে এ কথাটার আর কোনও মূল্য নেই এখন। যে এক মাসের অগ্রিম মাইনে পেয়ে গেছে, পাসপোর্ট-ভিসা এসে গেছে, প্লেনের টিকিটও হাতের মুঠোয়, সে কী করে তার জীবনের অভিমুখ বদলাবে?

মুহূর্তের জন্য মেনকারও মনে হয়, না গেলে কেমন হয়? একটা অজানা-অচেনা জায়গায় অনিশ্চিত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে একটু তো ভয় করছেই। কিন্তু সেন্টারের দিদি তো ছেড়ে দেবেন না তাকে। তাঁরও তো স্বার্থ জড়িয়ে আছে এখানে। অত টাকার কমিশন কি ছেড়ে দেবেন তিনি? তার উপরে সেন্টারের সুনামেও তো কালির ছিটে পড়বে। নিজেকে একটা হালহীন নৌকো মনে হয় মেনকার। এখন স্রোতের টানে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু একটা লম্বা লগি নিয়ে এগিয়ে আসে কালাচাঁদ। মুখ ঘোরাতে চায় নৌকাটার। বলে, "তোর আগাম টাকাটা যদি ফেরত দিয়ে দিই আমরা?"

চোখ-ভরা জল নিয়ে মেনকা বলে, "আর পেলেনের টিকিটের দামটা? ফরমের সইটা? সেগুলো কি ফেরত দিতে পারব?"

ছোটন বড় দাদার মতো আশ্বাস দিয়ে বলল, "অত চিন্তার কী আছে? বছর খানেক কাজ করে ভাল না লাগলে ফিরে আসিস। আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের কি কাজের অভাব? ফিরে এসে অন্য কোথাও কাজ নিয়ে নিস।"

কালাচাঁদ ভুরু কুঁচকে বলে, "না-না, ও আর অন্য কোথাও কাজ করবে না।"

ছোটনের দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে আবার। বলে, "কেন রে, ফিরে এসে কি তোর বাচ্চাদের দেখবে মেনকা?"

পুচুৎ করে পানের পিকটা ফেলে মিনু বলে, "এই আবার শুরু হল তোর। তোর জ্বালায় আসল কতাটাই বলতে পারচি না আমি।"

"কোন কথা গো মাসি, কেউ কি অবৈদ সন্তান পয়দা করল?"

"উঁহু। বৈদ সন্তান বিককিরি হচ্চে। তোরা কি শুনেচিস সেই কতা? আমাদের খুব চেনা মানুষ নিজের বাচ্চাগুলোকে বিককিরি করচে রে।"

ভনভন করে ওঠে বাকি তিনজন, "কে গো মাসি?"

"আনজাদ কর দেখি তোরা," মিটমিটে হাসিতে ভরে ওঠে মিনুর মুখটা।

ওরা তিনজনে ভেবে-ভেবে কূল-কিনারা পায় না। ছোটন মাথাটা চুলকে বলে, "আমাদের সকলের চেনা বলছ?"

"হুঁ," চোখদুটো চকচক করছে মিনুর।

কালাচাঁদের কোনও উৎসাহ নেই এ সব পরনিন্দা-পরচর্চায়। তার মন জুড়ে এখন এক অতল-অন্ধকার খাদ। তার ভালবাসার মানুষটা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাবা-মা মরে যাওয়ার পর সে ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল বড়দার। তার পর আশ্রম ছেড়ে চাকরি করতে এল এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এ। স্নেহ পেল মুখার্জিসাহেবের। তার ব্যবহারে আর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কাছে টেনে নিলেন অন্যান্য আবাসিকরাও। ডাক্তারবাবু আর শর্মিষ্ঠাম্যাডাম ভরসা করেন তাকে। এটা-ওটা দেন। বিলেত থেকে অর্চিষ্মানদাদাও সপ্তাহে একবার ফোন করে দাশগুপ্তমাসিমার খোঁজ-খবর নেন। তবে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ সে সরকারবৌদির কাছে। অন্য আবাসিকরা অনেক নিন্দে করে তাঁর। কিন্তু কালাচাঁদ তাঁর কাছে দায়বদ্ধ। এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে দু'বেলার ভাত-তরকারি দেন তিনি কালাচাঁদকে। কিন্তু এমন করে ভালবাসেনি তো সে তাঁদের। মেনকাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে কিংবা তাকে একটু ছুঁলে যে সারা শরীর ঝনঝন করে বাজতে থাকে তার।

"ধুস! এ সব হেঁয়ালি ছাড়ো তো মাসি। ঝেড়ে কাশো।"

ছোটনের কর্কশ গলার আওয়াজে ঘোর ভাঙে কালাচাঁদের। মেনকাও অধৈর্য হয়ে উঠে বলে, "হ্যাঁ মাসি, তাড়াতাড়ি বলো। আমার বুকটা টিপটিপ করছে। নিজের বাচ্চাকে কেউ বেচে দেয়!"

"দ্যায় রে দ্যায়। টাকার নেশা বড় নেশা। নিজের শরীরের বীজ দিয়ে তৈরি বাচ্চাগুলোরও ছাড়ান নেই," দার্শনিক হয়ে যায় মিনু।

তার পর ঘন হয়ে বসে ফিসফিসিয়ে বলে, "কারুক্কে বলিস না যেন তোরা। আমাদের দেবু ডেরাইভারের কাণ্ড বুজলি তো? বছর-বছর বাচ্চা পসব করে বউটা আর দেবু সেগুলোকে বেচে দ্যায়। দাদা-বউদি কাল কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েচে ওকে।"

"সে কী!" চেঁচিয়ে ওঠে মেনকা, "এ কি কুকুরের বাচ্চা নাকি?"

ছোটন একদলা থুথু ফেলে বলে, "কুত্তারও অদম। কুত্তারা তো পিল্লাগুলোকে দেখে-শুনে রাখে। কেউ কাছে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে, এ তো নিজেই নিজের বাচ্চাকে বেচে দিচ্ছে।"

মিনু উত্তেজিত হয়ে মুখে একটা জর্দা পান ঠুঁসে দেয়। কচরমচর করে চিবোতে-চিবোতে বলে, "আর বলিস না। যত নষ্টের গোড়া ওই নাসসিং হোমের আয়াটা। না-না, নষ্টের গোড়া হবে কেন, সে তো ভাল কাজই করেচে। আমাদের বৌদির কানে তুলে দিয়েচে কতাটা। আসলে বখরায় পটেনি বোদয়। ছেলে হলে এক লাক, মেয়ে হলে সত্তুর হাজার বুজলি?"

চোখ দুটোকে গোল্লা পাকিয়ে মেনকা বলে, "তার পর?"

ছোটন বলে ওঠে, "শালা বেজন্মা কোথাকার। আমাদের ডেরাইভারদের নামে কালি লেপে দিল।"

মিনু তাকে থামিয়ে বলল, "আরে শোন-শোন, আগে আমার কতাগুলো শেষ করতে দে। নাসসিং হোমের ভিতরেই বউকে নাকি চড় কষিয়েছে দেবু।"

"কেন?" চেঁচিয়ে ওঠে মেনকা।

মিনু নিজের ঠোঁটের উপরে আঙুল রেখে বলে, "চেঁচাসনি বাপু, আস্তে কতা বল। কে কোতা থেকে শুনে ফেলবে।" তার পর আরও এক টিপ জর্দা মুখে ফেলে বলল, "দেবু নাকি বউকে চড় কষিয়ে বলেছে, এ বারেও আমার তিরিশ হাজার টাকা লোকসান করিয়ে দিলি?"

"কিসের লোকসান?" এ বারে জিজ্ঞেস করে ছোটন।

"আরে মেয়ে হয়েচে যে! হল না তিরিশ হাজার টাকার লোকসান?"

"কার কী লোকসান হল গো মাসি?" ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে বলল ফেলনা। ওদের সকলের মুখে কুলুপ। ল্যাংড়াকে বহিরাগতই ভাবে ওরা। এ বিল্ডিংয়ের কেচ্ছাকাহিনিগুলো যেন ওদের নিজেদের সম্পত্তি। কালাচাঁদ গেছে সরকারদের হোম ডেলিভারির খাবার পৌঁছতে।

মিনু তড়িঘড়ি বলে ওঠে, "ওই মেনকার কতা বলচিলাম রে।"

সামনের দিকের উঁচু দাঁত চারটে বের করে ফেলনা বলে, "তার আবার কী লোকসান? তার তো লাভই লাভ। টাকা-পয়সার লাভ, প্রেম-পীরিতের লাভ। সারা দিন খালি "ইলু ইলু" করতেছে।"

"সেটা আবার কীরে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে মিনু।

"আই লাভ ইউ!" দাঁতগুলো আরেকটু ছড়িয়ে বলল ফেলনা।
"তবে রে," বলে ছুটে গিয়ে ফেলনার পিঠে আলতো করে একটা ঘুষি মারল মেনকা। তার গাল দুটোতে লালচে আভা।
ফেলনা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে এসো মেনকাদি। কালাদারে আমি দেখেশুনে রাখব। তুমি ফিরে এলি তোমার হাতে তুলি দেব।"
মেনকা লক্ষ করল, শেষ কথাগুলো বলার সময়ে ল্যাংড়ার গলাটা যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেল।

## ১৪

দু'রাউন্ড খেলা শেষ হয়েছে। দুটোতেই জিতেছে চাকী-মুখার্জি জুটি। তাই মনের সুখে সিগারেটে একটা টান দিয়ে তাসগুলো শাফ্‌ল করছেন মিস্টার চাকী। মিস্টার তলাপাত্র মিনমিন করে বললেন, "আর খেলে কী হবে? জিতবেন তো আপনারা দু'জনেই আবার।"
"সেটা যার-যার ভাগ্য। তবে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটাও কিন্তু সকলের থাকা উচিত," তাসগুলো বাঁটতে-বাঁটতে বললেন মিস্টার চাকী।
"ছাড়ুন তো আপনার ওই ভাগ্যের কচকচি। এয়ারফোর্সে কাজ করা মানুষরা আবার ভাগ্যফাগ্য মানেন নাকি?" সারা মুখে বিরক্তি ছড়িয়ে বললেন মিস্টার দস্তিদার।
চাকী তাসগুলো বাঁটা শেষ করে বললেন, "বলছেন কী মশাই? অবশ্যই ভাগ্য মানি আমরা। ভাগ্যবান না হলে কি আমাদের উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমান ফিরে আসত? পাকিস্তান এয়ারফোর্স উড়িয়ে দিতে ওকে।"
মিস্টার দস্তিদার বললেন, "সেটা পাকিস্তানের বদান্যতা ছিল। রিয়্যালি ইট ওয়াজ় আ গুড জেসচার।"
"উঁহু, জেনারেসিটি নয়, আসলে ওরা ভয় পেয়েছিল," গোঁফে তা দিয়ে বললেন মিস্টার চাকী।
"কেন ভয় কেন পাবে?" ভুরু দুটোর মাঝখানে অসংখ্য খাঁজ ফেলে বললেন মিস্টার দস্তিদার।
"আসলে আপনারা সিভিলিয়ানরা আমাদের ইন্টারনাল সিক্রেটগুলো জানেন না তো, তাই এ কথা বলছেন।"
"কী রকম সিক্রেট?"
"ডিসিপ্লিন, মশাই ডিসিপ্লিন। অনেক রেগুলেশন মেনে চলতে হয় আমাদের। যেদিন থেকে এলওসি তৈরি হয়েছে সেদিন থেকেই এই কুকুর-বিড়ালের ঝগড়া আই মিন 'ডগ ফাইট' টা চালু হয়েছে।"
"এ আর নতুন কথা কী! সে তো আমাদের দেশের যদু-মধুরাও জানে।" দস্তিদারের সাফ জবাব।
"হ্যাঁ, ডগ ফাইটের কথা জানে তারা, কিন্তু সেই হামলায় কেমন এয়ারক্র্যাক্ট ব্যবহার করা যায়, সেকথা জানে কি?"
"মানে?"
হা হা হা করে দরাজ গলায় হেসে মিস্টার চাকী বলেন, "কী, ঘোল খেয়ে গেলেন তো? বললাম না সিভিলিয়ানরা আমাদের সব সিক্রেট জানেন না। আসলে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে কয়েকটা স্পেশ্যাল প্লেন কিনেছিল যেগুলো দিয়ে টেররিস্টদের ধ্বংস করার কথা। তারই একটা দিয়ে এই ডগ ফাইটটা করছিল ওরা। আমাদের ফাইটাররা ওই প্লেনটাকে গুলি করে নামিয়ে আনার পর খবরটা চাউর হয়ে যায়।"
মিস্টার দস্তিদারও অত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নন। ছেলে আমেরিকায় থাকে বলে তাঁর ধারণা, তাঁরও জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই তিনি বলে ওঠেন, "সে না হয় হল, কিন্তু এই অভিনন্দনকে ওরা ছেড়ে দিল কেন?"
"সেটাই তো ওর লাক। বললাম না আমরাও ভাগ্যে বিশ্বাস করি," মুচকি হেসে গোঁফজোড়া মুচড়িয়ে বললেন মিস্টার চাকী।
মিস্টার দস্তিদার আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারেন না। গলা চড়িয়ে বলেন, "এ সব হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলুন না।"
আজ আর কারও খেলায় মন নেই। তাসগুলোও পড়ে আছে উল্টো হয়ে। হাতে তুলেও দেখেননি কেউ। হুইস্কির গ্লাসে বরফের টুকরোগুলো দিতে দিতে মিস্টার মুখার্জি বললেন, "সিভিলিয়ানদের অত ডিগ্রেড করবেন না মিস্টার চাকী। আমরাও দেশ-বিদেশের খবর কিছু রাখি। আপনি পারমিশন দিলে আমিই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিতে পারি।"
তৃষ্ণার্ত মানুষ কি জলসত্রের কাছে এসে অযথা বাক্যব্যয় করে? নিজের গ্লাসটা হাতে তুলে 'চিয়ার্স' বলেই এক ঢোক গিলে ফেললেন মিস্টার চাকী। শরীরে-মনে একটা মধুর আমেজ মেখে বললেন "আরে বলুন না মশাই, আপনি তো আমাদের এনসাইক্লোপিডিয়া।"
সকলেই 'চিয়ার্স' বলে এক-এক ঢোক গিলে ফেলার পর মিস্টার মুখার্জি বললেন, "ইয়েস অভিনন্দন ওয়াস ভেরি লাকি। কেননা ওকে প্রিজ়নার অফ ওয়ার হিসেবে বন্দি করলে পাকিস্তানকে আমেরিকার কাছে জবাবদিহি করতে হত।"
মিস্টার তলাপাত্র বেশি কথা বলেন না। নির্বিবাদী মানুষ। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ক্লিয়ার আর করলেন কোথায়, আরও তো জট পাকিয়ে ফেলছেন। পাকিস্তান কেন আমেরিকার কাছে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে যাবে?"
চিকেন পকোড়ার প্লেট এসে গেছে। সকলেরই মনোযোগ এখন সেদিকে। এ সব আলোচনা এখন সময় কাটানোর উপকরণ। তবুও মিস্টার মুখার্জি নিজের বলা কথাটি সম্পূর্ণ করার জন্য বললেন, "জট পাকাবার কী হল? এ তো সোজা কথা, একেবারে জলবৎ তরলং। ওই ফাইটার প্লেনগুলো দিয়ে তো টেররিস্টদের ধ্বংস করার কথা, নেবারিং কান্ট্রির বর্ডারে ডগ ফাইটের জন্য নয়। তার মানে তো ব্রিচ অফ কনট্র্যাক্ট! আর সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই অভিনন্দনকে ছেড়ে দেওয়ার নাটক।"
তবুও বিভ্রান্তি যায় না মিস্টার তলাপাত্রর। দুয়ে-দুয়ে চার মেলাতে পারেন না তিনি কিছুতেই। বলেন, "সেসব তো বোঝা গেল। কিন্তু অভিনন্দনের ভাগ্যটা এখানে কী রোল প্লে করছে?"
কয়েক চুমুক হুইস্কির পর মিস্টার চাকী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। তাই তলাপাত্রকে চিমটি কাটতে ছাড়েন না, "যদি অন্য কোনও অর্ডিনারি ফাইটার প্লেন হত, তবে আর অভিনন্দনকে ছাড়ত না ওরা। ওই 'ফাইটিং ফ্যালকন' এয়ারক্র্যাক্টই ওকে বাঁচিয়ে দিল। হি ওয়াজ় লাকি ইনডিড।"
চিকেন পকোড়ার প্লেট খালি হতে থাকে আর হুইস্কির গ্লাস পূর্ণ হতে থাকে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বাক্যালাপ চলতে থাকে। কাশ্মীর সমস্যা, দেশীয় রাজনীতি তথা অর্থনীতি, ধর্ষণের ঝুলে থাকা কেস পেরিয়ে করোনা ভাইরাসে এসে পৌঁছয় তাঁদের আলোচনা।
মিস্টার চাকী একটু বেসামাল হয়ে উঠেছেন। গলা চড়িয়ে বললেন, "ছাড়ুন তো এ সব পলিটিক্স আর ভাইরাসের কচকচি। একটু সেনসুয়াল কিছু বলুন।"
মিস্টার তলাপাত্র মুচকি হেসে বললেন, "আমরা ছাপোষা মানুষ, ওসব টপিকে বেশি কিছু জানি না। আপনিই শোনান কিছু এয়ারফোর্সের মিসাইল মার্কা জোক্স।"
মিস্টার দস্তিদার তাঁকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "অত দূর যাওয়ার কী দরকার? স্মার্টফোন খুলুন, কোনও একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় যান, পেয়ে যাবেন নানা রকম হট অ্যান্ড স্পাইসি টপিক। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মুখে তো কোনও আগল নেই, যা মন চায় পাবলিকলি বলে ফেলে। এই তো ক'দিন আগে একটা ভিডিয়োতে দেখলাম একটা ছেলে হাতে রেকর্ডার নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যাকে-তাকে ধরে জিজ্ঞেস করছে, 'অর্গাজ়ম মানে জানেন?' 'আপনার অর্গাজ়ম হয়?'"
"বলেন কী!" বলে জিভ কাটলেন মিস্টার তলাপাত্র।
"শুধু কি তাই? তার পরেই জনে-জনে জিজ্ঞেস করছে আপনার স্ত্রীর হয়?" বলেই হো হো হো করে হেসে উঠলেন মিস্টার দস্তিদার।
মিস্টার চাকীর একটু ঝিমুনি ধরেছিল। তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, "আলবত হয়। কিন্তু সে তো এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই নিজেই নিজেকে স্যাটিসফাই করি। আফটার অল আয়্যাম অলসো আ হিউম্যান বিয়িং। কী কিছু ভুল কথা বলেছি?"
মিস্টার দস্তিদার অস্বস্তিবোধ করেন। একটা সেনসুয়াল টপিক শোনাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছেন তিনি। মিস্টার চাকী

তাঁর নিজের শোবার ঘরের দরজাটা হাট করে খুলে দিয়েছেন সকলের সামনে। তাই তিনি বলেন, “লেট আস কল ইট আ ডে। চলুন মিস্টার চাকী, বাড়িতে চলুন।”

মিস্টার মুখার্জিও আর বাধা দেন না ওঁদের। তাঁর নিজের শোবার ঘরটাও তাঁকে টানছে।

ঝটপট ডিনার খেয়ে, দাঁত ব্রাশ করে নিলেন মিস্টার মুখার্জি। বিকেল থেকে পরে থাকা শার্ট-প্যান্ট বদলে একটা ঢিলেঢালা বারমুডা প্যান্ট আর গোল গলার টি শার্ট পরে নিলেন। তার পর রাইটিং টেবিলে বসে চিঠিটা লিখতে লাগলেন, ‘Dear Lilith, please accept these offerings ... may the light of this candle burn brightly ... please send your daughter to me ...’

চিঠিটা লেখা শেষ করতেই দরজায় নক করে বিচ্ছু ঢুকল এক গ্লাস গরম দুধ আর জলের বোতল নিয়ে। বলল, “দাওয়াই লে লিয়া সাব?”

মিস্টার মুখার্জি বিরক্ত হয়ে বললেন, “হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে। তুই এ বার যা, আমার খুব ঘুম পেয়েছে।”

“দুধ পি লিজিয়ে, ঠান্ডা হো যায়গা,” দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল বিচ্ছু।

বিচ্ছুকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিয়ে মিস্টার মুখার্জি বললেন, “আজ আমি দুধ খাব না, পেট গরম হয়েছে। তুই খেয়ে নে ওটা। আর অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।”

বিচ্ছু অবাক হয়ে যায়। অন্য দিন ঘুমের আগে তো দলাইমলাই করতে হয় সাহেবকে, আজ কিছু বললেন না তো!

বিচ্ছুকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিলেন মিস্টার মুখার্জি। চিঠিটার তলায় নিজের নামটা সাইন করলেন। তার পর ঘরের মেঝেতে চক দিয়ে একটা বড়সড় বৃত্ত আঁকলেন। বৃত্তটির মাঝখানে একটা মোমবাতি বসিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন কিছু সুগন্ধী ধূপকাঠি। ড্রয়ার থেকে একটা ডিসপোজেবল নিড্‌লের প্যাকেট বের করে ছিঁড়লেন। তার পর বাঁহাতের তর্জনীতে সুচটা ফুটিয়ে দিয়ে টিপে ধরলেন চিঠিটার উপরে। বিন্দু-বিন্দু রক্তের ফোঁটা জমা হতে লাগল সেখানে। চিঠিটা হাতে নিয়ে বৃত্তের ভিতরে ঢুকে জ্বলন্ত মোমবাতিটির সামনে বসলেন তিনি। জ্বলন্ত শিখার উপরে চিঠিটাকে পোড়ালেন স্থির হয়ে বসে। তার পর নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যানে বসলেন। কল্পনা করতে লাগলেন লিলিথের কোনও কন্যা এসে বৃত্তের ভিতরে ঢুকছেন তাঁকে পরিতৃপ্তি দেওয়ার জন্য। নানা বিষয়ে লেখাপড়া করেন আদিদেব মুখোপাধ্যায়। স্পেকট্রোফেলিয়া নিয়েও গভীর জ্ঞান তাঁর। এই ইউরোপীয়ান মিথটি নিয়ে পড়াশুনো করতে করতেই তিনি ইনকুবুস, সাক্কুবুস এবং লিলিথের কথা জানতে পারেন। ভারী সুন্দর দেখতে লিলিথ আর তাঁর মেয়েরা। ঘুমন্ত আদিদেবকে নানা রকম ছলাকলায় তৃপ্ত করেন তাঁরা। স্বমেহনে তৃপ্তি হয় না আদিদেবের, নারীশরীর চাই।

হ্যাঁ, এসেছে। সে এসেছে। আদিদেবের গালে সুড়সুড়ি দিচ্ছে সে। শরীরে আনাচে-কানাচে তার স্পর্শ জাগিয়ে তুলছে তাঁকে। আদিদেব ফিসফিস করে বলেন, “আই থ্যাঙ্ক ইউ ‘ডটার অফ লিলিথ’ ফর কামিং টু মি। ইউ আর ওয়েলকাম।”

মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে বিবস্ত্র হন আদিদেব। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে উথালপাথাল হতে থাকে তাঁর শরীর।

ভোর চারটেয় উঠে চা তৈরি করে বসে আছে বিচ্ছু। কিন্তু তার সাহেব দরজা খোলেন নি এখনও। পাঁচটা নাগাদ মর্নিং ওয়াকের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। তাই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে নক করল বিচ্ছু। কিন্তু তবুও কোনও

দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিলেন মিস্টার মুখার্জি। চিঠিটার তলায় নিজের নামটা সাইন করলেন। তার পর ঘরের মেঝেতে চক দিয়ে একটা বড়সড় বৃত্ত আঁকলেন।
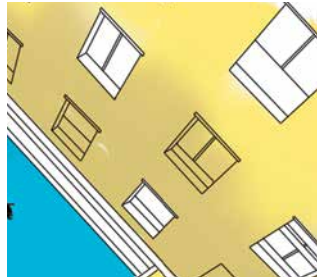
সাড়া না পেয়ে একটু ভড়কে যায় সে। ভাবে, কালাচাঁদকে ডাকবে কি না।

ও দিকে কালাচাঁদেরও টনক নড়েছে। পৌনে ছ’টা নাগাদ সে-ও উঠে এসেছে তিন তলায়। আসলে এই তিন তলাটা তাকে টানে। মেনকা চলে গেলেও তার গন্ধ আর স্পর্শ যেন রয়ে গেছে এখানে। এখন একটা বছর সেই স্মৃতিটুকু নিয়েই অপেক্ষা করতে হবে কালাচাঁদকে। মুখার্জিসাহেবের ফ্ল্যাটের বেলটা বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কালাচাঁদ। লিফ্‌টের কোলাপসিব্‌ল গেটের আওয়াজ পেয়ে উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের দরজাটা ফাঁক করে উঁকি দিলেন প্রিয়ংবদার বাবা। আসলে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।

বিচ্ছু এসে দরজাটা খুলতেই কালাচাঁদ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, “কীরে বিচ্ছু, সাহেব আজ হাঁটতে যাবেন না?”

বিচ্ছু কালাচাঁদের হাতটা ধরে টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বলল, “পতা নেহি। সাহাব তো আজ দরবাজাই নেহি খোলা।”

কালাচাঁদ বলল, “দরজায় টোকা দিয়ে দেখেছিস?”

“হাঁ কালাদা, বহুত খটখটায়া দরবাজা। লেকিন সাহাব তো কোই জবাবই নেহি দে রহেঁ হ্যাঁয়। মেরে কো ডর লাগ রহা হ্যায়।”

কালাচাঁদ বীরদর্পে মুখার্জিসাহেবের শোবার ঘরের দরজাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, “ভয়ের কী আছে? হয়তো ঘুমের ওষুধ বেশি খেয়ে ফেলেছেন কাল।”

তার পর দমাদম কিল-চড়-ঘুষি কষাতে লাগল সে দরজাটার উপরে আর গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, “দরজাটা খুলুন স্যর। আপনি ঠিক আছেন তো? একটু হুঁ-হাঁ অন্তত করুন।”

কিন্তু তা-ও কোনও জবাব আসে না ভিতর থেকে। তাই কালাচাঁদ বলে, “অ্যাই বিচ্ছু, এদিকে আয়তো। চল দু’জনে মিলে লাথি মারি। ছিটখিনিটা খুলে বেরিয়ে যাবে থালে।”

বিচ্ছু একটি পা-ও এগোয় না। ভয়ার্ত মুখে বলে, “অগর সাহাব কো কুছ হো গয়া তো?”

কালাচাঁদও একটু দমে যায়। বলে, “কী বলতে চাইছিস তুই? উনি মরে গেছেন?”

“শুভ্‌ শুভ্‌ বোলো কালাদা। অগর উওহি হুয়া তো পুলিশ আয়েঙ্গে অওর হামকো পাকড়কে লে যায়েঙ্গে। হাম হি তো রহতা হ্যায় উনকে সাথ,” ভয়ে-উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল বিচ্ছু।

কালাচাঁদ একটু চিন্তা করে বলল, “দাঁড়া, আমি পাঁচ তলার ডাক্তারবাবুকে আর ছ’ তলার পুনিতভাইয়াকে ডেকে আনি। ওঁরাই ঠিক করবেন কী করা উচিত। তুই সদর দরজাটা খোলা রাখিস,” বলেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল কালাচাঁদ। লিফ্‌টের অপেক্ষায় বসে থাকা চলবে না।

খবরটা শুনেই ছুটে এল ময়ূখ আর পুনিত। দু’জনেরই পরনে বারমুডা আর গোলগলা টি শার্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। এখনও দৈনন্দিন ব্যস্ততা শুরু হয়নি, সকাল ছ’টা বাজে। শুধু এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এর চৌহদ্দিতে একটা বাঁশির ধুন আছড়ে পড়ছে, “জাগো মোহন প্যারে জাগো ...”

ময়ূখ, পুনিত, কালাচাঁদ আর বিচ্ছু মিলে একটা জবরদস্ত ধাক্কা দিতেই ঝনঝন শব্দে আছড়ে পড়ল আংটসুদ্ধ পেতলের ছিটকিনিটা। আর ওরা চারজনেই বিস্ফারিত চোখে দেখল বিছানার উপরে উল্টো হয়ে শুয়ে আছেন আদিদেব মুখোপাধ্যায়। বিবস্ত্র। মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরিয়ে বালিশটা ভিজে গেছে। সম্ভবত জ্ঞান নেই।

তবে চোখে-মুখে জলের ছিটে আর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতেই চোখ মেললেন তিনি। চাদর দিয়ে তাঁর শরীরটা ঢেকে দিয়ে পাল্‌স দেখল ময়ূখ। পাল্‌স নরমাল হলেও তাঁর সারা শরীর ঘামে ভিজে আছে।

ব্লাড প্রেশার মাপতে-মাপতে ময়ূখ জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি বাথরুমে

গিয়েছিলেন মেসোমশাই? কাপড়-জামা নেই কেন গায়ে?”
আদিদেব সচকিত হয়ে বললেন, “হ্যাঁ ভোরবেলায় বাথরুমে গিয়েছিলাম। কমোডে বসেই হঠাৎ ঘামতে শুরু করলাম।”
ময়ূখ কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, “প্রেশার তো নর্মালই আছে। তবে লক্ষণ কিন্তু ভাল না। হার্ট অ্যাটাকগুলো সাধারণত বাথরুমে গিয়েই হয়। আপাতত কিছু ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি কালাচাঁদকে দিয়ে, তবে কাল-পরশুই ইসিজি আর ইকোকার্ডিওগ্রামটা করিয়ে নেবেন। বাইপাসের বড় হাসপাতালটায় চলে যাবেন, ওদের বলে রাখব আমি।”
পুনিত তড়িঘড়ি বলে ওঠে, “ফিকর মত কিজিয়ে ডাকসাব, ম্যাঁয় চলা যাউঙ্গা মুখার্জি সাবকে সাথ। একই ফ্যামিলি য্যায়সা হ্যায় হাম সব।”
কালাচাঁদ ভাবে, ঠিকই বলেছে পুনিতভাইয়া। মাঝে-মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হয় ঠিকই, তবে এই বিল্ডিং-এর বাসিন্দারা সবাই তো একটা পরিবারের মতোই। একে অন্যের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসেন ঠিক। আজ যদি কালাচাঁদের কোনও বিপদ হয়, এঁরা সবাই কি এগিয়ে আসবেন না?
কালাচাঁদের ভাবনাটা ছিঁড়ে যায় ময়ূখের গলার আওয়াজে।
“এই পোড়া ক্যান্ডল, কাগজ-পোড়া ছাই পড়ে আছে কেন মেসোমশাই?”
এতক্ষণ ঘটনাটার আকস্মিকতায় ওরা কেউ লক্ষ করেনি ওগুলো। তাই সকলেই অবাক হয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আর মহাবুদ্ধিমান আদিদেব সহজ ভাবে বললেন, “ভোররাতে পাওয়ার কাট হয়েছিল বুঝতে পারোনি? বাথরুমে যাওয়ার জন্য ক্যান্ডল জ্বালিয়েছিলাম।”
পুনিত বলল, “কব? ম্যায় তো ল্যাপটপমে কাম কর রহা থা। হমারে ফ্ল্যাট মে তো পাওয়ার নেহি গয়া।”
আদিদেব বললেন, “হয়তো একটা ফেজ় ছিল না।”
কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকলনা ময়ূখের কাছেও। পাওয়ার না থাকলে বুঝতে পারত না ওরা? তা ছাড়া পোড়া কাগজ থাকবে কেন ঘরে? ব্রাউন শুগারটুগার ইনহেল করছেন না তো মেসোমশাই? বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতা মেটাতে কত কিছুই তো করছেন আজকাল মানুষ।

## ১৫

মাঝরাত নাগাদ ফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠাতে ধড়মড় করে উঠে বসে কালাচাঁদ। বালিশের তলায় ফোনটা হাতড়াতে-হাতড়াতে ভাবে, ‘আবার কার কী হল এত রাতে? পাঁচ তলার মাসিমা ঠিক আছেন তো?’
কিন্তু ফোনটা এসেছে একটা অচেনা নম্বর থেকে। তাই ধরবে কি ধরবে না বুঝতে পারে না। ফোনের ঘড়িটা বলছে এখন রাত দুটো বেজে দশ মিনিট। কারও কোন বিপদ না হলে এত রাতে ফোন করে? কথাগুলো ভাবতে-ভাবতেই ফোনের সবুজ বোতামটা টিপে দিল কালাচাঁদ।
“কেমন আছ গো কালাদা?” ফোনের ওপারে যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল, যেন একসঙ্গে ফুটে উঠল অনেক সুগন্ধি ফুল, যেন একটা দোয়েল পাখি গাছের ডালে বসে শিস দিয়ে উঠল। বুকের ভিতরটা তিরতির করে কাঁপছে কালাচাঁদের।
কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কালাচাঁদ বলল, “তুই? এত রাতে ফোন করছিস কেন?”
ওপাশ থেকে খিলখিল করে হেসে মেনকা বলল, “রাত কোথায় গো? এখন তো সবে বিকেল চারটে চল্লিশ এখানে।”
“তা কী করে সম্ভব?” অবাক প্রশ্ন কালাচাঁদের।
“সম্ভব-অসম্ভব জানি না বাপু, তবে এখন এখানে বিকেল চারটে বেজে ৪১ মিনিট। বেবিকে নিয়ে পার্কে গিয়েছিলাম। এই ফিরলাম,” সাফ জবাব মেনকার।
“হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম। এখানে যখন দিন ওখানে তখন রাত, আর এখানে যখন রাত ওখানে দিন। আসলে আমাদের পৃথিবীটা তো কমলালেবুর মতো গোল, তাই সূর্য যখন এ দিকে থাকে, ও দিকে আলো যায় না।”
“চুপ করো তো, তুমি কি আমার ভূগোলের মাস্টার? অন্য কথা বলো।”
“আগে বল তোর ফোনে বিল চড়বে কি না। এত কথা বলছিস কী করে?”
“কী যে বলো না তুমি! এই সবুজ রঙের ফোনের ছবিওয়ালা লাইনটা তো ফিরি। এখানকার দাদা নতুন ফোন কিনে ওইগুলো সব ভরে দিয়েছেন। বলেছেন শুধু সবুজ রঙের ফোনের ছবিটা দিয়ে ছবি পাঠাতে আর কথা বলতে। আমি তো লিখে খবর পাঠাতে পারি না। তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে কথা বলি।”
“বেশ করেছিস। লিখলে পরে কি তোর গলার আওয়াজটা শুনতে পেতাম? আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে কী বলব তোকে! সারা শরীরটা যেন ঝনঝন করছে। তোর কিছু হচ্ছে না?”
“হ্যাঁ তো, হচ্ছে তো! কুছ কুছ হোতা হায় ...”
“বেশ বললি তো! এর পর ছবি তুলে পাঠাস। সেল্ফি তুলতে জানিস তো? নয়তো অন্য কাউকে বলিস তুলে দেবে।”
“সে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমার এখানে অনেক বন্ধু এখন।”
“তাই? তা মেয়ে বন্ধু না ছেলে বন্ধু?”
হেসে গড়িয়ে পড়ে মেনকা বলে, “মেয়ে বন্ধু গো মেয়ে বন্ধু। ছেলে বন্ধু কোথায় পাব এখানে?”
“কেন, তুই যেখানে থাকিস, সেখানে কোনও ছেলে নেই?”
“থাকবে না কেন, অনেক আছে। কচি-জোয়ান-বুড়ো সব রকমের ছেলে আছে। কিন্তু তারা হয় ময়দার মতো ফটফটে সাদা, নয়তো কয়লার মতো কুচকুচে কালো।”
“তা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না বুঝি?”
“কেন করব? আমার তো আছেই এক জন।”
“তাই? কী নাম তার?”
“বেশি ঢং কোরো না তো! আর সবাই কেমন আছে বলো? ল্যাংড়া, ছোটনদা, মিনুমাসি সবাই ভাল আছে তো?”
“ল্যাংড়া তো জানিসই নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছে এখন। আর সবাই ভালই আছে। মুখার্জিসাহেবের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল মাঝে। এখন ঠিকই আছেন।”
“আর আমার আহির সোনা, ইমন সোনা? ওরা ভাল আছে তো?”
“ওদের সঙ্গে আজকাল তেমন দেখা হয় না রে। প্রিয়াদিদি সকালবেলায় কাজে যাওয়ার পথে ইশকুলে দিয়ে যায় ওদের। আর দুপুরবেলায় ওদের দাদু বা দিদা গিয়ে নিয়ে আসেন। নীচে বড় একটা নামে না ওরা। আর তুই বল। কেমন আছিস?”
“অমনিতে তো ভালই আছি, তবে মনটা ভাল লাগে না গো।”
“কেন, ওরা কি তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে?”
“না-না, দাদা-বৌদি খুব ভাল মানুষ। আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার থাকা-খাওয়ার খুব ভাল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আলাদা ঘর আর বাথরুম আমার। ওঁরা নিজেরা তো মাংস, স্যালাড আর ফল খেয়েই দিন কাটিয়ে দেন। তবে আমি দু’বেলো ভাত খাই। তা ছাড়া ফ্রিজ় থেকে, ভাঁড়ার থেকে যখন যা ইচ্ছে বের করে খেয়ে নিই। কিচ্ছু বলেন না ওঁরা, কোনও হিসেবই নেই।”
“তা হলে তোর দুঃখ কিসের?”
“মন খুলে কথা বলতে পারি না যে।”
“কেন, তুই যে বললি অনেক বন্ধু হয়েছে তোর।”
“সে তো হয়েইছে। কিন্তু তারা তো সব ইংরিজিতে কথা বলে। আমি কি ইংরিজি বলতে পারি? ওই একটা-দুটো কথা আর হাসি দিয়ে চালিয়ে নিই। তাতে কি মন ভরে? আর তাদের সঙ্গে তো শুধু বিকেলে দেখা হয়। বেবিকে নিয়ে পার্কে যাই যখন, তখন।”
“কেন, তোর দাদা-বৌদি তোর সঙ্গে কথা বলে না?”
“তাঁদের সময় কোথায়? সারা দিন অফিসে কাটে আর সন্ধেবেলায় বাড়িতে ফিরে দুটো মুখে দিয়েই দু’জনে দু’খানা কম্পুটার নিয়ে বসে পড়েন। বাচ্চাটাকে খাইয়েদাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই তো আমিই।”
“আর শনি-রবিবার? শনি-রবিতে তো ছুটি ওদের, তাই না?”
“শনি-রবির কথা আর বোলো না। সে দুটো দিন তো আরও ব্যস্ত তাঁরা। দাদা বাজার করেন, কাপড় কাচেন, বাড়িঘর ঝাঁটপাট দিয়ে

পরিষ্কার করেন, বাসন মাজেন...”
“দাঁড়া-দাঁড়া। কী বললি? তোর দাদাই এ সব কাজ করে? থালে বৌদি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়?”
“ধুস, তা কেন হবে। বৌদিরও কি কম কাজ? সারা সপ্তাহের রান্না করে রাখা, বাচ্চার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, কম কাজ?”
“তার পর সারা সপ্তাহ ধরে ওই বাসি খাবার খায় তো? তা হলে আর সরকারবৌদির দোষ কী?”
“কী যে বলো না তুমি কালাদা। ফ্রিজে রাখলে আবার বাসি হয় নাকি?”
“শোন-শোন, ভাল করে শুনে রাখ। আমার কিন্তু রোজ টাটকা ঝোল-ভাত চাই। আগের দিনের বাসি ভাত-তরকারি দিলে আমি কিন্তু থালা ছুড়ে ফেলে দেব।”
“ইস, কত শখ!”
“নয়তো কী? তখন তো আর আয়ার কাজ করবি না তুই, আমার ঘর-সংসার সামলাবি। কিন্তু তুই যদি এক্ষুনি ফিরে আসিস, তবে তোর জন্য একটা কাজ রেডি আছে বুজলি তো? ছ'তলার বিক্রমদার বৌ পোয়াতি হয়েছে।”
“তুমিও যেমন! ওই কিপটে বুড়ো-বুড়ি বাচ্চার জন্য আয়া রাখবে? তাও আবার আমাকে?”
“ছাড় ওসব কথা। যেকথা বলছিলাম। শোন, আমাদের আশ্রমের বড়দাকে বলেছিলাম একটা জমির খোঁজ করতে। তা তিনি একটা বিঘা খানেক জমির খবর পেয়েছেন। দু'লাখ টাকা দাম। বায়না করে দিই?”
“না-না, এখুনি ওসব করতে যেয়ো না।”
“কেন, তুই-ই তো বলেছিলি একটু মাটি চাই, গাছ লাগাবি। তা লাগা না কত গাছ লাগাবি।”
“তুমিও যেমন! কাঁঠাল রইল গাছেই আর গোঁফে তেল দিয়ে বসে আছো তুমি। আরে বাবা, আমি আগে দেশে ফিরি, তবে তো সে সব কথা। আমি নিজে জমি দেখে পছন্দ করব।”
“ঠিক আছে, থালে তাই করিস।”
“হ্যাঁ, আর-একটা কথা। আসছে মাসের এক তারিখেই দাদার বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে আমার মাইনেটা জমা করে দেবেন। তুমি কিন্তু বইটা নিয়ে দু' তারিখেই ব্যাঙ্কে যেয়ো। টাকাটা জমা হল কি না দেখো।”
“ঠিক আছে, ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যত দিন আমি বেঁচে আছি, এ সব দায়িত্ব আমার।”
ওদের কথার মাঝখানেই কালাচাঁদ বুঝতে পারল যে, আর-একটা কল আসছে তার ফোনে। তাই সে বলল, “এখন ছাড়ি রে মেনকা, চারতলার রাজীবদা এল বোধহয়। বারবার ফোন করছে। যাই গেটটা খুলে দিই গিয়ে। তিনটে বেজে গেছে।”
মেনকা গলার স্বরে মধু ঢেলে বলল, “বা-ই, টেক কেয়ার।”
“মানে?”
“তার মানে হচ্ছে ভাল থেকো, শরীরের যত্ন নিয়ো।''
“ঠিক আছে। তুই-ও সাবধানে থাকিস।”

সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ চা-মুড়ি খেতে-খেতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে কালাচাঁদ ও ছোটন। এ কেমন ভোজবাজি? কেউ-ই জানতে পারল না খবরটা?
ছোটন লঙ্কায় কামড় বসিয়ে বলল, “এ নিঘ্ঘাত পুনিত লোহিয়ার কাজ।”
কালাচাঁদ বিতৃষ্ণ মুখে বলল, “তুই কী করে জানলি?”
“জানাজানির কী আছে? ব্যাটা শেয়ারে টাকা খাটায়, সব সময়ে দু'পয়সা লাভের ধান্দায় ঘোরে, ও ছাড়া আর কে করবে এমন কাজ?”
“কেন, বিক্রমদাও করতে পারে। সারা রাত কি আর অমনি-অমনি বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?”
ছোটন দাঁত কেলিয়ে বলে, “ধুস, তুই-ও যেমন! মাঝ রাত্তিরে কি দালালি করে কেউ?”
“তবে কী করে?” অনুসন্ধিৎসু কালাচাঁদ।
“মাঝরাত্তিরে কলকাতা শহরে তিন-চার রকমের লোক ঘোরাঘুরি করে। বুঝলি তো?”
“যেমন?”
“যেমন যারা সুপারি নিয়েছে মানুষ খুন করার জন্য, যাদের সংসার চলে চুরি-ডাকাতি করে আর যারা তাদের ধরার জন্য ছুটোছুটি করে মানে পুলিশ।''
একনাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু দম নেয় ছোটন। তার পর আকর্ণ হেসে বলে, “আর যারা মাগীবাড়ি যাওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক করে।”
“তোর খালি বাজে কথা,” চায়ে চুমুক দিয়ে বলল কালাচাঁদ।
“বাজে কথার কী দেখলি? জানিস কত লোক কাজের ধান্দায় দেশ ছেড়ে শহরে এসে থাকে? তাদের বুঝি ইচ্ছে করে না?”
এতক্ষণ চুপচাপ বসে মুড়ি খাচ্ছিল ফেলনা। ওদের কথায় কোনও মন্তব্য করেনি। তবে তার মনেও কিছু কথার ঢেউ উঠছে। তাই গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে সে বলে, “আর-এক ধরনের মানুষও কিন্তু মাঝরাত্তিরে ঘোরে শহরে ...”
ছোটন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, “তুই থাম তো। মাঝরাত্তিরের কথা তুই কী জানবি? তুই তো সন্ধে থেকে গাঁজায় দম দিয়ে ঘুমোস।”
ফেলনা তার চারটে দাঁত বের করে হেসে অস্থির হয়। তার পর হাসি থামিয়ে বলে, “সে তো দু'-চার বছরের গপ্পো গো ছোটনদা। যবে থেকে কালাদা তার পায়ে ঠাঁই দিইছে আমারে।”
ছোটনের সামনে এ সব কথা শুনতে অস্বস্তি হয় কালাচাঁদের। সে আবার কোন কথা কোন দিকে ঘুরিয়ে দেবে বলা যায় না। অমনিতেই দু'জন পুরুষ মানুষকে এক ঘরে ঘুমোতে দেখলে নানা কথা বলে আজকাল মানুষ। তাই ফেলনার বলা আগের কথাটায় ফিরে যায় সে।
“কী বলছিলি তুই? আর কারা ঘোরে মাঝরাত্তিরে? ইঁদুর-বাদুড়?”
“ইঁদুর-বাদুড় নয় গো কালাদা, মানুষ। ভুখা মানুষ।”
এ বার কালাচাঁদ হেসে ফেলে। বলে, “তুই কি আজ আগে-ভাগেই গাঁজা টেনে এসেছিস? ভুখা মানুষরা মাঝরাত্তিরে ঘুরবে কেন, মাঝরাত্তিরে কে তাদের খাবার দেবে?”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলনা বলে, “কেউ দেয় না গো, ওরা খাবার খোঁজে।”
“কোথায়?” একই সঙ্গে বলে ওঠে ছোটন ও কালাচাঁদ।
“আর কোথায়, ডাস্টবিনে। পর দিন সকালে ময়লার গাড়ি এসে সব তুলে নিয়ি যায় যে। তাই যে যা পারে তুলে জমায়ে রাখে।”
“যত্ত সব গাঁজাখুরি গপ্পো!” এক দলা থুতু ফেলে বলে ছোটন, “নিজে এক গাঁজাখোর, গপ্পোও ফেঁদেছে গাঁজাখুরি।”
“না গো ছোটনদা, মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি। তুমি এক দিন মাঝরাত্তিরে বেরিয়ে দেখো।”
“তুই দেখেছিস? মানে নিজে চোখে?”
“দেখিছি কি গো, আমি তো ছোটবেলায় তাই-ই করতাম ...”
ফেলনাকে থামিয়ে দিয়ে কালাচাঁদ বলে, “তুই থাম তো ফেলু, এ সব কথা শুনতে একটুও ভাল লাগছে না আমার।”
কিছু ক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ওরা। এ কথার পর আর ছোটনও ঘাঁটায় না ফেলনাকে। তাই পুরনো প্রসঙ্গটাতেই ফিরে যায় ছোটন। বলে, “একটা বড় দাঁও মারার চান্স ছিল, হাত ফসকে বেরিয়ে গেল সেটাও। রাত-দিন বসে থাকি এখানে, কোন শালা মাঝখান থেকে এসে দালালিটা মেরে দিল বল তো?”
জিভে আর টাকরায় চুকচুক আওয়াজ তুলে কালাচাঁদ বলল, “শুনছি তো দেড় কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে ছ'তলার ফ্ল্যাট দুটো।”
ছোটন চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, “তাহলে ভাবত দেড় কোটির টু পাস্সেন্ট কত হয়?”
“বলতে পারব না, আমি হিসেবে খুব কাঁচা,” হতাশ মুখে বলল কালাচাঁদ।
“দাঁড়া-দাঁড়া আমার মোবাইলে হিসেব করে নিচ্ছি। আমার মেয়ে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে,” পকেট থেকে নিজের মোবাইল ফোনটা বের ক্যালকুলেটারে হিসেব করতে লাগল ছোটন। কিন্তু এক আর পাঁচ লেখার পর ক'টা শূন্য বসাতে হবে ভেবে পায় না সে। তাই ইস্তফা দেয় অঙ্ক কষায়। কালাচাঁদ হঠাৎ বলে ওঠে, “অনলাইন বেচা-কেনা কাকে বলে জানিস?”
ছোটন মাথা চুলকে বলে, “শুনিনি তো কখনও।”
“এই জমিজমা, ফ্ল্যাট-ট্ল্যাটের কথা বলছি,” বলল কালাচাঁদ।
“তুই কোথা থেকে শুনলি এসব কথা? তুইও চুপিচুপি দালালি শুরু করেছিস নাকি?” হিংস্র হয়ে ওঠে ছোটনের চোখ-মুখ।
“ধুস, তুই-ও যেমন!” ওই মুখার্জিসাহেব বলছিলেন পুনিতভাইয়াকে, “অনলাইনে বিক্রি

করে দিয়েছে ফ্ল্যাট দুটো, কাউকে দালালি দেয়নি জমির মালিকের বড় ছেলে।"

ফেলনা মাঝখানে উঠে গিয়ে মুড়ির গামলা, চায়ের কাপ-কেটলি ধুয়ে উপুড় করে রেখেছে। চুলটা আঁচড়ে লম্বা বিনুনি বেঁধেছে। চোখে কাজল পরেছে। তার পর গাঁজার কল্কেটায় টান দিয়ে এসে বসে ঝিমোচ্ছে।

সে হঠাৎ বলে ওঠে, "তা যদি করেও থাকে জমির মালিকের বড় ছেলে, তাতে তোমাদের কী?"

ছোটন গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "এই শালা জ্ঞান দিবি না বলে দিচ্ছি। নিজের বাপ-মায়ের ঠিকানা নেই, আবার আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে! শালা ছক্কা কোথাকার।"

কালাচাঁদের খারাপ লাগে। ফেলনা চোখে কাজল পরে আর লম্বা চুল রাখে বলে ছোটন যা খুশি তাই বলে। আর আজকাল মেয়েগুলো যে টাইট জিন্স পরে আর ছেলেদের মতো চুল কাটে, তার বেলা?

কিন্তু ফেলনা সহজ ভাবে তার উঁচু দাঁত চারটে বের করে হেসে ওঠে। বলে, "জ্ঞান নয় গো ছোটনদা, বলতেছি কি যার-যার ভাগ্যে মানুষ খায়। নয়তো আমি কি আজ তোমাদের সঙ্গে বসি এক গামলা থেকে মুড়ি খেতাম? আমার মতো ভাগ্যবান আর কে আছে বলো?"

কথাগুলো বলেই বাঁশিটা হাতে তুলে নেয় ফেলনা। ধুন তোলে, "পায়ো জি ম্যাঁয়নে রাম রতন ধন পায়ো ..." ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে তার দু'গাল বেয়ে। ময়ূখ আর শর্মিষ্ঠা ফিরে এসেছে দিনের শেষে। কালাচাঁদ দৌড়ে গিয়ে গেটটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবু না থাকায় ময়ূখ নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে আজকাল। তাই গাড়ি পার্ক না করা পর্যন্ত একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কালাচাঁদ। তার পর তাদের হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যায়। ফেলনা বাঁশি বাজানো বন্ধ করে কালাচাঁদের ঘরে চলে গেছে। ছোটন অপেক্ষা করে কালাচাঁদের জন্য। তার হাতে মুখার্জিসাহেবের গাড়ির চাবিটা দিয়ে বাড়ি যাবে। উপরে গেলে ওই মাতাল বুড়োগুলো কোনও না-কোনও কাজে ফাঁসিয়ে দেবে ওকে।

## ১৬

বেলা এগারোটা বাজে। মেনকার পাসবুকটা আপডেট করাতে বাইপাসের মোড়ের ব্যাঙ্কটায় এসেছে কালাচাঁদ। ছোটনকে বসিয়ে রেখে এসেছে ওর জায়গায়। যদিও এ সময়টায় খুব একটা ডাকাডাকি, হাঁকাহাকি করেন না কেউ। সকালে একবার সরকারগিন্নি ডেকেছিলেন পেঁয়াজ এনে দেওয়ার জন্য। আবার যেতে হবে বারোটা নাগাদ। হোম ডেলিভারির টিফিন ক্যারিয়ারগুলো বাড়ি-বাড়ি পৌঁছতে। তাই পুনিত লোহিয়া বেরিয়ে যেতেই বেরিয়ে পড়েছে কালাচাঁদ।

এটিএম-টা থেকে বেরিয়ে পাসবুকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল কালাচাঁদ। মেনকার পাসবুকে জমা হওয়া টাকার অঙ্কটা দেখে মাথা ঘুরে গেল তার। কতগুলো শূন্য রে বাবা! যাওয়ার আগে মেনকা যখন বলেছিল যে, মাসে সত্তর-বাহাত্তর হাজার টাকা মাইনে পাবে, বিশ্বাস হয়নি কালাচাঁদের। কিন্তু পাসবুকটা আপডেট করবার পর মেনকার উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার। এলেম আছে বটে মেয়েটার! হ্যাঁ, ওকেই বিয়ে করবে কালাচাঁদ। সংসার করতে গিয়ে যদি কখনও তেমন টানাটানি হয় তবে আর-একবার নয়তো চলে যাবে অ্যামেরিকায়। কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়ে ফিরে আসবে আবার। ছ'তলার ফ্ল্যাট দুটো বিক্রির দালালি না পাবার দুঃখটা ভুলে যায় কালাচাঁদ।

তবে ছোটনকে বলা যাবে না কথাটা। পাসবুকটাও দেখানো যাবে না। ফিরে গিয়েই তার ঘরের আলমারিটার লকারে রেখে দেবে ওটা। ছোটন জিজ্ঞেস করলে বলবে, অনেক লম্বা লাইন ছিল, তাই ফিরে এসেছে। আবার কখনও যাবে সুবিধেমতো। কথাগুলো ভাবতে-ভাবতেই ঝটপট পা চালায় সে। এ পারে পৌঁছে কালাচাঁদ দেখল একটা লোক ঝাঁকাভর্তি খুদে খুদে কালচে রঙের ফল বিক্রি করছে। কাছে যেতেই জিভ আর গাল সুড়সুড় করতে লাগল তাঁর। মুখের ভিতরটাও ভরে গেল নালে। কত্ত বছর পর ফলসা দেখল সে। আর কিচ্ছু না ভেবে একশো গ্রাম ফলসা কিনে ফেলল সে। আর ফলওয়ালাকে বলল, একটু বেশি করে বিট নুন ছড়িয়ে দিতে। ফলসার ঠোঙাটা সাবধানে ধরে নিজেদের বিল্ডিংয়ের পথ ধরল সে। আর তখনই দেখল, ফেলনা কেমন ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে গিয়ে ট্র্যাফিক লাইটে থেমে থাকা গাড়িগুলোর জানলায় হাত পাতছে। কেউ দু'-পাঁচ টাকা দিচ্ছেন, কেউ বা জানলার কাচ তুলে দিচ্ছেন। তাকে নাম ধরে ডাকতে গিয়েও চুপ করে যায় কালাচাঁদ। মুহূর্তের অসতর্কতায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার চাইতেও বড় কথা, ফেলনা লজ্জিত হবে। মনটার ভিতরে একটা চিনচিনে অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে চলে কালাচাঁদ। আর অবাক হয়ে দেখে ওদের আশপাশের জলাজমিগুলো কে বা কারা যেন বুজিয়ে ফেলেছে। হয়তো আরও নতুন-নতুন বাড়ি তৈরি হবে। ভাবে কালাচাঁদ। কিন্তু ওদের বাড়ির সামনের লেকটাও যদি বুজিয়ে ফেলে! তবে মুখার্জিসাহেবরা হাঁটতে যাবেন কোথায়? আর বাড়িটার নামও তো বদলে ফেলতে হবে। মুখার্জিসাহেবই তো বলেছিলেন, ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্ট্‌স মানে যে বাড়িগুলো থেকে জল দেখা যায়। তা জলই যদি না থাকে তবে আর ওই নাম থেকে কী লাভ?

বর্ষা এসে গেল আবার। ভরা শ্রাবণ এখন। বেঞ্চের উপরে পা গুটিয়ে বসে আছে কালাচাঁদ আর ছোটন। ছোটন বেজার মুখে বলল, "কাল থেকে আর ডিউটিতে আসব না মাইরি। এভাবে ব্যাঙের মতো বসে থাকা যায়?"

ছোটনের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই লিফ্‌টটা এসে ঘটাং করে থামল ওদের পিছনে। আর সেখান থেকেই গলা চড়াল মিনু, "অ্যাই কালা, অ্যাই ছোটন, এট্টু এগিয়ে এসে নিয়ে যা দিকিনি। আমার হাত দুটো পুড়ে গেল যে।"

মুহূর্তে ছোটনের মেজাজে খুশির আমেজ, "কী এনেছ মাসি?"

পান চিবোতে-চিবোতে মিনু বলল, "আজ রাতে দাদা খিচুড়ি আর পেঁয়াজি খাবেন বলেচেন। মুসুর ডাল বাটা পেঁয়াজি। তাই ডালটা বেটে রাখছিলাম শিল-নোড়া দিয়ে। ভাবলাম তোদের জন্য ক'টা ভেজে দিয়ে আসি। দুধ-চাও আচে। এই বাদলা দিনে তোদেরও তো ভাজাভুজি খেতে ইচ্ছে করচে।"

ছোটন ছুটে গিয়ে মিনুর হাত থেকে চায়ের গ্লাস আর পেঁয়াজির বাটিটা নিয়ে বলল, "ও মাসি, তুমি আগের জন্মে আমার মা ছিলে নিঘ্ঘাত। আমার যে কী ইচ্ছে করছিল ক'টা তেলেভাজা আর চা খেতে সে আর কী বলব তোমাকে।"

মিনু গদগদ হয়ে বলল, "ঠিক আচে, তোরা ধীরে সুস্থে, আরাম করে খা। আমি উপরে যাই। সোনোয়িকে রেখে এসেচি তো, বেশিক্ষণ বসতে পারব না।"

গপাগপ পেঁয়াজিগুলো খাচ্ছে ছোটন। কিন্তু কালাচাঁদের মুখে রুচি নেই। সদাসর্বদা আজকাল মেনকার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে সে। কে জানে কেমন আছে ওখানে। বেচারি এত বকবক করতে ভালবাসে, অথচ ওখানে নাকি কথা বলার মানুষই নেই তেমন। কালাচাঁদ তো রোজই রাতে এগারোটার পরে ফোন করে কথা বলতে পারে। কিন্তু এখানকার ক'টার সময় ফোন করলে যে মেনকা ফ্রি থাকবে সে কথা তো জানে না সে। একটা তিন-চার মাসের বাচ্চাকে নিয়ে তো সব সময়েই ব্যস্ত থাকে ও। তবে একটা ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত কালাচাঁদ। ওদের নিজেদের যখন বাচ্চা হবে, তখন কালাচাঁদকে কিচ্ছুটি করতে হবেনা। মেনকাই সামলে নেবে সব। কথাগুলো ভাবতেই কালাচাঁদের ঠোঁটের কোনায় একটা হাসির ঝিলিক। ছোটন খেপে গিয়ে বলে, "অ্যাই, হাসছিস কেন রে শালা?"

তার ভাবনার জগৎটাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে কালাচাঁদ বলল, "সব কথাই কি তোকে বলতে হবে নাকি? তার পর যদি রেগে যাস তুই!"

"কেন, কেন? আমি রেগে যাব কেন? আমার নামে চুকলি করেছিস কোথাও?"

"চুকলি-ফুকলি করিনি, তবে আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। যেভাবে হাভাতের মতো খাচ্ছিস পেঁয়াজিগুলো, মনে হচ্ছে যেন কোনওদিন ভাল খাবার খাসনি।"

"তবে রে বা**, আমাকে বলছিস হাভাতে, তবে তুই কী? আমার আর আমার বউয়ের রোজগার কত জানিস? মাসে উনিশ হাজার টাকা। আমার দশ হাজার আর বউয়ের নয় হাজার। এছাড়াও বোনাস আছে, উপরি আছে। আর তোর? মাত্র তো পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাস মাসে। আবার আমাকে বলছিস হাভাতে! যত্ত সব।"

কালাচাঁদ ভাবে, ছিঃ, ওই হাভাতে কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু কী করবে, মেনকার

কথাটা লুকোতে গিয়ে বলে ফেলেছে ওটা। এখন আর নিজেকে শুধরে নেবার উপায় নেই। তাই সে উল্টে রাগ দেখায়, "আর আমার হবু বউয়ের মাইনেটা ধরবি না? বাপের জন্মে কাউকে দেখেছিস সত্তর-বাহাত্তর হাজার টাকা মাইনে পেতে?"

"কী? কী বললি? সত্তর-বাহাত্তর হাজার টাকা? মাস মাইনে? কে পায়? তোর হবু বউ? র‍্যালা মারার আর জায়গা পাসনি?"

"র‍্যালা মারার কী আছে? যা সত্যি তাই বললাম। তোর যদি বিশ্বাস না হয় তো আলমারি থেকে ব্যাঙ্কের বই এনে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"নিয়ে আয় দেখি," অবিশ্বাসের সুরে বলল ছোটন।

কালাচাঁদের এখন ইজ্জত কা সওয়াল। বলে যখন ফেলেইছে এই লুকিয়ে রাখা কথাটা, তখন তার প্রমাণও দিতে হবে। তাই নিজের ঘরে গিয়ে আলমারির লকার খুলে নিয়ে আসে মেনকার পাসবইটা। আর গত চার মাসে সেখানে প্রায় তিন লক্ষ টাকা জমা হয়েছে দেখে ভিরমি খাবার জোগাড় ছোটনের। চোখ দুটোকে গোল্লা পাকিয়ে সে বলে, "তোর হবু বউ তো সোনার ডিম পাড়া মুরগি রে। মাথায় করে রাখিস ওকে।"

"কারে মাথায় করে রাখবা ছোটনদা?" জল ছপছপিয়ে এগিয়ে আসছে ফেলনা। ডান হাতে লাঠি, বাঁ কাঁধে একটা বাঁক আর বাঁকের দু'দিকে ঝুলছে দুটো মাটির ঘট। ঘটগুলো গাঁদাফুলের মালা দিয়ে জড়ানো।

কালাচাঁদ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুই কোথায় চললি রে ফেলু?"

ফেলনা উপরের পাটির দাঁত চারটে বের করে বলে, "বাবা ডাক দেছেন গো কালাদা। বাবার মাথায় জল ঢালতি যাব তারকেশ্বরে। কাল ভোর রাতে রওনা দেব, আরও কয়েক জন যাবে।"

"তুই কী করে যাবি রে ফেলু? একটা পায়ে অত দূর কি যাওয়া যায়? কষ্ট হবে তোর।"

ওদের কথাবার্তার মাঝখানেই পাঁচ তলা থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল অমলা দাশগুপ্তের আয়া বাসন্তী। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখখানা। কালাচাঁদ এগিয়ে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে গো বাসন্তীদি? মাসিমা ঠিক আছেন তো?"

বাসন্তী বলল, "নাগো কালাদা, মাসিমা শ্বাস নিতে পারছেন না। অক্সিজেন টানতে পারছেন না। আমি কোম্পানিতে ফোন করে দিয়েছি। ওরা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে মাসিমাকে।"

"অর্চিদাদাকে জানানো হয়েছে?" চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল কালাচাঁদ।

বাসন্তী বলল, "সে সব তো কোম্পানির কাজ। ওরাই জানিয়ে দেবে। এখন তুমি একবার উপরে আসবে? একা-একা ভয় করছে আমার।"

ছোটন আর ফেলনাকে উদ্দেশ করে কালাচাঁদ বলল, "তোরা একটু গেটটা দেখিস, আমি উপরে যাচ্ছি।"

পাঁচ তলার অমলা দাশগুপ্তের ছেলে অর্চিষ্মান বিদেশে যাওয়ার আগে একটা এলডার-কেয়ার কোম্পানির সঙ্গে কনট্র্যাক্ট করে গেছে। মাসে পাঁচশ হাজার টাকা নেয় তারা। রোজকার হেলথ কেয়ার ছাড়া এমার্জেন্সিও সামলায় তারাই। সপ্তাহে একদিন এক জন ডাক্তার আসেন চেকআপ করতে। ওই কোম্পানিরই আয়া বাসন্তী। সর্বক্ষণ থাকে। রান্নাবান্না করে, খাইয়েও দেয়। তবে বাজার-হাট করে দেয় কালাচাঁদ। অর্চিষ্মানের সেভিংস অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজার টাকা রাখা আছে যেটা অথোরাইজ় করা আছে কালাচাঁদকে। সেখান থেকেই টাকা তুলে বাজার-হাট করে সে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব লিখে রাখে। মাসে পাঁচশো টাকা পায় বলে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করে সে। কালাচাঁদ আর বাসন্তী উপরে চলে যেতেই সাইরেন বাজিয়ে এসে গেল অ্যাম্বুলেন্স। তবে কার পার্কিংটা জলে ভরে আছে বলে গেটের বাইরেই রইল গাড়িটা। দু'জন বলিষ্ঠ কর্মী স্ট্রেচারটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

বাসন্তী নেমে গেছে নীচে। সে-ও যাবে হাসপাতালে। অর্চিষ্মানদের ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগাতে-লাগাতে কালাচাঁদের মনে হল, তার নিজেরও কি যাওয়া উচিত? বাসন্তী তো কোম্পানির আয়া, অ্যাম্বুলেন্সও কোম্পানির। তারা তাদের ডিউটি করবে কনট্র্যাক্ট অনুযায়ী। আর দ্বিধা না করে কালাচাঁদও উঠে বসল অ্যাম্বুলেন্সে। ছোটনকে বলল, "মুখার্জিসাহেবকে একটু বলে দিস। তাড়া আছে বলে ওঁকে বলে যেতে পারলাম না। ওরা বলছে, মাসিমার অবস্থা ভাল না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

আর ফেলনাকে বলল, "তুই একটু গেটটা

দেখিস ফেলু। আমি না আসা পর্যন্ত বেরোস না। আর তোর খাবারটা ...”

“তুমি যাও দিকিনি। আমার খাবার জন্যি তোমার চিন্তা করতি হবে না। আগে মানুষটারে বাঁচাও।”

যতক্ষণে ওরা মুকুন্দপুরের বড় হাসপাতালটার ইনটেনসিভ থোরাসিক কেয়ার ইউনিটে পৌঁছোল তত ক্ষণে ময়ূখ আর শর্মিষ্ঠাও হাজির সেখানে। কাছাকাছিই আর-একটা হাসপাতালে ছিল ওরা। আদিদেব মুখোপাধ্যায়ের ফোন পেয়েই চলে এসেছে।

কিন্তু এত করেও বাঁচানো গেল না অমলা দাশগুপ্তকে। বিছানায় একটানা শুয়ে থেকে পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল তাঁর। সেটাই ধীরে-ধীরে ফুসফুসের শিরায় উঠে গিয়ে অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ লেখা হল, পালমোনারি এমবলিজ়ম।

পনেরো-কুড়ি ঘণ্টার আগে অর্চিষ্মান এসে পৌঁছতে পারবে না। তাই তার সঙ্গে কথা বলে মুখার্জিসাহেব স্থির করলেন যে অমলা দাশগুপ্তের দেহটিকে বো ব্যারাকের একটা মর্চুয়ারিতে রেখে দেওয়া হবে।

সব কাজ মিটিয়ে ওরা ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এ ফিরল সন্ধে নাগাদ। ময়ূখ, শর্মিষ্ঠা ও আদিনাথ উপরে চলে যাওয়ার পর ছোটন তার সাইকেলটা নিয়ে ছুটল চা আনতে। একটা ছোট পাউরুটিও নিয়ে এল সঙ্গে। বলল, “চায়ে ডুবিয়ে খেয়ে নে রুটিটা। সারা দিন তো পেটে কিছু পড়েনি।”

ফেলনা বলল, “তুমি চান করে এসো কালাদা। আমি ইস্টোবে আলু-সিদ্ধ ভাত করি দিচ্ছি। চাল আর আলু এনে দিয়েছে ছোটনদা।”

স্নান-খাওয়া সেরে, রাত এগারোটা নাগাদ গেটে তালা দিয়ে শুয়ে পড়ল কালাচাঁদ। আজ সারাটা দিন খুব ধকল গেছে। শরীরের চাইতেও মনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। এত বছর একসঙ্গে থাকতে-থাকতে আর সকাল-সন্ধে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে-বলতে কেমন যেন আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে গেছে কালাচাঁদ। তার মনে হয়, আহা! অর্চিদাদাও তারই মতো অনাথ হয়ে গেল।

চোখ দুটো সবে লেগেছিল কালাচাঁদের, হঠাৎ ফোনের আওয়াজে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। ফোনের ও পাশে মেনকার গলার স্বর, “কী গো, আজ এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছ যে! এখন তো তোমাদের ওখানে বারোটাও বাজেনি।”

‘তোমাদের ওখানে’ শব্দবন্ধটা একটু বাজল কালাচাঁদের কানে। তার মানে গত চার-পাঁচ মাসেই মেনকা নিজেকে আমেরিকার আবাসিক ভাবতে শুরু করেছে। তাই এখানকার খবরটা চেপে গিয়ে কালাচাঁদ বলল, “কী খবর বল।”

“ব্যাঙ্কে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ, তোর টাকা ঠিক সময়েই জমা পড়েছে।”

“জানো কালাদা, আজ পার্কে এখানকার ন্যানিদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আমি এক হাজার ডলার মাইনে পাই শুনে ওরা বলল, দাদা-বৌদি আমাকে নাকি ঠকাচ্ছেন। ওরা নাকি কেউ দু’ হাজার, কেউ আড়াই হাজার ডলার পায় মাসে। তাই দাদা-বৌদির সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছে আজ।”

কালাচাঁদ রেগে যায়। অমনিতেই মন-মেজাজ ভাল নেই আজ। তাই বলে, “যে থালায় খাচ্ছিস, সেই থালাতেই ছ্যাঁদা করছিস? তোকে যদি তাড়িয়ে দেয় ওরা?”

“তাড়ালেই হল? এদেশের নিয়ম খুব কড়া। তাছাড়া দেশ থেকে কাজের লোক নিয়ে আসাও বেআইনি। আমাকে আত্মীয় দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। দাদা-বৌদির ঘরের দরজায় আড়ি পেতে সব শুনে নিয়েছি আমি। আর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ওরা করবে না।”

“কী করে জানলি তুই?”

“বাঃ, বাচ্চাটা সারা দিন আমার জিম্মায় থাকে না?”

মেনকার বলা কথাগুলোর গূঢ় অর্থ ভেবে শিউরে ওঠে কালাচাঁদ। এমন চতুর মেয়েকে বিয়ে করে সে সুখী হবে তো?

## ১৭

আজ বহুদিন বাদে ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এ খুশির জোয়ার। ছ’তলার সরকারদের পুত্রবধূ মৌটুসির ছেলে হয়েছে। ছেলেসহ মা বাড়িতে ফিরে এসেছে। তারা দু’জনেই সুস্থ আছে। কালাচাঁদকে ডেকে বাড়ি বাড়ি মিষ্টির প্যাকেট পাঠিয়েছেন সরকার গিন্নি। পুত্রবধূর উপরে আর কোনও অভিযোগ নেই তাঁর।

কিন্তু এই সুখবরটা আরও কিছু মানুষের কানে পৌঁছে গিয়েছে বলে আতান্তরে পড়েছেন সরকারগিন্নি। চাল-আনাজ-মিষ্টি ও মৌটুসির সাধে পাওয়া একটা শাড়ি দিয়েও তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি তিনি। তারা ঢোল বাজিয়ে নাচ-গান করছে ছ’তলায়, জোরে-জোরে হাততালি দিচ্ছে। আর সেই হাততালির আওয়াজ ছাপিয়ে সরকারগিন্নি তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, “কালাচাঁদ, ও কালাচাঁদ ...”

কিন্তু কালাচাঁদ কী করবে? এ তো তাদের হকের পাওনা। সবাই দেয় বলেই তো খেয়ে-পরে বেঁচে আছে ওরা। তাই কালাচাঁদ ঘাপটি মেরে বসে আছে। শুনেও না শোনার ভান করছে।

দুপুর বেলাটা খাঁ খাঁ করে কারপার্কিংটা। শক্তপোক্ত লোহার দরজা থাকলে কী হবে, একটা পাল্লা তো খোলা রাখতেই হয়। হাজারটা লোক আসছে-যাচ্ছে সারা দিন। কত বার দরজা খুলে দেবে কালাচাঁদ? আর এই লোকগুলোও খুব চালাক। এসেছে ঠিক দুপুরবেলাতেই, যখন বাড়ির কর্তারা বাড়ি নেই। তবে সরকারমশাই আর বিক্রমদা তো বাড়িতেই থাকে। তারা কী করছে? ভাবে কালাচাঁদ।

আধঘণ্টা চেঁচামেচি করে নেমে এল ওরা। তাদের হাবেভাবে, কথায়-বার্তায় অসন্তোষ। যাওয়ার সময় কালাচাঁদকে বলে গেল, “খুব কঞ্জুষ আছে বুড়িটা। আরে বাবা, পোতার মুখ দেখেছিস, একটু রোকড়া ছাড়, মালগুলো নিয়েই কি চিতায় উঠবি নাকি?”

কালাচাঁদের খুব ইচ্ছে করছে যে জিজ্ঞেস করে, কত দিল ওরা? পরক্ষণেই মনকে প্রবোধ দেয়, কী দরকার? সে নিজে না দাতা, না গ্রহীতা, তবে কিছু তো দিয়েছে নিশ্চয়ই। নইলে ওরা অশ্লীল নাচ-গান করে পাড়া মাথায় করত। ফেলনা ভিক্ষে করতে বেরিয়ে গেছে। ছোটন ভাত খেয়ে ফেরেনি এখনও। একা-একা বসে নানা কথা ভাবছে কালাচাঁদ।

“কীরে কালা, কী ভাবছিস বসে-বসে? মেনকার কথা?”

কালাচাঁদ বুঝতেই পারেনি, কখন ছোটন ফিরে এসেছে। মাঝে-মাঝে অদ্ভুত-অদ্ভুত ভাবনা পেয়ে বসে তাকে। কখনও সে দেখতে পায়, একটা ছোট্ট বাড়ি। ইটের গাঁথনি আর টিনের চাল। নিকোনো উঠোনে তুলসীমঞ্চ। মেনকা সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করছে। বাড়িটার চার পাশে কত রকমের ফুলের গাছ। জবা, কাঞ্চন, টগর, রক্তকরবী। মেনকার শরীরটা ভারী হয়েছে। তার মস্ত পেটটার ভিতরে সাঁতার কাটছে কালাচাঁদের বাবা নয়তো মা ...

“এই কালা, তুই বেঁচে আছিস তো? নাকি মরেই গেলি?” ছোটন এসে ধাক্কা দেয় কালাচাঁদকে।

ঘোর ভেঙে যায় কালাচাঁদের। বলে, “তুই কখন এলি? বুঝতে পারিনি তো!”

ছোটন বলে, “তুই তো আজকাল জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখিস দেখছি। কখন থেকে ডাকছি তোকে, তা তোর তো কোনও হুঁশই নেই। খবর শুনেছিস?”

“কীসের খবর?”

“আরে, বৌবাজারে ধস নেমেছে।”

“কিসের ধস?”

“আরে ধস কাকে বলে জানিস না নাকি? মাটি বসে গেছে। অনেক বাড়ির ভিত নড়ে গেছে। ফাটল ধরেছে।”

“কেন? ভূমিকম্প হয়েছিল? আমি বুঝতে পারিনি তো!”

“ধুস বোকা**, ভূমিকম্প কেন হবে? মেট্রো রেলের জন্য মাটি খুঁড়ছে না? বোধ হয় বেশি খুঁড়ে ফেলেছিল। ঠিক জানি না। তবে অনেক লোক বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম।”

“তুই বৌবাজারে গিয়েছিলি?”

“ওখানে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। টিভিতে দেখলাম।”

“তাই? চল মুখার্জিসাহেবের ঘরে গিয়ে টিভি দেখি।”

“পাগল! যেচে বাঘের মুখে হাত দেয় কেউ? তোর ইচ্ছে করে তো যা। আমি যাচ্ছি না।”

কিন্তু বাঘ নিজেই যদি নীচে নেমে এসে হালুম-হুলুম করেন?

“অ্যাই ছোটন, কোথায় গেলি তুই?” বলতে-বলতে লিফ্ট থেকে নেমে এলেন আদিনাথ মুখোপাধ্যায়। পরনে বারমুডা প্যান্ট আর গেঞ্জি। পায়ে হাওয়াই চটি।

এই পোশাকে কখনও নীচে নামেন না তিনি, তাই কালাচাঁদ পড়ি কি মরি করে এগিয়ে গেল। বলল, "আপনার শরীর ঠিক আছে তো স্যার?"

"কেন, আমার শরীরের কী হবে?" ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল মুখার্জিসাহেবের।

আসলে পাঁচ তলার অমলা দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে একটু শঙ্কিত হয়ে আছে কালাচাঁদ। মুখার্জিসাহেবেরও তো বয়েস হয়েছে। তার উপরে মাসকয়েক আগে ভোর রাতে কেমন অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাই সে বলে, "না-না অমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম। আসলে এমন ভাবে তো নীচে নামেন না আপনি।"

কথাটা সত্যি হলেও আমল দিলেন না তিনি। ছোটনকে বললেন, "গাড়িটা বার কর, আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।"

ছোটন ঘাড়টা হেলিয়ে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু কদ্দুর যাবেন স্যর? গাড়িতে কিন্তু পেট্রল বেশি নেই।"

"বেশি দূরে না, এই কাছেই বৌবাজারে যাব। রাস্তায় পেট্রল ভরে নেব কোনও পাম্প থেকে। মুনশিবাজারে একটা পাম্প আছে না?"

ছোটন আতঙ্কিত হয়ে বলে, "বৌবাজারে কী করতে যাবেন? ওখানে তো রাস্তায় ধস নেমেছে। বাড়ি-ঘর বসে গেছে। ফাটলও ধরেছে অনেক বাড়ির দেয়ালে।"

"ও, তুই জানিস সেকথা? কোথায় শুনলি? গিয়েছিলি নাকি ওদিকে?" একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন বেরিয়ে এল মুখার্জিসাহেবের মুখ থেকে।

"টিভিতে দেখেছি। যখন ভাত খেতে বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন।"

"সেই জন্যই তো। আমার এক বন্ধুর বাড়ি ওখানে। অনেক পুরনো বনেদি বাড়ি। অনেক দামি-দামি পেন্টিং আছে, অ্যান্টিক ফার্নিচার আছে। ও তুই বুঝবি না। কিন্তু ফোন তুলছে না যে। যাই এক বার দেখে আসি ঠিকঠাক আছে কিনা সবাই।"

"কিন্তু স্যর, ওখানে তো নো এনটিরি করে দিয়েছে পুলিশ। গাড়ি ঢুকতে দেবে না।"

"তুই ঠিক জানিস?"

"হ্যাঁ স্যর, টিভিতেই তো দেখাচ্ছে।"

ওদের কথার মাঝখানেই ছ'তলা থেকে নেমে এসেছে বিনীতের বউ। পরনে বাঁধনি ছাপের শিফন জর্জেট শাড়ি। সবুজ রঙের। শাড়িটা পাট করে বাঁ কাঁধে পিন করা। ডান কাঁধটা ঢেকে মাথায় ঘোমটা দেওয়া। দু'হাত ভর্তি সবুজ কাচের চুড়ি। গলায় মঙ্গলসূত্র আর কপালে ছোট্ট একটা টিপ।

কালাচাঁদের অভিমুখ বদলে যায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, "ভাবিজি আপ!"

"তুমহারে পাস উনলোগোকো কোই ফোন আয়া কেয়া?" উৎকণ্ঠিত বিনীতের বউ।

তবে কালাচাঁদ কিছু বলার আগেই আদিনাথ মুখোপাধ্যায় বলে উঠলেন, "ওখানে ফোন যাচ্ছে না। চিন্তা কোরো না, সবাই ব্যস্ত আছে তো, তাই হয়তো ফোন ধরতে পারছে না।"

"বহত ফিকর হো রহা হ্যায় আঙ্কলজি," উদ্বেগে অস্থির বিনীতের বউ।

"চিন্তা করে তো কোনও লাভ নেই, তুমি উপরে চলে যাও। আমি দেখি পুনিতকে যদি ধরতে পারি।"

কিন্তু বিনীতের বউ উপরে গেল না। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল ওদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তাটায়। সন্ধে গড়িয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও পুনিতকে ফোনে পেলেন না আদিনাথ। তাই তাঁর তাস খেলার সঙ্গীদের ফোন করে জানিয়ে দিলেন যে আজ তাস খেলার মুড নেই। কালাচাঁদের মনে হচ্ছে এ ভাবে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকার মানে হয় না। পুনিতভাইয়াদের যদি কোনও বিপদ হয়ে থাকে! তবে কি ও নিজেই চলে যাবে বৌবাজারে? কথাটা মুখার্জিসাহেবকে বলতেই এক ধমক, "তুমি ওখানে গিয়ে কী করবে? তার পর তোমাকে খোঁজার জন্য আবার আরেকজনকে পাঠাতে হবে।"

সাড়ে আটটা নাগাদ ফিরে এল পুনিত ও বিনীত। তবে দু'জনেই বিধ্বস্ত। এখনও পর্যন্ত অক্ষত আছে তাদের শোরুম। তবে ভরসা কী? ধীরে-ধীরে ফাটলটা তাদের দোকান পর্যন্তও আসতে পারে রাতের দিকে। ওরা দু'ভাই অনেক চেষ্টা করেছিল একটা ট্রাক ভাড়া করার। দোকানের জিনিসগুলোকে জোকার গুদামে পাঠিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকত ওরা। কিন্তু কোথায় ট্রাক? শয়ে-শয়ে সোনার দোকান আর স্যানিটারিওয়্যারের দোকান এ অঞ্চলে। হাতাহাতি-মারামারি হয়ে যাচ্ছে একটা ট্রাকের জন্য। তা ছাড়া নো-এন্ট্রি বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে পুলিশ। কোনও গাড়ি-ই ঢুকতে পারছে না। এখন একমাত্র ভরসা ভগবান।

দুটো সুটকেস ডালা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে বিছানার উপরে। তার পাশে রাশিকৃত কাপড়-জামা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুনম। তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে তার। তিন বছরে এত কাপড়-জামা-জুতো-ব্যাগ-কসমেটিকস-পারফিউম জমে মানুষের? আসলে এর নব্বই ভাগ জিনিসই রোহিতের দেওয়া। যখন পৃথিবীর যে শহরে গেছে প্লেন নিয়ে, কিছু না-কিছু নিয়ে এসেছে পুনমের জন্য। এত দিন সেগুলো ব্যবহার করেছে পুনম, কিন্তু আর নয়।

এখন ফেসবুকে ওদের যুগল ফটো দিচ্ছে। বন্ধুরা হইচই করছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেই বন্ধুদের অনেকেই আবার পুনমেরও বন্ধু। ওদের ওয়ালে অভিনন্দন জানিয়েই তারা আবার পুনমের ইনবক্সে জিজ্ঞেস করছে, "হোয়াট্স রং? আর ইউ নট কাপ্‌ল এনিমোর?"

কী জবাব দেবে পুনম এ সব প্রশ্নের? তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। এ বিল্ডিংয়ের লোকেরা জানে না, এ সব গুপ্ত কথা। কেননা এখানে কেউ তার সাইবার বন্ধু নয়। তবে কালাচাঁদ হয়তো আঁচ করেছে কিছু। নাকি নেশার ঘোরে পুনম নিজেই কিছু বলে ফেলেছে ওকে? তবে ছেলেটা বড় ভাল। যদি কিছু বলে ফেলেও থাকে পুনম, ও হয়তো কাউকে বলবে না। মেয়েদের একটা সেভেন্‌থ সেন্স থাকে, যেটা দিয়ে পুরুষমানুষদের মনের কথা ধরে ফেলে তারা। পুনম নিজেও এয়ারহস্টেস ছিল। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়াত। সেই একই এয়ারলাইনের পাইলট ছিল রোহিত। বেশ কিছু ফ্লাইটে একসঙ্গে ডিউটি করেছে তারা। রাতে একই হোটেলে থেকেছে। তখনই প্রেম তাদের। তবে রোহিতের চাহনিতে শুধু লালসা ছিল না, ভালবাসাও ছিল। সে অনুভূতি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করত পুনম। আর পুনমের বাবা-মা তো আকাশের চাঁদ পেয়েছিলেন হাতে। একে সুদর্শন, তায় এয়ারলাইনের পাইলট। তাই তাদের চার হাত এক করতে দেরি করেননি। কিন্তু পুনমের কি আরও কিছু সময় নেওয়া উচিত ছিল? জানে না সে।

বছর দুয়েক ভালই কেটেছিল। প্রেমে-ভালবাসায়-শরীরী খেলায়। রোহিতের এক কথায় চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিল পুনম। কেননা তার মতে একজন পাইলটের স্ত্রী হয়ে সাধারণ যাত্রীদের সেবাদাসী হতে পারে না পুনম। রোহিত যা মাইনে পায়, সে টাকা ফেলে-ছড়িয়েও শেষ করতে পারবে না পুনম। তাদের এয়ারলাইনের ফ্লাইটগুলো যেহেতু সাউথ-ইস্ট এশিয়া বাউন্ড, তাই কলকাতার এই জোড়া ফ্ল্যাট কিনেছিল রোহিত।

কিন্তু পুনম কেন হেরে গেল ওই চিনে এয়ারহস্টেসটার কাছে? পুনমের কী নেই যা ওই মেয়েটার আছে? ওই তো না থাকার মতো বুক, ধানি লঙ্কা-চেরা চোখ আর খাঁদা নাক! সিঙ্গাপুরের নানা জায়গায় ওরা ঘুরে বেড়ায় আজকাল। আচ্ছা রোহিতের কি একবারের জন্যও মনে হয় না, পুনম যদি দেখে ফেলে! নাকি পরোয়াই করে না সে? তবে কেন পরোয়া করবে পুনম? তাই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। কাল সকালের দিল্লির ফ্লাইটের টিকিট কেটেছে। অনলাইন। আপাতত বসন্তবিহারে বাবা-মায়ের কাছেই গিয়ে উঠবে। পরে নিজের একটা আস্তানা খুঁজে নেবে। চাকরিও খুঁজতে হবে একটা। বেশ কয়েক বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে এয়ারহস্টেস হিসেবে কাজ করার। অসুবিধে হবে না হয়তো। আপাতত কাপড়-জামার পাহাড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কোনটা নেবে, আর কোনটা নেবে না? সকলের আগে তার বিয়ের লেহঙ্গা-চোলি আর ওড়নাটা ভরে নিল পুনম। এটা তার বাবা-মায়ের দেওয়া। পরক্ষণেই নামিয়ে দিল সেটা। বাবা-মায়ের পয়সায় কেনা হলে কী হবে, সেটাতে লেগে আছে রোহিতের স্পর্শ। তা ছাড়াও একটা অন্য রকমের আবেগ জড়িয়ে আছে ওটার সঙ্গে। যে অনুভূতিটা তাকে বার বার মনে করিয়ে দেবে একজন প্রতারক পুরুষের কথা। তাই সেটা বাতিল হল। বাতিল হল একটা সুটকেসও। প্রয়োজনীয় কিছু জামা-কাপড় আর জুতো গুছিয়ে নিল সে একটা সুটকেসেই। যেগুলো নিজের উপার্জনের পয়সায় কিনেছিল সে। বিয়ের আগে।

বাকি কাপড়-জামাগুলো তিনটে বড়সড়

ক্যারিব্যাগে গুছিয়ে রেখে দিল। একটা দেবে নির্মলার মেয়ের জন্য, একটা ছোটনের মেয়ের জন্য আর তৃতীয়টা কালাচাঁদের হবু বউয়ের জন্য। পুনম জানে, মেনকা নামের আয়াটার প্রেমে পড়েছে কালাচাঁদ। সে আমেরিকা থেকে ফিরে এলেই বিয়ে করবে তারা। পুনম মনে-মনে প্রার্থনা করে, তাদের এই প্রেম যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কালাচাঁদকে ফোন করে পুনম বলল, 'লেকভিউ ফিটনেস' থেকে একটা ওজন করার মেশিন নিয়ে আসতে। পুনমের নাম বললেই দিয়ে দেবে ওরা। মিনিট পনেরো পরেই আবার ফেরত দিয়ে দেবে সে। তার কথামতো ওয়েয়িং মেশিনটা এনে পুনমের সুটকেস আর ব্যাগটা ওজন করে দিল কালাচাঁদ। এবং ফেরত দিতে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই পুনম কাপড়-জামা-জুতো-ব্যাগ-কসমেটিক্স-পারফিউমভর্তি ব্যাগ দুটো তার হাতে দিয়ে বলল, "এক তুমহারে বিবিকে লিয়ে অওর দুসরা ছোটনকে বেটিকে লিয়ে।"

লজ্জায় লাল হয়ে কালাচাঁদ বলল, "হামারা তো বিবি নেহি হ্যায় ম্যাডাম।"

"হো যায়েগি কুছ মাহিনো মেঁ। রাখ লো," মিষ্টি হেসে বলল পুনম। "অওর কাল সুবা ছে বাজে এক অ্যাপ ক্যাব আয়েগি, দরওয়াজা খোল দেনা। উপর আকে মেরা সুটকেস লে যানা। অওর হাঁ, ইয়ে ফ্ল্যাটকে চাবি অওর গাড়িকে চাবি তুমহারে পাস রাখ না। সাহাব আনে সে উনকো দে দেনা।"

"আপ কাঁহা যা রহে হ্যায় ম্যাডাম?" চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল কালাচাঁদ।

"দেলহি, মেরি মাকে পাস," কথাটা বলে একটা মস্ত দাঁড়ি বসিয়ে দিল পুনম। কালাচাঁদেরও আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না।

নীচে গিয়ে ছোটনকে কথাগুলো বলে ব্যাগটা দিল কালাচাঁদ। প্রাথমিকভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছোটন বলল, "একটা বেলাউজ আমি আমার বালিশের তলায় রেখে দেব গন্ধ শোঁকার জন্য।"

তারপরই পাকা কৌঁসুলির মতো জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়নি তো? পুনমম্যাডাম আবার ফিরে আসবে তো?"

দু'চোখ ভরা জল নিয়ে কালাচাঁদ বলল, "জানি না।"

## ১৮

এ বছর শীতটা পড়েছে জব্বর। পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে পারদ নেমে গেছে অনেকটাই। কলকাতার মানুষের জবুথবু অবস্থা। উলিকটের গেঞ্জি, মাফলার, মাঙ্কি ক্যাপ দিয়েও আটকানো যাচ্ছে না তাকে। আদিনাথ মুখোপাধ্যায় শর্টস ছেড়ে গরম ট্র্যাকপ্যান্ট পরে মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছেন। আর নানা রকমের ওয়ার্মার গেঞ্জি, সোয়েটশার্ট আর ডাউন্স জ্যাকেট দিয়ে বুক-পিঠ রক্ষা করছেন। অমনিতেই সিওপিডি-র সমস্যাটা বেড়ে যায় এই শীতকালেই। পল্যুটেড ভারী বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। একবার নিউমোনিয়া ধরে গেলে আর দেখতে হবে না।

আদিনাথ মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এসে দেখলেন ত্রিসীমানায় নেই কালাচাঁদ। তিনি জানেন বাইপাসের মোড়ে চা আনতে গেছে সে। এটাই রুটিন হয়ে গেছে বলে আর কিছু বলেন না তিনি। সত্যিই তো, চা তো চাই-ই সকালে সকলের। তার উপরে যা ঠান্ডা পড়েছে!

ফেলনা মন দিয়ে মরসুমি ফুলের গাছগুলোতে জল দিচ্ছে, মরা পাতাগুলো বেছে ফেলে দিচ্ছে, ফুটে যাওয়া বাসি ফুলগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিচ্ছে। এই কাজটা শিখিয়েছেন আদিনাথ। আর তাঁকে শিখিয়েছিল শিলিগুড়ির সরকারি বাংলোর মালি। প্রত্যেক ফুলের তলায় থাকে এক বীজভাণ্ডার। সেই বীজগুলোকে পুষ্ট করতে গিয়ে গাছের সব রস শুষে নেয় ওই ওভারি। তাই তাকে ছেঁটে ফেলে দিলে গাছটা সতেজ হয়ে ওঠে। আদিনাথ ভাবেন, কী অদ্ভুত ইনস্টিংট। গাছপালা, জীবজন্তু মায় মানুষও এই একই প্রবৃত্তি বহন করে। তাঁর ফ্ল্যাটের উল্টো দিকেই আহির ও ইমনকে নিয়ে থাকে প্রিয়ংবদা। মেয়েটা ডিভোর্সি, অথচ কী যত্নে ছেলে দুটোকে মানুষ করছে! মেনকা চলে যাওয়ার পর নিজের বাবা-মাকে এনে রেখেছে তাদের দেখাশোনার জন্য। আর ছ'তলার সরকারদের ছেলের বউটা! ছেলেটা তো এক মস্তান। কী যে করে ভগবানই জানেন। বিয়েও করেছিল একটা বস্তির মেয়েকে তুলে এনে। অথচ সেই মেয়েটাই মা হওয়ার পরে কেমন আমূল বদলে গেল। আগের মতো উদ্ধত, ঝগড়াটে ভাবটা নেই আর। যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন আদিনাথ, সে এসে গেছে লিফ্‌টে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে। পরনে গ্রে রঙের সার্জের প্লিটেড স্কার্ট, কালো টুইডের ব্লেজার, পায়ে হাঁটু লম্বা কালো মোজা, কালো চামড়ার জুতো। বিনুনি দুটো দুলিয়ে সে বলল, "গুড মর্নিং দাদুভাই।"

আদিনাথও তার গালে গাল লাগিয়ে বললেন, "আ ভেরি গুড মর্নিং মাই সুইটহার্ট," তার পর বাগান থেকে একটা হলদে রঙের স্নোবল ফুল তুলে এনে তার হাতে দিয়ে বললেন, "লং লিভ আওয়ার ফ্রেন্ডশিপ!"

পমপমের বাসটা তাকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আদিনাথ। ভাবলেন, মেয়েগুলো বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়।

পমপমকে বাসে তুলে দিয়ে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মিনু। ফেলনা চোখে-চোখে তার সঙ্গে কথা বলে। মিনুও চোখে-চোখেই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে দাদা-বৌদি বেরিয়ে যাওয়ার পর সে আসবে।

কালাচাঁদ ফিরে এসেছে, তাদের চা-বিস্কুট খাওয়া হয়ে গেছে। লাটুও এসে গেছে গাড়ি ধুতে। সকলের আগে ডাক্তারবাবুর গাড়িটা ধুয়ে দিল সে। দেবুকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে আরও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ময়ূখ আর শর্মিষ্ঠা। ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করা ব্যাপারটা নেই আর।

বাথরুম সেরে ফেলনাও তৈরি হয়ে নিল ভিক্ষে করতে যাওয়ার জন্য। গত মাসে শক্তিগড়ের আশ্রম থেকে ফেরার সময় ধর্মতলা থেকে একটা মোটা সোয়েটার এনে দিয়েছে তাকে কালাচাঁদ। নিজের পুরনো জুতোটাও দিয়েছে ঠান্ডার মধ্যে পড়ার জন্য। কিন্তু সেসব পরে ভিক্ষে করতে গেলে কি পয়সা দেবে মানুষ? তাই পুরনো রংচটা চাদরটাই গায়ে জড়িয়ে নিল ফেলনা। পায়ে ছেঁড়া হাওয়াই চটি। ফেলনা বেরিয়ে যাওয়ার পরই লাটুও বেরিয়ে যায়। আর সাইকেলের ঘন্টিটা বাজিয়ে ঢুকে পড়ে ছোটন। রাজার মতো। বলে, "কীরে চা রেখেছিস আমার জন্য, নাকি সব খেয়ে ফেলেছিস?"

কালাচাঁদ সে কথার জবাব দেয় না। তার মনটা আজকাল ভাল থাকে না। কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস বাড়িটা। মেনকা অ্যামেরিকায় চলে গেল, পুনমম্যাডাম দিল্লিতে চলে গেলেন, অয়নদা মরে গেল, দাশগুপ্তমাসিমাও মারা গেলেন। কেমন যেন পোড়োবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বিল্ডিংটা। শুধু মাঝে-মাঝে চিল-চিৎকার করে ওঠে মৌটুসিবৌদির ছেলেটা। তবে সন্ধের পর একইরকম সরগরম থাকে মুখার্জিসাহেবের ফ্ল্যাট। কখনও 'চিয়ার্স', কখনও 'ট্রাম্প' শব্দদুটো একইভাবে তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়।

মিনু আজ চায়ের সঙ্গে ক'টা কড়াইশুঁটির কচুরি নিয়ে এসেছে ওদের জন্য। কাল রাতের বেঁচে যাওয়া। তপ্ত বা পান্তা, কোনও খাবারেই অরুচি নেই ওদের। কালাচাঁদ কাগজ দিয়ে মুড়ে দুটো কচুরি রেখে দিল ড্রয়ারের ভিতরে। বলল, "ফেলু এসে খাবে।"

ছোটন রেগে যায়। বলে, "কেন, ওর জন্য রাখবি কেন? ও যে কত খাবার পায় মিষ্টির দোকানগুলো থেকে, আমাদের কি তার ভাগ দেয়?"

কালাচাঁদ তার মুখটা বিকৃত করে বলে, "তোর মনটা খুব ছোট রে ছোটন। একটা ভিখিরির ভিক্ষে করা খাবারেও ভাগ বসাতে চাস তুই? সন্ধেবেলায় তোকে চপ-মুড়ি খাওয়ায় না ফেলু?"

"আর তোকে যে রোজ ডিমসেদ্ধ খাওয়ায়, তার বেলা?"

"না রে, আমার খেতে ইচ্ছে করে না, তবুও খাই। কেন জানিস?"

"কেন?"

"ওর যেন মনে না হয় যে আমার দয়ায় বেঁচে আছে ও। এই ডিম আর চপ-মুড়ির পিছনে খরচা করে ওর যেন মনে হয় যে, ও নিজেও কিছু দিচ্ছে। আত্মসম্মান বলেও তো একটা কথা আছে। ঠিক কি না?"

"ঠিক-ঠিক, তোর বিচারটা একদম ঠিক রে কালা," পান চিবোতে-চিবোতে বলল মিনু।

কালাচাঁদ উঠি-উঠি করছে। সরকারদের হোম ডেলিভারির টিফিন ক্যারিয়ারগুলো পৌঁছতে হবে বাড়ি-বাড়ি। দূর থেকে ফেলনাকে আসতে দেখেই খিক খিক করে হেসে ওঠে ছোটন। বলে, "শয়তানকা নাম লিয়া, শয়তান

হাজির হ্যায় ...”
মিনু বলে, “ছিঃ, অমন করে বলচিস কেন রে? ছেলেটা বড় ভাল আর দয়ালু।”
ফেলনা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে বেঞ্চটার উপরে বসে একটু দম নেয়। তার পর মুখে হাজারবাতির আলো মেখে বলে, “তোমরা কেউ দেখতি পেলে না, আমি তারে দেখি এলাম।”
“কাকে দেখে এলি?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কালাচাঁদ।
“মেটরো টেরেন গো। কী সুন্দর দেখতি। বড়-বড় কাচের দরজা-জালনা। আর কী জোরে ছোটে গো!”
“কোতায় দেকলি?” অনুসন্ধিৎসু মিনু।
“এই তো ইসটেডিয়ামের কাছে। কিন্তু হলি হবে কী? আমারে তো ঢুকতি দিবে না। ভিখারিদের ‘নো এনটিরি’,” বলে দু’হাতের বুড়ো আঙুল দুটো নাড়িয়ে হা হা হা করে হাসতে থাকে ফেলনা। যেন একটা মস্ত মজার কথা বলেছে সে।
হাসতে-হাসতেই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সে। বলে, “ওই দ্যাখো কে আসতিছে!”
উপস্থিত তিন জন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে বলল, “তুই!!!”
সদর দরজাটা দিয়ে ঢুকছে মেনকা। পরনে ব্লু জিন্স একটা গোলাপি রঙের জ্যাকেট আর সেই একই রঙের স্নিকার্স। তার কাঁধে যে টোট ব্যাগটা ঝুলছে সেটাও গোলাপি রঙের।
উচ্ছ্বসিত কালাচাঁদ ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, “একটু খবর দিয়ে এলি না কেন? থালে ফুল নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতাম। তাই না রে ছোটন?”
ছোটন দাঁত কেলিয়ে বলল, “নয়তো কী? একবারে মালাবদলটাও করিয়ে দিতাম ওখানেই।”
“তোমাদের এ সব আজেবাজে কথা ছাড়ো তো। অমনিতেই আমার মনমেজাজ ভাল নেই,” কর্কশ গলায় বলল মেনকা।
মিনু তাকে পাশে বসিয়ে, তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ‘‘কেন রে, তোর কী হয়েছে? মেজাজ ভাল নেই কেন?”
মিনুর হলুদ রঙের ফাটা-ফাটা আঙুলগুলো দেখে আর তেলচিটে, ময়লা শাড়িটার গন্ধে গা-টা ঘিনঘিন করে উঠল মেনকার। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমার ভিসা রিনিউ হয়নি। মানে ওদেশে আর থাকতে পারব না আমি। তাই দাদা-বৌদি আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার নতুন লোক নিয়ে যাবে কিছুদিন পর।”
কালাচাঁদ বিচক্ষণ মানুষের মতো বলে উঠল, “শোন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তোর আর কোথাও যেতে হবে না। এ বারে ভবিষ্যতের কথা ভাবি চল।”
মেনকার মনের ভিতরটা রি রি করছে। ভারী তো একটা অশিক্ষিত দরোয়ান, চাল নেই চুলো নেই, আবার এসেছে আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে! তবে সেসব কথা মুখে বলা চলবে না। ব্যাঙ্কের বইটা এখনও কালাচাঁদের কাছেই আছে। তাই সে মিষ্টিমুখে বলল, “অত তাড়ার কী আছে? আরও কিছু পয়সা জমাই আগে। আসছে সপ্তাহেই আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাচ্ছেন সেন্টারের দিদি। সেখানে একটা ভাল কাজ আছে। আমি এখন দিদির বাড়িতেই আছি।”
“সে দেশটা কত দূরে রে?” বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞেস করল কালাচাঁদ।
“সেটাও অনেক দূরে, তবে অন্য দিকে।”
“আর কবে নাগাদ ফিরবি?”
“আরে, আগে যাই তো! তবে মনে হয় ওই ছ’মাসের জন্যই পাঠাবে দিদি। তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।”
“ঠিক আছে, তবে আরও ছ’মাসের জন্য অপেক্ষা করবো না হয়।”
মিনু বলল, “সেই ভাল। তুই হাতে আর-একটু সময় পেলি রে কালা। এ বারে একটু জমিটমি কিনে গুচিয়ে নে। তার পর উলুউলু করে আমরা সবাই মিলে বিয়ে দেব তোদের।”
ফেলনা এত ক্ষণ চুপচাপ বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। কালাচাঁদের মনের গতিকও বুঝতে পারছে সে। তাই পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্য সে বলে উঠল, “আমি কিন্তু নিতবর হব।”
এ সব কথা শুনে বমি পাচ্ছে মেনকার। কিন্তু উপস্থিত কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না সে কথা। তাই মুখের হাসিটা বজায় রেখে বলল, “ও কালাদা, ব্যাঙ্কের বইটা দাও। দেখি কত টাকা জমল।”
তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে কালাচাঁদ বলল, “তুই কেন বিয়ের খরচা দিবি? সে তো দেব আমি। তুই শুধু জমি কেনার অর্ধেক টাকাটা দিস।”
“সে না হয় দেব, কিন্তু ব্যাঙ্কের বইটা দাও আগে। টাকাটা ফেলে রেখে তো লাভ নেই, ছ’মাসের জন্য ফিক্স করে দেব। ভালই সুদ পেয়ে যাব, বলো?”
“দাঁড়া, এনে দিচ্ছি। আলমারির লকারে রাখা আছে,” বলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল কালাচাঁদ।
ফিরেও এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। পাসবুকটা মেনকার হাতে তুলে দিয়ে বলল, “সব ঠিক আছে কিনা দেখে নে।”
মেনকা হেসে বলল, “ঠিক না থাকার কী আছে? আমার পিন নম্বর তো তুমি জানো না। আর জানলেই বা কী? তোমার টাকা যেমন আমার টাকা, আমার টাকাও তো তোমার-ই টাকা।”
উপস্থিত সকলের সামনে মেনকা এ কথা বলাতে কালাচাঁদের বুকে যেন চন্দনের প্রলেপ পড়ে। হালকা চালে সে বলে, “চল, বাইপাসের মোড়ের হোটেলটা থেকে মাছ-ভাত খেয়ে আসি। বেলা তো অনেক হল।”
মেনকা তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “না গো, আমি দিদির বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। তোমরা চান-খাওয়া করো। আমি এ বার যাব।”
তার হাতটা টেনে ধরে মিনু বলল, “আরে, চললি কোতায়? বাচ্চা দুটোর সঙ্গে দেকা করবি না? তোর আইর আর ইমন?”
“না গো মাসি, ওরা হয়তো এখন ইশকুল থেকে ফিরে ঘুমোচ্ছে। ওদের আর ডিসটার্ব করব না।”
বলেই কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে ওদেরকে ‘টাটা বাই বাই’ করে চলে গেল মেনকা। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো মুখটা হাঁ করে বসে রইল কালাচাঁদ।
বসন্ত কাল এসে গেল। প্রকৃতির সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে। শিমুলে-পলাশে-জারুলে-কৃষ্ণচূড়ায়-অমলতাসে রঙিন হয়ে উঠেছে বাইপাস আর ভিআইপি রোডসংলগ্ন কলকাতা। মন্দ-মধুর হাওয়াতেও একটা অদ্ভুত শিরশিরানি। লেকের ধারের বেঞ্চগুলোতে কপোত-কপোতিদের গোপন অভিসার। কিন্তু মন ভাল নেই কালাচাঁদের। আজ শুধু মনে হচ্ছে অয়নদার মতো ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? সাত তলার ছাদে গিয়ে পাঁচিলের উপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখে সে। ডান পা-টা তুলে পাঁচিলের উপরে দাঁড়ানোরও চেষ্টা করে। কিন্তু অয়নের থ্যাঁতলানো মুখটার কথা মনে পড়ে যায়। নীচে নেমে আসে সে। অস্থির হয়ে পায়চারি করে। ছোটন বলে, “তুই কি পাগল হলি কালা? সাত ঘাটের জল খাওয়া একটা বেইমান মেয়ের জন্য নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলি? ক’টা মেয়ে চাস? আমি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব।”
কিন্তু কালাচাঁদ কী ভাবে বোঝাবে ছোটনকে যে মেনকাকে ও ভালবেসেছিল। বিয়ে করা আর ভালবাসায় আকাশ-পাতাল ফারাক। ছোটন তার বৌকে বিয়ে করেছে, সংসারধর্ম পালন করেছে। কিন্তু ভালবেসেছে কি?
চপ-মুড়ি মেখে এনে ফেলনা বলে, “ও কালাদা, একগাল খেয়ে দ্যাখো দিকিনি কেমন হয়েছে মাখাটা।”
কিন্তু কালাচাঁদের মুখে রুচি নেই। সে ছুঁয়েও দেখে না চপ-মুড়ি মাখা। টেবিলের উপরে মাথাটা ঠেকিয়ে বসে থাকে শুধু।
ফেলনা তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, “আমি বলতেছি কালাদা, মেনকা দিদি ঠিক ফিরে আসবি তোমার কাছে। কাল তোমারে বাবার থানে নিয়ি যাবো। সেখানে মানত করলি বাপ বাপ করে ফিরে আসবি সে।”
কিন্তু এ সব কথা স্পর্শ করে না কালাচাঁদকে। কে এল, কে গেল সে দিকেও হুঁশ নেই। ময়ূখ-শর্মিষ্ঠা ফিরে এসেছে, ছোটন বিচ্ছুর কাছে গাড়ির চাবি জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। তিন তলার তাসের আড্ডাও ভেঙে গেছে। একটু আগে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল ছ’তলার বিক্রম। ফেলনা বড় গেটে তালা দেয়। সিকিউরিটি লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু কালাচাঁদ একই ভাবে বসে থাকে। আজকাল সরকারগিন্নির কাছ থেকে রাতের খাবারটাও আনে না সে। ফেলনা কালাচাঁদের ঘরে গিয়ে চুল বাঁধে, চোখে কাজল দেয়। গাঁজার কল্কেতে আগুন দিয়ে কালাচাঁদের কাছে যায়। বলে, জয় বাবা ভোলানাথ।
ফেলনার উপর্যুপরি অনুরোধে কল্কেটায়

বারদুয়েক টান দেয় কালাচাঁদ। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। ফেলনা বলে, "পথম পথম অমনি হয় গো কালাদা। আর-একবার টান দ্যাও দিকিনি। দ্যাখো তো দেখতি পাও কিনা কিছু। দ্যাখো, দ্যাখো, মেনকা দিদি আসতিছে। পরনে লাল বেনারসি শাড়ি, মাথায় মুটুক ..."

কিন্তু সে সব কিছুই দেখতে পায় না কালাচাঁদ। কিংবা দেখতে চায় না। এমন একটা অলীক জীবনযাপনে রুচি নেই তার। তবে ফেলনার দেওয়া ওষুধটায় কাজ হয়েছে। সব দুঃখ ভুলে থাকার একটা গোপন মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছে সে।

## ১৯

কিচ্ছু ভাল লাগে না আজকাল কালাচাঁদের। শুধু মনে হয় এ জীবন বৃথা। ছোট্টবেলায় বাবা-মাকে কেড়ে নিলেন ভগবান তাকে অনাথ করে রেখে। মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত অনাথ আশ্রমেই কেটে গেল বড়দার ছত্রছায়ায়। বটগাছের মতো আগলে রাখতেন তিনি প্রতিটি ছেলেকে। তবে কালাচাঁদের প্রতি একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর। সে কথাটা শুধু কালাচাঁদই নয়, অন্যান্য ছেলেরা, স্টাফরা, কমিটি মেম্বাররাও জানতেন। এটুকুই পাওনা তার জীবনে। মাথার উপরে একটা ছাদ আর পিতৃপ্রতিম একজন মানুষের স্নেহ। তাঁর সুপারিশেই এই ওয়াটারভিউ অ্যাপার্টমেন্টস-এর কেয়ারটেকারের চাকরিটা পেয়েছিল কালাচাঁদ। মেনকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবনের মোড়টাকে ঘোরাতে চেয়েছিল কালাচাঁদ। তাকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানেও দাগা খেল সে। কিছুদিন তার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলে তাকে ব্যবহার করল মেনকা। কেন করল সে এমন প্রতারণা? এর পরেও কি আর কোনও মেয়েকে ভালবাসতে পারবে কালাচাঁদ?

তবে আছে একজন যে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসে কালাচাঁদকে। সে-ও অনাথ। সে-ও পরার্থপর। সে-ও ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু তাকেও বোধহয় হারাতে বসেছে কালাচাঁদ।

আজ সকালেই মুখার্জিসাহেব কালাচাঁদকে ডেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন। এই বিল্ডিংয়ে যারা কাজ করে, তাদের সকলের পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে স্থানীয় থানায়। চুরিচামারি নাকি বেড়ে গেছে খুব এই এলাকায়। তাই পরিচয়হীন কাউকে রাখা যাবে না বিল্ডিংগুলোতে। কালাচাঁদের চিন্তা নেই, কেননা তার আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে। আছে একটা স্থায়ী ঠিকানাও। ছোটনেরও আছে সেসব পরিচয়পত্র। বিচ্ছুর জন্যও তৈরি করে দিয়েছেন মুখার্জিসাহেব। কিন্তু ফেলনা? তার কী হবে? তার না আছে কোনও স্থায়ী ঠিকানা, না আছে বাপ-মায়ের নাম, না আছে রেশন কার্ড, না ইলেকট্রিক বিল, না বার্থ সার্টিফিকেট। আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড তো কোন ছার। একজন মানুষ হলেও সে নাম-গোত্রহীন এবং ভূমিহীন। কেউ একজন এগিয়ে এসে তার মাথার উপরে একটা ছাদের ব্যবস্থা না করে দিলে সে তো অনিকেতই রয়ে যাবে সারা জীবন। ভিক্ষে করে কি একটা স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করা যায়? কথাটা মুখার্জিসাহেবকে বলেছিল কালাচাঁদ। কিন্তু তিনি কানেই তোলেননি কথাটা। ফেলনাকেই কি কথাটা বলতে পারবে কালাচাঁদ? বললেও কী বলবে? তোর বার্থ সার্টিফিকেট আছে ফেলনা? কিংবা কোনও জমির দলিল? প্রশ্নগুলো হাস্যকর হবে না কি? ফুটপাতে জন্ম নেওয়া একটা ছেলে, যে তার বাপ-মায়ের পরিচয় জানে না, সে তার নিজের পরিচয়পত্র জোগাড় করবে কী করে?

ফেলনার তৃপ্ত মুখটা দেখতে পাচ্ছে কালাচাঁদ। মুখার্জিসাহেবের আদেশটা শোনার পর হাসিমুখে সে বলছে, "আমার জন্যি চিন্তা কোরোনি তুমি কালাদা। কত থাকার জায়গা এখন কলকেতায়। ফেলাইওভারের তলায় থাকতি পারি, মেট্রো লাইনের তলায় থাকতি পারি। আমার কি থাকার জায়গার অভাব?"

আজ সন্ধেবেলায় বসে চপ-মুড়ি খাচ্ছিল ওরা তিন জন। কালাচাঁদ, ছোটন আর ফেলনা। কালাচাঁদের ফোনটা বেজে উঠতেই লাল বোতামটা টিপে দিল সে। ছোটন দাঁত কেলিয়ে বলল, "ফোনটা ধরলি না কেন?"

"কী হবে ধরে? ওই তো সরকারবৌদির কোনও বায়না হবে নয়তো মুখার্জিসাহেবের অর্ডার। অনেক করেছি, আর পরোয়া করব না। এই যে বারো বছর ধরে গাধার মতো খাটছি, কী পেলাম আমি বল তো? মাস গেলে পাঁচ হাজার টাকা ধরিয়ে দেয় শুধু। এ কাজটা ছেড়ে দেব আমি ..."

আবার বাজছে ফোনটা। খুব বিরক্ত হয়ে ফোনটা অন করল কালাচাঁদ। একটা অচেনা নম্বর দেখে ধরবে কি ধরবে না ভাবতে-ভাবতেই সবুজ বোতামটা টিপে দিল সে। একটা উৎকণ্ঠিত গলার আওয়াজ ফোনের অন্য প্রান্তে। "কালাচাঁদ বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি। আপনি কে বলছেন?" বিরক্তি ঝরে পড়ে কালাচাঁদের গলায়।

"আমি শক্তিগড়ের অনাথ আশ্রম থেকে বলছি। ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি। কিছু কথা বলছি, একটু মন দিয়ে শোনো।"

এ বারে তটস্থ হয়ে কালাচাঁদ বলে, "হ্যাঁ, বলুন স্যর।"

"কিছুক্ষণ আগে বড়দা মারা গেছেন। জানোই তো বহুদিন ডায়াবিটিসে ভুগছিলেন। কিছু ইচ্ছে ডায়েরিতে লিখে গিয়েছেন তিনি। সেগুলোই ফলো করছি আমরা।"

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু থামলেন ভদ্রলোক। পরের কথাগুলো বলার জন্য হয়তো একটু দম নিলেন। তার পর বললেন, "তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী তোমাকেই মুখাগ্নি করতে হবে। রাতে আসার দরকার নেই, ভোরের ট্রেনেই এসো। আর একটা কথা, মনে-মনে প্রস্তুত হয়ে এসো যে বড়দার জায়গাটা তোমাকেই নিতে হবে। এটাও তাঁরই অন্তিম ইচ্ছে। অনাথ বাচ্চাদের জন্য সহমর্মিতা সকলের থাকে না, যেটা তোমার আছে। তা ছাড়া এ আশ্রমে বহু বছর কাটিয়েছ তুমি, তাই এখানকার নিয়ম-কানুনও তোমার জানা।"

ফোনটা অফ করে থমথমে মুখে বসে থাকে কালাচাঁদ। বড়দার মৃত্যুটাকে মেনে নেওয়াই কষ্টকর, তার উপরে বড়দার চেয়ারে বসা যে অকল্পনীয় তার কাছে! মুখার্জিসাহেবের কাছেও গেল খবরটা দিতে। কাল ভোরের ট্রেনে শক্তিগড়ে যেতে হবে, সে কথাটাও জানিয়ে এল। আদিনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, "ঠিক আছে, যাও। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

কালাচাঁদের মেরুদণ্ডটা আজ হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। বলল, "না স্যর, তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব না। মুখাগ্নি করব যখন আমি, তখন শ্রাদ্ধটাও আমাকেই করতে হবে তো। তাই ফিরতে দেরি হবে।"

একে তো তাস খেলার মাঝখানে উঠে এসেছেন, তার উপরে কালাচাঁদের কথায় বিনয়ের অভাব দেখে রেগে গেলেন তিনি। বললেন, "তা হলে এই বিল্ডিং-এর কাজকর্ম সামলাবে কে?"

"সেটা আমি কী করে বলব স্যর ? অসুবিধে হলে অন্য লোক দেখে নেবেন।"

আদিনাথ কথা বাড়ালেন না। ভাবলেন, কালাচাঁদ ফিরে এলে উপযুক্ত জবাব দেবেন। আপাতত খেলাটা সম্পূর্ণ করতে হবে ও চিকেন পকোড়া এবং হুইস্কির সদ্গতি করতে হবে।

ভোর পাঁচটায় চিংড়িঘাটা থেকে রওনা হয়ে ছ'টা দশের বর্ধমান লোকালে উঠে পড়ল কালাচাঁদ। এত সকালে তেমন ভিড় নেই ট্রেনটায়। জানলার ধারের সিট পেয়ে গেল সে। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় তার মনটাও সক্রিয় হয়ে উঠল। বড়দাকে নিজের বাবার মতো শ্রদ্ধা করত সে। তাঁকে আর কখনও দেখতে পাবে না কিংবা তিনি আর কখনও তার মাথায় হাত রাখবেন না এ সব কথা ভাবতে পারে না কালাচাঁদ। আবার এ কথা ভেবেও আনন্দ হচ্ছে যে, বড়দাই তার নামটি উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু এ গুরুদায়িত্ব কি সে পালন করতে পারবে? সকলের আগে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে তার। তবেই সে অত অনাথের দায়িত্ব নিতে পারবে। আর যদি যায় তো ফেলনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। সে-ও তো অনাথই, কর্মঠও বটে। কিছু না-কিছু কাজ জুটে যাবে তারও।

ফেলনার মাথার উপরে একটা ছাদ আর একটা স্থায়ী ঠিকানার স্বপ্ন দেখছে কালাচাঁদ। পেরিয়ে যাচ্ছে রেললাইনের ধারের ফসলের খেতগুলো। লেবু লজেন্সওয়ালা গলা ফাটাচ্ছে কামরার ভিতরে। সেদিকে লক্ষ্য নেই কালাচাঁদের। তার লক্ষ্যভেদী মনটা আবদ্ধ হয়ে আছে একটা কেন্দ্রবিন্দুতে। ট্রেনটা ছুটে চলেছে শক্তিগড়ের দিকে। নতুন বসতির সন্ধানে।

**অলংকরণ:** পিয়ালী বালা

সানন্দা
সৌন্দর্য ১
গ্রী ষ্ম
সাহসী, অপ্রতিরোধ্য,
বেপরোয়া। গ্রীষ্মের
সেই মেজাজই
ফুটে উঠেছে
লাল-কমলা-
হলুদের অমব্রে আই
মেক-আপে।

# মেক-আপে ষড়ঋতু

বাংলার ছয় ঋতু। চরিত্রে, বৈচিত্রে প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়, নিজ নিজ রূপে অনন্য। শারদীয়ার সাজচিত্রে নানা ঋতুর সেই স্বকীয়তাই তুলে ধরার চেষ্টা করলেন সায়নী দাশশর্মা।

শ র ৎ

চোখের পাতা
ও কোল জুড়ে
আসমানি রঙের
বিন্যাস। ঠোঁটে ঈষৎ
গোলাপির আভা।
শরতের মতোই
স্নিগ্ধ ও সুন্দর।

**হেমন্ত**

প্রাক-শীতের ঋতু, তবে নিজদীপ্তিতে উজ্জ্বল। চোখে-ঠোঁটে গাঢ় রঙের ব্যবহার। শিমারের ছোঁয়ায় আবেদন আরও বেড়েছে।

শী ত
সাজে শীতের
আদুরে আমেজ।
চোখে স্বচ্ছ
শিমারের উপর
উজ্জ্বল সাদা
উইঙ্গ লাইনার।
যোগ্য সঙ্গত
দিচ্ছে ঠোঁটের
ফ্রস্টেড গ্লস।

## বসন্ত

ঋতুরাজ। প্রকৃতি জুড়ে রঙিন খুশির জোয়ার। মেক-আপেও তার ছাপ সুস্পষ্ট। চোখে হালকা বাদামি শ্যাডোর উষ্ণতা, ঠোঁটে-গালে উজ্জ্বল গোলাপির উচ্ছ্বাস।

মডেল: রিয়া ভট্টাচার্য,
রিয়া বণিক, শ্রীলগ্না
মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
কাজু গুহ
(রিয়া ভট্টাচার্য),
ফোন: ৮০১৭৯৪২৬৫১
পোশাক: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
ছবি: সোমনাথ রায়

মাটন পেপার ফ্রাই

# নানা রাজ্যে মাটন

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রন্ধনশৈলীর হেরফেরে নানা রূপে সেজে ওঠে মাটন। উদাহরণ পেশ করলেন শেফ রাহুল অরোরা। সাক্ষী সংবেত্তা চক্রবর্তী।

কষা মাংসের আভিজাত্যই হোক বা রবিবারের আলু দিয়ে ঘরোয়া ঝোলের আরাম, মাটন সর্বদাই মোহময়! মাটনপ্রেমী আমরা বাঙালিরা, বাংলার বাইরে বেরিয়ে যদি এ দেশের 'মাটন ম্যাপিং' করি, দেখতে পাব নানা রাজ্যের হেঁশেলে সাধারণ উপকরণেই কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে পরিবেশিত হয়, স্রেফ হাতের গুণে! শাক, দই বা রাজমা দিয়ে মাটনের পাশাপাশি স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভুনা, তাওয়া পোলাও বা নারকেল দিয়ে ফ্রাই। বিভিন্ন রাজ্যের রকমারি মাটন রান্নার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এলাম এবার। দেখে অবাক হবেন, রান্নাগুলো কত সহজ!

## মাটন পেপার ফ্রাই *(কেরল)*

*দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্রই ভালবেসে খাওয়া হয় এই পদ। কেরল পেপার ফ্রাইয়ের বিশেষত্ব, নারকেলের উপস্থিতি। মালাবার পরোটা, আপ্পাম বা স্রেফ গরম ভাত, সবের সঙ্গেই দারুণ!*

উপকরণ: মাটন ৫০০ গ্রাম, নুন, গোলমরিচ ও লঙ্কা প্রয়োজনমতো। **মসলা বেসের জন্য:** তিল তেল ২ টেবলচামচ, নারকেলকোরা ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টা (স্লাইস করা), মেথিবীজ ১/২ চা-চামচ, জিরে ১ টেবলচামচ, গোটাধনে ১ টেবলচামচ, গোটাগোলমরিচ ২ টেবলচামচ, গুন্ডু চিলি (ছোট, গোল যে লঙ্কা আচার বা সম্বর জাতীয় জিনিস বানাতে বা ফোড়ন দিতে ব্যবহার করা হয়। দোকানেই পেয়ে যাবেন) ২-৩টে, রসুন ৪ কোয়া, আদা ১ সেন্টিমিটার। **গ্রেভির জন্য:** ঘি ১ টেবলচামচ, নারকেল তেল ১ চা-চামচ, তিল তেল ১ চা-চামচ, গোটাসরষে ১ চা-চামচ, কারিপাতা ১০টা, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, লাললঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতা ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: নুন, গোলমরিচ আর লঙ্কা দিয়ে মাটন সেদ্ধ করে রাখুন। মসলা বেসের সব উপকরণ সোনালি করে ভেজে নিন। তারপর একসঙ্গে মিক্সারে পিষে, পেস্টের মতো বানিয়ে নিন। গ্রেভি বানানোর জন্য ঘি, নারকেল তেল আর তিল তেল একসঙ্গে গরম করুন। পেঁয়াজ, আদা আর রসুন সতে করে নিন সোনালি করে। এতে মসালা পেস্টটা দিন। শুকনো মশলাগুলো দিয়ে দিন। তেল ছাড়তে শুরু করলে সেদ্ধ করা মাটন দেবেন। লেবুর রস মেশান। বাদামি রং না ধরা অবধি রাঁধতে থাকুন। নামানোর আগে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবেন।

## দহি গোশ্‌ত *(পঞ্জাব)*

*পঞ্জাবি হোম-স্টাইল ডিশ। দই রয়েছে বলে সহজপাচ্য। গরমকালের জন্য উপযুক্ত।*

উপকরণ: **ম্যারিনেডের জন্য:** মাটন ২৫০ গ্রাম, নুন এবং গোলমরিচ স্বাদমতো, চিনি

**দহি গোশ্‌ত**

জ়াফরানি ইয়াখনি

$^1/_2$ কাপ, তেল ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, দই ২ টেবলচামচ। **গ্রেভির জন্য:** সরষের তেল ২ চা-চামচ, ঘি ২ টেবলচামচ, হিং ১ চিমটে, গোটাসরষে ১ চা-চামচ, কারিপাতা ৫-৬টা, কাঁচালঙ্কা ২টো, আদাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, ছোট ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ ১ কাপ, দই ১ কাপ, বেসন ১ টেবলচামচ, জল ১ কাপ। **গার্নিশিংয়ের জন্য:** টাটকা ধনেপাতা প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: মাটনে ম্যারিনেডের সব উপকরণ একে একে মিশিয়ে, মাখিয়ে নিন। রেখে দিন ২ ঘণ্টা। গ্রেভি বানাতে ঘি আর তেল একসঙ্গে গরম করে নিন। হিং, সরষে, কাঁচালঙ্কা, আদা আর রসুন ফোড়ন দিন। সোনালি-বাদামি রং ধরা অবধি নাড়াচাড়া করে নিন। এবার ম্যারিনেটেড মাংস দিয়ে, ভেজে নিন ৫-৭ মিনিট। তারপর পেঁয়াজ দিয়ে, পাত্র ঢাকা দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে রাঁধতে থাকুন মিনিটকুড়ি। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে নেবেন। এদিকে জলের সঙ্গে বেসন আর দই ভাল করে মিশিয়ে নিন। একটুও ডেলা থাকলে চলবে না। মাটনে মিশিয়ে দিন। ঢিমে আঁচে রাঁধতে থাকুন, যতক্ষণ না মাটন নরম হয় এবং গ্রেভি ঘন হয়ে আসে। নুন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। ধনেপাতা ছড়িয়ে, গরম গরম পরিবেশন করুন।

## জ়াফরানি ইয়াখনি (কাশ্মীর)

*কাশ্মীরের ঠান্ডায় এই সুপ দারুণ। ঠান্ডা লাগা বা গায়ে ব্যথা রোখার পাশাপাশি ত্বকও ভাল রাখে।*

উপকরণ: **ম্যারিনেডের জন্য:** মাটনের নলি হাড় ২৫০ গ্রাম, দই $^1/_2$ কাপ, নুন স্বাদমতো, আদাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, লঙ্কাকুচি ১ চা-চামচ, গোলাপজল কয়েকফোঁটা। **রান্নার জন্য:** ঘি ১ টেবলচামচ, মিহি স্লাইস করা পেঁয়াজ ১ কাপ, গোটাগোলমরিচ ৮-১০টা, দারচিনি ছোট ১ টুকরো, লবঙ্গ ২-৩টে, স্টার অ্যানিস ১টা, জল ৩ কাপ, কেশর কয়েকটা স্ট্র্যান্ড, এলাচগুঁড়ো ১ চিমটে।

প্রণালী: ম্যারিনেডের সব উপকরণ মাটনের নলি মিশিয়ে, ম্যারিনেট করে নিন ৩-৪ ঘণ্টা। ঘি গরম করে গোটাগোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি আর স্টার অ্যানিস ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ দিয়ে, সতে করে নিন। ম্যারিনেটেড মাটন নলি দিয়ে, হালকা সোনালি করে রেঁধে নিন। জল মিশিয়ে, আঁচ

কমিয়ে রাখুন যতক্ষণ না হাড় নরম হয়ে আসে। হয়ে গেলে, নলি সরিয়ে শোরবা ছেঁকে নিন। আবার নলি মেশান, কেশর আর এলাচগুঁড়োও মিশিয়ে নিন। কয়েক মিনিট ঢিমে আঁচে রেখে, গরম গরম সার্ভ করুন।

## কিমা কে পরাঠা (দিল্লি)

*উত্তর ভারতে পরোটা খুবই জনপ্রিয় প্রাতরাশ। অনেকটা আটা আর অল্প ময়দায় তৈরি হয় এই কিমা কে পরাঠা। দই দিয়ে খেয়ে দেখুন!*

উপকরণ: **ডো-এর জন্য:** আটা $^{3}/_{4}$ কাপ, ময়দা ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, ঘি $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, উষ্ণ জল পরিমাণমতো। পুরের জন্য: মাটন কিমা ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, গরমমশলা ১ চা-চামচ, লাললঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, তেল ১ চা-চামচ, কুচনো লঙ্কা ১টা, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, পুদিনাপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, তেল বা মাখন ভাজার জন্য।

প্রণালী: ননস্টিক প্যানে ১ চা-চামচ তেল গরম করে, আদা, রসুন আর $^{1}/_{2}$ কাপ পেঁয়াজকুচি সতে করুন। মাটন দিন। লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো আর নুন মেশান। মাটন নরম হওয়া অবধি রান্না করুন। মাটন ঠান্ডা হলে বাকি পেঁয়াজ, ধনেপাতা-পুদিনাপাতা আর লঙ্কা মেশান। ডো-এ এই পুর ভরে, সাবধানে বেলে, পরোটা ভেজে নিন সোনালি করে।

## গোশ্‌ত সাগওয়ালা (পঞ্জাব)

*পঞ্জাবি রান্নাঘরের চেনা পদ। শাকের স্বাদটা একটু 'মেটালিক' হয় বলে, মালাই আর গুড় মেশানো হয়। ভাবছেন তো, গ্রেভির রংটা ঝলমলে সবুজ নয় কেন? কারণ, মাংস আর শাক একসঙ্গেই রান্না করা হয়— যাতে শাকের মেঠো ফ্লেভার মাংসেও জারিয়ে যায়। চিকেন, ডিম বা পনির দিয়েও এই রান্না করতে পারেন।*

উপকরণ: **ম্যারিনেশনের জন্য:** হাড়ছাড়া মাটন ৫০০ গ্রাম, দই ২ টেবলচামচ, মালাই ৪ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, সরষের তেল ১ টেবলচামচ, রসুনকুচি ১ টেবলচামচ। **গ্রেভির জন্য:** বড় পেঁয়াজ ২টো, বড় টোম্যাটো ২টো, ঘি ২ টেবলচামচ, গুড় ১ টেবলচামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, লঙ্কাকুচি ১ চা-চামচ, পালংশাকের পিউরি ১ কাপ, ধনেপাতার পিউরি ১ টেবলচামচ, নুন এবং গোলমরিচ স্বাদমতো, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কসুরি মেথিগুঁড়ো ১ চিমটে, গরমমশলা ১ চিমটে। **গার্নিশিংয়ের জন্য:** ঘি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ।

প্রণালী: সরষের তেলে রসুন ভেজে নিন। মাটনের উপর ভাজা রসুন আর ম্যারিনেশনের বাকি সব উপকরণ দিয়ে, ভাল করে মিশিয়ে নিন। সারারাত রেখে দিতে হবে। পরদিন ব্লেন্ডারে পেঁয়াজ আর টোম্যাটো দিয়ে, মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন। তারপর পেস্টটা কড়াইয়ে দিয়ে, তেল ছাড়াই রান্না করুন, যতক্ষণ না অর্ধেক হয়ে আসে। ঘি গরম করে,

মাটনের সঙ্গে শাক, রাজমা বা দই দিয়ে গ্রেভিওয়ালা রান্না যেমন সুপারহিট, তেমনই পরোটার পুরে মাটন বা নলি হাড় দিয়ে ইয়াখনি শোরবাও স্বাদে সমান আবেদনময়!

কিমা কে পরাঠা

গোশ্‌ত সাগওয়ালা

তাওয়া পোলাও

মশলাপাতির অনুপাত এবং মূল উপকরণের বৈচিত্র্যেই মাটনের কোনও রান্না হয় স্বাদে জোরালো, কোনওটা ‘রাস্টিক’, আবার কোনওটা হালকা অথচ সতেজ।

গুড় দিন। গুড় গলে গেলে, রসুনকুচি আর লঙ্কাকুচি দিয়ে, মিনিটখানেক সতে করে নিন। মাটন দিন কড়াইয়ে। পেঁয়াজ-টোম্যাটোর মিশ্রণটা দিন। জল দেবেন না। আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। তিন-চতুর্থাংশ রান্না হলে, পালং আর ধনেপাতার পিউরি দিন। ঢাকা দিয়ে, দমে রান্না করুন মাংস নরম হওয়া অবধি। কসুরি মেথি আর গরমমশলা ছড়িয়ে দিন। ঘিয়ে রসুন ভেজে, নামানোর আগে ঘি সমেত রসুনভাজা ঢেলে দিন সাগওয়ালা গোশ্‌তের উপর।

## তাওয়া পোলাও (মহারাষ্ট্র)

*মুম্বইয়ের বিখ্যাত স্ট্রিট স্টাইল ডিশ। জিভ আর পেটকে খুশি করতে জুড়ি নেই। সয়া চাঙ্ক দিয়েও বানানো যায় এই পোলাও।*

উপকরণ: সেদ্ধ বা রোস্টেড মাটন বা সয়া চাঙ্ক) ১০০ গ্রাম, ভাত ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১/২ চা-চামচ, লঙ্কাকুচি ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, পুদিনাপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, স্প্রিং অনিয়নকুচি ১ টেবলচামচ, লাললঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন-গোলমরিচ স্বাদমতো, বিরিয়ানি মশলা ১/২ চা-চামচ, সুইট চিলি সস ১ চা-চামচ, লেবুর রস কয়েক ফোঁটা, তেল ২ চা-চামচ।

প্রণালী: একটা ফ্ল্যাট প্যান অনেকটা গরম করে, তাতে তেল গরম করুন। পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত সতে করে নিন। বাকি সব মশলা আর সিজ়নিং দিয়ে, মিনিটখানেক নাড়াচাড়া করে নিন। মাটন মিশিয়ে, টস করুন। ভাত, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, স্প্রিং অনিয়ন আর লেবুর রস মেশান। স্টার-ফ্রাই করে, পরিবেশন করুন।

## রাজমা গোশ্‌ত (পঞ্জাব)

*দেশভাগের পূর্বের পঞ্জাবি রেসিপি।*

উপকরণ: ছোট রাজমা ১ কাপ, ঘি ২ টেবলচামচ, বড় এলাচ ২টো, তেজপাতা ২টো, মাটন ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ ২টো+ টোম্যাটো ২টো (একসঙ্গে পেস্ট করা), লাললঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, গরমমশলা ১ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা ১টা, গার্নিশিংয়ের জন্য মাখন।

প্রণালী: ঘি গরম করে, এলাচ-তেজপাতা ফোড়ন দিন। আদাকুচি, রসুনকুচি, কাঁচালঙ্কা সতে করে নিন। আঁচ বন্ধ করে মাটন, নুন আর শুকনো মশলাগুলো দিন। গরম কড়াইয়ে রেখে

রাজমা গোশ্‌ত

বিহারি ভুনা মাটন

দিন আধঘণ্টা। তারপর ভাজতে শুরু করুন। সোনালি রং ধরলে, পেঁয়াজ-টোম্যাটোর পেস্ট দিন। ঢাকা দিয়ে, ঢিমে আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ না নরম হয়। ১০ মিনিট অন্তর ঢাকনা খুলে, নাড়াচাড়া করে নেবেন। মাটন নরম হলে রাজমা মিশিয়ে রাঁধুন, মাখো-মাখো হওয়া অবধি। পরিবেশনের আগে একদলা মাখন দিন উপর থেকে।

## বিহারি ভুনা মাটন *(বিহার)*

মশলাদার স্বাদ ও সরষের তেলের সতেজতায় ভরা এই ভুনা মাটন, লিট্টি বা ছাতুর পরোটার সঙ্গে ভাল লাগবে।

উপকরণ: **ম্যারিনেডের জন্য:** কাঁচা পেঁপে ৫০ গ্রাম, রসুন ৫ কোয়া, আদা ১ ইঞ্চি, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লাললঙ্কাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, নুন এবং গোলমরিচ স্বাদমতো, হাড়সমেত মাটন ৫০০ গ্রাম, দই ১ কাপ। **রান্নার জন্য:** স্লাইস করা পেঁয়াজ ৫০০ গ্রাম, হিং ১ চিমটে, শুকনো লাললঙ্কা ২টো, তেজপাতা ২টো, সরষের তেল ৩ টেবলচামচ, ঘি ২ টেবলচামচ। **গোটা মেশানোর জন্য:** ছোট পেঁয়াজ ৮টা, মাঝারি টোম্যাটো ২টো (৪ টুকরো করে কাটা), রসুন ৬-৭ কোয়া, কাঁচালঙ্কা ২টো, আদা ৩-৪ স্লাইস।

প্রণালী: পেঁপে, আদা, রসুন একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। এই পেস্ট এবং বাকি সব উপকরণ মাটনে মাখিয়ে কয়েকঘণ্টা রেখে দিন। তেল গরম করে লাললঙ্কা, হিং, তেজপাতা আর গোটাগোলমরিচ ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ দিয়ে, বাদামি করে ভেজে নিন। তারপর মাটন দিয়ে রাঁধতে থাকুন, যতক্ষণ না সোনালি রং ধরছে। আঁচ কমিয়ে, গোটা পেঁয়াজ, রসুনের কোয়া, কাঁচালঙ্কা আর টোম্যাটো মেশান। ঢাকা দিয়ে, ঢিমে আঁচে রাঁধুন। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে, একটু জল মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে রেঁধে নেবেন। টোম্যাটো যখন গলে যাবে আর মাটন নরম হয়ে আসবে, নামিয়ে নিন।

নানা রাজ্যের নানা রূপের মাটনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় তো করলেন। এবার চেখে দেখার ব্যবস্থাও করে ফেলুন!

**যোগাযোগ:**
rahul.bonappetit@gmail.com

বিহারি ভুনা মাটনের রেসিপি ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন এই QR কোডটি।

শুধু আধ্যাত্মিক বিকাশ নয়, শ্রীজগন্নাথ বাঙালি এমনকী সারা ভারতের মানুষকে আকর্ষণ করেছেন তাঁর বিখ্যাত মহাপ্রসাদের মাধ্যমে। সেই বিখ্যাত পাকশালা ও ভোগের খুঁটিনাটি ইতিহাসের পাতা ওলটালেন পায়েল সেনগুপ্ত।

# শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ

পুরী এবং বাংলার আত্মিক এবং ভৌগোলিক যোগসূত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে অনন্ত অবধি বিস্তৃত। শ্রীজগন্নাথ তাঁর অপার মহিমা নিয়ে যেভাবে অধিষ্ঠান করছেন তাঁর ভক্তদের জীবনে ও মননে, ঠিক সেভাবেই তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ‘ভোগ’-প্রসাদ, যাঁকে মহাপ্রসাদ বলা হয়। শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সারা ভারতবর্ষেই প্রায় ‘মিথ’-এর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ নানা দিক থেকে অনন্য। এর প্রসাদগুণ, রন্ধনপদ্ধতি, পরিমাণ এবং নিবেদন পদ্ধতি ভক্তরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ তো বটেই, ইতিহাসবিদদেরও গবেষণার বিষয়। জনপ্রিয় বিশ্বাসগাথায় বলে, কোনও অদৃশ্য হাত যেন এই রোজকার বিপুল পরিমাণ ভোগপ্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। সুয়ারা এবং সেবায়েতরা, যাঁরা নিত্যদিন এই ভোগপ্রস্তুতি পর্বের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাঁরা ছাড়া বাকি সকলে প্রায় কিছুই জানেন না বা ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে এই ভোগের তৈয়ারি সম্পর্কে। তাই এই নিয়ে গবেষণাও চলছে নিরন্তর। ভারতবর্ষে শ্রীবিষ্ণুর যে ক’টি ধাম বা পীঠ রয়েছে, পুরী তার মধ্যে ‘ভোগ’ পীঠ। চারটি বিখ্যাত বৈষ্ণব পীঠের মধ্যে কথিত রয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু রামেশ্বরমে স্নান করেন, দ্বারিকায় বেশ বদল করেন, পুরীতে আহার করেন এবং বদ্রীনাথে শয়ন করেন। ‘শ্রী’ অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান শ্রীক্ষেত্র বা লক্ষ্মীক্ষেত্রও তাই এরই সংলগ্ন। কারণ মা লক্ষ্মী স্বয়ং নিজের হাতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জন্য ভোগ রন্ধন করেন। পুরীর মন্দিরের পবিত্র রন্ধনশালাও মন্দিরের মতোই বিখ্যাত, সেখানেই মা লক্ষ্মী শ্রীজগন্নাথের জন্য রান্না করেন। শ্রীজগন্নাথের বিখ্যাত রান্নাঘর যেখানে মহাপ্রসাদ প্রস্তুত হয়, তা যেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এই পাকশালা শুধু বৃহৎই নয়, ভীষণ গোছানো, সুশৃঙ্খল এবং প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি হয় এখানে খাবার। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এই প্রসাদ রান্না করেন এবং শ্রীবিষ্ণু নিজহাতে এই প্রসাদ গ্রহণ করেন বলে একে অত্যন্ত পবিত্র বলে ধরা হয়। এমনকী, এই প্রসাদের সামান্য অংশ গ্রহণ করলেও অনেক অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে মনে করেন ভক্তরা। যজ্ঞাগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী এই ভোগ প্রস্তুত করেন এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তা শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করা হয়। এই অর্ণ প্রসাদ তখনই মহাপ্রসাদ বা অর্ণ ব্রহ্ম হয়ে ওঠে। মনে করা হয়, খুব অল্প ভোগপ্রসাদ লাভ করলে সেটাই নাকি শ্রী জগন্নাথের দর্শনের মতোই পুণ্যবান। হিন্দু দেবদেবীদের পূজা-পদ্ধতির মধ্যে ভোগপ্রসাদ ও তার নিবেদনের রীতি খুবই প্রচলিত। কিন্তু পুরীর এই শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিগণিত হয়। পুরীর প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে বলা হয় দারুব্রহ্ম এবং তাঁর প্রসাদকে বলা হয় অর্ণ ব্রহ্ম বা মহাপ্রসাদ।

নীলাদ্রিভিজ রসগোল্লা

## মহাপ্রসাদ রন্ধনের প্রথা

যে কোনও বৈষ্ণব পীঠেই মনে করা হয় যে, শ্রীবিষ্ণু একবার তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা সাধারণ ভোগ থেকে

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

প্রসাদে উন্নীত হয়। পুরী যেহেতু শ্রীবিষ্ণুর ভোজনক্ষেত্র এবং এখানে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর ভোগ রান্না করেন, শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তা গ্রহণ করেন। সারাদিন ধরে নীলাচলের এই শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর জন্য ভোগ প্রস্তুত করা হয়। ফুলকোর্স মিল দিনের বিভিন্ন সময়ে তিনি গ্রহণ করেন। নিয়মিতভাবে 'নীতি' ও 'নৈবেদ্য' আচারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পদ সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানে নিবেদন করা হয় শ্রীজগন্নাথকে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে নটার মধ্যে শ্রীজগন্নাথের স্নান হয়। স্নান শেষে সূর্যপুজোর সঙ্গে রান্নাঘরে যজ্ঞ শুরু হয়। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে প্রতিদিন উনুন জ্বালানো হয়। দারুব্রহ্মের প্রসাদ হল অর্ণ ব্রহ্ম। একমাত্র পুরীতেই এই অর্ণ প্রসাদ বা ভোগপ্রসাদকে অর্ণব্রহ্ম বলা হয়। কথিত রয়েছে যে শ্রীক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নীলাচল পাহাড়ে আদিবাসী রাজা বিশ্বাবসুর দ্বারা নীলমাধব হিসেবে পূজিত হতেন। সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথকে নীলাচল পুরীতে দারুব্রহ্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এবং বৈদিক রীতি মেনে তাঁর পূজা এবং বিভিন্ন উৎসব চালু করতে পেরেছিলেন। সত্যযুগে শ্রীজগন্নাথের চারপ্রকার সেবক ছিল। আচার্য, ব্রহ্মা, চারু হোতা ও পত্র হোতা। সোমবংশীয় রাজা যযাতি কেশরীর সময় থেকে আটধরনের সেবক নিযুক্ত হয়েছিল শ্রীজগন্নাথের জন্য। পরে জগদ্গুরু শ্রী শঙ্করাচার্যের পরামর্শে এই সেবকদের শ্রেণি আরও বিস্তৃত করে এগারোয় এসে দাঁড়ায়, পাণ্ডা, পত্রিবাদু, গারাবাদু, সুয়ার, মহাসুয়ার, অখণ্ড মেকপ, প্রতিহারী, ভাণ্ডার মেকপ, দেউলা, করন এবং চুনারা। এই সোমবংশীয় রাজাদের সময় থেকেই দিনে তিনবার করে ভোগ নিবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই অর্ণ বা অন্ন ভোগপ্রথা যযাতির আমলেই শুরু হয়েছিল শঙ্করাচার্যের উপদেশ অনুযায়ী। অধুনা এই মন্দিরের ভিতরেই 'ইম্পিরিয়াল গ্যাঞ্জেস' বলে জলাধার নির্মিত হয়েছিল। পাতালেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি থেকে

## যা ব্যবহৃত হয়

- আতপ চাল, সুজি, চালের গুঁড়ো, গুড়, ডাল, নারকেল, দই এবং দুধ রান্নায় ব্যবহার করা হয়।
- ভাত কখনও শুধু দেওয়া হয় না। ঘি, দুধ, জল, গুড় বা ডালের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।
- রান্না তৈরির সময় জল ও বাটামশলা দিয়ে রান্না হয়। নিবেদনের সময় উপরে ঘি ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
- **উপকরণ:** তরিতরকারিতে মূলত দেশজ সবজি, যেমন কুমড়ো, বেগুন, ওল, রাঙালু, পটল, শাক, ছোলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এমনকী, কাঁঠাল, কমলালেবু, কলা, নারকেলও ব্যবহার করা হয়। মশলা, যেমন হলুদ, জিরে, সরষে, বড় এলাচ, মরিচ, পেস্তাবাদাম, কিশমিশ।

- টকের জন্য মূলত তেঁতুল ব্যবহার করা হয়।
- মিষ্টিতে আটা, সুজি, চালের গুঁড়ো, গুড়, ক্ষীর প্রভৃতি ব্যবহার হয়

## যা ব্যবহৃত হয় না

- চিনি, গুঁড়ো মশলা ও তেল
- বিদেশি শাকসবজি ও ফল যেমন আলু টোম্যাটো, পাতিলেবু, কপি, ঢ্যাঁড়শ, লাউ, সবুজ ও লাললঙ্কা

অন্নপ্রসাদ

উদ্ধার করা গিয়েছে যে, গঙ্গা জলাধার নির্মাণ ও বিস্তৃত পূজা ও ভোগের রীতিনীতি মূলত রাজা অনঙ্গভীমদেবের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। সানখুড়ি ভোগপদ্ধতি যুক্ত হওয়ার পর ভোগ আরও বিশদভাবে প্রস্তুত করা
শুরু হয়। শ্রীজগন্নাথের এই ভোগরন্ধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন বিভিন্ন শ্রেণির সেবকেরা, সঙ্গে অবশ্যই থাকেন সুপাকরস (মন্দিরের রন্ধনকারীরা)।

## প্রসাদ থেকে মহাপ্রসাদ

মহাপ্রসাদকে অম্রুতা মানোহিও বলা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় এই প্রসাদের অংশ হল নির্মাল্য। নির্মাল্যকে মনে করা হয় অমৃত, যা খেলেই মানুষ অমরত্ব অর্জন করবে। এইসব প্রচলিত বিশ্বাস আসলে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যকেই নির্দেশ করে কোথাও। কোনও বিখ্যাত বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ অর্পণ করলে, তাকে বলা হয় অম্রুতা মানোহি। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের মানোহির চল রয়েছে। সর্প মানোহি, অম্রুতা মানোহি এবং চক্র মানোহি নামকরণ হয়, কোন স্থানে বা কোথায় তা অর্পণ করা হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে। যেখানে প্রধান ভোগ বা মানোহি অফার করা হয়, তাকে মানোহি কোঠা বা মণি কোঠা বলা হয়। আবার ভোগ মণ্ডপও বলা হয়। নাটমণ্ডপ বা রথে যখন নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়, তাকে বলা হয় সর্প মানোহি। মন্দিরক্ষেত্রের মধ্যে যেখান থেকে নীলাচক্র দেখা যায়, সেখানে ভোগ অর্পণ করা হলে, তাকে বলা হয় চক্র মানোহি। মানোহি কোঠায় ভগবানের চোখের সামনে অর্পিত ভোগকে বলা হয় অম্রুতা মানোহি।

নৈবেদ্য সমর্পণের স্থান এবং সময় বেশ কঠোরভাবে পালিত হয় মন্দিরে। অম্রুতা মানোহি যেহেতু মূল প্রসাদ, তার আয়োজনও এলাহি। প্রতিদিন ১২০-এর চেয়েও বেশি ধরনের ভোগ দেওয়া হয়। সেই কারণেই বহু বহু বছর ধরে ওড়িশার রাজা ও জমিদাররা পালা করে এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। মহাপ্রসাদ মূলত দুইভাগে বিভক্ত। সুখিলি ভোগ এবং সানুখুড়ি ভোগ। প্রথাগত ভাবে এই ভোগ সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাই এর নাম 'অবাধ'। যে কোনও মানুষ এই ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন বলেই এর নাম 'অবাধ' এবং মহাপ্রসাদ সমস্তরকম অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্ত। বলা হয়, মহাপ্রসাদ হাতে পাওয়ার পর যে অবস্থাতেই সেটি থাকে, ফ্রেশ, শুকনো, এমনকী নষ্ট অবস্থাতে পেলেও তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নিতে হয়। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যের কতগুলি কারণ বিশ্বাস করা হয়। বিশেষত স্বয়ং দেবী লক্ষ্মীর রান্না এই ভোগ এবং সোনার থালায় তাকে নিবেদন করা হয় যেখানে শ্রী যন্ত্র আঁকা থাকে। ভোগ নিবেদনের সময় মন্ত্ররাজ বা পাতাল নৃসিংহ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। সমর্পণের সময় অষ্টাদশ অক্ষর গোপাল মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয়। ভৈরবী চক্রের (বিশেষ প্রকার ভোগ) কিছু অংশ নিবেদন করা হয় বিমলা দেবীকে অষ্টাদশাত্বিকা বৈষ্ণবদের। এই পুরো আচারকে মহাপ্রসাদ প্রক্রিয়ার সদাঙ্গ সংস্কার বলা হয়। এই সদাঙ্গ সংস্কারের পর 'অর্ণ' অর্ণ-ব্রহ্মে পরিণত হয়, প্রসাদ পরিণত হয় মহাপ্রসাদে।

## ভোগ রন্ধনের রীতিনীতি

পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে একবারে একসঙ্গে কমপক্ষে একলাখ লোকের রান্না হয়। আক্ষরিক অর্থে বিশ্বের সর্ববৃহৎ কিচেন এটি। কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে এত লোকের রান্না কোথাও হয় না। যথেষ্ট পরিমাণে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের চুল্লি

আনন্দ বাজারের পথে মহাপ্রসাদ

নিয়ে পাকশালাটিও এত সুন্দর করে বানানো যে, কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। রান্না করা হয় ১০০টিরও বেশি কুড়ুয়াতে (মাটির পাত্র) এবং সেটি একটির উপরে অন্যটি একবারে চাপিয়ে দেওয়া হয়। খাদ্যসামগ্রী পুরোপুরি সেদ্ধ করা হয়, কিছু ভাজা হয় না। আকার অনুযায়ী এইসব কুড়ুয়া বা মাটির পাত্রের বিভিন্ন নাম রয়েছে, যেমন, বাই হাণ্ডি, সামাধি হাণ্ডি, এমার হাণ্ডি, মঠ কুড়ুয়া, নামবারি, ভাত কুড়ুয়া প্রমুখ। মন্দিরের একেবারে প্রথম দিন থেকে চলে আসা তালিকা ও রীতিনীতি অনুযায়ীই মহাপ্রসাদের প্রস্তুতি চলে। খুব কড়াভাবে তা মান্য করা হয়। এর কোনও বিচ্যুতি কাম্য নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এই নৈবেদ্য পর্বের জন্য অনেক আধ্যাত্মিক প্রথা ও সেগুলো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা লেখা রয়েছে। এই পুরো সিস্টেমটি অবিকল একইভাবে চলেছে এত বছর ধরে এবং পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, কখনও এই নিয়মের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ় করা হয়নি। পুরীর মন্দিরে নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যতিক্রমী ও আশ্চর্যের ব্যাপার। বরং বেশ কিছু সাধক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের উপদেশে তা আরও পরিশুদ্ধ হয়েছে। অনেক রাজারাই, যেমন সোমবংশীয় কেশরীরা বা সূর্যবংশীয়রা শ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁর মন্দিরের জন্য যথাসাধ্য করেছেন। অনেক রাজকীয় ভাতা চালু হয়েছে, অনেক জমি লিখিত হয়েছে মন্দিরের নামে।

## পাকশালের ইতিহাস

মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণে একটি বড় কুয়া রয়েছে, যাকে ঘিরে বড় বড় ঘর নিয়ে তৈরি হয়েছে এই পবিত্র পাকশালা। উপযুক্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, যথেষ্ট পরিমাণ জানলার অস্তিত্ব, প্রচুর দরজা, ধোঁয়া বেরোবার ব্যবস্থা এবং জলের ব্যবস্থা এই রন্ধনশালাকে উন্নত এবং আধুনিক করে তুলেছে। এত শতাব্দী আগে এত সুন্দর ব্যবস্থা ও মানুষের নিজস্ব প্রাকৃতিক প্রযুক্তির ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পদ্ধতিও একেবারেই আলাদা। যেমন পেজা বানানো, অর্থাৎ ভাতের মাড় শুকিয়ে ফেলার জন্য আলাদা ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে। মন্দিরের উত্তরদিকের শ্রীজগন্নাথের মূর্তিকে রোজই নিয়ম মেনে পূজা করা হয়। সুপাকরস, অর্থাৎ রন্ধনকারীরা কিচেনে ঢোকার পূর্বে গণেশের পূজা করেন প্রত্যেকবার। মনে করা হয়, দেবী দক্ষিণাকালী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রতিনিধি হয়ে এই পবিত্র পাকশালের সবকিছুর তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর নির্দেশমতোই রান্নাঘরে সবকিছু করা হয়। মনে করা হয়, এই পবিত্র পাকশালাও এই মন্দিরের মতোই প্রাচীন। যদিও বিভিন্ন রাজাদের আমলে তা ক্রমশ আরও উন্নত হয়েছে। পুরীর বিভিন্ন মঠও রান্নাঘরের এই উন্নয়নে সাহায্য করেছে বহুবছর ধরে। মন্দিরে যে পাকশালাটি এখন আমরা দেখতে পাই, তা বহু বছর ধরে বহু মানুষের প্রচেষ্টার ফসল। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অধুনা পাকশালাটি ১৬৮২-১৭১৩ সালের মধ্যে ক্ষুদ্রের রাজা দিব্যসিংহদেব এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়, এবং এর খরচ বহন করেছিলেন কটকের রাজা রাজেন্দ্র রায়। গজপতি মহারাজ হরেক্রুষ্ণদেবের আমলে পাকশালা ও নাটমন্দিরের মধ্যেকার পাথরের যোগাযোগ পথটি নির্মিত হয়, পুরো ব্যাপারটি দেখভাল করেছিলেন তাঁর মন্ত্রী ব্রহ্মবর। পাকশালা মেরাদা রোসা তৈরি করেছিলেন যযাতি কেশরী, সত্যনারায়ণ মন্দিরের পিছনদিকে। এটি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পুরনো ধাঁচের পাকশালা। এখানে তিনটি লম্বা এবং একটি বারান্দা ধরনের ঘর আছে। আর রয়েছে ১০টি খোলা চুল্লি, যার মধ্যে চারটিতে রান্না করা হয় ভাত, চারটিতে পিঠা

ছানা খই ও ছানা তাড়িয়া

এবং দু'টিতে আহিয়া। ঘরের সামনে একটা খোলা উঠোন আছে। বর্তমান পাকশালাটি প্লট নং ২০৫-এ অবস্থিত এবং পূর্ব থেকে দক্ষিণে ১২টি ঘর নিয়ে নির্মিত। এটি ১০০ ফুট লম্বা ও ৮০ ফুট চওড়া। পূর্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে যমুনা নামে দু'টি জলাধার রয়েছে। রান্নার জন্য জল এগুলো থেকেই ব্যবহার করা হয়। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল আক্রমণের সময় পুরীর শ্রীজগন্নাথের মূর্তিটি নিরাপত্তার কারণে সরানো হয়েছিল। কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরে আহার ও ভোগের প্রসাদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, রান্নাঘর খালি হয়ে গেলেও নতুন জায়গায় ভোগের ব্যবস্থা ঠিকই করা হয়েছিল। কারণ ঈশ্বর এখানে অভুক্ত থাকতে পারেন না। ১৬০০-১৭৩৬ সাল পর্যন্ত এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কিন্তু ১৭৩৭ সালের পর থেকে এমনকী ব্রিটিশ বা মারাঠা আক্রমণের সময়ও পুরীর মন্দিরে অর্ণভোগ প্রস্তুতিতে কোনও বাধা পড়েনি। পাকশালার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যেমন কোঠা ভোগ রোসা, বড়া বড়া রোসা, সাতপুরি রোসা, থালি আদা রোসা, বড় ওড়িয়া মঠ রোসা, এমআর মঠ রোসা, পিঠা রোসা, শ্রীরামদাস রোসা, উত্তর পার্শ্বমঠ রোসা, রাঘবদাস রোসা এবং ভিতরচা রোসা। ১১টা রোসায় ২৪০টি চুল্লি ভাগ করা আছে। কোঠা ভোগ রোসা রাজাদের ভোগ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। এটি রান্না করেন বাদুসুয়ারাস। রোসা হোম প্রতিদিন অবকাশনীতির মাধ্যমে অর্পণ করা হয়। এটি কোঠা ভোগ রোসাতে রান্না হয়। সাতপুরি অমাবস্যা আর মকর সংক্রান্তি এই দু'দিন সাতপুরি রোসায় রান্না হয়।

## রান্নাঘরের বর্ণনা

**পুরীর 'মহাপ্রসাদ':** পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 'ছপ্পন ভোগ' প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ রন্ধনশালা বলে ধরা হয় এই মন্দিরের হেঁশেলকে। শ্রীমন্দিরের বাইরের চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এই হেঁশেল। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ ফুট, চওড়া ১০০ ফুট, আর উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট মতো। প্রায় ৩২টি ঘর আর ২৪২ মাটির উনুন রয়েছে এখানে। প্রতিদিন জগন্নাথদেবের ভোগ বানাতে ১০০০ রন্ধনশিল্পী ও সহযোগী নিয়োজিত থাকেন। দু'টো ভাতের উনুনের মাঝে যে চৌকো জায়গাটি থাকে, তা হল আহিয়া চুল্লি। সবরকমের ডাল ও তরকারি এই চুল্লিতে তৈরি হয়। ৩৬ ধরনের সেবায়েতরা মন্দিরে কাজ করে। হেঁশেলের আগুন কখনও নেভানো হয় না, একে বলা হয় বৈষ্ণব অগ্নি। রথযাত্রার আগের ক'দিন জগন্নাথদেব যখন অসুস্থ থাকেন, খাবারের স্বাদও হয় তুলনায় দুর্বল। বলা হয়, এই দিনগুলো মহালক্ষ্মী মন দিয়ে রান্না করেননি।

চুল্লি সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। অর্ণচুল্লি, আহিয়াচুল্লি আর পিঠাচুল্লি। এর মধ্যে অর্ণচুল্লির সংখ্যাই বেশি। সব ক'টি চুল্লিই ভূমি থেকে সরলরেখায় তিন ফুট উচ্চতায় নির্মিত হয়েছে। সাধারণ চুল্লির থেকে এদের আকারও অনেক আলাদা। অর্ণচুল্লিতে একসঙ্গে একবারে ১২টি কুড়ুয়া (মাটির পাত্র) একটার উপর অন্যটা রাখা যায়। ২০-৪০ কিলো কাঠ লাগে চুল্লিতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে। ১০টি চুল্লি কোঠা ভোগের জন্য আলাদা ভাবে চিহ্নিত থাকে। অর্ণভোগ রান্না করতে সময় লাগে মিনিটপনেরো। এই অর্ণচুল্লি ব্যবহৃত হয় ডালি, বেসারা, মাহুরা, শাক, খাটা ইত্যাদি তৈরি করার জন্য। সুপাকরস-রা ১২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন ভোগ রন্ধনের জন্য।

রীতি অনুযায়ী, চারটি শ্রেণিতে ভোগ তৈরি করা হয়। ভীমপাক, নালাপাক, সৌরিপাক, গৌরীপাক। ভীমপাকের মাধ্যমে পুরাপিঠা, বিরিপিঠা, গুড়কাঞ্জি, বাড়িতিয়ানা ইত্যাদি রান্না করা হয়। নালাপাকের মাধ্যমে সাকারা, তিয়ানা, লাপারাতিয়ানা, আদঙ্গ, পান ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। সৌরীপাক দিয়ে দুধ, মাহুড়া, দেশি আলুভাজা ইত্যাদি রান্না হয়। গৌরীপাকের মাধ্যমে মাষকলাই কারি, শাক ইত্যাদি তৈরি হয়। একইভাবে ভাতের প্রকারও নানা রকমের হয়, যেমন সালি অর্ণ, ক্ষীর অর্ণ, দধি অর্ণ, শীতলা অর্ণ। মন্দির কর্তৃপক্ষকে যে ভোগ নিবেদন করা হয়, সেটি রাজভোগ বা কোঠাভোগ নামে পরিচিত। অন্য সমস্ত ভোগকেই যজমান ভোগ বলা হয়। এটি দিনে দুবার হয়। রাজভোগ প্রদান করা হয় মন্দিরের গর্ভগৃহে। সাধারণত ৬০ ধরনের রাজভোগ প্রতিদিন নিবেদন করা হয়, চার দফায়। সকালে প্রাতঃরাশে থাকে মিষ্টি, দেশজ ফল এবং নারকেল দই, রাবড়ি, মালাই। বাকি তিনবার অন্নভোগ হয়, সকাল, দুপুর ও রাত্রে। এই অন্ন ভোগে মূলত থাকে, খিচুড়ি, ঘিভাত, সুজি, রাবড়ি।, গুড়ভাত, দুধভাত, ফ্যানভাত, দই, ক্ষীর, ছানা, পিঠে ইত্যাদি। ফলের মধ্যে থাকে কলা, আনারস, কাঁঠাল, আম, আঙুর ও অন্যান্য দেশজ ফল। যজমান ভোগ হয় গর্ভগৃহের বাইরে, এর মধ্যে মূলত থাকে ছয়-সাত রকমের ভাত, শাকসবজি ৩০ ধরনের, ডাল সবজি বা নারকেল দেওয়া ডাল বা ডালমা, ক্ষীর ও রাবড়ি। বিভিন্ন ধরনের সেবক এই ভোগ প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত থাকেন। মহাপ্রসাদ রন্ধনের রীতিনীতি খুব কঠোর ভাবে পালন করেন সবাই। এই ভোগ রান্নার সময় হাতে কোনও সুতো রাখা যায় না। কপালে দক্ষিণাকালীর টিপ ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন রাখা যায় না। কোনও রকম নেশা করা যায় না। কোনও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করা যায় না এবং অসুস্থ ও বয়স্কদের অংশ নিতে

# দুই বাংলার আহার বিহার

স্বাদের ব্যাপারে দুই বাংলা যেন যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ! আসলে যদিও তা উভয়ের খাদ্যপ্রেমেরই পরিচয় দেয়। ঘটি-বাঙালের অনন্য স্বাদসংস্কৃতি তুলে ধরলেন ফুড হিস্টোরিয়ান আলপনা ঘোষ। রান্নাঘরে ফুড কলামনিস্ট রঞ্জনা দাস।

একসময় যখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একসূত্রে বাঁধা ছিল, যখন বাংলার বিভাজন হয়নি, তখনও কিন্তু একটি বিষয়ে ওদের মধ্যে মস্ত ফারাক ছিল। আর সে ফারাকের মূলে ছিল দুই রাজ্যের রান্নাবান্না। তবে পুরোটাই ছিল নির্মল হাসিঠাট্টা ও কৌতুকের ব্যাপার। তাই পরস্পরকে 'ঘটি' এবং 'বাঙাল' বলে সম্বোধনের মধ্যে কোনও অসূয়া ভাব ছিল না সে সময়। ছিল না অন্য পক্ষকে ছোট করে দেখার মতো কোনও ব্যাপারও।

এরপর ভারত স্বাধীন হল আর তারই সঙ্গে এ দেশ ছাড়ার আগে দেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেলেন ইংরেজ শাসকদল। তার পরের ইতিহাস তো সকলের জানা। আমার নিজের পরিবারও অন্য অনেকের মতো জন্মভূমি ছেড়ে এপার বাংলায় এসে নতুন করে জীবন শুরু করলেন। ভাষা, পোশাক, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুই বঙ্গবাসীর মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য না থাকলেও, রন্ধন সংস্কৃতি এবং সামাজিক আচারবিচারের মধ্যে ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য। ডুবন্ত মানুষ যেমন জলের মধ্যে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে, পূর্ববঙ্গের মানুষজনেরা ঠিক তেমনভাবেই দেশভাগের সেই কঠিন দিনগুলিতে ওঁদের নিজস্ব রন্ধনরীতি, খাদ্যাভ্যাস, রুচি, পছন্দ, সামাজিক আচারবিচারকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আমাদের পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

একথা কারওর অজানা নয় যে, পূর্ববঙ্গের মানুষদের, অর্থাৎ তথাকথিত 'বাঙাল'দের অন্নপ্রীতি সাংঘাতিক। চারবেলা ভাত খেতেও তাঁরা বিন্দুমাত্র আপত্তি করতেন না। ছোটবেলায় আমাদের 'বাঙাল' বাড়িতে এই খোদ কলকাতা শহরে বসেও দেখেছি সকলকে ভাত দিয়ে প্রাতরাশ সারতে। সকালে স্কুল যাওয়ার আগে আগেই হোক বা ছুটির দিনের সকালে, আমাদের জন্য বরাবরই বরাদ্দ থাকত গোবিন্দভোগ চালের ফেনাভাত আর তার সঙ্গে সোনালি মাখন বা ঝাঁঝালো সরষের তেল-সহযোগে আলুসেদ্ধ। যেদিন তার সঙ্গে নরম করে সেদ্ধ করা হাঁসের ডিম জুটত, সেদিন আর আমাদের দেখে কে! অন্যান্য অনেক বাড়ির মতোই আমার ঠাকুমায়ের হেঁশেলেও মুরগি নিষিদ্ধ মাংসের তালিকাভুক্ত ছিল। তাই অনেকদিন পর্যন্ত মুরগির ডিম বা মাংস কোনওটাই আমাদের  বাড়িতে ঢুকত না।

বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের প্রাতরাশ সারতে দেখেছি চায়ের সঙ্গে মুড়ি অথবা চিঁড়েভাজা দিয়ে। রোববার ছুটির দিন আমরা আবদার করলে মা অনেক সময়ে চিঁড়ের পোলাও বা সুজির পায়েস করে দিতেন। আম-কাঁঠালের দিনে অবশ্য মা এসব ফরমায়েশি রান্নায় সাময়িক বিরতি টেনে দিতেন। প্রাতরাশে তখন আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকত

একথা কারওর অজানা নয় যে, পূর্ববঙ্গের মানুষদের, অর্থাৎ তথাকথিত 'বাঙাল'দের অন্নপ্রীতি সাংঘাতিক। চারবেলা ভাত খেতেও তাঁরা বিন্দুমাত্র আপত্তি করবেন না, বরং খুশিই হবেন!

দুধ-মুড়ি আর তার সঙ্গে আম-কাঁঠাল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের দিনগুলিতে পেট ঠান্ডা রাখতে বাড়িতে পাতা দই দিয়ে মা জলে ভেজানো চিঁড়ে বা মুড়ি মেখে দিতেন। এ খাবার আমাদের বিশেষ পছন্দ না হলেও ট্যাঁ-ফোঁ করার সাধ্য ছিল না। এর বাইরে ছিল পিঠে। আমার মায়ের মতো বাঙাল গিন্নিদের পিঠেপুলি তৈরিতে বেশ হাত-যশ ছিল। শীতকালে নানাবিধ পিঠেপুলি দিয়েই তাই জলখাবার সারা হত। পূর্ববঙ্গে নারকেলগাছের অভাব ছিল না। এই কারণেই হয়তো নারকেলের হরেক রকমের মিষ্টি বানানোয় বাঙাল গিন্নিদের জুড়ি মেলা ভার। নারকেলের নাড়ু থেকে শুরু করে নানা রকমের পিঠে তৈরিতে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আমার মায়ের এক বাল্যবিধবা দাপুটে পিসিমা ছিলেন। দেশভাগের পরেও বাপের বাড়ির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে স্বেচ্ছায় থেকে গিয়েছিলেন যশোর জেলার কালিয়া গ্রামে। আমরা তাঁকে ডাকতাম 'পিসিদিম্মা' বলে। প্রতিবার শীতের শুরুতে তিনি কলকাতায় আসতেন। যখন ওঁকে প্রথম দেখি, বয়সের ভারে উনি তখন নুইয়ে পড়েছেন। গায়ের রং ফরসা, টিকোলো নাক, দীর্ঘাঙ্গী। মা বলতেন, একসময় তিনি ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। মনে আছে, পিসিদিম্মার সঙ্গে আসত এক মস্ত তোরঙ্গ। গাছের ফলমূল, নারকেল নিয়ে আসতেন থলে ভর্তি করে। আমরা তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতাম, কখন তিনি তোরঙ্গের

ডালা খুলবেন আর তার ভিতর থেকে বেরবে নানা লোভনীয় জিনিসপত্র। বয়াম ভর্তি করে আনতেন ঝোলা নলেন গুড়, নানা মাপের পাটালি, টক-মিষ্টি-ঝাল আচার, কাসুন্দি, নাড়ু, মোয়া আর চিঁড়াকুচা। পিসিদিম্মার হাতের সেই প্রায় দেবভোগ্য চিঁড়াকুচার জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম। মায়ের কাছে শুনেছি, নারকেলের শাঁস অতি মিহি করে কুচিয়ে ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে মেখে শুকিয়ে নিলেই তৈরি এই চিঁড়াকুচা। সারা গ্রামে নাকি ওঁর মতো মিহি চিঁড়াকুচা কেউ বানাতে পারতেন না।

পাঁচের দশকে কলকাতার বাঙালি, অর্থাৎ 'ঘটি' প্রতিবেশীদের সকাল-বিকেলের জলখাবার ছিল আবার একেবারে অন্য ধাঁচের। 'বাঙাল' এবং 'ঘটি' খাদ্যাভ্যাসের প্রধান তফাত ছিল, ওপার বাংলার মানুষজনের মতো এপার বাংলার মানুষেরা ভাতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না। সকাল বা বিকেলের জলখাবারে ওঁদের বেশি পছন্দের ছিল 'নুচি' বা লুচি, যাকে 'ঘটি' ভাষায় ওঁরা বলতেন 'ময়দা খাওয়া'। কোনও ব্রত পালনের দিনে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ঘটি আমার মায়ের সঙ্গে গল্প করতে এসে কথাপ্রসঙ্গে জানাতেন, সেদিন তাঁদের কাটবে শুধু 'ময়দা খেয়ে', অর্থাৎ লুচি খেয়ে। বাঙালদের অন্নপ্রেম যেমন, ঘটিদের

## কালীপুজোর নিরামিষ কচি পাঁঠার মাংস

**উপকরণ:** পাঁঠার মাংস ৫০০ গ্রাম, টক দই ১ কাপ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, জিরেবাটা ২ চা-চামচ, ধনেবাটা ২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, তেজপাতা ২-৩টে, থেঁতো করা গরমমশলা ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টে, সরষের তেল বা সয়াবিন অয়েল ১/২ কাপ, ঘি ২ চা-চামচ, আলু ২টো (অর্ধেক করে কাটা), নুন ও চিনি স্বাদ অনুযায়ী।

**প্রণালী:** মাংস ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। এবার একটি পাত্রে মাংস রেখে তার মধ্যে অল্প টক দই এবং বাকি সব মশলা অর্ধেক করে দিয়ে অল্প সরষের তেল দিয়ে মেখে আধঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইতে তেল গরম করে নুন-হলুদ মাখানো আলু ভেজে নিন। ওই তেলে তেজপাতা, থেঁতো করা গরমমশলা ও কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে লাল রং ধরলে বাকি সব বাটা ও গুঁড়ো মশলা সামান্য জল দিয়ে গুলে ঢেলে দিন। ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলার ভাজা গন্ধ বেরলে মাংসটা ঢেলে কষাতে থাকুন। স্বাদমতো নুন মেশান। মাঝে মাঝে ঢাকা দিন, তাতে মাংস থেকে জল বেরবে। অন্য একটি পাত্রে জল গরম করে রেখে দিন। মাংসের উপরে তেল ভেসে উঠলে প্রেশার কুকারে মাংস ঢেলে দিন। কড়াইতে গরম জল ঢেলে মশলা ধোয়া জল প্রেশার কুকারে ঢালুন। আলু দিন। জল ফুটতে শুরু করলে কুকারের ঢাকা বন্ধ করুন। প্রথমে জোরালো আঁচে দু'টো সিটি দিয়ে আঁচ কমিয়ে আর-একটা সিটি দিন। ঢাকা খুলে ঘি ও গরমমশলাগুঁড়ো মিশিয়ে পাত্রে ঢালুন।

সেই ভালবাসা ছিল লুচির প্রতি। লুচি নিয়ে সে যুগে কম লেখালিখি হয়েছে! সুলেখিকা কল্যাণী দত্ত তাঁর 'থোড় বড়ি খাড়া' গ্রন্থে লিখেছেন "সব চেয়ে সহজ ও সেরা আদরের জিনিস ছিল 'লুচি'।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে ভোজনরসিক ছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে লিখে গিয়েছেন, "সাহেব মেরেছি বঙ্গবাসীর কলঙ্ক গেছে ঘুচি/ মেজবউ কোথা ডেকে দাও তারে কোথা ছোকা কোথা লুচি"? লুচির সঙ্গে 'ছোকা' অর্থাৎ ছক্কা ছিল ঘটিদের কাছে বিশেষ উপাদেয়। তবে লুচির ময়দা মেখে বেলা এবং লুচি ভাজার কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাই

লুচি ফুললে রাঁধুনির প্রভূত প্রশংসা আর তার অন্যথা ঘটলে নিন্দা বাঁধা ছিল। অনেক পরে অবশ্য আমাদের বাঙালবাড়িতেও লুচির শুভাগমন ঘটে। তবে তা সীমাবদ্ধ থাকত বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন অথবা ছুটির দিনের জন্য। এদেশিদের মতো পূর্ববঙ্গীয়দের কিন্তু কোনওদিনই লুচি-পরোটা বা আটার রুটি রোজকার খাবারের তালিকায় থাকত না। একবার ঘটি বন্ধুর বাড়িতে লুচির সঙ্গে সাদা আলুর ছেঁচকি আর ঘি এবং সুজি দিয়ে বানানো এলাচগুঁড়ো দেওয়া মোহনভোগ খেয়েছিলাম। এই 'মোহনভোগ' নামে যেমন সুন্দর, তেমনই সুন্দর ছিল তার সোয়াদ। লুচির সঙ্গে হরেক কিসিমের মশলা দিয়ে আলুর দম রাঁধতে জানতেন কলকাত্তাইয়া গিন্নিরা। শুধু আদাবাটা, শুকনো খোলায় ভাজা জিরে-লঙ্কার গুঁড়ো আর তাতে আমচুর মিশিয়ে এক অসামান্য টক-ঝাল-সামান্য মিষ্টির আভাস দেওয়া আলুর দম বানাতেন শোভাবাজার রাজবাড়ির রন্ধনপটিয়সী বউরানি।
আমার নিজের দিদিমা ছিলেন সাত্ত্বিক বিধবা। তাই তিনি যখন আমাদের বাড়িতে আসতেন, আমার ঠাকুরমা তোলা উনুনে আমাদের আঁশ রান্নাঘরের বাইরের ঢাকা বারান্দায় তাঁর জন্য রান্না করতেন। ঠাকুরমা যে সব স্বাদু পদ রাঁধতেন নিজের বেয়ানের জন্য, তার মধ্যে দু'টি বিশেষ রান্নার কথা আজও ভুলিনি। সে দু'টি পদ ছিল নারকেলকোরা দিয়ে চালকুমড়োর ঘণ্ট আর লাউ-করলা দিয়ে তেতোর ডাল। আজও সেই রান্নার স্বাদ আমার জিভে লেগে রয়েছে।
কলকাতার মানুষদের একসময় ধারণা ছিল, ইলিশ ছাড়া ওপার বাংলার মানুষেরা আর কোনও মাছই রাঁধতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবে শুধু ইলিশই নয়, চিতল, কই, ভেটকি, রুই, কাতলার মতো মহার্ঘ্য মাছ থেকে খালবিলের ছোট চুনো মাছ রান্নাতেও তাঁদের অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। বাঙালদের হাতের শুঁটকি যিনি খাননি, তিনি যে কোন সুখরস থেকে বঞ্চিত, তা বলাই বাহুল্য! তবে কেন জানি না, শুঁটকি আমাদের বাঙাল বাড়িতে ব্রাত্য ছিল। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের স্টাফরুমে আমাদের দুপুরের খাওয়া হত ভাগাভাগি করে। এরকমই একদিন আমাদের সিলেটি বাংলার টিচার চিত্রাদির হাতে প্রথম ছুরি শুঁটকি খেয়েছিলাম। আজও মনে আছে, সেদিন ছিল এক বর্ষার দিন। চিত্রাদি সেদিন দুপুরে তাঁর টিফিন বক্সের ঢাকা খুলতেই যে স্বাদু গন্ধ আমাদের নাকে এসে ঠেকেছিল, তাতে আমার নোলা শকশক! চিত্রাদি আমার পাশেই বসতেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। শুধু আমাকে নয়, ছিটেফোঁটা হলেও সেদিন স্টাফরুমে উপস্থিত সবাই ভাগ পেয়েছিল সেই অমৃত পদার্থের! ভাত দিয়ে শুকনো করে মেখে খেয়ে ঝালের দাপটে আমার অবস্থা একটু খারাপ হলেও স্বাদের মহিমায় সেই উপাদেয় বস্তুটি চেটেপুটে খেয়েছিলাম সেদিন। পরে জেনেছিলাম এটি একটি সিলেটি শুঁটকি পদ। সেই আমার প্রথম শুঁটকির প্রেমে পড়া। বাড়িতে রান্না করব বলে ছুরি শুঁটকির রেসিপিও লিখে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার ঘটি স্বামীর দৌলতে সে আশা পূরণ হয়নি আমার। মনেপ্রাণে নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই মানুষটি শুঁটকির ব্যাপারে কোন সমঝোতায় যেতে রাজি হলেন না। তুমি বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে, স্কুলে বসে যত খুশি শুঁটকি সাঁটাও, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু

## সিলেটি ছুরি শুঁটকি

**উপকরণ:** ছুরি শুঁটকি ২ কাপ, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, গোটা রসুন ২টো, চেরা কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১/২ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো, নুন স্বাদমতো।

**প্রণালী:** ছুরি শুঁটকির মাথা বাদ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে টুকরো করে কেটে নিন। টুকরোগুলো কুসুমগরম জলে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। দু'টো রসুন থেকে কোয়া বের করে ছাড়িয়ে রাখুন। তেলে পেঁয়াজকুচি, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে শুঁটকি দিন। ভালমতো মিশিয়ে জল দিয়ে কষান। জিরেগুঁড়ো দিন। এবারে রসুনের কোয়া ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিন। পুরোটা সেদ্ধ হয়ে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিন।

ঘটি হেঁশেলে শুঁটকির প্রবেশ নৈব নৈব চ। ইতিমধ্যে চিত্রাদির ক্যানসার ধরা পড়ল। যতদিন স্কুলে আসার অবস্থায় ছিলেন, বাটি করে আমার জন্য কত রকমের শুঁটকির পদ রান্না করে এনেছেন বলতে পারি না। তারপর তো স্কুলে আসা বন্ধই হয়ে গেল। ক্রমে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। কেমোর দাপটে মাথার চুল পড়ে গেল, কিন্তু তখনও মুখের হাসিটি অম্লান। কখন কী অবস্থায় থাকেন, তাই যেদিন যেতাম ওঁকে
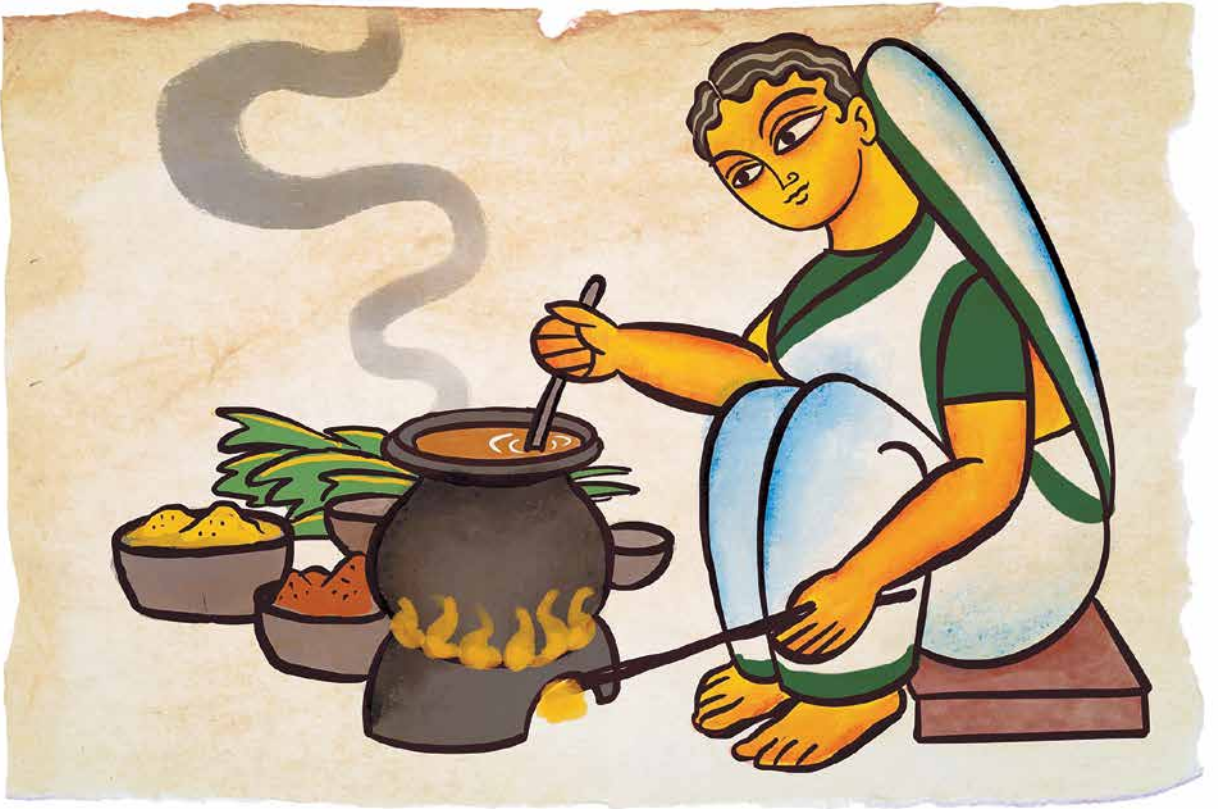
দেখতে, খবর নিয়ে যেতে হত। সেদিন যখন গেলাম কথা বলার অবস্থায় নেই। চিকিৎসক জবাব দিয়ে দিয়েছেন। ওঁর স্বামী বললেন, চিত্রাদি ওঁকে দিয়ে আমার জন্য শুঁটকি রাঁধিয়ে রেখেছেন। সেদিন চিত্রাদির সামনে বসে শুঁটকি গলাধঃকরণ করেছিলাম কিভাবে, সে শুধু আমিই জানি। সেই আমার শেষ যাওয়া।
আমিষ রান্নার মধ্যে ইলিশমাছের মুড়ো দিয়ে বাঙাল গৃহিণী যে কচুর শাক রাঁধতেন, সেই রান্নাকে সেরার সেরা শিরোপা দেওয়া যেতেই পারে। তবে বাঙালদের এই মৎস্যপ্রেম যে শুধু ইলিশ আর শুঁটকির প্রতিই, তা নয় কখনওই। কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক শ্রী বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত তাঁর 'ভোজন শিল্পী বাঙালী' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে চিতল মাছের ঘন-কণ্টকিত 'জলজ মাংস' দিয়ে প্রস্তুত কাঁটাবিহীন মুইঠ্যা পদকে 'বঙ্গসংস্কৃতির আনন্দ-মেলায় পূর্ববাংলার এক বিশেষ অবদান' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর পরে পূর্ববঙ্গীয়দের মৎস্যপ্রীতি বা রান্নার উৎকৃষ্টতা নিয়ে সত্যিই কোনও প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।
বুদ্ধদেববাবু অবশ্য পশ্চিমবঙ্গীয় রমণীর রন্ধন পারদর্শিতার কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। ওঁদের হাতের নিরামিষ রান্নারও

## কাঁচা কুমড়ো দিয়ে ইলিশ মাছের তেল ঝোল

**উপকরণ:** ইলিশ মাছের গাদা ও পেটি (গোল করে কাটা) ৫০০ গ্রাম, ছোট মাপের কাঁচা কুমড়ো ১টা (টুকরো করে কাটা), চেরা কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, হলুদগুঁড়ো ২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কালোজিরে ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, জল অল্প, সরষের তেল ১/২ কাপ।

**প্রণালী:** ইলিশ মাছে নুন, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও অল্প কাঁচা সরষের তেল মাখিয়ে রেখে দিন। কড়াইতে তেল গরম করে মাছগুলো এপিঠওপিঠ করে হালকা সাঁতলে তুলে রাখুন। এবারে ওই তেলের মধ্যে কাঁচা কুমড়ো সাঁতলে তুলে নিন। কড়াইয়ের তেলে কালোজিরে ও কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। ফোড়নের সুগন্ধ বেরলে লঙ্কাগুঁড়ো ও হলুদগুঁড়ো সামান্য জলে গুলে তেলের মধ্যে দিন। একটু নাড়াচাড়া করে সাঁতলানো কুমড়ো দিয়ে জল দিন। ফুটে উঠলে স্বাদমতো নুন মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। কুমড়ো সেদ্ধ হয়ে এলে ঝোলের মধ্যে মাছ ছাড়ুন। তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিন।

ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। অতি সাধারণ সব উপকরণ, যেমন 'ঈষৎ-মধুর মাংসল কাঁঠালবিচি দিয়ে রাঁধা অনবদ্য

মটর ডাল, আবার কখনও হয়তো সরষেবাটায় মখমল মসৃণ কচু সেদ্ধ' তাঁদের হাতের গুণে হয়ে উঠেছে অতুলনীয়। এই কচু সেদ্ধর প্রসঙ্গে আমার বরিশালের কাঠবাঙাল পরিবারের একটি দারুণ স্বাদু পদের কথা মনে পড়ে গেল। এই পদের বিশেষত্ব হল, এ রান্নায় আগুনের প্রয়োজন পড়ে না। আর সেই অসাধারণ পদটি হল 'মানকচুবাটা'। মাকে দেখেছি মানকচুর মাংসল অংশটিকে কুচিয়ে শিলনোড়ায় বেটে নিতে। একই সঙ্গে বাটতেন সরষে ও নারকেলকোরা। তারপর নুন, সামান্য মিষ্টি ও সরষের তেল দিয়ে পুরোটা মেখে নিতেন। কী যে অপূর্ব স্বাদ ছিল এই পদের! এক থালা ভাত পুরোটাই খাওয়া হয়ে যেত শুধু এই কচুবাটা দিয়ে। মসৃণ করে বেটে নেওয়ার দরুণই বোধ হয়, কচুবাটা খেয়ে কারওর গলা ধরেছে বলে কখনও শুনিনি। আমার নিজের ননদ, যাঁর হাতের রান্নার যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছি বিয়ের পর, তাঁর বিয়ে হয়েছিল পাইকপাড়ার বোসদের বাড়িতে। যৌথ এই পরিবারের দুই রত্ন ছিলেন চিত্রকর দীপেন বসু এবং ওঁর ভাই সেতার শিল্পী নিতাই বসু। আমার বাবা-কাকারা যদি 'কাঠবাঙাল' হন, তাহলে বোসবাড়ির সদস্যরা ছিলেন 'কাঠঘটি'। ওঁদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল আমার। ননদের শাশুড়ি স্থানীয় অনেককেই লেবুকে 'নেবু', লুচিকে 'নুচি', লাউকে 'নাউ' বলতে শুনেছি। সারাবছর পুজো-পার্বণ সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাওয়াদাওয়া লেগেই থাকত

## কই মাছের হরগৌরী

**উপকরণ:** পুরুষ্টু কই মাছ ৪টে, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, সরষের তেল ৩ টেবলচামচ (মাছ সাঁতলানোর জন্য)। সরষের গ্রেভির জন্য: সাদা সরষেবাটা ২ টেবলচামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ৫-৬টি, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ½ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, সরষের তেল ২ টেবলচামচ। তেঁতুলের **গ্রেভির জন্য:** সাদা সরষে ১ চা-চামচ, তেঁতুলের ক্বাথ ২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ½ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, সরষের তেল ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: মাছের আঁশ ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ভাল করে ধুয়ে নিন। তারপর অল্প হলুদগুঁড়ো এবং নুন দিয়ে মেখে গরম তেলে সাঁতলে তুলে রাখুন। হর গ্রেভি বা সরষের গ্রেভি বানানোর জন্য তেল গরম করে তাতে পাঁচফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরলে পেঁয়াজবাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলার ভাজা গন্ধ বেরলে সরষেবাটা, হলুদগুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, কাঁচালঙ্কা এবং লঙ্কাগুঁড়ো দিন। হালকা করে কষিয়ে পরিমাণমতো জল দিন। ফুটে গেলে তার মধ্যে মাছগুলো দিন। গ্রেভি ঘন হয়ে এলে কড়াই নামিয়ে নিন। অন্য কড়াইতে গৌরী গ্রেভি বা তেঁতুলের গ্রেভি বানাতে তেল গরম করে গোটা সরষে ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বেরলে একে একে তেঁতুলের ক্বাথ, লঙ্কাগুঁড়ো এবং স্বাদমতো নুন-চিনি দিয়ে কষুন। মাপমতো জল দিন। মশলার উপরে তেল ভেসে উঠলে পরিবেশনের পাত্রে গ্রেভি ঢেলে দিন। এবার খুব সাবধানে অন্য কড়াই থেকে গ্রেভি-সহ মাছগুলো তুলে তেঁতুলের গ্রেভির উপরে সাজিয়ে রাখুন। এমনভাবে সাজাবেন, যাতে সরষের হলুদ গ্রেভি মাছের উপরে থাকে আর তেঁতুলের বাদামি গ্রেভি মাছের নিচে থাকে। তাহলেই তৈরি কই মাছের হরগৌরী।

## কাঁঠালের বিচি দিয়ে মটরডাল

**উপকরণ:** মটরডাল ১৫০ গ্রাম, কাঁঠালের বিচি ১০০ গ্রাম, চেরা কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, গোটা শুকনোলঙ্কা ২টো, তেজপাতা ২টো, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদ অনুযায়ী, সরষের তেল ২ টেবলচামচ, ঘি ১ চা-চামচ।

**প্রণালী:** মটরডাল ধুয়ে বেছে অল্প নুন, সামান্য হলুদ ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করে রেখে দিন। খেয়াল রাখবেন, ডাল যেন একেবারে গলে না যায়। কাঁঠালের বিচিগুলো সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। একটি কড়াইতে তেল গরম করে নিন। তেজপাতা, গোটা জিরে ও শুকনোলঙ্কার বোঁটা বাদ দিয়ে একটু ভেঙে তেলের মধ্যে ছাড়ুন। ফোড়নের গন্ধ বেরলে আদাবাটা দিয়ে কষুন। সামান্য জলের মধ্যে হলুদ ও জিরেগুঁড়ো মিশিয়ে তেলের মধ্যে ঢেলে দিন। মশলার ভাজা গন্ধ বেরলে সেদ্ধ করা ডাল জল-সমেত ঢেলে দিন। কাঁঠালের বিচিগুলোও ডালের সঙ্গে মেশান। প্রয়োজন হলে অল্প নুন দিন। নামানোর আগে চিনি দিন। মাঝারি আঁচে ঢাকা দিয়ে ডাল ফুটতে দিন। ঘন হয়ে এলে ঘি মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

আজকের এই প্রজন্মের বঙ্গবাসীর জীবনে ঘটি-বাঙালের তেমন কোনও অস্তিত্বই নেই আর। বাঙাল রান্না, ঘটি রান্না আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এই বঙ্গের বাঙালির হেঁশেলে।

ওঁদের বাড়িতে। এরকমই এক অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন ছিল আমার। মনে আছে, সেদিন আমি ননদের হাতে ওঁর শাশুড়ির পছন্দের দুটি পদ, 'নাউচিংড়ি' আর 'কই মাছের হরগৌরী' খেয়েছিলাম। লাউচিংড়ি অবশ্য বাপের বাড়িতে খেয়েছিলাম, যা রান্না হত পেঁয়াজ দিয়ে। কিন্তু সেদিনের রান্নায় পেঁয়াজের ছোঁয়া না থাকা সত্ত্বেও স্বাদের দিক থেকে এ পদটি একটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর 'হরগৌরী' ছিল আমার কাছে একেবারে আনকোরা একটি নতুন পদ, যা শুধুমাত্র দেখনদারিতে নয়, স্বাদেও এককথায় অনবদ্য। পরে জেনেছি, কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বহু যুগ ধরে জামাইষষ্ঠীর দিন জামাইভোজের অন্যতম পদ হিসেবে পাতে পড়ত এই হরগৌরী। এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ আর কিছু নয়, এই রান্নায় কই মাছের একপাশটি সরষে দিয়ে হয়, অন্যপাশটি তেঁতুল দিয়ে। ফলে মাছের উপরের অংশটি হয় হলুদ আর নিচের অংশ কালচে বাদামি।

আর-একটি 'কলকাত্তাইয়া' রান্নার কথা খুব মনে পড়ে। তা হল নিরামিষ পাঁঠার মাংস। এককালে যখন হিন্দু পুজোয় বলিপ্রথা নিষিদ্ধ হয়নি, তখন কলকাতার বনেদি বাড়িগুলোর পুজোয়, এমনকী কালীঘাটের মন্দিরেও, বিশেষ করে কালিপুজোর রাতে পাঁঠা বলি দেওয়ার প্রচলন ছিল। বলিপ্রদত্ত পাঁঠার মাংস মন্দিরের সেবায়েত ও ভক্তদের জন্য রান্না হত অত্যন্ত সাত্ত্বিকভাবে, আচারনিয়ম মেনে। দেবীকে প্রদত্ত এই মাংস রান্নায় কোনও পেঁয়াজ বা রসুনজাতীয় 'আমিষ' মশলার ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। তার পরিবর্তে এই বিশেষ পদে দেওয়া হত নিরামিষ রান্নার মশলা,

অর্থাৎ যে মশলা নির্ভেজাল নিরামিষ রান্না বা ভোগের রান্নায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কারণেই এই পদটির নাম হয়েছিল 'নিরামিষ মাংস'। প্রধানত টক দই, আদা, সাদা জিরে, ধনে, হলুদ, লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ইত্যাদি মশলা দিয়ে এই রান্না হত আর রান্নার মাধ্যম ছিল বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি। এখন অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে ঘিয়ের পরিবর্তে সরষের তেলই মাধ্যম হিসেব ব্যবহার করা হয়। স্রেফ নামানোর আগে সামান্য ঘি ছড়িয়ে দেওয়া হয় সুগন্ধের জন্য। জীবের কল্যাণে জীবহত্যা, বলিপ্রথার মতো নৃশংস সব রীতি নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন। কিন্তু আজও এই নিরামিষ মাংসের পদটি কলকাতার মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।
ঘটি-বাঙালের রান্না নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে না করে পারছি না যে, আজকের এই প্রজন্মের বঙ্গবাসীর জীবনে ঘটি-বাঙালের তেমন কোনও অস্তিত্বই নেই আর। পঁচাত্তর বছর হল আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর আধুনিক প্রজন্মের বঙ্গবাসীরও আজ শুধু একটিই পরিচয়, সে বাঙালি। তাই বাঙাল রান্না, ঘটি রান্না আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এই বঙ্গের বাঙালির হেঁশেলে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা বেঁচে আছে আমাদের মতো প্রবীণদের স্মৃতিতে। এই লেখাটি ফেলে আসা সেই অতীতের এক বিষাদমধুর স্মৃতিচারণ মাত্র।

**বিষয় বিন্যাস:** সায়নী দাশশর্মা
**যোগাযোগ:** ৯৮৩১৪৮৩৩১০ (আলপনা ঘোষ), ৯৪৭৭২৫০৬৬৫ (রঞ্জনা দাস)
**অলংকরণ:** রৌদ্র মিত্র
**রান্নার ছবি:** শুভদীপ ধর

## চিতল মাছের মুইঠ্যা

**উপকরণ:** চিতল মাছ ১ কেজি, হলুদগুঁড়ো ২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ২ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ১½ চা-চামচ, আদারসুনবাটা ২ চা-চামচ, আলু ৫০০ গ্রাম (সেদ্ধ করা), টক দই ১ টেবলচামচ, থেঁতো করা গরমমশলা ১ চা-চামচ, সরষের তেল ১ কাপ, ঘি ১ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** মুইঠ্যা রাঁধার জন্য চিতল মাছের পিঠের অংশ নিন। আঁশ ছাড়িয়ে পিঠ বরাবর লম্বালম্বি করে কেটে নিন মাছ। এরপর পিঠের অংশকে কাঠ দিয়ে পিটিয়ে নরম করে নিন। তারপর চামচে করে চিতলের মাংস কুরে নিন। এর মধ্যে যদি অবশিষ্ট কাঁটা কিছু থেকে যায়, তা বেছে নিন এই সময়। এরপর একটি কড়াইতে জল দিয়ে আঁচে বসান। কাঁটাবিহীন অংশের সঙ্গে আলুসেদ্ধ, অর্ধেক পেঁয়াজবাটা, ১ চা-চামচ আদারসুনবাটা, ১ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো, সামান্য সরষের তেল ও স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে একসঙ্গে মেখে নিন। এই পুরো মিশ্রণটি ছোট ছোট কোপ্তার আকারে গড়ে কড়াইয়ের ফুটন্ত জলে ছাড়ুন। কোপ্তাগুলি সেদ্ধ হয়ে এলে ঝাঁঝরি দিয়ে তুলে জল ঝরিয়ে রাখুন। কোপ্তা সেদ্ধ করা জল গ্রেভির জন্য আলাদা করে রেখে দিন। অন্য একটি কড়াইতে কোপ্তা ভাজার জন্য বাকি তেল দিন। তেল থেকে ধোঁয়া বেরলে কোপ্তাগুলো বাদামি করে ভেজে একটি থালায় পেপার ন্যাপকিনের উপরে তুলে রাখুন। এতে কোপ্তার বাড়তি তেল কাগজ শুষে নেবে। এবারে কোপ্তা ভাজার তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ও থেঁতো করা গরমমশলা ফোড়ন দিন। আঁচ কমিয়ে রাখুন। বাকি পেঁয়াজবাটা নিংড়ে রসটুকু বের করে তার মধ্যে বাকি আদারসুনবাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, ধনে ও জিরেগুঁড়ো দিয়ে সামান্য জল দিয়ে গুলে নিন। কড়াইতে ঢেলে দিন পুরো মিশ্রণটা। স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে ঢিমে আঁচে ভাল করে কষান। মশলার রং বাদামি হয়ে এলে টক দই দিন। আবার কষান। মুইঠ্যাগুলো ছাড়ুন। এবারে এতে কোপ্তা সেদ্ধ করা জল দিন। ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে ফুটতে দিন। মুইঠ্যাগুলো নরম হয়ে গ্রেভি ঘন হয়ে এলে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

## ঠাকুমায়ের চালকুমড়োর ঘণ্ট

উপকরণ: কচি চালকুমড়ো ১টা, নারকেল $^{১}/_{২}$ মালা (কুরনো), জিরেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, তেজপাতা ২টো, চেরা কাঁচালঙ্কা ৪-৫টা, গোটা সাদা জিরে $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো, সরষের তেল বা রাইস ব্র্যান অয়েল ৩ টেবলচামচ, ঘি ১ চা-চামচ।
প্রণালী: খোসা ছাড়িয়ে চালকুমড়ো চার টুকরো করে কেটে কুচিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে তেজপাতা, সাদা জিরে ও কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। ফোড়নের সুগন্ধ বেরলে ওই তেলে নারকেলকোরা দিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে চালকুমড়োকুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদমতো নুন মেশান। এবারে এতে জিরেগুঁড়ো দিয়ে আর-একবার নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। তরকারি থেকে জল বেরলে সেই জলেই চালকুমড়ো সেদ্ধ হয়ে যাবে। ঢাকা তুলে বারবার নাড়ুন শুধু। চিনি মেশান স্বাদমতো। মাখো মাখো হলে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

## নাউ চিংড়ি

উপকরণ: কচি লাউ ১টা, ছোট চিংড়ি ১৫০ গ্রাম (বেছে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে রাখা), কাঁচালঙ্কা ৩-৪টে (চেরা), ধনেপাতা $^{১}/_{২}$ আঁটি, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, কালোজিরে $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদ অনুযায়ী, সরষের তেল ১$^{১}/_{২}$ টেবলচামচ, ধনেপাতাকুচি ২ চা-চামচ বা প্রয়োজনমতো।
প্রণালী: লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ঝিরি ঝিরি করে কুচিয়ে নিন। চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রেখে দিন। কড়াই আঁচে বসিয়ে তেল গরম করে তাতে চিংড়িগুলো হালকা করে সাঁতলে তুলে রাখুন। এবারে ওই তেলে কালোজিরে ও একটি চেরা কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। ভাজা গন্ধ বেরলে ওতে হলুদগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো সামান্য জলে গুলে দিয়ে দিন। মশলার উপরে তেল ভেসে উঠলে লাউ, বাকি কাঁচালঙ্কা ও স্বাদমতো নুন দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। লাউ থেকে জল বেরিয়ে সেদ্ধ হয়ে এলে চিংড়ি দিয়ে দিন। আবার ঢাকা দিয়ে রাঁধুন এবং মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন। চিনি মেশান। লাউয়ের জল শুকিয়ে মাখোমাখো হয়ে এলে কুচনো ধনেপাতা দিয়ে হালকা নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।

# রুখে দিন ডিজিট্যাল এজিং

হাই এনার্জি ভিজ়িবল লাইট বা ব্লু লাইটের প্রভাবে ত্বকে আসতে পারে অকালবার্ধক্য, হতে পারে পিগমেন্টেশনও। কীভাবে বা রুখবেন ডিজিট্যাল এজিং? জানাচ্ছেন সেলেব ইনটিগ্রেটিভ স্কিন অ্যান্ড ওয়েলনেস ডক্টর কিরণ শেঠি।

**পরিস্থিতি ১:** টানা লকডাউন আর ওয়র্ক ফ্রম হোমে কত ঘণ্টা যে একদৃষ্টে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিলেন এতদিন, তার বোধহয় নির্দিষ্ট পরিমাপ সম্ভব নয়। আর গত দু'বছরে কাজের ক্ষেত্রে এটাই ছিল 'নিউ নর্মাল'। ক্লান্ত চোখ, পিঠে ব্যথার পাশাপাশি ক্লান্ত হয়েছে আপনার ত্বক।

**পরিস্থিতি ২:** কর্পোরেট চাকরির ক্ষেত্রে এমনিতেই দিনের অনেকটা সময় ডেস্কে বসে কম্পিউটার বা ল্যাপটপে কাজ করতে হয়। চোখের ক্ষতি, পশ্চারে সমস্যার বাইরে দিনের পর দিন ত্বকের ক্ষতি মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কী!

**পরিস্থিতি ৩:** গ্যাজেট অ্যাডিকশন ছোট থেকে বড় সকলের। দিনের মধ্যে কতটা সময়ে মোবাইলে চোখ রেখে আমাদের

কেটে যায় বলুন তো? কাজের হোক, অকাজের হোক, স্ট্রেস কাটাতে হোক...মোবাইলে চোখ সর্বক্ষণের সঙ্গী।

উপরের এই সবক'টি পরিস্থিতিতেই কিন্তু শরীরের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব পড়ে আপনার ত্বকে। কারণ, গ্যাজেট থেকে বেরয় একধরনের ব্লু লাইট। আর গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্লু লাইটের প্রভাবে বদল আসতে পারে ত্বকের কোষে, হতে পারে কোষ-সঙ্কোচন। ব্লু লাইটের থেকে ত্বকের ক্ষতির পোশাকি নামও রয়েছে—তা হল 'ডিজিট্যাল এজিং'। হাই এনার্জি ভিজ়িবল লাইট বা HEV হল এই ডিজিট্যাল এজিংয়ের মূল কারণ। মানে, ডিজিট্যাল প্রভাবে অকালে ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া। তবে সমস্যা এটুকুতেই থেমে থাকে না...

## কী কী হতে পারে ব্লু লাইট থেকে?

ত্বক বিশেষজ্ঞ কিরণ শেঠির মতে, ''ত্বকের অকালবার্ধক্য বা ত্বকে পিগমেন্টেশনের
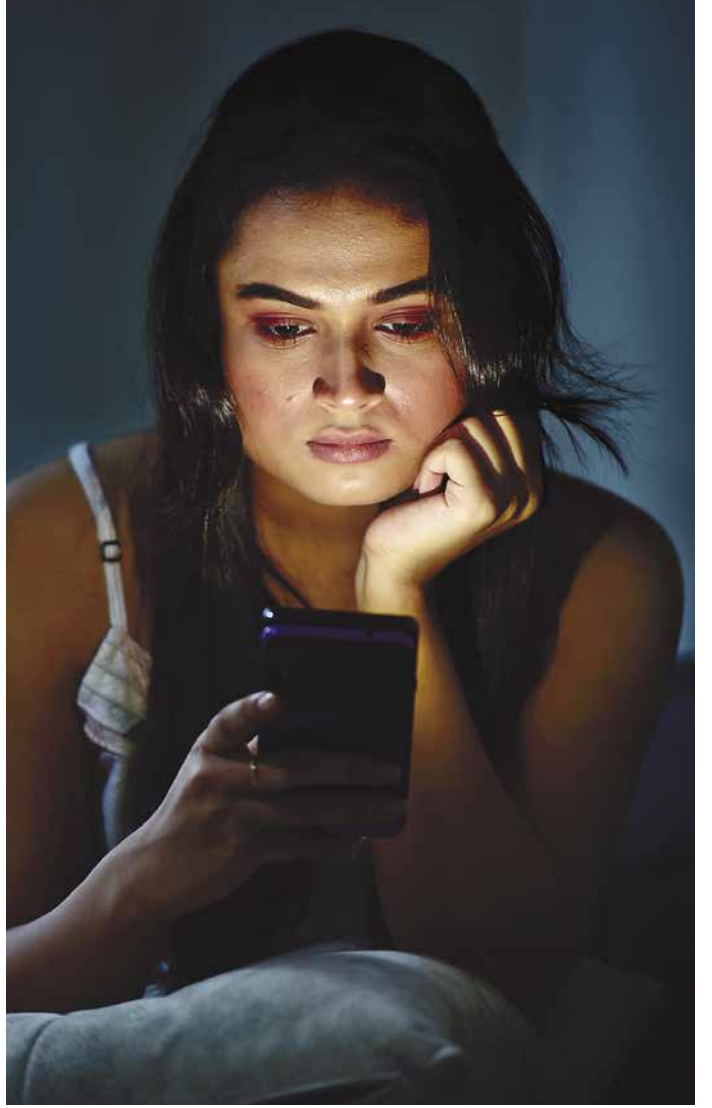
মতো সমস্যা তো আছেই। অতিরিক্ত ব্লু লাইট এক্সপোজ়ারের ফলে ত্বক আরও বেশি সেনসিটিভ হয়ে পড়ে।'' ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, ইনফ্ল্যামেশন এসবও হতে পারে। ত্বকের অকালে বুড়িয়ে যাওয়া রুখতে শুধুমাত্র ইউভিএ ও ইউভিবি রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করলে হবে না। ডিজিট্যাল যন্ত্রপাতি থেকে বেরনো ব্লু লাইটের হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে। ২০১৯-এর একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, গড়ে সাধারণ মানুষ প্রায় ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করেন ফোনে! বলাই বাহুল্য, কোভিড-লকডাউনের জেরে এই অনুপাত আরওই বেড়েছে। ব্লু লাইট থেকে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল জেনারেটেড হয়। এর থেকে ত্বকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হয়। আর তার পরিণামই ত্বকের অকালবার্ধক্য। এতদিন ধরে জানা গিয়েছিল আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মিই ত্বককে বুড়িয়ে দেয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ব্লু লাইট ত্বকের

রিদম, তাতেও প্রভাব ফেলে। মানে, চোখের সামনে যদি মোবাইল বা ল্যাপটপের আলো জ্বলে তাহলে ত্বকের মনে হবে এখন তো দিন! অতএব, রাতে ত্বকে যে মেরামতির পর্ব চলে তা ব্যাহত হয়। আন্ডার আই সার্কলের একটি কারণ কিন্তু ঘুমের অভাব।

## কীভাবে বাছবেন সানস্ক্রিন?

''খাওয়াদাওয়ায় অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকা খুব জরুরি। রেসভেরাট্রল, ভিটামিন সি, ফুলারেন-এর মতো যৌগ ত্বককে অক্সিডেটিভ প্রোটেকশন দেবে। আগেই বললাম ব্লু লাইট থেকে ত্বকের অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হয়। ওরাল অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের আকারেও খেতে পারেন। একইসঙ্গে জরুরি হল সানস্ক্রিন। বাড়িতে বা অফিসেও যে সানস্ক্রিন জরুরি, এ কথা আগে থেকেই আমরা জানি। কিন্তু ঘরের মধ্যে কী ধরনের সানস্ক্রিন লাগবে তা বুঝতে পারেন না অনেকেই। জ়িঙ্ক অক্সাইড-যুক্ত সানস্ক্রিন

আরও গভীরে ঢুকে যেতে পারে। অর্থাৎ, ত্বকের যে অংশে কোলাজেন ও ইলাস্টিন থাকে, সেখানে রশ্মি প্রবেশ করে ত্বকের টানটানভাব নষ্ট করে দেয়। আর দৃশ্যত ত্বকে বলিরেখা দেখা দেয়। চুলেও কি ব্লু লাইট এতটাই ক্ষত তৈরি করে? কিরণ জানালেন, ''চুলেও একইরকম ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু তা প্রতিরোধ করা মুশকিল। চুলে ব্লু লাইটের প্রভাব ঠেকাতে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টযুক্ত খাবার খান। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টযুক্ত সেরাম ব্যবহার করুন। চুলের জন্য আলাদা সানব্লক পাওয়া যায়। এগুলোও ব্যবহার করতে পারেন। এই হেয়ারস্ক্রিন ব্যবহার করলে চুল পেকে যায় না।''

## কী কী করণীয়?

করণীয় দু'রকম: ব্লু লাইট থেকে চুল-ত্বককে সুরক্ষিত করতে সুস্থ জীবনযাপন আর গ্যাজেটে প্রিভেনটিভ স্ক্রিনিং। ''স্ক্রিনে ব্লু লাইট ফিল্টার লাগাতে পারেন। অনলাইনেই পেয়ে যাবেন। এ ধরনের প্রোটেক্টিভ স্ক্রিন অনেকটাই সাহায্য করে ঠিকই, তবে একশো শতাংশ ফল পাবেন না। একইসঙ্গে প্রয়োজন স্ক্রিন টাইম কমানো।'' অনেক স্মার্টফোনেই আজকাল ইয়েলো লাইটের অপশন আছে, যাকে নাইটটাইম মোড বলে। ফোনে এই ফিচার থাকলে, সেটি সারাদিনই অন করে রাখতে পারেন। স্ক্রিন টাইম কমানোটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের, সাধারণত সবার কাছেই। রাত জেগে কাজ করলে বা মোবাইলে সিনেমা দেখলে স্বাভাবিক সারকাডিয়ান রিদম ঘেঁটে যেতে পারে। ফলে, রাতে ঘুম আসতেও দেরি হয়। ব্লু লাইট মেলাটোনিন বা স্লিপ হরমোনের ভারসাম্যও নষ্ট করে। এ সবেও ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে পারে। স্কিন সেলের যে স্বাভাবিক সারকাডিয়ান

### ফেশিয়ালে কাজ হয়?

কিরণের মতে, ''ফেশিয়ালে ত্বকের ড্যামেজ অনেকটাই মেরামত হয়। আবার ড্যামেজ প্রতিরোধশক্তিও গড়ে ওঠে। কিছু কিছু মেডিক্যাল ফেশিয়াল রয়েছে যা ড্যামেজ-রিভার্সালে কাজে দেয়। মাঝেমাঝে ফেশিয়াল মাসাজও করতে পারেন। এতে রক্তসঞ্চালন ভাল হয়। ত্বকের ইলাস্টিসিটি বাড়াতেও এটির কিছু ভূমিকা রয়েছে।''

ব্যবহার করুন। যাঁদের সারাদিন কম্পিউটার বা ফোনে কাজ করতে হয়, তাঁরা সারাদিনই এই সানস্ক্রিন লাগাতে পারেন। এসপিএফ ৩০-যুক্ত মিনারেল সানব্লক লাগাতে পারেন। মোটামুটি চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর রি-অ্যাপ্লাই করুন,'' জানালেন কিরণ। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাঁর মত, ''সারাদিন ইলেকট্রোলাইট-যুক্ত উষ্ণ জল খেতে পারেন। অনেকেই ল্যাপটপের সামনে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে করতে বারবার কফি খান। এতে আপনার ক্লান্তি কাটলেও ত্বকের কোনও উপকার হয় না। ক্যাফেন, অ্যালকোহল, সোডা যত পারেন কম খাবেন। ফল, সবজি খান বেশি করে। হেলদি ফ্যাটও জরুরি। যেমন অ্যাভোকাডো বা বড় চর্বিওলা মাছে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, বাদাম...এসবই কিন্তু ত্বকের জন্য ভাল।'' অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-যুক্ত খাবার ত্বকের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। অনেকে টপিক্যাল অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ক্রিম ব্যবহারের পরামর্শও দেন। তবে খুব ঘন ঘন বারবার এই ক্রিম লাগানোর প্রয়োজন নেই। আপনার ত্বকের চাহিদা বুঝে ব্যবহার করবেন। কারণ, ত্বকে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ক্রিমের 'ডিপো' তৈরি হয়, সেখান থেকেই ত্বক অসময়ের রসদ সংগ্রহ করে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হায়ালুরনিক অ্যাসিড ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-যুক্ত আন্ডার আই ক্রিম লাগাতে পারেন। এতে ত্বকের রিনিউয়াল প্রসেস ত্বরান্বিত হয়।

অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টযুক্ত খাবার খান বেশি করে। নিজেকে হাইড্রেটেড রাখাও জরুরি। তাই, কাজ করতে করতে জল খেতে ভুলে যাবেন না। ক্যাফেন ইনটেক কমাতে হবে।

**লেখা:** মধুরিমা সিংহ রায়

**যোগাযোগ:** ৯৬৬৭৩৭৭৭০৯,
info@isyaderm.com,
www.isyaderm.com

**মডেল:** ডিম্পল, দেবলীনা
**মেক-আপ:** পপি, **ফোন:** ৯৫২৭৬১৬৯২৪
**পোশাক:** অরণ্য, **ফোন:** ৯৮৩১০৩৯৮২২
**ছবি:** শুভদীপ ধর

# পান-বিলাসে মিষ্টিমুখ

**মিষ্টি এবং পানীয়, চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পরিবেশনের ধাঁচও আলাদা। তাই বলে যে দুয়ের মিল সম্ভব নয়, তা তো নয়! উৎসবের মধুরেণ সমাপয়েতে চেনা পানীয়কে মিষ্টিরূপে উপস্থাপিত করলেন ফুড কলামনিস্ট মৌসুমী ভট্টাচার্য। চেখে দেখলেন সায়নী দাশশর্মা।**

ঠান্ডাই ফাজ সন্দেশ

পিনা কোলাডা সন্দেশ

রান্নাবান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যাপারে বাঙালিরা চিরকালই সকলের চেয়ে দু'কদম এগিয়ে। কোন খাবারের স্বাদ কোন রন্ধনপ্রণালীতে বেশি খোলে বা কোন উপকরণে নিতান্ত সাধারণ, চেনা খাবারই অচেনা এবং সুস্বাদু হয়ে ওঠে, সেই মুনশিয়ানা তাঁদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে মিশে রয়েছে। মিষ্টির কথাই ধরুন। ছানা-ময়দা-চিনির চিরন্তন সমীকরণে সর্বক্ষণই সংযোজন ঘটছে নতুন উপকরণের, আর তাতেই সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন স্বাদ। অবশ্য সবই যে বাঙালির নিজস্ব ভাবনা, তা নয়। অন্তত মিষ্টির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনিতে ফ্লেভার্ড মিষ্টির প্রচলন বিদেশেই। তার বাইরেও কফি বা চায়ের মতো উপকরণ, যা এখন দেশি মিষ্টির অন্যতম জনপ্রিয় উপকরণ, তার নেপথ্যেও বিদেশি ডেসার্টের অনুপ্রেরণা অনেকখানি। তবে বাঙালির এক্সপেরিমেন্ট করার প্রতি ঝোঁক তো বরাবরই বেশি। তাই আমরা শুধু চা-কফিতেই সীমিত থাকতে নারাজ। এই দুয়ের বাইরেও এমন অনেক পানীয় রয়েছে, যার স্বাদে চেনা মিষ্টিও আনকোরা নতুন হয়ে উঠতে পারে। ভেবে দেখুন, মোহিতোর স্বাদ যদি মেশে সকলের প্রিয় লাড্ডুতে, কিংবা সন্দেশে খুঁজে পান ঠান্ডাই বা পিনা কোলাডার মজা, মন্দ হবে কি? আর উৎসবের ভূরিভোজের শেষপাত আলো করে যদি থাকে এই সব মিষ্টি, তাহলে কে-ই বা খুশি হবেন না! সেই ভাবনা থেকেই শারদীয়ার প্রীতিভোজে অভিনব মিষ্টিমুখের আয়োজন করলাম আমরা। উৎসবের আবহে সকলের মন ভরে উঠুক মিষ্টিরূপী পানীয়র স্বাদে...

## ঠান্ডাই ফাজ সন্দেশ

উপকরণ: হোয়াইট চকোলেট ১৫০ গ্রাম, টাটকা ক্রিম ১/৪ কাপ, ছানা ১০০ গ্রাম, চিনি ২ টেবলচামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১/৪ চা-চামচ, মাখন ১ চা-চামচ, ঠান্ডাই পাউডার ১-২ টেবলচামচ, হলুদ ফুড কালার কয়েক ফোঁটা, সাজানোর

ফ্রুট পাঞ্চ সন্দেশ রোল

মশলা চা ভাপা দই

জন্য কুচনো বাদামকুচি ২ টেবলচামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি ২ টেবলচামচ, রুপোলি স্প্রিংকলস ২ চা-চামচ, কেশর সামান্য।
প্রণালী: মাইক্রোওয়েভে ক্রিম সামান্য গরম করে নিন। ওতে মাখন মিশিয়ে নিন ভাল করে। এরপর হোয়াইট চকোলেট দিয়ে নেড়ে আর-একটু গরম করে নিন, যাতে চকোলেট গলে যায়। চিনি, ছানা ও কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মেখে নিন। ছানা মসৃণ করে মাখতে হবে। মাখা ছানার মধ্যে ঠান্ডাই পাউডার এবং হলুদ ফুড কালার মেশান। একটা চৌকো বেকিং টিনে বাটার পেপার লাগিয়ে ওর মধ্যে ছানার মিশ্রণটি ঢালুন। উপরে শুকনো গোলাপের পাপড়ি, কুচনো বাদাম, কেশর এবং রুপোলি স্প্রিংকলস ছড়িয়ে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে দিন। তারপর ফ্রিজে সেট হতে দিন ৬-৭ ঘণ্টা। বের করে পছন্দের মতো আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

## পিনা কোলাডা সন্দেশ

উপকরণ: ছানা ২০০ গ্রাম, চিনি $^{১}/_{২}$ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, আনারসের টুকরো $^{১}/_{৪}$ কাপ, পাইন্যাপল পিউরি বা ক্রাশ ৪-৫ চা-চামচ, ডেসিকেটেড কোকোনাট ২ টেবলচামচ, সাজানোর জন্য চেরি ও আনারসের টুকরো কয়েকটা।
প্রণালী: ছানা হাতের তালু দিয়ে ঘষে মসৃণ করে মেখে নিন। ৫০ গ্রাম ছানা তা থেকে সরিয়ে রেখে বাকি ছানার মধ্যে চিনি মেশান। আর-একবার ভালভাবে মেখে নিয়ে কড়াইতে দিয়ে নাড়তে থাকুন। মাঝারি আঁচে মিনিটপাঁচেক পাক দিয়ে ওর মধ্যে সরিয়ে রাখা ছানা এবং ডেসিকেটেড কোকোনাট মেশান। আরও ৫ মিনিট পাক দিয়ে নামিয়ে ভ্যানিলা এসেন্স মেশান। ভাল করে মেখে আনারসকুচি মিশিয়ে নিন ওতে। লম্বা গ্লাসে প্রথমে এই সন্দেশের মিশ্রণটা রেখে

ব্লু লাগুন ভাপা সন্দেশ

উপরে পাইন্যাপল ক্রাশ বা পিউরি দিন খানিকটা। চেরি ও আনারসের টুকরো দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

## ফ্রুট পাঞ্চ সন্দেশ রোল

উপকরণ: ছানা ২০০ গ্রাম, ড্রায়েড স্ট্রবেরি, কিউয়ি, কমলালেবু, আমের ছোট টুকরো ১ কাপ, মিক্সড ফ্রুট এসেন্স কয়েক ফোঁটা, হলুদ ফুড কালার কয়েক ফোঁটা, চিনি ১/৪ কাপ, আমসত্ত্ব ১/২ বার।

প্রণালী: ছানা হাতের তালু দিয়ে মসৃণ করে মেখে নিন। তা থেকে ৫০ গ্রাম ছানা সরিয়ে রেখে বাকি ছানার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে নিন ভালভাবে। কড়াইতে মাঝারি আঁচে চিনি মেশানো ছানা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। ৫ মিনিট পরে বাকি ছানাটা দিয়ে পাক দিন। ৫ মিনিট নাড়িয়ে নামিয়ে নিন। এতে মিক্সড ফ্রুট এসেন্স এবং ফুড কালার মিশিয়ে নিন। শুকনো ফলের টুকরোগুলো মেশান তারপর। আমসত্ত্বের একটা করে স্লাইস রেখে উপরে এই সন্দেশের মিশ্রণ রেখে রোল করে নিন। তৈরি ফ্রুট পাঞ্চ

মোহিতো মোতিচুর লাড্ডু

সন্দেশ রোল।

## মশলা চা ভাপা দই

উপকরণ: দুধ চা $^{1}/_{8}$ কাপ, চায়ের মশলা ১ টেবলচামচ, জল-ঝরানো টক দই ১৫০ গ্রাম, টাটকা ক্রিম $^{1}/_{8}$ কাপ, কনডেন্সড মিল্ক $^{1}/_{2}$ কাপ, আইসিং সুগার $^{1}/_{8}$ কাপ, সাজানোর জন্য কেশর ১ চিমটে, মাটির ভাঁড় ৪-৫টা।

প্রণালী: একটা পাত্রে জল-ঝরানো টক দই নিয়ে খুব ভাল করে ফেটান। এরপর এক এক করে বাকি সব উপকরণ এতে মিশিয়ে নিন। মাটির ভাঁড় জলে ভিজিয়ে রাখুন খানিকক্ষণ। তারপর জল থেকে তুলে একটু জল ঝরিয়ে নিন। এবার ওতে দইয়ের মিশ্রণ ঢেলে উপরে অল্প কেশর রাখুন। হাঁড়ির মুখ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে মুড়ে ফুটন্ত জলের উপর রেখে মিনিটকুড়ি ভাপিয়ে নিন। নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে সেট হতে দিন। ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

## মোহিতো মোতিচুর লাড্ডু

উপকরণ: বেসন ১ কাপ, মোহিতো সিরাপ ২-৩ টেবলচামচ, তেল/ঘি/ডালডা পরিমাণমতো, লেবুর রস ১ চা-চামচ, পুদিনাপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, চিনি ১

কাপ, জল ১ কাপ, সবুজ ফুড কালার কয়েক ফোঁটা, ঘি ১ চা-চামচ, কুরনো খোয়াক্ষীর ১/২ কাপ।
প্রণালী: একটা পাত্রে বেসন নিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে মাঝারি ঘনত্বের একটা ব্যাটার তৈরি করে নিন। এবার ওতে সবুজ ফুড কালার মেশান। কড়াইতে তেল গরম করে ছোট ঝাঁঝরিতে করে মিশ্রণ ছাড়ুন। ছোট ছোট মিহিদানার মতো দেখতে হবে। সোনালি করে ভেজে তুলে নিন ওগুলো। ১ কাপ চিনি এবং ১ কাপ জল মিশিয়ে ফুটতে দিন। এক তারের চেয়ে একটু কম ঘন করতে হবে। এবার এর মধ্যে মোহিতো সিরাপ এবং লেবুর রস মেশান। ভেজে রাখা গরম মিহিদানাগুলো এই সিরাপে দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। সব রসটা টেনে একটু আঠা আঠা হলে ওর মধ্যে খোয়াক্ষীর ও ঘি মেশান। একইসঙ্গে পুদিনাপাতাকুচি মেশান। হাতে একটু তেল বা ঘি লাগিয়ে গরম থাকা অবস্থাতেই অল্প অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে লাড্ডু গড়ে নিন। কুরনো খোয়াক্ষীর দিয়ে সাজিয়ে দিন। শেষপাতে হোক বা মিষ্টিমুখে, এই লাড্ডু সকলের মনে ধরবেই!

## ব্লু লাগুন ভাপা সন্দেশ

উপকরণ: ছানা ২০০ গ্রাম, কর্নফ্লাওয়ার ১/৪ চা-চামচ, টাটকা ক্রিম ১/৪ কাপ, কনডেন্সড মিল্ক ১/৪ কাপ, চিনি ১/৪ কাপ, ব্লু কিউরাসাও সিরাপ ১/৪ কাপ, আনারসকুচি ১/৪ কাপ, সাজানোর জন্য পুদিনাপাতা ও লেবুর চাকতি কয়েকটা।
প্রণালী: চিনি, ছানা ও কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মেখে নিন। ছানা মসৃণ করে মাখতে হবে। মাখা ছানার মধ্যে ক্রিম ও কনডেন্সড মিল্কও মেশান। এরপর ব্লু কিউরাসাও সিরাপ আর আনারসকুচি দিয়ে আবারও মেখে নিন। র‍্যামেকিন মোল্ড বা চৌকো বেকিম টিনে মিশ্রণটি ঢেলে মোমো স্টিমারে রেখে ২০-২৫ মিনিট ভাপিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ফ্রিজে সেট হতে দিন। পুদিনাপাতা ও লেবুর চাকতি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

## কোল্ড কফি রসমালাই

উপকরণ: ছানা ২০০ গ্রাম, চিনি ১ কাপ, জল ২ কাপ, ময়দা ১/২ চা-চামচ, কফিগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ফোটানো দুধ ৩০০ মিলি, ভ্যানিলা আইসক্রিম ১/২ কাপ, চিনি ২-৩ টেবলচামচ।
প্রণালী: ছানা ও ময়দা ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণ একেবারে মসৃণ হবে। এর থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করে নিন। কড়াইতে ১ কাপ চিনি ও ২ কাপ জল একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন। ফুটে উঠলে ওতে ছানার বলগুলো ছেড়ে দিন। ১৫-২০ মিনিট ফোটান। ১০ মিনিটের পর অল্প ঠান্ডা জল মিশিয়ে হালকা হাতে নেড়ে নিন। ২০ মিনিট পর নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ঈষদুষ্ণ দুধের মধ্যে কফিগুঁড়ো ও চিনি মিশিয়ে নিন। এর থেকে খানিকটা মিশ্রণ সরিয়ে রেখে বাকিটা ছোট বাটিতে ঢেলে নিন। রসমালাইগুলোর রস চিপে এই কফির মিশ্রণে ফেলুন। আধঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন ঠান্ডা করার জন্য। বাকি কফির মিশ্রণে ভ্যানিলা আইসক্রিম মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। ঠান্ডা রসমালাইগুলোর উপর এই মিশ্রণ ঢেলে পরিবেশন করুন।

## সানসেট মালপোয়া

উপকরণ: ময়দা ২ কাপ, সুজি ১/৪ কাপ, চিনি ২ কাপ + ২ টেবলচামচ, আনারসের রস ১/২ কাপ, কমলালেবুর রস ১/২ কাপ,

কোল্ড কফি রসমালাই

হলুদ ফুড কালার ২-৩ ফোঁটা, কমলা ফুড কালার ২-৩ ফোঁটা, পাইন্যাপল এসেন্স ২-৩ ফোঁটা, অরেঞ্জ এসেন্স ২-৩ ফোঁটা, দুধ পরিমাণমতো, নুন ১ চিমটে, ভাজার জন্য সানফ্লাওয়ার তেল পরিমাণমতো।
প্রণালী: একটা বাটিতে ময়দা, সুজি, নুন ভালভাবে মিশিয়ে নিন। ওর মধ্যে অল্প অল্প করে দুধ মিশিয়ে একটা মাঝারি ঘনত্বের ব্যাটার তৈরি করুন। এই সময় ২ টেবলচামচ চিনিও মেশান। তারপর মিশ্রণটাকে দু'ভাগে ভাগ করে একটা ভাগে হলুদ ফুড কালার এবং পাইন্যাপল এসেন্স মেশান। অন্যভাগে কমলা ফুড কালার ও অরেঞ্জ এসেন্স দিন। আলাদা আলাদা করে মিশিয়ে নিন ভালভাবে। একটি পাত্রে ২ কাপ চিনি ও ১ কাপ জল মিশিয়ে ফুটতে দিন। বেশ খানিকক্ষণ জাল দিয়ে মাঝারি ঘনত্বের সিরা তৈরি করে নিন। খানিকটা সরিয়ে রেখে বাকি সিরা দু'ভাগে ভাগ করে একটায় কমলালেবুর রস এবং অন্যভাগে আনারসের রস মিশিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে দু'টো ব্যাটার অল্প অল্প করে ঢেলে মালপোয়া ভেজে নিন। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রাখা চিনির সিরায় ফেলুন। একটু মজে এলে তুলে নিন। কমলালেবু এবং আনারসের রস মেশানো সিরাগুলো আরও খানিকক্ষণ ফুটিয়ে সসের মতো ঘন করে নিন। প্লেটে মালপোয়া রেখে উপর দিয়ে এই দু'রঙা সস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু মালপোয়া।

চিরন্তন মিষ্টি, দই, সন্দেশ তো রইলই সারাবছরের জন্য। উৎসবের মধুরেণ সমাপয়েতে একটু এক্সপেরিমেন্টই করলেন না হয়!

**যোগাযোগ:** ৯৮৩১৫১৫৪৮৮, ৯৮৩৬৮৭৭৮২৪
**ছবি:** শুভেন্দু চাকী

'ঠান্ডাই ফাজ সন্দেশ'-এর রেসিপি ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন এই QR কোডটি।

সানসেট মালপোয়া

গল্প ১

# প্রত্নশিলা

বিপুল দাস

আমাদের পাড়ায় ছিল সতুপাগল। এমনিতে ওর পাগলামি বোঝা যেত না। দিব্যি আমাদের সঙ্গে ক্লাবে আড্ডা মারছে। আমরা যখন ক্যারম খেলতাম, পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখত। কেউ রেড মিস করলে মুখ দিয়ে চুচ্চু শব্দ করত। এমনকী, দু'একবার ওকে ব্রিজের টেবিলের পাশেও গম্ভীর মুখে দেখা গেছে। পরের দিকে কখনও হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলত, "পাস, থ্রি স্পেড। তুই টেক্কা খেললি কেন,"— আপন মনেই বলত। তবে ভায়োলেন্ট হতে কখনও দেখিনি। পাড়ায় অনেক নতুন ফ্ল্যাট হচ্ছিল। বয়স্ক লোকজন ঠিক ক্লাবে তাসের আড্ডা খুঁজে নিত। বলতে গেলে ক্লাবে প্রায় সারাদিনই তাসখেলা চলত। স্কুলের বিপিন মান্না আমাদের ক্লাবের নাম দিয়েছিল তাসখন্দ। বয়স্করা আসত সন্ধের পর। খেলা নিঃশব্দে চললেও খেলার শেষে তুমুল কথাবার্তা শোনা যেত। কে ভুল কল দিয়েছে, কে কল শুনেও পার্টনারের হাতের তাস বুঝতে পারেনি— এই নিয়ে মৃদু তর্কাতর্কি করতে করতে সকলে বাড়ির পথ ধরত।

তিনশো বছরের এই পুরনো শহরে আমাদের অঞ্চলের ইতিহাসও বেশ পুরনো। হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কোনও নেতাজি কলোনি বা প্রমোদনগর নয়। এসব অঞ্চল আগে ছিল মাছের ভেড়িতে ভর্তি। কিছু চাষাবাদ হত। জমিদার ছিল। তার লেঠেলের দল ছিল। জমিদারের তৈরি করা নিজস্ব পথ ছিল। ভেড়ির দখল নিয়ে এখন যেমন খুনোখুনি হয়, আগেও তাই হত। হেঁসোর কোপে মুণ্ডু উড়ে গিয়ে পড়ত ভেড়ির জলে। লাল হয়ে যেত জল। মানুষজন বলতে ভেড়ির লোকজন, আর কিছু চাষাভুষো। আঠারশো উনত্রিশের গির্জায় এখনও লেখা আছে— 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব'। এখনও এখানে খ্রিস্টানপাড়া রয়েছে। মাইকেল নস্কর, জোসেফ মণ্ডল, মেরি প্রামাণিক। সেখানকার পুরনো লোকজন এখন বলে, "বাপের জন্মে বাঙাল, ফেলাট আর এগরোল শুনিনি বাপু। তাও দেকচি।

কালে কালে কত হল, পুলিপিঠের ন্যাজ গজাল।''
সতুপাগলার বাপ ব্রজ নস্কর ছিল দূরদর্শী লোক। বুঝেছিল, এই অঞ্চলের মাটি একদিন সোনার মত দামি হয়ে উঠবে। কাঠা, বিঘা ছাড়িয়ে তার জমির পরিমাণ একরে দাঁড়াচ্ছিল। তার বন্ধুরা আড়ালে বলাবলি করত, ''বেজোটা গু-খেগোর মত কাজ কচ্ছে। টাকা ছড়াবি তো ভেড়ির জলে দে। মাছ তোকে একশো গুণ ফেরত দেবে। আরে বাবা, মৎস্য হল গে পিথিবির পেত্থম অবতার। অত মাটি ধরে রেখে তুই কী করবি? কতকাল ধরে মাছের সঙ্গে ওঠবস কচ্চি। সেই হল আমাগের নক্কি। বেজোর কপালে দুক্কু আচে।''
সে সব ভুয়োদর্শী লোকের আশায় ছাই ঢেলে গড়ে উঠল লবণহ্রদ। গড়ে উঠল সল্টলেক। পরে রাজারহাট-নিউটাউন। ব্রজ নস্কর একটু একটু করে জমি ছাড়ছিল। একটা চারতলা, একটা তিনতলা বাড়ি করে কোম্পানিকে ভাড়া দিল। বিখ্যাত কোম্পানির রং, লোহার রড আর সিমেন্টের এজেন্সি নিল। স্রোতের মতো তার ঘরে লক্ষ্মীর প্রসাদ ঝনঝন করে বাজছে। লক্ষ্মীঠাকুরের পায়ের ছাপ সব তার বাড়িমুখো। সতুর তখন গলার স্বর ভাঙছে। ফরসা মুখমণ্ডলে কচি দূর্বাদলের মত তরুণ শ্মশ্রুগুম্ফ ঘনাচ্ছে। ব্রজ নস্করের সময় ছিল না ছেলের দিকে লক্ষ রাখার। তার বউ বীণাপাণি নস্করের ওপর দায় ছেড়ে সে তার বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বীণাপাণি ছিল গোলমতো একজন মহিলা। সারাদিন সে স্বর্ণ ও রত্নভূষিতা হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এঘর ওঘর করত। হঠাৎ এক সকালে কেমন করে যেন ব্রজ নস্কর জানতে পারল সত্যেন্দ্র নস্কর কলেজে পড়ে। সত্যেন্দ্রই যে সতু, সেটা বুঝে উঠতে তার দু'এক সেকেন্ড সময় বেশি লেগেছিল। শেয়ালদা থেকে একবার ট্রেনে বর্ধমানে যাওয়ার পথে বীণাপাণি দেবী অনেকবার রেললাইনের পাশে 'সত্যেন্দ্র' নামটি দেখতে পান। কখন যে কার কোনটা মনে ধরে যায়, ঈশ্বরও জানেন না। তখনই তিনি ঠিক করেন তাঁর আগামী সন্তানের নাম হবে সত্যেন্দ্র। কী সুন্দর নাম। আসলে শব্দটির ধ্বনিমাধুর্যে বীণাপাণি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।
"হ্যাঁ গা, আমাদের ছেলের নাম সত্যেন্দ্র রাখলে কেমন হয় ?"
আচমকা তার বউয়ের মুখে এমন প্রস্তাব শুনে ব্রজ নস্কর প্রাথমিকভাবে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বৃষ্টিবাদলার দিন। দুপুরে খেয়ে উঠে বিছানায় শোয়ার পর শরীর কেমন আইঢাই করে। উপদ্রব শুরু হয়। সে তখন ভাবছিল, আজ দুপুরে আর দোকানে বসবে না। দুপুরে শুয়ে একটু বীণাপাণির সঙ্গে 'আমি শ্যাম তুমি রাই' গোছের খেলাধূলা শেষ করে বিষয়কর্মে উদ্যোগ নেবে। এমন সময় এ কী উৎপটাং কথা! রাধামাধবের লীলা, তাকে এক আশ্চর্য খবর শোনাল বীণাপাণি। মেঝেতে পিঁড়ি পেতে খেতে বসেছে। অমাবস্যা ছিল, দুপুর থেকে হাঁটুর পুরনো ব্যথাটা জানান দিচ্ছিল। বলে দিয়েছিল, দুপুরে লুচি খাবে। বীণা পায়েস করেছিল। ফ্যান চলছে, তবু পাতের পাশে বসে ঝালর দেওয়া হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করছে বীণাপাণি। ঘোমটা নেই, ব্রজ লক্ষ করল বীণাপাণি মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে। ব্রজ নস্করের মনে হল বীণাপাণি কিছু বলবে তাকে। আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করা তার ধাতে নেই, সময় হলে সে-ই বলবে।

ব্রজ নস্করের মনে হল বীণাপাণি কিছু বলবে তাকে। আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করা তার ধাতে নেই, সময় হলে সে-ই বলবে।

"একটা কথা বলব ? ভেবেছিলাম আর ক'দিন পরে জানাব।''
"বলো, সোদপুর যাবে? এই তো পুজোয় দশদিন কাটিয়ে এলে।''
"না, সে কথা নয়। আমার শরীরটা কেমন যেন ভার ভার কচ্চে। আমার কিন্তু এবার অন্য রকম কিছু মনে হচ্ছে।''
"অন্য রকম মানে? আবার কোন ব্যামো বাঁধালে? তোমার শরীরে তো আর কোনও অসুখ বাকি নেই।''
"না গো, এসব লক্ষণ তোমরা বুঝবে না। গতমাসে আমার মাসিক হয়নি, এ মাসেও কোনও লক্ষণ দেখছিনে। আমার কিন্তু সন্দ হচ্ছে। শোনো, তুমি কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে রাখবে। সাতকাহন করে গেয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। এ মাসেও যদি না হয়, তবে ষষ্ঠীতলায় গিয়ে ভাল করে একটা পুজো দিয়ে এসো।''
মনে মনে হাসল ব্রজ নস্কর। বীণা তার মনের কথা ঠিকই টের পেয়েছে। তার তো সত্যি ঢোলশহরত করে গেয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছে, 'শুন হে নগরবাসী ...'। সরাসরি বলার সাহস কারও নেই, কিন্তু তার আশপাশে কোথাও দু'চারজন লোককে ফিসফাস করতে দেখলেই মনে হত তার অপদার্থতা, পৌরুষহীনতা নিয়েই বুঝি হাসাহাসি হচ্ছে। সন্দেহবাতিক ক্রমশ বাড়ছিল। আঁটকুড়ে শব্দটা মনে আনতে না চাইলেও এসে যেত। হুঁ, হল কিনা! ও সব পিরের জল, ফকিরের ফুঁ, দরবেশের মাদুলি, সন্ন্যাসীর তাবিজ বাজে কথা। আসল হল পুরুষের উরুর দাপট। এর দাপটেই জমিতে ফসল ফলে, ভেড়ির দখল আসে, খাস জমি খতিয়ানভুক্ত হয়ে যায়, ঘাড়-বাঁকানো ঘোড়াও চড়তে দেয়। বীণাপাণির বাঁজা নাম ঘুঁচল তো! গোটা পনেরো লুচি আর এক জামবাটি পায়েস শেষ করে এঁটো হাতেই বউয়ের চিবুক তুলে ধরলেন।
"কী নেবে বলো? যতন স্যাকরাকে আসতে বলি। নাকি উল্টোডাঙার নিধুর দোকানে গিয়ে নিজে অর্ডার দেবে?"
"উঁহু, এখনই বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। রাধামাধবের কৃপায় সব কিছু ভালমতো হয়ে গেলে যতনকে ডেকো। তা ছাড়া, বাড়িতে কোনও পালাপাব্বণ নেই, হঠাৎ স্যাকরা ডাকলে জবাব দিতে দিতে কাহিল হয়ে পড়ব। কেউ হয়তো আন্দাজও করে ফেলতে পারে।''
এঁটো হাতেই বউয়ের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। বীণাপাণির চিবুকে একটুখানি পায়েস লেগে রয়েছে। এবার মনে হল সত্যিই বীণাপাণির চেহারায় কোথায় যেন একটা বদল ঘটেছে। প্রকট কোনও লক্ষণ নয়, কোথায় যেন একটা লাবণ্য, সুখের ছায়া পড়েছে তার শরীর জুড়ে।
"আর একটা কথা বলব, রাগ কোরো না। ভাল কেত্তন শুনতে ইচ্ছে করে তো, বাড়িতে নবগ্রামের বলরাম গোসাঁই কিংবা বেলেঘাটায় রাসমণি বাজারের প্যারী দাসীর দলকে বায়না দিয়ে আনিয়ে শুনলেই পারো। বাইরে এর ওর ঘরে গিয়ে কেত্তন শোনার কী এমন দরকার তোমার! তোমার যত পুরনো দিনের মানুষের মতো স্বভাব। টেপরেকডে তো ইচ্ছে করলেই গান শুনতে পারো। রাসের দিন বাড়িতে আসর দাও। তা নয়, খুঁজে খুঁজে কোথায় কোন মেয়েছেলে ভাল কেত্তন গায়, তার ঘরে বসে গান শুনতে হবে।''
চুপ করে রইলেন ব্রজ নস্কর। এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। এর ওর ঘরে নয়, তিনি শুধু বিনোদবালার ঘরেই মাঝেসাঝে গান শুনতে যান। বিনোদবালা সরকার। বিনোদ পেশাদার গাইয়েও নয়, হঠাৎ কোনও রাতে মনটা উচাটন হয়ে ওঠে বিনোদের গান শোনার জন্য। বীণাপাণি অবশ্য আরও অনেক কিছু ভেবে বসে আছে। তার ধারণা গান শোনার বাহানায় তিনি বিনোদের সঙ্গে শোয়াবসা করেন। এ নিয়ে অবশ্য তার সঙ্গে কোনও দিন গলা ছেড়ে ঝগড়া করেনি, কথা বলাও বন্ধ করেনি। কিন্তু সন্দেহ যে তাকে কুরে কুরে খায়, একটা দুটো কথায় সেটা টের পেয়েছেন।

বিনোদের সঙ্গে তার গল্প করতে ভাল লাগে— এ কথা বীণাপাণিকে বলা যায় না। সে কী এমন গল্প জানে যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ঘরে বসে থাকতে হবে— তার বউ তো এ কথাই জানতে চাইবে। পুরুষ আর নারী হল আগুন আর ঘি। পাশাপাশি বসলে, একসঙ্গে মেলামেশা করলে ও হবেই। নারীপুরুষের আর কোনও সম্পর্ক হতেই পারে না। মেয়েদের কাছে ছেলেরা ওই একটা জিনিসই চায়। শরীর। গান শোনা তো বাহানা। সে মাগিও চুষে খাচ্ছে বাবুকে। শুধু বীণাপাণি কেন, সব মেয়ে তাই ভাবে, তাই জানে। অথচ বিনোদের শরীরের জন্য কোনও দিন তার কোনও কামনা জাগেনি, এ কথা বললে তার বউ বিশ্বাস করবে না। সে নিজেও জানে, শরীর চাইলে বিনোদ আর কোনও দিন তার নস্করমশাইকে গান শোনাবে না। এতগুলো বছরের নিঃসঙ্গ দাম্পত্যজীবন— বীণাপাণির মনের কথা বুঝতে তার এতটুকুও অসুবিধা হয় না।
আপন মনে মাথা নাড়ল ব্রজ নস্কর। খুব সূক্ষ্ম রহস্যময় একটু হাসি ফুটে রইল তার ঠোঁটে। না বোধহয়। সারাজীবন এক সঙ্গে বাস করেও দু'জনেরই কিছু গোপন কথা গোপন থেকে যায়। এমন নয় যে, সে কোনও গোপন প্রেমের কথা। সে হতে পারে স্বপ্নে কোনও অচ্ছুৎ কন্যার সঙ্গে সহবাস, হতে পারে বিনোদের গানে পরদা একটু উঁচুতে চড়ে গেলে সামান্য ভেঙে যায়— তখন শরীরটা কেমন শিরশির করে ওঠে, হতে পারে অকারণেই একবার ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার তীব্র বাসনা জেগে উঠেছিল তার। একবার তার দাঁতে প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়েছিল। বীণাকে বলেছিল গরমজল দিতে। বীণা ভুলে গিয়েছিল। সেই অভিমান তার এখনও যায়নি। গরমজলের দরকার হলে নিজেই করে নেয়। বীণাপাণি রাগ করে। সে মৃদু হাসে। পুরুষমানুষের বুকের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও মেয়েছেলের নেই। বিনোদের ঘরে তিনি কেন যান, তার একটা মাত্র কারণই বীণা বোঝে। তার ভেতরে বোধহয় এক রকম পাগলামি লুকোনো আছে। শুনেছিল তাদের বংশে কে নাকি ঘোর পাগল ছিল। কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে যে একটা লুঠপাট, ভাঙচুরের নেশা আছে— কেউ টের পায় না। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের মত একর একর জমি আটকে রাখছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সকলের জমি, সকলের ভেড়ি লুঠ করে নিতে। শরীরে জমিদারের লেঠেলের গরম রক্ত এখনও দৌড়ে বেড়ায়। কে জানে ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে!

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সকলের জমি, সকলের ভেড়ি লুঠ করে নিতে। শরীরে জমিদারের লেঠেলের গরম রক্ত এখনও দৌড়ে বেড়ায়।

"চলাফেরা এখন থেকে একটু সাবধানে কোরো। সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামার দরকার নেই। ঠাকুরসেবার কাজ কিছুটা অন্তত চঞ্চলা করুক। দেখি, কালপরশুর মধ্যে একবার রাঘবডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসব।"
"অত আদিখ্যেতা করতে হবে না তোমার। ডাক্তারের সামনে কিন্তু আমি যেতে পারবনে। যা কথা বলার, তুমি বলবে।"
"আরে এইটুকু পথ, গাড়িতে যাবে-আসবে। নারাণকে বলে দেব সাবধানে চালাতে। আমি তো সঙ্গেই থাকব। ভালমন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য সব বুঝেশুনে আসব। আসলে বেশি বয়সে প্রসবের বেলা একটু বেশি সাবধান হতে হয়।"
বীণাপাণির মুখ একটু গম্ভীর হল। তিনি বুঝলেন, 'বেশি বয়স' কথাটা বীণার আঁতে লেগেছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, এখন আর বাক্যবাণ ফেরানোর কোনও উপায় নেই।
রাতে খাটের ছত্রির সঙ্গে মশারি টাঙানো হলে ব্রজ তার বউকে জড়িয়ে নিল। পেটের কাপড় সরিয়ে বীণাপাণির সুগোল, গভীর নাভিতে একটি দীর্ঘ চুম্বন দিল। উত্তেজনা টের পাচ্ছিল বীণাপাণি। তার ইচ্ছে করছিল নস্করমশাই আরও নীচে চুম্বন দিতে থাকুক। আরও, আরও গভীরে।
"দেখো, আমাদের ছেলে হবে। আমার মন বলছে।"
"ধুস, ও সব ঠিকঠাক বলা যায় না। সব রাধামাধবের ইচ্ছে।"
"ছেলেটা খুব গুণী হবে। ভাল লেখাপড়া শিখবে। ওকে আমি তোমার বিজিনেসে যেতে দেব না। লেখাপড়া শিখে বাবু বড় চাগরি করবে। ওর নাম কিন্তু আমি সত্যেন্দ্র রাখব।"
"ধুস, পরে ওটা ছাতু হয়ে যাবে।"
"তা হোক, সত্যেন্দ্র— কী সুন্দর নাম!"
"বাবা, এতকিছু ভেবে বসে আছ?"
"আমি হিসেব কষে দেখেছি, শেষ যে বার তুমি বিনোদের ঘর থেকে কেত্তন শুনে ফিরলে, সে রাতেই তো পাগলের মত আমায় খেয়ে ফেলতে চাইছিলে। যেন বাঘ, আমার হাড়মজ্জা চুষে খেয়েছিলে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি আয়নার সামনে গিয়ে... ইস, সে দাগ আমার বুকে এখনও আছে।"
"তোমারও তো ভাল লেগেছিল..."
"হ্যাঁ, তোমার সুখ পাওয়া যেটুকু বাকি ছেল, আমার তো কর্তব্য ছেল, সেটুকু তোমাকে পাইয়ে দেওয়া।"
নাইটল্যাম্প জ্বালিয়ে ঘর প্রায় অন্ধকার করে মৃদু হাসল ব্রজ নস্কর। একহাতে জড়িয়ে নিল বীণাপাণিকে। হায় রে পুরুষের নিয়তি! তবু কথা বলল স্বাভাবিক সুরে।
"না গো, আমি লক্ষণ বুঝতে পারি। তোমার মেয়ে হবে।"
অন্ধকারে বীণাপাণি নিঃশব্দে হাসল। সূক্ষ্ম একটুকরো বিদ্রূপ, একটু জয়ের উল্লাস, এক রতি দুঃখ ছিল হাসিতে।

## ২

বাপের ধারা পায়নি সতু। তার বাপের দাপটের ছিটেফোঁটাও তার স্বভাবে নেই। নরমসরম, ভিতু-ভিতু টাইপের। মাঝে মাঝে আমরা দেখতাম অটোস্ট্যান্ডের পাশে বিমলের চায়ের দোকানে বাইরের বেঞ্চে বসে থাকত সতু। সেক্টর ফাইভের প্রচুর ছেলেমেয়ে আসাযাওয়া করত সেখানে। সকলের গলায় একটা কালো ধড়া, সঙ্গে একটা কার্ড ঝুলছে। খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের লক্ষ করত সতু। নরমসরম টাইপের হলে কী হবে, মেয়েদের দেখত যেন বাজপাখির দৃষ্টি দিয়ে।
ব্রজ নস্কর তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করেছিল। ভালভাবেই পাশ করেছিল সতু। কিন্তু কে জানে কেন, গ্র্যাজুয়েশন ক্লিয়ার করতে পারল না। তখন থেকেই দেখতাম, বিমলের দোকানের বাইরে বসে সেক্টর ফাইভের ছেলেমেয়েগুলোকে ভাল করে লক্ষ করত। খবর পেলাম মাঝে মাঝে খালপাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
"বুঝলি, সতুর দিকে একটু লক্ষ রাখা উচিত আমাদের।"
কাটানিমাই একদিন ক্লাবের বারান্দায় বসে বলল। বৃষ্টি এলে আমরা ক্লাবের বারান্দায় উঠে আসি। তাসের আড্ডা শেষ হলে পেছনের ছোট পার্কে গিয়ে আমাদের আসর বসে। কাটানিমাই, জগা, রাধেশ্যাম, আমি আর শাজাহান। রাধেশ্যাম বাদে আর সকলেই আমরা একদম খাঁটি লোকাল। রাধেশ্যামরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। নিকষ বাঙাল। প্রথম দিন ওর গ্লাসে মাল ঢাললে জিজ্ঞেস করেছিল— "কী দিয়া খামু?" তারপর গরম পিঁয়াজি দেখে মুখ

বিকৃত করে বলল, ''রেন্ডম এসিড হইব।'' শালার জন্য আবার বাদামভাজা আনা হয়েছিল। প্রথম সিপ দেওয়ার আগে রাধেশ্যাম গ্লাসে আঙুল চুবিয়ে বাইরে ছিটিয়ে দিল। তারপর বিড়বিড় করে কী যেন বলে চুমুক দিল।
"কী বললি রে রাধু?" আমি চেপে ধরলাম।
"পাপকাম করতাছি। ঠাকুরের নাম নিলাম। আসলে দীক্ষা নিলে অনাচার করা উচিত না।''
"তুই দীক্ষা নিয়েছিস? এই বয়সেই?"
"হ, আমাগো বংশের গুরুদেব। শ্রী শ্রী কালিকানন্দ মহারাজ। সক্কলে কইল ওই পারে যাওনের আগে দীক্ষা নিতে। ওই পারে তো আর গুরুদেবরে পাওন যাইব না। দীক্ষা না নিলে শরিলটা শুদ্ধ হয় না। নিয়া নিলাম।''
"আচ্ছা, তোদের জমিদারি ছিল না? ওপার থেকে যারা আসে, সকলেরই শুনি বিশাল জমিদারি ছিল।''
"তয়, আছিল তো। দালান, পুষ্কর্ণি, নাইরহলের বাগান। সব অহন শ্যাখেরা ভোগ করতাছে।''
'শ্যাখ' শুনে আমাদের একটু অস্বস্তি হয় শাজাহানের জন্য। অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে দিই। শাজাহানের মুখ দেখে অবশ্য বোঝা যায় না সে কিছু মনে করল কি না। তা ছাড়া, শাজাহান ধর্মটর্ম নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় বলে মনেও হয় না।
হঠাৎ একদিন শুনলাম সতুকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে ব্রজ নস্কর খুঁজতে বেরিয়েছে। বিকেলে ক্লাবে এসে খুঁজে গেছে। শুনে আমাদের চিন্তা হল। ইদানীং যেন কেমন আউলবাউলের মত ঘুরে বেড়াত সতু। সকালের দিকে বিমলের চায়ের দোকানে, সন্ধের পর ক্লাবে এসে আমাদের খেলা দেখত। একদিন বিমলই আমাদের বলল — "সতু বোধহয় ম্যাড হয়ে গেছে।''
"কী করে বুঝলি?"
আমার খুব রাগ হয়ে গেল। সতু আমাদের বন্ধু। বড়লোকের ছেলে বলে কোনওদিনও আমাদের তাচ্ছিল্য করেনি। তা ছাড়া, পাগল না ছাগল— আমরা বুঝব। বিমল চা-ওয়ালা, সে কেন সতুর ব্যাপারে নাক গলাবে? আমাদের পাগল, আমরা বুঝে নেব।
"আরে এখান দিয়ে আইটি-র মেয়েগুলো যায়। পার্টিকুলার একটা মেয়েকে রেগুলার ফলো করে। দোকানে বসে ব্রিজের কল দেয়। ব্রজ নস্করের ছেলে বলে এখনও কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু এরিয়ার বদনাম হয়ে যাচ্ছে না? আগে সবসময় পরিষ্কার দামি জামাপ্যান্ট পরে থাকত। এখন দেখেছিস? চুলে বোধহয় চিরুনিও দেয় না। দাড়িফাড়ি শেভ করে না। জেনুইন কেস অফ ম্যাডনেস। আমার ছোটমামার বেলায় তো দেখেছি। সেম কেস।''
"ঠিক আছে, আমরা দেখব।''
সতুকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। তিনটে বাইক নিয়ে আমরা পাঁচজন তিনদিকে খুঁজতে বেরলাম। মহিষবাথানের বলাকা সংঘের পাশে ওকে পাওয়া গেল। ক্লাবের ফেলে দেওয়া তাসগুলো কুড়িয়েছে। একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে বসে সেগুলো টেক্কা থেকে সাহেব পর্যন্ত সাজানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। মেলাতে পারছে না। সেট ধরে তো আর পায়নি। এলোমেলো পড়ে থাকা তাস দিয়ে কি আর সিকোয়েন্স মেলে! গলায় আবার কালো রঙের একটা দড়ি বেঁধেছে। তার সঙ্গে একটা স্পেডের বিবি আটকে দিয়েছে।
আমাদের দেখে একমাথা রুক্ষ চুল ঘ্যাসঘ্যাস করে চুলকোতে শুরু করল। শাজাহানের দিকে আঙুল তুলে বলল, ''থ্রি ডাইস।'' ওকে ধরে সকলে আমার বাইকের পেছনে বসিয়ে দিল। কিছুটা আসার পর সতু চেঁচিয়ে উঠল।
"আমি বাড়ি যাব না, আমাকে ছেড়ে দে। প্লিজ়, আমাকে এখানে নামিয়ে দে।''
"কেন, বাড়ি যাবি না কেন?"
"শিলার বাড়ির লোক ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। বলেছে আমাকে পাগলাগারদে ভর্তি করে দিতে। বাবা আমার বিয়ের জন্য মেয়ে ঠিক করেছে।''
"শিলা, কে শিলা ? কার কথা বলছিস?"
"আরে আমারও তো গুলিয়ে যায়। সবগুলো মেয়েকেই শিলা মনে হয়। প্রথমদিন দেখা সেই মেয়েটার মুখ কিছুতেই মনে করতে পারি না। জানিস, প্রথমদিনের সেই মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। আমি হাঁ করে ওকে দেখছিলাম। পাশে ওর বন্ধু ডাক দিল— এই শিলা, তাড়াতাড়ি চল। অটোটা বেরিয়ে যাবে। আমি সেই শিলাকে আর খুঁজেই পাই না। জানিস, একদিন একজন মহিলাকে পেছন থেকে দেখে মনে হল শিলা। তাড়াতাড়ি ক্রস করে পেছন ফিরে দেখি মুখটা কিছুটা শিলার মতো। কিন্তু অনেক বয়স। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। কিন্তু চোখদুটো অবিকল শিলার মতো। সেই তাকানো। আমার মনে হল হতে পারে। আমি তো কতকাল ধরে মেয়েটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শিলারও তো বয়স হয়েছে। একদিন বাড়িতে আয়, শিলার ছবি এঁকেছি, তোদের দেখাব। বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলিস তো শিলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার আবার বিয়ে দিলে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে আমরা ফেঁসে যাব।''
ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। গেটের সামনে ব্রজ নস্কর, আরও কিছু লোক, সতুর মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে সতুকে ধরে নামালাম। হাত ধরে ওর বাবার কাছে নিয়ে গেলাম।
"কোথায় পেলে ওকে?"
"ওই মহিষবাথানের ওদিকে। মনে হয় কোনও বন্ধুর বাড়িটাড়ি গিয়েছিল। আড্ডা মারতে মারতে দেরি করে ফেলেছে।''
"এসো তোমরা, ভেতরে এসে কিছু মুখে দিয়ে যাও। কী করব বলো! ডাক্তার দেখিয়েছি। ওষুধ খেতে চায় না। ওর মা বলছে বিয়ে দিতে। আমি ডিসিশন নিতে পারছি না। আমাদের পালটি ঘরের মেয়ে পেয়েছি। কিন্তু যদি সেই মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যায়..."
আমরা সতুর ঘরে বসে আছি। একটা ঢাউস খাতা বের করে সতু আমাদের ছবি দেখাচ্ছে। সব তাসের বিবির ছবি। এঁকেছে কালি দিয়ে।
"দ্যাখ এটা, অনেকটা শিলা। কিন্তু চোখটা ঠিক আসেনি। আর এটা, এটায় কিছুটা এসেছে।''
"কী দেখেছিলিস তুই শিলার চোখে? কেমন? কিছুতেই সেই ভাব আসছে না কেন?"
কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সতু। ওর শরীর থেকে ধুলো আর ঘামের গন্ধ আসছিল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে রাজারহাটের আলোকিত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সতু।
"কেমন জানিস ? অনেক পুরনো দিনের একটি মেয়ে, আমি আর মেয়েটি একটা পাথরের ঘরে সতরঞ্চি বিছিয়ে তাস খেলছি। মেয়েটির চোখে ওর হাতের তাসের ছায়া ফুটে উঠেছে। আমি বললাম, ''তোমার হাতে কী কী আছে আমি জানি। খেলব না।'' মেয়েটি, শিলাবতী, চোখ বন্ধ করে বলল, ''আমিও জানি। ওই, ওই চোখদুটো কিছুতেই আঁকতে পারছি না। খুব কষ্ট হয় রে তখন। যার যার চোখেই তো তার তার কপালের ছবি আঁকা থাকে। তাই না, বল?''
মাথাটা চুলকে উঠল আমার। শিয়োর ওর থেকে আজ আমার চুলে উকুন এসেছে।

**অলংকরণ:** মহেশ্বর মণ্ডল

কালীঘাট মন্দির

# প্রসাদের প্রসাদগুণ

ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের ভোগ-প্রসাদে রয়েছে বৈচিত্র। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় ঐতিহ্য ও লোককথার ছোঁয়া। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

বিবিধের মাঝে মহামিলন...ভারতের যে কোনও সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য নিয়ে লিখতে বসলেই বোধহয় এই শব্দবন্ধগুলো মনে পড়ে। তা সে রসনাবৈচিত্র হোক বা স্থানীয় আদব-কায়দার তারতম্য... সবই এক অসামান্য বিবিধ-ক্ষেত্র যেন! ঠিক একই বৈচিত্র চোখে পড়ে বিভিন্ন মন্দিরে দেবতাকে অর্পিত ভোগের মধ্যেও। এদেশে প্রসাদ তো শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই জায়গার আঞ্চলিক সংস্কৃতি, স্থানীয় রীতি-নীতি, মানুষের বিশ্বাস ও নানা প্রথা। স্থানীয় ঐতিহ্যে ঋদ্ধ হয়েছে মন্দিরের প্রসাদ-সংস্কৃতিও। আর সেখানেই বোধহয় এর মাহাত্ম্য, এর বিশেষত্ব। পুরীর মহাপ্রসাদের কথা যেমন সর্বজনশ্রুত। তা প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু তার বাইরেও রয়েছে উত্তর-দক্ষিণের আরও বেশ কিছু মন্দিরের প্রসাদ, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা গল্প। দেশের এমনই কিছু মন্দিরের ভোগ-আখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমরা...

কালীঘাটের খিচুড়ি ভোগ

### কালীঘাট মন্দিরের ভোগ

কলকাতায় আগমন এবং কালীঘাট মন্দিরে গমন বা মাতৃদর্শন, এই ঘটনার ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মায়ের আশীর্বাদ, তাঁর ভক্তদের কাছে যতখানি কাম্য, তেমনই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হল মায়ের ভোগপ্রসাদ। সোম, বুধ ও শুক্র মায়ের মন্দির  সর্বসাধারণের জন্য খুলে যায় ভোর

বৈষ্ণোদেবী মন্দির

বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরের প্রসাদ, মুখ্য উপাদান শুকনো আপেল

রাজস্থানের 'মাথরি' ভোগ শ্রীনাথজির প্রিয়

জম্মুর কাটরার বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের প্রসাদও বেশ অভিনব। মুড়ি, গোটা এলাচ, মিছরি, শুকনো নারকেল আর বাদামের কুচি একসঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। আর তার মধ্যে দেওয়া হয় রোদে শুকোনো আপেলের টুকরো।

৪টে বা সাড়ে ৪টে থেকে। মাকে মুখ ধুইয়ে রসগোল্লা খাইয়ে আরতি করে মন্দির খোলা হয়। সোয়া ছটা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে শুরু হয় ফল এবং আতপ চালের নৈবেদ্য দিয়ে নিত্যপুজো, যা সাড়ে সাতটা বা কখনও আটটা অবধিও চলে। অধুনা নিয়ম অনুযায়ী, মন্দির দুপুর ১টা থেকে সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইটে বা পৌনে তিনটে থেকে মায়ের নিত্যভোগ হয়। সাদা ভাত, পাঁচরকম ভাজা (আলু, পটল, বেগুন ইত্যাদি), শুক্তো, তরকারি (আলু পটল, আলু ফুলকপি ইত্যাদি), পোলাও, মহাপ্রসাদ (পাঁঠার মাংস, কিন্তু পিঁয়াজ-রসুন ছাড়া রান্না হয় এবং মন্দিরে রোজই বলির প্রথা প্রচলিত) এবং পায়েস, এইরকমই থাকে ভোগের পদ। মিনিট পনেরো পরে মায়ের শয়ন হয়। আবার মন্দির খুলে যায় বিকেল চারটে নাগাদ। সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে আরতি প্রায় পৌনে আটটা পর্যন্ত চলে। তারপর লুচি, আলুভাজা ও মিষ্টি দিয়ে হয় রাত্রিকালীন ভোগ। এরপর সওয়া দশটা নাগাদ মায়ের রাজবেশে শয়ন আরতি হয়। সেই সময় মুখে নয়, মায়ের চরণে নিবেদন করা হয় মিষ্টান্ন। এই সময় আরতি করেন মায়ের মিছরি মশাই, তাঁরাই মায়ের নিরাপত্তারক্ষী। তাঁরা ধ্যানে বসেন এবং মন্দিরও বন্ধ হয়ে যায়। শনি এবং মঙ্গলবার কখনও কখনও ভোর সোয়া তিনটের সময়ও মন্দির খুলে যায়। কালী পূজার দিনও কোনও আলাদা ভোগ হয় না। মায়ের নিত্যপুজো, শৃঙ্গারবেশ এবং নিত্যভোগের পদ্ধতিই বজায় থাকে। বিশেষ কোনও ভক্ত বা পালা বিশেষভাবে নিজের উদ্যোগে কোনও আয়োজন করলে তার কথা আলাদা। (তথ্যসূত্র: মন্দির কমিটি)

### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রসাদ

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ভোগও খুব বিখ্যাত। সাধারণ মানুষ টিকিট কেটে পেতে পারেন। কালীঘাটের মতো এখানেও আমিষ ভোগের প্রচলন আছে। তবে এখানে মাংস হয় না। পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাছ থাকে ভোগে। এখানে বলিও নিষিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতি ও ভোগ-নিবেদন এখানে পালিত হয়ে আসছে।

*ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা কাহিনি। সেসব গল্প শোনালেন ফুড হিস্টোরিয়ান ও ফুড রিসার্চার তনুশ্রী ভৌমিক।*

### বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে আপেল-ভোগ

জম্মুর কাটরার বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের প্রসাদও বেশ অভিনব। মুড়ি, গোটা এলাচ, মিছরি, শুকনো নারকেল আর বাদামের কুচি একসঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। আর তার মধ্যে দেওয়া হয় রোদে শুকোনো আপেলের টুকরো। এই আপেল সহজেই

গণপতিপুলেতে দেওয়া হয় খিচুড়ি, মিক্সড আচার, রায়তা ও পাপড়

প্রসাদের ছবি

পচনশীল নয়। কারণ, দর্শন-শেষে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নীচে নামতেই তো অনেকটা সময় লাগে! তাই, পুণ্যার্থীদের প্রসাদ যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা। প্রসাদে ব্যবহৃত আপেলের ফলন হয় রাজ্যেই। ডাক মারফতও এই প্রসাদ অর্ডার দিতে পারেন।

### রাজস্থানের 'মাথরি'

রাজস্থানের নাথওয়াড়ায় শ্রীনাথজির মন্দির। আর সেখানেই দেওয়া হয় 'মাথরি'। এই মাথরি ডুবো তেলে ভাজা বিস্কিটের মতো দেখতে। নোনতা প্রসাদ হিসেবে এটিই তাঁর প্রিয়। তবে এর মিষ্টি সংস্করণও রয়েছে। চিনির রসে ডোবানো মাথরি-কে এখানে স্থানীয় ভাষায় 'থর' বলে।

### বারাণসীর পেড়া, লাড্ডু আর ওয়াইন

বারাণসী আর উজ্জয়িনীতে কালভৈরবের মন্দিরের মূল প্রসাদ সুরা (হুইস্কি বা ওয়াইন) দেওয়া হয়। তা-ই প্রসাদ হিসেবে পান ভক্তরা। বারাণসীর সঙ্কট মোচন মন্দিরে আবার দেওয়া হয় লাল পেড়া আর বেসনের লাড্ডু। শোনা যায়, এই মন্দিরে হনুমানজির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তুলসীদাস। তারপরেই মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

### গোরখপুরের 'খিচড়ি পর্ব'

গোরখপুরের রাপ্তি আর রোহিণী নদীর মাঝামাঝি জায়গায় গোরক্ষনাথ মন্দির। শোনা যায়, মধ্যযুগীয় যোগী গোরক্ষনাথ নদীদ্বয়ের মাঝখানে বসে উত্তরায়ণের দিনে ধ্যান করতে শুরু করেন। পাশেই রাখা ছিল ভিক্ষাপাত্র। সেখানে পথচলতি মানুষজন সাধ্যমতো চাল-ডাল দিতে থাকলেও ভিক্ষাপাত্রটি অর্ধেকই ভর্তি হচ্ছিল। কিন্তু পরে তাঁরা বুঝতে পারেন, এই যোগী ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত। তাই এরপর থেকে তাঁকে খিচুড়ি ভোগ দিতে শুরু করেন। সেই থেকে পুরো উত্তর প্রদেশেই উত্তরায়ণের দিন 'খিচড়ি পর্ব' পালন করা হয়।

### গণপতিপুলের খিচুড়ি-আচার

কোঙ্কণ উপত্যকার গণপতিপুলেতে গণেশের স্বয়ম্ভূ-রূপ বিরাজমান। এখানে ভগবানকে খিচুড়ি, আচার ও বোঁদে দেওয়া হয় ভোগ হিসেবে। আর সন্ধেয় প্রসাদ হিসেবে থাকে মশলা রাইস আর আচার। মিষ্টির মধ্যে দেওয়া হয় মোদক।

### কামাখ্যা মন্দিরের অঙ্গোদক

গুয়াহাটির কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে প্রতিবছর বিশেষভাবে পালিত হয় 'অম্বুবাচী মেলা'। এই সময়ে তিনদিনের জন্য মন্দির বন্ধ রাখা হয়। চারনম্বর দিনে মন্দিরের দরজা খুললে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান প্রসাদের জন্য। প্রসাদ হিসেবে 'অঙ্গোদক' আর 'অঙ্গবস্ত্র' ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার চল আছে। অঙ্গোদক হল, দেবীর শরীর থেকে নির্গত তরল। প্রতীকী রূপে তা এখানকার গর্ভগৃহের ঝরণার জল হিসেবে ধরা হয়। অঙ্গবস্ত্র হল একখণ্ড কাপড়, যা দিয়ে পাথরের মূর্তিটি ঢেকে রাখা হয়।
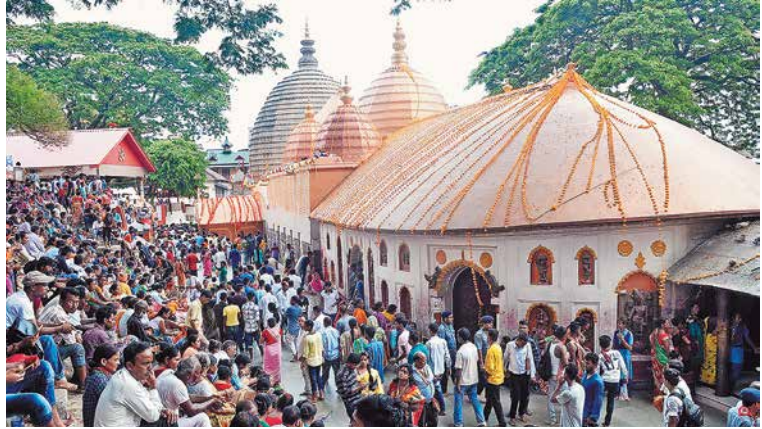
কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী মেলা

গুয়াহাটির কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে প্রতিবছর বিশেষভাবে পালিত হয় 'অম্বুবাচী মেলা'। এই সময়ে তিনদিনের জন্য মন্দির বন্ধ রাখা হয়। চারনম্বর দিনে মন্দিরের দরজা খুললে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান।

### বৃন্দাবনের কুলিয়া ভোগ

কুলিয়া ভোগ হল ঘন মিষ্টি রাবড়ি। বৃন্দাবনে রাধারমণজিকে প্রতিদিন প্রতিবেলার আহারের সঙ্গে এটি দেওয়া হয়। এই ভোগ-নিবেদনের নেপথ্যে রয়েছে লোকগাথা। শোনা যায়, এক রাতে কৃষ্ণ শ্রীলা মাধবেন্দ্র পুরীর স্বপ্নে আসেন। তাঁকে বলেন মলয় দেশ থেকে চন্দন নিয়ে আসতে, সেই চন্দন তাঁর অঙ্গে লেপন করে দিলে অসহ্য গরম থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। চন্দনের খোঁজে শ্রীলা মাধবেন্দ্র রওনা দেন জগন্নাথ ধামের উদ্দেশ্যে। পথে
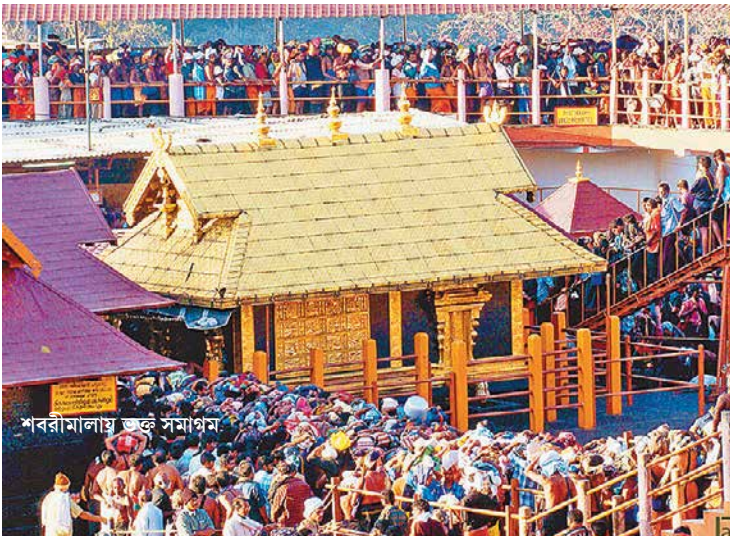
ওড়িশার বালেশ্বরের রেমুনা গোপীনাথ মন্দিরে আসেন তিনি। সেখানে তাঁর ইচ্ছে হয় কিশমিশ দেওয়া মিষ্টি ঘন দুধ খাওয়ার! গোপীনাথ তাঁর ভক্তের মনের ইচ্ছে বুঝতে পেরে এক বাটি ক্ষীর চুরি করে মাধবেন্দ্রকে দেন। সেই থেকেই গোপীনাথের নাম হয় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। চন্দন নিয়ে ফেরার পথে গোপীনাথ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন তাঁর গায়ে চন্দন লেপন করে দিতে। তিনি বোঝেন, পুরীর জগন্নাথ, গোবর্ধনের গোপাল ও রেমুনা গোপীনাথ একই। সেই থেকে এই ভোগের প্রচলন।

## কেরলের আমিষ প্রসাদ

কেরলের কান্নুরে পারাস্‌সিনিক্কাদাভু মন্দিরে রয়েছেন শ্রী মুথাপ্পান। কলিযুগে জন্মানো বিষ্ণু ও শিবের অবতার ইনি। এখানে মন্দিরের ভোগ প্রসাদ রোস্ট করা মাছ, টডি (একধরনের গরম পানীয়, যাতে সাধারণত 'রাম', চিনি ও নানারকম মশলা মেশানো থাকে), সবুজ ছোলা, নারকেল ও চা।

কুলিয়া ভোগের অনুকরণে তৈরি রেসিপি

প্রসাদের ছবি

কুলিয়া ভোগ হল ঘন মিষ্টি রাবড়ি। বৃন্দাবনে রাধারমণজিকে প্রতিদিন প্রতিবেলার আহারের সঙ্গে এটি দেওয়া হয়। এই ভোগ-নিবেদনের নেপথ্যে রয়েছে লোকগাথা।

শবরীমালায় ভক্ত সমাগম

## মুরুগানের পঞ্চামৃত প্রসাদ

তামিলনাড়ুতে মুরুগান-এর ছ'টি বাসস্থানের মধ্যে অন্যতম পালানি আরুলমিগু শ্রী ধান্ডায়ুথাপানি মন্দির। এখানে পালানি পঞ্চামৃত পরিবেশন করা হয় প্রসাদ হিসেবে। না-তরল, না-জমাট অবস্থায় দেওয়া এই পঞ্চামৃত 'অভিষেগা প্রসাদম' হিসেবে পরিচিত। এই পঞ্চামৃত কলা, গুড়, গরুর দুধের ঘি, মধু, এলাচ—এই পাঁচটি উপকরণের সমষ্টি। এর মধ্যে খেজুর ও মিছরিও (রক সুগার) দেওয়া হয়। ২০১৯-এ এই মন্দিরের প্রসাদ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ পেয়েছে, ভারতের কোনও মন্দিরের মধ্যে এটিই প্রথম নজির।

## কৃষ্ণমন্দিরের পাল পায়সম

কেরলের আলেপ্পির একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির হল আম্বালাপুজ়া শ্রী কৃষ্ণ মন্দির। কথিত

ট্যামারিন্ড রাইস

ভেন পোঙ্গল

আছে, প্রাচীনকালে এখানকার শাসক ছেম্পাকাসেরিল পুরাদাম তিরুনাল দেবা-নারায়ণ থাম্পুরানের সামনে এক সাধুর বেশে আবির্ভূত হন শ্রী কৃষ্ণ। তাঁকে চতুরঙ্গম (পাশা) খেলায় আহ্বান করেন। রাজা তাঁর পারদর্শিতা নিয়ে এতটাই গর্বিত ছিলেন যে তিনি বলেন, হেরে গেলে নিজের প্রিয় যে কোনও জিনিস তিনি ত্যাগ করবেন। শ্রী কৃষ্ণ তাঁকে বলেন, পাশার প্রতিটি খোপে খানিকটা করে চাল রাখতে। খেলার বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী, রাজা উপলব্ধি করেন যে ৬৪তম খোপ ভরতে এক লাখ কোটি শস্যদানার প্রয়োজন। কৃষ্ণ নিজের পরিচয় সামনে এনে রাজাকে বলেন, যতদিন না এই ঋণ শোধ হচ্ছে ততদিন প্রতিদিন এখানকার সাধারণ ভক্তদের পাল পায়সম খাওয়াতে হবে বিনামূল্যে। এখনও সেই রীতি মেনে এখানকার মন্দিরে পাল পায়সম প্রসাদে দেওয়া হয়। তবে দক্ষিণের একাধিক মন্দিরেই এই পায়েস প্রসাদের চল আছে। অনেকটা বাঙালি পায়েসের মতোই, কিন্তু তেজপাতা ও এলাচ ছাড়া তৈরি হয়। দুধ ঘন করে তাতে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। তারপর মন্দির নির্বিশেষে চিনি বা গুড়ে মেশানো হয়। পাল পায়সমের অন্য একটি সংস্করণ হল ক্ষীরান্নাম।

## ত্রিশূরে জ্ঞান-প্রসাদ

এতক্ষণ তো ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে দেবতাদের কী কী ভোগ অর্পণ করা হয়, তার তালিকা দিলাম। কিন্তু ত্রিশূরের মাজুভানচেরিতে অবস্থিত মহাদেব মন্দিরে দেওয়া হয় সিডি, ডিভিডি, পাঠ্যবই, লেখার জিনিসপত্র। বলা হয়, ভগবানকে উৎসর্গ করার সেরা প্রসাদ হল জ্ঞান।

## দক্ষিণের মন্দির-ভোগ

*দক্ষিণের মন্দিরগুলিতে যে প্রসাদ দেওয়া হয়, তার অনুকরণে রেসিপি বানালেন শেফ ঈশানী প্রিয়দর্শিনী।*

উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে সারা দেশের ভোগ-প্রসাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে ইতিহাস, তা তো জানা গেল। কিন্তু মন্দির সংস্কৃতির ঐতিহ্যে দাক্ষিণাত্য বরাবরই ঋদ্ধ। কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী প্রসাদের অনুকরণে দিলাম খানিকটা কাছাকাছি রেসিপি:

**ট্যামারিন্ড রাইস:** হায়দরাবাদের পেদাম্মাগুড়ি মন্দিরে ট্যামারিন্ড রাইস

মিলাগু বড়া

খুব বিখ্যাত। এছাড়াও একাধিক মন্দিরে এটি দেওয়া হয়, এক এক জায়গায় এক একরকমের নাম! কোথাও তা পুলিহোরা, কোথাও পুলিয়োধারাই, কোথাও পুলিয়োগারে...

**উপকরণ:** চাল ২৫০ গ্রাম, তেল ১/৪ কাপ (বাড়িতে বানালে কম তেলেও বানাতে পারেন), গুড় পরিমাণমতো, কারিপাতা ২ আঁটি, কাঁচালঙ্কা ২টো, হলুদ ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, তেঁতুল ৫০ গ্রাম। **প্রথম সিজ়নিং:** তেল ২ চা-চামচ, গোটা সরষে ১/২ চা-চামচ, গোটা মেথি ১/২ চা-চামচ, কারিপাতা ১ আঁটি, হিং ১/২ চা-চামচ। **দ্বিতীয় সিজ়নিং:** তেল ১/৪ কাপ, গোটা সরষে ১/২ চা-চামচ, চিনেবাদাম ১/৪ কাপ, অড়হর ডাল ১ টেবলচামচ, ছোলা ১ টেবলচামচ, শুকনোলঙ্কা ৫টা, কারিপাতা ১ আঁটি। **সরষে পেস্ট বানানোর জন্য:** গোটা সরষে ২ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কা ১টা, আদা ১ ইঞ্চি, নুন (সব একসঙ্গে পিষে নিন)

**প্রণালী:** ২৫০ গ্রাম গরম জলে তেঁতুল ভিজিয়ে রাখুন। পাল্প বের করে নিন। পোলাওয়ের মতো, চালের দ্বিগুণ জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। না হলে চাল সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। হলুদ, তেল, কাঁচালঙ্কা, কারিপাতা দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার তেল গরম করে সরষে, মেথি, কারিপাতা ফোড়ন দিন। এতে তেঁতুল পাল্প, গুড় দিন। ঘন পেস্ট হয়ে গেলে সরষেবাটা দিন। ঠান্ডা করে ভাতের মধ্যে মিশিয়ে দিন। তেল গরম করে তাতে সরষে ফোড়ন দিন। একে একে চিনেবাদাম, ছোলা, অড়হর ডাল দিয়ে রোস্ট করুন। শুকনোলঙ্কা, কারিপাতা ভেজে ভাতের উপর দিন।

**ভেন পোঙ্গল ও চক্র পোঙ্গল:** মন্দিরে তো বটেই, নবরাত্রির সময়ে এটি মা লক্ষ্মী ও মা দুর্গার প্রসাদ। একটি বিষয় হল, আরাভানা বা চক্র পোঙ্গলের ক্ষেত্রে মন্দিরের স্বাদ পেতে হলে তালের গুড় ব্যবহার করতে পারেন। তিরুপতির শ্রীপ্রসাদমে চক্র পোঙ্গল খুবই বিখ্যাত। এছাড়া পার্থসারথি মন্দিরেও এই প্রসাদ বিখ্যাত। তবে এটি আরও অসংখ্য দক্ষিণের মন্দিরের গুরুত্বপূর্ণ প্রসাদ।

**উপকরণ:** মুগডাল ১/২ কাপ, গোবিন্দভোগ চাল ১/২ কাপ, ঘি আন্দাজমতো, গোলমরিচ (হালকা ক্রাশ করা), সরষে, কারিপাতা,

উন্নিয়াপ্পাম

> দক্ষিণের মন্দিরে দুধের প্রসাদ একটু কম পাওয়া যায়। দুর্গম কোনও জায়গার মন্দিরের প্রসাদ যদি পায়েস হয়, সেই পায়েসে দুধ থাকে না। বরং ঘিয়ের পরিমাণ থাকে বেশি।

আরাভানা

আদাকুচি (সব পরিমাণমতো)।

প্রণালী: ঘি-তে মুগডাল ভেজে তাতে সেদ্ধ চাল দিন। নেড়েচেড়ে নুন, হলুদ ও তিন কাপ মতো জল দিন। একদম গলে গেলে সরিয়ে রাখুন। ঘি-তে অল্প ভাঙা গোলমরিচ, সরষে, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে পোঙ্গলের উপর ঢেলে দিন। মিষ্টি পোঙ্গলের ক্ষেত্রে এরপরে গুড়ের সিরাপ তৈরি করে নিন। তাতে এলাচগুঁড়ো দিয়ে পুরো মিশ্রণের উপর ঢেলে কাজুভাজা দিয়ে সাজিয়ে দিন। আর তিরুপতির মন্দিরের প্রসাদের স্বাদ আনতে গেলে এতে এক চিমটি খাবার কর্পূর দিন।

**মিলাগু বড়া:** তিরুপতির মন্দিরে মিলাগু বড়া পরিবেশন করা হয় প্রসাদ হিসেবে। প্রতিটা বেলায় আলাদা আলাদা ভোগ হয় এখানে। সকালে যদি ভেন পোঙ্গল দেওয়া হল, বিকেলে হয়তো মিলাগু বড়া দেওয়া হয়।

উপকরণ: অড়হর ডাল ১ কাপ, চালের গুঁড়ো ২ টেবলচামচ, পেপারকর্ন ১ টেবলচামচ, নুন ১ চা-চামচ, তেল ২ কাপ (ভাজার জন্য)।

চক্র পোঙ্গল

প্রণালী: ডাল ভাল করে ধুয়ে একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পুরো জল ঝরিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। যৎসামান্য জল দিন দরকার হলে। গোলমরিচ, নুন, চালের গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন আবার। দু'চামচ তেল দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। প্যানে ভাজার জন্য তেল গরম করে ছোট বড়ার আকারে দিয়ে ভেজে নিন।

**কোসাম্বারি:** এটি মূলত স্প্রাউটস, নারকেল আর সবজির স্যালাড। উদুপি মন্দিরে এই প্রসাদ দেওয়া হয়।
উপকরণ: অঙ্কুরিত ছোলা, নারকেল, শসার কুচি (তিনটেই একমুঠো করে), বা অন্য কোনও তাজা সবজি (অপশনাল)।
প্রণালী: সব উপকরণ মিশিয়ে পরিবেশন করা হয় প্রসাদ হিসেবে। মন্দির থেকে মন্দিরে উপকরণে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

**উন্নিয়াপ্পাম:** কেরলের আট্টুকল মন্দিরের উনিয়াপ্পাম বিখ্যাত।
উপকরণ: চালের গুঁড়ো ২ কাপ, গুড় ৩/৪ কাপ, এলাচগুঁড়ো ২টো, নারকেলকুচি ৩ টেবলচামচ, ঘি ১ চা-চামচ, কলা ২টো (ছোট), জল ১ কাপ।
প্রণালী: ১/৪ কাপ জলে গুড় ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। ছোট প্যানে ১ চা-চামচ ঘি গরম করে তাতে নারকেলকুচি ভাজুন। হালকা বাদামি রং ধরবে। একটি পাত্রে কলা চটকে মেখে তাতে গুড়, চালের গুঁড়ো, নারকেল, এলাচগুঁড়ো, জল দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন। ৩০ মিনিট রেখে দিন। আপ্পাকাড়ায় (ছোট ছোট আপ্পাম বানানোর কড়াই) তেল গরম করে তাতে ব্যাটার দিন। তিন মিনিট পরে একপিঠ সোনালি রংয়ের হলে অন্যপিঠ মিনিটচারেক রাঁধুন। চাটু থেকে উঠে এলে আবার আর একটি বানান।

**আরাভানা:** দক্ষিণের মন্দিরে পেড়া, সন্দেশ, পায়েসের মতো দুধের প্রসাদ কমই পাওয়া যায়। দুর্গম কোনও জায়গার মন্দিরের প্রসাদ যদি পায়েস হয়, সেই পায়েসে দুধ থাকে না। ঘিয়ের পরিমাণ থাকে বেশি। তাতে প্রসাদ বেশিদিন রাখা যায়। শবরীমালা মন্দিরে বিখ্যাত হল আরাভানা।
উপকরণ: ঘি ১/৪ কাপ ও ১ টেবলচামচ, মাট্টা রাইস (লালচে মোটা সেদ্ধ চাল, ওনামের সময় মানুষ খান) ১/৪ কাপ, গুড় ২ ১/২ কাপ, এলাচ ২টো (চাইলে গুঁড়ো করে নিতে পারেন, বা গুড়ের সঙ্গে এলাচ গুঁড়ো করে নিতে পারেন), শুকনো আদাগুঁড়ো ১ চিমটে, জল ২ কাপ।
প্রণালী: তলা-ভারী কড়াইতে ঘি দিন। জল-ঝরানো চাল ভাল করে ভেজে নিন। কড়াইতে দু'কাপ জল দিয়ে ৩০ মিনিট মতো ভাত সেদ্ধ করে নিন। এতে গুড়ের গোলা দিয়ে নাড়তে থাকুন। একটু চকচকে মতো দেখতে হলে ১ টেবলচামচ ঘি আর শুকনো আদাগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। চাইলে ২ টেবলচামচ নারকেলকুচি ঘি-তে শুরুতেই ভেজে তুলে রাখতে পারেন। সেই তেলে চাল ভেজে বাকি প্রণালী অনুসরণ করুন। নারকেলকুচি দিয়ে ভগবানকে নিবেদন করা হয়।

**কুলিয়া ভোগ, খিচুড়ি ও মাথরির রেসিপি:**
**রান্না:** মণিদীপা সাহা
**ছবি:** শুভেন্দু চাকী

**বাকি ছবি:** ইন্টারনেট ও আর্কাইভ

# ফ্যাশন ক্যানভাসে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

কেউ চিত্রশিল্পী, কেউ অভিনেত্রী, কেউ আবার লেখক-নর্তকী বা রাজরানি। পেশাদারি পরিচিতি যা-ই হোক না কেন, এরা সকলেই 'আপোসহীন'। সমাজনীতির সঙ্গে আপোস না করে, সময়ের চেয়ে অনেকগুণ এগিয়ে থাকা এক একজন ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক তাঁদের মনন, তাঁদের কর্মজীবন, তাঁদের সাজপোশাক... সবকিছু। সেই ব্যক্তিত্বের আগুন এতটাই তীব্র যে, এত যুগ পরেও তাঁরা একইরকম প্রাসঙ্গিক। সেই সময়ে নিজেদের মতো করে গড়ে তোলা স্বকীয় ফ্যাশন স্টেটমেন্ট এযুগেও সমান সমাদৃত। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তাঁরা লিখেছেন মননশীলতায়, স্বাতন্ত্র্যে। ইতিহাসের পাতা থেকে এমনই দশজন আইকনের সাজ-ফ্যাশনের সূত্র ধরে তাঁদের শ্রদ্ধা জানালাম আমরা। সামগ্রিক ফ্যাশনচিত্রের পরিকল্পনায় সায়নী দাশশর্মা ও মধুরিমা সিংহ রায়।

ফ্রিডা কাহলো

*"I don't paint dreams or nightmares, I paint my own reality"*...এমনই ছিলেন মেক্সিকোর চিত্রশিল্পী ফ্রিডা কাহলো। পোলিওয় শয্যাশায়ী, গাড়ি দুর্ঘটনায় ভয়ঙ্কর চোট কিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি তাঁকে। স্টেটমেন্ট নেকপিস, হেডব্যান্ড আর ইউনিক পার্সোনালিটি, ফ্রিডার স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠল যুগান্তকারী।

মডেল: দময়ন্তী

দেবিকা রানি

ভারতীয় সিনেমার ফার্স্ট লেডি। তিন-চারের দশকে সিনেমার পরদায় দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন এক মহিলা, একা হাতে সামলেছেন 'বম্বে টকিজ়' স্টুডিওর দায়িত্ব। পুরুষ-অধ্যুষিত ইন্ডাস্ট্রির 'নায়ক' হয়ে উঠেছিলেন। সাজগোজ, মেক-আপেও ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। সিম্পল অথচ এলিগ্যান্ট।

মডেল: শ্রীলগ্না

## গায়ত্রী দেবী

সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি বলা হত জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবীকে। টিনএজে তিনিই নাকি ঈষৎ ভারী চেহারা ও সান ট্যানড ত্বকের জন্য বিব্রত ছিলেন! তাঁর মা বলেন, 'সৌন্দর্য হল

এমন এক আলো যা তোমার হৃদয়ে পরিণত হয়ে উঠবে।' রাজকীয় আভিজাত্যের সঙ্গে মিশেছিল জনদরদি সত্তা। শাড়ি ও হেয়ারস্টাইলে তৈরি করেছিলেন নিজস্ব স্টেটমেন্ট।

**মডেল:** হিয়া

অড্রে হেপবার্ন

*''Beauty is being the best possible version of yourself, inside and out.''*...বক্তা অড্রে হেপবার্ন। পাঁচের দশকে যিনি ছিলেন আধুনিকতার প্রতীক। অক্লান্ত কাজ করেছেন শিশু-অধিকার নিয়ে।

ইথিয়োপিয়ার খরা-বিধ্বস্ত এলাকাতেও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। 'ব্রেকফাস্ট অ্যাট টিফানি'স'-এ কালো ড্রেস, ডায়মন্ড আর সিগার হয়ে উঠল সিগনেচার।

মডেল: স্নেহা

## গওহর জান

ভারতীয় পারফর্মিং আর্টের পরিসরে গওহর জান আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন 'বিপ্লবী'। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রেকর্ডেড আর্টিস্ট...তাঁর হাত ধরে একপ্রকার 'লিবারেশন' হয়েছিল মহিলা সংগীতশিল্পীদের।

রেকর্ডিং সেশনে নিতেন ৩০০০ টাকা! পার্টি দিতেন পোষ্য বেড়ালের জন্য। সাজগোজেও ছিল নিজস্বতা ও প্রাচুর্য।

মডেল: ডিম্পল

## আরও যাঁরা আইকনিক...

### ভার্জিনিয়া উলফ

বিশ শতকের অন্যতম 'মডার্নিস্ট' লেখক হিসেবে ধরা হয় ভার্জিনিয়া উলফকে। ১৮৮২-তে জন্ম। উলফ যখন লেখালেখি শুরু করেন, তখন মেয়েদের লেখালিখি বা শিক্ষিত হওয়াকে মোটেও নেকনজরে দেখা হত না। সেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'মেয়েরা কেন স্বাধীনচেতা হতে পারবে না?' *"She died young — alas, she never wrote a word. [...] She lives in you and in me, and in many other women who are not here to-night, for they are washing up the dishes and putting the children to bed."*— লিখেছিলেন ১৯২৯-এ দাঁড়িয়ে 'আ রুম অফ ওয়ান'স ওন'-এ। মেয়েরা কেন লিখবে না, প্রশ্ন ছিল এটাই। সেই উলফই আবার নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন তাঁর সাজগোজের প্রতি ভালবাসার কথা। কলারড টপ, আরামদায়ক কার্ডিগান, সলিড কালারের হাই ওয়েস্ট স্কার্টে পকেট...এসবই ছিল তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্ট। সিম্পল অথচ ভিন্টেজ ফ্যাশন যাকে বলে।

অমৃতা প্রীতম

তাঁর কলমে, মননে, সাহিত্যভাবনায় আগুন ছিল। ছোট থেকে সমাজনীতিকে প্রশ্ন করা অমৃতার ‘পিঞ্জর’ দেশভাগের জ্বলন্ত সময়ের দলিল। অসুখী দাম্পত্য, অস্থির সময় তাঁর দৃঢ়তা টলায়নি এতটুকু। সহজ-সরল সাজগোজ। শাড়ি আর পঞ্জাবের ট্র্যাডিশনাল সালওয়ার কামিজ়েই বেশি স্বচ্ছন্দ।

মডেল: শুভমিতা

মায়া অ্যাঞ্জেলো

আমেরিকান মেময়ারিস্ট, লেখক ও সমাজকর্মী...প্রায় ৫০ বছরের বর্ণময় কেরিয়ার মায়া অ্যাঞ্জেলোর। মাত্র আট বছর বয়সে মায়ের বয়ফ্রেন্ডের হাতে নিগৃহীত হন মায়া। মুখ খোলার পরে সেই পুরুষকে মেরে ফেলা হয়। তারপর পাঁচবছর কথা বলেননি তিনি! তাঁর প্রথম আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, “And I thought I would never speak again, because my voice would kill anyone.” কিন্তু সেই কণ্ঠই বারবার ছকভাঙা কথা বলেছে ভবিষ্যতে। তিনের দশকে বড় হওয়ার ছাপ সুস্পষ্ট তাঁর ফ্যাশনে। প্রিন্টেড ড্রেস, হেডস্কার্ফ, মুক্তোর গয়না ছিল তাঁর সিগনেচার। ফ্ল্যাশি নয়, আন্ডারস্টেটেড স্টাইল ছিল তাঁর ইউএসপি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

একাধারে শিক্ষিতা, বিদ্যানুরাগী এবং সমাজসেবী। ‘পর্দা’প্রথা ভাঙতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই উনিশ শতকে বাংলার বুকে নারীক্ষমতায়ন এবং সামাজিক পুনর্গঠনের সূত্রপাত ঘটে। শুধু তাই নয়, বাঙালি নারীদের পোশাক-পরিচ্ছেদ আজ যে রূপ পেয়েছে, তার নেপথ্যেও জ্ঞানদানন্দিনীর ভূমিকা অপরিসীম। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মসূত্রে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন স্থান দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। হয়তো সেই কারণেই চিন্তায়, মননে এত আধুনিক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী।

অশ্বারোহণে পারদর্শী ছিলেন, নাটকে অভিনয় করতেন, সংবাদপত্রেও লেখালেখি করেছেন বহুবছর। পার্সি ধাঁচে অনুপ্রাণিত হয়ে আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে তিনিই প্রথম ‘ব্রাহ্মিকা’ শাড়ির প্রচলন করেন। শাড়ির সঙ্গে বেছে নেন জ্যাকেট এবং বিদেশি কাটের ব্লাউজ়। এত বছর পেরিয়েও তাঁর শাড়ি পরার ধরনে, তাঁর স্বতন্ত্র স্টাইল স্টেটমেন্টে বাংলা তথা গোটা দেশের কাছে ফ্যাশন আইকন হয়ে রয়ে গিয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনী।

**অভিজিৎ চন্দ**, *মেক-আপ শিল্পী*

আইকনিক চরিত্রকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার অনুপ্রেরণা ঋতুপর্ণ ঘোষ। যে কোনও চরিত্র রিক্রিয়েট করার আগে রিসার্চ করি। এখন তো ইন্টারনেটও সাহায্য করে অনেকটা। একটা থেকে আর একটা চরিত্রে ট্রানজ়িশনের মাঝে ছোট্ট ব্রেক নিই, যাতে মনে মনে ওই লুকটা কল্পনা করে নিতে পারি। মডেলদেরও কিছুটা সময় দিতে হয়, যাতে ওঁরা চরিত্রের মধ্যে ঢুকতে পারেন। ক্যারেক্টার মেক-আপ আমি খুবই উপভোগ করি। এবারের ফোটোশুটে আমরা যাঁদের লুক রিক্রিয়েট করলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন আইকন। এতবছর পরেও তাঁদের ফ্যাশন প্রাসঙ্গিক। আসলে, ফ্যাশন রিভলভস। যেমন, গোগো সানগ্লাস, হ্যাটস, রেড লিপস্টিক, উইংগড লাইনার, শর্ট হেয়ার, বব...এগুলো সবই ক্ল্যাসিক লুক। সময়ের সঙ্গে এগুলো খানিক পরিবর্তন হয় মাত্র! কিন্তু যাঁরা এগুলোর প্রচলন করেছেন, তাঁরা সেগুলো স্টাইল স্টেটমেন্ট হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

## নার্গিস

মাত্র ছ'বছর বয়সে রুপোলি পর্দায় 'নার্গিস' হয়ে পা রাখেন কলকাতার ফতিমা রশিদ। হিন্দি চলচ্চিত্রে সর্বকালের সেরা অভিনেত্রীদের অন্যতম তো বটেই, তবে পেশাগত প্রতিষ্ঠার বাইরেও তাঁর পরিচয় অনেক। সংসদ সদস্য, সমাজসেবী, সাংস্কৃতিক দলের অধিকর্ত্রী। বাস্তবিক জীবনে অসম্ভব সাহসীও ছিলেন পর্দার 'মাদার ইন্ডিয়া'। বিয়ে-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে একবার এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, "একজন পতিতার মেয়েকে কে বিয়ে করবে?" (তাঁর মা জদ্দানবাঈ হিন্দি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন)... ব্যক্তিগত জীবনেও কম বাধার মুখোমুখি হননি তিনি। বিয়ে করতে অস্বীকার করায় রাজ কপূরের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ভেঙেছিলেন, সেই বিচ্ছেদের পর বিয়ে করেন সুনীল দত্তকে। হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এছাড়া মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই এবং শেষে দূরারোগ্য ক্যানসারে মৃত্যুবরণ... জীবনপথের সব সংঘাতের সঙ্গেই মাথা উঁচু করে যুঝেছেন নার্গিস। তাঁর সাহস, মুক্তমনা ব্যক্তিত্ব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নারীদের অনুপ্রাণিত করেছে। তাই এত বছর পেরিয়েও তাঁর এলিগ্যান্ট, গ্রেসফুল স্টাইল মনে রেখেছেন সকলে। শুধু পর্দায় নয়, বাস্তবজীবনেও শাড়ি পরতে ভালবাসতেন নার্গিস। তবে গয়নার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল না। আর তাঁর সিগনেচার শর্ট হেয়ার এবং স্মার্ট ক্যাজুয়ালস তো পাঁচের দশক থেকেই স্টেটমেন্ট!

## ইন্দিরা গান্ধী

ছয়ের দশক থেকেই ভারতে নারীক্ষমতায়নের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যদিও নিজেকে 'ফেমিনিস্ট' হিসেবে নয়, বরং 'বাইফর্ম হিউম্যান বিয়িং' হিসেবেই ভাবতে পছন্দ করতেন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে, তবে ভারতের মতো পুরুষতান্ত্রিক দেশে নারী হিসেবে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। যে সময়ে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা দূর, ব্যক্তিস্বাধীনতারও কোনও অস্তিত্ব ছিল না, সেই সময় একটা গোটা রাষ্ট্রকে নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন ইন্দিরা। আর সেই সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের। ব্যক্তিত্বে, চিন্তাধারায় যতটা অনন্য ছিলেন, ততটাই স্বতন্ত্র ছিলেন ফ্যাশনসেন্সে। সিল্কের শাড়ি, বিশেষত কাঞ্চিপূরম সিল্ক একান্ত পছন্দের ছিল। আর তাই শাড়িকেই নিজের সিগনেচার স্টাইল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কাঁচা-পাকা মেশানো ববকাট চুল, ছিমছাম শাড়ি, চওড়া প্লিট করা আঁচল, একরঙা এয়ারহোস্টেস ব্লাউজ়, গলায় রুদ্রাক্ষের হার এবং ব্যক্তিত্ব থেকে চুঁইয়ে পড়া আভিজাত্য এবং সম্ভ্রম... ইন্দিরা গান্ধীর সিম্পলিস্টিক 'পাওয়ার ড্রেসিং' ভারতীয় ফ্যাশনের এক উজ্জ্বল অধ্যায় অবশ্যই!

## প্রিন্সেস ডায়ানা

বুদ্ধিদীপ্ত, প্রখর ব্যক্তিত্ব। স্টাইলেও একইরকম 'ডেয়ারিং'। নিজের শর্তে জীবন বেঁচেছেন বরাবর। রাজপরিবারের একজন হয়েও অকাতরে মিশেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রেম থেকে বিতর্ক, সবকিছুকেই সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন, যাপন বরাবর হয়েছে পাপারাৎজ়ির আকর্ষণের বিষয়। জনগণের তা নিয়ে অসীম কৌতূহল। কিন্তু সে সবকে তোয়াক্কা করেননি তিনি। রাজপরিবারের সনাতন ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেও তিনি আধুনিক, ছকভাঙা এক ব্যক্তিত্ব। ফ্যাশনেও সেই স্বকীয়তার ছাপ ধরা পড়েছিল বরাবর। আট-নয়ের দশকে কালার ব্লকিং, গোল্ডেন বাটন, পোলার-নেকড সোয়েটার, হাই ওয়েস্টেড অল্প ক্রপড ডেনিম, ফ্ল্যাট পাম্পস...এসব স্টাইল এখনও অনুকরণীয়।

## অমলা শঙ্কর

যে সময়ে মহিলাদের পারফর্মিং আর্টসে আসা বা মঞ্চে পারফর্ম করার মতো বিষয়গুলো সাধারণ বাড়িতে ভাবাই যেত না, সে সময়ে ছক ভাঙলেন অমলা শঙ্কর। দেশে-বিদেশে নিজের নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে গড়ে তুললেন নিজস্ব পরিচয়। স্বামী উদয় শঙ্করের ছত্রছায়ায় নয়, নিজের নিয়মে গড়ে তুললেন তাঁর যাপন। নাচের মতোই পোশাক পরিকল্পনাতেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। 'কল্পনা'র পোশাক পরিকল্পনা যেমন, সময়ের চেয়ে

কোকো শ্যানেল

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকেই বিশ্ব ফ্যাশনকে নতুন দিশা দেখিয়েছে তাঁর ক্যাজুয়াল শিক, স্পোর্টি পোশাক। ব্ল্যাক গাউন, স্টেটমেন্ট হ্যাট এবং মুক্তোর গয়নায় ফিরে দেখা ফ্যাশন-সম্রাজ্ঞীর সিগনেচার স্টাইল।**

মডেল: শ্রীময়ী

এগিয়ে ছিল অনেকটাই।

### মেরিলিন মনরো

ফ্যাশন সম্রাজ্ঞী, সেক্স সিম্বলও। পাঁচ-ছয়ের দশকে পরদায় তাঁর উপস্থিতি কত যে পুরুষের বুকে হিল্লোল তুলত, তার ইয়ত্তা নেই! একজন মহিলা তাঁর আবেদনে, ফ্যাশন সেন্সে, ব্যক্তিত্বে, রূপে কতটা 'ডিজ়ায়ারেবল' হয়ে উঠতে পারেন, মেরিলিন ছিলেন তাঁর আদর্শ উদাহরণ। গতেবাঁধা জীবন চাননি মেরিলিন। তাই তো ব্যর্থ প্রেম, দাম্পত্য অশান্তি সবকিছুকে ছাপিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন বারবার। ফ্যাশনে তাঁর স্লিভলেস গাউন, উইগি ড্রেস, স্টিলেটো পাম্পস চিরন্তন হয়ে ওঠে। এখনও, এত বছর পরেও, তা অনেক ফ্যাশনিস্তার কাছেই অনুকরণযোগ্য।

### স্মিতা পাতিল

ছক-ভাঙা চরিত্রেই মূলত দর্শক চিনেছেন তাঁকে। গ্ল্যামারাস চরিত্রের ভিড়ে তাঁর মধ্যে পেয়েছেন 'সাধারণ নারী'কে। প্যারালাল সুপারস্টার স্মিতা পাটিলের সাজপোশাক তাঁর স্মার্ট, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিসত্ত্বারই সম্প্রসারণ।

কুশল চট্টোপাধ্যায়
*স্টাইলিস্ট*

অড্রে হেপবার্ন, ফ্রিডা কাহলো থেকে আমাদের গায়ত্রী দেবী, স্মিতা পাটিল... ছোট থেকে টেলিভিশনের পর্দায়, ম্যাগাজ়িনের পাতায় এঁদের দেখেই বড় হয়েছি। বরাবরই আমায় অনুপ্রাণিত করেছে ওঁদের সাজপোশাক। পরবর্তীকালে যখন ফ্যাশন জগতে পা রাখলাম, তখন নতুন করে উপলব্ধি করলাম, সেই সব টাইমলেস স্টেটমেন্ট আমার ফ্যাশনসেন্সকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে, কতটা পরিণত করেছে। প্রত্যেকেই আলাদা সময়ের মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত, অথচ একটা বিষয় সকলের ক্ষেত্রেই কমন। এঁদের প্রত্যেকেরই স্টাইল, ফ্যাশনদর্শন তাঁদের সময়ানুপাতে অনেক এগিয়ে। তবে আমি এটাও মনে করি, যে কোনও স্টাইলের 'স্টেটমেন্ট' হয়ে ওঠার নেপথ্যে শুধু সাজপোশাক নয়, যিনি পোশাক পরছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বেরও অনেকখানি ভূমিকা থাকে। সেই কারণেই হয়তো এত বছর পরও তাঁদের ফ্যাশনবোধ আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়, এত আধুনিকতার ভিড়েও তাঁদের স্টেটমেন্ট প্রাসঙ্গিকতা হারায় না।

মডেল: তরুণিমা

সোফিয়া লরেন

হলিউডের স্বর্ণযুগের সাক্ষী তিনি। চূড়ান্ত গ্ল্যামারাস, লাস্যময়ী। সাজপোশাকেও বরাবর তাঁর সাহসী ব্যক্তিসত্ত্বাকেই তুলে ধরেছেন 'বম্বশেল বিউটি'। গোলাপি নেটের ক্লাসিক অফ-শোল্ডার ড্রেসেও তাঁর চিরন্তন আবেদন স্পষ্ট ধরা পড়ছে।

**মডেল:** অনন্যা

অমৃতা শের-গিল

**প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের অন্যতম প্রতিভাবান চিত্রকর, যাঁর বর্ণময় ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাঁর রং-তুলির ক্যানভাসে। নিজের পাশ্চাত্য ঐতিহ্যকে যেমন তুলে ধরেছিলেন বুর্জোয়া বোহেমিয়ান পোশাকে, তেমনই নজর কেড়েছেন শাড়িতে।**

*এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি*

মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
স্টাইলিং ও পোশাক: কুশল চট্টোপাধ্যায়
ফোন: ৮৬৯৭১২০৩৬১
৭-১৩ নম্বর পাতার
লোকেশন: দ্য অ্যাস্টর কলকাতা
ফোন: ০৩৩২২৮২৯৯৫৭
ছবি: দেবর্ষি সরকার
রূপায়ণ: অসীম হালদার

**মডেল:** তনুশ্রী

# একই অঙ্গে এত রূপ

এ শুধু তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের নাম নয়, এই তাঁর জীবনের চালচিত্র। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের রঙিন-সাদাকালো জীবনচিত্রের সামনে কয়েক লহমা কাটিয়ে উপলব্ধি করলেন পায়েল সেনগুপ্ত।

*মাইল এবং মাইলফলক, দুই-ই সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছেন শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের ছোট্ট মেয়ে মাধুরী, হয়ে উঠেছেন স্বনামধন্য মাধবী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর অভিনয় জীবনের খুঁটিনাটি নয়, ব্যক্তিসত্তার বিস্তৃত ও বর্ণময় ক্যানভাসে তিনি কীভাবে নিজের প্রতিফলন দেখেন, সেকথাই জানতে চেয়েছে সানন্দা। সেই প্রসঙ্গে চলে এসেছে কিছু অবশ্যম্ভাবী মানুষের কথা। কিন্তু এই বহুধা ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের জন্য সময় সংকুলান। তাই*
*শুধু জীবনদর্শনের কয়েক ঝলক রইল সানন্দার পাতায়।*

**আদর্শ মেয়ের যে 'ইমেজ' আজকের সমাজ তুলে ধরতে চায়, সেখানে বলা হয় একজন মেয়ে কাজের জায়গাটা খুব ভাল সামলালে, পাশাপাশি নিজের ঘর-সংসার ভাল সামলালে, খুব মন দিয়ে সন্তান মানুষ করলে— এই ধরনের একাধিক শর্ত পূরণ করলে তবেই তিনি সফল নারী। আপনি নিজেও কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবন, দুই-ই খুব সফল ভাবে সামলেছেন। সমাজ-নির্ধারিত ওই ইমেজে আপনি নিজে কতটা ফিট করেছেন বলে মনে করেন?**

কী জানো তো, মেয়েদের সারা জীবনই একটার পর-একটা যুদ্ধ করতে হয়। আমাকেও তেমনটাই করতে হয়েছে। শুধু মাথায় রেখেছি একটা সীমার কথা যে, আমি এই অবধি এগোব, এর বেশি এগোব না। একটা মেয়ের পক্ষে এটা করা অতটা সহজ না, যতটা সহজ একজন ছেলের পক্ষে। তবু যে উতরে গেছি, তার কারণ আমার মনের জোর খুব বেশি। গড্ডলিকা প্রবাহে আমি গা ভাসাইনি কখনও। আজ পার্টি, কাল অমুক, পরশু তমুক, এসব উল্টোপাল্টা জায়গায় আমি যেতাম খুব কম। কাজ করেছি সংসারের জন্য। বাইরের মতো সংসারেও কম অসুবিধে পাইনি। কিন্তু এখন ভাল আছি।

**অভিনয়ে আসাটা আপনাদের সময়ে একেবারেই সহজ ছিল না। সহজে কেউ এই পেশায় আসতেও চাইত না। সেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি কী করে এই পেশায় এলেন এবং ভালবেসে থেকেও গেলেন?**

আসলে আমার সাফল্য ঠিক আমার সাফল্য নয়, সঠিক ভাবে বলতে গেলে এ আমার মায়ের সাফল্য। মা জানতেন, আজ লোকে যা দেখে খারাপ বলছে, ভবিষ্যতে তারা তেমনটা বলবে না। যে কারণে মাত্র ছ'বছর বয়স থেকে আমি কাজ করতে শুরু করি। তার পর আমার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। আর্থিক প্রয়োজনও একটা তৈরি হয়। বিয়ের পরও দেখি অর্থের প্রয়োজন ফুরোচ্ছে না। (হাসতে হাসতে) এখন তো টিভি খুললেই কোটি টাকার গল্প! আমি জীবনে কখনও এক কোটি টাকাও নিজের চোখে দেখিনি।

**আপনি তো ছোট থেকে মঞ্চেও অভিনয় করেছেন। ছোট বয়সে যাঁদের তত্ত্বাবধানে আপনি কাজ করতেন, সেই শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে কাজ করার মতো আত্মবিশ্বাস বলুন কিংবা সাহস, নিজের মধ্যে কী করে জাগিয়েছিলেন?**

ওঁরা আমাকে এত ভালবাসতেন সবাই, সেই ভালবাসায় ভরসা করেই কাজ করেছি। খুব স্নেহ করতেন আমাকে। ওটা ছিল একটা স্কুলের মতো, যেখানে অনেক কিছু শিখেছি। তা ছাড়া আমি খুব ছোট ছিলাম। মাঝে-মাঝে খুব দুষ্টুমিও করতাম। দেখতাম, খুকখুক করে কাশলে অহীন্দ্র চৌধুরী একটা লজেন্স দিতেন। আমি অনেকসময়ই গলা খাঁকারি দিয়ে কাশির অভিনয় করে লজেন্স নিয়ে নিতাম। উনি অবশ্য এই দুষ্টুমিটা ধরে ফেলেছিলেন। এখন তো অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করার এই জায়গাটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

**এত অল্প বয়সে 'সুবর্ণরেখা'য় সীতার মতো একটা চরিত্রে, বাইশে শ্রাবণ বা দিবারাত্রির কাব্য-র মতো ছবিতে আপনি অভিনয় করলেন কীভাবে?**

আসলে ছ'বছর বয়স থেকেই অভিনয় করছি তো, ফলে আমার রক্তে-মজ্জায়, শরীর-মন জুড়ে ছিল অভিনয়। কিছুই তাই কঠিন বলে মনে হয়নি। শুধু আমাকে বলে দিতে হত, তোমার এই চরিত্র, ব্যস।

**প্রায়ই শুনি, 'ডিরেক্টর্স অ্যাক্টর।' অভিনেতা হিসেবে আপনার কি মনে হয় পরিচালকই অভিনেতা তৈরি করেন? নাকি ক্যামেরার**

চারুলতায় মাধবী
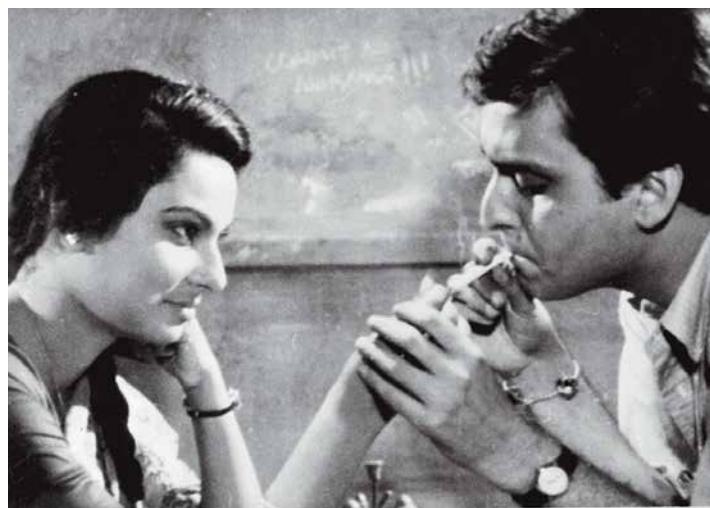
কাপুরুষ ছবিতে বাস্তয়

**সামনে দাঁড়ালে অভিনেতার নিজস্বতাটাই ছাপিয়ে আসে?**

দুর্গাপুজো হয় তো? দুর্গাপুজোয় কত মানুষ মিলে সমস্ত কাজকর্ম করেন, আয়োজন করেন। কিন্তু প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজটা করেন পুরুতঠাকুর। সিনেমাতেও তা-ই। সাজানোগোছানোর কাজটা সমস্তই বড় পরিচালকরা করেন। আমরা, অভিনেতারা শুধু চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। সেটুকুই আমাদের কাজ।

**স্বনামধন্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু পরিচালকের সঙ্গেই আপনি কাজ করেছেন। সকলেরই আপনি পছন্দের অভিনেত্রী। প্রত্যেক পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি, ছবি তৈরির পদ্ধতি, ফিলোজ়ফি — সবটাই স্বতন্ত্র ছিল। সবার সঙ্গে নিজেকে মেলাতেন কী করে?**

কথাটা ঠিকই। মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় প্রত্যেকের কাজের ধরনই একেবারে নিজস্ব ছিল। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি কারণ ওই যে বললাম, আমার কাজ ছিল শুধুই চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠার। ফলে এঁদের কারও সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার কখনও কোনও অসুবিধে হয়নি।

**অভিনয়ের মঞ্চ থেকে আপনার ছবির জগতে আসা কীভাবে?**

সে-ও খুব ছোটবেলায়। মিনার্ভা থিয়েটারে তখন 'আত্মদর্শন' নামে একটা নাটকে অভিনয় করছিলাম। শ্যাম লাহা সেই নাটকে বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, আমি তাঁর ছেলের ভূমিকায়। উনিই আমাকে একদিন বললেন, ''মাধু চল, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি।'' ওঁরা সকলেই আমাকে খুব স্নেহ করতেন, ফলে আমি সঙ্গে গেলাম। শ্যাম লাহা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাছে। জানতে পারলাম, 'দুই বেয়াই' নামে একটা ছবি হবে। ওতেই আমার প্রথম কাজ। তার পর তো একের পর-এক ছবি।

**পিছন ফিরে তাকালে অভিনয়-জীবনে কোনও কঠিন পর্যায়ের কথা মনে পড়ে?**

নাহ। আসলে কী বলো তো, কঠিন জায়গা থেকেই তো আমরা এসেছি। দেশভাগের যন্ত্রণা দেখেছি। ফলে আলাদা করে অভিনয়-জীবনে আর কিছু কঠিন মনে হয়নি। লড়াই করে বাঁচার ততদিনে অভ্যেস হয়ে গেছিল।

**প্রসঙ্গটা আগেও একবার তুলেছি। এবার জানতে চাই, কাজ আর পরিবার— দুটো এত সফল ভাবে ব্যালান্স করেছেন কীভাবে?**

হিমশিম খেয়ে গেছি! হয়তো আত্মীয়স্বজনরা সবাই এসেছেন বাড়িতে। সকালে ননদদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একপ্রস্থ রান্না সেরে শুটিংয়ে গেছি। শুটিং থেকে ফিরে স্নান সেরেই আবার রান্নাঘরে ঢোকা— এরকম দিনও গিয়েছে। এগুলো তো হয়ই। এর সবটাই বেদনাদায়ক স্মৃতি নয়। অনেক আনন্দও আছে এর মধ্যে। আসলে মেয়েদের মধ্যে সব ধরনের ভালবাসা, স্নেহই থাকে। ইচ্ছে করলে সকলেই সেই অনুভূতিগুলো জাগিয়ে তুলতে পারে। মেয়েদের পক্ষে কোনওটাই কঠিন নয়।

**আপনি যে যুগের মানুষ, সেই সময়টার প্রতি আমাদের প্রজন্মের একটা আশ্চর্য মুগ্ধতা আছে। স্বর্ণযুগের সেই স্টারডম আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন...**

(কথা শেষ না হতে) আমি কিন্তু স্টার হতে চাইনি ভাই। আমি শুধু চেয়েছিলাম একটা চরিত্রের ব্যথা বেদনা ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে। প্রত্যেক মানুষের জীবনই একটা লড়াই। স্ট্রাগল ফর এগজ়িসট্যান্স। দুর্গা

সুবর্ণরেখা ছবিতে

মায়ের হাতে থাকে ত্রিশূল, যা দিয়ে তিনি অসুর বধ করেন। আমাদের ক্ষেত্রে অসুর জীবনের এই বাধাবিপত্তি, হার্ডলগুলো। সব দিন সমান যায় না। ভাল-মন্দ মিশিয়েই কাটে জীবন। সে ভাবেই আমাদেরও চলতে হয়েছে।

**‘কাপুরুষ’ ছবিতে অমন মাপা একটা অভিনয় করলেন, যেখানে চরিত্রের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, তার মনের ভিতর কী চলছে— আবার ‘ছদ্মবেশী’, ‘শঙ্খবেলা’-র মতো ছবিতে একেবারে বিপরীত, ভিন্ন মেরুর ভূমিকা সামলেছেন। তা বাদেও কত ছবি, কত রকম চরিত্র— এত বিভিন্ন শেডে অভিনয়ে অমন মুনশিয়ানা কীভাবে দেখাতেন?**

রামধনুতে সাতটা রং তো? সেই সাত রং আছে তো মনের মধ্যে। সবটাই আসলে ভাবনার ব্যাপার। তোমাকে ভাবতে হবে, আমি এই চরিত্রটা। আমার চরিত্রের পারিপার্শ্বিক এই। তার পরিবেশ এই। সে এমনটা চায়। তা হলেই আর অসুবিধে হয় না। কোনও পরিচালক স্ক্রিপ্ট আগেই দিয়ে দিতেন, সেটা পড়ে অভিনয় করতে নামতাম। কেউ আবার শুটিংয়ে পৌঁছলে সেদিনের অংশটুকু ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, মুখস্থ করে অভিনয় করতে। সব রকমই করেছি।

**মহানায়কের কথা আপনার মুখ থেকে শোনার লোভ সামলানো অসম্ভব। কাজ এবং কাজের বাইরেও মানুষটাকে কেমন দেখেছেন?**

প্রথমেই বলতে হয়, উনি ছিলেন সাধক। অভিনয় জীবনে উনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। এর জন্য মনের ভিতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। যখনই বন্যা হত, উনি বেরিয়ে যেতেন কিছু শিল্পী নিয়ে, ভিক্ষা করতে। কারণ কোটি-কোটি টাকা ওঁর ছিল না। (হেসে) এখন তো কোটি-কোটির গল্প চার দিকে। ওঁর নিজের যা ছিল, তা দিয়ে নিজের সংসারটা চলে যেত। ভিক্ষা করে পাওয়া টাকা যাতে মানুষের কাজে লাগে, সে জন্য টাকাটা উনি দিয়ে দিতেন মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে। হলিউড-টলিউড ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেও প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে দান করেছেন। ব্যক্তিগত স্তরেও কারও অসুবিধের কথা শুনলেই তাঁকে অর্থসাহায্য করেছেন যথাসম্ভব। মেক আপ ম্যান হয়তো মেক আপ করছেন। হঠাৎ উনি তাঁকে থামিয়ে জানতে চাইলেন, “কী ব্যাপার, তোর মুখ-চোখ এরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন?” সে লোক প্রথমে বলতে চায় না কিছু। বলে, “না কিছু হয়নি তো, সব ঠিকই আছে।” উনি সে কথা শুনে হেসে বলেছেন, “আমাদের কাজটা কী বল তো? অভিনয় করি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিজে বোধ করতে পারলে তবেই অভিনয় করার সময় সেটা আমাদের মুখে ফুটে ওঠে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। অন্যের কষ্ট বুঝতেই না-পারলে আর আমরা কী অভিনয় করলাম! তোর মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছে, কিছু একটা কষ্টে আছিস। কী সেটা?” জানা গেল, ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। শেষ মুহূর্তে ছেলের বাড়ি থেকে বাড়তি পাঁচ হাজার টাকা পণ চেয়েছে। সে আমলে পাঁচ হাজার অনেকটাই টাকা। উনি সব শুনে বললেন, “তুই আর ভাবিস না, নিজের কাজ কর। ও ঠিক হয়ে যাবে।” এক মাসের মধ্যে সেই টাকা জোগাড় করে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উত্তম কুমার দিয়ে এসেছেন। এরকম অনেক ঘটনা আছে।

মহানায়কের সঙ্গে

পলিটিক্স তো সব জায়গায় সব সময়ই আছে। তখনও ছিল ভীষণ রকম। তবে উত্তমবাবু এসবের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। এক সময় উনি অভিনেত্রী সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সে সময় কিছু সহকর্মীর অপমানজনক কথাবার্তা কানে আসায় কেঁদেই ফেলেছিলেন একবার, এ ঘটনাও হয়েছে। উত্তমকুমার অনুভব করেছিলেন, অর্থাভাবে শিল্পীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন চালনা অনেক সময়ই অসুবিধেজনক হয়ে পড়ে। এই চিন্তা থেকে উনি ১৯৬৮ সালে শিল্পী-সংসদ তৈরি করেছিলেন, যেটা আজও আছে। যেখান থেকে আজও বাংলার বহু শিল্পী নিয়মিত অর্থসাহায্য পেয়ে থাকেন।

**আপনার জীবনে বিবিধ সত্তা। নিজের কাছে আপনি এক রকম। অভিনয়ে অন্য। ঘরে, পরিবারে অন্য। এই সমস্ত সত্তার মধ্যে কোনটা আপনার নিজের প্রিয়তম? কোনটা**

**সবচেয়ে ভালবাসেন?**

অত ভালবাসাবাসি আমার নেই। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করতে আমার ভাল লাগে বরাবর। কত মানুষের অসুস্থতায় সাহায্য করেছি। সমাজসেবা যথেষ্টই করি। সেই করতে গিয়ে নিজের পা-ও ভেঙেছি। নিজের কমপ্লেক্সের কারও কোনও সমস্যা হলে তারও সমাধান করার চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব। ইদানীং আগের মতো ছুটে ছুটে যেতে পারি না, সে একান্তই কোভিডের ভয়ে।

**আপনার লেখা পড়েছি, আপনি প্রচুর পড়েনও। কার লেখা আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে? আপনার জীবনদর্শনকে আরও সমৃদ্ধ করে?**

প্রভাবিত করেন এক মাত্র রবীন্দ্রনাথ। তবে কেউই খারাপ নন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্করবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়)... সবার লেখাই আমার ভীষণ পছন্দের। রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রিয় লেখক নন, উনি আমার প্রিয় মানুষ। সুখে, দুঃখে, যে কোনও অনুভূতিতে ওঁর কোনও না-কোনও লেখা তুমি পেয়েই যাবে। যেটা অন্য কারও কাছেই পাবে না। সফল সাহিত্যিক আমাদের দেশে অনেক আছেন। যেমন সুবোধবাবু (ঘোষ)-র লেখা আমার খুব পছন্দের। ঘুমের একটু গোলমাল ছিল আমার, যার জেরে রাত জেগে আমি বই পড়তাম। এক-একজন সাহিত্যিককে ধরে তাঁর সমস্ত লেখা পড়ে শেষ করতাম। আমার দিদি যেখানে কাজ করতেন, সেখানে লাইব্রেরি ছিল। ওই লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে তারাশঙ্করের সমস্ত লেখা পড়ে ফেলেছিলাম। আজকের দিনে যাঁরা ছবি বানাচ্ছেন, তাঁরা যে কেন আরও বেশি করে সাহিত্য-নির্ভর কাজ করছেন না, এটা আমার প্রশ্ন। গানেও যেমন অনেক কিছু বদলে গেছে। সব গানেই এখন অন্যরকম ভাষা। বুঝতে পারি না, আমরা এগোচ্ছি, না ক্রমে পিছোচ্ছি।

**বাংলা ছবির যে স্বর্ণযুগে আপনি কাজ করেছেন, সে সময়ের অন্য অভিনেত্রীদের সঙ্গে আপনাকে কিছুতেই এক সারিতে রাখা যায় না। সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবার চেয়েই আপনি যেন আলাদা। এই স্বাতন্ত্র্য কী করে ধরে রেখেছিলেন?**

ওঁরা সত্যিই আমার চেয়ে অন্য রকম ছিলেন। কেউই মানুষের সঙ্গে খুব বেশি মিশতে চাইতেন না। সুচিত্রা সেন নিজের বাড়ির বারান্দাতেও দাঁড়াননি কোনওদিন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে রেখেছিলেন, মারা গেলে যেন তাঁকে কফিনে করে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সুচিত্রা সেনকে মানুষ ছবিতে যেমন দেখেছেন, সেভাবেই তিনি মানুষের মনে থেকে যাবেন, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এতে আমি কিছু ভুল দেখি না। কিন্তু আমি সহজ হয়ে জীবনে মিশেছি।

স্বীকৃতির ঘর

*‘দার্ঢ্য’ বলে বাংলা অভিধানে একটি শব্দ আছে। অনেকদিন পরে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের সামনে এই শব্দটি মনের ভিতরে উপলব্ধি করে এবং লেখায় উচ্চারণ করতে পেরে প্রশান্তি এল মনে। সারা ঘর পরিপূর্ণ পুরস্কারে (তাও গত ২৫ বছরেরে), স্বীকৃতিতে, তিলমাত্র ফাঁকা নেই জায়গা। তবু কেমন অবলীলায় বলতে পারেন এই ঘরে পা দিলে নতুন করে কিছুই মনে হয় না। সাফল্যের নিস্পৃহতাই হয়তো তাঁকে একান্ত জীবন সাধক করে তুলেছে। কোভিডের অসুস্থতা তাঁকেও মুক্তি দেয়নি। কিন্তু লড়াই যাঁর রক্তে, তাঁর প্রাণশক্তি ও উদ্যমকে হয়তো পৃথিবীর কোনও প্রতিবন্ধকতাই আটকে রাখতে পারবে না। সামনেই মুক্তি তাঁর নতুন ছবি ‘প্রবাহ’র। জীবনের এই প্রবহমানতায় আমরা আবার তাঁকে নিশ্চিত করেই পাব একই অঙ্গে নানা রূপে...*

সহশিল্পীদের সঙ্গে

# পারসি স্বাদে মজল মন...

পারসি বাড়িতে কেমন খাবারের চল? তাঁদের ঐতিহ্য-রীতি রেওয়াজের সঙ্গে কতটা জড়িয়ে রয়েছে খাদ্য-সংস্কৃতি? এসব নিয়েই লিখলেন মধুরিমা সিংহ রায়। সঙ্গে পারসি রেসিপির সংকলন।

পাপেতা পার ইদা

বুমলা ফ্রাই

ইতিহাস বই অনুযায়ী, আট শতকে পারসিরা ভারতের অভিমুখে রওনা দেন। ধীরে ধীরে এদেশে নিজেদের বসতি গড়ে তোলেন। ভারতে তাঁদের অনুপ্রবেশ আরও দু'শতক অবধি চলেছিল বলেই জানা যায়। প্রথমে দিউ অঞ্চলে বসবাস শুরু করলেও, পরে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা হয় গুজরাত। প্রায় ৮০০ বছর ধরে ছোট্ট এক কৃষিজীবী গোষ্ঠী হিসেবেই সেখানে থাকতেন তাঁরা। পরে ব্রিটিশ শাসনের আমলে পারসিরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি অনেক সহজেই গ্রহণ করতে শুরু করলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রসার ঘটল তাঁদের। পারসিদের খাদ্যাভ্যাসে কিছু আঞ্চলিক প্রভাব পড়লেও, তা বরাবরই স্বতন্ত্র। নিজেদের মতো করে তাঁরা ধরে রেখেছেন খাদ্য-ঐতিহ্যকে।

*বাড়িতেই পারসি খাবারের স্বাদ! কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পারসি হোম ডেলিভারির কর্ণধার সুপ্রিয়া মানচার্জি শেখালেন সেসব রেসিপি। জানালেন পারসি বাড়ির নানা রীতি-নিয়মের কথাও।*

বিবাহসূত্রে পারসি কলকাতার মেয়ে সুপ্রিয়া মানচার্জি। আগে পদবি ছিল দত্তগুপ্ত। বিয়ের পরে পারসি পরিবারের রীতিনীতি এখন তাঁর নখদর্পণে! একইসঙ্গে তিনি সফল ফুড-অন্ত্রপ্রনরও বটে! কলকাতার বুকে কিড স্ট্রিটে পারসি ইটারি চালাচ্ছেন ৫৮ বছরের সুপ্রিয়া। তিনি যখন শুরু করেছিলেন, এ শহরে এরকম পারসি খাবারের জায়গা প্রায় ছিলই না। তাঁর ব্র্যান্ডের নাম 'মানচার্জি'স'। সুপ্রিয়া জানালেন, ‘‘যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে পড়াশোনা করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতাম। এক কাজ্নিনের সূত্রে এক পারসি পুরুষের সঙ্গে আমার অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হয়। আমার শ্বশুরের বাবা এসেছিলেন লাহোর থেকে। শাশুড়ি ছিলেন পুনের মেয়ে। আমার স্বামী ও তাঁর ভাই-বোনরা কলকাতাতেই জন্মেছেন। স্বামীর নাম ছিল মাঞ্চি মানচার্জি। বিয়ের পর আমার শাশুড়ি হিল্লা মানচার্জির হাতেই পারসি রান্নায় আমার হাতেখড়ি। তিনি অভিনেত্রী নার্গিসের বন্ধু ছিলেন। লেনিন

বিবাহসূত্রে পারসি কলকাতার মেয়ে সুপ্রিয়া মানচার্জি। আগে পদবি ছিল দত্তগুপ্ত। বিয়ের পরে পারসি পরিবারের রীতিনীতি এখন তাঁর নখদর্পণে! একইসঙ্গে তিনি সফল ফুড-অন্ত্রপ্রনরও বটে! কলকাতার বুকে কিড স্ট্রিটে পারসি ইটারি চালাচ্ছেন ৫৮ বছরের সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া মানচার্জি

চিকেন ফারচা

সরণির বাড়ি থেকে সে সময়ে হোম ডেলিভারিও চালাতেন। তারপর আমিও শাশুড়ির সঙ্গে হাত লাগাই।'' ২০০৫ সাল থেকে সেই ভোজনালয় চালাচ্ছেন তিনি। কথায় কথায় জানালেন, ''আগেকার দিনে পারসিরা ব্রেড খেত বেশি। আমাদের বাড়িতেই যেমন! শাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, কখনও বাড়িতে হাতরুটি বানানো হয়নি। জার্মান ব্রেড আসত বো ব্যারাকস থেকে। ব্রেকফাস্টে ব্রেড-মাখন-জ্যাম বা ব্রেড আকুরি খাওয়া হত সনাতন পারসি পরিবারে। আমার শাশুড়িকে আমি লাঞ্চে রবিবার ছাড়া কখনও ভাত খেতে দেখিনি। ব্রেডই খেতেন মূলত। পারসিরা পঞ্চব্যঞ্জনে সাজিয়ে খায় না। হয়তো ভেটকি মাছ মশলা ফ্রাই করে ওয়ান ডিশ মিল খেয়ে নিলেন তাঁরা। বা মসালা চিকেন হলে ওটাই শুধু ব্রেড দিয়ে খাওয়া হল। আবার হালকা কিছু খেতে চাইলে মাটন বা চিকেন 'রাস' বানানো হয়। স্টুয়ের মতো হয় অনেকটা। পারসিদের আর একটি বিশেষত্ব হল সাম্ভার মশলা ও ধানসাক মশলা। আগেকার দিনের মানুষরা কিন্তু তেল-মশলা দিয়েই খেতেন। তবে এখন আমার হোম ডেলিভারিতে বেশিরভাগই বলছেন কম তেলমশলায় পারসি খাবার খাবেন। পারসি রান্নায় কমন মশলা হল আদা, রসুন, লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরে। এরপরে নারকেলবাটা, ছোলাবাটা, বাদামবাটা, পোস্তবাটা, তিলবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কা। তারপরে তাঁরা দেন ধানসাক বা সাম্ভার মশলা। এইসব মশলা দিয়ে একটি সুস্বাদু কারি বানানো হয়। গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে এই কারি ও কাচুম্বার স্যালাড দিয়ে খান পারসিরা। একটু রিচ রান্না বটে এটি!'' নিজের হেঁশেল থেকে কয়েকটি রেসিপিও শেয়ার করলেন তিনি।

## পাপেতা-পার-ইদা

*(এটি হল আলুর উপর ফাটানো ডিমের এক অভিনব রেসিপি। সাধারণ পারসি বাড়িতে খুবই জনপ্রিয় এই ডিশ। এই ডিশের বিশেষত্ব হল পারসি সাম্ভার মশলার ব্যবহার, যা দক্ষিণ ভারতীয় সাম্ভার মশলার চেয়ে একেবারেই আলাদা।)*

**উপকরণ:** আলু ২টো (পাতলা গোল গোল করে কাটা), ডিম ২টো, কাঁচালঙ্কাকুচি ১/২ চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবলচামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবলচামচ, পারসি সাম্ভার মশলা পরিমাণমতো, টোম্যাটো ২টো ছোট বা ১টা বড়, নুন-হলুদ পরিমাণমতো।

**প্রণালী:** কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। সোনালি রং ধরলে তাতে আলু দিন। ভাজাভাজা হয়ে এলে খানিকটা রসুনবাটা, আদাবাটা দিন। একটু কষে নিন। টোম্যাটোর খোসা ছাড়িয়ে লম্বা ও পাতলা করে কেটে রাখুন আগেই। প্যানে আলু-পেঁয়াজের মিশ্রণের মাঝখানে একটু জায়গা করে টোম্যাটো দিন। কাঁচালঙ্কাকুচি দিন। খানিকক্ষণ রান্না হওয়ার পরে নুন, হলুদ, সাম্ভার মশলা দিন। নেড়েচেড়ে জল দিন। পরিমিত জল দেবেন যাতে আলু সেদ্ধ হয়ে যায়। ধনেপাতাকুচি দিন। এবার কড়াইতে আলুর মিশ্রণটি ছড়িয়ে (ফ্ল্যাট করে) দিয়ে তার উপরে ডিম ফেটিয়ে দিন। ভাপে সেদ্ধ হবে। নামিয়ে পরিবেশন করুন।

## বুমলা ফ্রাই

*(বাঙালিরা যাকে লটে মাছ বলেন, পারসিরা তাকেই বুমলা বলেন। পারসিরাও কিন্তু বাঙালিদের মতোই মুচমুচে লটেমাছভাজা খেতে পছন্দ করেন!)*

**উপকরণ:** লটে মাছ ৪-৬টা (মাথা কেটে নেবেন), আটা ২ টেবলচামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, ময়দা ৪-৫ টেবলচামচ, তেল (ভাজার জন্য), লেবু ১টা।

**প্রণালী:** লটে মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। ধোওয়ার সময় আটা মেশানো জলে মাছ ধোবেন, তাতে পিচ্ছিলভাব খানিকটা কমে যাবে। ধোওয়ার পরে ছাঁকনিতে রেখে দিন। লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, নুন মাখিয়ে ম্যারিনেট করে নিন। একটি প্লেটে ময়দা নিয়ে ম্যারিনেট করা মাছ ময়দায় কোটিং করে নিন। প্যানে তেল গরম করে তাতে ডিপ ফ্রাই করে তুলে নিন। মাছের উপর লেবু দিয়ে পরিবেশন করুন।

## চিকেন ফারচা

*(অনেকটা ক্রিস্পি চিকেন ড্রামস্টিকের মতো দেখতে ও খেতে। স্ন্যাক্স হিসেবে ভাল জমে।)*

মাটন সাল্লি

চাটনি প্যাটিস
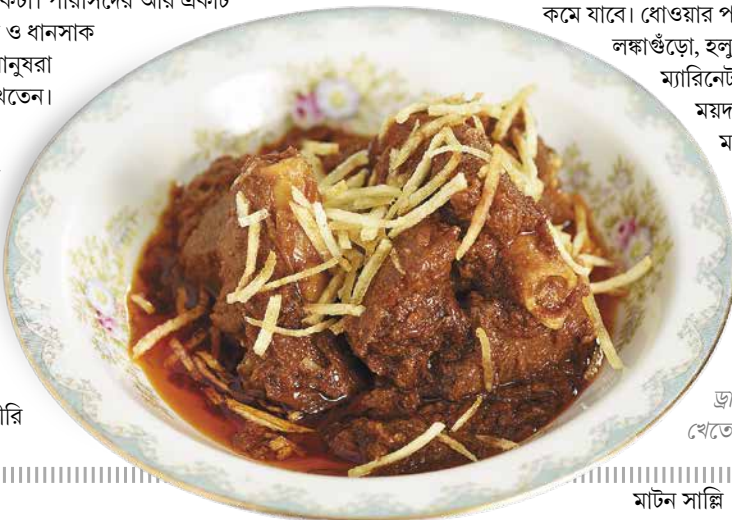
**উপকরণ:** চিকেন ৮ পিস (বোনলেস), পেঁয়াজ ২টো (কুচনো), আদাবাটা ১ টেবলচামচ, রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, পুদিনাপাতা ও গোলমরিচগুঁড়ো পরিমাণমতো, বিস্কিটের গুঁড়ো বা ব্রেডক্রাম ১/২ বাটি, ডিম ২-৩টে, তেল (ভাজার জন্য)।

**প্রণালী:** চিকেনের টুকরোগুলোকে পেঁয়াজকুচি, আদাবাটা, রসুনবাটা, নুন, গোটা কাঁচালঙ্কা, পুদিনাপাতা ও গোলমরিচগুঁড়ো দিয়ে ম্যারিনেট করুন। কিছুক্ষণ পরে প্যানে এই ম্যারিনেটেড চিকেন দিয়ে, খানিকটা জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। খুব বেশি সেদ্ধ করবেন না। হয়ে গেলে ছাঁকনিতে ছেঁকে, বিস্কিটের গুড়ো মাখিয়ে নিন। ডিমের গোলায় ডুবিয়ে তেলে ডিপ ফ্রাই করে নিন। টোম্যাটো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

## মাটন সাল্লি

*(সাল্লি মানে আলুর চিপস। শোনা যায়, পারসিদের জন্যই নাকি চিপসের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল! এই পদ অনেকে বোনলেস মাটন দিয়ে করেন। কিন্তু অনেকেই আবার তা পছন্দ করেন না। আর এই রান্নায় হলুদ ব্যবহার হয় না।)*

**উপকরণ:** মাটন ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২-৩টে (পাতলা স্লাইস করা), আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, জিরেগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, সাম্ভার মশলা পরিমাণমতো, গরম মশলা-নুন স্বাদমতো, আলুর চিপস ১ প্যাকেট।

**প্রণালী:** কড়াইতে বেশি তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে তুলুন। নামিয়ে ঠান্ডা করে হাত দিয়ে গুঁড়ো করে নিন। প্যানে বাকি তেলে আদা, রসুন, লঙ্কা, ধনে, জিরে ও সাম্ভার মশলা দিয়ে কষে নিন। এতে মাটন দিন। নুন দিন। নেড়েচেড়ে প্রেশার কুকারে সব উপকরণ দিয়ে দিন। পরিমাণমতো জল দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে নামানোর আগে ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে কষিয়ে নিন। সাল্লিতে বেশি গ্রেভি থাকবে না। নামানোর আগে গরম মশলা দিন। মাটন গ্রেভির উপর আলুর চিপস সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

## লগান-নু-কাস্টার্ড

*(পারসিরা মিষ্টি খেতে ভালবাসেন। এটি পারসিদের অন্যতম প্রিয় ও সাবেকি সুইট ডিশ।)*

**উপকরণ:** দুধ ১ লিটার, কনডেন্সড মিল্ক ১ প্যাকেট, চিনি ১০০-১২৫ গ্রাম, ডিম ৫টা, ভ্যানিলা এসেন্স, কাজু ২৫ গ্রাম (টুকরো করা)।

**প্রণালী:** দুধে কনডেন্সড মিল্ক ও চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নিন। অনেকক্ষণ ফোটাবেন না। কিছুটা ফুটে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে নিন। ঠান্ডা দুধে ফেটানো ডিম মেশান। ভ্যানিলা এসেন্স দিন। সব ভাল করে মিশিয়ে নিন। বেকিং ট্রে-তে মিশ্রণ দিয়ে ওটিজি-তে বেক করে নিন। ট্রে-র চারদিকে কাজুর টুকরো ছড়িয়ে নিন। ১৯০ ডিগ্রিতে ৫৫ মিনিট মতো বেক করে নিন (ব্র্যান্ড অনুযায়ী এই তাপমাত্রা বদলাতে পারে)। উপরের অংশ লালচে হয়ে গেলে বুঝতে পারবেন যে কাস্টার্ড প্রায় তৈরি। বের করে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে খান।
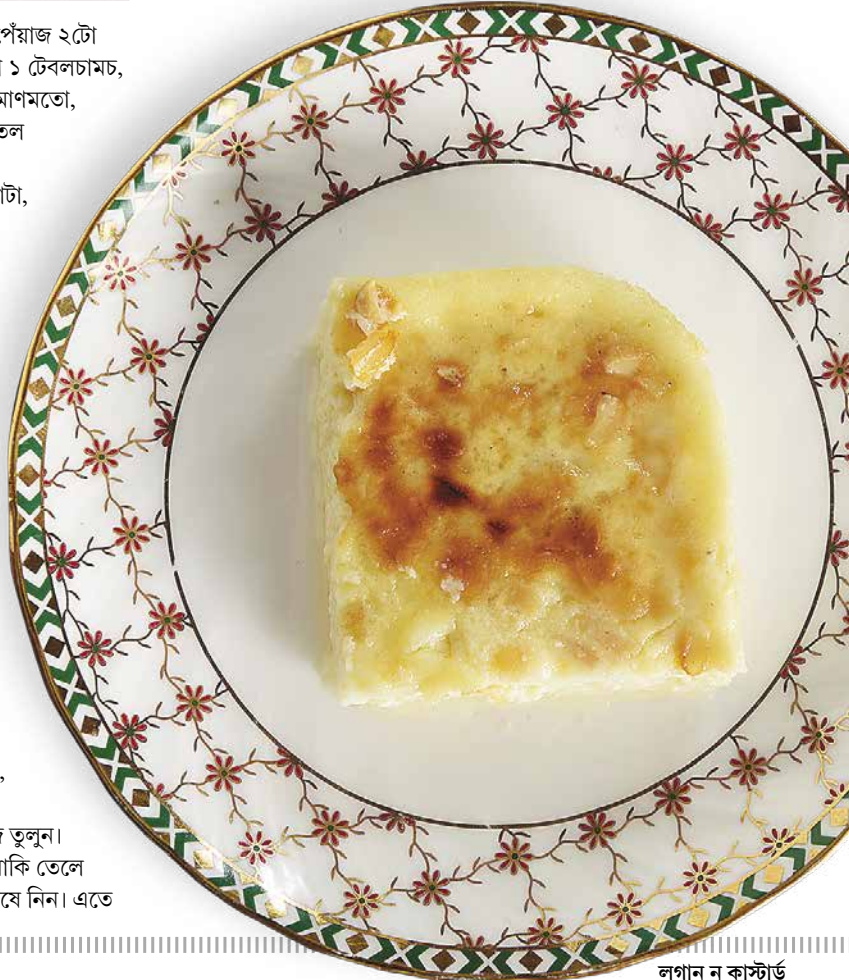
লগান নু কাস্টার্ড

ধানসাক

*কলকাতার নামী ক্লাউড কিচেন 'প্যাপরিকা গুরমে' থেকে রইল তিনটি সিগনেচার পারসি রেসিপি।*

পারসি পরিবারে তো বটেই, কলকাতার কয়েকটি রেস্তরাঁতেও পেতে পারেন পারসি স্বাদ। শেফ বিদিশা বাথওয়াল জানালেন, ''পারসিরা মূলত মুম্বইয়ের বাসিন্দা। দেশের মধ্যে বেঙ্গালুরুতেও অনেক পারসির বসবাস। এঁদের প্রিয় খাবারের মধ্যে স্টু, মাংসের নানা পদ, ড্রাই ফ্রুটস আর বাদাম রয়েছে। কলকাতায় রেস্তরাঁয় পারসি মেনুর মধ্যে তাই আমরা ক্লাসিক ধানসাক বা লগান নু কাস্টার্ডের মতো ডিশ (নিরামিষাশীদের জন্য) যেমন রেখেছি, তেমনই মাছ-মাংসের নানা পদও রয়েছে। আবার আমিষ পদের নিরামিষ বিকল্পও রয়েছে। যেমন পত্রানি মাচ্ছি-র বিকল্প পনিরের পারসি পত্রানি। কলকাতার মানুষ কিন্তু পারসি খাবার যথেষ্টই পছন্দ করছেন।''

## এডু প্যাটি বা চাটনি প্যাটিস

*(ডিমের প্যাটিস, সঙ্গে নারকেল-কাঁচা আমের চাটনি। অভিনব এই ডিশটি পারসিদের প্রিয়)*

**উপকরণ: এগ প্যাটিস বানানোর জন্য:** ডিম ৪টে (হার্ড বয়েলড), মাঝারি মাপের আলু ৪-৫টা (সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো), নুন স্বাদমতো, সুজি ১ টেবলচামচ+১/৪ কাপ, ডিম ২টো, তেল (ভাজার জন্য), ধনেপাতা (সাজানোর জন্য)। **চাটনি বানানোর জন্য:** নারকেলকুচি ১ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৫-৬টা, কাঁচা আম ১টা (কুচনো), রোস্টেড গোটা জিরে ১ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, রসুন ৩-৪ কোয়া, ক্যাস্টর সুগার ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতা ৫-৬ ডাঁটি, পুদিনাপাতা ৪-৫ ডাঁটি, লেবুর রস (অর্ধেক লেবুর)।

**প্রণালী:** চাটনি বানানোর জন্য নারকেল, কুচনো লঙ্কা, কাঁচা আম, গোটা জিরে, নুন, ক্যাস্টর সুগার ও রসুন ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। একটি পাত্রে ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা কুচিয়ে নিন। নারকেলের মিশ্রণে মিশিয়ে আরও একবার মিক্সিতে বেটে মিহি করে নিন। একটি পাত্রে মিশ্রণটি নিয়ে তাতে তাতে লেবুর রস ও নুন মেশান। অন্য পাত্রে আলু হালকা মেখে তাতে নুন ও ১ টেবলচামচ সুজি দিন। ডিম ফাটিয়ে নুন দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে বাকি সুজি দিন। আলুর মিশ্রণটি দু'ভাগে ভাগ করে হাত দিয়ে চ্যাপ্টা আকৃতির গড়ে তুলুন। মাঝখানে চাটনি দিয়ে একটি সেদ্ধ ডিমের অর্ধেকটা রেখে চারপাশ মুড়ে দিন। প্যাটিসটি এবার সুজিতে গড়িয়ে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে ভেজে ধনেপাতা সহযোগে পরিবেশন করুন।

## ভেজিটেবল ধানসাক

*(পারসি ও গুজরাতি প্রভাবের মিশেলে তৈরি এই সিগনেচার ডিশ। মাটন ধানসাকের মতোই নিরামিষাশীদের জন্য সবজি-ডাল দিয়ে তৈরি ধানসাক)*

**উপকরণ:** অড়হর ডাল ১/২ কাপ, সোনা মুগ ডাল ১/২ কাপ, ছোলার ডাল ১/২ কাপ, মেথিপাতাকুচি ৫০ গ্রাম, পুদিনাপাতাকুচি ২০টা, কাঁচালঙ্কাকুচি ২টো, বেগুন ২টো (ছোট, টুকরো করা), কুমড়ো ১ কাপ (টুকরো করে কাটা), পেঁয়াজ ১টা (পাতলা স্লাইস করা), হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ। **ফোড়নের জন্য:** পেঁয়াজ ১টা (পাতলা স্লাইস করা), টোম্যাটো ২টো (কুচনো), তেল বা ঘি ২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, জল পরিমাণমতো। **ধানসাক মশলার পেস্ট বানানোর জন্য:** রসুন ৩ কোয়া, আদা ২ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা ২টো, গোটা গোলমরিচ ১ চা-চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, লবঙ্গ ৫টা, দারচিনি ১ ইঞ্চি, গোটা ধনে ১ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** ধানসাক মশলা বানানোর জন্য যাবতীয় উপকরণ মিক্সিতে বেটে নিন। অল্প জল মেশাবেন প্রয়োজনমতো। মিহি মশলাবাটা হয়ে গেলে আলাদা সরিয়ে রাখুন। সবজিগুলো টুকরো করে নিন। মেথিপাতা, পুদিনাপাতা কুচিয়ে নিন। তিনরকমের ডাল আলাদা আলাদা করে আধঘণ্টা মতো ভিজিয়ে রাখুন। এবার প্রেশার কুকারে

পোট্যাটো স্টু

তিনরকমের ডাল, সবজি, মেথি-পুদিনাপাতাকুচি, একটা কুচনো পেঁয়াজ, লঙ্কা ও হলুদগুঁড়ো একে একে দিন। তিন কাপ জল দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে অপেক্ষা করুন অন্তত দু'টো হুইসলের জন্য। আঁচ কমিয়ে তিন-চার মিনিট সেদ্ধ হতে দিন। কুকার থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে গেলে সব উপকরণ একসঙ্গে নিয়ে মেখে নিন। প্যানে ঘি গরম করে পেঁয়াজকুচি সতে করে নিন। টোম্যাটো দিন। টোম্যাটো নরম হয়ে এলে মশলাবাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন যতক্ষণ না মশলার কাঁচা গন্ধ চলে যাচ্ছে। এবার ডাল-সবজির মিশ্রণ দিয়ে কম আঁচে ১০-২০ মিনিট রাখুন। আঁচ বন্ধ করে লেবুর রস ও ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নেড়েচেড়ে নিন। ব্রাউন রাইস বা সেদ্ধ ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

## পারসি লাগান সারা ইশটু বা পোট্যাটো স্টু

*(পারসি বিয়েবাড়িতে এই ডিশটি পরিবেশন করা হয়।)*

**উপকরণ:** গাজর ১টি (ছাড়িয়ে টুকরো করে কাটা), ছোট আলু ৫টি, ওল ১০০ গ্রাম (ছাড়িয়ে টুকরো করে কাটা), মটরশুঁটি ১/৪ কাপ, কিশমিশ ১ টেবলচামচ, খেজুর ৪টে (কুচনো), ভিনিগার ১/৪ কাপ,

রাভো

গুড় ১ টেবলচামচ, পেঁয়াজ ১টা (কুচনো), টোম্যাটো ১/৪ কাপ (কুচনো), রসুন ২ কোয়া (কুচনো), আদা ১ ইঞ্চি (কুচনো), কাঁচালঙ্কা ২টো (কুচনো), হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, শুকনো লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধানসাক মশলা ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য।

**প্রণালী:** প্রেশার কুকারে গাজর, আলু, ওল, নুন ও এক কাপ জল দিয়ে ঢেকে একটি হুইসল অবধি অপেক্ষা করুন। নামিয়ে, কুকার থেকে ধোঁয়া বেরতে দিন। একটি পাত্রে কিশমিশ, খেজুর ও গুড় ভিনিগারে ভিজিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ ভেজে টোম্যাটো, নুন দিয়ে কষে নিন। নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। তলা-ভারী পাত্রে তেল গরম করে সবজি ভেজে তুলুন। ওই তেলেই আদা, রসুন, লঙ্কা দিন। নেড়েচেড়ে মশলার মিশ্রণ দিন, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো, ধানসাক পাউডার, খেজুর-গুড় ভেজানো মিশ্রণ দিন। নেড়েচেড়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

**ছবি:** শুভেন্দু চাকী
**শেষ পাতার ছবি:** শেফ অনাহিতা ধোন্দির ইনস্টাগ্রাম

শেফ অনাহিতা ধোন্দি ভাণ্ডারি

*পারসি রীতিনীতি ও খাওয়াদাওয়া নিয়ে জানালেন সেলেব্রিটি শেফ অনাহিতা ধোন্দি ভাণ্ডারি।*

মার্চ আর অগস্ট, বছরে দু'বার আমরা পারসি নতুন বছর উদযাপন করি। কয়েক হাজার বছর আগে যখন পারসিরা ভারতে এসেছিলেন, সেই দিনটি উদযাপন করে আমাদের ক্যালেন্ডার শুরু হয়। মোটামুটি ১৬ অগস্ট হয় পারসি নিউ ইয়ার। দেশের অন্য অঞ্চলে যেভাবে নতুন বছরের দিনটা আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো হয়, তেমনই আমরাও এদিনটা আমাদের কাছের মানুষদের সঙ্গে কাটাই। আমিষ বা অ্যালকোহল খেতে পারব না—এরকম কোনও নিয়ম নেই। সকালের ব্রেকফাস্টে একটি মিষ্টি আমরা বানাই, তার নাম 'রাভো'। মিষ্টি বানানোর পরে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, তার কাছাকাছি কোনও ফায়ার টেম্পল বা 'আগিয়ারি'-তে যাই। অনেকটা যেভাবে গুজরাতিরা গরবা সেলিব্রেট করেন, সেরকমই আমাদের পুরো কমিউনিটি উদযাপন হয়। নাচ-গান, গেমস, খাওয়াদাওয়া... সব থাকে। উপহারও আদান-প্রদানও হয়। আমার বাবা-মা, দিদা, কাকা-কাকিমারা যেমন আমায় উপহার দেন। আমরা 'গারা' শাড়ি পরি এই বিশেষ দিনে। এ তো গেল নতুন বছরের কথা। সাধারণত পারসি বাড়িতে প্রন কারি রাইস, ধানসাক, পত্রানি মচ্ছি, চাটনি প্যাটিস, নানারকমের কাটলেট, নানারকমের বেকারি আইটেম, পুডিং, কাস্টার্ড...এসব খুব জনপ্রিয়। আমার মা গত ৩০ বছর ধরে হোম শেফ। উনি নানারকমের কেক বেক করেন। পারসিরা রন্ধনপ্রণালীতে অল্প ভিনিগার ব্যবহার করেন। স্বাদ হয় টক-ঝাল-মিষ্টি মেশানো। যেহেতু গুজরাতি প্রভাব আছে আমাদের রান্নায়, একটু চিনিও দেওয়া হয়। ছুটির দিনে আমার মায়ের হাতের ধানসাক আমার প্রিয়। পারসিরা মিষ্টি খেতে ভালবাসে। ফালুদা, মাওয়া কেক, বিস্কিট, কুলফি (মুম্বইতে খুব বিখ্যাত) বা লগান-নু-কাস্টার্ড, ক্যারামেল কাস্টার্ড...এসবই আমাদের প্রিয়। আর পারসি ড্রিংকের মধ্যে আলাদা করে বলব র‍্যাসপবেরি সোডা, জিঞ্জার সোডা, মশলা সোডার কথা। পারসি চায়ও খুব জনপ্রিয়। গরমকালে লেমন বার্লি ওয়াটার বানাই বাড়িতে। পারসি চায়-তে লেমনগ্রাসও থাকে।

ঘন আসমানি রঙের অ্যাসিমেট্রিক্যাল লং ড্রেস। নেকলাইন ও হেমে মেরুনরঙের আধিপত্য এবং বিডসের ডিটেলিং।

**পোশাক:** লেবেল মেঘা গর্গ

# Aerial Inspiration

বাতাসের মতোই চিরবহতা উৎসবের আনন্দ, অনাবিল সেই খুশির রেশ। প্রকৃতির সেই উপমা ধার করেই এই বিশেষ ফিচার। শারদীয়ার প্রাঞ্জল আবহে হালকা, ফুরফুরে পোশাকের অনন্য ফ্যাশনস্কেপ।

হলুদ, নীল, লাল, ধূসরের মিশেলে ফ্রি-ফ্লোয়িং অরগ্যানজ়া ড্রেস। রঙের উজ্জ্বলতায় উৎসবের উচ্ছ্বাস।

**পোশাক:** লেবেল মেঘা গর্গ
**ওয়েবসাইট:** www.meghagarg.com

আকাশি স্যাটিন
শর্ট ড্রেসের ইয়োকে
নেটের লেয়ারিং।
তাতে বাড়তি আবেদন
যোগ করেছে
শিফনের ট্রেল।

**পোশাক:** ফোমো
**ফোন:** ৭০০৩৯৮৯৮৩৬

পিচরঙা অ্যান্টিফিট স্লিপ ড্রেস। পোশাকের ফলে অবারিত খুশির ধারা। হালকা রঙেও জৌলুসের অভাব নেই কোনও!

পোশাক: সুমন নাথওয়ানি
ফোন: ৯৮৩০২৬৪৪০১

গাঢ় মেরুন রঙের স্লিভলেস নি-লেংথ ড্রেস। রঙের একঘেয়েমি কাটায় লাল-কালো অরগ্যানজ়া ফুলস্লিভ জ্যাকেট।

**পোশাক:** লেবেল মেঘা গর্গ
**ইয়ারিং:** উমাইরা

উজ্জ্বল রঙে ঝলমলে উপস্থিতি। টুকটুকে লাল অ্যাসিমেট্রিক্যাল ফ্লোয়ি ড্রেসে একই রঙের সিকুইনের কারুকাজ। সাহসী এবং গ্ল্যামারাস!

পোশাক: লেবেল মেঘা গর্গ
ফোন: ৯৮৩০৪৮৮২৮২
ইয়ারিং: উমাইরা
ফোন: ৮১০০১৮১৯১৪

দুধসাদা হল্টারব্যাক
রম্পারে ফান
অ্যান্ড প্লেফুল মুড।
সিকুইনের ফ্রিঞ্জেস
আলাদা মাত্রা
এনেছে পোশাকে।

**পোশাক:** বম্বে বাই আয়েশা

বেবিপিঙ্ক অফ-শোল্ডার বেলুন ড্রেস। ওয়েস্টলাইনে টাই-আপের ডিটেলিং। বোল্ড অ্যান্ড ইউথফুল।

**পোশাক:** সাস্যা
**ফোন:** ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩

স্নিগ্ধ এবং সাবলীল। সাদা ও গোলাপির জুটিতে টাই অ্যান্ড ডাই অরগ্যানজ়া ড্রেস। আপারবডির প্লিটসও বেশ অভিনব।

পোশাক: ফোমো

গোলাপি করসেট ড্রেসে ঢেউ খেলানো অ্যাসিমেট্রিক্যাল লোয়ার বডি। বাতাসের মতোই মুক্ত, ফ্রি-স্পিরিটেড। *(ডানদিকের পাতা)*

পোশাক: সাস্যা

পরিকল্পনা: সায়নী দাশশর্মা
শুটিং কোঅর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার
রূপায়ণে: অসীম হালদার

মডেল: জুহি, অঙ্কিতা, রিয়া
মেক-আপ: কাজু গুহ
ফোন: ৮০১৭৯৪২৬৫১
হেয়ার: আম্রপালি
ফোন: ৯০৭৩৮০৮০৬০
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: দীপশিখা রায়
ছবি: সোমনাথ রায়

উপন্যাস ২

# ময়না তদন্ত

ই ন্দ্র নী ল সা ন্যা ল

**প্রাককথন**

প্রিয়া দাশ খুন হবেন! এখন, একটু পরে, আজ রাতে, কাল সকালে বা পরশু দুপুরে... যে কোনও সময়, যে কোনও দিন। বাঁচার রাস্তা নেই। পালানোর পথ, নেই। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ কি এই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন?

বিরলতম অপরাধে অপরাধীদের ক্ষেত্রে আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। অতীতে গিলোটিনে গলা কাটা হত, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হত। এখন বিদেশে বিষ ইঞ্জেকশন বা ইলেকট্রিক চেয়ার বা গ্যাস চেম্বারের ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। কথাই আছে, 'হ্যাং হিম টিল ডেথ!' সব ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষটি জানেন তিনি কবে কীভাবে মারা যাচ্ছেন, কে তাঁকে মারছে।

মব লিঞ্চিং-এ মৃত্যু, আত্মঘাতী মানববোমার নিজেকে ধ্বংস করা, সিংহের সঙ্গে লড়াই করে গ্ল্যাডিয়েটরের মরণ— সব পরিস্থিতিতেই মৃত্যুপথযাত্রী জানেন তিনি কখন কীভাবে মরবেন। আত্মহত্যাকামী নিজেই নিজেকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

প্রিয়া দাশের এই সুবিধে নেই। তিনি শুধু জানেন যে খুন হবেন। কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে... কিচ্ছু জানেন না। হত্যাকারী কে, এটা জানলেও তিনি যে নিজের হাতে মারবেন— এমন না-ও হতে পারে। ভাড়াটে খুনিরা, কলকাতায় অন্তত, অল্প টাকায় কাজ করে। ছোট বাজারে টিকে থাকতে গেলে দর কমাতেই হয়।

পরিচিত মানুষের বৃত্ত ছোট করে ফেলেছেন প্রিয়া। জার্নালে পড়েছেন,
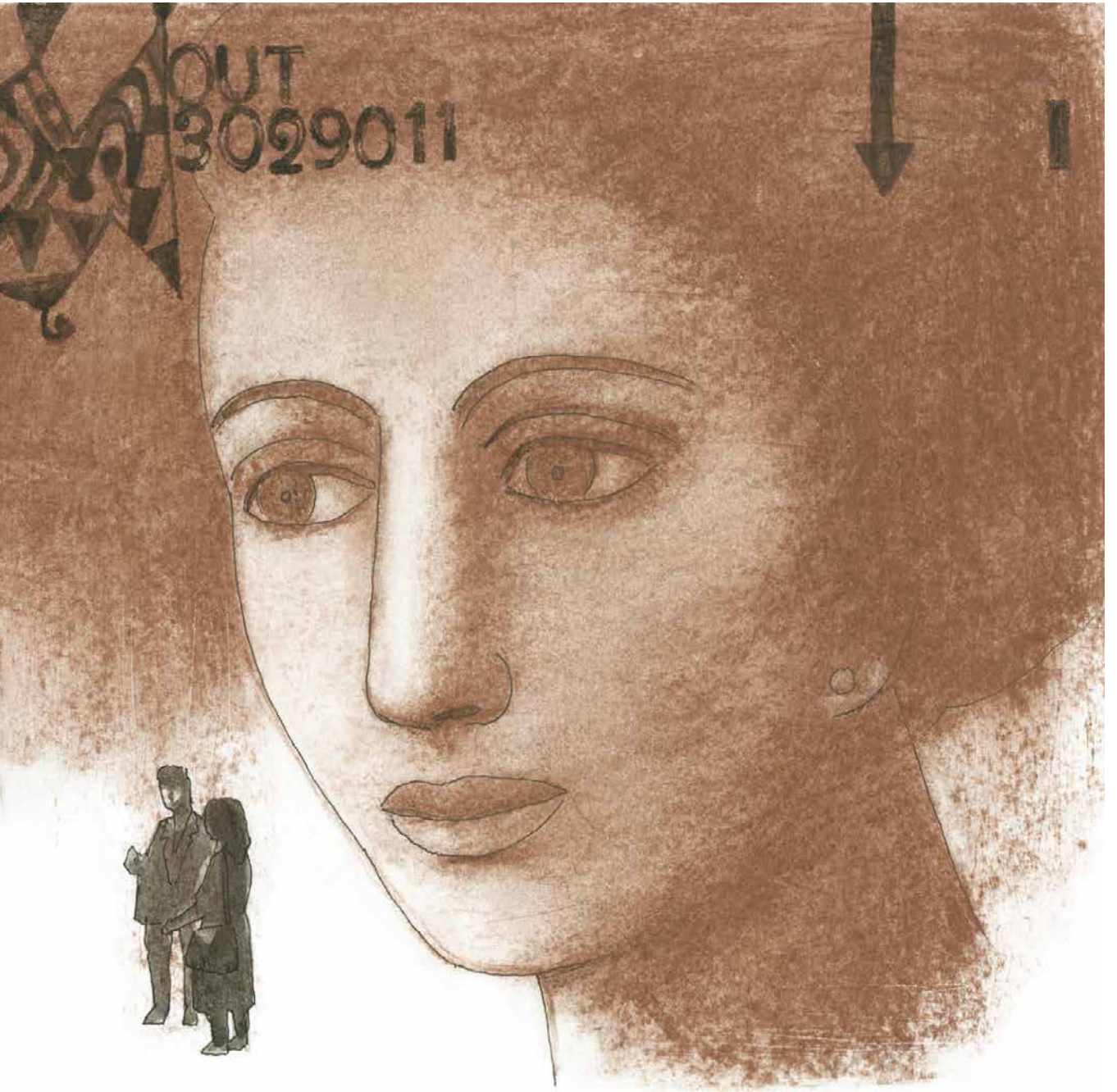
প্রতি চারটি খুনের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে খুনি মৃত ব্যক্তির খুব কাছের লোক হয়ে থাকে। কিন্তু বৃত্ত ছোট করেও লাভ হল কই? খুনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তেই আছেন।

কাজে বেরিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু, দূর থেকে গুলি করা, গাড়িতে তুলে হাইওয়ের ধারে গিয়ে কচুকাটা করে ভেড়ির জলে ফেলে দেওয়া, বস্তাবন্দি করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া— কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না প্রিয়া।

বাড়িতে থাকলেও শান্তি নেই। খাবার বা পানীয়ের মধ্যে বিষ মেশানো, ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া, গায়ে আগুন লাগানো, মুখে বালিশ চাপা দেওয়া, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া... সম্ভাবনা অসীম। এবং এই সবের মধ্যে যে কোনও একটা, যে কোনও মুহূর্তে ঘটবে। প্রিয়া খুন হবেন। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

মনোচিকিৎসক হিসেবে হত্যার নানা বিচিত্র পদ্ধতির কথা প্রিয়া জানেন, যা অন্য কারও পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। এর ফলে তাঁর মানসিক সমস্যা হচ্ছে। সাইকায়াট্রিস্ট প্রিয়া গত কয়েক মাস ধরে অ্যাংজ়াইটি বা বিপন্নতায় ভুগছেন, ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতায় তলিয়ে যাচ্ছেন, প্যানিক অ্যাটাক বা অতি আতঙ্কের ঝড়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন।

নিজের খুন আটকাতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এক নম্বর, ডাক্তারি করতে বাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ। এর ফলে ভাড়াটে খুনি রাস্তায় তাঁকে খুন করতে পারবে না। দু'নম্বর, নিজের বেডরুম থেকে বেরোচ্ছেন না। কারণ খুনি বাড়ির মধ্যেই রয়েছেন! তিনি ঘরে ঢুকে খুন করতে সাহস করবেন না। তিন নম্বর প্ল্যান হিসেবে বাড়ির খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা বন্ধ

করেছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে বোতলবন্দি জল এবং প্যাকেটবন্দি শুকনো খাবার দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। মায় শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ়ও বদলাচ্ছেন না। সেটার অন্য কারণ আছে।

আর কী কী করা যেতে পারে খুনির হাত থেকে বাঁচতে? ভাবছেন প্রিয়া।

একটা উপায় হল, খুনির জন্যে অপেক্ষা না-করে নিজেকে খুন করা। অর্থাৎ আত্মহত্যা। এই ক্ষেত্রে প্রিয়া জানবেন কে তাঁকে মারছেন, কী ভাবে মারছেন, কেন, কখন মারছেন। কোনও মানসিক চাপ নেই।

কিন্তু প্রিয়া আত্মহত্যাকামী নন। তিনি রোগী দেখতে চান, তাঁদের সুস্থ করে তুলতে চান, নতুন গান গাইতে চান, নতুন শাড়ি পরতে চান, নতুন সিনেমা-থিয়েটার দেখতে চান, রেস্তরাঁয় নতুন ডিশ ট্রাই করতে চান। এক কথায়, বেঁচে থাকতে চান।

একটাই উপায় পড়ে রইল। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। অন্য কোনও শহরে, অন্য কোনও রাজ্যে, অন্য কোনও দেশে। সেটাও কোনও সমাধান নয়। অন্য দেশ ত্যাগ করে এই দেশে এসেছেন তিনি। আবার দেশত্যাগ বা গৃহত্যাগ করার মতো মনের জোর নেই। সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়ার থেকে মৃত্যুও ভাল।

তবে হ্যাঁ, সেই মৃত্যু যেন খুন না হয়! হত্যার চিন্তা মাথায় আসতেই অতি-আতঙ্কে বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে। বিছানার পাশেই চিন্তাহরণ বড়ি আছে, যা তিনি বিষণ্ণতা আর বিপন্নতার রোগীদের নিয়মিত লিখে থাকেন এবং নিজেও খেয়ে থাকেন। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ঘুমের ওষুধ খেতে ভয় পাচ্ছেন। ঘুমিয়ে পড়লে বিপদ হবে!

কাউকে বলে কিছু লাভ নেই। সে চেষ্টা তিনি করেছেন। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে জনৈক ক্ষমতাবান মানুষও তাঁকে সাহায্য করতে পারছে না। অন্যরা নিচু গলায় বলেছে, "আপনি সাইকায়াট্রিস্টের কাছে যান। আপনাকে মানসিক ভাবে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে।"

কারও কাছে গিয়ে লাভ নেই। প্রিয়া যেটা করতে পারেন, সেটা হল যাবতীয় তথ্য জড়ো করে রাখা। যে কাজটা তিনি গত কয়েক মাস ধরে নিঃশব্দে করেছেন।

তিনি খুন হয়ে যাওয়ার পরে সেই সব সূত্র ছড়িয়ে থাকবে নানা জায়গায়, নানা ভাবে। কেউ কি পারবে, সূত্রগুলো উদ্ধার করতে? যদি পারেও, সেগুলো জুড়তে সক্ষম হবে?

সূত্র মানে সুতো। যে সুতো দিয়ে তিনি মালা গেঁথে রাখছেন তা বিফলে যাবে না তো? মরে না-গেলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না।

তবে তা-ই হোক। তিনি বেঁচে না-থাকলেও ঠিক জেনে যাবেন, হত্যাকারী শাস্তি পেল কি না। ঈশ্বর, আত্মা বা পরজন্মে অবিশ্বাসী প্রিয়া জীবনে এই প্রথম আস্তিকতার দিকে ঝুঁকলেন।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া চুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিলেন প্রিয়া। শরীরের ভাষায় বদল এল। এতক্ষণ তিনি খাটের কোণে কুঁকড়ে বসেছিলেন। এখন খাট থেকে উঠেছেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন, গায়ে সুগন্ধি ছড়াচ্ছেন, চোখের পাতায় কাজল বোলাচ্ছেন, দেওয়ালঘড়িতে সময় দেখছেন। রাত ন'টা বাজে। 'পুনশ্চ' নামের এই তিনতলা বাড়িতে কাঁটায় কাঁটায় রাত ন'টার সময় সবাই রাতের খাবার খেতে বসেন।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে খাওয়ার ঘরের দিকে এগোলেন প্রিয়া। দেখলেন আট-আসন বিশিষ্ট খাওয়ার টেবিলের চার দিকে বসে রয়েছেন শ্বশুর, স্বামী আর ছেলে। খাবার দিচ্ছেন সেবিকা এবং কাজের লোক। চেয়ারে বসে তিনি বললেন, "আজ কত তারিখ?"

ছেলে বলল, "বারোই অগস্ট। তুমি দিন-রাত ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকছ কেন? হ্যাভ ইউ লস্ট ইয়োর মাইন্ড?"

ছেলের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় স্বামী বললেন, "মায়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে নেই। তুমি এখন বড় হয়ে গেছ। ভদ্রতা, এটিকেট— এসব কবে শিখবে?"

শ্বশুর বললেন, "কী যে হচ্ছে..."

সেবিকা বললেন, "চিকেন স্টু দেব? নাকি দু'মুঠো ভাত দিয়ে পারশে মাছের ঝাল খাবে?"

ছেলে বলল, "মাছ-ভাত দাও। দুর্বল শরীরে মাংস খাওয়া ঠিক হবে না।"

ভাত আর পারশে মাছের ঝাল। এর মধ্যে কোন পদটির মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল, জানতে পারেননি প্রিয়া। বেডরুমে যখন ঢুকলেন, ঘুমে চোখ বুজে আসছে। শরীর হালকা লাগছে। মনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উধাও হচ্ছে ধীরে ধীরে।

দিনের শেষে, প্রিয়া, ঘুমের দেশে চলে গেলেন। জানতেও পারলেন না, সে দেশ থেকে ফেরা হবে না।

সে দেশ থেকে কেউ ফেরে না।

## ১

ঘুম থেকে উঠে দীপশিখার প্রথম কাজ হল মোবাইলের দিকে তাকিয়ে তারিখ, বার আর সময় দেখে নেওয়া। আজ তেরোই অগস্ট, শনিবার, সকাল ছ'টা বাজে। এবার হোয়াটসঅ্যাপ খুলে দেখে নেওয়া, কোনও কাজের মেসেজ এসেছে কি না। কাজের মেসেজ মানে ডিপার্টমেন্টের কূটকচালি, থানা থেকে সমন, লোকাল কাউন্সিলর, এমএলএ বা এমপি-র আবেদন বা হুমকি...

বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের 'ফরেনসিক মেডিসিন' ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর হিসেবে এই সব হুমকি আর গায়ে লাগে না সাঁইত্রিশ বছরের চিকিৎসক দীপশিখা মুখোপাধ্যায়ের। ঠোঁটকাটা অটপ্সি সার্জন বা টেঁটিয়া 'মড়াকাটা ডাক্তার' হিসেবে সে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত এবং রাজনীতির দুনিয়ায় যথেষ্ট বদনাম কুড়িয়েছে।

রবীন্দ্রসদন আর রেস কোর্সের উল্টোদিকের 'বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ' ব্রিটিশ আমলে তৈরি। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারতের সব রাজ্য, এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার রোগী রোজ এখানে আসে। কাজের চাপ অমানুষিক। সকাল ন'টায় ডিপার্টমেন্টে ঢুকলে বিকেল পাঁচটার আগে মাথা তোলার সময় পাওয়া যায় না।

দীপশিখার চেহারা ছোটখাটো, রোগা-পাতলা। আসানসোলে জন্ম এবং বড় হওয়া। মেয়েটার, সে অর্থে, কোনও বাহ্যিক সৌন্দর্য অতীতে ছিল না, আজও নেই। তবে জন্মের সময়ে চোখদু'টি এঁকে দিয়েছিলেন যামিনী রায়। মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার পরে টানা টানা, মায়া-মাখা কাজল-নয়ন দেখে সহপাঠী সৈকত প্রেমে পড়েছিল। অতীতে দীপশিখার মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল ছিল। এখন কয়েকগাছা খর্বুটে কেশরাশি কোনও রকমে মাথাটুকু ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত এসে হাঁফিয়ে গেছে।

সৈকতও রাজপুত্তুর নয়। কালো, রোগা, লম্বা এবং ক্লিন শেভ্ড ছেলেটিকে কলেজ জীবনে দেখলে মনে হত পাশ ফিরে শুইয়ে ইস্তিরি করে দেওয়া হয়েছে। এখন মধ্য প্রদেশে সামান্য গত্তি লেগেছে। দীপশিখা আর সৈকত মিলে কলেজ জীবন জুড়ে চুটিয়ে প্রেম করেছে, একসঙ্গে হাউসস্টাফশিপ করেছে, একসঙ্গে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন'-এর পরীক্ষায় বসেছে, সরকারি চাকরি পেয়েছে। একই জায়গায় চাকরির প্রথম পোস্টিংও হয়েছিল। পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো হাসপাতাল।

চাকরিতে ঢোকার ঠিক আগে ওদের বিয়ে হয়। আলমবাজারের 'নর্থ সিটি' অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে নতুন ফ্ল্যাট কেনে বিয়ের তিন বছর পরে।

হাসপাতালে কাজের চাপ, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, চরমপন্থী গ্রীষ্ম ও শীতকাল— এই সব নিয়ে কত্তাগিন্নি দিব্যি ছিল। হাসপাতালে কাজ করত, বাকি সময় স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুযোগ পাওয়ার জন্যে পড়াশুনো করত। সৈকত না-পারলেও প্রথম বার পরীক্ষা দিয়েই এমডি-এমএস এনট্রান্স পরীক্ষার মেধাতালিকায় নাম তুলেছিল দীপশিখা। এমডি করার জন্যে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল ফরেনসিক মেডিসিন। বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে।

সৈকত অবাক হয়ে বলেছিল, "এত পড়াশুনো করে শেষে মড়াকাটা ডাক্তার হবে? ঘেঁটুরানি, তুমি কি পাগল হলে?"

"ফরেনসিক মেডিসিন সাবজেক্টটা আমায় হন্ট করে ঘণ্টুসোনা," বলেছিল দীপশিখা, "তোমার মনে আছে, এই সাবজেক্টে আমি ক্লাসের মধ্যে হায়েস্ট মার্কস পেয়েছিলাম?"

কত্তাগিন্নি যখন একান্তে আড্ডা মারে তখন পরস্পরকে 'ঘেঁটুরানি' আর 'ঘণ্টুসোনা' সম্বোধন করে। প্রেম বটে, আদিখ্যেতাও বটে।

ঘণ্টুসোনা বলেছিল, "পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া আর কেরিয়ার সিলেকশনের মধ্যে

অনেক তফাত ঘেঁটুরানি! তুমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কে একশোয় একশো পেয়েছিলে। তা হলে ম্যাথ্‌স নিয়ে না-পড়ে মেডিক্যালে এলে কেন?”

ঘেঁটুরানি বলেছিল, “অতীতে আমার অঙ্ক ভাল লাগত। এখন ফরেনসিক মেডিসিন ভাল লাগে। ইনফ্যাক্ট, দুটো সাবজেক্টের মধ্যে অনেক মিল। দুটোই সলিড যুক্তির ওপরে দাঁড়িয়ে। জ্যান্ত মানুষ মিথ্যে কথা বলতে পারে। কিন্তু মৃতদেহ? সে ‘যাহা বলিবে সত্য বলিবে। সত্যি বই মিথ্যা বলিবে না।’ তার চুলের রং আর হাতের ট্যাটু, তাবিজ-কবচ-পৈতে, ধুতি-শাড়ি-লুঙ্গি, পাগড়ি-ফেজ়-হ্যাট, কপালের ক্ষতচিহ্ন আর গলায় দড়ির দাগ, বুলেট উন্ড আর ছুরির আঘাত— এইসবের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। জার্নিটা আমার ফ্যাসিনেটিং লাগে। তুমি আপত্তি কোরো না ঘণ্ঞুসোনা, প্লিজ়!”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘণ্ঞুসোনা বলেছিল, “আমি আপত্তি করলেও তুমি শুনবে না। সুতরাং, গো অ্যাহেড! তবে তোমার লাইফস্টাইল কী হবে এটা ভেবে দেখেছ? প্রতিদিন পোস্টমর্টেম করতে হবে। পচাগলা ডেডবডি, পলিটিক্যাল লিডারদের হুমকি আর পুলিশি কূটকচালি নিত্যসঙ্গী হবে। ব্যাচমেটরা এসইউভি হাঁকাবে, বিদেশ যাবে, নিউ টাউনে থ্রি বিএইচকে কিনবে আর তোমাকে বলবে, মড়াকাটা ডাক্তার। মেনে নিতে পারবে তো? প্লাস, রুগি দেখে সমাজের প্রতি কনট্রিবিউশনের কথাটাও একবার ভাবো।”

ঘেঁটুরানি বলেছিল, “রোগীদের চিকিচ্ছে করে তোমরা সমাজে যে অবদান রাখবে, মড়া কেটে আর পিএম রিপোর্ট লিখে আমি তার থেকে অনেক বেশি অবদান রাখব। এই কথাটা মিলিয়ে নিয়ো।”

সৈকত কথা বাড়ায়নি। দীপশিখাও নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাশ করার পরে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তার পোস্টিং হয়েছিল বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজেই। সৈকত রয়ে গিয়েছিল পুরুলিয়ায়। সেই সময় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ আর সহকর্মী মানস নাথ। মানস বয়সে দীপশিখার থেকে দশ বছরের বড় এবং চূড়ান্ত ফাঁকিবাজ। ডিম্যান্ডিং বস আর অলস সহকর্মীর পাল্লায় পড়ে দীপশিখার জীবন যায় যায়!

তবে আসল সমস্যা এল অন্য জায়গা থেকে, অতর্কিতে। জানা গেল, বত্রিশ বছরের দীপশিখার স্তনে বাসা বেঁধেছে কর্কট রোগ। ফোনে সে কথা জানতে পেরেই এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল সৈকত। দীপশিখা তখন বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের শল্য চিকিৎসা বিভাগে ভর্তি। পরের দিন অপারেশন।

শল্য চিকিৎসার বিভাগীয় প্রধান দীপশিখার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, “দু’রকম সার্জারি আছে। প্রথম সার্জারিতে ব্রেস্ট রেখে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সার্জারিতে ব্রেস্ট বাদ দেওয়া হয়। তোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা করতে হচ্ছে।”

দীপশিখা মুখ ঘুরিয়ে কান্না চেপেছিল।

অপারেশনে বাঁ দিকের স্তন বাদ গেল। সাতদিন হাসপাতাল বাসের পরে ফ্ল্যাটে ফিরেছিল দীপশিখা। কয়েক দিন পরে আবার যেতে হয়েছিল কেমোথেরাপির জন্যে। সেই সময় সব চুল উঠে গিয়েছিল। কেমো-পর্ব শেষ হওয়ার পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরে দীপশিখা। হাসপাতালের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সৈকত ফিরে যায় পুরুলিয়ায়।

অপারেশনের পর থেকে দীপশিখা শাড়ি পরা বন্ধ করে দিয়েছে। সালোয়ার-কামিজ়-দোপাট্টা অথবা কুর্তি-জিন্‌স পরে। শাড়ি খুবই প্রিয়, কিন্তু স্তন বাদ যাওয়ার পর থেকেই ব্লাউজ় দেখলেই মন খারাপ হয়। সব ব্লাউজ় সে পরিচারিকা বুলুদিকে দান করেছে। সালোয়ার কামিজ়ের অতিরিক্ত সুবিধে, দোপাট্টায় মাথা ঢেকে রাখা যায়। খর্বুটে তিন গাছা চুল কাউকে দেখাতে হয় না।

মোবাইলের দিকে তাকিয়ে এইসব ভাবছিল দীপশিখা। হঠাৎ হুঁশ ফিরল। দেখল সৈকত গতকাল রাত সাড়ে এগারোটার সময় একটা ঘুমিয়ে পড়ার ইমোজি পাঠিয়েছে। আজ ভোর ছ’টার সময় পাঠিয়েছে জগিং করার ইমোজি।

শুধু হাসপাতাল, থানা আর রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কাজের মেসেজ আসে না। সৈকতের পাঠানো এই ইমোজিগুলোও কাজের। রোজ এই দুটো ইমোজি দেখে দীপশিখা বুঝতে পারে সৈকত ক’টার সময় শুতে গিয়েছিল এবং ক’টার সময় ঘুম থেকে উঠেছে।

একই ইমোজি দীপশিখাকেও পাঠাতে হয়। দূর থেকে নজরদারি করা হোক বা লং ডিস্ট্যান্স বিবাহিত জীবনের খুচরো আদিখ্যেতা— ইমোজি চালাচালির মাধ্যমে ঘেঁটুরানি আর ঘণ্ঞুসোনা পরস্পরের খেয়াল রাখে।

দীপশিখা এখন কর্কটরোগ মুক্ত। পাঁচ বছর পার করে তার জীবনে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে। পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে হিসেব কষতে বসে।

প্রথম পরিবর্তন পেশাগত জীবনে। দীপশিখা এখন আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নয়, প্রফেসর। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের অবসরের পরে বিভাগীয় প্রধান মানস নাথ। তিনি আগের মতোই ফাঁকিবাজ। দীপশিখা তাঁকে পাত্তা দেয় না।

দ্বিতীয় পরিবর্তন হল, সৈকত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এনট্রান্স পরীক্ষায় চান্স পেয়ে কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে এসেছিল তিন বছরের জন্যে। শিশুরোগ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশুনো করে, এমডি ডিগ্রি নিয়ে আবার ফিরে গেছে দেবেন মাহাতো হাসপাতালে। পুরুলিয়ায় ‘বাচ্চাদের ডাক্তার’ হিসেবে খুব সুনাম। পসার বাড়ছে চড়চড় করে। এখন আর সপ্তাহান্তে কলকাতা আসে না। পনেরো দিনে একবার আসতেও অনীহা। কারণ হিসেবে বলে, “আমার জন্যে বাচ্চার মায়েরা অপেক্ষা করে থাকে।”

কথাটা ভুল না। কিছুদিন প্র্যাকটিস করেই সে দুটো গাড়ি কিনে ফেলেছে। একটা পুরুলিয়ায়, নিজের জন্যে। অন্যটি আলমবাজারে, দীপশিখার জন্যে।

দীপশিখা অতীতে দক্ষিণেশ্বর থেকে মেট্রো ধরে হাসপাতাল যেত। এখন গাড়ি চালিয়ে যায়। এর কারণ দীপশিখার জীবনের তৃতীয় পরিবর্তন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এসে সে গর্ভবতী। ডাক্তারি পরিভাষায় ‘এল্ডারলি প্রাইমি’ বা ‘বেশি বয়সের মা।’ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ।

বিয়ের পরে দু’জনের কেউই বাচ্চার কথা ভাবেনি। বছর তিনেক বাদে যখন এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হল, তখন দীপশিখা এমডি-তে চান্স পেয়ে কলকাতা চলে এল। সে এমডি পাশ করার পরে সৈকত যখন সপ্তাহান্তে কলকাতায় আসত, মেলামেশা হল সুরক্ষা ছাড়া। দীপশিখাও আপত্তি করেনি। বাচ্চার জন্যে আকুতির ঠিক মাঝেই কর্কট রোগের আক্রমণ।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরে দীপশিখার খুব অসহায় লাগত। সৈকত কি আর কখনও মানসিক বাধা কাটিয়ে তাকে ভালবাসতে পারবে? সৈকত যদিও বা পারে, দীপশিখা কি পারবে ওর সামনে নিঃসংকোচে নগ্ন হতে? তার কি মনে হবে না, সৈকতের যৌনবাসনা আসলে দয়া বা দাক্ষিণ্য? তার কি মনে হবে না, যৌনক্রীড়ায় সে স্থান পাচ্ছে স্ত্রী হিসেবে নয়, যৌন প্রতিবন্ধী হিসেবে?

নিজেকে সত্যিই ‘প্রতিবন্ধী’ বলে মনে হত দীপশিখার। মনে হত ঊননারী, আলাদা, সংখ্যালঘু। প্রকাশ্যে সমবেদনা জানালেও আড়ালে সবাই ‘নিমাই’ বা ‘ম্যানচেস্টার’ বলে হাসাহাসি করে।

দীপশিখা সেই সময় ঘুমের ওষুধ খেতে শুরু করেছিল। ডিনারের আগে জিভের তলায় ট্যাবলেট রেখে দিত। একটু পরেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। সকালবেলা খুব ফ্রেশ লাগত।

কিছুদিন পরেই ঘুমের ওষুধের কর্মক্ষমতা কমতে শুরু করায় দুটো করে বড়ি খেতে শুরু করেছিল দীপশিখা। ফিরে এসেছিল জমাটি ঘুম। কয়েক মাস বাদে আবার অনিদ্রা-সঙ্কট। এই ভাবে সে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়েছিল। দিন-রাত মিলিয়ে চারটে ট্যাবলেট খেত। অ্যাডিকশনের কথা সৈকত জানতেও পারেনি।

ঠিক সেই সময়ে পেশাগত জায়গায় বিশাল সমস্যার মুখে পড়েছিল দীপশিখা। একাধিক মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে কলকাতা শহর উত্তাল হয়েছিল। তাতে জড়িয়ে পড়েছিল দীপশিখা এবং ময়দান থানার অফিসার-ইন-চার্জ বরুণ সরকার। জীবন সংশয় হয়েছিল দু’জনের। প্রাণ বাঁচানোর আর অপরাধীকে ধরার তাগিদে ঘুমের ওষুধের নেশা কেটে যায় দীপশিখার।

পারিবারিক জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে সৈকত কলকাতায় তিন বছরের জন্যে চলে আসার পরে। ওই তিনটে বছর খুব আনন্দে

কাটিয়েছে দু'জনে। সন্তানের জন্যে চেষ্টাও চলেছিল একটানা।

তিন বছরে কিছুই বোঝা যায়নি। সৈকত পুরুলিয়ায় ফিরে যাওয়ার পরেও নয়। ওর সাপ্তাহিক আসা-যাওয়া কমে যাওয়ার পরে ঋতু বন্ধ হল দীপশিখার। ঘরেই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে সৈকতকে সে ফোন করে বলেছিল, "ঘঞ্চুসোনা, আমরা প্রেগন্যান্ট!"

"আমরা মানে? তুমি আর কে? আমি তো অন্য কারও সঙ্গে বিলিক-ছিলিক করি না!" ঠান্ডা মাথায় বৌয়ের সঙ্গে ছ্যাবলামো করেছিল ঘঞ্চুসোনা।

"মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব শালা!" উত্তেজিত হলে টুকটাক মুখ খারাপ করে ঘেঁটুরানি। পুলিশ এবং ডোম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওঠাবসা করে তার গালাগালির ভান্ডারটি খুবই সমৃদ্ধ। শুধু ঘঞ্চুসোনার সঙ্গে কথা বলার সময়েই ভান্ডার থেকে এক-দু'টি মণিরত্ন ব্যবহার করে।

"পরের বাচ্চা দেখে দিন কাটছিল। এবারে নিজের বাচ্চা দেখব," ঘঞ্চুসোনার গলায় তৃপ্তি।

পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল দীপশিখা। বুলুদির কলিং বেল বাজানোর শব্দে ঘোর কাটল। বিছানা থেকে উঠে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। স্নান সেরে বারমুডা আর টি-শার্ট পরে বেরিয়ে দেখল বুলুদি চা বানিয়ে বারান্দায় রেখে দিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে দীপশিখা। সব রকমের খবরে চোখ বোলালেও তার নজর থাকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে। কলকাতা হোক বা মফস্‌সল, জেলা শহর বা গণ্ডগ্রাম— জটিল, অস্বাভাবিক মৃত্যু হলেই সেটা রেফার হয়ে আসে বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে। মৃত মানুষটি বিখ্যাত, কুখ্যাত অথবা ক্ষমতাবান হলে তো কথাই নেই। ফোনের ঠেলায় পাগল-পাগল অবস্থা হয়। সকালবেলার খবরের কাগজ তাকে জানিয়ে দেয়, আজকের দিন কেমন যাবে।

আজ তেমন কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর নেই। বাঁচা গেল! আজ তার রুটিন আলট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষা। চোদ্দোতে সপ্তাহের মাথায় পেটের ইউএসজি হচ্ছে। রেডিয়োলজি বিভাগের প্রফেসর মেধা মাহাতোকে গতকাল বলে রেখেছিল দীপশিখা।

চা পর্ব চুকিয়ে ব্রেকফাস্ট। বুলুদি এক বাটি ওট্‌স টেবিলে রেখে বলল, "টিপিন কৌটোয় ভাত, ডাল, আলুভাতে আর পারশে মাছের ঝোল আছে," তারপরে ফ্ল্যাট পরিষ্কার শুরু করল।

দ্রুত ব্রেকফাস্ট শেষ করল দীপশিখা। পোশাক বদলে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল। গাড়িতে উঠে হোয়াটসঅ্যাপে সৈকতকে গাড়ির ইমোজি পাঠাল। দেখল, সৈকতও আটটার সময় ডাক্তার-এর ইমোজি পাঠিয়েছে। অর্থাৎ আটটা থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেছে। সওয়া ন'টা নাগাদ হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের ইমোজি পাঠাবে। মানে হাসপাতালে কাজ শুরু করছে।

স্মিত হেসে গাড়ি স্টার্ট করল দীপশিখা।

*

টিস্যু পেপার দিয়ে পেটে লাগানো জেল পরিষ্কার করতে করতে দীপশিখা বলল, "কী বুঝলি?"

মেধা মাহাতো খটখট করে কি বোর্ড টিপছে। মাথা না-তুলে বলল, "সব কিছু নরমাল। নো টেনশন। হার্ড কপি নিবি, না সফ্‌ট কপি মেল করে দেব?"

ভিজে টিস্যু পেপার ওয়েস্ট বিনে ফেলে সালোয়ারের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে দীপশিখা বলল, "হার্ড কপি নেব। না হলে গাইনির মন্দিরা ম্যাম ঝামেলা করবেন। উনি সিনিয়র মানুষ। এইসব হার্ড-সফ্‌ট বুঝতে চান না।"

"বয়স্কদের নিয়ে এই হল সমস্যা," প্রিন্ট আউট নিচ্ছে মেধা, "তোকে একটা কথা বলি? ইট্‌স বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি ওনলি।"

"তাড়াতাড়ি বল!"

"ইট্‌স আ বেবি গার্ল!" হাই ফাইভের জন্যে হাতের তালু এগিয়ে দিয়েছে মেধা। তালুতে তালু ঠুকে দীপশিখা বলল, "এসবের কোনও গুরুত্ব নেই আমার কাছে। তবে আমি বরাবর মেয়ে চেয়ে এসেছি। সৈকতকে খবরটা দিই, কী বল?"

"আর কাউকে বলিস না!" শঙ্কিত মুখে বলে মেধা, "এসব বলা ইল্‌লিগাল!"

"আমি আর সৈকত ছাড়া কেউ জানবে না," রিপোর্ট আর ইউএসজি প্লেট নিয়ে নিজের বিভাগের দিকে দৌড়য় দীপশিখা। দশটা বাজে। মানস যে এখনও আসেননি, সে তো জানা কথা। কিন্তু অন্য স্টাফেরা এসেছে কি?

যেতে যেতে সে সৈকতকে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটি বাচ্চা মেয়ের ইমোজি পাঠায়।

## ২

"ম্যাডাম, আসতে পারি?" দীপশিখার কেবিনের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে খাকি পোশাক পরা পুলিশ অফিসার। লোকটাকে চেনা চেনা লাগলেও চিনতে পারছে না দীপশিখা। সে ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনাকে... কোথায় যেন দেখেছি..."

"আমি বরুণ সরকার ম্যাডাম," এখনও হাসছে খাকি উর্দি, "আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল, তখন ময়দান থানায় ছিলাম। কয়েক মাস আগে ভবানীপুর থানায় এসেছি।"

"এ মা! সরি!" লজ্জা পেয়েছে দীপশিখা, "চিনতে না-পারার জন্যে খুব লজ্জিত। প্লিজ় ভিতরে আসুন।"

বরুণের বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ। দীপশিখার সঙ্গে আলাপের সময় চেহারা ছিল অ্যাথলিটের মতো। জিন্‌স, না-গোঁজা টিশার্ট, স্নিকার আর চওড়া গোঁফ দেখে পেশা আন্দাজ করা যেত। 'নো ননসেন্স অ্যাটিটিউড'-এর মানুষটি বাড়তি কথা বলত না। যেটুকু বলত, শুনে বোঝা যেত পেটে বিদ্যে আছে।

মাঝে পাঁচটি বছর পার করে আজকের বরুণের মুখে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। হালকা ভুঁড়ি হয়েছে। মাথায় অল্প টাক। পাঁচ বছর আগে পেশাদার সখ্য গড়ে উঠেছিল দীপশিখা আর বরুণের মধ্যে। দুই কাজপাগল মিলে সমাধান করেছিল কলকাতা জুড়ে ঘটে চলা সিরিয়াল কিলিং-এর। আজ ভোরবেলাই বরুণের কথা ভাবছিল দীপশিখা। এখন চোখের সামনে স্বয়ং সে।

"দরকারে এসেছি," কাজের কথা পাড়ল বরুণ, "আমার জুরিসডিকশনে এক ডাক্তারের 'ইউডি' হয়েছে।"

"ডাক্তারের 'আনন্যাচরাল ডেথ?"' হাত বাড়িয়ে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট চায় দীপশিখা।

'ইউডি' বা 'আনন্যাচরাল ডেথ' বা 'অস্বাভাবিক মৃত্যু।' সেটা দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা খুন— যা খুশি হতে পারে। পুলিশ আর ফরেনসিক এক্সপার্ট মিলে ঠিক করে, কী কারণে মৃত্যু হয়েছে। 'ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট' হল পুলিশের সরেজমিন তদন্তের প্রতিবেদন। থানা থেকে একজন পুলিশ অকুস্থলে গিয়ে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট লেখেন। ময়না তদন্ত শুরু করার আগে পড়ে নিলে কাজের সুবিধে হয়।

প্রতিবেদন পড়তে পড়তে দীপশিখা বলল, "আরে! আমি এঁর নাম জানি। সাইকায়াট্রিস্ট। 'মানবিক' নামের একটা মেন্টাল হেল্‌থ কেয়ার ফাউন্ডেশন চালান।"

"নিজের ফিল্ডে খ্যাতি আছে," ঘাড় নাড়ল বরুণ, "ভবানীপুরের যে বাড়িতে থাকতেন সেটা কলকাতার পুরনো বাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাড়ির নাম 'পুনশ্চ।' পেল্লায় সাইজ়ের বাড়ির বয়স একশো তো হবেই। দাশ পরিবারের তিন প্রজন্ম, মানে ঠাকুরদা, বাবা এবং ছেলে— সবাই ডাক্তার।"

"সকালবেলায় আমার কাছে এসে পোস্ট মর্টেম করার জন্যে তাড়া দিচ্ছেন কেন?" কেজো কথায় ফিরল দীপশিখা, "আমি সেকেন্ড হাফে কাজটা করব। এখন আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদের ক্লাস নেব।"

"প্লিজ় ম্যাডাম!" হাত জোড় করেছে বরুণ, "কনস্টেবল না-পাঠিয়ে আমি নিজে কেন এসেছি, সেটা ভাবুন। দাশ ফ্যামিলি ইজ় ভেরি ইনফ্লুয়েনশিয়াল। নবান্ন, স্বাস্থ্য ভবন, বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, মায় দিল্লির পাওয়ার করিডোর— সব জায়গায় হাত আছে।"

বরুণের কথার মধ্যে কাবলি জুতো ঘষটে, ঈষৎ খুঁড়িয়ে দীপশিখার চেম্বারে ঢুকলেন মানস নাথ। হাতের মোবাইল দেখিয়ে দীপশিখাকে বললেন, "বিএমসি-র ডিরেক্টর বিভাস কাঞ্জিলালের ফোন এসেছে। পিএম-টা করে দে।"

দীপশিখা উত্তর দেওয়ার আগেই রাজু ডোম চেম্বারে ঢুকে মানসকে বলল, "হয়ে যাবে স্যর। আপনি চেম্বারে যান।"

মানস পা ঘষটে চলে যেতেই রাজু দীপশিখার দিকে তাকাল, "করে দিন ম্যাডাম। লোকাল কাউন্সিলর গুড্ডুদা আমাকেও ক্যাচ মেরেছেন।"

“তুই যখন বলছিস...” অসহায় ভাবে ঘাড় ঝাঁকায় দীপশিখা।

রাজুর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। লম্বা এবং কালো। আগে রোগা ছিল, সম্প্রতি পেটে মেদ জমেছে। ডোম সম্পর্কে লোকে ভাবে যে ওরা অশিক্ষিত, সারাক্ষণ মদ খায়, ‘বডি’ ছাড়ার আগে বাড়ির লোকের কাছ থেকে ঘুষ খায়। রাজু এসবের মূর্তিমান ব্যতিক্রম। সে নেশা করে না। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনো করেছে। ময়না তদন্তের সময়টুকু বাদ দিলে অন্য সময় ডিপার্টমেন্টের কাজে ব্যস্ত থাকে। ডেটা এন্ট্রির কাজ জানে বলে হাতে লেখা পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কম্পিউটারে তোলার ব্যাপারে সবাই সাহায্য নেয়। কিছুদিন আগেও দীপশিখা এই কাজটা পারত না। রাজুর সাহায্য লাগত। এখন আর লাগে না।

দীপশিখাকে রাজু স্পেশ্যাল খাতির করে। তার কারণ, দীপশিখা এই বিভাগের একমাত্র মহিলা চিকিৎসক। পুরুষ অধ্যুষিত ডিপার্টমেন্টে দীপশিখাকে অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লড়াই করতে হয়। সেই সব যুদ্ধে নীরবে সাহায্য করে রাজু।

রাজুর আশ্বাস শুনে মানস নিজের চেম্বারে চলে গেলেন। বরুণ, দীপশিখা আর রাজু সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাশকাটা ঘরের দিকে এগোল।

আগে মর্গ ছিল বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের পিছন দিকে। এখন এই বিল্ডিংয়ের একতলায় ঝাঁ চকচকে মর্গ হয়েছে। তিনজনকে আসতে দেখে মর্গের দরজার তালা খুলে দিল রাজুর বাবা সাধু ডোম।

বছর ষাটের মানুষটির পরনে নোংরা ফতুয়া আর লুঙ্গি। খালি পা। শরীর থেকে মদের গন্ধ আসছে, মুখে বিড়ি। স্বভাবে বাবা আর ছেলে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও দু’জনের মধ্যে একটা মিল আছে। দু’জনেই দীপশিখাকে খুব মানে।

দরজা খুলে দিয়ে সাধু চলে গেল। মর্গে ঢুকে বরুণ বলল, “বাপ রে! কী ঠান্ডা!”

এপ্রন, সার্জিকাল ক্যাপ, মাস্ক আর গ্লাভ্স পরতে পরতে দীপশিখা বলল, “এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন বসানো আছে। টেম্পারেচার সব সময় ষোলো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সেট থাকে।”

মর্গটি লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট, চওড়ায় পনেরোর আশপাশে। বিশাল জায়গা জুড়ে দুই সারিতে পাতা রয়েছে আটটা টেবিল। লোহার তৈরি ফ্রেমে পাথরের স্ল্যাব বসিয়ে টেবিল তৈরি হয়েছে। আটটা টেবিলের মধ্যে একটি টেবিলে কালো রঙের বডি-ব্যাগ রয়েছে। বাকি টেবিলগুলো আপাতত খালি।

রাজু এপ্রন, মাস্ক ইত্যাদি পরেছে। এর পরে বডি-ব্যাগ খুলে মৃতদেহ বের করবে। সেই ফাঁকে দীপশিখা ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে চোখ রাখল।

‘আমি, সহ-অবর পরিদর্শক মনোজ মণ্ডল, সঙ্গী কনস্টেবল নং ১২৭, সুব্রত প্রামাণিক এবং ডোম সাধু মল্লিককে সাক্ষী লইয়া ভবানীপুর থানার বড়বাবুর নির্দেশে, দাশ ভবনের দ্বিতলের শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইয়া মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈয়ারী করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরিবারের নিকট হইতে জানা যাইল মৃতার নাম প্রিয়া দাশ, স্বামীর নাম নীল দাশ, পোস্ট অফিস ও থানা ভবানীপুর, জিলা কলিকাতা। শ্বশুর ববি দাশ, পুত্র আকাশ দাশ এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান অনুযায়ী গতকাল অর্থাৎ বারোই অগস্ট, সন দু’ হাজার বাইশ, রাত নয়টা নাগাদ আহার গ্রহণ করিয়া প্রিয়া দাশ নিজ শয়ন কক্ষে চলিয়া যান। আজ ভোর ছটার সময় সেবিকা আলো হালদার তাঁকে মৃত হিসাবে দেখিতে পান।

‘মৃতার চুলের রং কালো, গড়ন মাঝারি, সিঁথিতে সিঁদুর নাই। হাতে শাখা ও পলা নাই। উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পরনে হলুদ রঙের শাড়ি, নীল রঙের ব্লাউজ, সাদা রঙের পেটিকোট ও অন্তর্বাস। পায়ে জুতা। মৃতার মাথা উত্তর দিকে ও পা দক্ষিণ দিকে। দুই হাত অর্ধ মুঠি। চোখ অর্ধ খোলা। মৃতার শরীরের কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নাই। মৃতাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম যে মাসিক হয় নাই এবং মলদ্বারে পায়খানা রহিয়াছে। মৃতার ছবি তোলা হইয়াছে। মৃতার স্বামী এবং গাড়িচালক তাঁহাকে বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে লইয়া গেলে চিকিৎসক মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য কনস্টেবল নং ১২৭, সুব্রত প্রামাণিককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের মর্গে প্রেরণ করিলাম।’

ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট পড়ে মুচকি হেসে দীপশিখা বলল, “পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল, আপনারা এখনও ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের ভাষা বদলাতে পারলেন না। এখনও সেই হাতে লেখা, সাধুভাষায় রিপোর্ট? এখনও সেই ‘উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম মাসিক হয় নাই’-এর মতো হাস্যকর ল্যাঙ্গোয়েজ? একটু আপডেটেড হোন প্লিজ়!”

ডেডবডির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছিল বরুণ। দীপশিখার শ্লেষাত্মক মন্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে চোয়াল চেপে বলল, “এই পিএম-এর ভিডিয়োগ্রাফি হবে। আমি ক্যামেরা নিয়ে এসেছি,” তারপর মৃতদেহের দিকে ক্যামেরা তাক করল।

ক্যামেরার সামনে পোস্ট মর্টেম করায় দীপশিখা অভ্যস্ত। বিশেষ কিছু কেসে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ থাকে ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ের জন্যে। কখনও কখনও পুলিশ বিভাগ থেকেও অনুরোধ আসে ভিডিয়োগ্রাফির। ছবি তোলার ব্যবস্থা করে পুলিশ বিভাগ।

দীপশিখা বলল, “ভিডিয়ো তোলা হয়ে গেলে আমায় একটা কপি দেবেন।”

বরুণ ঘাড় নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

দীপশিখা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলতে শুরু করল, “আমি, ডক্টর দীপশিখা মুখার্জি, বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, ইউডি কেস নম্বর ২০১/২২-এর পোস্ট মর্টেম শুরু করলাম,” মৃতদেহের পোশাক খুলতে খুলতে বলল, “ভিক্টিমের নাম প্রিয়া দাশ, বয়স— ইনকোয়েস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী— সাতচল্লিশ। পরনে শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ়, ব্রা এবং ডেনিমের শু। সেগুলো এগজ়িবিট হিসেবে আলাদা আলাদা প্যাকেটের মধ্যে রাখা হল।”

রাজু জ়িপলক লাগানো পাঁচটা প্লাস্টিকের পাউচ এগিয়ে দিয়েছে। ক্যামেরার সামনে প্রতিটি পোশাক ভাল করে দেখিয়ে পাউচের মধ্যে ভরে, কালো মার্কার পেন দিয়ে দীপশিখা লেখে, এগজ়িবিট ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ। কাজ শেষ হলে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলে, “ডেডবডির শরীরে একাধিক ট্যাটু আছে। আমি ক্যামেরা অপারেটরকে অনুরোধ করব সেগুলোর ক্লোজ় শট নিতে।”

ভুরু কুঁচকে ক্লোজ় শট নিচ্ছে বরুণ। প্রিয়ার কব্জিতে, বাহুর উপর দিকে, কনুইয়ের পিছনে, দুই স্তনের মাঝখানে, পিঠে, গোড়ালি বরাবর নানা রকম সংখ্যা, হরফ আর ছবি লেখা বা আঁকা রয়েছে। দেখে বেশ অবাক লাগল দীপশিখার। একজন চিকিৎসকের শরীরে এতগুলো ট্যাটু দেখে কেমন যেন লাগে...

না! সে জাজমেন্টাল হবে না। লম্বা, ধারালো ছুরি দিয়ে ডেডবডির বুকের উপরে ‘ওয়াই’ হরফের মতো ছুরি চালায় দীপশিখা। একই সঙ্গে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, “বিল্ট মিডিয়াম, রাইগর মর্টিস প্লাস। নো এক্সটার্নাল ইনজুরি...”

কাজ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। দীপশিখা বলল, “ফুড পার্টিকল ইন স্টম্যাক। কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ নেই। ভিসেরা প্রিজ়ার্ভ করা হল কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্যে।”

‘ভিসেরা’ হল শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শরীরে বিষের উপস্থিতির প্রমাণ খুঁজতে সেগুলো রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

পাকস্থলী, দুটো বৃক্ক আর যকৃতের অংশ ছুরি দিয়ে কেটে, কাচের জারে ভরে দীপশিখা বলল, “হার্টের বাঁদিকের চেম্বার খালি কিন্তু ডানদিকের চেম্বারে রক্ত রয়েছে। অর্থাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে প্রিয়া দাশের,” তারপরে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে মাথার খুলি ফাটাবে বলে রেডি হল। খুলিতে ছেনি ঠেকিয়ে হাতুড়ি মারার ঠিক আগে বরুণ হঠাৎ আঙুলের ইশারায় দীপশিখাকে ডেডবডির মাথা দেখতে বলল।

খুঁটিয়ে দেখে দীপশিখার ভুরু কুঁচকে গেল। মাথার চামড়ার এক জায়গায় এক ফোঁটা রক্ত জমে আছে।

বরুণ হাত আর ঠোঁট নেড়ে ইশারায় বলল, ‘সুচ ফোটালে এরকম দাগ হয় না?’

ঠোঁট নেড়ে জিজ্ঞাসার কারণ, ভিডিয়োয় তার কণ্ঠস্বর যেন না-আসে।

দীপশিখা মন দিয়ে দাগটা দেখছে আর ভাবছে। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল, “মাথায় একটা নিড্‌ল প্রিক ইনজুরি আছে। স্ক্যাল্পের চামড়া আর ব্লাড

স্যাম্পল কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্যে পাঠানো হবে।"

ময়না তদন্তের কাজ আরও পাঁচ মিনিট চলল। ভিসেরা আর ব্লাড স্যাম্পল প্রিজ়ার্ভ করার কাজ চুকিয়ে দীপশিখা ইশারা করল ক্যামেরা বন্ধ করার জন্যে। বরুণ ক্যামেরা বন্ধ করতে রাজু মোটা সুতো আর সুচ নিয়ে মৃতদেহ সেলাইয়ের কাজ শুরু করল।

এপ্রন, মাস্ক, গ্লাভস খুলতে খুলতে দীপশিখা বলল, "অন ক্যামেরা বলিনি। এটা মার্ডার। মাথার শিরায় ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে। যা থেকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।"

"কোন ড্রাগ ইঞ্জেকশন দিলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে?" জিজ্ঞেস করে বরুণ।

"অনেক ড্রাগ আছে। কিন্তু কীভাবে খুন হয়েছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কে খুন করেছে?" মর্গ থেকে বেরোচ্ছে দীপশিখা, "এই খুন এমন লোকের কাজ যে ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়ায় পোক্ত। ডাক্তার, সিস্টার, ফার্মাসিস্ট, কম্পাউন্ডার, কোয়াক— যে কেউ হতে পারে।"

দোতলায় এসে ক্যামেরা থেকে মেমরি কার্ড বের করে দীপশিখার দিকে এগিয়ে দিল বরুণ, "ভিক্টিম বাদ দিলে পুনশ্চয় গত রাতে দু'জন ডাক্তার, একজন নার্স, একজন কাজের লোক আর দু'জন ভাড়াটে ছিলেন। ভিক্টিমের ছেলেও ছিল। সে মাইনর।"

"নার্স কেন ছিলেন?" মেমরি কার্ড নিজের ডেস্কটপে গুঁজে ভিডিয়ো কপি করছে দীপশিখা।

"দুই নার্স মিলে চব্বিশ ঘণ্টা থাকেন প্রিয়ার শ্বশুর ববি দাশকে দেখাশোনা করার জন্যে। ওঁদের নাম আলো হালদার আর নীলিমা মণ্ডল। কাল রাতে পুনশ্চয় ছিলেন আলো। ওঁরা ছাড়া পুনশ্চয় কাল রাতে ছিলেন ড্রাইভার মিলন মল্লিক আর দু'জন ভাড়াটে।"

মেমরি কার্ড কম্পিউটার থেকে বের করে বরুণের হাতে তুলে দিল দীপশিখা, "ঘুমন্ত অবস্থায় মাথায় ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে। এর মানে হল ভিক্টিমকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। এই কাণ্ড বাড়ির কেউ করেছে।"

"পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কবে পাব?"

"রিপোর্টের জন্যে মোটেই তাড়া দেবেন না!" গজগজ করে দীপশিখা, "কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্যে ভিসেরা আর ব্লাড স্যাম্পল যাবে 'সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি' বা 'সিএফএসএল'-এ। রিপোর্ট আসতে সপ্তাহ খানেক লাগবে।"

"অত সময় দেওয়া যাবে না!" পকেট থেকে মোবাইল বের করে বরুণ, "হাই প্রোফাইল কেস। যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট কমপ্লিট করুন। বাকিটা আমি দেখছি।"

"আমি নিজেকে সেফ জায়গায় রেখেই আপনাকে হেল্প করব," কঠিন গলায় বলে দীপশিখা, "ভিসেরা আর ব্লাডের রিপোর্ট না-আসা পর্যন্ত পিএম রিপোর্ট লিখব না। লিখতে বাধ্য করলে এমন ভাবে লিখব যে ফাইনাল ডায়াগনসিস জানা যাবে না।"

বরুণের ফোন এসেছে। কানে মোবাইল গুঁজে বলল, "শোনো সুব্রত, 'দিনরাত' আর 'দ্য টেলিগ্রাম'-এর জার্নালিস্টদের স্পেশ্যাল খাতির করো। মিনতিকে বলো ভাল সিঙাড়া আর কফি আনাতে। আমি আসছি।"

"মিডিয়া এর মধ্যে মার্ডারের গন্ধ পেয়ে গেল?" দীপশিখা অবাক।

"মার্ডারের গন্ধ নয়। এটা অন্য ব্যাপার," ফোন কেটেছে বরুণ, "থানার মালখানা কাকে বলে জানেন?"

"ক্রাইম সিন থেকে পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা মালপত্র থানার যে ঘরে বা বিল্ডিংয়ে জমা থাকে।"

"পুলিশের সঙ্গে থেকে অনেক কিছু জেনে গেছেন!" হাসল বরুণ, "ভবানীপুর থানায় ট্রান্সফার হয়ে আসার পরে মালখানা সাফ করছিলাম। জঞ্জালের মধ্যে থেকে অনেক পুরনো ডকুমেন্ট উদ্ধার করা গেছে।

এপ্রন, মাস্ক, গ্লাভস খুলতে খুলতে দীপশিখা বলল, "অন ক্যামেরা বলিনি। এটা মার্ডার। মাথার শিরায় ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে। যা থেকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।"
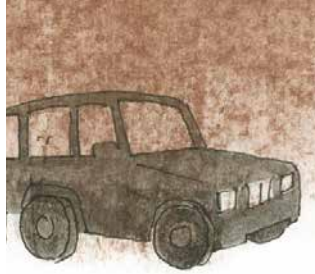
সেগুলো ইনডেক্সিংয়ের কাজ চলছে। শেষ হলে পুলিশ মিউজ়িয়ামে পাঠাব। এই বিষয় নিয়ে প্রেস মিট আছে।"

"টিভিতে আপনাকে দেখাবে? আপনি তো সেলেব মশাই!" আওয়াজ দিল দীপশখা।

বরুণ না-শোনার ভান করে বলল, "কালকের মধ্যে পিএম রিপোর্ট না-পেলে ওপরমহল থেকে ফোন আসবে!"

"আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই," দীপশিখা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

## ৩

বুলুদির কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভাঙতেই দীপশিখার মনে পড়ল, গত সপ্তাহে সৈকত ফোনে জানিয়েছিল, এই সপ্তাহে পুরুলিয়া থেকে ফিরবে না। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে আবার শুল সে।

বিছানাতেই দু'বার চা, বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতে কাগজ পড়া। বিছানাতেই লুচি, আলুচচ্চড়ি, ডবল ডিমের ওমলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট। বুলুদি সব কাজ চুকিয়ে ঘোষণা করল, "আমি চললাম। গতর নাড়াও। পেটেরটার কথা ভাবো। বাসি কাপড় পরে থেকো না। ওতে অকল্যাণ হয়।"

বুলুদির কথায় পাত্তা দেয়নি দীপশিখা। বুলুদি চলে যাওয়ার পরে মোবাইল টেনে নিল। আজ চোদ্দোই অগস্ট, রোববার। এখন সকাল সাড়ে ন'টা। হোয়াটসঅ্যাপে সৈকতের মেসেজ এসেছে। গতকাল রাতে ঘুমিয়ে পড়ার ইমোজি আর ভোর ছ'টায় জগিং করার ইমোজির পরে দীপশিখার পাঠানো পরিবারের ইমোজি টেনে লিখেছে, "ইজ় ইট আ গার্ল চাইল্ড?"

দীপশিখা লিখল, "হ্যাঁ," তারপরে মোবাইল বিছানায় রেখে বাথরুমের দিকে এগোল। ব্যস! অমনি ফোনের কলকলানি শুরু হয়ে গেল। বরুণ ফোন করেছে। বিরক্তির সঙ্গে ফোন ধরে দীপশিখা বলল, "ছুটির দিনে কী দরকার?"

"ছুটির দিন বলেই ফোন করলাম। আমি পুনশ্চ-য় যাচ্ছি। আপনি যাবেন?"

দীপশিখা শব্দ করে হেসে বলল, "আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই যে খুনের গন্ধ পেলে দৌড়ব। তা ছাড়া ওখানে যাওয়াটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না।"

"ফরেনসিক এক্সপার্ট হিসেবে ক্রাইম সিনে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। মাথামোটা পুলিশের লেখা ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট পড়ে কেন পিএম রিপোর্ট লিখবেন?"

বরুণের ঠেস দেওয়া মন্তব্য হজম করে দীপশিখা, "ওই বাড়ির প্রায় সবাই ডাক্তার। কার কী অধিকার, তা নিয়ে সচেতন। হুট করে আমাকে অপমানজনক কিছু বলে দিলে?"

"আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি যেতে। ওই বাড়ির সবাই সাসপেক্ট। সবাই মুখে সেলাই করে বসে আছেন আর ওপরমহলে ক্যাচ মারছেন। আমার কাছে কাউন্সিলর গুড্ডুদার ফোন এসেছে কেস ক্লোজ় করে দেওয়ার জন্যে।"

"ওহ! এর মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গেছে? তা হলে আর কী? ফাইল ক্লোজ় করুন।"

"সেটা করার জন্যে আপনাকে পিএম রিপোর্ট লিখতে হবে। তার জন্য প্লেস অফ অকারেন্সে যেতে হবে। চলে আসুন। আপনার ফ্ল্যাটের নীচে দাঁড়িয়ে আছি।"

দীপশিখা অবাক হল। এটা ঠিক যে বরুণ নর্থ সিটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে পাঁচ বছর আগে এসেছিল। কিন্তু লোকটা ভাবল কী করে যে সে এখনও এখানেই থাকে?

"বরানগর থানায় ফোন করে আপনার ঠিকানা কনফার্ম করে এলাম," হাসল বরুণ, "আপনি প্লিজ় আসুন।"

"আধ ঘণ্টা!" গম্ভীর গলায় বলল দীপশিখা। সকালের রুটিন চুকিয়ে নীচে

নামার সময় মনে পড়ল পাঁচ বছর আগে বরুণের সঙ্গে স্বল্প সময়ের বন্ধুত্বের কথা। লোকটা কোথায় থাকে? ওর বৌ কী করে? বাচ্চা ক'টি? বরুণের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না দীপশিখা।

*

মোহিনীমোহন স্ট্রিট আর পদ্মপুকুর রোডকে জুড়েছে যে ক'টা রাস্তা, তার মধ্যে একটা হল অভয় সরকার স্ট্রিট। সেই রাস্তার উপরে পেশি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দাশ পরিবারের বাসভবন, পুনশ্চ। বিশাল বড় তিনতলা বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ ভাল ভাবেই হয়। দেখলে বোঝা যায়, বাসস্থানের মালিক বনেদি বড়লোক।

বাড়ির সামনে বড় রাস্তা আর বাকি তিন দিকে সরু গলি। পুনশ্চর সদর দরজার দু'দিকে রয়েছে দু'টি করে দোকান ও গ্যারেজ। গ্যারেজদু'টির শাটার নামানো। আন্দাজ করা যায়, ভিতরে দাশ পরিবারের গাড়ি রয়েছে। দু'টি দোকানের একটির নাম 'পশ কিটেন'। সেটি ট্যাটু পার্লার। অন্যটির নাম 'সিয়া-জ়া।' সেটি মেয়েদের পোশাকের বুটিক। রবিবার বেলা বারোটা নাগাদ দু'টিই খোলা।

অভয় সরকার স্ট্রিটে পুলিশের জিপ রেখে বরুণ বলল, "এই রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে নজরদারি ক্যামেরা লাগানো আছে। গুড!" তারপর কলিং বেল বাজাল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বছর পঁয়ত্রিশের দাড়ি-গোঁফ কামানো, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার একজন লোক দরজা খুলে বরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আসুন স্যর।"

ভিতরে ঢুকে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বরুণ বলল, "ইনি হলেন মিলন মল্লিক। এই বাড়ির বাজার সরকার, ঠাকুর, পরিচারক, ড্রাইভার... অর্থাৎ অল ইন ওয়ান।"

শার্ট-প্যান্ট আর হাওয়াই চপ্পল পরা মিলন বললেন, "আপনারা ওপরে আসুন।"

দীপশিখা এর মধ্যেই দেখে নিয়েছে, একতলার অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে দু'টি গ্যারেজ, বুটিক আর পার্লার। বাকি জায়গায় দালান আর সিঁড়ি ছাড়া তিনটে ঘর রয়েছে। সব ঘরেই তালা লাগানো।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই বসার ঘর। বিশাল বড় ড্রয়িং রুমের ঠিক মাঝখানে পেল্লায় একটা সেন্টার টেবিলের চার দিকে সোফা, চেয়ার, টুল আর মোড়া ছড়ানো। ঘরের দেওয়াল জুড়ে অজস্র সাদা-কালো আর রঙিন পারিবারিক ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো। খড়খড়ি দেওয়া জানলায় ঝুলছে গাঢ় রঙের পর্দা। ঘরময় দেশ-বিদেশের শো-পিস আর ইন্ডোর প্লান্ট। একদিকের দেওয়ালের গায়ে লাগানো কনসোল টেবিল। পুরনো আমলের আসবাবপত্র বাড়ির অন্দরসজ্জার সঙ্গে দিব্যি যাচ্ছে।

সোফায় সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ গোলগলা টি-শার্ট আর থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরে সংবাদপত্রে সুদোকু সমাধান করছেন। চোখের মণি সবুজ। দীপশিখার মনে পড়ল, ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে লেখা ছিল, প্রিয়ার শ্বশুরের নাম ববি দাশ।

ববিকে দেখে বোঝা যায় তিনি কম বয়সে লম্বা, ফরসা এবং হ্যান্ডসাম ছিলেন। বয়সের কারণে চেহারা ছোট এবং খাটো হয়ে গেলেও রঙের জেল্লা যায়নি। তাঁর দিকে তাকিয়ে মিলন বললেন, "বড়বাবু, এঁরা থানা থেকে এসেছেন।"

বরুণ সোফায় বসে বলল, "স্যর, আর একবার এলাম। আমার সঙ্গে এসেছেন বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের অটপ্সি সার্জেন ডক্টর দীপশিখা মুখার্জি। উনিই পোস্ট মর্টেম করেছেন।"

"পোস্ট মর্টেম? কেন?" দীপশিখার দিকে ভ্যাবলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ববি। দীপশিখা খেয়াল করল ওঁর দৃষ্টি এবং কথা বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু আছে, যা থেকে মনে হয় উনি অসুস্থ।

ববির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দীপশিখা বলল, "কেন পোস্ট মর্টেম, সেটা পুলিশ জানে। আমি সেই কারণে আসিনি। প্রিয়া ম্যামের পেশেন্ট হিসেবে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।"

খবরের কাগজ টেবিলে রেখে ববি বললেন, "ও!"

ববির কথার মধ্যে বসার ঘরে ঢুকেছেন বছর পঁয়তাল্লিশের এক ভদ্রলোক। ইনিও লম্বা, ফরসা এবং সুপুরুষ। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, পায়ে বাহারি চপ্পল, হাতে বাংলা খবরের কাগজ 'দিনরাত।' দীপশিখার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললেন, "বরুণ আমাকে বলেছেন যে আপনি আসবেন। আমি নীল দাশ। প্রিয়ার স্বামী।"

দীপশিখা বলল, "ম্যাডামের কোনও ছবি আছে?" হাতে ধরা পুষ্পস্তবক দেখিয়ে বলল, "এইটা রাখতে চাই।"

বরুণের সঙ্গে পুনশ্চয় আসার সময় প্রিয়ার কাছে মানসিক চিকিৎসা করানোর গল্পটা বানিয়েছে দীপশিখা। এতে ঘরোয়া বাতাবরণ তৈরি হবে। ফ্লাওয়ার বুটিক থেকে 'ফরগেট মি নট' ফুলের তোড়াও কিনেছে।

"আপনি এদিকে আসুন," বসার ঘরে ঢুকে দীপশিখাকে বললেন ছোটখাটো চেহারার এক মহিলা। শ্যামলা গায়ের রং, খর্বুটে চেহারা, পরনে সাদা শাড়ি আর নীল ব্লাউজ়, পায়ে নীল চপ্পল। দীপশিখা আন্দাজ করল, ইনি দিনের নার্স নীলিমা মণ্ডল। রাতের সেবিকা আলো হালদার ডিউটি সেরে চলে গেছেন।

নীলিমার ইশারায় দেওয়াল সংলগ্ন কনসোল টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল দীপশিখা। দেখল প্রিয়ার সাম্প্রতিক একটি ফটো ফ্রেমে বাঁধিয়ে টেবিলের উপরে রাখা রয়েছে। ফ্রেমে একগাদা মালা পরানো। সামনে ফুলের স্তূপ। মেঝেতেও ফুল, ধূপকাঠির বাক্স, মিষ্টির প্যাকেট রাখা রয়েছে।

নীল ফুলের তোড়া ফটোর সামনে রাখতে গিয়ে দীপশিখার নজর গেল দেওয়ালে ঝোলানো একটি ফটোর দিকে। ফ্রেমে বাঁধানো সাদা-কালো ফটোয় সময়ের প্রহারে সিপিয়া রং চলে এসেছে। বিশাল চেহারার এক ব্যক্তি ধুতি-পাঞ্জাবি এবং টোপর পরে ক্যামেরার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বেনারসি শাড়ি, কনে চন্দন আর চেলি পরা এক মহিলা। গলায় রজনীগন্ধার মালা। তাঁর চেহারায় নরম ভাব অনুপস্থিত। জাঁহাবাজ, খান্ডারনি, ঝগড়ুটে টাইপ মনে হচ্ছে।

দীপশিখা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি সময় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ শুনল, ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে নীল বলছেন, "আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুমার বিয়ের সময় তোলা ছবি। পল আর লীলা দাশ। দু'জনেই মারা গেছেন।"

"ওঁরা ডাক্তার ছিলেন?" জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

নীল 'হ্যাঁ' আর 'না'-এর মাঝামাঝি ঘাড় নাড়লেন। তার মধ্যেই সোফা থেকে ববি বললেন, "খিদে পেয়েছে।"

দীপশিখা আর নীল সোফার কাছে ফেরত আসছে। নিচু গলায় নীল বললেন, "বাবার বয়স ছিয়াত্তর। কিছুদিন ধরে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রিয়াই ডায়াগনসিস করে যে বাবার ডিমেনশিয়া ডেভেলপ করছে। ওষুধ এবং অন্যান্য চিকিৎসা চলছে..."

এতক্ষণে দীপশিখা বুঝতে পেরেছে ববির দৃষ্টি আর কথা বলার মধ্যে বেবভুল ভাব কেন। সে বলল, "সুদোকু করছিলেন ওই কারণেই?"

"সুদোকু, ক্রসওয়ার্ড পাজ়ল, ওয়ার্ড আর নাম্বার গেম। ডিমেনশিয়া আটকানোর জন্যে সব কিছুই চলছে। কিন্তু খুব কুইক সিচুয়েশন খারাপ হচ্ছে," সোফায় বসে নীল বললেন, "আপনি এসে ভালই করেছেন। পিএম রিপোর্টটা প্লিজ় তাড়াতাড়ি লিখে দিন। প্রিয়ার লাইফ ইনসিয়োরেন্স পলিসি ও অন্যান্য ফিনান্সিয়াল ম্যাটারের জন্যে লাগবে।"

দীপশিখা সোফায় বসে আড়চোখে বরুণের দিকে তাকাল। সে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করল, 'এবার?'

বরুণ সাহায্য চাইছে। দীপশিখা সাহায্য করবে। গভীর শ্বাস নিয়ে বলল, "প্রিয়ার মাথায় নিড্‌ল প্রিক ইনজুরি আছে। যার মানে হল, মৃত্যুর আগে ওঁর স্ক্যাল্প ভেনে কোনও ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করা হয়েছিল। এটা কী করে হল, কেউ বলতে পারবেন?"

সোফা থেকে নড়বড় করে উঠে দাঁড়িয়েছেন ববি। নীলিমা তাঁকে ধরে ধরে ডাইনিং রুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। নীল ভুরু কুঁচকে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"আমি কিছুই বলতে চাইছি না," তড়িঘড়ি বলে দীপশিখা। সে যে প্রিয়ার পেশেন্ট ছিল না, এই কথাটা মাথায় ঘুরছে। এই কেস আদালত পর্যন্ত গড়াবেই। সেক্ষেত্রে তাকে বিরোধী পক্ষের উকিলের জেরার মুখে পড়তে হবে। মিথ্যে কথা বলেছে এটা প্রমাণিত হলে 'হস্টাইল উইটনেস' বা 'মিথ্যেবাদী সাক্ষী' বলা হবে। তার সাক্ষ্যে আর বিশ্বাস রাখবে না আদালত। ময়না তদন্তের রিপোর্টও বাতিল হবে। এত পরিশ্রম জলে যাবে।

"আমি সবার সঙ্গে আর একবার কথা বলতে চাই," দীপশিখাকে বাঁচাতে বরুণ বিনীত ভাবে বলছে, "বুঝতেই তো পারছেন, মিডিয়ার চাপ আছে। কলকাতার অন্যতম বনেদি বাঙালি পরিবারের নাম নিয়ে কাটাছেঁড়া হোক, সেটা চাই না। আজকাল গোদের ওপরে বিষফোড়া হয়েছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়া। কী ভাবে যে খেলা ঘুরিয়ে দেবে, সে শুধু জুকারবার্গই জানেন!"

নীল মার্কিনি অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বললেন, "মিডিয়া হোক বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়া— নিউজ় লিক করলে ধরে নেব, সেটা আপনি করেছেন। যা করবেন ভেবেচিন্তে করুন। দাশ পরিবারকে সম্মান করে এমন লোক শুধু বেঙ্গল লেভেলে নেই। দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে যে সব আইএএস অফিসার ঘোরেন, তাঁরা এবং তাদের বাবা-কাকারা আমার আর বাবার বন্ধু।"

নীলের শাসানি শুনে ঘাবড়ালেও দীপশিখা বিনীত ভাবে বলল, "স্ক্যাল্প ভেনে নিড্‌ল প্রিক কীভাবে হতে পারে? কোনও আইডিয়া?"

"ইট্‌স আ ক্লিয়ার কেস অফ সুইসাইড। আপনারা অকারণে কমপ্লিকেট করছেন," দীপশিখার দিকে তাকিয়ে গনগনে চোখে বললেন নীল। একটু থেমে, মাথা নিচু করে বললেন, "কয়েক মাস ধরে প্রিয়ার মধ্যে নানান চেঞ্জ এসেছে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে এমন সব ঘটনা ঘটাচ্ছিল, যেগুলো আমার অন্তত স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি।"

নীলের আগ্রাসী ব্যবহারে বদল আসায় বরুণ নড়েচড়ে বসেছে, "কীরকম চেঞ্জ? কী কী ঘটাচ্ছিলেন?"

নীলের মুখের ভূগোলে ভাঙচুর শুরু হয়েছে। কান্না চাপার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। হাতের পাতার উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "শুধু আমি নয়, বাড়ির সবাই চেঞ্জগুলো খেয়াল করেছে। একের পর-এক ট্যাটু করাচ্ছে, দ্যাট টু ইন প্রাইভেট পার্টস..."

"আমি দেখেছি," বলল দীপশিখা। গতকাল ময়না তদন্তের সময় তারও একই কথা মনে হয়েছিল।

"দাশ পরিবারের বৌ হয়ে, ডাক্তার হয়ে, চোদ্দো বছরের ছেলের মা হয়ে এই সব ছেলেমানুষি মানায় না। চুলে নীল রং করেছে, নোজ় রিং আর আই-ব্রাও রিং পরছে, এক কানে ইয়ার স্টাড ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, অদ্ভুত সব পোশাক পরছে..."

"অদ্ভুত পোশাক বলতে?" জিজ্ঞেস করল বরুণ।

"গায়ে তো বটেই, শাড়ি, ব্লাউজ় আর ডেনিমের জুতোয় অদ্ভুত সব কথা লেখা থাকে। আই মিন... থাকত।"

বরুণ বলল, "যেমন?"

"রোমান হরফ, বাংলা হরফ, ইংরেজি সংখ্যা মিলিয়ে ভুলভাল সব কথা। 'U2,' 'বিন্দাস বং,' 'AK/47,' 'ডাইনিবুড়ি,' 'UD/12/50/Bhawa,' 'ল্যাদখোর,' '1up/2down,' 'দম রাখো, খেলা ঘুরবে,' 'AC/DC', 'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না'... আর কত বলব? আমার ধারণা, ও ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছিল।"

"কেন এরকম মনে হল?" নিজের নেশাগ্রস্ত অতীত নিয়ে শঙ্কিত দীপশিখা প্রশ্নটা করতে বাধ্য হল।

"ও নিয়মিত ঘুমের ওষুধ আর অ্যান্টি ডিপ্রেস্যান্ট পিল খেত। ওর টেবিলে সে সব রাখা আছে। প্লাস, এটা হতে পারে যে ও কোনও অনলাইন সিক্রেট গ্রুপের পাল্লায় পড়েছিল, যারা আত্মহত্যা প্রোমোট করে। 'ব্লু হোয়েল' টাইপের গেম। নিজের স্ক্যাল্প ভেনে ড্রাগ ইনজেক্ট করাটা শেষ টাস্ক ছিল।"

নীলের ব্যাখ্যা শুনে দীপশিখা অবাক হয়ে বরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, "নিজের স্ক্যাল্প ভেনে কেউ ইঞ্জেকশন দিতে পারে? পারা সম্ভব?"

তার কথা বরুণ শুনতে পেলেও গুরুত্ব দেয়নি। সে ডাইনিং রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইয়েস আকাশবাবু! এদিকে এসো।"

ঘরে ঢুকছে বছর চোদ্দোর এক কিশোর। লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট কিন্তু মুখটি শিশুর মতো। টুকটুকে ফরসা গায়ের রং, একমাথা রেশমের মতো চুল, লালচে ঠোঁট। পরনে বাড়িতে পরার ঢিলেঢালা পোশাক। ছেলেটির মুখ দেখলে 'মাসুম' সিনেমার যুগল হংসরাজের কথা মনে পড়ে। দীপশিখার মনে হল, বালক যিশু খ্রিস্ট!

আকাশের চোখ ফোলা। বোঝা যায় যে কাঁদছিল। বরুণ তাকে পাশে বসিয়ে বলল, "মায়ের জন্যে মন খারাপ?"

"খুব!" মাথা নিচু করে ঠোঁট চিপে বলল আকাশ।

"তোমার মা আত্মহত্যা করতে পারেন বলে মনে হয়?"

"আমি কী করে বলব?" অসহায়ভাবে বাবার দিকে তাকায় আকাশ।

নীল তাকে কাছে টেনে নেন। বাবার কাঁধে মাথা রেখে আকাশ বলে, "মা কী রকম যেন হয়ে গিয়েছিল।"

"কী রকম?" জানতে চাইল দীপশিখা।

"দিনের পর দিন নিজের ঘর থেকে বেরোত না, চান করত না, মিনারেল ওয়াটার আর ড্রাই ফুড খেয়ে থাকত। টপাটপ ঘুমের ওষুধ খেত। গত এক সপ্তাহ চান করেনি। একটাই শাড়ি পরে থাকত।"

নীল উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ড্রয়িংরুমে এখন দীপশিখা, বরুণ আর আকাশ। বরুণ জিজ্ঞেস করল, "মায়ের এরকম ব্যবহারের কারণ কী হতে পারে?"

"জানি না!" মাথা নিচু করে বলল আকাশ, "মা নরমাল ব্যবহার করছিল না।"

দীপশিখার ফোন বাজছে। রেডিয়োলজির মেধা ফোন করেছে। ফোন ধরে দীপশিখা নিচু গলায় বলল, "চটপট বল।"

"মন্দিরা ম্যাম কি রিপোর্ট দেখেছেন?"

"আমার ইউএসজি রিপোর্ট? এখনও দেখেননি। কেন রে?"

"রিপোর্টে আমি ভুল করে তোর বয়স সাতাশ বছর লিখে ফেলেছি।"

"কাম অন মেধা," হেসে ফেলেছে দীপশিখা, "ডিপ্লোম্যাটিক হতে গেলে মেয়েদের জন্মতারিখ মনে রেখে জন্মসাল ভুলে যেতে হয়। তুই দেখছি ডিপ্লোম্যাটিক! এনিওয়ে, আমি এখন সাঁইত্রিশ। আর আমার প্রেগন্যান্সিটা হাই রিস্ক। তুই ফ্রেশ রিপোর্ট রেডি কর। আমি কাল তোর থেকে রিপোর্টটা নেব।"

কথা শেষ করে ফোন কাটল দীপশিখা। আকাশের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "নরমাল ব্যবহার নয় মানে অ্যাবনরমাল ব্যবহার। সেটা কীরকম? উদাহরণ দাও।"

"অনেক এগজ্যাম্পল আছে। ডাক্তার হয়ে, সাতচল্লিশ বছর বয়সে ফানি ওয়ান লাইনার লেখা শাড়ি পরা মানায় না। রক ব্যান্ডের নাম লেখা ট্যাটু সারা গায়ে করানো মানায় না। যখন তখন স্লিপিং পিল খাওয়া মানায় না। সিয়াদি আর আলপথদার পাল্লায় পড়ে মা বিগড়ে গেছে।"

"আকাশ কাদের কথা বলছে?" বরুণকে জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

"একতলার দুই ভাড়াটে। আলপথ রায় আর সিয়া কপূর," ডাইনিং রুমের দরজা থেকে কর্কশ গলায় বললেন নীলিমা।

## ৪

"ওদের সঙ্গে আলাপ করার আগে আপনার সঙ্গে একবার কথা বলে নিই? আপনিই নীলিমা মণ্ডল?" জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

"হ্যাঁ," একমুখ বিরক্তি নিয়ে বললেন নীলিমা, "আমি আর আমার বন্ধু আলো হালদার সরকারি হাসপাতালে নার্স ছিলাম। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি দু'বছর আগে। দু'জনেই কালীঘাটে থাকি। বাড়িতে বসে শরীরে জং ধরে যাচ্ছিল বলে দু'জনে মিলে এই বাড়িতে নার্সিংয়ের কাজ করি। একজন দিনের ডিউটি করি, অন্যজন রাতের। এক সপ্তাহ পরে শিফ্‌ট বদলে নিই।"

"আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?"

"আমি একা থাকি। স্বামী মারা গেছেন এক বছর আগে। মেয়ে বেঙ্গালুরুতে," এখনও মুখে বিরক্তি নীলিমার। দীপশিখা খেয়াল করল কর্কশ ব্যবহার আর বিরক্তি হচ্ছে মুখোশ। উনি আদতে শান্ত স্বভাবের মানুষ। সে জিজ্ঞেস করল, "আলো হালদারের বাড়িতে কে কে আছেন?"

"ওর বরও মারা গেছে দেড় বছর আগে। ছেলে পুনেয় চাকরি করে।"

"প্রিয়া মারা যাওয়ার রাতে কে ছিলেন?"

"আলো।"

নীলিমার দিকে তাকিয়ে বরুণ বলল, "আলো হালদারকে এক্ষুনি আসতে বলুন," তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। পিছন পিছন

আসছেন মিলন আর দীপশিখা।

'পশ কিটেন' ট্যাটু পার্লারে ঢুকে দীপশিখা অবাক। বিউটি পার্লারের মতো দেখতে ঘরে চারটি চেয়ার পাতা। সেগুলোয় দাঁত তোলা হয় না চুল কাটা হয়— বোঝার উপায় নেই। দেওয়ালময় গাদা গাদা ট্যাটুর ডিজ়াইন ফ্রেমবন্দি হয়ে ঝুলছে। দেওয়ালে নজরদারি ক্যামেরা লাগানো। তার ঠিক নীচে একটি পোস্টার, 'প্লিজ় স্মাইল। ইউ আর বিইয়িং ফটোগ্রাফড!'

একটি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে রয়েছে হট প্যান্ট আর ক্রপ্‌ড টপ পরা একটি মেয়ে। তার জঙ্ঘায় টেরোড্যাক্টাইল এঁকে দিচ্ছে যে ট্যাটুশিল্পী, সে মুখ না-ঘুরিয়ে বলল, "জাস্ট আ সেক। আমার কাজ নিয়ারলি ওভার।"

বরুণ দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ফটোগুলো দেখতে লাগল। দীপশিখা চেয়ারে বসে মাপতে লাগল আলপথ রায়কে।

পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা ছেলেটার গড়ন রোগার দিকে। মুখময় ট্রিম করা দাড়িগোঁফ। চুলে বাজ় কাট। পরনে রিপ্‌ড ডেনিম, টি-শার্ট আর স্নিকার্স। আলপথ কাজ সেরে দীপশিখার দিকে ঘুরে বলল, "মে আই নো হু ইউ আর!"

এই রকম বঙ্গসন্তান নিজের যৌবনকালে দেখেনি দীপশিখা। যতই অ্যাংলিসাইজ়ড ছেলে হোক না কেন, তার সময়ের যুবকদের চোখে স্বপ্ন থাকত, একটু-আধটু পাগলামো থাকত। এ সেরকম নয়। এ প্রতিটি কথা বলছে মেপে। বুঝে নিতে চাইছে, কিছু পাওয়া যাবে? না কিছু দিতে হবে?

যে মেয়েটি উল্কি আঁকাতে এসেছিল সে কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা মিটিয়ে চলে যাওয়ার আগে বলল, "ইঙ্কিংয়ের ভিডিয়োটা ইনস্টায় আপলোড করে তোমায় ট্যাগ করে দেব।"

"শিয়োর!" আঙুল তুলে ডেভিল্‌স হর্ন দেখাল আলপথ।

"আমার নাম দীপশিখা," ন্যূনতম পরিচয় দিয়ে দীপশিখা বলল, "এই ট্যাটু পার্লারের জন্যে কত টাকা ভাড়া দিতে হয়?"

"আমার রোজগার কী রকম জানতে চাইছেন?" স্যানিটাইজ়ার দিয়ে হাত সাফ করে আলপথ বলল, "আমি বাবা-মায়ের এক ছেলে। বাবা ইজ় ইন মার্চেন্ট নেভি। মা ডাক্তার, বাড়িতেই চেম্বার করেন। আমাকে টাকাপয়সা নিয়ে ভাবতে হয় না। তাও যখন প্রশ্নটা করলেন, তা হলে বলি, যাবতীয় খরচ বাদ দিলে পশ কিটেন থেকে ভালই লাভ থাকে। আমার বয়স সাতাশ। এখন থেকেই মাসে বারো হাজার টাকা এসআইপি-তে ইনভেস্ট করি।"

দীপশিখা আজও টাকা লগ্নি করা শিখল না। আর এই সদ্য যুবা বছরে প্রায় দেড় লাখ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড কেনে।

বরুণ বলল, "আমি ওর সঙ্গে আলাপ করে গেছি। ইন্টারেস্টিং ছেলে। জার্মান ভাষা শিখছে। খুব ভাল গিটার বাজায়, খুব ভাল গান গায়। ওদের একটা ব্যান্ডও আছে।"

"ব্যান্ডের নাম কী? ব্যান্ড মেম্বার কারা?" জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

"আমাদের ব্যান্ডের নাম 'পি-ও-ডাবলিউ' বা 'প্রিজ়নার অফ ওয়ার'। লিরিক লেখে মিলনদা, সুর দিই আমি আর সিয়া। পারফর্ম করি... আই মিন করতাম... আমি, সিয়া আর প্রিয়া।"

অনেকগুলো তথ্য জেনে অবাক দীপশিখা। সে বলল, "মিলন গীতিকার, এটা জানা ছিল না। প্রিয়া আপনাদের ব্যান্ড মেম্বার ছিলেন, এটাও না। এই নিয়ে পরে কথা বলব। আপাতত সিয়া-র সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"ওকে টেক্সট করেছি," স্মার্টফোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল আলপথ, "সিয়া আসছে।"

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র পশ কিটেনে ঢুকেছে গোলগাল একটি মেয়ে। পরনে শাড়ি আর টিশার্ট, পায়ে হাই হিল। ঢুকেই মেয়েটি বলল, "উফ! বাঙালিতে কলকাতা শহর ভরে গেল! কোথাও কি এদের হাত থেকে মুক্তি নেই!"

দীপশিখা ভুরু তুলে তাকাতেই সিয়া এক গাল হেসে বলল, "আমার নাম সিয়া কপূর। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ভবানীপুর। এই ছোকরার সঙ্গে প্রেম করার পর থেকে অ্যান্টি-বং হয়ে গেছি। অ্যাল্পসের বদগুণগুলো বাঙালি জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিই।"

"আলপথ থেকে অ্যাল্পস?" হেসে ফেলেছে দীপশিখাও। সে বুঝতে পারছে সিয়ার রাগ আসলে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

"তুমি কী করো?" জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

"আপনি কী করেন?" পাল্টা প্রশ্ন সিয়ার।

"আমি পোস্ট মর্টেম করি।"

একটুও ঘাবড়ে না-গিয়ে দিয়া বলল, "আমি ইস্টার্ন ওয়্যারের বুটিক চালাই। নাম সিয়া-জ়। পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ শিখছি, আমাদের ব্যান্ডে ইউকেলেলে বাজাচ্ছি, গান গাই। গানের ভিডিয়ো শুট, এডিটিং, পোস্ট প্রোডাকশন সামলাই। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের গ্রোথও মনিটর করি। থ্রি-কে ফলোয়ার! সদ্য মানিটাইজ় হয়েছে। বাট ইট নিডস মোর সাবস্ক্রাইবার। আপনি ইউটিউবে গিয়ে 'পি-ও-ডাবলিউ' লিখে সার্চ দিলেই চ্যানেলটা চলে আসবে। তখন বেল আইকনে ক্লিক করলে..."

বিরক্ত হচ্ছে দীপশিখা। অতীতে ছিল লিটল ম্যাগাজ়িনের উপদ্রব। মধ্যেখানে এল বাংলা ব্যান্ডের হানাদারি। এখন ইউটিউবারদের কলার তুলে ঘোরার সময়। কথা ঘোরানোর জন্যে সে বলল, "বাড়িতে কে কে আছেন?"

"বাবা-মা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন বছরদশেক আগে। দ্যাটস হোয়াই আই নো অ্যাবাউট পোস্ট মর্টেম ডক্টর্স। আমি থাকি জ্যাঠার ফ্যামিলির সঙ্গে। এলগিন রোডে যে ধাবাটা আছে, তার পাশেই জ্যাঠার ওষুধের দোকান।"

দীপশিখা খেয়াল করল, সিয়া 'জ্যাঠা' বলল। গুরুমুখী ভাষায় যে সব সম্পর্কের নাম হামেশাই হিন্দি সিনেমা বা সিরিয়ালের কল্যাণে জানা যায়, সেগুলো বলল না। দীপশিখা জিজ্ঞেস করল, "গতকাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?"

"এই বাড়িতেই ছিলাম। আমাদের রিহার্সাল ছিল।"

"পুনশ্চয় রিহার্সাল করো?"

"প্রিয়াই করতে বলেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি, উনি আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাদের দুটো ডাকনামও দিয়েছিলেন," লাজুক মুখে বলল সিয়া, "আমাকে 'তুলতুলি' বলতেন আর অ্যাল্পসকে 'খোকা।' আমরা কেউই ডাকনামদুটো পছন্দ করতাম না। সেটা জানা সত্ত্বেও ওই নামে ডেকে বোর করতেন।"

"আমরা ওই রকম ডাকনাম পছন্দ করতাম না জেনেই আমাদের নিয়ে গান লিখেছিলেন..." শ্রাগ করল আলপথ, "এনিওয়ে, শি ওয়জ় আ গ্রেট লেডি।"

সিয়া বলল, "মিলনদার পাশের ঘরটায় সাউন্ডপ্রুফ স্টুডিয়ো করা হয়েছে। ওখানেই শুট, রেকর্ডিং, কালার গ্রেডিং, মিক্সিং। ওটা রেন্টে নেওয়া আছে। টাকাটা প্রিয়া দেন... আই মিন... দিতেন। এই নিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে খিটিরমিটির লেগেই থাকত।"

"তোমরা কোন ভাষায় গান গাও?"

"আমি আর অ্যাল্পস মিলে বাংলা, ইংরেজি, গুরুমুখী, হিন্দি, উর্দু, জার্মান আর ফরাসি ভাষা জানি। মিলন শুধু বাংলা জানে। প্রিয়া বাংলা, ইংরেজি আর জার্মান জানতেন। 'পি-ও-ডাবলিউ'-এর গানের লিরিক বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজি ভাষা মিলিয়ে। প্রিয়ার একার গানও খুব পপুলার। উনি 'ডাইনিবুড়ি' নামে বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে র‍্যাপ গাইতেন। হিউজ ফ্যান ফলোয়িং ছিল।"

"ডাইনিবুড়ি?" বরুণ ভুরু কুঁচকে সিয়ার দিকে তাকাল।

আলপথ সিরিয়াস মুখে বলল, "ওঁর ড্রেস কোড ছিল সাদা থান, সাদা উইগ, লাল সানগ্লাস আর একটা কালারফুল ব্যাগ। যেটাকে প্রিয়া 'ঠাকুরমার ঝুলি' বলে ডাকতেন। এই দেখুন।"

আলপথ স্মার্টফোন এগিয়ে দিয়েছে। ওদের ইউটিউব চ্যানেলে 'ডাইনিবুড়ির বুলি' নামের একটি গান শুরু হল।

"খোকা আর তুলতুলি,
শোন ডাইনিবুড়ির বুলি,
খোল চোখের থেকে ঠুলি।
বুঝলি না তুলতুলি?
লাগা আঁচলে রং-তুলি।
বুঝলি না তুই খোকা?
আঁক ত্যাঁদড় ট্যাটুগুলি।
শোন ডাইনিবুড়ির বুলি,
ঘাঁট ঠাকুরমায়ের ঝুলি,
পাবি কলম-চালকগুলি।
খোল চোখের থেকে ঠুলি।
পুনশ্চ দেখ খুলি।"

বেগুনি আলোর মধ্যে সাদা থান, সাদা উইগ আর লাল সানগ্লাস পরা প্রিয়া নানা রঙের কাপড় সেলাই করে তৈরি রংচঙে পাশঝোলা দুলিয়ে আওড়ে যাচ্ছেন। ড্রোন শটে হাওড়া

ব্রিজ, দুর্গাপুজো, হলুদ ট্যাক্সি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখানো হচ্ছে।

প্রিয়ার মানসিকতা বোঝার জন্যে গানটা শুনল এবং দেখল দীপশিখা। খোকা আর তুলতুলি কে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ট্যাটু আঁকতে বলা হচ্ছে খোকাকে আর আঁচলে রং-তুলি লাগাতে বলা হচ্ছে তুলতুলিকে। এর মানে আলপথকে ট্যাটু করতে আর সিয়াকে ডিজিটাল প্রিন্টের শাড়ি ডিজ়াইন করতে বলছেন। চোখের ঠুলি খুলতে বলছেন বারবার করে। বাকি লাইনগুলোর কোনও মানে নেই।

"এটা গানের লিরিক?" আলপথকে মোবাইল ফেরত দিয়ে দীপশিখা বলল, "তুমি বা সিয়া এইসব গান গাও, তার মানে বুঝতে পারি। প্রিয়া কেন শিং ভেঙে বাছুরের দলে এলেন?"

"নীল আর আকাশ এটাই বলতে চাইছিলেন," বলল বরুণ, "প্রিয়া নরমাল ছিলেন না।"

"আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না!" কড়া গলায় বলল সিয়া, "এই গানটি আন্ডারগ্রাউন্ড সং হিসেবে অ্যানথেম হয়ে গেছে। আপনারা অন্য জেনারেশন। আপনারা বুঝবেন না।"

সিয়ার দিকে তাকিয়ে দীপশিখা প্রসঙ্গ বদলাল, "প্রিয়া যে মারা গেছেন সেটা তোমরা কখন টের পাও?"

"আমি আর অ্যাল্পস মিলে রাত দুটো পর্যন্ত স্টুডিয়োয় জ্যামিং করছিলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে নিজেদের বুটিক আর পার্লারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। বাড়ির ভিতর থেকে আমাদের শপে যাওয়ার দরজা আছে। পুনশ্চর সদর দরজা খুলতে হয় না। সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে যে যার বাড়ি চলে যাই। তখনও কিছু জানতে পারিনি। পরে মিলনদা ফোন করে জানায়।"

"উনি কি সুইসাইড করতে পারেন? তোমাদের কী ধারণা?"

"শি ওয়াজ় ফুল অফ লাইফ," ভুরু কুঁচকে বলল আলপথ, "যদিও কয়েক মাস ধরে একটু অন্যরকম লাগছিল। কখনও উচ্ছল, কখনও চাপা। কখনও একটানা বকবক করছেন, কখনও গুম মেরে আছেন... এইরকম আর কী!"

"উনি কি ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন?"

"আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। চলুন সিয়ার বুটিকে যাই," বলল আলপথ।

পশ কিটেন থেকে বেরিয়ে বুটিকে ঢুকল সবাই। এই বুটিকেও সিসিটিভি সারভেল্যান্সের ব্যবস্থা আছে। এখানেও একই পোস্টার মারা রয়েছে। বরুণ যখন বুটিকের কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত, দীপশিখা তখন পোশাকের সংগ্রহ দেখছে। মেয়েদের পোশাকে ডিজিটাল প্রিন্টে রিকশা, অটো, সাইকেল, ব্যাং, কচ্ছপ, মুরগি দেখে বুঝতে পারল 'মিলেনিয়াল' বা 'জেনারেশন জ়েড'-দের সে চেনে না। এদের কথাবার্তা, গান, প্রেম বা ফ্যাশন সেন্স নিয়ে কোনও ধারণাই তৈরি হয়নি।

বুটিক থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল রেকর্ডিং স্টুডিয়োয়। এখানে যেসব যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো দীপশিখার অচেনা। বরুণও আগ্রহ দেখাল না। স্টুডিয়োর দরজায় তালা লাগিয়ে চাবি মিলনের হাতে দিয়ে আলপথ আর সিয়া চলে গেল।

একতলায় এখন মিলন, বরুণ, দীপশিখা।

"আপনার ঘরে একটু বসব," বলল দীপশিখা।

মিলন নিজের ঘরের দরজা খুলে বললেন, "আমি কিছু জানি না।"

পুনশ্চর অন্য ঘরের মতো এটিও বেশ বড়। সাফসুতরো ঘরে ডবল বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল, টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। দেওয়ালের তাকে বইয়ের সংগ্রহ দেখে এগিয়ে গেল দীপশিখা। রাজশেখর বসুর মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি আর পুনশ্চ, কল্লোল আর কৃত্তিবাসী যুগের কবিদের বই পেরিয়ে নব্বই আর শূন্য দশকের প্রায় সব কবির কোনও না-কোনও কবিতার বই রয়েছে। রয়েছে প্রচুর কবিতা সংক্রান্ত লিটল ম্যাগাজ়িন। দীপশিখা যখন এইসব দেখছে, তখন বরুণ জেরা শুরু করেছে, "আপনার

বাড়ি কোথায়?"
"দাঁইহাট, বর্ধমান জেলা।"
"বাড়িতে কে কে আছেন?"
"বাবা, মা, বৌ আর মেয়ে।"
"আপনি কতদূর পড়াশুনো করেছেন?"
"কাটোয়া কলেজ থেকে বিএ।"
"এখানে কী কী কাজ করতে হয়?"
"সবরকম কাজ। ঘর মোছা, রান্না করা, বাসন মাজা, জামাকাপড় কাচা, বাজার দোকান করা, গাড়ি চালানো..."
"কম্পাউন্ডারি জানেন?"
"জানি স্যর, এই বাড়িতে থাকলে এসব আপনিই শিখে যেতে হয়। সেলাই করা, ড্রেসিং করা, ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা..."
"ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিতে পারেন?"
"পারি স্যর। মিথ্যে বলে লাভ নেই," মেঝের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মিলন।
"বিএ পাশ করে লোকের বাড়িতে কাজ করেন কেন?"
"আর কোনও কাজ পাইনি স্যর। তা ছাড়া, মালিক হিসেবে এঁরা ভাল। মাইনেপত্তর খারাপ না। কাজের সেরকম চাপ নেই। মাসে একবার ছুটি পাই বাড়ি যাওয়ার জন্যে। আর কলকাতায় থেকে আমার লাভও হচ্ছে।"
বরুণ বলল, "কীরকম লাভ?"
দীপশিখা হঠাৎ বলল, "মিলন মল্লিক! নামটা চেনা চেনা লাগছিল! আপনি কবিতা লেখেন, তাই না?"
মাথা নিচু করে নরম গলায় মিলন বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম।"
"আপনার কবিতা আমি 'স্বদেশ' সাহিত্য পত্রিকা আর লিট্‌ল ম্যাগাজিনে পড়েছি। আপনি তো পপুলার কবি।"
মিলন মাথা চুলকে বললেন, "স্যরকে ওটাই বলছিলাম। কলকাতায় থাকার কিছু সুবিধে আছে। বিভিন্ন কবি সম্মেলনে ডাক পাওয়া যায়। সবার সঙ্গে আলাপ হয়। হুট করে কলেজ স্ট্রিট বা বাংলা অ্যাকাডেমি চলে যাওয়া যায়। দাঁইহাটে থাকলে সে সব হত না। তা ছাড়া আমার কবিতায় আলপথদা আর সিয়াদি সুর দেয়।"
"হ্যাঁ, সেটা আলপথের মুখে শুনলাম।"
কবিতা ও গানের কথা সংক্রান্ত আলোচনা থামিয়ে বরুণ বলল, "সেই রাতে এই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন, সবার নাম আর মোবাইল নম্বর একটা কাগজে লিখে ম্যাডামকে দিন। সেই সঙ্গে বলুন, খুনের রাতে ঠিক কী হয়েছিল?"
"আমি তো আপনাকে আগের দিন বলেছি স্যর," খাতার পাতায় সুন্দর হাতের লেখায় নাম আর ফোন নম্বর লিখতে লিখতে মিলন বললেন, "ওঁদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে আমি আর আলোদি খেয়েছিলাম। তারপরে আমি নীচে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ি..."
"তখন আলপথ আর সিয়া স্টুডিয়োয় ছিল, সেটা বুঝতে পেরেছিলেন?"
"একতলার কমন প্যাসেজের লাইট জ্বলছিল। তার মানে ওরা এখানেই ছিল। প্র্যাক্টিস করছিল কি না জানি না। কোনও আওয়াজ পাইনি।"
"নার্সরা কোথায় শোন?"
বরুণের প্রশ্নের মধ্যে কলিং বেল বাজল। মিলন বললেন, "আলোদি আর নীলিমাদি বড়বাবুর ঘরেই বিশ্রাম নেন," তারপর সদর দরজা খুলে দিলেন।
ভিতরে ঢুকলেন আলো হালদার। নীলিমার সঙ্গে বয়স এবং চেহারায় যথেষ্ট মিল। আলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অতিরিক্ত কিছু জানা গেল না।
খাতার পাতা ছিঁড়ে নাম ও ফোন নম্বরের তালিকা দীপশিখার হাতে ধরিয়ে দিলেন মিলন। মিলনের হাতে আটটা ভিজ়িটিং কার্ড ধরিয়ে বরুণ বলল, "এটা আমার ভিজ়িটিং কার্ড। এগুলো কাকে কাকে দেবেন? নামের তালিকাটা বলে ফেলুন।"
তাসের মতো কার্ডগুলো ছড়িয়ে মিলন আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বললেন, "ববি দাশ, নীল দাশ, আকাশ দাশ, নীলিমা মণ্ডল, আলো হালদার, আলপথ রায়, সিয়া কপূর আর আমি, মানে মিলন মল্লিক।"
"সবাইকে বলে দেবেন, যদি কিছু মনে পড়ে, তা হলে যেন আমাকে বা এই ম্যাডামকে ফোন করেন। ম্যাডামের নম্বর ভিজ়িটিং কার্ডের পিছনে লেখা আছে।"
কথা শেষ করে পুনশ্চর সদর দরজা দিয়ে বেরোল বরুণ। সঙ্গে দীপশিখা।

*

জিপে বসে বরুণ বলল, "কী বুঝছেন?"
ভ্রু কুঁচকে দীপশিখা বলল, "সাসপেক্টদের মধ্যে, খুনের রাতে পুনশ্চয় ছিলেন, নীলিমা বাদ দিয়ে, সাতজন। এঁদের মধ্যেই এক বা একাধিক জন খুনি। তাঁকে বা তাঁদের কীভাবে খুঁজে বের করা হবে, সেটা ভাবছিলাম।"
"এভাবে পুলিশ কাজ করে না," হাসছে বরুণ, "যাকে খুনি, খুনির সহকারী বা খুনের সাক্ষী বলে মনে হবে, তাকে কাস্টডিতে তুলে এনে 'আড়ং ধোলাই' দেব। তা হলেই সব জানা যাবে। মুশকিল হচ্ছে, দাশ ফ্যামিলি বড্ড ইনফ্লুয়েনশিয়াল!"
"খুন কে করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?" পিছন দিকে দৌড়তে থাকা রবিবারের কলকাতার দিকে তাকিয়ে বলল দীপশিখা।
"যে ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিতে পারে।"
"তা হলে আকাশ, আলপথ, সিয়া বাদ।"
বরুণ বলল, "ভুল সিদ্ধান্ত। আলপথের মা ডাক্তার এবং তিনি বাড়িতে চেম্বার করেন। সিয়ার জ্যাঠার ওষুধের দোকান আছে। আকাশের বাড়ির সবাই ডাক্তার। এঁরা সবাই ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশান দিতে পারেন, আমি শিয়োর।"
দীপশিখা বলল, "ববি, নীল, মিলন, আলো আর নীলিমাও কাজটা পারেন। খুব ঘেঁটে যাচ্ছে কেসটা!"

## ৫

পনেরোই অগস্ট সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন বুলুদির জন্যে ফ্ল্যাটের দরজা খুলছে দীপশিখা, তখন কানে মোবাইল। আজ আর ইমোজি চালাচালি নয়। ঘণ্টুসোনার সঙ্গে আদিখ্যেতা চলছে। ঘেঁটুরানি আদুরে গলায় বলছে, "আজ ন্যাশনাল হলিডে, আউটডোর বন্ধ। তার ওপরে সোমবার। গতকাল আর আজ মিলিয়ে দু'দিনের জন্যে বাড়ি এলে কী ক্ষতি হত?"
"আগামিকালের আগে ছুটি পাচ্ছি না ঘেঁটুরানি। অন্য পিডিয়াট্রিশিয়ান বাড়ি গেছে।"
"গত বছর দুর্গাপুজোর সময়ও ও বাড়ি গিয়েছিল। এবার পুজোয় আমার ঘণ্টুসোনাকে ডিউটি করতে হলে বাচ্চাদের ডাক্তার আমার কাছে ব্যাপক ঝাড় খাবে।"
চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ বারান্দায় রেখে এসেছে বুলুদি। বারান্দার চেয়ারে বসে ফোন কাটল দীপশিখা। কাগজ খুলে দেখল, প্রথম পাতার নীচের দিকে বিশেষ প্রতিবেদনের হেডলাইন, 'ভবানীপুর থানার মালখানা পরিষ্কার করতে গিয়ে বেরিয়ে এল থমকে থাকা সময়।' প্রতিবেদনটি বলছে, 'ভবানীপুর থানার মালখানায় প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে পড়েছিল পুরনো নানা নথি! ধুলো সাফ করে সেই সব কেস ফাইল পুলিশ জাদুঘরে ঠাঁই পেতে চলেছে...'
পড়তে পড়তে চায়ে চুমুক দিচ্ছে দীপশিখা। প্রতিবেদন অনুযায়ী কেস ফাইলগুলি কালানুক্রমিক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, কেপমারি, হত্যা, ধর্ষণ— সব রকম অপরাধের ফাইল আছে। একদম শেষে লেখা, "'কলকাতা পুলিশের কমিশনার অমিত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'আমরা এই সব নথি সংরক্ষণ করব।'"
মোবাইল কলকলিয়ে উঠেছে। বরুণের ফোন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে দীপশিখা বলল, "বলুন।"
"ম্যাডাম, কমিশনার সাহেব অমিত চক্রবর্তী ফোন করেছিলেন। পুলিশমন্ত্রী, অনারেব্‌ল সপ্তর্ষি রায়ও ফোন করে বললেন 'প্রিয়া দাশ মার্ডার কেস' ক্লোজ় করতে হবে। অনুরোধ নয়, হুকুম। আপনি প্লিজ় রিপোর্টটা আজকের মধ্যে কমপ্লিট করুন।"
উত্তর না দিয়ে ফোন কাটল দীপশিখা। সকালের ফুরফুরে মেজাজ গায়েব। মাথায় বিরক্তি কিলবিল করছে। বিরক্তির বান্ডিল মাথায় নিয়েই হাসপাতাল পৌঁছল। রেডিয়োলজি ডিপার্টমেন্টে ঢুকে মেধার কাছ থেকে ইউএসজি রিপোর্ট সংগ্রহ করে, পুরনোটা ফেরত দিয়ে নিজের ডিপার্টমেন্টে ঢুকল। কেবিনে ঢুকতে না-ঢুকতেই বিভাস কাঞ্জিলালের ফোন, "পিএম রিপোর্ট রেডি?"

“ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট না-এলে কী করে লিখি স্যর? এটা ক্লিয়ার কেস অফ মার্ডার!”

“এটা মার্ডার নয়। সুইসাইড,” ঠান্ডা গলায় বললেন বিভাস।

দীপশিখা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন মিথ্যে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট লেখার জন্যে।

ডিপ ব্রিদিং করে রাগ কমাচ্ছে দীপশিখা। বলছে, “মার্ডার না সুইসাইড, সেটা আমি ঠিক করব। এই রকম কথা আপনি আর আমার সঙ্গে বলবেন না।”

“ঠিক আছে। বলব না,” কেটে কেটে বললেন বিভাস, “মাননীয় পুলিশমন্ত্রী তোকে ফোন করলে একই উত্তর পাবেন তো?”

“আমার সেই রকম বদনাম আছে বলেই শুনেছি,” দীপশিখা বলল, “ভিসেরা রিপোর্ট এসে গেলেই আমি আমার কাজ শেষ করব।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিভাস বললেন, “আমি যদি তোর মতো হতে পারতাম!” তারপরে ফোন কেটে দিলেন।

চেয়ারে বসে কম্পিউটার অন করেছে দীপশিখা। প্রিয়ার পিএম রিপোর্ট লেখার কাজ শুরু করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল পোস্ট মর্টেমের ভিডিয়োটার কথা। সেটা একবার দেখা যাক। ভিডিয়ো ক্লিপটা চালু করল দীপশিখা।

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে সে বলছে, “আমি, ডক্টর দীপশিখা মুখার্জি, বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, ইউডি কেস নম্বর ২০১/২২-এর পোস্ট মর্টেম শুরু করলাম। ভিক্টিমের নাম প্রিয়া দাশ, বয়স— ইনকোয়েস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী— সাতচল্লিশ। পরনে শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ়, ব্রা এবং ডেনিমের শু। সেগুলো এগজ়িবিট হিসেবে আলাদা আলাদা প্যাকেটের মধ্যে রাখা হল। ডেডবডির শরীরে একাধিক ট্যাটু আছে। আমি ক্যামেরা অপারেটরকে অনুরোধ করব সেগুলোর ক্লোজ় শট নিতে।”

এইখানে থমকাল দীপশিখা। ক্লোজ় শটে দেখা যাচ্ছে, প্রিয়ার বাঁ হাতের উপর দিকে ট্রাইবাল ফন্টে ট্যাটু করা আছে, ‘UD/12/50/ Bhawa’।

এর মানে কী? চমকে উঠল দীপশিখা। পোস্ট মর্টেম করার সময় সে খেয়াল করেনি কোথায় কী ট্যাটু আঁকা আছে। নেহাত বরুণ ভিডিয়ো করেছিল, তাই এটা দেখা গেল। লেখা রয়েছে একটি ক্রমিক সংখ্যা, সাল এবং থানা সহ ইউডি কেস নম্বর! ভবানীপুর থানায় ১৯৫০ সালে ১২ নম্বর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস নম্বর!

মোবাইলে বরুণকে ধরে দীপশিখা। বলে, “মালখানা থেকে যে সব কেস ফাইল উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে ‘ইউডি ১২/৫০’ আছে?”

“হঠাৎ এই প্রশ্ন?” কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বরুণ বলল।

প্রিয়ার হাতে কী ট্যাটু করা আছে, সেটার ব্যাখ্যা দিয়ে দীপশিখা বলল, “এবারে বুঝতে পারলেন?”

“আমরা মাথামোটা পুলিশ। সব কিছু লেটে বুঝি। খুঁজে দেখছি। দাঁড়ান,” বলল বরুণ। দীপশিখা ফোন কাটল।

একটু পরেই বরুণের ফোন। সে বলল, “কেস ফাইলটা আছে। কেসের আইও বিজন চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন। পুনশ্চর ঘটনা। লীলা দাশ পুনশ্চর তিনতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। কেস ফাইলের মধ্যে অনেক ডকুমেন্ট আছে। তার মধ্যে জার্মান ভাষায় লেখা একটা খাতাও আছে।”

একই বাড়িতে দু’টি মেয়ের অস্বাভবিক মৃত্যু? উনিশশো পঞ্চাশ সালের পরে দু’হাজার বাইশ সালে? আশ্চর্য!

কম্পিউটার শাট ডাউন করে দীপশিখা বলল, “আমি আসছি।”

*

“নমস্কার, আমি সপ্তর্ষি রায়,” কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন পুলিশমন্ত্রী।

ভবানীপুর থানার কম্পাউন্ডের মধ্যে গাড়ি রেখে দীপশিখা সবে নেমেছে, এমন সময় মন্ত্রীর ফোন। সে বলল, “বলুন স্যর।”

“প্রিয়া দাশের কেসে কী সমস্যা হচ্ছে?”

বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তা মিশিয়ে দীপশিখা জানাল, “ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট না-এলে ফাইনাল ডায়াগনসিস করতে পারা যাবে না স্যর। এটাই সমস্যা।”

“ওটা আমি দেখে নিচ্ছি,” ফোন কাটলেন সপ্তর্ষি। দ্রুত বরুণের চেম্বারে ঢুকে দীপশিখা বলল, “কই, কেস ফাইলটা দেখি!”

“কার ফোন ছিল?” চেয়ারে বসতে অনুরোধ করল বরুণ।

“সবই তো জানেন!” চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা ফাইলের দিকে তাকাল দীপশিখা। বরুণ তার দিকে একজোড়া গ্লাভস এগিয়ে দিয়েছে।

হলদেটে ফাইল সময়ের হানাদারিতে মলিন হয়ে গেছে। সাফসুতরো করার পরেও মিহি ধুলোর আস্তরণ আছে। ফাইল উল্টে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পড়ল দীপশিখা। অন্যান্য নানা কাগজের ভিতর থেকে একটা খাতা বের করল। পুরনো দিনের সাদা পাতায় হালকা খয়েরি রং ধরেছে। ঝর্না কলমে লেখা টানা টানা হরফগুলি স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে যদিও। হাতে লেখা তিরিশটি পাতার ফটো তুলবে বলে ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে দীপশিখা।

বরুণ বলে, “কী করতে চাইছেন?”

ফটো তুলতে তুলতে দীপশিখা বলে, “আলপথকে দিয়ে এটার অনুবাদ করাব।”

“প্রিয়া দাশ মার্ডার কেসে ও একজন সাসপেক্ট!”

“ঠিকই। ওকে দিয়ে এই কাজটা করানো উচিত নয়। কিন্তু আপনার চেনা কোনও লোক আছে, যে জার্মানি থেকে বাংলায় কুড়িটা পাতা অনুবাদ করে দেবে? এবং সেটাও আজকের মধ্যে?” শ্লেষের সঙ্গে বলে দীপশিখা।

বরুণ কী একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। দীপশিখা বলল, “বিভাস কাঞ্জিলাল আর সপ্তর্ষি রায় যেরকম চাপ দিচ্ছেন, তাতে পিএম রিপোর্ট কাল পরশুর মধ্যে লিখে ফেলতে হবে। তার আগে দেখে নেওয়া জরুরি, প্রিয়ার হাতে লীলা দাশের ইউডি কেস নম্বর ট্যাটু করা ছিল কেন? প্রিয়ার হাতে ট্যাটু আঁকার কাজটা আলপথ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। ওকে দিয়ে অনুবাদ করানোটা ভুল পদক্ষেপ। কিন্তু এ ছাড়া উপায় দেখছি না।”

বরুণ আবারও কী একটা বলতে গিয়ে ঢোক গিলল।

আলপথের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কুড়িটা ফটো পাঠিয়ে ফোন করল দীপশিখা, “হ্যালো আলপথ, আমি সেই অটপ্‌সি সার্জন বলছি।”

“বলুন ম্যাডাম,” উত্তর দিল আলপথ।

“আমি তোমাকে কুড়িটা ছবি পাঠিয়েছি। জার্মান ভাষায় লেখা কুড়িটা পাতা। ওগুলো বাংলায় অনুবাদ করে আমাকে আজ রাতের মধ্যে পাঠাও।”

“হোয়াট দ্য...” গালাগালি দিতে গিয়ে নিজেকে সামলেছে আলপথ, “ইমপসিব্‌ল ম্যাডাম!”

দীপশিখার হাত থেকে নিজের হাতে মোবাইল নিয়ে পুলিশি গলায় বরুণ হাঁক পাড়ল, “ম্যাডাম যা বলছেন, সেটা করে দাও,” তারপরে ফোন কেটে দিল।

ফোন ফেরত নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দীপশিখা বলল, “আমাকে এখন হাসপাতালে যেতে হবে। আপনি কি কেস ফাইলটা পড়েছেন?”

“এইসব ফালতু কাজের জন্যে সময় নেই ম্যাডাম,” গম্ভীর মুখে বলল বরুণ, “কয়েকটা ড্রাগ পেড্‌লারকে ধরেছি। আড়ং ধোলাই দিয়ে পেট থেকে কথা বার করছিলাম। এখন কোর্টে প্রোডিউস করব। তার আগে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে ওদের জন্যে ‘ফিট সার্টিফিকেট’ লেখাতে হবে।”

“পুলিশ সাসপেক্টদের ধরে মারবে আর ডাক্তাররা ফিট সার্টিফিকেট দেবে?” বিরক্তি প্রকাশ করে দীপশিখা, “দিস ইজ় মিসইউজ় অফ মেডিক্যাল প্রফেশন।”

“আপনারা আর আমরা একই বৃন্তের দু’টি কুসুম ম্যাডাম,” পুলিশ ভ্যানে উঠতে থাকা পাঁচজন মার খাওয়া মানুষকে দেখিয়ে বরুণ হাসে, “রাষ্ট্র যা চায়, সেটা পুলিশ আর ডাক্তারকে করতেই হয়।”

*

গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে দীপশিখা। মাথায় ঘুরছে বরুণের বলা কথাগুলো। ‘রাষ্ট্র যা চায়, সেটা পুলিশ আর ডাক্তারকে করতেই হয়।’ কথাগুলো বোধহয় ঠিক নয়। নিজের অবস্থান জাস্টিফাই করতে গিয়ে অন্য পেশা নিয়ে টানাটানি করছে বরুণ।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পেরিয়ে গাড়ি দৌড়চ্ছে টালা ব্রিজের দিকে। এমন সময় মোবাইল কলকলিয়ে উঠল। গাড়ি চালানোর সময় কখনওই ফোন ধরে না দীপশিখা। আজ ধরল। সপ্তর্ষি বা বিভাসের ফোন না-ধরা খুব খারাপ ব্যাপার।

হ্যান্ডস ফ্রি সেটের স্পিকার কানে গোঁজা আছে। মোবাইলের পর্দা দেখতে পাচ্ছে না দীপশিখা। সে বলল, "হ্যালো!"

"প্রেগন্যান্ট অবস্থায় দৌড়োদৌড়ি করছেন কেন?" খসখসে পুরুষ কণ্ঠ বলছে, "রেস্টে থাকুন। যদি হুট করে অ্যাবর্শন হয়ে যায়!"

"কে বলছেন?" চিৎকার করছে দীপশিখা। টালা ব্রিজ দিয়ে উঠছে বলে গাড়ি দাঁড় করাতেও পারছে না। রাগের চোটে মাথা দপদপ করছে।

ফোন কেটে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ি চালাচ্ছে দীপশিখা। সার্কুলার রোডে এমন একটা রাস্তা যে কোথাও গাড়ি দাঁড় করানোর উপায় নেই। মাথা ঠান্ডা রেখে নর্থ সিটি অ্যাপার্টমেন্টের কার পার্কিংয়ে পৌঁছল। নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি রেখে মোবাইল হাতে নিয়ে দেখল, ফোন এসেছিল অচেনা নম্বর থেকে।

বরুণকে ফোন করে সবটা জানাল দীপশিখা। অচেনা নম্বরটাও পাঠিয়ে দিল। পুলিশ এইসব নম্বর ট্র্যাক করার কাজে পারদর্শী। ফোন পর্ব চুকিয়ে গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছে সে, এমন সময় গাড়ির কাচে টকটক করে আওয়াজ।

চমকে উঠে চিৎকার করে দীপশিখা, "কে?"

কাচের ওপার থেকে সৈকত হাহা করে হেসে উঠল।

গাড়ি থেকে নেমে সৈকতকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছে দীপশিখা। বলছে, "আমার কাছে একটা হুমকি ফোন এসেছিল।"

"কুল ডাউন ঘেঁটুরানি!" দীপশিখার মাথায় হাত বুলোচ্ছে সৈকত, "তোমার লাইনে এসব থাকবে জেনেই তো মড়াকাটা বেছে নিয়েছিলে।"

চোখের জল মুছে দীপশিখা বলল, "সকালে বললে তোমার ছুটি নেই? তা হলে এখন এলে কী করে?"

"ঘেঁটুরানিকে দেখতে ইচ্ছে করছিল," বৌয়ের হাত ধরে লিফ্‌টের দিকে এগোচ্ছে ঘঞ্চুসোনা। ঘেঁটুরানিও বরকে কাছে পেয়ে যাবতীয় কথা উগরে দিচ্ছে। প্রিয়া দাশের অস্বাভাবিক মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেনে ঘঞ্চুসোনা বলল, "কেন তুমি এইসব ফালতু ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ? আমি মাত্র দু'দিনের জন্যে এসেছি। তুমি বরং ছুটি নাও।"

"ভাল বলেছ। কাল সকালেই বসকে ফোন করব।"

বুলুদি রান্না করে গিয়েছিল। কিন্তু সৈকতের আবদারে ফুড ডেলিভারি অ্যাপ খুলে নামী চাইনিজ় রেস্তরাঁ থেকে চিলি পর্ক আর মিক্সড চাউমিন অর্ডার করা হল।

গরম খাবার টেবিলে সাজিয়ে সৈকত বলল, "আমাদের বাচ্চা নিয়ে তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"কী কথা?" চিলি পর্ক খেতে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

"কাল বলব," বৌয়ের পাতে মিক্সড চাউমিন তুলে দিচ্ছে সৈকত। ঘঞ্চুসোনা আর ঘেঁটুরানি খাচ্ছে, গল্প করছে, হাসছে, চুপ করে বসে থাকছে। একে অপরের মধ্যে নির্ভরতা খুঁজে নিচ্ছে। আর তো মাত্র একটা দিন। তারপরেই এই যৌথযাপন ভেঙে যাবে। তার আগে যতটা আনন্দ শুষে নেওয়া যায়...

রাতের খাওয়া সেরে দু'জনে যখন ঘুমোচ্ছে, তখন আলপথের কাছ থেকে লম্বা একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দীপশিখার হোয়াটসঅ্যাপে এল। জার্মান থেকে বাংলা ভাষায় করা অনুবাদটি আগামিকাল দীপশিখা দেখবে।

## ৬

কার্ল হাইমের নোটবুক

আউশউইৎজ় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ল্যাবরেটরিতে ঢোকার ঠিক আগে দেখলাম ইহুদি ডাক্তারটিকে। অন্য এক ইহুদি ডাক্তারের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ায় হাসছিল ছেলেটি। ওর ক্রমিক সংখ্যা হল ১৪০৬০৪। সংক্ষেপে চোদ্দোো। এই ক্যাম্পে ইহুদিরা হাসে না। চোদ্দোোর সাহস আছে বলতে হবে।

কেন ইহুদিরা হাসে না? তার কারণ আছে। একে তো সাত-আটদিন ধরে ট্রেনের বগিতে গাদাগাদি করে ওদের আনা হয়। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বুট আর বেয়নেটের গুঁতো খেতে খেতে কামরা থেকে গড়িয়ে পড়ে ওরা দেখতে পায় ছাই রঙের দিকচক্রবাল। কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে আকাশ। সেই ধোঁয়া চব্বিশ ঘণ্টাই বেরচ্ছে, কখনওই মিলিয়ে যাচ্ছে না। এর কারণ আছে। অর্ধমৃত বা মৃত ইহুদিদের পোড়ানো হয় যে ক্রেমেটোরিয়ামে বা শ্মশানে, তার আগুন কখনও নেবে না। জার্মানিতে যে এত ইহুদি আছে কে জানত?

কালো ধোঁয়ার ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যায় আগুনের লাল জিভ। দেখা যায় 'শুৎস্স্টাফেল' বা 'এসএস' বা নাৎসি সৈন্যদের। আর দেখা যায় আমাকে। এসএসরা যখন পুরুষ, নারী আর বাচ্চাদের আলাদা করছে, আমি তখন অন্য পদ্ধতিতে ওদের আলাদা করি। একটা ট্রেনে দশ থেকে বারো হাজার ইহুদি আসে। তাদের মধ্যে হাজার তিনেক লোককে ক্যাম্পে রাখা যাবে। বাকিদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে ক্রেমেটোরিয়ামে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্যে। অবশ্য তার আগে ওদের পোশাক আর অন্যান্য সামগ্রী কেড়ে নেওয়া হবে। ওগুলো আমাদের কাজে লাগে। কাদের রাখা হবে আর কাদের সরিয়ে দেওয়া হবে, সেটা ঠিক করার দায়িত্ব আমার।

যাক গে! যা লিখছিলাম। চোদ্দোো-র হাসিমুখ দেখে খুব ভাল লাগল। ওয়ার্ডেন ম্যাক্সকে বললাম ওকে ডেকে আনতে। চোদ্দো যখন জানতে পারল যে আমি, মানে আউশউইৎজ় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ডাক্তার কার্ল হাইম ওকে ডাকছি, তখন কিছুটা স্বস্তি পেল। এসএস-এর হাতে পড়া মানেই মৃত্যু। কিন্তু এক ডাক্তার কখনওই অন্য ডাক্তারকে মেরে ফেলবে না।

চোদ্দো আমার চেম্বারে ঢুকতেই ওকে এগজ়ামিনেশন বেডে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিলাম। দেখলাম ওর উর্দিতে নম্বরের পাশে একটি হলদে আর একটি লাল ত্রিকোণ আঁকা আছে। চোদ্দোকে বললাম, "রুটিন কয়েকটা পরীক্ষা করব। তার জন্যে একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তা হলেই তোমার ছুটি। রাজি তো?"

এখানে বলে রাখা ভাল, আউশউইৎজ় ক্যাম্পে বন্দিদের শ্রেণিবিভাগ করার জন্যে চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি চালু আছে। বন্দিদের ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, কে কী ধরনের অপরাধী। রাজনৈতিক বন্দিদের ইউনিফর্মে লাল ত্রিকোণ ব্যাজ থাকে। জার্মান অপরাধীর ক্ষেত্রে উল্টোনো সবুজ ত্রিকোণ, সমকামীদের ক্ষেত্রে গোলাপি ত্রিকোণ, ইহুদিদের ক্ষেত্রে দুটি হলুদ ত্রিকোণ। কোনও ইহুদি যদি একই সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিও হয় তাহলে দুই ত্রিকোণের মধ্যে একটা লাল আর অন্যটা হলুদ।

চোদ্দো আমার প্রস্তাবে রাজি। আউশউইৎজ় থেকে মুক্তি কে না চায়? ও শুয়ে পড়তেই বুকের বাঁদিকের পাঁজর ঘেঁষে সুচ ফোটালাম। একটু পরেই বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল চোদ্দো। ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সারা শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে।

মিনিট খানেকের মধ্যে মারা গেল শুয়োরের বাচ্চা ইহুদি ডাক্তারটা। ওয়ার্ডেন ম্যাক্সকে ডেকে বললাম, "ডেডবডিটা ফুটন্ত গরম জলে সেদ্ধ করে আনো।"

এক ঘণ্টা পরে বডি চলে এল। প্রথমে ছুরি দিয়ে মুন্ডুটা আলাদা করলাম। ধারালো ব্লেড দিয়ে করোটি থেকে ছাড়িয়ে নিলাম চামড়া, মাংস, শিরা, ধমনী আর মস্তিষ্ক। ধবধবে সাদা খুলি হাতে পেয়ে মন আনন্দে ভরে গেল। সেটার মধ্যে নুড়ি আর পাথর ভরে বানালাম পেপার ওয়েট। আমার ল্যাবরেটরির টেবিলে রিসার্চ পেপারগুলো ডাঁই হয়ে রয়েছে। অনেক দিন ধরে একটা ভাল পেপার ওয়েট খুঁজছিলাম। আজ চোদ্দোর মুখে অমলিন হাসি দেখে মনে হল ওর খুলির গঠন খুব ভাল। খুলিটা দিয়ে পেপার ওয়েট হতে পারে। তাই পেট্রোল, জল আর বিষের ককটেল বানিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম ওর হৃৎপিণ্ডে। বেজন্মাটার শরীরের বাকি অংশ নষ্ট করিনি। ওর চামড়া দিয়ে চেয়ার বানাব।

আমি ডক্টর কার্ল হাইম, বিশুদ্ধ রক্তের একজন জার্মান। আমি ইহুদিদের ঘৃণা করি। ঘৃণা করি উদারপন্থী, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, সমকামী, যাযাবর, কালো বা হলুদ চামড়া— সবাইকে। আমি মনে করি, ওদের মেরে ফেলা অথবা বন্দি করা অথবা অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

*

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মোবাইল হাতে নিয়ে দীপশিখা দেখল, আজ ষোলোই অগস্ট, মঙ্গলবার। তারপর দেখল আলপথের কাছ একটা লম্বা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এসে জমেছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। সৈকতকে ঘুম থেকে না-তুলে সেটাই পড়ছে আর শিউরে উঠছে সে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে দীপশিখা টুকটাক তথ্য জানে। উনিশশো তেত্রিশ সালে অ্যাডলফ

হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। পরের বছর গণভোটের মাধ্যমে জার্মানির ‘ফ্যুয়েরার’ বা নেতা নির্বাচিত হলেন। তাঁর মুখের কথাই হয়ে গেল আইন। থার্ড রাইখ, হলোকস্ট, মিত্রশক্তি বা ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের নাম শুনেছে দীপশিখা। বিশদে কিছু জানে না।

মূল প্রশ্ন অন্য জায়গায়। আউশউইৎজ় ক্যাম্পের এক নাৎসি চিকিৎসকের নোটবুক ভবানীপুর থানায় এল কীভাবে এল? আউশউইৎজ় থেকে কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে দু'হাজার বাইশ সাল— এই লম্বা সময় এবং দূরত্ব নোটবুকটি অতিক্রম করল কীভাবে?

দীপশিখা নোটবুকের পরের অংশে যায়। এবং বুঝতে পারে এটা শুধু নোটবুক নয়। ইহুদিদের উপরে ডাক্তার কার্ল হাইম যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছিলেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে।

*

কার্ল হাইমের নোটবুক

অ্যান্টিবায়োটিক পরীক্ষা।

জার্মান যোদ্ধারা যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে সংক্রমণের কারণে মারা না যান, তার জন্যে এই পরীক্ষা। প্রথমেই ইহুদি সাবজেক্টদের পায়ের কিছু অংশ বিনা অ্যানাস্থেসিয়ায় কেটে ফেলা হচ্ছে। এরপর সেখানে কাঠের টুকরো, ময়লা, মরচে, বা মানুষের নখ ঘষে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা তৈরির জন্য কাচের স্প্লিন্টারও ঘষা হচ্ছে। ক্ষতস্থানকে এইভাবে জীবাণু দিয়ে সংক্রমিত করার পরে সংক্রমণের বিস্তার রোধ করার জন্য ক্ষতস্থানের দু'দিকের রক্তনালী বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে সাবজেক্ট ভাল হয়ে উঠছে না মারা যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে আমি সালফোনামাইড গ্রুপের ওষুধ আবিষ্কার করেছি। আমার এইসব পরীক্ষা চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে অনেক অবদান রাখছে। এটা ঠিক যে সাবজেক্টরা মারা যাচ্ছে। কিন্তু এসব ছোট ঘটনা যে কোনও মহৎ কাজের সময় ঘটেই থাকে।

*

শরীর অবশ হয়ে আসছে দীপশিখার। পাতার পর পাতা জুড়ে আরও পরীক্ষার বর্ণনা, সাফল্য বা ব্যর্থতার খতিয়ান। রক্ত জমাট বাঁধার পরীক্ষা, হাইপোথার্মিয়া পরীক্ষা, যমজ বাচ্চাদের উপরে পরীক্ষা! যমজ বাচ্চাদের উপরে পরীক্ষার বর্ণনা পড়ে বিকট শব্দে ওয়াক তুলল দীপশিখা। ভাগ্যিস সৈকত একটু আগে বাথরুমে গেছে। তাই শুনতে পায়নি। নাকি পেয়েছে? তা হলে তো এক্ষুনি বেরিয়ে আদিখ্যেতা শুরু করবে।

একটানা নোটবুক পড়ছিল দীপশিখা। রাগ হচ্ছিল, বিরক্ত লাগছিল, ঘেন্না করছিল। বাচ্চাদের প্রসঙ্গ আসায় বমি পেয়ে গেল। সে এই নোটবুক আর পড়বে না।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে আলপথকে ফোন করল দীপশিখা। একবার রিং হতেই আলপথ ফোন ধরে বলল, “অনুবাদ করার সময় আমি নোটবুকটা পড়েছি। রাতে আমার ঘুম হয়নি।”

“তোমার তো মাত্র এক রাত ঘুম হয়নি। আমার বাকি জীবনে ঘুম হবে বলে মনে হয় না। এই নোটবুক আমি আর পড়ব না। তুমি বলে দাও, ডাক্তারি গবেষণার নামে ইহুদি খুন করা ছাড়া আর কি কিছু আছে এই খাতায়?”

“অনেক কিছু আছে। আমি কি সিলেক্টিভলি আপনাকে পড়ে শোনাব?”

“সেটাই করতে বলছি।”

“দাঁড়ান, ল্যাপটপ অন করি,” ফোন কাটল আলপথ। একটু পরে ফোন করে বলল, “কার্ল হাইমের জন্ম উনিশশো এগারো সালে। স্কুলে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। মিউনিখে যান দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করতে। এই মিউনিখেই ‘ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কিং পার্টি’ বা নাৎসি পার্টির সদর দফতর ছিল। পরে তিনি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাকোলজিতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।”

“আমি ওসব শুনতে চাইছি না,” আপত্তি করে দীপশিখা, “লোকটা নিজের আইডিয়োলজি নিয়ে কিছু লেখেনি?”

“আছে...” বলল আলপথ, “গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের মাঝে টুকটাক রয়েছে। যেমন ধরুন এইখানটা...”

*

কার্ল হাইমের নোটবুক

স্যর ফ্রান্সিস গ্যালটন উনিশশো ঊনচল্লিশ সালে যে নিয়ম চালু করেছিলেন সেটা অধিকাংশ জার্মানবাসী বুঝতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, তিন বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে যারা বিকলাঙ্গ বা যাদের জিনঘটিত সমস্যা আছে, তাদের নাম সরকারি দফতরে নথিভুক্ত করতে হবে। মহামান্য হিটলার এবং নাৎসি পার্টির শীর্ষস্থানীয় সদস্য এবং জার্মান পুলিশ-প্রধান হেনরিক হিমলারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। ওই দু'জন নানা রকমের তালিকা বানাতে ভালবাসতেন। সবাই ভেবেছিল এটা সেই রকম কোনও তালিকা।

তালিকা তৈরি হওয়ার একমাস পরে বাচ্চাগুলিকে তুলে আনা হতে লাগল কাছের হেল্থ সেন্টারে। বাবা-মাকে বলা হচ্ছিল, ওদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য দফতর এই কাজ করছে। এই ভাবেই, খুব গোপনে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শুরু হয়েছিল বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের বিষ-ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলার পবিত্র মিশন। উদ্দেশ্য, একটি নীরোগ জাতি গঠন। পরবর্তী ছ'বছরে সরিয়ে দেওয়া হল তিন লক্ষ শিশুকে। বিকলাঙ্গ, জিন-ঘটিত রোগ, সমকামিতা— সব রকম রোগমুক্তির ব্যবস্থা করা হল। রোগবিহীন, শুদ্ধ রক্তের জাতি তৈরির বিজ্ঞানের আরেক নাম হল ‘ইউজেনিক্স।’ ইউজেনিস্টরা কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় মাইনরিটি, সেক্সুয়াল মাইনরিটি, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, নিম্নবর্গ, অন্ত্যজ শ্রেণি, নিগ্রো, গরিব এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতো ফালতু মানুষদের গায়ের জোরে নির্বীজকরণ ঘটাচ্ছিলেন। সেই জায়গা থেকেই আমাদের দেশের দুই মহান নেতা ইহুদি নিধন যজ্ঞ শুরু করেন। সমাজের শক্তিশালী ও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতায়ন ঘটানোকে বিরোধীরা বলেন ছদ্মবিজ্ঞান, আমি বলি বিজ্ঞান। বিরোধীরা বলেন পলিটিক্স, আমি বলি জেনেটিক্স।

ডাক্তারের কাজ শুধু শরীরের অভ্যন্তরের জীবাণু সাফ করা নয়। সমাজের জীবাণুও সাফ করাও তার কাজ। মেডিক্যাল এথিক্স একদিকে আর দেশভক্তি অন্য দিকে। আমি বিশ্বাস করি রাষ্ট্রকে সাহায্য করা উচিত, বিরোধী শক্তিকে নিকেশ করা উচিত।

‘রেশিয়াল হাইজিন’ নিয়ে বলার ফাঁকে অন্য কথা বলে নিই। বিরোধীদের বাড়াবাড়ি এখন বড্ডো বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে। এখন জানা যাচ্ছে, লাল ফৌজ আমাদের দখলে থাকা পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে দ্রুত এই ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি কোনও কিছুকেই ভয় নাই না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যে নিজের জীবন দিতেও রাজি। কিন্তু আমার এইসব গবেষণার কী হবে?

*

আলপথের পাঠ শুনতে শুনতে বিরক্ত দীপশিখা, “বুলশিট! এক জিনিস আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে। অনার কিলিং, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ খুন... জঘন্য! লোকটার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কিছু পেলে?”

“এই যে ম্যাডাম। পড়ছি,” বলল আলপথ।

*

কার্ল হাইমের নোটবুক

সাতই জানুয়ারি, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। রাশিয়ান সেনারা এত কাছে এসে গেছে যে কয়েক দিনের মধ্যে আউশউইৎজ়ের দখল নেবে। মহামান্য ফ্যুয়েরারের নির্দেশে আরও অনেক ডাক্তারের সঙ্গে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের দায়িত্বে আছে ওয়ার্ডেন ম্যাক্স। ওর মুখে শুনলাম, এখান থেকে আমরা অনেকটা দূরের গ্রস-রোজ়েন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যাচ্ছি। মন খুবই খারাপ। ম্যাক্সের কাছে জানতে পারলাম, আমার যাবতীয় গবেষণার তথ্য এবং ক্যাম্পের সমস্ত মেডিক্যাল রেকর্ড পুড়িয়ে দিয়েছে এসএস। যাতে ওই তথ্য মিত্রশক্তির হাতে না পড়ে। আমি আনতে পেরেছি মাত্র দু'বাক্স নমুনা এবং আর কিছু পরীক্ষার রেকর্ড আর এই নোটবুকটা।

আঠেরোই জানুয়ারি, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। লাল ফৌজ আউশউইৎজ় দখল করেছে। আমি নিশ্চিত, ওদের পরাজয় হবে।

দশই ফেব্রুয়ারি, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। ম্যাক্সের মুখে শুনলাম লাল ফৌজ এদিকেই আসছে। এখান থেকেও চলে যেতে হবে। আমার মন একদম ভাল নেই।

আঠেরোই ফেব্রুয়ারি, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। ওদের আসতে আর এক সপ্তাহ বাকি। ম্যাক্সের নির্দেশে আমি গ্রস-রোজ়েন থেকে ছদ্মবেশে ধরে পালিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা চলে যাওয়া নয়। এটা পালিয়ে যাওয়া। ম্যাক্স বলেছে, ধরা পড়লে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে। তবে এটা সাময়িক পরাজয়। আমি নিশ্চিত যে দেশদ্রোহী আর উদারপন্থীদের হাতে ইউজেনিক্সের সাময়িক পরাজয় হচ্ছে। কিন্তু

আমরা আবার ফিরে আসব। রক্তের শুদ্ধতার আদর্শ কখনও মরে না।

*

আলপথ চুপ করে গেছে। দীপশিখা বলল, “কী হল? খাতা শেষ?”

আলপথ বলল, “মাঝের কয়েকটা পাতা ছেঁড়া। শেষের কয়েকটা পাতায় ইন্টারেস্টিং কথা লেখা আছে। আমি পড়ছি।”

*

কার্ল হাইমের নোটবুক

অনেক দিন বাদে লিখতে বসলাম। কিছু জরুরি কথার রেকর্ড রাখার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই যেটা বলার, সেটা হল, মিত্রশক্তির হাতে ধরা পড়ার পরেও আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। এর কারণ হল, ওরা মিশ্র রক্তের প্রাণী এবং নির্বোধ। তাই ‘ওয়ান্টেড তালিকা’ ভাল ভাবে বানাতে পারেনি। ওদের লিস্টে আমার নাম ছিল না, এটা একটা সুবিধে। অন্য সুবিধে হল, আমার হাতে এসএস-এর মতো নিয়মমাফিক ব্লাড গ্রুপের ট্যাটু আঁকা ছিল না। ওই ট্যাটুর জন্যে অনেক এসএস ধরা পড়েছে।

মিত্রশক্তি ভাবছে নাৎসি পার্টি আর নেই। ওরা জানে না যে প্রাক্তন এসএসদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে। যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানে লড়াই শেষ যাওয়া নয়। ওটা পরের লড়াই শুরু হওয়ার প্রথম ধাপ।

পরাজয়ের পরে কাজ বাড়ে। এখনও তাই হচ্ছে। প্রাক্তন এসএসদের এই মুহূর্তে প্রধান কাজ হল আমার মতো পার্টি সদস্যদের জার্মানি থেকে পালানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া। তার জন্যে ভুয়ো ডকুমেন্ট লাগে, সেফ প্যাসেজ লাগে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পার্টি দরদি মানুষ লাগে।

এসএস-এর বানিয়ে দেওয়া পাসপোর্ট অনুযায়ী আমার নতুন নাম হয়েছে। ডাক্তারি ডিগ্রি সেই নামেই। ‘র‍্যাটলাইন’ প্যাসেজের সাহায্যে জার্মানি ছেড়ে পালাচ্ছি।

এখানে বলা ভাল, ‘র‍্যাটলাইন’ বা ‘ইদুরের পঙ্‌ক্তি’ হল জার্মানি এবং ইউরোপ থেকে পালানো নাৎসিদের জন্যে সেফ প্যাসেজ। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, মেক্সিকো, চিলি...

এই মুহূর্তে আমি আর্জেন্টিনার একটি হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে ভর্তি রয়েছি। আমার দেখাশোনা করছে যে নার্স, সে এখন এদিকেই আসছে। লেখা শেষ করি।

## ৭

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সৈকত বলল, “এত জোরে ওয়াক তুললে কেন? এরকম আবার হলে হাসপাতালে অ্যাডমিট করতে হবে।”

কেন বমি পেয়েছিল, সে কথা সৈকতকে বলার কোনও মানে হয় না। দীপশিখা বলল, “ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। ঠিক হয়ে যাবে। আজ একবার মন্দিরা ম্যাডামকে ফোন করে নেব।”

দীপশিখাকে জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে সৈকত বলল, “একটা কথা বলব? রাগ করবে না?”

“কী কথা?” ছদ্ম বিস্ময় দীপশিখার চোখেমুখে।

“আমি ভাবছিলাম...'' সৈকতের মুখে ফিচেল হাসি, ''প্রথম ইসু ছেলে হলে কী মজা হত, তাই না?”

“আমি এর মধ্যে কোথাও মজা দেখতে পাচ্ছি না ঘঞ্চুসোনা,” সৈকতের থুতনি নেড়ে দেয় দীপশিখা।

“এটা তো আনপ্ল্যানড প্রেগন্যান্সি। আমি বলছিলাম কি, এটাকে যদি ইয়ে করা যায়...”

“ইয়ে করার কথা বলছ? তুমি সিরিয়াস?” দীপশিখা অবাক! “আমি সাঁইত্রিশ বছর বয়সে কনসিভ করেছি। কত রিস্ক তুমি জানো। তা ছাড়া অ্যাবর্শন করালে পরের বারও যে মেয়ে আসবে না, তার গ্যারান্টি তুমি দিতে পারবে?”

“আহ! সামান্য কথায় অ্যাটাকিং মোডে চলে গেলে হবে? তোমাকে নিয়ে এই হল মুশকিল। কথা না বুঝেই ফেমিনিস্টদের মতো হাঁউমাউ জুড়ে দাও।”

“ওরে বোকাখোকা! নিজের পেটে একটা বাচ্চা এনে দেখা না!” খুব রেগে গেলে আর খুব ভালবাসলে সৈকতকে তুইতোকারি করে দীপশিখা, “আর একবার যদি এইসব ফালতু, সেক্সিস্ট কথাবার্তা শুনেছি...”

সৈকত ভুরু কুঁচকে বলল, “আমার একটা ছেলে চাই। এর মধ্যে কোনও সেক্সিজ়ম নেই। আমি আমার চয়েস বলেছি।”

“আমি যদি তোকে না বলতাম পেটের বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে, তা হলে চয়েস কোথায় যেত?”

“তুমি বলেছ বলেই আমি রিকোয়েস্ট করছি। আমাদের ফ্যামিলিতে প্রথম সন্তান ছেলে হওয়াটা প্রথা। আমি, বাবা, ঠাকুরদা, তাঁর বাবা... তুমি তো সবটাই জানো।”

“হ্যাঁ, শাশুড়িমা এই সব মাম্বো-জাম্বো বলেই থাকেন,” রাগ কন্ট্রোল করছে দীপশিখা, “আমার ক্যানসারের সময় কোন এক সাধুবাবার শেকড় এনে দিয়েছিলেন। তাই বলে তুমিও? আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না।”

“প্লিজ় ঘেঁটুরানি! আমার কথাটা ভেবে দেখো! মাত্র মিনিট পনেরোর ব্যাপার!”

দীপশিখা চুপ করে গেল। সৈকতের এই অন্ধকার দিকটার কথা সে জানত না। এত বছরের প্রেম, এত বছরের বিয়ে, এত বছর ধরে একসঙ্গে থাকা... তারপরেও মানুষ কত অচেনা থাকে! দীপশিখা নিজেকেই কি ভাল করে চিনে উঠতে পেরেছে? নাহ! পারেনি। তা হলে অন্য মানুষকে চিনবে কী করে?

অন্য মানুষদের ভুলে গিয়ে কাছের মানুষটিকে চেনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেই চেষ্টা চালাতে গিয়ে দীপশিখা বলল, “তুমি বলেছিলে আজকে ফিরবে। গতকাল হঠাৎ চলে এলে কেন?”

“আসতে পারি না?” সৈকত এবার অ্যাটাকিং মোডে, “নিজের বাড়িতে, নিজের বৌয়ের কাছে এলে কৈফিয়ত দিতে হবে?”

“আসার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে না,” নিজেকে গুটিয়ে নিল বিরক্ত দীপশিখা, “আমাকে না জানিয়ে আসার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে। আমাকে মিথ্যে বলার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে!”

সৈকত কিছুক্ষণ নীরবে বৌকে মেপে বলল, “তুমি এখন ইরিটেটেড! পরে কথা বলব,” তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের কয়েক ঘণ্টা রুটিনমাফিক কাটল। বুলুদি কলিং বেল বাজাল, বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে মোবাইলে ই-পেপার পড়ল দীপশিখা, কারণ খবরের কাগজ বন্ধ। হাসপাতাল যাওয়ার জন্যে ফ্ল্যাট থেকে যখন বেরোল, সৈকত তখন ঘুমোচ্ছে অথবা মটকা মেরে পড়ে আছে। বৌয়ের মুখোমুখি হতে চাইছে না।

ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে না-ঢুকতেই বরুণের ফোন। ফোন ধরে দীপশিখা বলল, “বলুন।”

“মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে সাসপেক্টদের মোবাইল নম্বর গতকালই পৌঁছে গিয়েছিল। সবার কল রেকর্ড আমার কাছে আছে। গতকাল ওই নম্বরগুলোর কোনওটার থেকেই আপনার কাছে ফোন যায়নি।”

“তা হলে?”

“যে নম্বর থেকে কলটা জেনারেট হয়েছে সেটা এখন সুইচ্‌ড অফ। মোবাইল কোম্পানির ডেটা অনুযায়ী ওটা হাতফেরতা মোবাইল। সিম কার্ড বানানো হয়েছিল নকল আইডি প্রুফ দিয়ে। কাজেই ওই মোবাইল ফোন সুইচ অন না হওয়া পর্যন্ত কিছু জানা যাবে না।”

“ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান!” দীপশিখা ফোন কাটল। এবারে কম্পিউটার অন করতে হবে। প্রিয়ার ময়না তদন্তের ভিডিয়োটা তাকে টানছে। মৃত প্রিয়া তাকে অনেক কথা বলতে চাইছেন।

কম্পিউটার অন করার আগেই চলে এসেছে সাধু ডোম। দীপশিখা বলল, “বলুন সাধুদা।”

“একটা কেস আছে। সাল্টে দিন ম্যাডাম। পরেরগুলো রাজু এলে করবেন।”

“কার ক্যাচ?” চেয়ার থেকে উঠে মর্গের দিকে এগোচ্ছে দীপশিখা।

“গুড্ডুদা ফোন করেছিলেন। বৌকে বিষ খাইয়ে মেরেছে বর আর শাশুড়ি। বৌ বারবার মেয়ে পয়দা করছিল বলে খুন। এখন বর আর শাশুড়ি— দু’জনেই জেলে। পচে মরুক শালারা!”

কন্যা ভ্রূণ প্রসঙ্গটা খুব ডিস্টার্বিং। অন্য বিষয়ে গেল দীপশিখা, “আচ্ছা সাধুদা, তুমি এই কাজ করো, তোমার ছেলেও এই কাজ করো— এটা কেন?”

“অমিতাভ বচ্চনের ছেলে অ্যাক্টো করে। রাজ কপূরের গুষ্টি হিরো-হিরোইন। ওদের কখনও এই কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেছে?”

মাস্কের আড়ালে লজ্জায় জিভ কাটল দীপশিখা। অভ্যস্ত হাতে স্ক্যালপেল চালাতে চালাতে বলল, “হ্যাঁ। ওদেরও এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। তারকার ছেলেমেয়েদের বলা হয় ‘স্টার কিড’ বা ‘নেপো কিড’। ‘নেপো’ কথাটা

এসেছে ‘নেপোটিজ়ম’ বা ‘স্বজনপোষণ’ থেকে। আসল কথা হল, বাবা-মা যে পেশায় আছে, সেই পেশার খুঁটিনাটি তাঁদের জানা। প্রচুর চেনাশোনাও আছে। কাজেই বাবা-মায়েরা সেই দিকেই বাচ্চাদের ঠেলবে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা।”

“সেই নিয়ম তো ভাল পেশার লোকেদের জন্যে ম্যাডাম। আপনার বাচ্চা ডাক্তার হবে, উকিলের বাচ্চা উকিল হবে। কিন্তু জল্লাদের ছেলে কেন জল্লাদ হয়? সাধু ডোমের ছেলে কেন রাজু ডোম হয়? সে রাজু মাস্টার হয় না কেন?”

ভিসেরা প্রিজ়ার্ভ করার কাজ শেষ। বডি সেলাই করার দায়িত্ব সাধুকে দিয়ে দীপশিখা বলল, “পেশা নির্বাচনের পিছনে জেনেটিক ফ্যাক্টর কাজ করে কি না জিজ্ঞেস করছ? সেটা আমার জানা নেই গো!”

‘জিন’ কাকে বলে জানা না-থাকলেও বংশগতি নিয়ে সাধুর ধারণা আছে। সন্তানের বাবা কে, সেটা জানার জন্যে জিন পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ এই বিভাগে নিয়মিত হয়। সাধু বলল, “‘খুনিয়া জিন’ বলে কিছু হয় ম্যাডাম?”

“জানি না,” সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে মর্গ থেকে বেরোল দীপশিখা। নিজের কেবিনে গিয়ে মোবাইলে আলপথকে ধরল।

ফোন ধরে আলপথ বলল, “হ্যাঁ ম্যাডাম।”

“ওই খাতা থেকে শুধু কাজের কথাগুলো পড়ো। আমার হাতে সময় নেই। আমার ধারণা তোমার হাতেও নেই। উল্কির কাস্টমার চলে আসবে।”

“উল্কি না ম্যাডাম, ট্যাটু,” বলল আলপথ, “আপনার মনে নেই, কার্ল হাইমের হাতে ব্লাড গ্রুপ ট্যাটু করা ছিল না বলে লাল ফৌজের হাতে ধরা পড়েও বেঁচে যায়?”

“মনে আছে। তুমি পড়তে থাকো।”

*

কার্ল হাইমের নোটবুক

আর্জেন্টিনার হাসপাতালে আমার তিন সপ্তাহ থাকা হয়ে গেল। শরীরে কোনও রোগ নেই। দুর্বলতা, হাত-পা কাঁপা-র মত নানান অনির্দিষ্ট লক্ষণ নিয়ে ভর্তি আছি। আসল উদ্দেশ্য মিত্রশক্তির নজরের বাইরে থাকা, চুপচাপ সময় কাটানো এবং প্রথম সুযোগেই অন্য দেশে চলে যাওয়া। মিত্রশক্তি জানতে পেরেছে যে এসএসরা জার্মানি ছেড়ে অন্য দেশে পালাচ্ছে। সেই সব দেশের সরকারের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করছে।

যে সেবিকা আমাকে দেখাশোনা করছে তার নাম লীলা দাশ। লীলাকে জার্মান ভেবে ভয়ে ভয়ে ছিলাম কারণ ‘দাশ’ একটি জার্মান পদবি, যেটা ‘dachs’ বা ‘dahs’ থেকে এসেছে। অবশ্য ওর শ্যামলা গায়ের রং দেখে মনে হয়েছিল যে বিশুদ্ধ জার্মান নয়। পরে জানলাম ‘দাশ’ পদবিটি ভারতবর্ষ নামের ব্রিটিশ কলোনিতেও আছে। আমি এই কলোনির নাম শুনেছি, তবে পৃথিবীর কোন গোলার্ধে জানি না। জার্মান আর ভারতীয় ভাষায় ‘দাশ’ পদবির মিল পেয়ে নতুন প্ল্যান কষেছি।

গত এক সপ্তাহ ধরে নিজের সঙ্গে লড়াই করেছি। একদিকে আমার আদর্শ, অন্যদিকে আমার বেঁচে থাকার দায়। তুলাযন্ত্রে ওজন করে দেখলাম, নাৎসি আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই জারি রাখার জন্যে আমাকে পালাতে হবে। সেই কাজে সাহায্য করবে লীলা দাশ। আমি ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করব। প্রয়োজন হলে বিয়েও করব। আমাদের সন্তানকে শিক্ষা দেব যে মেডিক্যাল এথিক্স ভুলে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা উচিত। বিরোধী শক্তিকে নিকেশ করা উচিত। ইনফ্যাক্ট, আমি আমাদের সন্তানকে বোঝাব যে বড় হয়ে ডাক্তারি পড়তে হবে।

*

“কার্ল হাইম নিজের নাম বদলে ফেলেছিলেন না?” উত্তেজিত দীপশিখা প্রশ্ন

আমি ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করব। প্রয়োজন হলে বিয়েও করব। আমাদের সন্তানকে শিক্ষা দেব, মেডিক্যাল এথিক্স ভুলে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা উচিত।

করে আলপথকে। পাঠ থামিয়ে আলপথ বলে, “হ্যাঁ ম্যাডাম, ভুয়ো পাসপোর্ট আর ভুয়ো ডাক্তারি ডিগ্রি বানিয়ে দিয়েছিল এসএস।”

“কার্লের নতুন নাম কী হয়েছিল?”

“এসএস-এর কল্যাণে কার্ল হাইমের নতুন নাম হয় পল দাশ। লীলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় আর্জেন্টিনার হাসপাতালে। পল কখনওই লীলাকে ভালবাসেননি। পলের কাছে লীলা ছিলেন ভারতবর্ষে আসার চাবিকাঠি। উনি প্ল্যানফুলি লীলার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেন এবং উনিশশো ছেচল্লিশ সালে আর্জেন্টিনাতেই লীলাকে বিয়ে করেন। লীলার বাবা-মা কলকাতার প্রতাপশালী পরিবার ছিলেন। মেয়েকে নার্সিং পড়াতে সেই জমানায় আর্জেন্টিনা পাঠিয়েছিলেন।”

“মূল কথায় এসো আলপথ!” দীপশিখা অত্যন্ত উত্তেজিত।

“লীলা দাশের চিকিৎসক-স্বামী হিসেবে, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটির সহায়তায় পল দাশ ভারতবর্ষে আসেন উনিশশো ছেচল্লিশ সালের শেষের দিকে। অজুহাত, ভারতবর্ষের প্লেগ আর কলেরা রোগ নিয়ে গবেষণা। কলকাতায় এসে ওঠেন ভবানীপুরে লীলার বাপের বাড়িতে, যার নাম পুনশ্চ।”

প্রিয়ার মনে পড়ে যাচ্ছে পুনশ্চর দেওয়ালে ঝোলা, ফ্রেমে বাঁধানো ফটোটির কথা। সে বলল, “ওদের কলকাতায় থাকা নিয়ে কিছু লেখা নেই?”

“লীলা দাশের বাবা-মায়ের সঙ্গে পলের আলাপের কথা লেখা আছে,” বলল আলপথ, “উনিশশো ছেচল্লিশ সালে পল ও লীলার ছেলের জন্মের কথা আছে। বাচ্চার নাম রাখা হয় ববি।”

দীপশিখার মনে পড়ল ববি দাশের চোখের মণির রং সবুজ। সে বলল, “আমার ধারণা জার্মানিতে ছেলেদের নাম হিসেবে ‘ববি’ পপুলার। আমাদের দেশে ববি নাম হয় মেয়েদের।”

খুকখুক করে হেসে আলপথ বলল, “নোটবুকে লেখা আছে, উনিশশো আটচল্লিশ সালে লীলার বাবামা বার্ধ্যক্যজনিত কারণে মারা যান। ববি পলের খুব ন্যাওটা, সেটাও জানা যাচ্ছে। আর জানা যাচ্ছে, লীলা সেবিকার চাকরি করতেন শিশুমঙ্গলে। উনিশশো পঞ্চাশ সালে পুনশ্চর ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। ভবানীপুর থানার অফিসার ইন চার্জ বিজন চট্টোপাধ্যায় সেই কেসের তদন্ত করেন। কেস নম্বর ইউডি ১২/৫০, পিএস ভবানীপুর। আত্মহত্যা হিসাবে কেস ফাইল ক্লোজ় করা করেন আইও বিজন চট্টোপাধ্যায়...”

“যিনি মারা গেছেন!” আপনমনে বলে দীপশিখা।

“নোটবুকের শেষ এন্ট্রি নিজের অসুস্থতার খবর দিয়ে। নোটবুকের শেষ দু’টি শব্দ হল, “হেইল হিটলার!”

“থ্যাঙ্ক ইউ আলপথ,” উত্তেজিত দীপশিখা ফোন কাটল। তার বুকের বাঁদিক দিয়ে মেল ট্রেন দৌড়ে যাচ্ছে আউশউইৎজ় অভিমুখে। মাথায় ঘনিয়ে উঠেছে বিষণ্ণতার ধূসর ধোঁয়া। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিপন্নতার লকলকে লাল জিভ। প্রিয়ার ময়না তদন্ত করতে গিয়ে ইতিহাসের কোন আবর্তে জড়িয়ে যাচ্ছে সে!

বিপন্নতা আর বিষণ্ণতা! এই দুই ডাইনিবুড়ির পাল্লায় সে পড়েছিল স্তন অপারেশনের পরে। তখন মুঠো মুঠো ঘুমের ওষুধ খেতে হয়েছিল। একবার আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিল। আজ সে রকম কোনও ইচ্ছে করছে না, তবে টেনশন কমানোর জন্যে একটা কিছু একটা লাগবে। লাগবেই।

টেবিল থেকে হাসপাতালের টিকিট

নিয়ে দ্রুত ঘুমের ওষুধের বড়ির নাম লিখল দীপশিখা। ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরলেই হাসপাতালের গেট। মূল রাস্তায় পড়ে ডানদিকে ঘুরলে পরপর ওষুধের দোকান, শিখদের গুরুদ্বার, ধাবা। এখানেই কোথাও একটা সিয়ার জেঠার ওষুধের দোকান আছে। সামনেই এলগিন রোডের ক্রসিং। সেই ক্রসিংয়ে পড়ে একটু এগোলেই রাস্তার মাঝখানে গোলমন্দির।

তবে দীপশিখাকে অত দূর যেতে হবে না। সামনে যে দোকানটা এল, সেটার কাউন্টারে হাসপাতালের টিকিট এগিয়ে একপাতা ওষুধ কেনে দীপশিখা। দাম মিটিয়ে ফুটপাতে নেমে, হাসপাতালের গেটে আসার আগেই একটা বড়ি টপ করে গিলে নেয়। গর্ভাবস্থায় এসব ওষুধ খেলে ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে। সে কথা জেনেই ওষুধ খেয়েছে। আগে তো এই মুহূর্তটায় মানসিক ভাবে স্টেব্‌ল থাকতে হবে। তারপরে অন্য কথা।

শীতের ভোরের ফিনফিনে কুয়াশা যেমন রোদ উঠলেই মিলিয়ে যায়, ঠিক সেই রকম ভাবে মিলিয়ে গেল বিপন্নতা। অন্য এক সংশয় দেখা দিল দীপশিখার মনে। এই ওষুধ খাওয়ার জন্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে! সে কি মা হতে পারবে? জড়ভরত বাচ্চার জন্ম দেবে না তো!

দীপশিখা বুঝতে পারল সে বিপন্নতা আর বিষণ্ণতার দুষ্ট চক্রে জড়িয়ে পড়ছে।

## ৮

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দীপশিখা খেয়াল করল সৈকত বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। তার মানে বুলুদি এসে গেছে! সৈকত চা খেতে ডাকল না কেন? ক'টা বাজে?

ধড়মড় করে উঠে মোবাইলে সময় দেখে দীপশিখা। আজ বুধবার, সতেরোই অগস্ট, এখন সকাল সাড়ে সাতটা বাজে। যাক বাবা! খুব বেশি দেরি হয়নি। বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে বারান্দায় গিয়ে সৈকতের পাশে বসে সে বলল, "আমাকে ডাকোনি কেন?"

"কাল রাতে তোমার ডিস্টার্বড স্লিপ হয়েছে। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে বকছিলে। বুলুদি যখন কলিং বেল বাজাল তখন তুমি ডিপ স্লিপে।"

হাই তুলতে গিয়ে দীপশিখা বুঝতে পারল শরীর খুবই ক্লান্ত। নড়াচড়া করতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে মাথায় দশ কিলোর পাথর বাঁধা। এ সবই ঘুমের ওষুধের জন্যে। ওটা খাওয়ার কথা সৈকতকে বলবে কি না, কিছুক্ষণ ভাবল দীপশিখা। অবশেষে ঠিক করল বলবে না। একবারই খেয়েছে। আর খাবে না। ওই পর্ব ভুলে যাওয়াই ভাল।

ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যাচ্ছে কই? মাথা ভার বলে তো আর বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না। বুলুদির দিয়ে যাওয়া চা শেষ করে অটো পাইলট মোডে চলে যায় দীপশিখা। রোবটের মতো নিত্যকর্মপদ্ধতি চুকিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর আগে সৈকতকে বলে, "আর্লি ফেরার চেষ্টা করছি। বাইরে খেতে যাবে, না অ্যাপ থেকে আনাবে?"

"অ্যাপ, অ্যাপ!" হাত নাড়ে সৈকত। আবার খবরের কাগজের মধ্যে ঢুকে যায়।

ডিপার্টমেন্টে ঢুকে নিজের কেবিনে বসতে না-বসতেই সপ্তর্ষি রায়ের ফোন। পুলিশমন্ত্রী কেজো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কাজ কদ্দুর এগোল?"

"আমি তো রেডি স্যর! ভিসেরা রিপোর্টের জন্যে আটকে আছি। আপনিই তো বললেন যে দেখছেন! ওদের একটু ফোন করে বলুন না স্যর!" মিষ্টি গলায় বলল দীপশিখা।

"হুম," বিরক্ত মন্ত্রীমশাই ফোন কেটে দিয়েছেন।

চেয়ারে বসে কম্পিউটার অন করে দীপশিখা। কাল থেকে সে ময়না তদন্তের ভিডিয়োটা দেখার চেষ্টা করছে কিন্তু হয়ে উঠছে না।

"আমি, ডক্টর দীপশিখা মুখার্জি, বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, ইউডি কেস নম্বর ২০১/২২-এর পোস্ট মর্টেম শুরু করলাম। ভিক্টিমের নাম প্রিয়া দাশ, বয়স— ইনকোয়েস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী— সাতচল্লিশ। পরনে শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ়, ব্রা এবং ডেনিমের শু।

ভিডিয়ো পজ় করে দীপশিখা। রিওয়াইন্ড করে শাড়িটা দেখে। ডিজিটাল প্রিন্টের শাড়িতে নানান সংখ্যা আর হরফ লেখা। ভিডিয়ো বারবার থামিয়ে দীপশিখা দেখল শব্দ এবং সংখ্যার একটা কম্বিনেশন বারবার লেখা হয়েছে। 'UD/33/97/Bhawa।'

"উনিশশো সাতানব্বই সালে ভবানীপুর থানায় আনন্যাচরাল ডেথ?" বিড়বিড় করে দীপশিখা। কম্পিউটার শাট ডাউন করে কেবিন থেকে বেরিয়ে রাজুকে বলে, "আমি একটু বেরোচ্ছি। মানস স্যরকে বলবি আজকের পোস্ট মর্টেমগুলো করে দিতে।" তারপরে কার পার্কিং-এর দিকে দৌড়য়। গাড়িতে উঠে বরুণকে ফোন করে বলে, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। একটা ইউডি কেস নম্বর আপনাকে মেসেজ করেছি। ফাইলটা বের করে রাখুন।"

*

"পুনশ্চতে প্রথম অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে উনিশশো পঞ্চাশ সালে। মারা যান বাড়ির মেয়ে লীলা দাশ। কেস ফাইল বলছে আত্মহত্যা। দ্বিতীয় অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে দু'হাজার বাইশ সালে। মারা গেছেন বাড়ির বৌ প্রিয়া দাশ। নিশ্চিত ভাবে এটা খুন। এই গন্ডগোলের মধ্যে আর একটা আনন্যাচরাল ডেথের কেস ফাইল ঢুকে গেল?" নতুন কেস ফাইল টেবিলে রেখে বলে বরুণ। "আমাদের উচিত ইতিহাস বইয়ের মধ্যে না-ঢুকে বর্তমানে ফোকাস করা। অন্য কেস নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে প্রিয়া দাশের কেসটাই পাখির চোখ হওয়া উচিত।

"আপনি লীলা দাশের ফাইলটা পড়েছেন?" জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

"দু'হাজার বাইশ সালের ফাইল ওল্টানোর সময় পাচ্ছি না..." বিরক্তি প্রকাশ করে বরুণ।

"জার্মান ভাষায় লেখা নোটবুকের বাংলা অনুবাদ পেন ড্রাইভে ভরে এনেছি। আপনি চাইলে প্রিন্ট আউট বের করে লীলা দাশের ফাইলে ঢুকিয়ে রাখতে পারেন।"

কনস্টেবল সুব্রত প্রামাণিককে ডেকে পেন ড্রাইভ দিয়ে বরুণ বলল, "তিন কপি প্রিন্ট করে নিয়ে এসো। আর কাউকে এক কাপ চা দিতে বলো।"

সেলাম ঠুকে সুব্রত চলে যাওয়ার পরে বরুণ বলল, "আমি রাউন্ডে বেরোচ্ছি। আপনি ততক্ষণ ফাইলটা ঠান্ডা মাথায় পড়ুন। কিছু লাগলে সুব্রতকে বলবেন।"

ইউডি ৩৩/৯৭-র ফাইল খুলে দীপশিখার মাথায় বাজ পড়ল। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুটিও ঘটেছিল পুনশ্চতে। ববি দাশের স্ত্রী কবিতা দাশের আত্মহত্যার ফাইল। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলেন কল্যাণ রায়। ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট, জেরার কপি, ময়না তদন্তের কপি— সব সাজানো রয়েছে। আর রয়েছে ইংরেজিতে লেখা একটি ডায়েরি ও একটি চিঠি।

চিঠিতে চোখ রাখে দীপশিখা। মনে মনে অনুবাদ করতে থাকে...

*

কবিতার চিঠি

আমি কবিতা দাশ, এখন রয়েছি বাল্টিমোরের বাড়িতে। এই চিঠিতে কিছু কথা লিখে রাখছি। কেন লিখছি, সেটা ঠিক সময়ে জানাব। সবার আগে বেসিক কিছু ইনফর্মেশন শেয়ার করা যাক।

আমার স্বামী ববি দাশের জন্ম উনিশশো ছেচল্লিশ সালে। বারো ক্লাস পাশ করে উনিশশো চৌষট্টি সালে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে অ্যানাস্থেশিয়ায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার জন্যে বাল্টিমোরের 'জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন' নামের মেডিক্যাল কলেজে আসে উনিশশো তিয়াত্তর সালে।

আমি আমেরিকায় জন্মানো সেকেন্ড জেনারেশন বাঙালি। স্কুলিং এদেশেই। ডাক্তারি পাশ করার পরে গাইনিকলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে ঢোকার ঠিক আগের বছরে ববির সঙ্গে আলাপ ও প্রেম। আমাদের বিয়ে হয় উনিশশো ছিয়াত্তর সালে। তখন আমার বয়স চব্বিশ আর ববির তিরিশ। আমাদের ছেলে হয় উনিশশো সাতাত্তর সালে। আমিই নাম রাখি নীল।

বেসিক ইনফো লেখার পাট শেষ। এবারে আসা যাক অন্য কথায়।

বাবা-মায়ের মুখে 'বাংলা' নামের দেশের কথা শুনে একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়েছিল। একটু বড় হয়ে কয়েকবার কলকাতা শহরে গিয়েছিলাম। শীতকাল বা দুর্গাপুজোর সময়ে গেলে ভালই লাগত। রাস্তায় বড্ড ভিড়, সবাই ভীষণ চেঁচিয়ে কথা বলে, বিচ্ছিরি রকমের পলিউশন... এসব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও শহরটার মধ্যে ম্যাজিক আছে। কী রকম ম্যাজিক? বুঝতে পারতাম না। তবে এটা বুঝতাম, আমার শিকড় বাংলায়। এখানে বলে রাখা ভাল, আমি বাংলা ভাষা বলতে, বুঝতে এবং পড়তে পারলেও লিখতে পারি না।

ববির সঙ্গে আমার যে সব কারণে প্রেম হয় তার মধ্যে অন্যতম হল, ও বাঙালি। কলকাতার লোক, বাংলা ভাষায় কথা বলে, দেখতে দুর্দান্ত— আর কী চাই? ভেবেছিলাম বিয়ে করে সুখী হব। দু'জনে জন হপকিন্সে চাকরি করব, হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকব। ওর গা থেকে বাংলা ভাষা আর কলকাতা শহরের গন্ধ শুঁকে নেব। এতেই আমার শিকড়-প্রবণতা শান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু সব কিছু কি আর নিজের ইচ্ছে মতো হয়? বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই খেয়াল করছিলাম, ববি আমেরিকায় থাকতে রাজি নয়। কলকাতায় ফিরতে চায়। আরও স্পেসিফিক ভাবে বলতে গেলে বাবার কাছে ফিরতে চায়। কোনও ছেলের মধ্যে এত বাবা-প্রীতি কখনও দেখিনি।

উনিশশো সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ও রোজ আইএসডি কল করত। কখনও সেটা শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে, কখনও ভানুদা নামে একটা লোকের সঙ্গে। কলকাতার পরিস্থিতি এখন কী রকম, খুনজখম আর হচ্ছে কি না, সবাই গ্রেফতার হয়েছে কি না— এই রকম সব প্রশ্ন শুনতে পেতাম।

হঠাৎ একদিন ববি ঘোষণা করল, "আমি কলকাতা ফেরত যাচ্ছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

ও বলল, "মা মারা গেছেন। বাবার বয়স হচ্ছে। তাকে একা ফেলে আমি এ দেশে থাকতে পারব না।"

"আর আমি কী করে থাকব? তোমার ছেলে কী করে থাকবে?"

"আমি তো তোমাদের যেতে বারণ করিনি। তোমরাও চলো।"

আমি রাগ করে বললাম, "যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন কি বলেছিলে যে আমেরিকা ছেড়ে চলে যাবে?"

ববি চুপ করে গেল। আমার মনে হতে লাগল, ও কলকাতা থেকে পালানোর জন্যে আমেরিকায় এসেছিল। বিপদ কেটে গেছে বলে ফিরে যেতে চাইছে। এটাও মনে হয়েছে, ও আমাকে ভালবাসে না। সময় কাটানোর জন্যে একজন সঙ্গী খুঁজে নিয়েছিল।

আমার সব যুক্তি, আবেগ, ভালবাসা অগ্রাহ্য করে ও কলকাতা চলে গেল উনিশশো আটাত্তর সালে। আমি আর নীল এখানে রয়ে গেলাম।

তারপরে দীর্ঘ দু'দশক পেরিয়ে গিয়েছে। নীলের বয়স এখন কুড়ি। ববি এদেশে আসে পাঁচ বছরে একবার। তবে নীলের সঙ্গে ওর চিঠি আর ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ আছে। নীলের মুখেই শুনেছি, কলকাতায় ফিরে পুনশ্চতে থিতু হয়েছে ববি। অ্যানাস্থেসিয়ায় ডিগ্রি থাকার জন্যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার নিয়ে কলকাতা শহরে কাজ পেতে অসুবিধে হয়নি। মধ্য কলকাতার বিখ্যাত নার্সিং হোমের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের বিভাগীয় প্রধান। ববি দাশের নাম এখন ভারতজোড়া। ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে হিসেবে সুনাম আছে। একাধিক ক্যাসেটও বেরিয়েছে। কলকাতার কালচারাল সার্কিটে খুবই জনপ্রিয়। কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠান করতে ও প্রতি বছর দিল্লি যায়। দিল্লির আমলাদের সঙ্গে খুবই দহরম মহরম।

ববি এখানে এলেই বারবার আমাকে অনুরোধ করে কলকাতায় শিফ্‌ট করতে। নীলের ব্রেন ওয়াশ কমপ্লিট। সে আমেরিকা ছেড়ে ভারতে যেতে রাজি।

গত বছর, মানে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ববি এই দেশে এসেছিল। ও ফিরে যাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, নীলকে নিয়ে কলকাতা যাব। পাকাপাকি ভাবে থাকার জন্যে নয়। সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

কী কারণ?

ববি একটা ডায়েরি ফেলে গিয়েছিল। সেটা আমার হাতে এসেছে। তাতে 'টর্চার মেডিসিন' বা 'নির্যাতন চিকিৎসা' নিয়ে যে সব কথা লেখা আছে, তা সুস্থ মানুষের চিন্তার বাইরে। চূড়ান্ত বিকৃতমনস্ক না হলে কেউ এইসব ভাবে না। আমেরিকা যাওয়ার আগে কলকাতা শহরে টর্চার মেডিসিন নিয়ে গবেষণা করেছিল ববি।

ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে উনিশশো সত্তর সালে। তখন কলকাতায় চলছে নকশাল মুভমেন্ট। সেই বছরই কোনও ভাবে ববির সঙ্গে যোগাযোগ হয় কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের অফিসার ইন-চার্জ ভানু গুহরায়ের সঙ্গে। নকশালদের ওপরে ববি টর্চার মেডিসিন প্র্যাকটিস করে উনিশশো সত্তর থেকে উনিশশো বাহাত্তর সাল জুড়ে। লিখতে থাকে একের পর এক রিসার্চ পেপার। বহু নকশাল সেই রিসার্চের কারণে খুন হয়েছে।

আমি ওর ডায়েরি থেকে কিছু অংশ এখানে লিখে রাখছি...

*

ববির ডায়েরি

স্বেচ্ছায় বা প্রতিষ্ঠানের চাপে পড়ে স্বাস্থ্যকর্মী যখন রোগীর অনুমতি না নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে নির্যাতন করেন, তাকে 'টর্চার মেডিসিন' বা 'নির্যাতন চিকিৎসা' বলা হয়। জেরা করতে, গোপন কথা বের করতে, বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সময়ের অভাবে প্রাণীদের শরীরে অগ্রিম পরীক্ষা না করে সরাসরি বন্দিদের ওপরে কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতির ট্রায়াল দিলে সেটিও টর্চার মেডিসিনের মধ্যে পড়ে।

হিপোক্রেটিক ওথে বলা আছে, 'আমি আমার ক্ষমতা এবং নৈতিকতা অনুসারে রোগীর ভালর জন্য চিকিৎসা করব।' বলা আছে, 'সচেতনভাবে, অন্য কারও স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে রোগীর ক্ষতি করব না।' কিন্তু এসব কথা মানলে চলে না। চিন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধের সময় জাপানি চিকিৎসকরা দশ হাজারের বেশি কোরিয়ান, চিনা ও আমেরিকান সৈন্যকে মেডিক্যাল টর্চারের মাধ্যমে হত্যা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কী হয়েছিল, সে কথা বাবার মুখ থেকে শোনা। ইনফ্যাক্ট সেই কথা মা জেনে ফেলেছিলেন বলেই বাবা তাঁকে পুনশ্চর ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন। পুলিশের খাতায় অবশ্য এটি আত্মহত্যা হিসেবে নথিভুক্ত আছে।

বাড়ির কথা বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। উনিশশো সত্তর থেকে উনিশশো একাত্তর সালের মধ্যে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বন্দি শিবিরে ব্রিটিশ ডাক্তাররা মানসিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন পেট থেকে কথা বের করার জন্যে। আর আমি, কলকাতা শহরে বসে ভানু গুহরায়ের সহযোগিতায় সেই কাজটাই করছি। নকশাল নামের এই পোকামাকড়গুলোর ওপরে টর্চার মেডিসিন প্রয়োগের ফলে দুটো লাভ হচ্ছে। এক, দেশের মানুষ শান্তিতে বাঁচতে পারছে। দুই, নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে।

*

দীপশিখা চোখ গোল গোল করে কেস ফাইল পড়ছে। লীলা আত্মহত্যা করেননি! তাঁকে খুন করেছিলেন স্বামী পল! এটা ভেবে শিহরন হচ্ছে! কখন যে টেবিলে চায়ের কাপ চলে এসেছে, খেয়ালও করেনি। জাপান, জার্মানি আর আয়ারল্যান্ডের গবেষণাপত্র পড়তে গিয়ে আবার গা গুলোচ্ছে। কিছু না ভেবেই ব্যাগ থেকে ঘুমের ওষুধের পাতা বের করে একটা ওষুধ টপ করে মুখে ফেলে দীপশিখা। ডায়েরি আর চিঠির পাতাগুলোর ফটো মোবাইলে তুলে আবার ডায়েরি পড়তে শুরু করে।

*

ববির ডায়েরি

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অধীনে অনেক বিভাগ আছে। যেমন মার্ডার, ডেকয়টি বা ট্রাফিক। উনিশশো সত্তর সালে নতুন একটি বিভাগ চালু হয়েছে নকশালপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য। নাম 'স্পেশ্যাল সেল' বা 'বিশেষ বিভাগ'। কলকাতার বিভিন্ন থানা থেকে কনস্টেবল, এএসআই, এসআই— সব স্তরের কর্মচারীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে এই সেল। বছর চল্লিশের ভানুদা, মানে ভানু গুহরায় এই সেলের অফিসার ইন চার্জ। পুলিশ মহলে স্পেশ্যাল সেলকে বলা হয় 'ভানুর সেল।'

ছ' ফুটের ওপরে লম্বা, মুগুর ভাঁজা চেহারা, কুতকুতে চোখ, খাড়া নাক আর শ্যামলা

গায়ের রং নিয়ে ভানুদা ছিলেন নকশালদের কাছে যমদূতের মত। তাঁর স্পেশ্যাল সেলের চেম্বারটি ছিল আমার কাজের জায়গা। যাকে লোকে বলত 'টর্চার চেম্বার,' আমি বলতাম 'চর্চার চেম্বার।' এখানে চর্চা বলতে বিজ্ঞান চর্চা বোঝানো হচ্ছে।

স্পেশ্যাল সেলের সবাই হোম ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী। একমাত্র আমি ছিলাম বহিরাগত। খাতায়-কলমে আমার নাম এই সেলে না থাকলেও নকশালরা একটা সময় জেনে যায় যে আমিও টর্চারের সঙ্গে যুক্ত। ওরা আমাকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে।

## ৯

ববির ডায়েরি

সত্যি কথাটা বলেই ফেলা যাক। টর্চার মেডিসিন নিয়ে গবেষণা শুরু করার সময় আমার ধারণা ছিল না নকশাল আন্দোলন কাকে বলে। পরে স্পষ্ট হয়। নকশাল আন্দোলন কীভাবে নির্যাতন-বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, সেটা লেখার চেষ্টা করা যাক।

উনিশশো সাতষট্টি সালের পঁচিশে মে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রামে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল দু'টি শিশু সহ এগারোজন। এই ঘটনার বিরোধিতা করতে গিয়ে লোকেরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। নকশালবাড়ির এই রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল যারা, তাদের মধ্যে মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালের তালিকায় ছিল বীরু মজুমদার বা বীরুবাবু। লোকটা মনে করত ভারতের চাষা আর গরিব মানুষদের উচিত চিনের কায়দায় শ্রেণিশত্রু চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করা। সত্তর সালের গোড়া থেকেই চালু হল 'খতম লাইন।' সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে স্কুল-কলেজ পোড়ানো, মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, সরকারি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া চলতে লাগল।

এখানে বলা ভাল, বীরুবাবুর ছেলে দেবজিত মজুমদার আমার সঙ্গেই ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছিল মেডিক্যাল কলেজে। ও ছিল আমার ব্যাচমেট, হস্টেলে আমার রুমমেট। ওর কাছ থেকে জানতে পারতাম বীরুবাবু কবে কোথায় লুকিয়ে থাকছে। আমার কাছ থেকে জানতে পারতেন ভানুদা। দেবজিতই বলেছিল যে ওর বাবা হার্টের রোগী। দুটো অ্যাটাক হয়ে গেছে। প্রথমটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি, দার্জিলিংয়ে। সেকেন্ড অ্যাটাক হয় কলকাতায়। বুকে ব্যথা হলে অক্সিজেন আর পেথিডিন ইঞ্জেকশন ছাড়া কাজ হত না।

নকশালরা ছিল দেশদ্রোহী এবং সন্ত্রাসবাদী। স্পেশ্যাল টিমের আমরা ভানুদার নেতৃত্বে দেশসেবা করতাম। বীরুবাবু তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। হঠাৎই একদিন দেবজিতের কাছ থেকে জানতে পারলাম লোকটা কোথায় লুকিয়ে আছে।

উনিশশো বাহাত্তর সালের সতেরোই জুলাই গভীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি তিনতলা বাড়িতে ঢুকে পড়েন ভানুদা আর তার দলবল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। ঘরে ঢুকে ক্ষয়াটে চেহারার একটা বুড়োকে ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে তুলে ভানুদা বললেন, "দাদু, আমি ভানু গুহরায়। আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি।"

লোকটা সব বুঝতে পেরে চুপ করে গেল।

প্রিজ়ন ভ্যানে ওকে লালবাজারে আনা হল। বীরুবাবু যখন জানল যে সব স্যাঙাত অ্যারেস্টেড, তখন মানসিকভাবে চুরমার হয়ে গেল। বুকে ব্যথা শুরু হল।

ঠিক তার পরের দিন ভোরবেলা দু'জন পুলিশ মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে এসে দেবজিতকে বলল, "তোমার বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে যেতে হবে।"

দেবজিত ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে বলল, "তুই আমার সঙ্গে যাবি রে?"

আমি 'না' বলেছিলাম। বীরুবাবু আমাকে চিনে গেছে। ওখানে গেলে বিপদে পড়ব।

দেবজিত লালবাজার গেল। ফিরে এসে বলল, "বাবাকে সুস্থ বলেই মনে হল।"

আমি মনে মনে হাসলেও গম্ভীর মুখে বসে রইলাম। পরে দেবজিত আরও দু'বার বীরুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

প্রাথমিক ঘুটি সাজানো শেষ। পরিবার জেনে গেল যে বীরুবাবু সুস্থ। এর পরে বীরুবাবুকে সেন্ট্রাল লকআপ থেকে নিয়ে যাওয়া হল ভানুদার সেলে।

'কম্বল ধোলাই' বা থার্ড ডিগ্রি অত্যাচারের কথা সবাই বলে। পুলিশের পরিভাষায় অবশ্য এসবের অস্তিত্ব নেই। পুলিশ কখনও কাউকে শারীরিক বা মানসিক ভাবে নিগ্রহ করতে পারে না। তাদের কাজ হল চার্জশিট তৈরি করে অভিযুক্তকে আদালতের হাতে তুলে দেওয়া। হ্যাঁ, শব্দটা 'অভিযুক্ত'। 'অপরাধী' নয়। বীরুবাবু অপরাধ করেছে কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব আদালতের।

সংবিধান প্রণেতার নির্দেশ মাথায় রেখে ভানুদার পরামর্শে কাজ শুরু করলাম। শুরু হল একটানা জেরা। সকাল আটটায় শুরু হত। চলত রাত একটা পর্যন্ত। জল, খাবার, ওষুধ, বিশ্রাম— কোনওটাই দেওয়া হত না। পায়ের নীচে কাপড় জড়ানো রুলের একটানা বাড়ি, উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা, বরফঠান্ডা জল গায়ে ঢেলে দেওয়া, জ্বলন্ত বাল্বে চুমু খেতে বাধ্য করা, পিছনে রুল ঢুকিয়ে দেওয়া— সবই করা হচ্ছিল। আমি সমানে নোট নিচ্ছিলাম পাল্স, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার, রেসপিরেশন, হার্ট রেটের। কতটা বেদনা মানুষ সহ্য করতে পারে, নোট করছিলাম সেটাও। নানা রকমের 'ট্রুথ সেরাম' ইঞ্জেক্ট করছিলাম, যেগুলো শরীরে ঢুকলে মানুষ সত্যি কথা বলতে বাধ্য হয়। এগুলো এখনও বাজারে আসেনি। প্রাণীদের ওপরে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। তবে এই জাতীয় বন্দিদের ওপরে যে ব্যবহার করা যায়, সেটা বাবার কাছ থেকেই শেখা।

*

দীপশিখার মনে পড়ে যাচ্ছে দু'দিন আগের কথা। স্বাধীনতা দিবসের সকালে বরুণ বলেছিল, "কয়েকটা ড্রাগ পেড়লারকে ধরেছি। আড়ং ধোলাই দিয়ে পেট থেকে কথা বের করছিলাম। এখন কোর্টে প্রোডিউস করব। তার আগে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে ওদের জন্যে 'ফিট সার্টিফিকেট' লেখাতে হবে।"

দীপশিখা বলেছিল, "পুলিশ সাসপেক্টদের ধরে মারবে আর ডাক্তাররা ফিট সার্টিফিকেট দেবে? দিস ইজ় মিসইউজ় অফ মেডিক্যাল প্রফেশন।"

বরুণ বলেছিল, "আপনারা আর আমরা একই বৃন্তের দু'টি কুসুম ম্যাডাম। রাষ্ট্র যা চায়, সেটা পুলিশ আর ডাক্তারকে করতেই হয়।"

বরুণের বলা কথাগুলো মনে পড়তেই আবার ওয়াক উঠল দীপশিখার। সুব্রত দৌড়ে এসে বলল, "আমার কাছে রুটি-তরকারি আছে। আপনি খাবেন?"

সুব্রত পদমর্যাদায় কনস্টেবল। স্পেশ্যাল সেলের সদস্যদের মধ্যেও কনস্টেবল ছিল। সুব্রত বা বরুণের মতো লোক আছে বলেই পুলিশ ফোর্সের উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস এখনও চলে যায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপশিখা বলল, "একটা রুটি দিন, খাই," তারপরে পড়া শুরু করল।

*

ববির ডায়েরি

একটানা জেরা চলল সাত দিন। ভানুদা জেনে গেলেন নকশালদের সমস্ত হাইড আউট, সমস্ত ফ্র্যাকশন, সমস্ত গোষ্ঠী কোন্দলের কথা। ফান্ডিং কোথা থেকে আসছে, শহরে, গ্রামে আর মফস্‌সলে কারা সিমপ্যাথাইজ়ার, কারা পার্টি-দরদি, কারা পার্টি কর্মী, কারা পার্টি সদস্য। রাষ্ট্রের কাছে হেরে গেছে, এটা বুঝতে পেরে বীরুবাবুর বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গেল। মানসিক ও শারীরিক চাপে শুরু হল বুকে ব্যথা। ভানুদা আমার দিকে তাকালেন। আমার বুঝতে অসুবিধে হল না উনি কী চাইছেন।

পঁচিশে জুলাই মাঝরাতে বীরুবাবুকে আমাদের ইউনিটে ভর্তি করলাম। চিকিৎসার অভিনয় করলাম। অক্সিজেন, স্যালাইন, পেথিডিন বা অন্য কোনও ওষুধ দিলাম না।

সেই রাতেই বীরুবাবু মরল। মরার পরে অক্সিজেন, স্যালাইন আর ইঞ্জেকশন দিয়ে হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলাম। ওরা তৈরি ছিল। ভোর ছ'টা নাগাদ জানাজানি হল, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বীরু মজুমদার পঁচিশে জুলাই ভোর চারটে পঞ্চান্ন মিনিটে মারা গেছে। আমার লেখা ডেথ সার্টিফিকেট অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ, 'ইশকিমিক হার্ট ডিজ়িজ় উইথ কনজেসটিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়োর।'

খবরের কাগজের লোক, বাড়ির লোক, পার্টির লোক বা সাধারণ মানুষ জানতে পেরে গেল যে কমরেড বীরু মজুমদার হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে শুরু করল যে পুলিশের অত্যাচারে মারা গেছেন কমরেড মজুমদার। কয়েকটা ইন্টেলেকচুয়াল আবার থানায় গিয়ে

এফআইআর করে এল।

ভানুদা কাজের লোক। এসব যে হবে, আন্দাজ করেছিলেন। দ্রুত বডি পাঠিয়ে দিলেন মর্গে। চেনা ডাক্তারকে দিয়ে পোস্ট মর্টেম করালেন। কত লোক যে হাসপাতালে ওকে দেখতে এসেছিল তার হিসেব নেই। কেউই বীরুবাবুর মুখ দেখতে পায়নি। কারণ ভানুদার নির্দেশে সারা শরীর ব্যান্ডেজে মোড়া ছিল, যাতে আঘাতের চিহ্ন দেখতে না পাওয়া যায়। সেই অবস্থাতেই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল।

কলকাতায় তখন অঘোষিত কারফিউ। অন্য শবযাত্রীদের ধাক্কা মেরে বের করে দিল পুলিশ। দেবজিত কয়েকটা জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরিয়ে মুখাগ্নি করার সময়ে আমাকে বলল, "খেয়াল করেছিস, বাবার পায়ের তলাটা কালো? তুই বাবার ট্রিটমেন্ট করার সময় কিছু অস্বাভাবিক দেখতে পেয়েছিলি?"

"দেখতে পাইনি রে। এটা নরমাল ডেথ," বলেছিলাম আমি। আর ভেবেছিলাম, ব্যান্ডেজ জড়ানোর সময় পায়ের তলাটা পুলিশ মিস করে গেল কেন!

*

কবিতার চিঠি

ববির ডায়েরি পড়ার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, কলকাতায় যাব। ববির সঙ্গে দেখা করতে নয়, কলকাতায় শিফ্‌ট করতেও নয়। এক বিকৃতমনস্ক চিকিৎসককে, এক সাইকোপ্যাথকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে। যদিও সেই ঘটনার পরে কেটে গেছে প্রায় কুড়ি বছর, কিন্তু আমার কাছে যা ডকুমেন্ট আছে, তা-ই দিয়ে ববিকে জেলে পোরা যাবে। ভানু গুহরায়কে কিছু করা যাবে না। কারণ লোকটা উনিশশো পঁচানব্বই সালে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে।

আমি এখন বাল্টিমোরে নেই। আজ, মানে বারোই নভেম্বর সকালবেলা কলকাতায় এসেছি। উঠেছি পুনশ্চয়, শ্বশুরবাড়িতে। আমার সঙ্গে এসেছে নীল। ও মেরিল্যান্ডের মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়ছে। ওকে সবটাই খুলে বলছি। সব ডকুমেন্ট দেখিয়েছি। ও কিছু বলেনি। গুম মেরে রয়েছে। ওর সঙ্গে বরাবরই বাবার ভাল সম্পর্ক। আমি কেন কলকাতায় আসছি সেটা ববি জানে কি না, জানি না। দেখা যাক, কী হয়।

*

ডায়েরি শেষ। সুব্রতর এনে দেওয়া রুটি-তরকারি খেতে খেতে দীপশিখা ভাবছে, উনিশশো সাতানব্বই সালের বারোই নভেম্বর চিঠি লেখা শেষ করার পরে কী হয়েছিল কবিতার!

বরুণ রাউন্ড দিয়ে ফিরেছে। সে বলল, "করুণ মুখে রুটি চিবোচ্ছেন? আর কিছু কেউ দিল না? আমার থানা ইজ় সো ব্যাড!"

কবিতা দাশের কেস ফাইল এগিয়ে দীপশিখা বলল, "আমি যতক্ষণ জাবর কাটছি তার মধ্যে এটা পড়ে ফেলুন।"

"ধুর! আবার এসব!" ভুরু কুঁচকে ফাইলে চোখ রাখে বরুণ। কনস্টেবল সুব্রত এসে দু'কাপ মশলা চা রেখে যায়। দীপশিখা চা শেষ করার আগেই বরুণ ফাইল বন্ধ করল।

দীপশিখা অবাক হয়ে বলে, "হয়ে গেল?"

"এটাই আমাদের কাজ ম্যাডাম," হাসল বরুণ, "আপনি পড়া ধরুন। সব বলে দেব। সাল-তারিখ সমেত।"

"বেশ। এখন আমাদের কী করা উচিত?"

"প্রিয়া দাশের কেসটা যে এত জটিল, সেটা আপনি সাহায্য না-করলে বুঝতেই পারতাম না। এবারে আমি আপনাকে একটা সাহায্য করি। কবিতা দাশ মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বা আইও কল্যাণ রায় এখনও জীবিত। যাবেন নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে? উনি গড়িয়াহাটে যশোধরা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন।"

দীপশিখা বলল, "কাল যাব। আজ বাড়ি যাই। সৈকত কালই পুরুলিয়া চলে যাবে।"

*

ভবানীপুর থানা থেকে গাড়ি চালিয়ে বিএমসি ফিরেছে দীপশিখা। সন্ধে ছ'টা বাজে, ডিপার্টমেন্ট ফাঁকা। রাজু আর সাধুর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে আসছে, এমন সময়ে অচেনা মোবাইল নম্বর থেকে ফোন এল। ফোন ধরে দীপশিখা বলল, "হ্যালো!"

"ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় গোল মন্দিরের সামনে আসুন। একটা জিনিস দেব," খসখসে পুরুষকণ্ঠ এই কথা বলে ফোন কেটে দিল।

কে এ? কী জিনিস দিতে চায়? ঘাবড়ে গেছে দীপশিখা। হঠাৎ মনে হল, হুমকি ফোন যে করেছিল, তার গলার আওয়াজও খসখসে ছিল। সেই লোকটাই আবার ফোন করেনি তো? নাকি এ অন্য কেউ? কী করবে বুঝতে না-পেরে দীপশিখা মোবাইল নম্বরটা বরুণকে পাঠাল। তারপর ফোন করে বিশদে জানিয়ে বলল, "কী করব?"

"নম্বরটা ট্রেস করতে সময় লাগবে। এবং এই নম্বরটাও জালিই বেরোবে। তবে আপনি যান। গোল মন্দির আপনার হাসপাতাল থেকে হাঁটা রাস্তা। গাড়ি নিয়ে গেলে পৌঁছতে পারবেন না। আমি ওখানে বাইক নিয়ে প্লেন ড্রেসে পৌঁছে যাচ্ছি।"

মোবাইলে সময় দেখল দীপশিখা। ছ'টা দশ বাজে। সাড়ে ছ'টার সময় গোল মন্দির হেঁটে পৌঁছতে হলে এক্ষুনি বেরতে হবে।

বিএমসি-র গেটের বাইরে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে ডানদিকে যাচ্ছে দীপশিখা। ওষুধের দোকানের সারি পেরিয়ে একটু হাঁটার পরে এসে গেল এলগিন রোড। রাস্তা পেরিয়ে এলগিন রোড বরাবর হাঁটছে সে। একমুখী রাস্তা দিয়ে হুশহাশ চলে যাচ্ছে দু'চাকা আর চারচাকা। ফুটপাথে পথচারীর সংখ্যা কম। সন্ধে নামছে। রাস্তার আলো এখনও জ্বলেনি। তবে সূর্য ডুবে গেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগল দীপশিখার কোমরে। টাল সামলাতে না-পেরে ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় চিৎকার করে উঠল।

লোকজন দৌড়ে আসছে। চেঁচিয়ে বলছে, "বাইকওয়ালাকো পকড়ো! বদমাশ লাথ মারকে ভাগা!"

এক শিখ যুবক বাইকে স্টার্ট দিয়ে বাইকওয়ালাকে ধাওয়া করে গোল মন্দিরের দিকে চলে গেল। বিহারি ঘটিগরমওয়ালা দীপশিখার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "হমার হাত পকড়কে উঠে পড়ুন ম্যাডাম!"

কারও সাহায্য না-নিয়েই দীপশিখা উঠল। হাতের তালু ছড়ে গেছে, হাঁটু থেকে রক্ত বেরিয়ে সালোয়ার ভিজিয়ে দিচ্ছে, গোড়ালিতে এত ব্যথা যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তবে আসল ব্যথা হচ্ছে তলপেটে। মনে হচ্ছে, কী যেন একটা তলপেট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে...

"কী হল তোমার? কী হল?" ভিড়ের মধ্য থেকে ছুটে এল সৈকত। দীপশিখাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি এখানে কেন? গাড়ি কোথায়?"

সৈকত এখানে? দীপশিখা অবাক। সৈকত বিএমসি-র ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আসতে পারে। তা বলে এখানে, এখন? ঠিক সেই সময়, যখন তাকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে?

সবাই মিলে দীপশিখাকে চাদরের উপরে শুইয়ে চার দিকের খুঁট ধরে দৌড়তে দৌড়তে বিএমসি নিয়ে যাচ্ছে। সৈকত চেঁচাচ্ছে, "গাইনি ইমার্জেন্সিতে চলুন। শি ইজ় প্রেগন্যান্ট!"

দীপশিখার মনে পড়ছে সৈকতের বলা কথাগুলো, "আমি ভাবছিলাম... প্রথম ইসুটা ছেলে হলে কী মজা হত, তাই না?"

দীপশিখার বুক দিয়ে আবার একটা মেল ট্রেন যাচ্ছে আউশউইৎজ়ের দিকে। মাথার মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে বিষণ্ণতার কালো ধোঁয়া। লকলকিয়ে উঠছে বিপন্নতার লাল জিভ!

## ১০

আঠেরোই অগস্ট রাত আটটার সময় বিএমসি হাসপাতালের গাইনি বিভাগে দীপশিখার কেবিনে ঢুকে বরুণ বলল, "আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কেউ জেনে ফেললে?"

"আপনাকে যেতে হবে না," বেড ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দীপশিখা, "আপনি তো এখনও খুঁজেই বের করতে পারলেন না, আমাকে কে অ্যাটাক করেছিল। আমি একাই কল্যাণ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

"সিস্টার জানে, হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় বাইরে বেরোচ্ছেন?" ফিসফিস করছে বরুণ, "মন্দিরা ম্যাডাম চলে এলে?"

"সবাই সব জানেন। কেউ নাক গলাবেন না," নতুন এক সেট পোশাক নিয়ে সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে গেছে দীপশিখা। চেয়ারে বসে বরুণ ভাবছে গতকালের কথা...

সন্ধে সাড়ে ছ'টার একটু আগেই বাইক নিয়ে গোল মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছিল সে। স্থানীয় ইনফর্মারের কাছ থেকে জানতে পারে, এলগিন রোডের বেঙ্গল মেডিক্যাল

কলেজ প্রান্তে গন্ডগোল হয়েছে। দীপশিখাকে মোবাইলে না-পেয়ে বাইক চালিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সব কথা জানতে পারে বরুণ। হাসপাতালে গিয়ে দেখে, দীপশিখাকে গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করেছে সৈকত। ভিজ়িটিং গাইনিকলজিস্ট মন্দিরা আর রেডিয়োলজিস্ট মেধা মিলে যাবতীয় পরীক্ষা সেরে নিদান দিয়েছেন, গর্ভস্থ ভ্রূণ ঠিক আছে। আপাতত দু'দিন 'অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট।' এই পরামর্শে দীপশিখার তুমুল আপত্তি থাকলেও সৈকতের জোরাজুরিতে সে হাসপাতালের কেবিনে বন্দি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ফোনে যোগাযোগ ছিল বরুণ আর দীপশিখার মধ্যে। দীপশিখাই মেসেজ করেছিল, সৈকত তাকে দেখে চলে যাওয়ার পরে বরুণ যেন আসে। দীপশিখা দেখা করতে যাবে কল্যাণ রায়ের সঙ্গে।

আগামিকাল দীপশিখাকে ছুটি দেওয়া হবে। সৈকত কালই পুরুলিয়া চলে যাবে। সে হুকুম জারি করেছে দীপশিখা সাতদিন বেড রেস্টে থাকবে। বুলুদি এই ক'দিন ফ্ল্যাটেই থাকবে। একটু এদিক ওদিক করলেই বুলুদি ফোন করে সৈকতকে জানিয়ে দেবে। সব মিলিয়ে, আজ রাত্তিরটাই কল্যাণের বাড়ি যাওয়ার জন্যে আদর্শ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দীপশিখা বলল, "চলুন।"

বরুণ শ্রাগ করে কেবিন থেকে বেরোল। তার জিপ গাইনিকলজি ডিপার্টমেন্টের ঠিক সামনে পার্ক করা আছে। যাতে দীপশিখাকে বেশি হাঁটতে না হয়।

*

গড়িয়াহাটের যশোধরা অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলার দু'কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন পঁচাত্তর বছরের কল্যাণ এবং তাঁর স্ত্রী প্রণতি। একমাত্র মেয়ে থাকেন লন্ডনে। ভদ্রলোকের শরীর ও মন তরতাজা। কবিতা দাশের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা স্পষ্ট মনে আছে।

কল্যাণ বললেন, "কবিতা দাশের আনন্যাচরাল ডেথের কথা মনে আছে, কারণ ওপরওয়ালার চাপে মার্ডার কেসকে সুইসাইডে বদলে দিতে হয়েছিল।"

"কার চাপে?" জানতে চাইল বরুণ।

"সব কথা অবসরের এত বছর পরেও বলা যায় না। তখনকার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী আর দুই আমলার হুকুম ছিল। তাঁদের মধ্যে এক মন্ত্রী আর দুই আমলা মারা গেলেও অন্য মন্ত্রী পুরনো দল বদলে এখনকার শাসক দলের সঙ্গে আছেন। যথেষ্ট প্রভাবশালীও। ফলে আমি নাম নেব না।"

"কবিতাকে কে খুন করেছিলেন?"

"ওঁর স্বামী ববি দাশ। তিনি জানতে পারেন যে বৌ তাঁর অতীতের কুকাজ জেনে ফেলেছেন। কবিতা দিনের বেলা কলকাতায় পা রাখেন। রাতের বেলা সিলিংয়ের হুকে শাড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করেন। পোস্ট মর্টেমও তাই বলেছিল। তবে আমি বুঝতে পারি যে কেসটা মার্ডার।"

"কীভাবে?" জিজ্ঞেস করে দীপশিখা। যদিও সে এই প্রশ্নের উত্তর জানে।

"যে আত্মহত্যা করে, সে হুকের মধ্যে দিয়ে শাড়ি ঘুরিয়ে এনে গিঁট তৈরি করে। আর যে মৃতদেহকে শাড়ি পেঁচিয়ে খুন করে হুক থেকে ঝোলায়, সে বডি টেনে তোলে। ওই টানার ফলে, বা বলা যেতে পারে ধাতব হুক আর শাড়ির ঘর্ষণের ফলে, দুই জায়গায় প্রমাণ থাকে। শাড়িটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেঁসে যায়। আর ধাতব হুকে শাড়ির ফাইবার লেগে থাকে। যে সিন অফ ক্রাইমে গেছে, সে এগুলো দেখতে পাবে। পোস্ট মর্টেম যদি কারও চাপে বদলে দেওয়া না হয়, তা হলে সেখানেও লেখা থাকার কথা।"

বরুণ বলল, "অটপ্সি সার্জনকে চাপ দিয়ে না হয় নর্মাল রিপোর্ট লেখানো গেল। কিন্তু শুধু সেই রিপোর্টের ওপরে তো সবটা নির্ভর করে না। আপনি মার্ডারের চার্জশিট দিলেন না কেন?"

কল্যাণ বললেন, "একই কারণ। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ। আমি সামান্য চাকরিজীবী। কেন ঝামেলা করতে যাব? আমি ওই কেস ক্লোজ় করে দিই। তবে ওঁদের ছেলে নীল দাশ পুরোটাই জানতেন। উনি তখন আমেরিকায় ডাক্তারি পড়ছেন। আমার কাছে হাঁউমাউ করে সব বলে, মায়ের শ্রাদ্ধ সেরে এ দেশ থেকে কেটে পড়েন। তবে কেস ক্লোজ় করলেও আমি কেস ফাইলের মধ্যে কবিতার চিঠি আর ববির ডায়েরি রেখে দিয়েছিলাম।"

"কেন রেখেছিলেন?" জানতে চায় দীপশিখা।

"পিঠ বাঁচাতে!" হাসলেন কল্যাণ। "সরকার বদল হওয়ার পরে নতুন মন্ত্রী এসে যদি বলেন, 'কবিতা দাশের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস ফাইল আবার খোলা হোক,'— সেই সময় নিজেকে বাঁচাতে হবে, তাই না? মন্ত্রীরা পাঁচ বছরের জন্যে চেয়ারে বসেন। আমরা বসি রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত। কত পাপ যে দেখে যেতে হয়..."

"চিঠি আর ডায়েরি রেখে দেওয়ার আর কোনও কারণ ছিল?"

"অবশ্যই ছিল," চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে গিয়ে হাত কাঁপছে প্রাক্তন পুলিশ কর্তার, "অপরাধীদের পাকড়াও করা আমাদের কাজ। তাদের বেকসুর খালাস করে দেওয়ার জন্যে মাইনে পেতাম না। আজকের পেনশনও সেই কারণে পাই না। পলিটিক্যাল আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাপে এসব যখন করতে হয়, তখন মনে হয় আমার দোষে একজন খুনি সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। ভাবি, ভবিষ্যতে হয়তো এই কেস ফাইল খোলা হবে... হয়তো প্রকৃত বিচার হবে..."

"ওরা ভবিষ্যৎ থেকেই এসেছে," বৃদ্ধ স্বামীর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন বয়স্কা প্রণতি।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি," বরুণের দিকে তাকিয়ে কল্যাণ বললেন, "ববি দাশ এখন কোথায়?"

চেয়ার থেকে উঠে বরুণ বলল, "সপরিবারে পুনশ্চতেই থাকেন। বয়স ছিয়াত্তর। ডাক্তারি করা ছেড়ে দিয়েছেন," তারপর কল্যাণকে আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না-দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল।

*

পুলিশের জিপে বিএমসি ফেরার সময় বরুণ বলল, "গতকাল আপনাকে যখন ধাক্কা মারা হয়, সেই সময়কার এলগিন রোডের সিসিটিভি ফুটেজ আমি দেখেছি। বাইকের মডেল আর নম্বর জানা গেছে। মালিকের নামও জানা গেছে। তবে অপরাধীকে ধরা যায়নি। কারণ আপনাকে ধাক্কা মারার ঠিক আধঘণ্টা আগে বাইকটা চুরি করা হয়েছিল। বাইকের আসল মালিক তখন আমার থানায় বসেছিলেন এফআইআর করাবেন বলে। উনি নিরপরাধ।"

"তার মানে আমাকে ধাক্কা মারার জন্যেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছিল," আপনমনে বলে দীপশিখা, "আমার গতিবিধি খুব সোজাসাপটা। নর্থ সিটি থেকে বিএমসি, বিএমসি থেকে নর্থ সিটি। এবং পুরোটাই গাড়ির মধ্যে থাকি। কাজেই শারীরিক নিগ্রহ করার জন্যে আমাকে রাস্তা দিয়ে হাঁটাতে হবে। ওই কারণেই কম সময়ের মধ্যে গোল মন্দিরের সামনে আসতে বলা হয়েছিল। ইট ওয়াজ় আ ট্র্যাপ!"

"এগজ্যাক্টলি," বরুণ উত্তেজিত, "আপনাকে প্রথমে ভার্বাল থ্রেট দেওয়া হল। তারপরে ফিজ়িকাল অ্যাসল্ট। এর মানে..."

"আমি যেন প্রিয়া দাশের কেস নিয়ে মাথা না-ঘামাই। সেটা আমি বুঝেছি। কিন্তু বাইকওয়ালাকে ফুটেজ দেখে ধরা গেল না?"

"একটি শিখ ছেলে বাইক চালিয়ে ওকে ফলো করেছিল। সে-ও ধরতে পারেনি। বাইকওয়ালা মাথা ঢাকা হেলমেট পরেছিল। সে বড় রাস্তা পেরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে ছোট একটা গলিতে বাইক রেখে কেটে পড়ে। ওই গলিতে নজরদারি ক্যামেরা নেই। গলির অন্যদিকে বড় রাস্তা। বাস চলে। ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, হেলমেট পরা লোকটা বাসে উঠল। বাসটার গন্তব্য শেয়ালদা। লম্বা রাস্তার অনেক জায়গায় নজরদারি ক্যামেরা নেই। ওকে আর ট্রেস করা যায়নি।"

"ফুটেজ দেখে কী মনে হল? বাইকওয়ালা পুরুষ না মহিলা ?"

"ব্যাটাছেলে, নো ডাউট।"

"ধাক্কা খেয়ে আমারও তাই মনে হয়েছিল। বাপ রে! লাথির কী জোর!"

হাসপাতালের মধ্যে জিপ ঢুকেছে। গাইনি ওয়ার্ডের সামনে গাড়ি রেখে দীপশিখার সঙ্গে ভিতরে ঢুকছে বরুণ। দীপশিখা বলল, "আমরা তা হলে উল্টোদিক দিয়ে ভাবি। গতকাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পুনশ্চর সদস্যরা কী করছিলেন? তাঁদের কোনও অ্যালিবাই আছে?"

"সেই খোঁজ আগামিকাল পুনশ্চয় গিয়ে নেব। এসব জিনিস ফোনে জানা যায় না।"

কেবিনে ঢুকে দীপশিখা দেখল মন্দিরা ম্যাডাম চেয়ারে বসে তার হাসপাতালের ছুটির কাগজে সই করছেন। পাশে সিস্টার দাঁড়িয়ে

রয়েছেন। দীপশিখাকে দেখে মন্দিরা বললেন, “এসেছিস তা হলে। আমি তোর ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লিখে রাখলাম। কাল কখন বাড়ি যাবি?”

ঘরে পরার পোশাক ব্যাগ থেকে বের করে বাথরুমে যেতে যেতে দীপশিখা বলল, “সকাল আটটায় সৈকত নিতে আসবে।”

“বেশ,” বেরিয়ে গেলেন মন্দিরা আর সিস্টার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দীপশিখা দেখল বরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, “আপনি বাড়ি যাবেন না?”

“যাব। আমার একটা কথা ছিল।”

“আমার দুটো কথা ছিল।”

“বলুন শুনি,” চেয়ারে বসে বলল বরুণ।

“আপনার ফ্যামিলির কথা কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি।”

“ফ্যামিলি মানে বৌ-বাচ্চা?” দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বরুণ, “আপনার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, তখন আমি হ্যাপিলি ম্যারেড ছিলাম। একটা ছেলেও ছিল।”

“‘ছিল’ মানে?” কেঁপে উঠেছে দীপশিখা।

“রোড ট্র্যাফিক অ্যাক্সিডেন্টে ছেলে মারা যায়। দু’বছর পরে আমার ডিভোর্স হয়ে যায়। প্রাক্তন স্ত্রী এখন মুম্বইয়ে থাকে। কর্পোরেট বিগ শটকে বিয়ে করেছে। একটি মেয়েও হয়েছে।”

দীপশিখা চুপ করে বসে রয়েছে। একটু পরে বলল, “আপনি কোথায় থাকেন?”

“থানা কম্পাউন্ডের কোয়ার্টারে থাকি। নিজের বাড়ি মধ্যমগ্রামে। সেখানে বাবা-মা আছেন। সময় পেলে যাই। আপনি আর কী কথা বলবেন বলছিলেন?”

প্রসঙ্গ বদল হওয়ায় স্বস্তি পেল দীপশিখা। বলল, “আপনি আগে বলুন। আপনারও তো একটা কথা ছিল।”

বরুণ আবার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। “আমার বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা সুবিধের নয় বলেই বোধ হয় এইসব চিন্তা মাথায় আসে। প্লিজ় কিছু মনে করবেন না। আপনার কখনও মনে হয়নি যে...”

বরুণকে ইশারায় চুপ করিয়ে দীপশিখা বলে, “আমার দ্বিতীয় কথা আর আপনার কথাটা মিলে যায় কি না দেখি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, বাইকওয়ালা যখন আমাকে পিছন থেকে লাথি মারল, তখন সৈকত কী করে ওখানে পৌঁছল?”

বরুণ ভুরু কুঁচকে বসে। দীপশিখা বলল, “আপনি এটাই বলতে চেয়েছিলেন তো?”

বরুণ ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল।

বিছানায় বসে দীপশিখা বলল, “আমার সঙ্গে সৈকতের খুব ভাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, জানেন বরুণ! কত বছরের সম্পর্ক! বিয়ের আগে আর পরে মিলিয়ে লম্বা সময়। আমার ব্রেস্ট ক্যানসার ডায়াগনসিস আর ট্রিটমেন্টের সময় ওর সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার যে করেছি, তার হিসেব নেই। আমার সঙ্গে ও যদি সেই ব্যবহার করত, আমি ডিভোর্স করতাম। কিন্তু ও আমাকে সহ্য করেছে। হাজ়ব্যান্ড হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে আমার প্রতিটি ভালনারেবিলিটি বুঝতে পেরেছে। আমি ওর প্রতি আজীবন গ্রেটফুল থাকব। আমি এতদিন ভাবতাম, ওর সবটা জানি। কিন্তু ও যে এতটা সেক্সিস্ট এবং... হাউ টু পুট ইট... এতটা পেট্রিয়ার্কাল, এটা জানতাম না।”

বরুণ দীপশিখার চোখে চোখ রাখল। দীপশিখা বলল, “আপনাকে আগে বলা হয়নি। বলার প্রয়োজন বোধও করিনি, ফ্যামিলি ম্যাটার বলে। কিন্তু এটা আর পারিবারিক ইসু থাকছে না। আমি সামহাউ জানতে পেরেছিলাম যে আমার মেয়ে হবে। জানার কথা নয়, উচিতও নয়। কিন্তু জানতে পেরেছি। খুব ক্যাজুয়ালি কথাটা সৈকতকে বলছিলাম। তারপর থেকেই ও আমাকে অ্যাবর্ট করাতে বলছে। কারণ হিসেবে বলছে, ওদের পরিবারের ট্র্যাডিশন হল, প্রথম সন্তান ছেলে হবে।”

“আপনাকে হুমকি ফোনে কী যেন বলা হয়েছিল?” বরুণ ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল।

“পুরুষকণ্ঠ খসখসে গলায় বলেছিল, ‘প্রেগন্যান্ট অবস্থায় দৌড়োদৌড়ি করছেন কেন? রেস্টে থাকুন। যদি হুট করে অ্যাবর্শন হয়ে যায়!’ আমার কথা হল, পুনশ্চর লোকজনের তো জানার কথা নয় যে আমি প্রেগন্যান্ট। তা হলে?”

“আপনি আর সৈকত ছাড়া আর কে কে জানেন যে আপনি প্রেগন্যান্ট?”

একটু ভেবে নিয়ে দীপশিখা বলল, “বুলুদি, মন্দিরা ম্যাম, মেধা, সিস্টার। এখন আপনি জানলেন।”

“অ্যাবর্শন চায় বলে হুমকি ফোন? অ্যাবর্শন চায় বলে বাইক নিয়ে পিছন থেকে ধাক্কা? আমি কোনও পসিবিলিটিই বাদ রাখতে চাই না,” বলল বরুণ।

বড় একটা হাই তুলে দীপশিখা বলল, “আমার এবং আপনার সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হলে আমিই সবথেকে খুশি হব। আপনি এবার আসুন। গুড নাইট।”

বরুণ কথা না-বাড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

## ১১

আজ বিশে অগস্ট। গত পরশু সকালবেলা হাসপাতাল থেকে ফ্ল্যাটে ফিরেছিল দীপশিখা। ঘরে ঢোকা মাত্র বুলুদি তাকে বিছানায় পেড়ে ফেলেছিল। সৈকতের কড়া হুকুম, বাথরুম যাওয়া ছাড়া আগামী সাতদিন বিছানা থেকে ওঠার অনুমতি নেই।

গত দু’দিন দীপশিখা মুখ বুজে বুলুদির অত্যাচার সহ্য করেছে। অপেক্ষা করেছে, কখন সৈকত পুরুলিয়া রওনা হবে।

আজ সৈকত ফ্ল্যাট থেকে বেরোল দুপুরের খাবার খেয়ে। যাওয়ার আগে দীপশিখাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিল। শিঙি মাছের ট্যালটেলে ঝোল খেয়ে ঘেঁটুরানির মাথা গরম! তার গালে আর বুকে হামি খেয়ে ঘণ্টুসোনা ফ্ল্যাট থেকে বেরোল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মাণ গাড়িটি দেখতে দেখতে দীপশিখার মনে পড়ছে পরশু রাতের কথা। সৈকতকে সে প্রশ্ন করেছিল, “আমার গাড়িটা হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছে?”

“সেদিন রাতে আমিই ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরেছি,” বলেছিল সৈকত।

“আর তোমার গাড়ি?”

“আমি মেট্রোয় বিএমসি গিয়েছিলাম। ফেরার সময় তোমার গাড়ি নিয়ে ফিরেছি। গাড়ির চাবি তোমার ব্যাগেই ছিল।”

উত্তর শুনে সন্তুষ্ট নয় দীপশিখা। সে জিজ্ঞেস করেছিল, “রবীন্দ্র সদন থেকে বিএমসি তো সোজা রাস্তা। নন্দন আর রবীন্দ্র সদনের পাশ দিয়ে। তুমি এলগিন রোড হয়ে এলে কেন?”

“রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে নেমে মনে হল, সাবার্বান হসপিটাল রোডের ‘হমরো মোমো’ দোকানটা আছে কি না দেখি। তাই ওদিকটায় গিয়েছিলাম।”

অতীতে ওই দোকানটি ছিল কলকাতার একমাত্র তিব্বতি খাবারের ঠেক। দীপশিখা আর সৈকত কলেজ বেলায় নিয়মিত গিয়ে মোমো আর থুকপা খেত। পুরুলিয়ায় থেকে থেকে কলকাতার নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। দীপশিখা বলল, “কী দেখলে?”

“দোকানটা আছে। ভিতরে ঢুকিনি। বাইরে থেকে দেখে এলগিন রোড ধরে বিএমসি আসছিলাম। হঠাৎ দেখি গোয়েন্দা ঘেঁটুরানি বাইকওয়ালার লাথি খেয়ে রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে।”

নিশ্ছিদ্র যুক্তিজাল। ‘গোয়েন্দা ঘেঁটুরানি’ আর কোনও প্রশ্ন করেনি।

বেডরুমে মোবাইল বাজছে। অন্যমনস্ক দীপশিখা বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে দেখল বরুণের ফোন। ফোন ধরে বলল, “বলুন।”

“প্রিয়া দাশের ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট আপনার ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে গেছে। সপ্তর্ষি রায় আর বিভাস কাঞ্জিলাল ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমি কবে কেস ক্লোজ় করছি। কমিশনার সাহেবও একই কথা জানতে চেয়েছেন।”

“বেডরেস্টের নিকুচি করেছে!” দীপশিখা উত্তেজিত, “আমি এক্ষুনি রিপোর্ট দেখব!”

“আমি জিপ নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে। আপনি নেমে আসুন। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে রিপোর্ট লিখে আবার বেড রেস্টে ফেরত যান।”

“আসছি,” ফোন কাটে দীপশিখা।

*

নিজের কেবিনের দিকে দ্রুত হাঁটছে দীপশিখা। খুব ইচ্ছে করছে দৌড়তে, শুধু গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভেবে দৌড়চ্ছে না।

টেবিল থেকে সিল করা খাম তুলে ফ্যাঁস করে ছেঁড়ে দীপশিখা। টেনে বের করে ‘এ ফোর’ মাপের কাগজ। তাতে লেখা আছে প্রিয়ার পাকস্থলীতে অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে এবং রক্তের নমুনায় অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায় পটাসিয়াম পাওয়া

গেছে।

বরুণের দিকে তাকিয়ে দীপশিখা বলল, "ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে স্ক্যাল্প ভেনে পটাসিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেক্ট করা হয়। সেই জন্যে সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। ব্রিলিয়ান্ট মেথড।"

"ব্রিলিয়ান্ট কেন বলছেন?"

"যে খুন করেছে সে জানত যে প্রিয়া ঘুমের বড়ি খান। কাজেই স্টমাকে ঘুমের ওষুধ পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। স্ক্যাল্প ভেনে ইঞ্জেকশন দেওয়াটা সূক্ষ্ম চাল। এক মাথা চুলের মধ্যে নিড্‌ল প্রিকের দাগ আমি দেখতে পাইনি। নেহাত আপনি বললেন তাই। না হলে তো এই কেসে এতক্ষণে সুইসাইড স্ট্যাম্প পড়ে যেত।"

"আপনিও দেখেছিলেন ম্যাডাম," প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়েছে বরুণ, "তা ছাড়া আমি ক্রাইম সিনে গিয়েছিলাম। প্লেস অফ অকারেন্সে গেলে একটা ফার্স্ট হ্যান্ড ফিলিং হয়..."

"তা ঠিক," দীপশিখা আপনমনে বলছে, "বনেদি, উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে লীলা খুন হলেন উনিশশো পঞ্চাশ সালে। খুনি তাঁর স্বামী। ওই পরিবারের বৌ কবিতা দাশ খুন হলেন উনিশশো সাতানব্বই সালে। খুনি তাঁর স্বামী। পরিবারের আর এক বৌ প্রিয়া খুন হলেন দু'হাজার বাইশ সালে। খুনি কে?"

চেয়ারে বসে বরুণ বলল, "একে কি সিরিয়াল কিলিং বলা যাবে?"

"সিরিয়াল কিলিং-এর একটা বেসিক ডেফিনিশন আছে। একজনই মানুষ যদি অন্তত দু'জন মানুষকে আলাদা সময়ে, আলাদা ঘটনার প্রেক্ষিতে খুন করে তখন তাকে সিরিয়াল কিলিং বলে। আদালতে এসব সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো মিডিয়ার তৈরি। মোদ্দা কথা, এটা সিরিয়াল কিলিং নয়," বলল দীপশিখা, "বেসিক প্রশ্ন হল, একই পরিবারের তিন প্রজন্মের তিন মহিলা কেন খুন হবেন?"

"প্রথম দুটো ক্ষেত্রে স্বামীদের অতীত স্ত্রীরা জেনে ফেলেছিলেন।"

"প্রিয়ার ক্ষেত্রে মোটিভ কী?" প্রশ্নটি করতে গিয়ে শিউরে ওঠে দীপশিখা। তার মনে পড়ছে ফোনে শোনা কথাগুলো, 'প্রেগন্যান্ট অবস্থায় দৌড়োদৌড়ি করছেন কেন? যদি হুট করে অ্যাবর্শন হয়ে যায়!'

দীপশিখা ব্যাগ থেকে ঘুমের বড়ি বের করছে খাবে বলে। বরুণ টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, "পিএম রিপোর্ট লেখার আগে পুনশ্চ থেকে ঘুরে আসা যাক। গতকাল সন্ধেবেলায় কে কী করছিল, এটা জানা জরুরি।"

"চলুন," ভিসেরা রিপোর্ট ব্যাগে ভরে, বড়িটা জিভের তলায় ফেলল দীপশিখা।

*

'পশ কিটেন'-এ ঢুকে বরুণ বলল, "পার্লারের সিসিটিভি ফুটেজ দেখাও।"

আলপথ কম্পিউটারের সামনে বসেছিল। মুখ তুলে বলল, "ক্যামেরাটা খারাপ। ওটা আর পোস্টার লাগানো আছে চুরি আটকানোর জন্যে।"

বরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, "সিয়া-র বুটিকেও কি একই অবস্থা?"

"একদম! খরচা বাঁচানোর জন্যে দু'জনে মিলে একই জিনিস ইনস্টল করেছি।"

বরুণ পুলিশি গলায় বলল, "গতকাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত কোথায় ছিলে?"

"কেন?" দীপশিখার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আলপথ। নোটবুকটি জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছে বলে সে দীপশিখার সাহায্য চাইছে।

"কারণ আছে। তুমি বলো না!" নরম গলায় অভয় দিল দীপশিখা। আলপথ অনেক ভেবে বলল, "কাল বিকেল পাঁচটার পর থেকে কাস্টমার ছিল না। আমি এখানেই বসে ইউটিউব চ্যানেলে প্রিয়াদির গান শুনছিলাম। এই গানটা!"

দীপশিখা দেখল কম্পিউটারের পর্দায় ডাইনিবুড়ি প্রিয়া গান গাইছেন...

"খোকা আর তুলতুলি,
শোন ডাইনিবুড়ির বুলি,
খোল চোখের থেকে ঠুলি।
বুঝলি না তুলতুলি?
লাগা আঁচলে রং-তুলি।
বুঝলি না তুই খোকা?
আঁক ত্যাঁদড় ট্যাটুগুলি।
শোন ডাইনিবুড়ির বুলি,
ঘাঁট ঠাকুরমায়ের ঝুলি,
পাবি কলম-চালকগুলি।
খোল চোখের থেকে ঠুলি।
পুনশ্চ দেখ খুলি।"

একবার শুনেই গান থামাতে বলল দীপশিখা। জিজ্ঞেস করল, "কাল ওই সময়ের মধ্যে একবারও এখান থেকে বেরোওনি? সিয়ার কাছে যাওনি?"

একটু ভেবে ঘাড় নাড়ল আলপথ, "না!"

দীপশিখা প্রশ্ন করে, "ওই নোটবুকের কথা কাকে কাকে বলেছ?"

"শুধু সিয়াকে বলেছি।"

"সিয়া কাকে বলেছে?"

"সেটা জানি না। কী হয়েছে বলবেন তো!" আলপথ ঘাবড়ে গেছে।

ওকে বরুণের হাতে ছেড়ে সিয়ার বুটিকে ঢুকল দীপশিখা। মেয়েটা নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শাড়ি আর ড্রেসের ফটো আপলোড করছিল। দীপশিখাকে দেখে বলল, "ওয়েলকাম! বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?"

নো ননসেন্স মোডে দীপশিখা জিজ্ঞেস করল, "গতকাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত কোথায় ছিলে?"

"বাইকওয়ালা আপনাকে লাথি মেরে পালিয়ে যাওয়ার সময় আমার অ্যালিবাই কী ছিল জানতে চাইছেন?" হাসল সিয়া, "আমি এখানেই ছিলাম।"

"তুমি কী করে জানলে আমার সঙ্গে কোথায় কী হয়েছিল?" উত্তেজিত দীপশিখা প্রশ্ন করে। বরুণ আর আলপথও বুটিকে চলে এসেছে।

সিয়া হাসতে হাসতে বলল, "এটা ভবানীপুর ম্যাডাম। আমি সর্দার পরিবারের মেয়ে। যে পঞ্জাবি মুন্ডা ওই বাইকওয়ালাকে তাড়া করেছিল, সে আমার জ্যাঠার ছেলে। ও হাসপাতালেও গিয়েছিল। আমি কাল রাতে বাড়ি ফিরেই জেনে গেছি আপনার সঙ্গে কী হয়েছে।"

সিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বরুণ। তারপর দীপশিখাকে নিয়ে বুটিক থেকে বেরিয়ে পুনশ্চর সদর দরজার কলিং বেল টিপল। মিলন দরজা খুলতেই ভিতরে না-ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস করল, "গতকাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত কোথায় ছিলে?"

মিলন বললেন, "রবীন্দ্র সদন চত্বরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই ফিরে এসেছিলাম।"

"ওপরে চলো," কড়া গলায় বলল বরুণ।

দোতলায় ওঠার সময় দীপশিখা ভাবছিল বরুণের পরিকল্পনার কথা। হাসপাতাল থেকে জিপ চালিয়ে পুনশ্চয় আসার সময় বলেছিল, "অভয় সরকার স্ট্রিটের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করেছি। সাড়ে পাঁচটা থকে পৌনে সাতটার মধ্যে আলো আর মিলনকে আলাদা আলাদা সময়ে পুনশ্চ থেকে বেরোতে বা ঢুকতে দেখা গেছে। বাকিদের দেখা যায়নি।"

"তার মানে কী দাঁড়াল?"

"আপনার ওপরে ভারবাল বা ফিজ়িক্যাল অ্যাটাক এই কেসের সঙ্গে রিলেটেড কি না, সেটা বুঝতে পারছি না। রিলেটেড হলেও সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। কারণ ফিজ়িক্যাল অ্যাটাক বাড়ি থেকে না-বেরিয়ে, কোনও গুন্ডাকে টাকা দিয়েও ঘটানো যায়।"

দীপশিখা বলেছিল, "সেটা ঠিক। তবে আমার ওপরে যে অ্যাটাক হয়েছে, এটা ওদের জানা দরকার। ঘাবড়ে গিয়ে কোনও ভুল স্টেপ নিতে পারে।"

"আমি তা হলে বলব যে ফরেনসিক সার্জনের ওপরে ফিজ়িকাল অ্যাসল্ট নিয়ে খোঁজ করতে এসেছি।"

বরুণের প্ল্যান কীভাবে কার্যকর হয়, সেটা ভাবতে ভাবতে দোতলায় উঠে বসার ঘরে ঢুকে দীপশিখা দেখল ববি আর নীল মিলে বিবিসি-তে চিনের উইঘুর সম্প্রদায় নিয়ে একটা রিপোর্ট দেখছেন। বরুণ আর দীপশিখাকে দেখে রিমোট টিপে নীল টিভি বন্ধ করলেন।

বরুণ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আর একবার আসতে বাধ্য হলাম।"

তার দিকে তাকিয়ে ববি বললেন, "কেন?"

"আপনাদের বাড়ি আসতে পারি না?" অপ্রস্তুত হাসল দীপশিখা।

"না বোধহয়..." উঠে দাঁড়িয়েছেন নীল।

"শেষবার এলাম," বরুণ ঠান্ডা গলায় বলল, "গতকাল সন্ধে সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত আপনারা কে কোথায় ছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই চলে যাব।"

"আমি, বাবা আর নীলিমা বাড়িতেই ছিলাম," কড়া গলায় বললেন নীল।

"আলো আর আকাশ কোথায় ছিলেন?"
আকাশ বসার ঘরে ঢুকল। বরুণের দিকে তাকিয়ে, রেশমের মতো চুল ঝাঁকিয়ে বলল, "বাড়িতেই! ওয়েব সিরিজ় দেখছিলাম।"

"নীলিমা, আপনি কোথায় ছিলেন? আলোই বা কোথায় ছিলেন?" জিজ্ঞেস করল বরুণ।

"আমি এখানেই ছিলাম," ববির দিকে আঙুল নির্দেশ করে নীলিমা বলে, "বড়বাবুর সঙ্গে," তারপর মোবাইলে আলোকে ফোন করে পুনশ্চয় আসতে বলে।

মিলন চা আর বিস্কুট নিয়ে আসায় ঘরে টেনশন একটু কমল। বরুণ আর নীলিমা কথা বলছে। আকাশ ঠাকুরদার পাশে বসে বিস্কুট এগিয়ে দিল। এর মধ্যেই কলিং বেল বাজল।

নীলিমা নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিতে আলো উপরে উঠে এলেন। বরুণের প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, "আমি যদুবাবুর বাজারে বাজার করতে গিয়েছিলাম।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যে ববি নিজের ঘরে চলে গেলেও নীল বুকে হাত দিয়ে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দীপশিখা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "আসি তাহলে?"

নীল কেটে কেটে বললেন, "আমাদের বাড়ি কলকাতা শহরের বনেদি বাড়িগুলোর মধ্যে একটি। এই বাড়িতে মড়াকাটা ডাক্তার, ডাইনিবুড়ি বা শকুনের বারবার আসাটা অশুভ। আই হোপ দিস ইজ় দ্য লাস্ট টাইম।"

মড়াকাটা ডাক্তার! অনেকদিন পরে কথাটা শুনতে হল দীপশিখাকে। ডাক্তারির মধ্যে অন্ত্যজ হচ্ছে ফরেনসিক মেডিসিন। জ্যান্ত মানুষের এই ডাক্তারের দরকার পড়ে না বললেই হয়। তার মূল কাজ মৃতদেহ নিয়ে। যে কারণে শকুন আর ডাইনিবুড়ির কথা এল।

ডাইনিবুড়ি? চমকে ওঠে দীপশিখা। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছিটকোতে থাকে 'স্রিক স্রিক' করে! প্রিয়া ডাইনিবুড়ি সেজে র‍্যাপ গাইছেন! তাঁর কাঁধে থাকে ঠাকুরমার ঝুলি। গানটা একটু আগেই শুনেছে দীপশিখা। কী যেন লাইনটা? মনে পড়েছে! 'ঘাঁট ঠাকুরমায়ের ঝুলি/ পাবি কলম-চালকগুলি।'

সিয়ার বুটিকের ড্রয়ারে প্রিয়ার যে ব্যাগটা আছে সেটার নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি' না? এক্ষুনি একবার দেখতে হবে! সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামে দীপশিখা। পুনশ্চর সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে সিয়া-র বুটিকে ঢুকে বলে, "প্রিয়ার ব্যাগটা দেখি।"

"পুরো ডাইনিবুড়ি স্টাইলিংটাই আমার কাছে আছে," বুটিকের ড্রয়ার খোলে সিয়া। তার মধ্যে যত্ন করে রাখা রয়েছে সাদা পরচুলা, সাদা থান, লাল রঙের সানগ্লাস, নানা রঙের কাপড় সেলাই করে তৈরি পাশঝোলা।

আগেও এগুলো দেখেছিল দীপশিখা। আজ হাতও দিচ্ছে। পাশঝোলা খুলে দেখছে, চেন দেওয়া পকেটে উঁকি মারছে। বরুণ, মিলন আর আলপথও এসেছে।

বরুণ জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ কী হল? কী মনে পড়তে লাফিয়ে এখানে চলে এলেন?"

ব্যাগের হাতলে হাত বোলাতে বোলাতে দীপশিখা বলল, "ব্যাগটা পুলিশ হেফাজতে নিন। আপনার তদন্তে কাজে লাগবে।"

"কেন?" বোকার মতো বলল বরুণ।

"পরে বলব," সিয়ার বুটিক থেকে বেরিয়ে দীপশিখা মিলনকে বলে, "আপনার ঘরে একবার যাব।"

"আসুন ম্যাডাম," পুনশ্চর সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছেন মিলন।

বরুণ ব্যস্ত থানায় নির্দেশ দিতে। ক্রাইম সিন থেকে কোনও জিনিস নেওয়ার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে। সেগুলো মানতে হয়।

মিলনের ঘরে ঢুকে অন্য কোনও দিকে না-তাকিয়ে বইয়ের র‍্যাকের দিকে গেল দীপশিখা। টেনে নিল রবি ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ'। বই খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে

> শিউরে ওঠে দীপশিখা। তার মনে পড়ছে ফোনে শোনা কথাগুলো, 'প্রেগন্যান্ট অবস্থায় দৌড়োদৌড়ি করছেন কেন? যদি হুট করে অ্যাবর্শন হয়ে যায়!'

একটি হলদে রঙের খাম। দীপশিখা বরুণকে বলল, "এটাও নিয়ম মেনে সিজ় করুন।"

আলপথ, সিয়া আর মিলন অবাক হয়ে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে। নীলিমাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছেন ববি। তিনিও ভুরু কুঁচকে দেখছেন।

## ১২

"এখানে বসা ঠিক হবে তো?" ভবানীপুর থানায় ঢুকে বরুণের চেম্বারে বসে জিজ্ঞেস করল দীপশিখা।

সন্ধে নেমেছে। পুনশ্চ থেকে বেরিয়ে থানায় আসতে অল্প সময় লাগার কথা। কিন্তু সিজ়ার লিস্ট বানিয়ে মাল বাজেয়াপ্ত করতে প্রচুর সমস্যা হয়েছে। ববি সিঁড়ি থেকে দেখেছিলেন কী হচ্ছে। তিনি ডেকে পাঠান নীলকে। নীল এসে এমন চোটপাট শুরু করলেন যে বলার কথা নয়। ফোন চলে এল সপ্তর্ষি আর অমিতের। বিভাসও ফোন করে খোঁজ নিলেন। সব মিলে অযথা হয়রানি।

নেহাত অমিত ওই সময় বরুণের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাই সে স্নায়ু ঠান্ডা রেখে কাজটা করতে পেরেছে। অমিতের সঙ্গে দীপশিখারও কথা হয়েছে।

অমিত বলেছেন, "ম্যাডাম, আমি আপনার সম্পর্কে খবর রাখি। এই কেস নিয়ে আপনি যা যা করেছেন সে সব খবর বরুণ আমাকে দিয়েছে। আপনার কী মনে হয়? কিছু করে উঠতে পারবেন?"

"কী করব, সেটাই তো জানি না! অন্য কেসের ক্ষেত্রে পিএম রিপোর্ট লিখেই আমার কাজ শেষ। সেটা করার জন্যেই মাইনে পাই। কাজেই একটা কেস নিয়ে অকারণে মাথা ঘামাতে যাব কেন? কিন্তু..."

"আমার ওই 'কিন্তু'টাই দরকার!"

"প্রিয়ার মৃতদেহ একবার আমাকে নিয়ে গেল উনিশশো পঞ্চাশ সালের জার্মানিতে। আর একবার নিয়ে গেল উনিশশো বাহাত্তর সালের কলকাতায়। দুটো সময়রেখার শেষেই দাশ পরিবারের দুই মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে। আমি খুবই পারপ্লেক্সড! প্রিয়াকে কে খুন করেছে সেটা জানা যাবে পেন ড্রাইভ আর খাতা থেকে।"

"পেন ড্রাইভ?" অমিত অবাক।

"হ্যাঁ স্যর। প্রিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি খুন হবেন। এটাও বুঝেছিলেন যে খুনি তাঁর কাছের কেউ। তাই যাবতীয় তথ্য তিনি দু'টি পেন ড্রাইভ আর একটি জার্নালে লিখে রেখেছিলেন। সেগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, সেটি একটি গানের লিরিকের মারফত বলে গেছেন।" প্রিয়ার গানের লিরিক মুখস্থ বলে দীপশিখা, "আমি দু'বার শোনা সত্ত্বেও গানের লাইনগুলোকে থার্ড গ্রেডের লিরিক ভেবে পাত্তা দিইনি। পরে খেয়াল করলাম ওর মধ্যে 'খোকা' বা আলপথের ট্যাটু আঁকার কথা বলা আছে, 'তুলতুলি' বা সিয়ার ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ের শাড়ির কথা বলা আছে। এবং চোখ থেকে ঠুলি খুলে ঠাকুরমায়ের ঝুলি খুঁজতে বলা আছে। তাহলেই 'কলম-চালকগুলি' পাওয়ার কথা বলা আছে। কলম-চালক হল 'পেন ড্রাইভ'-এর বাংলা। খুব খারাপ বাংলা, কিন্তু প্রিয়া তো সাহিত্যচর্চা করছিলেন না, কাজের কথা বলছিলেন। তিনি যখন ডাইনিবুড়ি নামে গান গেয়ে থাকেন, তখন তাঁর সঙ্গে একটি পাশঝোলা থাকে, যার নাম 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি'। ওই পাশঝোলার হাতলের মধ্যে দুটো পেন ড্রাইভ সেলাই করে রাখা ছিল। আমি ঝোলার গায়ে হাত বুলোতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি। আর মিলনের ঘরে রবি ঠাকুরের 'পুনশ্চ' কবিতার বইয়ের মধ্যে একটা খাম পেয়েছি, যার মধ্যে রাখা আছে প্রিয়ার লেখা জার্নাল। লিরিকের শেষ দুই লাইনে উনি লিখেছেন, 'খোল চোখের থেকে ঠুলি, পুনশ্চ দেখ খুলি।' এই

পুনশ্চ মানে 'আবার' নয়। এই 'পুনশ্চ' বাড়ির নামও নয়। এই 'পুনশ্চ' হল রবি ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ, যেটা মিলনের ঘরে রাখা ছিল। এই তিনটে জিনিসের অফিশিয়াল সিজ়ার চাইছি। আমি কাউকে কিছু না-জানিয়ে জার্নাল আর পেন ড্রাইভ নিয়ে পুনশ্চ থেকে বেরোতে পারতাম। কিন্তু তা হলে কোর্টে কিছু প্রমাণ করা যেত না।"

অমিত কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "বরুণকে আমি জাস্ট চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেব এই পর্বটা চোকানোর জন্যে..."

"এটা বোধহয় আপনি আমাকেও বলছেন।"

"ম্যাডাম। আমার বয়স উনষাট। রিটায়ারমেন্টের আগে দেখতে চাই যে মন্ত্রীর ধমক টপকে আমার ফোর্স একটা বড় কেস ক্র্যাক করল।"

"আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

"আপনি বরুণকে ফোনটা দিন।"

দুই পুলিশের মধ্যে কী কথা হয়েছে দীপশিখা জানে না। তবে অমিত দায়িত্ব নেওয়ার পরে সপ্তর্ষি, বিভাস বা গুড্ডুর ফোন আসা বন্ধ হয়েছে। পেন ড্রাইভ আর জার্নাল নিয়ে থানায় এসেছে দু'জনে। চা-বিস্কুট এসে গেছে। দু'জনে মিলে ঠিক করেছে পাতাগুলো আগে পড়া হবে।

*

প্রিয়ার জার্নাল

আমি প্রিয়া দাশ। আজ, মানে দু'হাজার একুশ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর এই জার্নাল শুরু করলাম। কবে শেষ হবে, জানি না। আসলে আমি নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নিয়ে জার্নাল লেখা শুরু করলাম। লক্ষ্য পূরণ হলেই লেখা বন্ধ করে দেব। আমার দৃঢ় ধারণা, লক্ষ্য পূরণ হওয়ার আগেই খুন হব। তখন এই জার্নাল কাজে আসবে।

মূল কাহিনির শুরু গত শতকের চল্লিশের দশকে। সব কথা লেখার সময় বা ইচ্ছে নেই। আমি নিজের শরীরে ট্যাটু করে রেখেছি একটি কেস ফাইল নম্বর। শাড়িতে ডিজিটাল প্রিন্ট করে রেখেছি আর একটা কেস ফাইল নম্বর। বুদ্ধিমান অনুসন্ধানকারী এগুলোর খোঁজ পেয়ে যাবেন।

এবার কাজের কথায় আসা যাক।

আমার সঙ্গে নীলের আলাপ মেরিল্যান্ডের বেথেসডা মেডিক্যাল স্কুলে, দু'হাজার সালে। ও তখন সদ্য ডাক্তারি পাশ করেছে, বয়স তেইশ। আর আমি 'ইউ-এস-এম-এল-ই' নামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথেসডা মেডিক্যাল স্কুলে সাইকায়াট্রিতে এমডি করতে ঢুকেছি, বয়স পঁচিশ। আমার বাবা রাজা ব্যানার্জি কলকাতার নামকরা সাইকায়াট্রিস্ট। কলকাতায় বিরাট ক্লিনিক আছে, নাম 'মানবিক।' ভারতবর্ষে সাইকায়াট্রিতে এমডি করতে পারিনি বলে এখানে এসেছি। ডিগ্রিটা নিয়ে দেশে ফিরে 'মানবিক' সামলাতে হবে।

বেথেসডা মেডিক্যাল স্কুলে নীল ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে, উনিশ বছর বয়সে। বরাবর ওর ইচ্ছে, ইউএস আর্মিতে যোগ দেবে। তাই নির্দিষ্ট কেরিয়ার প্ল্যান কষেই আর্মি মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে ঢোকে। এখানে প্রথম থেকেই মিলিটারি কালচার শেখানো হয়, সেল্ফ ডিসিপ্লিন আসে, মানসিক চাপ সামলানোর ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা তৈরি হয়। পাশ করার পরে পোস্টিং হতে পারে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে। ন্যূনতম সাত বছর আর্মিতে পরিষেবা দেওয়া বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, আমার মত ছাত্রছাত্রী, যাদের আর্মির ভাষায় 'সিভিলিয়ান' বলা হয়, তারাও পড়তে পারে।

নীলের সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে যায় যৌবনের নিয়মে। ভালই ছিলাম। দু'জনের হাতেই সময় নেই। সারা দিনে একবার দেখা হত কি না সন্দেহ। কিন্তু তাতেই দু'জনে খুশি। উইকএন্ডে মুভি দেখতে যেতাম। সেখান থেকে চলে যেতাম নীলের রুমে। সঙ্গে টেক অ্যাওয়ে ডিনার আর বিয়ার। রাতটা ওখানে কাটিয়ে রবিবার সকালে ফিরতাম নিজের ডর্মে। সুন্দর কাটছিল দিনগুলো। যৌবন যেমন কাটে আর কী!

সেই রকম এক উইকএন্ডে, বিয়ারের ঘোরে কলকাতা যাওয়ার কথা বলেছিল নীল। উনিশশো সাতানব্বই সালে, কুড়ি বছর বয়সে, ডাক্তারি পড়ার ফার্স্ট ইয়ারে ও কলকাতা গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে। কলকাতায় মা মারা যান। শুনেছি আত্মহত্যা করেছিলেন। মায়ের কাছে ছোটবেলা কাটালেও নীল ছিল ড্যাডিজ় বয়। মায়ের থেকে বাবাকে বেশি ভালবাসত।

ডাক্তারি পাশ করার পরে গোটা দু'হাজার এক সাল ও বেথেসডা আর্মি স্কুলেই আর্মির ডাক্তার হিসেবে চাকরি করল। আমরা দু'জনেই জানতাম, কয়েক মাসের মধ্যেই ওকে চলে যেতে হবে বিশ্বের যে কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে। দু'হাজার দুই সালে সেই দিনটা এসেই গেল। ও চলে গেল আবু ঘ্রাইব। ওখানে কেন নীলকে পাঠানো হল সেটা বুঝতে গেলে জানতে হবে গাল্ফ ওয়ার বা খাঁড়ি-যুদ্ধের কথা।

ইরাক আর ইরানের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল লম্বা সময় ধরে। দুটো দেশই এর ফলে নিঃস্ব হয়ে যায়। নিজেকে বাঁচাতে ঋণ নেয় ইরাক। সেখানকার শাসক সাদ্দাম মনে করতেন কুয়েত দখল করে ওই দেশের তেলের ভাণ্ডার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলে ইরাক হয়ে যাবে মধ্য প্রাচ্যের হর্তাকর্তা। ব্যস! লোকটা বিশাল সামরিক বহর নিয়ে কুয়েত আক্রমণ করল। সেটা দেখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভাবলেন, ইরাক যদি কুয়েতের দখল নিয়ে তেলের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যায় তাহলে বিপদ। তিনি আমেরিকা এবং চৌত্রিশটি দেশকে নিয়ে কোয়ালিশন ফোর্স বা জোট বাহিনী তৈরি করলেন। এই বাহিনীর কাছে ইরাক পরাজিত হয়।

জোট বাহিনী গঠন এবং ইরাকের পরাজয়— এই সময়সীমার মধ্যে ঘটেছিল খাঁড়ি-যুদ্ধ। কত লোক যে সেই যুদ্ধে মারা গেছে, তার হিসেব নেই। দু'হাজার তিন সালে আমেরিকা এবং জোট বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণে সাদ্দামের পতন ঘটে। আমেরিকান সৈন্যদল ইরাকের দখল নেয়। দখল নেয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাড়ির। তার মধ্যে একটি ছিল আবু ঘ্রাইব।

বাগদাদের পশ্চিমে, বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছিল আবু ঘ্রাইব কারাগার যেটা বন্দিদের ওপরে অমানবিক নির্যাতন এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্যে কুখ্যাত ছিল। সাদ্দামের আমলে এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বন্দি ছিল। সাদ্দামের পতনের পর মার্কিন সেনারা আবু ঘ্রাইবের দখল নিয়ে সেটিকে মিলিটারি জেলে রূপান্তরিত করে। এখানে তিন ধরনের বন্দিদের রাখা হত। সাধারণ চোর-ডাকাত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসবাদী। আটক মানুষদের মধ্যে সত্তর থেকে আশি শতাংশ ছিলেন নিরপরাধ। নেহাতই সন্দেহের বশে আটকে রাখা হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যরা বন্দিদের ওপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, অত্যাচার, ধর্ষণ করত। এবং সব শেষে হত্যা।

কারাগারের প্রবেশদ্বারে একটি সাইন বোর্ড লাগানো হয়। তাতে লেখা, 'America is the friend of all Iraqi people.'

*

জার্নাল পড়া থামিয়ে দীপশিখা বলে, "আমি একটু ওয়াশরুমে যাব।"

"আমাদের এখানে লেডিস টয়লেট আছে!" উঠে দাঁড়াল বরুণ। লেডি কনস্টেবলকে ডেকে বলল, "মিনতি, ম্যাডামকে তোমাদের বাথরুমে নিয়ে যাও।"

থানা কম্পাউন্ডের পিছন দিকে হেঁটে যাচ্ছে মিনতি। দীপশিখাকে দেখাচ্ছে, "ওটা ছেলেদের ব্যারাক, ওটা স্যারের কোয়ার্টার, ওটা আমাদের ব্যারাক, এদিকে ক্যান্টিন..."

মেয়েদের ব্যারাকে ঢুকে টয়লেট সেরে বেরিয়ে এসেছে দীপশিখা। বলছে, "থানার মালখানাটা কোথায়?"

তালামারা, পুরনো একতলা ঘরের দিকে আঙুল দেখাল মিনতি। ঘরের সামনে অনেকগুলো বাজেয়াপ্ত করা বাইক, চারচাকা, সাইকেল এমনকি অ্যাম্বুল্যান্সও পড়ে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, এগুলো অনেক বছর ধরে এখানে রয়েছে। দীপশিখা জিজ্ঞাসা করল, "এগুলোর কী গতি হবে?"

"কোনও গতি হবে না ম্যাডাম। এভাবেই পড়ে থাকবে। আমরা অন্য থানায় বদলি হয়ে যাব। সেখানে অন্য মালখানার সামনে দিয়ে হেঁটে যাব। নেহাত আমাদের স্যার এই মালখানা সাফ করতে বললেন, তাই অনেক ফাইল উদ্ধার হল। অন্য থানা আমাদের

দেখে শিখবে। খবরের কাগজে নিজের নাম দেখার ব্যাপারে স্যরের খুব ইয়ে...”

“লোভ বলছেন?”

“হ্যাঁ,” খিলখিল করে হাসে মিনতি। “আগের বার কাগজে নাম বেরিয়েছিল তো! আপনিও তো সঙ্গে ছিলেন। তবে এবারের ব্যাপারটা আলাদা।”

“তাই? কেন?” মেয়েলি আড্ডায় মেতে ওঠে দু'জনে।

“আপনি বলে দেবেন না স্যরকে?” ফিচেল হাসি মিনতির মুখে, “গড প্রমিস?”

দীপশিখা দিব্যি খেয়ে বলে সে কাউকে বলবে না। এই নিয়ে গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর আর হাহাহিহি চলে কিছুক্ষণ।

চেম্বারে ফিরে দীপশিখা দেখল বরুণের জার্নাল পড়া শেষ। সে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বলল, “এই খাতায় আবু ঘ্রাইব নিয়ে আর কিছু বলা নেই। আছে ব্যক্তিগত কথা। সেগুলো আপনাকে বলে দেব?”

“বলুন,” বলল দীপশিখা।

“ওই কারাগারে নীল ছিলেন দু'হাজার দুই থেকে দু'হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত। প্রিয়া এর মধ্যে সাইকায়াট্রিতে এমডি করে আমেরিকায় প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন। ওঁর বাবা রাজা বারবার অনুরোধ করছেন কলকাতায় ফিরে আসতে। প্রিয়া শুনছেন না। আমেরিকার মসৃণ জীবন তাঁর পছন্দ হয়ে গেছে।”

“আর নীল?”

“দু'হাজার সাত সাল পর্যন্ত নীল ইউএস আর্মির মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। সাত বছর চাকরির মেয়াদ শেষ হতেই চাকরি ছেড়ে দেন। দু'হাজার আট সালে আমেরিকাতেই ওঁদের বিয়ে হয়। কারও বাড়ির লোক সেই বিয়েতে ছিলেন না। আকাশের জন্ম সেই বছরেই। সেই বছরই প্রিয়ার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। প্রবল পিতৃশোক, অপরাধবোধ, ‘মানবিক’কে বাঁচানোর তাগিদে প্রিয়া আমেরিকা ছাড়লেন স্বামী ও পুত্রসহ। উঠলেন পুনশ্চয়। তারপর থেকে এখানেই থাকেন ওঁরা। এই কথাগুলোই জার্নালে লেখা আছে। শেষ এন্ট্রি আছে অগস্ট মাসের সাত তারিখে। তাতে লেখা আছে...”

*

প্রিয়ার জার্নাল

গত বছর পঁচিশে ডিসেম্বর এই দু'টি পেন ড্রাইভ আমার হাতে আসে। তারপর থেকেই আমি এই জার্নাল লেখা শুরু করেছি। বাকি তথ্য জানার জন্যে পেন ড্রাইভ দু'টি দেখতে হবে। ওগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, কে আমাকে খুন করতে চায়, কেন খুন করতে চায়।

আজ আমি খুনির সঙ্গে কথা বলেছি। সে জেনে গেছে যে আমি সব জানি। আমার আর বেঁচে থাকার কোনও উপায় নেই। আমি স্নান করা, পোশাক বদলানো, বেডরুমের বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছি। বাড়ির খাবার খাচ্ছি না। দেখা যাক কী হয়।

*

জার্নালের শেষ এন্ট্রি শুনে দীপশিখা বলল, “এই দুটো পেন ড্রাইভে যা আছে, সেসব আগামিকাল দেখব। এখন আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।”

“চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই,” চেয়ার থেকে উঠেছে বরুণ, “আগামিকাল এগুলো কোথায় দেখা হবে? এখানে আসবেন?”

“আপনি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসুন,” মিনতি আর সুব্রতর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে থানা থেকে বেরোল দীপশিখা, “মন্দিরা ম্যাডাম বলেছেন, আমার কমপ্লিট বেডরেস্ট প্রয়োজন।”

“মন্দিরা ম্যাডামের পরামর্শ শুনে সবাইকে ধন্য করে দিচ্ছেন!” বরুণ হাহা করে হাসছে।

## ১৩

ভিডিয়ো ক্লিপ

হাতে ধরা ভিডিয়ো ক্যামেরায় তোলা ফিল্ম। ফ্রেম কাঁপছে, ছবি ঝিরঝির করছে। দেখা যাচ্ছে একটি কারাগার। ক্যামেরা ঘুরতে দেখা গেল কয়েদখানাটির নম্বর সাঁইত্রিশ। ধূসর দেওয়ালের পটভূমিতে রাখা রয়েছে একটি প্যাকিং বাক্স। এই রকম বড় কাঠের পেটিতে ফল জাতীয় জিনিস পাঠানো হয়। বাক্সটির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। শরীর ধূসর কম্বলে ঢাকা, মাথা ঢাকা বস্তা দিয়ে।

নেপথ্য ভাষণ শুরু হল। পাক্কা মার্কিন উচ্চারণে ভিডিয়োগ্রাফার বলছেন, “ইউএস আর্মির বিশেষজ্ঞ সাবরিনা হারমান এবং স্টাফ সার্জেন্ট ইভান ফ্রেডরিক এই ইরাকি বন্দির হাত-পায়ের আঙুলে এবং পুরুষাঙ্গে ইলেকট্রিক তার লাগিয়ে দিচ্ছেন। কী সাবরিনা, ঠিক বললাম তো?”

সাবরিনা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বন্দিকে শুনিয়ে বললেন, “ইরাকি কুত্তার বাচ্চাটা যদি বাক্স থেকে পড়ে যায় তা হলে ইলেকট্রিক শকে মারা যাবে। কাজেই, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ততক্ষণই ওর আয়ু।”

“দ্যাট্স গ্রেট। আমি এক নম্বর বন্দির পাল্স রেট, টেম্পারেচার, ব্লাড প্রেশার আর রেসপিরেটরি রেট মাপতে চাই। ওগুলো ছাড়াও কয়েকটা অতিরিক্ত মাপকাঠি আছে।”

হঠাৎ করে ক্যামেরায় শুধু জেলখানার সিলিং দেখা যাচ্ছে। ভিডিয়োগ্রাফার বললেন, “আমি প্রোব আর ইলেকট্রোডগুলো লাগিয়ে ফিরে আসছি। ইট উইল টেক হাফ আ মিনিট।”

তিরিশ সেকেন্ড পরে ক্যামেরা আবার সচল। দেখা গেল এক নম্বর বন্দি বাক্সের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর হাতে, বুকে, মাথায় নানা রকম তার লাগানো। পাশেই একাধিক মনিটরে নানা তথ্য রেকর্ড হচ্ছে।

*

“আবু ঘ্রাইবের এই ফটোটা বাইরে লিক হয়ে যায়,” বলল দীপশিখা, “এই ফটো আবু ঘ্রাইবের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে সাবরিনা আর ফ্রেডরিকের সাক্ষাৎকার বিবিসিতে দেখেছি। সাবরিনা বলছিলেন, ‘আমি এক নম্বর বন্দির সঙ্গে মজা করেছিলাম।’ ফ্রেডরিক বলেছিলেন, ‘এক নম্বর বন্দি যদি বাক্স থেকে পড়ে যেত, তাহলে সত্যিই ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা যেত।’ বরুণ, জেলে মানবাধিকার কোথায় গেছে দেখেছেন?”

দীপশিখার ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে রয়েছে বরুণ। জেলখানার নিন্দের কথা ঘোরাতে সে বলল, “প্রথম পেন ড্রাইভে অনেকগুলো ফোল্ডার দেখলাম। ভিডিয়ো ফাইল ছাড়াও পিডিএফ এবং ওয়ার্ড ডকুমেন্ট রয়েছে। ওগুলো দেখব না?”

“ওগুলোও দেখব,” দীপশিখা বলল, “আপনাকে জানিয়ে রাখি, এক নম্বর বন্দি ওই অবস্থায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে আবু ঘ্রাইব থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন।”

“বাকি ভিডিয়োটা দেখি।”

*

ভিডিয়ো ক্লিপ

এক নম্বর বন্দিকে ছেড়ে ক্যামেরা ঘুরল অন্য দিকে। সেখানে আমেরিকার নেভি সিলের একটি দল একটি ছেলেকে মারতে মারতে কারাগারে ঢোকাল। ছেলেটির মুখ বালির বস্তা দিয়ে ঢাকা। কয়েদখানায় ঢোকানোর পরে শুরু হল ঘুষি, লাথি, কিল, থাপ্পড়। এক নেভি সিল গলা টিপে ধরল। অন্য একজন চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিল।

মার্কিনি উচ্চারণে ভিডিয়োগ্রাফার বললেন, “বন্দি নম্বর দুই। একে এখন জেরা করা হবে।”

ফ্রেমে একটি শাওয়ার রুম। ইউ এস আর্মি ইন্টেলিজেন্সের তিনজন সাড়ে ছয় ফুটিয়া সদস্য জেরা করছে দ্বিতীয় বন্দিকে। ক্যামেরার ফ্রেমে আবার কিছুক্ষণের জন্যে জেলখানার ছাদ দেখা যাচ্ছে। ভিডিয়োগ্রাফার বললেন, “প্রোব আর ইলেকট্রোড লাগিয়ে ফিরে আসছি।”

ক্যামেরা সচল হতে আবার দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বন্দিকে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। একজন নেভি সিল বন্দির শরীরে পেচ্ছাপ করে দিল। আর-একজন লোহার রড দিয়ে বেদম মারল। এরকম অত্যাচার আধঘণ্টা চলার পরে দ্বিতীয় বন্দি মারা গেল।

ক্যামেরার ফ্রেমে আবার কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জেলখানার ছাদ। অর্থাৎ ভিডিয়োগ্রাফার মৃতদেহর শরীর থেকে নিজের কাজের জিনিস খুলে নিয়েছেন। ক্যামেরা আবার ঘুরছে। ভিডিয়োগ্রাফার অন্য দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, “আমাদের সামনে এখন এক মার্কিন সেনা। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাক।”

পর্দায় বিশাল চেহারার অল্প বয়সি এক মার্কিন সেনা। তিনি বললেন, “আমার নাম জেরেমি। বাড়ি পেনসিলভানিয়ার মার্টিনসবার্গে। আঠেরো বছর বয়সে আর্মিতে যোগ দিয়েছি। প্রথম পোস্টিং আবু ঘ্রাইব।”

“জেরেমি, আপনি কী কাজ করছেন এখানে?” জিজ্ঞেস করলেন ভিডিয়োগ্রাফার।

“আমি এখানকার মিস্ত্রি এবং ড্রাইভার।”

“কতজন বন্দি এখন এখানে আছেন?”

“ছেলে-মেয়ে-বাচ্চা মিলিয়ে প্রায় প্রায় দু'হাজার। বেশির ভাগই নির্দোষ। আমার কাজ

হল এদের নির্যাতন করা। আমি সেই কাজটা মন দিয়ে করছি।”

“এখানে আসার পরে প্রথম অভিজ্ঞতা শোনান।”

“সে আর বলবেন না!” খ্যাকখ্যাক করে হাসছেন জেরেমি, “আমার বস ইভান আমাকে নিয়ে গেল একটা হলঘরে। সেখানে ঢুকে দেখি কয়েকশো বন্দিকে ল্যাংটো করে শুইয়ে রাখা আছে। ইভান এবং অন্য সৈন্যরা আর্মির কুকুর নিয়ে এল। কুকুরগুলো যথেচ্ছ কামড়াতে লাগল। কেউ ভয় পেয়ে উঠতে গেলেই লাথি বা লোহার রডের বাড়ি মারা হচ্ছিল। গায়ে গরম বা বরফ ঠান্ডা জল ঢেলে দেওয়ার কাজটা করছিল দু'জন সৈন্য মিলে। এক মহিলা সৈন্য কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ দিয়ে পুরুষ বন্দিদের ধর্ষণ করেছিল। সে এক মজার দৃশ্য! আজও ভাবলেই হাসি পায়!”

*

বুলুদি এসে বলল, “সকাল দশটা বাজে। জলখাবার চাই না তোমাদের? সকাল থেকে তো শুধু কাপের পর-কাপ চা খেয়ে যাচ্ছ!”

“কী রান্না করেছ?” আড়মোড়া ভাঙে দীপশিখা, “আমার খিদে পায়নি।”

“খিদে না-পেলেও খেতে হবে!” ঝঙ্কার দেয় বুলুদি, “রাস্তার কুকুর-বেড়ালও নিজের পেটে ঠিক সময়ে রসদ ঠুসে দেয়। ওরা জানে যে পেটেরটাকেও খাওয়াচ্ছে।”

“উফ! তুমি এত বকবক করো কেন?” বিরক্ত দীপশিখা, “যা বানিয়েছ দিয়ে দাও।”

“তোমার বিস্নায় শুয়ে থাকার কথা। বসে আছ কেন? আমি দাদাবাবুকে ফোনে বলে দিচ্ছি।”

“মোটেই বলবে না!” চিৎকার করে দীপশিখা।

“তোমার একটা কিছু হয়ে গেলে আমি তাকে কী জবাব দেব?” ঠক করে লুচি আর কালো জিরে দেওয়া আলুর তরকারির দুটো প্লেট টেবিলে রেখে চলে যায় বুলুদি। ফিক করে হেসে বরুণের দিকে তাকিয়ে দীপশিখা বলে, “খেতে শুরু করুন। আরও আসছে।”

বরুণ লুচির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, “খুব খিদে পেয়েছে। আপনি পরের ভিডিয়োটা চালান।”

“দাঁড়ান। আগে এই ডকুমেন্টটা পড়ে নিই।”

“এটা তো ‘ল্যানসেট’ নামের জার্নালের একটা পাতা!” বলল বরুণ।

দীপশিখা বলল, “বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক পরিচিত জার্নালের মধ্যে ল্যানসেট পড়ে। এই জার্নালের গুরুত্ব অপরিসীম।”

*

ল্যানসেট জার্নাল

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-এথিক্সের অধ্যাপক স্টিভেন মাইলস লিখছেন, ‘আবু ঘ্রাইব কারাগারের সেনা চিকিৎসকরা ইরাকি বন্দিদের উপর ঘটে যাওয়া নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকে লুকোতে গিয়ে মিথ্যে মেডিক্যাল রেকর্ড তৈরি করেছেন। সেনা-চিকিৎসকরা নীতি আদর্শ লঙ্ঘন করেছেন এবং রোগীদের সেবা দেওয়ার পেশাদারি বাধ্যবাধকতা মানেননি।

‘আমেরিকান সেনা-চিকিৎসক এবং সেবিকারা আবু ঘ্রাইবে নির্যাতন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে সচেতন থাকা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের জানাননি। তদন্ত করে দেখা গেছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে নানাভাবে। তাঁরা চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। বন্দিদের চিকিৎসা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, প্রতিবন্ধী বা আহত বন্দিদের যত্ন নেননি। মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার রেকর্ড দেখে সেই অনুযায়ী অত্যাচার ডিজ়াইন বা পরিকল্পনা করেছেন, রোগী মারা গেলে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি বদলে ভুয়ো ‘মৃত্যু শংসাপত্র’ লিখেছেন। চিকিৎসা-কর্মীদের নৈতিক ব্যর্থতার সবথেকে বড় উদাহরণ হল ইরাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপকের হত্যা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রহমতের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পরে তাঁকে হত্যা করেন এক সেনা চিকিৎসক।

স্বাস্থ্যকর্মীকে ভরসা করে মানুষ নিজের গোপনতম কথা বলে। সেই চিকিৎসক যখন তথ্যের ভিত্তিতে অত্যাচার পরিকল্পনা করেন বা সব জেনে নিয়ে রোগীকে হত্যা করেন, তখন বুঝতে হবে কতিপয় ব্যক্তির জন্যে পেশাটি কলঙ্কিত হচ্ছে। যাঁর জীবন দেওয়ার কথা, তিনি জীবন নিচ্ছেন।

যাঁরা আবু ঘ্রাইব এবং গুয়ান্তানামো বে-তে সেনা চিকিৎসকদের দুর্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা যেন মুখ খোলেন। রোগীর স্বার্থরক্ষাই চিকিৎসকের একমাত্র লক্ষ্য। সেনা চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা কার প্রতি? ইউএস আর্মি, অর্থাৎ চাকরিদাতা? না কি রোগী? এই প্রশ্নের উত্তরে লুকিয়ে আছে সমস্যার সমাধান। মার্কিন সামরিক চিকিৎসা পরিষেবা, মানবাধিকার গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক আইন, চিকিৎসার নৈতিকতা— অনেকগুলি বিষয় জড়িত আছে এই সমস্যার সঙ্গে।

সমাধান চাই এক্ষুনি।

*

দীপশিখা বলল, “ঝুড়ির একটা পচা আপেলের জন্যে পুরো ঝুড়িকে পচা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। এটা জানেন তো?”

“আপনি ডাক্তারদের কথা বলছেন? পুলিশের ক্ষেত্রেও এই কথাটা সত্যি ম্যাডাম,” খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে বরুণ বলল, “পরের ভিডিয়োটা চালান।”

“এই পেন ড্রাইভে আর কিছু নেই। সেই জমানায় কম মেমরিওয়ালা পেন ড্রাইভ তৈরি হত। বাকি ভিডিয়ো পরের ড্রাইভে।”

“সেটা দেখান। আর এইটা আমাকে দিয়ে দিন।”

*

ভিডিয়ো ক্লিপ

আবার সচল ক্যামেরার ফ্রেম। আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, “আমার সামনে এখন তৃতীয় বন্দি। জেরা-পর্ব চুকিয়ে নিজের সেলে ফিরছেন। আপনার পরিচয়?”

“মাই নেম ইজ় রহমত...”

“ইউ আর প্রিজ়নার নাম্বার থ্রি!” ভরসা দিলেন ভিডিয়োগ্রাফার, “আপনার নাম গোপন রাখতে চাই। এবার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। আপনি কী করেন?”

“আমি ইরাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। পড়াশুনো করেছি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।”

“আবু ঘ্রাইবের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করুন।” বললেন ভিডিয়োগ্রাফার।

“আমার ব্লাড প্রেশার এবং ব্লাড সুগার আছে। আছে মাথা ঘোরার ব্যামো। এখানে আসার পরে সে সব তথ্য আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে এক মার্কিনি চিকিৎসক। তাঁকে আমি ভরসা করেছিলাম। পরে দেখলাম, ভুল সিদ্ধান্ত।”

“আপনাকে জেরা করার অভিজ্ঞতা কী রকম?”

“আপনি তো মার্কিনি সেনা? তা হলে এসব জানতে চাইছেন কেন?”

“আমি প্রেসের লোক,” ফিসফিস করে বলেন ভিডিয়োগ্রাফার, “বাইরের পৃথিবী জানুক এখানে কী হচ্ছে।”

“হ্যাঁ, আপনি সাদা চামড়ার আমেরিকান নন। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলছি।”

“ধন্যবাদ।”

“আমাকে এখানে আনার পরে উলঙ্গ করে এমন একটা সেলের মধ্যে রাখা হয়। গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে দেখা যায় ভিতরে কী হচ্ছে। প্রথম দিন ওরা দুটো লাউডস্পিকার নিয়ে এল। এক একটা প্রায় এক মিটার চওড়া। আমাকে সেলের মধ্যে উপুড় করে শুইয়ে দু'কানের দু'পাশে লাউডস্পিকার রেখে চালিয়ে দিল মাইকেল জ্যাকসনের ‘থ্রিলার!’ কী ভীষণ জোরে! লুপ মোডে একই গান চলছে তো চলছেই। আমার মাথা ঘোরার ব্যামো আছে জেনেই ওরা গান শোনাত। একটু পরে মাথা ঘুরতে লাগল, গা গুলোতে লাগল, তারপরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। পরের দু'দিন কিছু শুনতে পাইনি। আমাকে কী প্রশ্ন করত, বুঝতে পারতাম না। ওরা ভাবত ন্যাকামি করছি। তখন ওদের পোষা কুকুরগুলো নিয়ে আসত। কুত্তাগুলো কানের কাছে ঘেউ ঘেউ করত। ভয়ের চোটে পেচ্ছাপ পায়খানা করে ফেলতাম। আমাকে ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড সুগারের রুটিন ওষুধ দিত না। আমার শরীর দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।”

“আর কী কী করা হচ্ছে আপনার সঙ্গে?”

“জেরা করার আগে রোজ আমাকে উলঙ্গ করে হামাগুড়ি দেওয়ানো হয়। দশজন মার্কিন সৈন্য আমাকে গাধা বানিয়ে, পিঠে চড়ে এক কিলোমিটার করে হামাগুড়ি দেওয়ায়। শরীরের কষ্ট একদিন না একদিন চলে যাবে। কিন্তু এই মানসিক অত্যাচার, এই হিউমিলিয়েশন কখনও ভুলব না।”

“আপনার কি আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে?”

"এক সময় করত। যখন আমাদের দিয়ে মানব পিরামিড বানানো হত। দশ-বারোজন পুরুষ ও মহিলাকে উলঙ্গ করে বলা হত একে অপরের ওপরে উঠে পিরামিড তৈরি করতে। আমরা লজ্জা পেতাম, বিরক্ত হতাম, রাগ করতাম, ঘেন্না করতাম... তারপর নিতান্ত বেঁচে থাকার জৈবিক তাগিদে গায়ের জোর খাটিয়ে পিরামিডের মাথায় চড়ার চেষ্টা করতাম। না হলে তো মরে যাব। মেয়ে সৈন্যরা হাসতে হাসতে আমাদের উলঙ্গ অবস্থার ছবি তুলত! একটি ইরাকি মেয়েকে আমাদের চোখের সামনে ধর্ষণ করা হল। এক মহিলা সৈনিক তার ভিডিয়ো তুলল। এইসব অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আমি মানসিক ভাবে কঠোর হয়ে গিয়েছি। শারীরিক এবং মানসিক অসুবিধেগুলো গায়ে মাখি না।"

"রোজ জেরা করা হয়?"

"প্রতি দু'দিনে একবার।

"রাতে ঠিক সময়ে ঘুম আসে? মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়? দুঃস্বপ্ন দেখেন?"

"আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার কোনও সমস্যা নেই। আমার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিশোধ নেওয়া।"

ঠিক এইখানে ক্যামেরার ফ্রেম কেঁপে উঠল। রহমতের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ক্যামেরা নীচে ঝুঁকতে দেখা গেল ভিডিয়োগ্রাফারের হাতে সুইস আর্মি নাইফ। ছুরিটা তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিন নম্বর বন্দির পেটে। ছুরি ছোট বলে মৃত্যু আসতে সময় লাগছে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকানো হচ্ছে সেটি। ভিডিয়োগ্রাফার গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন কী ভাবে তিন নম্বর বন্দির মৃত্যু হবে। রক্তক্ষরণজনিত শক আর নিউরোজেনিক শকের মধ্যে কোনটি আগে মরণ ডেকে আনবে, এই নিয়ে বিভিন্ন কেস স্টাডির কথা বলছেন।

পাঁচ মিনিটের মাথায় তিন নম্বর বন্দি মারা গেলেন। হঠাৎ ক্যামেরায় দেখা গেল ভিডিয়োগ্রাফারের মুখ। হাতে ক্যামেরা ধরা অবস্থায় লেন্সের সামনে মুখ এনেছেন বলে অদ্ভুত এবং ভয়ানক লাগছে তাঁকে। দীপশিখার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "দিস ইজ় নীল ড্যাশ ফ্রম আবু ঘ্রাইব প্রিজ়ন। সিয়াও!"

*

দীপশিখা আঁতকে উঠে ওয়াক তুলল। তারপরে হড়হড়িয়ে বমি করতে লাগল।

বরুণ বেকুবের মতো বসে। বুলুদি দৌড়ে এসে বলল, "কী হল?"

দীপশিখা কোনও রকমে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত বাথরুমে যায় সে। হাতে, মুখে, ঘাড়ে আর কানের পিছনে জল দিয়ে, মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে বুলুদি বমি পরিষ্কার করে দিয়েছে, ঘরে রুম ফ্রেশনার স্প্রে করে দিয়েছে। বরুণ গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে।

"দুটো প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। বাকি সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার।"

"প্রথমটি কী?" জিজ্ঞেস করল বরুণ।

"আমাকে হুমকি ফোন আর ফিজ়িক্যাল অ্যাসল্ট করার পিছনে কে বা কারা আছে?"

"আর দ্বিতীয় প্রশ্ন?"

"আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন," ঠান্ডা মাথায় বলল দীপশিখা, "দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। পরে বলব।"

## ১৪

পুনশ্চর কলিং বেল টিপে সৈকত বলল, "আজ তেইশে অগস্ট। প্রিয়ার মৃত্যুর পরে এগারো নম্বর দিন। ওঁর বাড়ির লোক আজ শ্রাদ্ধ করছেন কেন? অপঘাতে মৃত্যু হলে তো তিন দিনের মাথায় কাজ হয়।"

নিজেদের গাড়ি থেকে নেমেছে দীপশিখা আর সৈকত। বিশে অগস্ট পুরুলিয়া গিয়ে একদিন ওখানে থেকেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছে সৈকত। দীপশিখার হুকুম অথবা অনুরোধ অস্বীকার করতে পারেনি। কারণ জিজ্ঞেস করায় দীপশিখা বলেছে, "পুনশ্চর তরফে প্রিয়াকে নিয়ে একটি স্মরণসভা আয়োজন করেছেন দাশ পরিবার। সেখানে ওঁরা ছাড়া বাইরের লোক বলতে পুলিশমন্ত্রী সপ্তর্ষি রায় আর পুলিশ কমিশনার অমিত চক্রবর্তী আমন্ত্রিত। আমরা সবাই মিলে গেট ক্র্যাশ করব। তুমিও এসো।"

"আমি গিয়ে কী করব? মহা মুশকিল তো!" আপত্তি করেছিল সৈকত, "আর ঘেঁটুরানিই বা কেন যাবে? তার এখন রেস্টে থাকার কথা!"

"ঘণ্টুসোনা ওই স্মরণসভায় যাবে বলে কলকাতা আসছে। দ্যাটস ফাইনাল," পুচ পুচ করে মোবাইলে চুমু খেয়ে ফোন রেখেছিল দীপশিখা। গিন্নির হুকুম অমান্য করার সাহস কোন বীরপুঙ্গবের আছে? সৈকত পুরুলিয়া থেকে চলে এসেছে।

দীপশিখার হাতে রয়েছে খবরের কাগজে মোড়া একটা হোয়াইটবোর্ড, কাঁধে ব্যাগ। সৈকতের হাতে 'ফরগেট মি নট' ফুলের তোড়া। ওদের গাড়ির ঠিক পিছনে পুলিশের জিপ দাঁড় করিয়ে নামল বরুণ, সুব্রত আর মিনতি। হুটার আর বিকন লাগানো কালো এসইউভি থেকে নেমেছেন অমিত চক্রবর্তী। লালবাতি লাগানো সরকারি সাদা গাড়ি থেকে নামলেন সপ্তর্ষি রায়।

সৈকতের দিকে তাকিয়ে বরুণ বলল, "দাশ পরিবার প্রথাগত শ্রাদ্ধ করছেন না, স্মরণসভা করছেন। সেটা যে কোনও দিন হতে পারে।"

মিলন দরজা খুলে দিয়েছেন। তাঁর পিছনে দেখা যাচ্ছে নীলকে। তিনি সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার আর অমিতের আসার কথা ছিল। সঙ্গে এত লোকজন কেন?"

"আমরা আসতে পারি না?" একগাল হাসল দীপশিখা, "মড়াকাটা ডাক্তার বলে কি মানুষ নই? আজও কিন্তু 'ফরগেট মি নট' নিয়ে এসেছি।"

"উনি কে?" সৈকতের দিকে বিরক্ত মুখে তাকালেন নীল।

"আমার বর, ডক্টর সৈকত মুখার্জি," সদর দরজা দিয়ে ঢোকে দীপশিখা, "বাকিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই? এঁরা সুব্রত আর মিনতি। ভবানীপুর থানার কনস্টেবল।"

সবাই ভিতরে ঢুকেছে। একদম শেষে এল আলপথ আর সিয়া। পুনশ্চর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন মিলন।

দোতলায় উঠে দেখা গেল, ড্রয়িং রুমের সেন্টার টেবিলে প্রিয়ার পুরনো ফটোটাই দাঁড় করানো আছে। টেবিলের উপরে এবং মেঝেয় অজস্র ফুলের মালা, স্তবক আর তোড়া রাখা রয়েছে। ধূপ জ্বলছে। ববি সোফায় বসে প্রিয়ার ফটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আলো আর নীলিমা ঘর সাফ করছিলেন। মিলন তাদের নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। সপ্তর্ষি আর অমিতকে নীল বললেন, "তোমরা সোফায় বোসো।"

বাকিরা কে কোথায় বসবেন, এই নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসার পরে দীপশিখা বলল, "প্রয়াত প্রিয়া দাশের স্মরণসভায় আসতে পেরে মন হালকা লাগছে। আমি যদিও আমন্ত্রিত নই, তাও চলে এসেছি। আমার বর, যে একজন ডাক্তার, তাকেও নিয়ে এসেছি। যদিও ও ডক্টর প্রিয়া দাশকে চিনত না। যাই হোক, আমাদের অনেকের কাছেই প্রিয়াকে নিয়ে কিছু না-কিছু স্মৃতি আছে। সেই সব স্মৃতি সকলে মিলে ভাগ করে নিতেই এই স্মরণসভা।"

দীপশিখার দিকে গনগনে চোখে তাকিয়ে রয়েছেন নীল। তিনি বুঝতে চাইছেন, অনুষ্ঠান সঞ্চালনার কাজ দীপশিখা নিজের হাতে নিচ্ছে কেন? উদ্দেশ্য কী? বাধা দিতে গিয়েও দিতে পারছেন না। কারণ দীপশিখা অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছে। সে বলছে, "সকলের অনুমতি নিয়ে প্রিয়ার স্মরণসভা শুরু করছি। বরুণ, আপনি প্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"আমি?" চমকে উঠেছে বরুণ। পুনশ্চর বাসিন্দাদের ছেড়ে দীপশিখা তাকে স্মৃতিচারণ করতে বলবে, এটা ভাবতেই পারেনি।

"আপনার সঙ্গে প্রথম কীভাবে যোগাযোগ হয়? কোনও স্মৃতি আছে?"

"আমি কী বলব..." বরুণ তো-তো করছে। এর মধ্যে নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছে আকাশ। মায়ের ফটোয় প্রণাম করে রেশমের মতো চুল ঝাঁকিয়ে, সর্দি বসা গলায় বলল, "মা মারা যাওয়ার পরে উনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। জীবিত অবস্থায় মাকে উনি চিনতেন না। ওঁর পক্ষে মাকে নিয়ে কিছু বলা ইমপসিব্‌ল। আমি বরং মাকে নিয়ে দু' কথা বলি।"

"বলো," হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বরুণ।

"মাকে নিয়ে কী বলা যায়?" প্রিয়ার ফটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আকাশ, "আমার মা মাদার টেরেসার মত শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পেত সবার কাছে, আমার মা আয়রনম্যানের মতো পাওয়ারফুল ছিল, ছিল ঐশ্বর্যা রাইয়ের মতো সুন্দরী। জন্মের পর থেকেই মা আমাকে নিজের মতো করে বড় করতে চেয়েছিল। এটা আমার ফেলিয়োর যে আমি বরাবর বাবার মতো হতে চেয়েছি। যাই হোক..." চোখ থেকে উপচে পড়া জল মুছে আকাশ বলল, "স্মরণসভায় ভাল ভাল কথা বলতে হয়। সেগুলো বলা

হয়ে গেছে। আমি বরং মাকে নিয়ে অন্য কথা বলি। গত কয়েক মাসে মায়ের ব্যবহার বদলে গিয়েছিল। এত বড় বাড়ির বৌ হয়ে, ডাক্তার হয়ে, সাতচল্লিশ বছর বয়সে এসে মা কেন যে খ্যাপামো শুরু করেছিল কে জানে! আমার মনে হয় 'প্রিজ়নার অফ ওয়ার' ব্যান্ডের মেম্বাররা এই নিয়ে কিছু বলতে পারবে।"

বক্তব্য শেষ করে দূরের একটি চেয়ারে বসল আকাশ। বোঝা যায়, সে খুব কেঁদেছে। চোখ-মুখ ফুলে আছে।

এগিয়ে এলেন আলো আর নীলিমা। দু'জনে মিলে গাইলেন, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

দীপশিখা দেখল ববি মাথা নিচু করে বসে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

গান শেষ হল। মিলন চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছেন। সবাই চায়ের পেয়ালা তুলে নিচ্ছেন। তার মধ্যেই উঠে দাঁড়াল দীপশিখা। খবরের কাগজের মোড়ক খুলে হোয়াইটবোর্ড বের করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে বলল, "আমি প্রথম দিন পুনশ্চয় এসে বলেছিলাম, প্রিয়া দাশকে আগে থেকে চিনতাম, কারণ ওঁর পেশেন্ট ছিলাম। তো, আমার চিকিৎসক হিসেবে প্রিয়াকে নিয়ে কিছু স্মৃতি থাকা উচিত। তবে আমি সেদিন সত্যি কথা বলিনি। কারণ, আমি প্রিয়া দাশকে চিনতাম না।"

"স্বাভাবিক," নাক-মুখ কুঁচকে বললেন ববি, "আপনার মুখ দেখলেই বোঝা যায় কোন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছেন।"

ববির অপমানজনক বক্তব্য শুনে সৈকত অবাক। সে দীপশিখাকে বলল, "এ তুমি কোথায় এসেছ? চলো এখান থেকে!"

দীপশিখা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "যাব তো বটেই," তারপর ববির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারেন সে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছে। এটা আপনি শিখেছেন আপনার বাবা পল দাশের কাছ থেকে। তাই না?"

"হাউ ডেয়ার ইউ টেক মাই ফাদার্স নেম?" বৃদ্ধ বাঘ গর্জন করে উঠলেন।

গর্জনে ঘাবড়ে না-গিয়ে দীপশিখা বলল, "আপনার পিতৃদেবের নাম কেন নিলাম, সেটা বলতে গেলে প্রিয়াকে দিয়ে শুরু করতে হয়। সোজা কথাটা প্রথমেই সোজা করে বলে দিই? প্রিয়া দাশ খুন হয়েছিলেন।"

"এটা আত্মহত্যা," কনফিডেন্টলি বললেন নীল।

তাঁর কথায় গুরুত্ব না-দিয়ে দীপশিখা বলল, "যে কোনও মার্ডার মিস্ট্রির শেষে একটা বিরক্তিকর গোলটেবিল বৈঠক হয়। সেখানে গোয়েন্দা ধীরে ধীরে সমস্ত তথ্য তাসের মতো মেলে ধরেন এবং বলেন, হত্যাকারী কে। আজকের এই স্মরণসভাটিকে আমি বেছে নিয়েছি গোলটেবিল বৈঠক করার জন্যে। সেই কারণে প্রিয়ার খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন এমন সব মানুষকে ডাকা হয়েছে।"

"আমাকে কেন?" জিজ্ঞেস করল সৈকত।

"একটু পরেই বুঝতে পারবে," সৈকতকে থামিয়ে দীপশিখা বলল, "এখানে গোয়েন্দা দু'জন। ভবানীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ বরুণ সরকার আর বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের মড়াকাটা ডাক্তার দীপশিখা মুখার্জি, মানে আমি। বরুণ 'কথা কম কাজ বেশি' তত্ত্বে বিশ্বাসী। কথা বলাটা আমার দায়িত্ব। মূল কাজটা বরুণ পরে করবে।"

"উনি কী করবেন?" জিজ্ঞেস করে সিয়া।

"খুনিকে গ্রেফতার করে আদালতের হাতে তুলে দেওয়াটাই পুলিশের কাজ। তাই না?" হাসল দীপশিখা, "যাক গে! আমরা মূল প্রসঙ্গে চলে আসি। যে কোনও খুনে কয়েকটা দিক দেখে নেওয়া খুব জরুরি। সেগুলো হল..." ব্যাগ থেকে মোটা নিবের 'পার্মানেন্ট মার্কার' কলম বের করে হোয়াইট বোর্ডের উপরে ঘসঘস করে লিখছে সে, "এক নম্বর হল মৃতদেহ, দু'নম্বর হল কীভাবে খুন করা হয়েছে বা 'মোডাস অপারেন্ডি,' তিন নম্বর হল খুনের অস্ত্র বা 'ওয়েপন অফ মার্ডার,' চার নম্বর— 'মোটিভ,' পাঁচ নম্বর— 'সাসপেক্টস,' ছ'নম্বর— 'রেড হেরিং' বা বুনো হাঁস— যাকে ধাওয়া করতে গিয়ে ভুল পথে যায় গোয়েন্দা, সাত নম্বর হল 'অ্যালিবাই' বা খুনের সময় কার কার খুন না-করার অজুহাত ছিল, আট নম্বর হল খুনের সাক্ষী বা 'উইটনেস' এবং সব শেষে ন'নম্বর, মানে সূত্র বা 'ক্লু।'"

"আপনি তো খুন নিয়ে 'মানে বই' লিখতে পারেন!" ফুট কাটলেন নীল।

আকাশ বিরক্ত হয়ে বলল, "বাবা, প্লিজ় চুপ করো।"

এক নম্বর পয়েন্ট 'মৃতদেহ' -তে টিকচিহ্ন দিয়ে দীপশিখা বলল, "মৃতদেহ, আছে।"

দু'নম্বর পয়েন্টে টিক দিয়ে দীপশিখা বলল, "পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এবং ভিসেরার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রিপোর্ট থেকে জানতে পারলাম, প্রথমে ওঁকে বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে মাথার শিরায় 'পটাসিয়াম ক্লোরাইড' বা 'পটক্লোর' ইঞ্জেক্ট করা হয়। পটাসিয়াম শরীরের প্রতিটি পেশির সঙ্গে হার্টের মাস্‌লকেও সংকুচিত হওয়ার জন্যে সঙ্কেত পাঠায়। হার্টের সোডিয়াম আর পটাসিয়ামের ভারসাম্য নষ্ট হয় বলে তার স্পন্দন অনিয়মিত হয়। পরিণতি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং মৃত্যু।"

সপ্তর্ষি আর অমিত নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

তিন নম্বর পয়েন্টে টিক দিয়ে দীপশিখা বলল, "পটক্লোরের ভাঙা অ্যাম্পিউল, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বা ঘুমের ওষুধের ফয়েল পাওয়া যায়নি। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মেথড জানতে পারাটাই যথেষ্ট। এবং এখান থেকে চলে আসছি সন্দেহভাজন খুনির তালিকায়..."

সুব্রত আর মিনতি ভুরু কুঁচকে বরুণের দিকে তাকাল। তারা বোঝার চেষ্টা করছে, বস কেন চুপচাপ।

পাঁচ নম্বর পয়েন্টে টিক দিয়ে দীপশিখা বলল, "খাবারের মধ্যে ওষুধ মেশানোর কাজ যে কেউ করতে পারে। কিন্তু মাথার শিরায় ইঞ্জেকশন দেওয়ার কাজ করতে পারে এমন কেউ, যে কাজটায় সড়গড়। মুশকিল হল, পুনশ্চয় সেই রাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই কাজটা পারেন। এমনকি মিলন, আলপথ আর সিয়াও পারে।"

"আমি পারি না," হাত তুলল আকাশ।

তার কথায় গুরুত্ব না-দিয়ে দীপশিখা বলল, "এবং এখানে এসে আমি আর বরুণ আটকে গেলাম। খুনের উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না, সাক্ষীও নেই।"

"তা হলে?" প্রশ্ন করল আলপথ।

তার দিকে তাকিয়ে দীপশিখা বলল, "ঠিক এই সময়ে, এই ড্রয়িং রুমে পাওয়া প্রথম ক্লুয়ের কথা মনে পড়ে।"

"কী ক্লু?" জিজ্ঞেস করলেন ববি।

কনসোল টেবিলের কাছে গেল দীপশিখা। দেওয়ালে ঝোলানো ফটো ফ্রেম দেখিয়ে ববিকে জিজ্ঞেস করল, "এই ফটোটা পল আর লীলা দাশের বিয়ের সময় তোলা, তাই তো?"

"হ্যাঁ," বললেন ববি।

নীল পাশ থেকে বললেন, "ফটোটা উনিশশো ছেচল্লিশ সালে তোলা। উনিশশো পঁচাশি সালে ঠাকুরদা স্ট্রোক হয়ে মারা যাওয়ার পরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো হয়েছে।"

হোয়াইটবোর্ডের ন' নম্বর পয়েন্ট অর্থাৎ ক্লুয়ের পাশে 'এক' লিখে দীপশিখা বলল, "সূত্র নম্বর এক। ওঁদের বিয়ে হয়েছিল আর্জেন্টিনায়। তখন ওঁদের কাছে ধুতি-পাঞ্জাবি, বেনারসি শাড়ি, টোপর, লাল চেলি বা কনে চন্দন থাকতেই পারে না। আমি বরুণকে অনুরোধ করব ফটোটা কোনও বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে যেতে। তিনি বলে দেবেন, ফটো কবে তোলা, একসঙ্গে তোলা না আলাদা আলাদা ভাবে তোলা, কবে জোড়া হয়েছে..."

"আপনি কী বলতে চাইছেন?" হুমকি দিলেন নীল।

"একটু আগে আপনার বাবাকে বলেছিলাম, 'আপনি যে মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারেন কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছে, এতে আপনার কোনও কৃতিত্ব নেই। এটা আপনি শিখেছেন আপনার বাবা পল দাশের কাছ থেকে।' বলেছিলাম না?"

ববি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

"আপনার ছেলেরও আপনার মতো ঘাড় নাড়ার স্বভাব আছে," ববিকে বলল দীপশিখা, "আমি যখন ডক্টর নীল দাশকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওঁরা ডাক্তার ছিলেন?' – উনি 'হ্যাঁ' আর 'না'-এর মাঝামাঝি ঘাড় নাড়েন। একজন 'ডাক্তার' আর অন্যজন 'নার্স'— এইটা বলতে সমস্যা কোথায়? আসলে উনি পূর্বপুরুষদের নিয়ে কোনও রকম আলোচনাই চান না। পল আর লীলাকে নিয়ে কথা বললে যদি অনভিপ্রেত কোনও তথ্য বেরিয়ে আসে!"

"এইসব আন্দাজ, গুলতাপ্পি আর

কনস্পিরেসি থিয়োরি দিয়ে আর কতক্ষণ চালাবেন?” শ্লেষের সঙ্গে বললেন নীল।

প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে ববির দিকে তাকিয়ে দীপশিখা বলল, “মানুষের মুখ দেখে তার ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝতে পারার নোংরা পাঠ আপনি পেয়েছেন ডক্টর পল দাশের কাছ থেকে। কারণ আউশউইৎজ়ের নাৎসি চিকিৎসক পল দাশ ওরফে কার্ল হাইম মুখ দেখে চিনতে পারতেন কে ইহুদি। মুখ পছন্দ হলে ইহুদিকে হত্যা করে মাথার খুলি দিয়ে পেপারওয়েট বানাতেন। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জার্মানি হেরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নাম বদলে হয়ে যান পল। বাঙালি সেবিকা লীলাকে বিয়ে করে চলে আসেন কলকাতায়। নতুন পরিচয়ে বাঁচতে শুরু করেন। উনিশশো পঞ্চাশ সালে জার্মান ভাষায় লেখা তাঁর ডকুমেন্ট লীলা পড়ে ফেলেছিলেন। সেই কারণে পল তাঁকে ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন। ভবানীপুর থানায় আনন্যাচরাল ডেথ নিয়ে একটি ডায়েরিও হয়। কেস নম্বর, ইউডি ১২/৫০। কেস ফাইলের মধ্যে জার্মান ভাষায় লেখা ডকুমেন্টটি আছে। এটাই দু’নম্বর সূত্র।”

হোয়াইটবোর্ডের ক্লুয়ের পাশে ‘দুই’ লেখে দীপশিখা, “তৎকালীন অফিসার ইন চার্জ বিজন চট্টোপাধ্যায় তদন্ত করেন এবং কেসটি ধামাচাপা দেন। বিজনবাবু মারা গেলেও কেস ফাইল উদ্ধার করা গেছে। সেটা এখন বরুণের জিম্মায়।”

“এ তো দেখি ধান ভানতে শিবের গীত। আমার বৌ কেন আত্মহত্যা করেছে সে কথা বলতে গিয়ে ডায়নোসরের আমলে চলে যাচ্ছেন। কাজের কথা বলুন!” বিরক্তি প্রকাশ করলেন নীল।

দীপশিখা বলল, “অনেকক্ষণ কাজের কথা বলেছি। এবার একটু স্মৃতিচারণ হোক। ডক্টর ববি দাশ, আপনার পুত্রবধূ প্রিয়াকে নিয়ে কিছু বলুন।”

ববি মাথা নিচু করে বসেছিলেন। নিজের নাম শুনে ঘাড় তুলে সবাইকে দেখলেন। বললেন, “নীলকে বিয়ে করে প্রিয়া এই বাড়িতে এসেছিল বটে, কিন্তু আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। এর থেকে বড় কথা আর কী-ই বা হতে পারে! প্রিয়া এই বাড়ির বৌ ছিল না, এই বাড়ির মেয়ে ছিল। আমাদের সবার দেখাশোনা করেও বাইরের কাজ সামলাত। শেষের দিকে কয়েক মাস একটু অন্য রকম আচরণ করত। কিন্তু সেটা আর মনে রাখতে চাই না।”

ববি আর বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে চোখের জল মুছছেন।

মিলন এগিয়ে এসে ফটোতে প্রণাম করে বললেন, “আমি কথা-টথা বিশেষ বলতে পারি না। গানও গাইতে পারি না। যেটা পারি, সেটাই বরং করি। একটা কবিতা শোনাই। ম্যাডামের খুব প্রিয় কবিতা,

“ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভাল।
এত কালো মেখেছি দু’হাতে
এতকাল ধরে!
কখনও তোমার ক’রে, তোমাকে ভাবিনি।”

“বাহ! অপূর্ব!” বললেন অমিত।

মিলন পড়ছেন,

“...যাব
কিন্তু, এখনই যাব না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব
একাকী যাব না, অসময়ে।”

মিলনের কবিতা পাঠ শেষে হতে দীপশিখা বলল, “এবার পুরনো প্রসঙ্গে ফেরা যাক। দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ে গেল। এখনই না-বললে ভুলে যাব। প্রথম কথাটা হল ডক্টর ববি দাশের চোখের মণির রং সবুজ, যেটা উনি পেয়েছেন পলের কাছ থেকে। জিনবাহিত এই বৈশিষ্ট্য অতীতে কনট্যাক্ট লেন্সের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন

“এ তো দেখি ধান ভানতে শিবের গীত। আমার বৌ কেন আত্মহত্যা করেছে সে কথা বলতে গিয়ে ডায়নোসরের আমলে চলে যাচ্ছেন। কাজের কথা বলুন!”

কি না জানি না। তবে এই বয়সে এসে, ডিমেনশিয়া নিয়ে লেন্স পরে থাকা শক্ত কাজ। কাজেই চোখের রং লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যদিও উনি অভিনয়টা ভালই জানেন। যতই ভ্যাবলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকুন না কেন, আগাগোড়াই জানতেন যে প্রিয়া খুন হয়েছেন।”

ববি এখনও ভ্যাবলাটে চোখে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে।

“দ্বিতীয় কথাটা কী?” জিজ্ঞেস করল সৈকত।

“বলছি,” এক চুমুক জল খেয়ে দীপশিখা বলে, “আপনাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারবেন, আমি কীভাবে লীলা দাশের কেস ফাইলের খোঁজ পাই? কেউ? এনিবডি?”

“আমি,” হাত তুলেছে আলপথ, “ইউডি ১২/৫০ পিএস ভবানীপুর’— এই আলফা-নিউমেরিক ডিজ়াইনটা আমি প্রিয়ার হাতে ট্যাটু করেছিলাম, “উনিই ডিজ়াইনটা আমাকে দিয়েছিলেন। এই বছরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাস নাগাদ।”

“এইটা ছিল...” হোয়াইটবোর্ডে ক্লুয়ের পাশে ‘তিন’ সংখ্যাটি লিখে দীপশিখা বলল, “তৃতীয় ক্লু। প্রিয়া বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর মৃত্যু হবে। কারণ তিনি এমন কোনও গোপন কথা জেনেছিলেন, যা জানার নয়। কী সেই কথা? নীল স্যারের বক্তব্য অনুযায়ী ডায়নোসরের আমলের কথা।”

নীল গলা চড়ালেন, “বাজে না-বকে চুপ করে বসুন তো। আলপথ, তুমি কিছু বলো।”

## ১৫

আলপথ ফটোয় প্রণাম করে বলল, “প্রিয়া আমাকে খোকা বলে ডাকতেন। ওঁর শরীরের সব ট্যাটু আমার করা। উনি চাইতেন, আমি ওঁকে নাম ধরে ডাকি। ‘ম্যাম’ নয়, ‘ডক্টর দাশ’ নয়, ‘প্রিয়াদি’ বা ‘বৌদি’ নয়। জাস্ট প্রিয়া। কেন চাইতেন, সেটাও বলেছিলেন। উনি ‘ম্যাম’ আর ‘ডক্টর’ শুনে শুনে ক্লান্ত। ‘দিদি’ বা ‘বৌদি’ সম্বোধন অপছন্দ করতেন। সামাজিক উচ্চতায় উনি যেখানে বিলং করেন, আমি তার অনেক ধাপ নীচে থাকা সত্ত্বেও তাই প্রিয়া বলেই ডাকতাম।”

“যতটা নীচে নিজেকে ভাবছ, তার থেকে অনেক নীচে তুমি বিলং করো,” দাঁতে দাঁত চিপে বললেন নীল।

তাঁর দিকে তাকিয়ে আলপথ বলল, “হ্যাঁ, আমি আমার ‘অওকাত’ জানি। মুশকিল হল, উনি সেটা আমাকে বুঝতে দিতেন না। সেটা ওঁর ‘বড়প্পন,’ আই মিন গ্রেটনেস। আমাদের গান ওঁর ভাল লেগেছিল বলে সহজ ভাবে মিশতেন— এমনটাই ভাবতাম। এখন বুঝি, ভুল ভাবতাম।”

“বেটার লেট দ্যান নেভার। শেখার কোনও বয়স নেই,” নীল কাঁধ ঝাঁকালেন।

“আমি আর কিছু বলব না। ফিলিং ইনসাল্টেড!” রাগে গনগন করতে করতে আলপথ বসে পড়ল।

স্মরণসভা পরিচালনার দায়িত্ব নীল কেড়ে নেওয়ায় চুপ করে বসেছিল দীপশিখা। এই সুযোগে সে তড়াক করে দাঁড়িয়ে বলল, “তা হলে আমিই কিছু বলি।”

“আবার কী বলবেন?” জিজ্ঞেস করলেন সপ্তর্ষি, “আমাকে বেরোতে হবে। ব্যাক টু ব্যাক অনেকগুলো মিটিং আছে।”

“স্যর, প্লিজ় একটু বসে যান,” বলল দীপশিখা। আলপথের দিকে তাকিয়ে বলল, “প্রিয়া গান লিখতেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘বুঝলি না তুই খোকা? আঁক ত্যাঁদড় ট্যাটুগুলি।’ এই খোকা মানে তুমি। তাই তো?”

“হ্যাঁ,” মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ে আলপথ।

“এবারে চার নম্বর ক্লু নিয়ে কথা বলা যাক,” হোয়াইটবোর্ডে ক্লুয়ের পাশে ‘চার’ সংখ্যাটি লিখে দীপশিখা বলে, “এই বনেদি, অতি শিক্ষিত চিকিৎসক পরিবারের বৈশিষ্ট্য

হল, বাড়ির ছেলেরা সবাই ড্যাডিজ় বয়। বাবারা কাছে থাকুন বা দূরে, চিঠি বা ফোনের মাধ্যমে ছেলের মগজ ধোলাই করবেনই। পল ববির মাথায় ঢুকিয়েছিলেন যে ডাক্তারদের কর্তব্য হল মানুষের শরীরের অভ্যন্তরের জীবাণু সাফ করার পাশাপাশি সমাজের জীবাণুও সাফ করা। সমাজের জীবাণুর একটা তালিকাও দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ধর্মীয় মাইনরিটি, সেক্সুয়াল মাইনরিটি, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, নিম্ন বর্গের মানুষ এবং অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা পড়েন। পল ববিকে শিখিয়েছেন, মেডিক্যাল এথিক্স ভুলে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা উচিত। বিরোধী শক্তিকে নিকেশ করা উচিত। ইনফ্যাক্ট, ববি যে বড় হয়ে ডাক্তারি পড়বেন, সেটা পলই ওঁর মাথায় ঢুকিয়েছিলেন।"

"তো?" মরা মাছের চোখ দিয়ে দীপশিখাকে দেখছেন ববি।

"ভানু গুহরায়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কে করিয়ে দেন?" ববির দিকে তাকিয়ে বলল দীপশিখা, "আপনার বাবা পল, তাই না? না হলে সদ্য ডাক্তারি পাশ করে আপনি কী করে জানবেন যে লালবাজারের টর্চার চেম্বারে জেরা করার নামে নকশালদের নির্যাতন করা হচ্ছে!"

"আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন! এবার আমি আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব!" চিৎকার করে উঠেছেন নীল।

"যাব কিন্তু, এখনই যাব না। তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব..." ক্রূর হেসে বলল দীপশিখা।

দাঁত বের করা কুকুর যেভাবে মালিককে দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে নেয়, ঠিক সেইভাবে নীল চুপ করে গেলেন। দীপশিখা বলল, "দাশ পরিবারের পরের প্রজন্ম, অর্থাৎ ববি দাশের কথা আসি। তিনি টর্চার মেডিসিনকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। নির্যাতনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা, পুরনো ওষুধ নতুন ভাবে প্রয়োগ করা, নির্যাতনের সময় শরীর কীভাবে সাড়া দেয় সেই সব তথ্য জানা— নির্যাতন-বিজ্ঞান শাস্ত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু নকশালরা যেই জেনে গেল যে বীরুবাবুকে হত্যা করার পিছনে ববির হাত আছে, ওরা ববিকে খতম করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। ববি প্রাণ বাঁচাতে পালালেন বাল্টিমোরের 'জন হপকিন্‌স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন'-এ। সেখানে ওঁর সঙ্গে আলাপ হল কবিতার। লীলাকে ব্যবহার করে পল ভারতে থিতু হয়েছিলেন। কবিতাকে ব্যবহার করে ববি আমেরিকায় থিতু হলেন। বিয়ে এবং ছেলের জন্ম হল আমেরিকায়। ববি কলকাতা ফিরে এলেন, বৌ আর ছেলে আমেরিকায় রয়ে গেলেন। ববি পাঁচ বছরে একবার বাল্টিমোরে গেলেও, পলের কায়দায় চিঠি এবং ফোন মারফত নীলের ব্রেন-ওয়াশ করতেন। সেটা কবিতা জানতে পারেননি। উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ববি শেষবারের মতো আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি টর্চার মেডিসিন নিয়ে লেখা তাঁর অভিজ্ঞতার ডায়েরি নীলকে দিয়ে আসেন। ডায়েরিটি কবিতার হাতে পড়ে। ডায়েরি পড়ে কবিতা ঠিক করেন, স্বামীকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। এবং তার জন্যে কলকাতায় যাবেন।"

"কোনও প্রমাণ আছে?" ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলেন ববি।

ববির প্রশ্ন দীপশিখা শুনতেই পায়নি। সে বলছে, "উনিশশো সাতানব্বই সালে কবিতা কলকাতায় এলেন এবং সেই রাতেই খুন হলেন। ওঁকে এই বাড়ির ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ভবানীপুর থানায় আরও একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর কেস ফাইল তৈরি হল। 'ইউডি ৩৩/৯৭, ভবানীপুর পিএস।' তদন্তকারী অফিসারের নাম কল্যাণ রায়। এবারও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপে কেসটি ধামা চাপা পড়ল। তবে কেস ফাইলের মধ্যে ববির লেখা ডায়েরি এবং কবিতার লেখা চিঠিটি এখনও আছে। কেসের আইও কল্যাণ রায়ও জীবিত। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক চাপে ফাইল ক্লোজ় করতে বাধ্য হন।"

ড্রয়িং রুমে এখন শ্মশানের স্তব্ধতা।

হোয়াইটবোর্ডে ক্লুয়ের পাশে 'পাঁচ' সংখ্যাটি লিখে দীপশিখা বলে, "মৃত প্রিয়া দাশের শাড়িতে ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে অনেক আলফা-নিউমেরিক কোড লেখা ছিল। তার মধ্যে ছিল এই কেস ফাইলের নম্বর। 'ইউডি ৩৩/৯৭, ভবানীপুর পিএস।' এই নিয়ে কেউ কিছু বলবেন?"

সিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে, "এই শাড়িটা আমি প্রিন্ট করে দিয়েছিলাম। আরও নানা আলফা নিউমেরিক কম্বিনেশনের মধ্যে এইটাও ছিল। প্রিয়া বলেছিলেন এই কম্বিনেশনটা একটা নিষিদ্ধ এবং গুপ্ত পলিটিক্যাল গ্রুপের কোড। আমি অবিশ্বাস করিনি। বাই দ্য ওয়ে, আমিও প্রিয়াকে 'প্রিয়া' বলেই ডাকতাম। 'ম্যাম' বা ওই জাতীয় কিছু নয়। কারণটা আলপথ বলে দিয়েছে।"

দীপশিখা বলল, "প্রিয়ার গানের লাইন হল, 'বুঝলি না তুলতুলি? লাগা আঁচলে রং-তুলি।' এই তুলতুলি হচ্ছ তুমি। তাই তো?"

"হ্যাঁ," ঘাড় নাড়ে সিয়া।

দীপশিখা বলল, "লীলা আর কবিতার পরে প্রিয়ার মৃত্যু। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সিয়াকে অনুরোধ করছি, প্রিয়াকে নিয়ে কিছু বলার জন্যে।"

সিয়া বলল, "আই অ্যাম নট ইনটু বেঙ্গলি কালচার অ্যান্ড পোয়েট্রি! তাও, আজ এখানে কিছু বলতে হবে— সেটা জেনে তৈরি হয়েই এসেছি। আই অ্যাম সিঙ্গিং আ টেগোর সং," তারপরে স্মার্টফোনে দেখে গাইল,

"জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে..."

সিয়ার গলা যে এত ভাল, এত শিক্ষিত গায়কি— দীপশিখা ভাবতেই পারেনি। তার মনে হচ্ছে, প্রিয়ার স্মরণসভাকে সিয়ার গান অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। সিয়া গাইছে। ববিও সিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন,

"আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া!
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে..."

গান শেষ হতে সবাই মৃদুমন্দ হাততালি দিল। ববি বললেন, "সাধু! সাধু!"

সিয়া বসতেই টক করে দাঁড়িয়েছে দীপশিখা, "এবারে আসি প্রিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে। যেটা জানতে ডক্টর নীল দাশ ডায়নোসরের আমল থেকে অপেক্ষা করছেন।"

নীল ভুরু কুঁচকে দীপশিখার দিকে তাকালেন। দীপশিখা তাঁকে বলল, "বাই বার্থ আমেরিকান সিটিজ়েন হয়ে কেন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির এই ডাইয়িং সিটিতে শিফ্‌ট করলেন? ইনফ্যাক্ট আপনার স্ত্রী আমেরিকায় সেট্‌ল করে গিয়েছিলেন। আপনিই জোর করে ফিরে আসেন কলকাতায়।"

"দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজ়নেস!" অধৈর্য হয়ে বললেন নীল।

"দ্যাটস ডেফিনিটলি মাই বিজ়নেস!" হিসহিস করে বলল দীপশিখা, "কেন? শুনুন তা হলে। আপনি মেরিল্যান্ডের বেথেসডা মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। সেখানেই প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ ও প্রেম। ইউএস আর্মির হয়ে আপনি চলে যান আবু ঘ্রাইব এবং সেখানে দু'হাজার দুই থেকে দু'হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত চাকরি করেন। পল এবং ববির মতো আপনিও টর্চার মেডিসিন নিয়ে গবেষণা চালাতে থাকেন। এর মধ্যে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে, অডিয়ো ভিজুয়াল মিডিয়া সহজলভ্য হয়েছে। আপনার রিসার্চের একটা বড় অংশের ভিডিয়ো আছে।"

"বুলশিট!" বললেন নীল।

দীপশিখা বলল, "দু'হাজার সাত সাল পর্যন্ত আপনি ইউএস আর্মির ডাক্তার ছিলেন। চাকরির মেয়াদ শেষ হতেই চাকরি ছেড়ে দিলেন। প্রিয়াকে বিয়ে করলেন, আকাশের জন্ম হল। এবং প্রিয়ার বাবা কলকাতায় হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। প্রবল পিতৃশোক, অপরাধবোধ, 'মানবিক'কে বাঁচানোর তাগিদে প্রিয়া আমেরিকা ছেড়ে কলকাতায় ফিরলেন। আপনি এবং আকাশও এলেন। উঠলেন পুনশ্চয়। তারপর থেকে আপনারা এখানেই থাকেন। সব কিছু দিব্যি চলছিল। দু'হাজার একুশ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর হঠাৎ করেই আপনার ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ের ক্লিপিং প্রিয়ার হাতে পড়ে। দীপশিখা সেগুলো দেখেন এবং সমস্ত ডকুমেন্ট দু'টি পেন ড্রাইভে কপি করে লুকিয়ে রাখেন পুনশ্চতেই। উনি জানতেন, এই বাড়ির প্রথামাফিক খুন হয়ে যাবেন। তাই আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। যাবতীয় তথ্য লিখে সেটাও লুকিয়ে রেখেছিলেন পুনশ্চতেই। গানের লাইনে লিখেছেন, 'খোকা আর তুলতুলি, শোন ডাইনিবুড়ির বুলি, খোল চোখের থেকে ঠুলি... ঘাঁট ঠাকুরমায়ের ঝুলি, পাবি কলম-চালকগুলি। খোল চোখের থেকে ঠুলি। পুনশ্চ দেখ খুলি।' আলপথ আর সিয়াকে উনি বলে গেছেন, পাশঝোলায় আছে পেন ড্রাইভ এবং পুনশ্চ কবিতার মধ্যে অন্য কিছু।

যেটা আদতে প্রিয়ার লেখা চিঠি।'"

আলপথ আর সিয়া অবাক হয়ে দীপশিখার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দীপশিখা নীলের দিকে তাকিয়ে বলছে, "দু'হাজার বাইশ সালের অগস্ট মাসে উনি আপনাকে কনফ্রন্ট করেন। পুলিশের কাছে এখন সেই ভিডিয়ো আছে, যেখানে আপনি ইরাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপকের পেটে ছুরি মেরে খুন করছেন এবং ক্যামেরায় নিজের মুখ দেখিয়ে বলছেন, 'দিস ইজ নীল ড্যাশ ফ্রম আবু ঘ্রাইব প্রিজ়ন। সিয়াও!'"

"প্রিয়ার সুইসাইড নিয়ে কথা বলুন। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, নকশাল পিরিয়ড বা গালফ ওয়ার নিয়ে নয়!" একটুও না-রেগে বললেন নীল। তিনি সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন।

হোয়াইটবোর্ডের 'চার' আর 'আট' নম্বর পয়েন্টে টিক মেরে দীপশিখা বলল, "যে কারণে লীলা আর কবিতা খুন হয়েছেন, সে কারণেই প্রিয়া খুন হয়েছেন। বাকি দু'জনের মতো উনিও স্বামীর অপরাধ জেনে ফেলেছিলেন। হত্যার 'মোটিভ' এটাই। এবং এইখানেই আসছে 'উইটনেস'-এর কথা।"

ববি, নীল আর আকাশ পরস্পরের দিকে তাকালেন। মিলন, আলো আর নীলিমাও একে অপরকে দেখে নিলেন। আলপথ আর সিয়া হাত ধরাধরি করে বসে রয়েছে।

দীপশিখা বলল, "এই বাড়িতে আসার পরেই আমাকে হুমকি ফোন করা হয়। অন্য একদিন ফিজ়িক্যালি অ্যাসল্ট করা হয়। দু'টি ক্ষেত্রেই আক্রমণকারী জানতেন, আমি প্রেগন্যান্ট। এই বাড়ির বাসিন্দাদের সেটা জানার কথা নয়। আমার 'টামি' এখনও একদম নরমাল সাইজ়, কোনও 'বেবি বাম্প' অ্যাপিয়ার করেনি। ইনফ্যাক্ট আমি, আমার বর সৈকত, বরুণ এবং হাসপাতালের ডাক্তার ছাড়া আর কেউ এটা জানে না। আমি তাই সৈকত আর বরুণকে সন্দেহ করতে শুরু করি।"

"তোমার কি মাথা খারাপ নাকি?" হেসে ফেলেছে সৈকত।

বরুণ বলল, "আমাকে সন্দেহ করছিলেন? একবারও বুঝতে দেননি কিন্তু!"

ফিক করে হেসে দীপশিখা বলে, "আমি অনেককেই অনেক কিছু বুঝতে দিই না। সে কথা থাক। পরে আমার মনে হল, এই ড্রয়িং রুমে বসে আমি একটা ফোন রিসিভ করেছিলাম। এবং এমন একটা কথা বলছিলাম, যেটা শুনে পাশের লোকের বোঝা উচিত যে আমি প্রেগন্যান্ট! এবং, তখন আমার কাছে ছিল আকাশ!"

সবাই চমকে উঠে আকাশের দিকে তাকাল। যিশুর মতো নিষ্পাপ শিশুটি মাথা নিচু করে বসে। যুগল হংসরাজের মুখের সারল্য এখনও টলটল করছে।

বরুণ এতক্ষণে মুখ খুলল, "অভয় সরকার স্ট্রিটে যে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে সেটা আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি। যেদিন ম্যাডামকে অ্যাটাক করা হয়, সেদিন বা তার আগের দিনগুলোয় ওই ক্যামেরায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ ফিড নেই। আপনারা কেউই একটা তথ্য জানেন না। সেটা হল, পুনশ্চর পিছনের গলিতেও একটা নজরদারি ক্যামেরা আছে। সেই ক্যামেরার ফিডে আকাশবাবুকে ম্যাডামের ফিজ়িক্যাল অ্যাসল্টের দিন ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গেছে। এলগিন রোডে ম্যাডামকে অ্যাটাক করে যে বাইকওয়ালা তার পোশাকের সঙ্গে পুনশ্চ-র পিছনের গলির ফুটেজের আকাশবাবুর পোশাক হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

আকাশ শান্ত হয়ে বসে। হোয়াইটবোর্ডে 'সাত' নম্বর পয়েন্টে টিক মারল দীপশিখা।

বরুণ বলল, "ম্যাডামের ওপরে আক্রমণ হয়েছিল যে সন্ধেবেলা, সেই সন্ধেয় কারও অ্যালিবাই ছিল, কারও ছিল না। আমরা সবার মুখের কথার সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখেছি। মিলনকে রবীন্দ্র সদনের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সৈকতবাবুকে সাবার্বান হসপিটাল রোডে দেখা গেছে। আলোদিকে যদুবাবুর বাজারে দেখা গেছে। একমাত্র আকাশবাবুর অ্যালিবাই মেলেনি। ফুটেজ বলছে সে পিছনের গলি দিয়ে বেরিয়ে এলগিন রোডে পৌঁছে বাইক চুরি করে ম্যাডামকে অ্যাটাক করে। দুটো ফোনও জোগাড় করে।"

অমিত বললেন, "বরুণ, কোর্টে এই যুক্তি স্ট্যান্ড করাতে পারবে? একটু উইক লাগছে।"

"আরও যুক্তি আছে স্যর!" বরুণ বলল।

অমিত বললেন, "শুনি।"

হোয়াইটবোর্ডে আট নম্বর পয়েন্টে টিক দিল দীপশিখা। বরুণ বলল, "আকাশবাবুকে থানায় নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছিলাম। এবং উনি সব কথা গড়গড় করে স্বীকার করেছেন। বাইক চুরি, দু'টি মোবাইল কেনা, ম্যাডামকে ফোনে চমকানো, তাঁকে লাথি মারা... সব বলেছে। এবং বলেছে প্রিয়াকে কে মার্ডার করেছেন!"

"শাট আপ ইউ অ্যাসহোল!" বরুণের দিকে তর্জনী তাক করে গর্জে ওঠেন নীল, "আমার

ছেলেকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সাহস আপনার হয় কী করে? আকাশ, তুই আর একটাও কথা বলবি না। ল'ইয়ারের প্রেজেন্স ছাড়া এই বাড়ির কেউ কোনও কথা বলবে না। দ্যাট্স অ্যান অর্ডার!"

"আর লাভ নেই মিস্টার নীল দাশ। আপনাদের পরিবারের প্রথা বজায় রেখে আকাশের এমন ব্রেন ওয়াশ করেছেন যে ও এই বয়স থেকেই আপনাদের ভাষায় কথা বলে। ইনফ্যাক্ট এটাও একটা ক্লু," হোয়াইট বোর্ডে 'ক্লু'-এর পাশে 'ছয়' সংখ্যাটি লিখে দীপশিখা বলল, "আপনি সেদিন নিজের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছিলেন, 'দাশ পরিবারের বৌ হয়ে, ডাক্তার হয়ে, চোদ্দো বছরের ছেলের মা হয়ে এইসব ছেলেমানুষি মানায় না,' তার একটু পরেই আকাশ বলেছিল, 'ডাক্তার হয়ে, সাতচল্লিশ বছর বয়সে এসে ফানি ওয়ান লাইনার লেখা শাড়ি পরা মানায় না,' আজ, একটু আগেও আকাশ একই সুরে কথা বলছিল। বাবা এবং ছেলের এই নারীবিদ্বেষী বক্তব্য খুবই উদ্বেগের। যাই হোক, আকাশ বলেছে সে সবটাই করেছে বাবা এবং দাদুর পরামর্শে।"

"বাপ রে!" আলপথ অবাক।

"শুধু তা-ই নয়। আকাশই প্রিয়ার অন্তিম ডিনারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছিল। ও জানিয়েছে, প্রিয়ার স্ক্যাল্প ভেনে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কাজটি করেন ডক্টর নীল দাশ। খুনের কথা ববি আর আকাশ, দু'জনেই জানতেন। আমার বলার পালা শেষ। এবার আমি ডক্টর নীল দাশকে অনুরোধ করব স্ত্রী-র স্মৃতিচারণ করতে। অথবা স্ত্রীকে হত্যার দায় স্বীকার করতে।"

নীল এখন খুব শান্ত। শরীরের ভাষায় আগ্রাসী ভাব নেই। চোখেমুখে নেই উত্তেজনার ছাপ। গভীর শ্বাস নিয়ে, প্রিয়ার ফটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রিয়া আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল। কেন ও আত্মহত্যা করল জানি না। আমি ওর আত্মার শান্তি কামনা করি। সবাইকে ধন্যবাদ।"

দীপশিখা অবাক হয়ে দেখছে নীলের স্নায়ুর জোর! সমস্ত কিছু প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরেও বলছে, এটা আত্মহত্যা! কিসের জোরে বলছে? ক্ষমতার অলিন্দে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জোর? পুলিশমন্ত্রী আর পুলিশ কমিশনারকে 'তুমি' বলে সম্বোধনের জোর? তা হলে কি লোকটা ছাড়া পেয়ে যাবে?

## ১৬

ভোরবেলা আধো ঘুমে হাত বাড়িয়ে বরকে জড়িয়ে ধরার আনন্দ আর কিছুতে নেই। ওই স্পর্শই ঘুমের বড়ি। তন্দ্রাচ্ছন্ন দীপশিখা আবার ঘুমের দেশে চলে যায়।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙে বুলুদির কলিং বেলের শব্দে। সৈকত দরজা খুলে দেয়, চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ বারান্দায় রেখে দীপশিখাকে বলে, "এবার ওঠো। সাড়ে সাতটা বাজে।"

আজ একত্রিশে অগস্ট, বুধবার। মাসের শেষ দিন। প্রিয়ার স্মরণসভা হয়ে গেছে ন'দিন আগে। সেদিন পুনশ্চ থেকে বেরিয়ে সোজা ফ্ল্যাটে ফিরেছিল দীপশিখা আর সৈকত। প্রিয়ার হত্যাকাণ্ড নিয়ে সৈকত সেই রাতে একটিও কথা বলেনি। পরের দিন সকালে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি সত্যিই আমাকে সন্দেহ করেছিলে?"

"হ্যাঁ," জবাব দিয়েছিল দীপশিখা, "তুমি অ্যাবর্শন করার কথা বললে। তুমি পুরুলিয়া থেকে আসবে না বলে চলে এলে। তুমি গাড়ির কাচে টোকা মেরে ভয় দেখালে, বাইকওয়ালা আমাকে ধাক্কা মারার পরের মুহূর্তে এলগিন রোডে পৌঁছে গেলে। ঘটনাগুলো জুড়লে কী মনে হয়?"

"তুমি কাল যে রেড হেরিং-এর কথা বলছিলে, সেইটাই আমি!" হাহা করে হাসে সৈকত, "বরুণ অকারণে আমাকে সন্দেহ করছিল! আমার জন্যে সাবার্বান হসপিটাল রোডের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করল। তুমি বারণ করলে পারতে!"

"তখন আমি অন্য স্টেট অফ মাইন্ডে ছিলাম গো!" সৈকতের বাহুতে হাত রাখে দীপশিখা, "বিয়ের এত বছর পরে প্রেগন্যান্সি... তুমি বলছ অ্যাবর্ট করাতে। বলছ, পরিবারের প্রথম সন্তান ছেলে হওয়া উচিত... বলছ, এটা তোমাদের পরিবারের ট্র্যাডিশন... এই সব উল্টোপাল্টা কথা শুনে আমি ঘাবড়াব না?"

"আই অ্যাম সরি!" লজ্জিত ঘঞ্চুসোনা ঘেঁটুরানির চোখে চোখ রাখতে পারছে না। চোখ বুজে বলছে, "মাফ করে দাও! প্লিজ়!"

এবারে দীপশিখার খারাপ লাগছে। সে কথা ঘোরাতে বলল, "কিছুদিন আগে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাধুদা ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলেছিল। ডাক্তারের বাচ্চারা ডাক্তার হয়, উকিলের বাচ্চারা উকিল। কারণ এগুলো ভাল পেশা। কিন্তু জল্লাদের ছেলে জল্লাদ হয় কেন? সাধু ডোমের ছেলে ডোমই কেন হয়? শিক্ষক হয় না কেন?"

"পেশা নির্বাচনের পিছনে জেনেটিক ফ্যাক্টর কাজ করে কি না জিজ্ঞেস করছিল?"

"আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই নিজেকে করেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, খুনি মানসিকতা কি জিনবাহিত? পল, ববি, নীল আর আকাশ— একই পরিবারের চার প্রজন্ম খুন করছে কেন? এ তো আর জল্লাদের মতো পেশা নয়।"

"গোপন কথা জেনে গেলে খুন তো করতেই হয়, তাই না?"

"আমি শুধু লীলা, কবিতা আর প্রিয়ার খুনের কথা বলছি না। সেটা তো উইটনেসদের সরিয়ে ফেলা। পল যে ইহুদিদের খুন করতেন, ববি যে নকশালদের খুন করতেন, নীল যে ইরাকিদের খুন করতেন— এর ব্যাখ্যা চাইছি। রক্তের শুদ্ধতা, সমাজকে দূষণমুক্ত করা আর ইউজেনিক্সের নামে খুন? না কি ওঁদের জিনে সমস্যা ছিল? তা না হলে আকাশের মতো বাচ্চা একটা ছেলে কী করে মায়ের খাবারে ঘুমের ওষুধ মেশাতে পারে? নোয়িং ফুললি ওয়েল, এর জন্যে মা খুন হবে?"

"পিডিয়াট্রিক্স পড়ার সময় একটু আধটু জেনেটিক্স পড়তে হয়েছিল। সেই সূত্রে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। দু'হাজার দশ সালে ইটালির বিচারক একজন খুনির শাস্তি কমিয়ে দেন। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, '"এম-এ-ও-এ' নামের একটি জিনে সমস্যার কারণে খুনি খুব তাড়াতাড়ি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠত।"

দীপশিখা চিন্তিত, "কথায় আছে ফ্যামিলি দ্যাট প্রেজ় টুগেদার, স্টেজ় টুগেদার। এরকম একাধিক উদাহরণ আছে যেগুলো প্রমাণ করে, ফ্যামিলি দ্যাট স্লেজ় টুগেদার, স্টেজ় টুগেদার। পরিবারতন্ত্রকে বেঁধে রেখেছে হত্যাতন্ত্র।"

সৈকত বলল, "যে কেউ এই কেস হিস্ট্রি শুনে বলবে, বড্ড বেশি সমাপতন। প্রত্যেকবার পরিবারের বৌ বা মেয়ের হাতে একটা কিছু যাচ্ছে, যেটা থেকে সে বুঝতে পারছে যে স্বামী গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক বার মেয়েটি চিঠি, ডায়েরি বা জার্নাল লিখছে। প্রত্যেক বার মেয়েটির স্বামী তাকে খুন করছে। এবং প্রত্যেক বার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে খুনকে আত্মহত্যায় বদলে দিচ্ছে।"

"ট্রুথ ইজ় স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন, ঘঞ্চুসোনা! প্রতিটি অ্যাবিউজ়ড চাইল্ডের গল্প এক। প্রতিটি রেপ ভিক্টিমের গল্পের ধাঁচ এক রকম। প্রতিটি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের প্যাটার্ন এক। কারণ পেট্রিয়ার্কির কাজের ধরণ অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ বদলায়নি। প্যাট্রিয়ার্কি প্রসঙ্গে মনে পড়ল। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাধুদা 'খুনিয়া জিন' শব্দদুটো ব্যবহার করেছিল।"

"খুনিয়া জিন! খুব ইন্টারেস্টিং শব্দবন্ধ! 'এম-ও-এ-ও' জিনের অন্য নাম 'ওয়ারিয়র জিন' বা 'যুদ্ধবাজ জিন।' বাই দ্য ওয়ে, বরুণ আকাশকে কবে থানায় নিয়ে যায়?"

"যে দিন প্রিয়ার স্মরণসভা ছিল, ঠিক তার আগের রাতে। পুরোটাই বরুণেরই প্ল্যান। ও ফোন করে আকাশকে থানায় ডেকেছিল। তারপরে এলগিন রোড আর পুনশ্চর পিছনের গলির সিসিটিভি-র ফুটেজ দেখিয়ে বলল, 'দীপশিখা ম্যাডামকে হত্যার চেষ্টার জন্যে তোমাকে গ্রেফতার করা হল।' যতই হার্ডকোর ক্রিমিনাল হোক না কেন, বয়সটা তো কম। ঘাবড়ে গিয়ে সব বলে দেয়। বরুণ চেয়েছিল স্মরণসভার দিন সকালে ওকে তুলতে। যাতে বাড়ি গিয়ে কাউকে বলতে না পারে। কিন্তু সেটা রিস্ক হয়ে যেত। থানা থেকে ছাড়ার আগে বরুণ ওকে এমন ধমক দিয়েছিল যে বাবাকে বলতে সাহস পায়নি।"

"একটা জিনিস খেয়াল করেছ? খবরের

কাগজে বা টিভিতে প্রিয়া দাশকে নিয়ে কোনও খবর নেই!"

"খেয়াল করেছি।"

"তুমি বরুণকে ফোন করোনি?"

"মাঝখানে একদিন করেছিলাম। বলল, প্রচণ্ড ব্যস্ত। সামনের মাসে কথা বলবে।"

"ঠিকই আছে," আড়মোড়া ভাঙে সৈকত, "পুলিশের দরকার শেষ। কাজেই ফোন ধরাও শেষ। আবার অন্য কেসে বিপদে পড়লে হাসতে হাসতে হাজির হবে।"

"আমার তা মনে হয় না," আপত্তি করল দীপশিখা, "তুমি সত্যিই আজ চলে যাবে?"

"যেতেই হবে। আর বেশিদিন বাড়িতে বসে থাকলে প্র্যাক্টিস লাটে উঠবে।"

"আমিও পরশু জয়েন করব। অকারণে বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না।"

বুলুদি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই সৈকত স্নান সেরে রেডি। সকাল সকাল বেরোচ্ছে। রাস্তায় লাঞ্চ করবে। পুরুলিয়া পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। পোশাক পরে রেডি হয়ে দীপশিখার পাশে বসে পেটে হাত রাখে সে। নরম গলায় বলে, "আমি যা বলেছিলাম, তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ, ঘেঁটুরানি? আমার একটা কথা তুমি রাখবে?" ঘুমের ওষুধ আর খেয়ো না," হাতের মুঠো খুলে ওষুধের রাংতা বার করে ঘণ্টুসোনা, "এক সময় তোমার ঘুমের ওষুধের অ্যাডিকশন হয়েছিল। সেটা থেকে বেরিয়ে এসেছ। আবার একটা ক্রাইসিস এল। আবার ধরলে। সঙ্কট তো জীবনভর থাকবে। আগামী কয়েক মাস আমাদের বাচ্চাটার কথা ভাবো। ওষুধের জন্যে মেয়েটার ক্ষতি হতে পারে।"

ঘেঁটুরানি চমকে উঠেছে। সৈকত জানল কী করে? তা হলে কি বুলুদি সৈকতকে খবর দিয়েছে?

"বুলুদি নয়," ঘেঁটুরানির মন পড়তে পারছে ঘণ্টুসোনা, "খবরটা আমাকে বরুণ দিয়েছে। স্মরণসভা থেকে বেরোনোর পরেই বলেছিল। যেদিন ও আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিল, তুমি বমি করার পরে ব্যাগ থেকে ওষুধ বের করে খেয়েছিলে। মুখ ধুতে তুমি যখন বাথরুমে যাও, বরুণ তখন তোমার ব্যাগ খুলে টুক করে ওষুধের নাম দেখে নিয়েছিল। আমি তোমাকে কিছু বলিনি। শুধু তুমি বাথরুমে গেলে ব্যাগ খুলে দেখতাম ক'টা ট্যাবলেট আছে। আমি খেয়াল করেছি, স্মরণসভার পরে তুমি আর একটাও ট্যাবলেট খাওনি। এরকমটাই থাকো ঘেঁটুরানি। টেনশন সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে শেখো।"

"আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম," ঘণ্টুসোনাকে জড়িয়ে ধরে ঘেঁটুরানি, "তুমিও আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর ঘুমের ওষুধ খাব না। টেনশন হলে সব্বার আগে তোমাকে ফোন করব। প্লিজ় ক্ষমা করে দাও!"

উত্তর না দিয়ে দীপশিখার পেটে মাথা রেখেছে সৈকত। চোখের লোনা জল পড়ছে দীপশিখার পেটে। পোশাকের উপর দিয়েও বুঝতে পারছে দীপশিখা। সে একই সঙ্গে রেগে যাচ্ছে আর হাসছে, অভিমান করছে আর ভালবাসছে, কাছে টানছে আর দূরে ঠেলে দিচ্ছে, থাপ্পড় কষাচ্ছে আর চুমু খাচ্ছে...

নারী আর পুরুষের সম্পর্ক যেমন হয় আর কী! এই ভাবেই বাকি জীবন ওদের কেটে যাবে হয় তো! বা কাটবে না! অন্য বাঁক আসবে। কিন্তু সেটা অন্য গল্প।

### উত্তরকথন

আজ দোসরা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। আজই কাজে যোগ দেবে দীপশিখা। হাসপাতালে যাওয়ার আগে ভবানীপুর থানায় এসেছে। থানা চত্বরে ঢুকে দেখল সুব্রত আর মিনতি মোবাইল ফোনে ভিডিয়ো দেখছে। চার দিক শুনশান, অভিযোগকারী বা অভিযুক্তরা সকাল সাড়ে আটটার সময় এসে উঠতে পারেনি। দীপশিখাকে দেখে মোবাইল টুক করে পকেটে ঢুকিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে সুব্রত বলল, "ম্যাডাম, আপনি?"

প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে দীপশিখা বলল, "স্যর আছেন?"

"কোয়ার্টারে আছেন। ডাকব?"

দীপশিখা বলল, "আমি ওঁর কোয়ার্টারে যেতে পারি?"

সুব্রত চোখ গোল গোল করে দীপশিখাকে দেখল। তারপরে কোয়ার্টারের দিকে দৌড়ল। একটু পরেই কোয়ার্টারের দরজায় দেখা গেল খাকি ট্রাউজ়ার্সের উপরে টি শার্ট পরা বরুণকে। সে হাত নেড়ে বলল, "ভেতরে আসুন।"

কোয়ার্টারের দরজা দিয়ে ঢুকে দীপশিখা গম্ভীর মুখে বলল, "আপনি আমাকে সামনের মাসে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন।"

বরুণ এক হাত লম্বা জিভ কেটে বলল, "আপনি অফেন্ডেড হয়েছেন। আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মরার সময় ছিল না।"

"এখন কি মরার সময় পেয়েছেন?" বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে দাগ কাটছে দীপশিখা।

"রাগ করবেন না প্লিজ়। আমি সব বলছি। আসলে এটা এত হাই প্রোফাইল কেস, এত রকম এজেন্সির সঙ্গে কোল্যাবরেশন করতে হচ্ছে যে বলার নয়।"

"এজেন্সি বলতে?"

"এটা আর কলকাতা পুলিশের হাতে নেই ম্যাডাম। আবু ঘ্রাইবের প্রাক্তন সেনা-চিকিৎসক কলকাতায় লুকিয়ে রয়েছেন। এর গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারছেন? ইউএস এমব্যাসি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস কমিশন— সবাই ঢুকে পড়েছে। মিডিয়া এখনও পর্যন্ত কিছু জানে না। ক'দিন পরেই জানবে। তখন আপনি আর আমি সেলেব হয়ে যাব।"

দীপশিখা বরুণের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কী ভাবছেন? বরুণ সরকার নামের এই পুলিশটা কী লোভী! তাই না?"

দীপশিখা এখনও বরুণের দিকে তাকিয়ে।

"আপনি আমার দিকে ওই ভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?" হাসছে বরুণ, "প্রেস মিটে আপনাকেও ডাকব। কিন্তু কতটা কী বলা হবে সেটা অমিত স্যর ঠিক করে দেবেন।"

দীপশিখা বরুণের কথা শুনছে না। সে চেয়ার থেকে উঠে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটি আপনার ছেলের ছবি, তাই না?"

"হ্যাঁ," বলল বরুণ।

"স্ত্রী-র ছবি নেই?"

"নাহ!" অস্বস্তি ঢাকতে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে বরুণ, "যাকে আমি ভালবাসি না তার ছবি কেন রাখব?"

"আপনার মনে আছে, সেদিন স্মরণসভার শুরুতে আপনাকে বলেছিলাম, প্রিয়াকে নিয়ে কিছু বলতে। বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হয় সেটা জানাতে। আপনি ফাম্বল করছিলেন কেন?"

বরুণ ভুরু কুঁচকে দীপশিখার দিকে তাকাল।

"প্রিয়াকে নিয়ে আপনার তো স্মৃতি আছে বরুণ। ক্রাইম সিনে, ডেডবডি হিসেবে, দীপশিখাকে আপনি প্রথম দেখেননি। ওঁকে আপনি প্রথম দেখেন এই থানায়, আপনার চেম্বারে। তাই না?"

বরুণ এখনও দীপশিখার দিকে তাকিয়ে।

"পুলিশ হিসেবে আপনারা ক্রাইম সিনের রি-কনস্ট্রাকশন করেন। আমি পুলিশ নই, মড়াকাটা ডাক্তার। আমি জাস্ট প্রিয়ার কর্মপদ্ধতিটা ভাবার চেষ্টা করেছি। পেন ড্রাইভ দুটো উনি খুঁজে পান দু'হাজার একুশ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর। নিজের স্বামীর অতীত ঘাঁটতে গিয়ে উনি কবিতা এবং লীলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা জানতে পারেন। প্রশ্ন হল, ভবানীপুর থানার ইউডি কেস নম্বরদু'টি উনি জানলেন কী করে?"

বরুণ তাকিয়ে রয়েছে।

"আমি প্রিয়ার মতো করে ভাবা চালিয়ে গেলাম। সেটা খুব ন্যাচরাল। কারণ আমরা দু'জনেই মেয়ে, দু'জনেই বিবাহিত, দু'জনেই ডাক্তার, দু'জনেই বরকে সন্দেহ করছি, এমনকি দু'জনেই ঘুমের বড়ি খাই...

বরুণ মাথা নিচু করে বলল, "আমার মনে হয়, সৈকতকে ওটা বলে আমি ঠিকই করেছিলাম।"

"আপনি আর আমি বন্ধু, বরুণ। আপনি ওটা বলে ঠিকই করেছেন," বলল দীপশিখা, "আমি বরং মূল কথায় আসি। আমি যদি প্রিয়া হতাম, তা হলে ভবানীপুর থানায় গিয়ে উনিশশো সাতানব্বই সালের ইউডি কেসের ফাইলগুলো দেখতে চাইতাম। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সেগুলো দেখতে দিতেন কি না সেটা নির্ভর করছে অনেকগুলো বিষয়ের ওপরে। আমার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি নিজে কেমন মানুষ, আধিকারিক কেমন মানুষ, তাঁর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড... এবং এখানেও আমার আর প্রিয়ার অভিজ্ঞতা মিলে গেল। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সন্তান মৃত, স্ত্রী থেকেও নেই। মানসিক শূন্যতা থেকে ভালবাসার কাঙাল। প্রিয়াকে তিনি কেস ফাইল দেখতে দিয়েছিলেন। কবিতার খুনের কেস ফাইল পড়লেই সেখান থেকে লীলার কেস ফাইলে পৌঁছে যাওয়া যায়। বিশেষত, প্রিয়া জার্মান ভাষা জানতেন। এই তথ্যটি আলপথ

আর সিয়ার কাছ থেকে আমি জানতে পারি।"

"আন্দাজে এত কিছু বলা যায়?" দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বরুণ হাসল।

"কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে খবর, 'ভবানীপুর থানার মালখানা থেকে মূল্যবান ডকুমেন্ট উদ্ধার।' তার মানে কেউ সেখানে ঢুকে সেগুলো নেড়েঘেঁটে দেখেছে, তাই না? সেটা যে আপনি, সে কথা আপনার এক স্টাফ আমাকে বলেছেন।"

"মিনতি?"

"মেয়েলি আড্ডার হালচাল তো জানেনই! শুধু হাহাহিহি, শুধু গুজুগুজুর ফুসুরফুসুর। কে কার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসে, কে কাকে মালখানা দেখাতে নিয়ে যায়... এই সব পিএনপিসি! মিস মার্পলের জমানা থেকে থেকে আজ পর্যন্ত মেয়েরা এক চুলও বদলাল না!"

বরুণের মাথা নিচু।

দীপশিখা বলল, "আমি আপনাকে বলেছিলাম, 'দুটো প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না। প্রথম প্রশ্ন ছিল আমাকে হুমকি ফোন আর ফিজ়িকাল অ্যাসল্ট করার পিছনে কে বা কারা আছে?' সেটা আপনি বলে দিয়েছেন। আমি বলেছিলাম, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে। সেই প্রশ্নটা এবার করি। উত্তর আমার জানা। প্রশ্নটা হল, আপনি প্রিয়াকে ভালবাসতেন?"

বরুণ ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ। প্রিয়াও আমাকে ভালবাসত। ও জানত, খুন হবে।"

"আপনিও সেটা জানতেন। আগাগোড়াই এও জানতেন যে, কে খুন করেছে। তাই না?"

"আমি মহাভারতের সঞ্জয়ের মতো, ম্যাডাম!" জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কান্না চাপছে বরুণ, "কুরুক্ষেত্রে কী হচ্ছে— সব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বিবরণ দেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। একে পুলিশের চাকরি, তার ওপরে যে বিবাহিত মহিলাকে ভালবাসি, সে খুন হয়েছে। আমিও পোটেনশিয়াল সাসপেক্ট। সমানে পুলিশমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার, লোকাল কাউন্সিলর চাপ দিচ্ছেন প্রিয়ার মৃত্যুকে আত্মহত্যা দেখিয়ে কেস ক্লোজ় করার জন্যে। পোস্ট মর্টেমের জন্যে বিএমসিতে গিয়ে আপনাকে দেখেই মোডাস অপারেন্ডি ঠিক করে ফেলি। এই কেস ক্র্যাক করার জন্যে আপনার মতো ঠোঁটকাটা আর টেঁটিয়া মড়াকাটা ডাক্তারকে ইনভল্‌ভ করাতেই হবে। সেই জন্যেই আমি যা যা জানি, সব আপনাকে বলছি। বাকিটা আপনার মাথা, আপনার দেখার চোখ, আপনার হাতযশ।"

বরুণের চোখের দিকে আবার তাকাল দীপশিখা। ও দুটো চোখ নয়, নজরদারি ক্যামেরার লেন্স। শুধু দেখা আর তথ্য জমিয়ে রাখা ছাড়া যার অন্য কোনও কাজ নেই। সে আনন্দে হাসে না, দুঃখে কাঁদে না, বিষণ্ণতায় আকুল হয় না, রাগে গর্জে ওঠে না, অভিমানে নত হয় না। তার কোনও অনুভূতিই নেই।

দীপশিখা বলল, "পরে ভেবে দেখেছি, আপনার আচরণ থেকে আগাগোড়াই একাধিক অর্থ বের করা যায়। ময়না তদন্ত শুরু করার সময় আপনি যে ভাবে ডেডবডির দিকে তাকিয়েছিলেন তার মধ্যে বেদনা ছিল। এই যে, এখন যেভাবে তাকিয়ে আছেন... এইটা সেই সময় ছিল।"

কান্না লুকোতে গিয়ে হেসে ফেলে, অনুভূতি লুকিয়ে রাখার ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে গলা খাঁকরে বরুণ বলল, "ওটা আপনার ইম্যাজিনেশন। আমি যেটা করেছিলাম, সেটা হল জোর করে ভিডিয়োগ্রাফি করা। আমি জানতাম, পরে এই ভিডিয়ো আপনার কাজে লাগবে।"

"আপনি যেভাবে ভুরু কুঁচকে ভিডিয়ো তুলছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল ওই ভিডিয়োগ্রাফির ওপরে আপনার সর্বস্ব নির্ভর করছে। আমি যখন ক্যাজুয়ালি বলি যে প্রিয়ার মৃত্যুর কারণ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, তখন আপনিই আঙুলের ইশারায় আমাকে স্ক্যাপ্লে নিড়্‌ল প্রিক ইনজুরি দেখান।"

বরুণ বাথরুম থেকে ঘুরে এল। চোখে-মুখে জল দেওয়ার পরে তাজা লাগছে। সুব্রতকে ফোনে বলল চা-বিস্কুট দিয়ে যেতে। দীপশিখার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কাছে কিছুই লুকোনো যায়নি দেখছি।"

"আপনি গুচ্ছের বড় বড় ভুল করেছেন। পুলিশের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে যা একদম মেলে না। উদাহরণ দেব? সন্দেহভাজনদের নাম আর মোবাইল নম্বরের তালিকা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সবাইকে আমার ফোন নম্বর বিলি করেছেন। দুটোই নিয়ম ভাঙা কাজ। ইনফ্যাক্ট ওখান থেকেই আকাশ আমার মোবাইল নম্বর পায়। পলের নোটবুক আমি আলপথকে দিয়ে অনুবাদ করাই। যে একজন সন্দেহভাজন। যে কোনও পুলিশ এই কাজটা করতে দিত না। দরকার হলে পেশাদার অনুবাদক ভাড়া করত, কিন্তু আলপথকে অ্যালাও করত না। আপনি আমাকে আটকাননি। এই সবই আপনার দাবার চাল বরুণ। আপনি চাইছিলেন, আমি যেন কেসটা সল্‌ভ করি। নিজেকে কেস থেকে দূরে সরিয়ে আমার হাতে একের পর-এক সূত্র তুলে দিয়েছেন।"

সুব্রত চা-বিস্কুট দিয়ে গেছে। চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে দীপশিখা আপনমনে বলছে, "মানুষ একে অপরকে কী ঘেন্না করে, তাই না? এক ধর্ম অন্য ধর্মকে, এক জাত অন্য জাতকে, এক ভাষা অন্য ভাষাকে দমন করার জন্যে লড়াই করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে। এত ঘৃণা আসে কোথা থেকে? অত্যাচারের পদ্ধতি নিয়ে দিনের পর-দিন না-ভেবে যদি কত রকম ভাবে ভালবাসা যায় এই নিয়ে রিসার্চ করত, তা হলে কী ভালই না হত।"

চায়ে চুমুক দিয়েছে বরুণ, "আমার কপালটা ভাবুন ম্যাডাম! যাকে ভালবাসি, তার খুনের তদন্ত করতে গিয়ে জানলাম যে ওই একটি খুনের পিছনে লক্ষাধিক খুনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আজ না হয় কাল নীল আর ববি জেলের ঘানি টানবেন, আকাশ বাড়ি যাবে বা সংশোধনাগারে, ওদের লোকে ভিলেন বলবে। কিন্তু তাতে কি ইতিহাস বদলে যাবে?"

"না," চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে দীপশিখা, "একজনকে খুন করলে খলনায়কের জন্ম হয়। লক্ষাধিক মানুষকে খুন করলে, নায়ক। আর পৃথিবীর সবাইকে হত্যা করলে জন্ম হয় ঈশ্বরের। সংখ্যাই আসল। সংখ্যাই কালো খলনায়ককে আলোকিত ঈশ্বরে বদলে দেয়।"

বরুণের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে হাঁটছে দীপশিখা। তাকে এবার হাসপাতাল যেতে হবে। এখান থেকেই বরুণের মোবাইলের রিংটোন শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বরুণের কেজো কণ্ঠস্বর, "জয় হিন্দ স্যর! হ্যাঁ, আজ ভোরে চারটে ডেডবডি পাওয়া গেছে। সবারই সারা গায়ে ঘা। সবাই দুধের শিশু। কী করে মারা গেল জানার জন্যে পোস্ট মর্টেম হবে। আমি যাচ্ছি বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে... হ্যাঁ স্যর... দীপশিখা ম্যাডাম আজই কাজে জয়েন করেছেন..."

দীপশিখা হতাশ হয়ে কপাল চাপড়াল। তারপরে বরুণের কোয়ার্টারের দিকে ফিরল।

**অলংকরণ:** সুব্রত চৌধুরী

*ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বাদ দিলে এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা, চরিত্র এবং প্রতিষ্ঠান লেখকের কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবের সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া গেলে তা আকস্মিক এবং লেখকের অনভিপ্রেত।*

*এই উপন্যাসে যাঁদের কবিতা এবং গানের পংক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়।*


*গ্রন্থপঞ্জি:*

*জার্মানি ও আউশউইৎজ়*

*I WAS A DOCTOR IN AUSCHWITZ. DR. GIESELLA PERL. INTERNATIONAL UNIVARSITY PRESS. NEW YORK.*

*স্বৈরাচারের বন্ধু ছদ্মবিজ্ঞান। স্বাগতম দাস। আনন্দবাজার পত্রিকা। উত্তর সম্পাদকীয়। ১৬ নভেম্বর, ২০২১*

*নকশাল আমল*

*জেলখানা কারাগার। নিকুঞ্জ সেন। গণ দীপায়ন পাবলিশার্স। প্রথম মুদ্রণঃ মাঘ ১৩৫৮*

*কারাগারে ১৮ বছর। আজিজুল হক। নবগ্রন্থনা। প্রথম প্রকাশঃ মাঘ ১৩৬৭*

*সাদা আমি কালো আমি। রুণু গুহ নিয়োগী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। জিনিয়া পাবলিশার্স। প্রথম প্রকাশঃ ১৩৬৬*

*হন্যমান। জয়া মিত্র। কামিনী প্রকাশালয়। প্রথম প্রকাশঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯*

*উজ্জ্বল অন্ধকার। নির্যাতন ও বন্দিজীবন পর্ব। সৌমেন গুহ। স্বপ্নরেখা প্রকাশন। প্রথম প্রকাশঃ ২০২০*

*আবু ঘ্রাইব*

*https://www.bbc.com/news/44031774*

*https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse*

*https://www.newyorker.com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib*

# পুরানো সেই চুলের কথা...

চার, পাঁচ থেকে সাতের দশক... হেয়ারস্টাইল, চুলের সাজ নিয়ে সেযুগে কম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি! এতটা সময় পেরিয়েও সেই সব ভিন্টেজ, স্টেটমেন্ট হেয়ারডু এখনও সমান জনপ্রিয়, সর্বস্তরে সমাদৃত। পুজোর মেকওভারে পুরনো সময়ের তেমনই কিছু 'ক্লাসিক' হেয়ারলুক ডিকোড করলেন সায়নী দাশশর্মা।

কথায় বলে, কিছু স্টাইল কখনও পুরনো হয় না। কারণ তার আবেদন, প্রাসঙ্গিকতা চিরন্তন। কিন্তু যা পুরনো হয়, তা-ও কি চিরতরে হারিয়ে যায়? নাকি সময়ের ঘষা লেগে 'নতুন' হয়ে ফিরে আসে বারবার? ফেলে আসা সময়ের চুলের সাজ, চুল বাঁধার আদবকায়দা এখন 'রেট্রো' স্ট্যাটাস পেয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তায় কোনও ফারাক পড়েছে কি? চুল নিয়ে কম পরীক্ষানিরীক্ষা তো হয়নি তারপর। মাত্র কয়েক দশকের তফাতে আজ আকাশপাতাল বদলে গিয়েছে চুলের সাজসজ্জা। তবুও, শত আধুনিকতার ভিড়েও পুরনো সেই সব স্টাইল, হেয়ার স্টেটমেন্ট আবেদনে অমলিন থেকে গিয়েছে...
চার থেকে সাতের দশকের মধ্যবর্তী সময়কাল রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছিল ফ্যাশনে। সময়ের অনুপাতে অনেকটাই উন্নত, আধুনিক ছিল সেইসব ট্রেন্ড এবং স্টেটমেন্ট। চুলের সাজ নিয়েও সেসময় যে ধরনের যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, তা এখনও ভাবলে অবাক হতে হয়! অবশ্য সেই পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছিল আরও কয়েক দশক আগে। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছিল নারীদের ফ্যাশনসেন্স। খানিকটা যুগের প্রয়োজন ছিল ঠিকই, তবে বেশিরভাগটাই ছিল তাঁদের নিজস্ব রুচি এবং পছন্দের বহিঃপ্রকাশ। যুদ্ধকালীন উত্তপ্ত আবহে চুলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসাধনীর জোগান কমে আসায় পিঠ ছাপানো লম্বা চুল কেটে ফেলা শুরু করলেন মহিলারা। অধুনা-জনপ্রিয় 'শর্ট ববকাট'-এর প্রচলন তখনই। ১৯০৯ সালে বিখ্যাত পোলিশ হেয়ারড্রেসার অ্যান্তোইন দে প্যারি 'জোয়ান অফ আর্ক' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহিলাদের ছোট চুলের এই ট্রেন্ড শুরু করেন। তার আগে পর্যন্ত ছোট চুলের চল ছিল না, তা নয়। তবে তা জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠে আঠেরো শতকের শুরুর দিকে। যদিও বিশ্ব জুড়ে এই ট্রেন্ড ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকান নৃত্যশিল্পী আইরিন কাসলের হাত ধরে। ইতিমধ্যে আর্বিভাব ঘটে ইলেকট্রিক হেয়ার স্টাইলারের। বাকিটা ইতিহাস! ওয়েভস, পার্ম, কার্লের প্রচলনে নতুন দিশা খুঁজে পায় গ্ল্যামার দুনিয়া। কিছু বছরের মধ্যে পপ কালচারের

আইডা লুপিনোর এই ক্লাসিক পিন-আপ আপডু মাঝারি দৈর্ঘ্যের চুলের জন্য আদর্শ। সাইড পার্ট করা চুল উলটে টপ নট বেঁধে নিন। সামনের অংশ কার্ল করে খুলে রাখুন।

পিন-আপ হেয়ার আপড়ু

আপের আধিপত্য ছিল। কখনও চুল খুলে সামনের অংশ রোলারের সাহায্যে পেঁচিয়ে নেওয়া হত বিভিন্ন ডিরেকশনে (পুডল স্টাইল), কখনও আবার ব্যাকব্রাশ করে ফুলিয়ে আপডু স্টাইলে বেঁধে দেওয়া হত। খুব ছোট চুলে সবচেয়ে বেশি দেখা যেত 'পম্পাডোর' পিন-আপ। ভলিউম আনতে সামনের অংশ ঈষৎ ফুলিয়ে মসৃণ কার্ভেচারে আঁচড়ে নেওয়া হত। অ্যাকসেসরাইজ়েশনের জন্য ব্যবহৃত হত বো, রিবন, ব্যান্ডানা কিংবা এম্বেলিশড হেয়ারক্লিপ।

## বিউটিফুল বি-হাইভ

স্লিক চুল আর কার্ল ছেড়ে 'বিগ হেয়ার' ট্রেন্ডের প্রতি অবসেশন শুরু হয় ছয়ের দশকে। সেসময় মহিলাদের মধ্যে ফেজ় হ্যাট পরার চল ছিল। তাই এমন হেয়ারস্টাইলের প্রয়োজন ছিল, যাতে ফেজ় হ্যাট পরতে অসুবিধে না হয়। সেই থেকেই লম্বা চুল উলটে ব্যাকব্রাশ এবং টিজ় করে মাথার উপরে জড়ো করে কনিক্যাল শেপ দেওয়ার শুরু। বাইরে থেকে মৌচাকের মতো দেখাত বলে, এর নাম দেওয়া হয় বি-হাইভ। যদিও আবিষ্কর্তা মার্গারেট ভিঞ্চি হেল্ট আসলে ফেজ়

লম্বা চুলে সহজেই রিক্রিয়েট করতে পারেন মুমতাজ়ের এই বি-হাইভ স্টাইল। সামনের অংশে সাইড পার্ট করে আঁচড়ে নিন। বাকি চুল ব্যাকব্রাশ করে, নিচে পাফার রেখে যথাস্থানে পিন করুন। স্প্রে দিয়ে সেট করে নিন।

বি-হাইভ

আগমন ঘটে। বিনোদন জগৎকে মাধ্যম করে প্রায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে নতুন ধারার হেয়ারস্টাইল। আমাদের দেশে সেই সব হেয়ার ট্রেন্ডের সূচনা মোটামুটি পাঁচের দশকে। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত কেশসজ্জার বিবর্তন এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। তবে চুলের স্টাইলিং এবং বাঁধার ধরনে আটের দশকাবধি সময়কালকে উপরেই রাখতে হবে। কারণ তার পরবর্তী হেয়ার

ট্রেন্ডে মূলত কাট এবং কালারের বৈচিত্র্যই বেশি নজর কেড়েছে। ভিন্টেজ স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রেও তাই পূর্ববর্তী কয়েক দশককেই বেছে নিলাম আমরা। ফিরে দেখলাম চার থেকে সাতের দশকের মধ্যবর্তী কিছু স্টেটমেন্ট হেয়ারস্টাইলকে...

## পপুলার পিন-আপ

চারের দশকের বিভিন্ন স্টাইলের মধ্যে অন্যতম ছিল পিন-আপ। চুলের দৈর্ঘ্য, কাট এবং টেক্সচার অনুসারে পিন-আপের স্টাইল বদলানো যেত বলে, সে যুগে কম-বেশি সকলেই ফলো করতেন এই হেয়ার স্টেটমেন্ট। আইডা লুপিনো, রিটা হেওয়র্থ থেকে মেরিলিন মনরো... সকলের কেশসজ্জাতেই একসময় পিন-

লিলি পামারের এই ভিক্টরি রোলস অনুকরণ করা খুব সহজ। স্রেফ হেয়ার কার্লার আর ববিপিন থাকলেই হবে। চুল যত ছোট দৈর্ঘ্যের হবে, ততই মানাবে ভাল!

হ্যাটের আকারে অনুপ্রাণিত হয়েই এর প্রচলন করেন। প্রথমদিকে স্রেফ আপড়ু হিসেবেই দেখা যেত এই স্টেটমেন্ট হেয়ারস্টাইল। পরের দিকে আপড়ু ছাড়াও বিনুনি, পনিটেল, এমনকী খোলা চুলেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বি-হাইভ। তালুর অংশে কৃত্রিম পাফার রেখে চুল ফুলিয়ে খুলে রাখার চল সাড়া ফেলেছিল বিনোদন জগতেও। ব্রিজেট বার্দো, রনি স্পেকটর থেকে শর্মিলা ঠাকুর, মুমতাজ... বি-হাইভের তুমুল জনপ্রিয়তায় এঁদের প্রত্যেকের অবদান সমান।

## ভিক্টরি রোলস

বি-হাইভ আর পিন-আপেরও আগের কোনও

এলিগ্যান্ট ভিক্টরি রোলস

স্ট্রেট কিংবা ওয়েভি হেয়ার এমনি খুলে না রেখে বি-হাইভের মতো ফুলিয়ে লো বা সাইড পনিটেল বেঁধে নিন। স্টাইলিং করুন মানানসই স্কার্ফ দিয়ে। কপাল চওড়া হলে সামনের অংশ পেতে আঁচড়ান।

স্টেটমেন্টে হেয়ারস্টাইলের কথা যদি বলতে হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে ভিক্টরি রোলস। আঠেরো শতকের শুরুর দিকে যখন প্রথম ইলেকট্রিক হেয়ার স্টাইলারের আর্বিভাব ঘটে, সেই সময় থেকেই কার্ল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার শুরু আর সেখান থেকেই ভিক্টরি রোলসের সূত্রপাত। চুল মিডল বা সাইড পার্ট করে ছোট ছোট সেকশনে ভাগ করে কার্ল করে মাথার দু'পাশে রোল করে পিন করে দেওয়া হত। পার্টিং এবং রোলের অবস্থান এমন হত যে, তা V আকৃতি নিত। সেই কারণেই এর নাম হয় 'ভিক্টরি' রোলস।

পনিটেল উইথ স্কার্ফ

নজরকাড়া স্টেটমেন্ট তৈরি করতে, বেছে নিতে পারেন ফ্লিপড হেয়ারস্টাইল। চুল উলটে আঁচড়ে হাই পনিটেলে বেঁধে নিন। নিচের অংশে থাকুক আউটওয়ার্ড কার্লস। ইলাবোরেট অ্যাকসেসরি দিয়ে স্টাইলিং করুন।

ফ্লিপড হেয়ারে স্টেটমেন্ট অ্যাকসেসরি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের পর এই হেয়ারস্টাইলে জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে। তবে একে প্রাথমিকভাবে পরিচিতির আলোয় এনেছিলেন লিলি পামার, ইনগ্রিড বার্গম্যানের মতো অভিনেত্রীরা।

## ভলিউমিনাস পনিটেল উইথ স্কার্ফ

সত্তরের শুরু থেকে ধীরে ধীরে লাইমলাইট ফিরে পায় লম্বা চুল। ফিরে আসে পনিটেলের ফ্যাশনও। বুফোঁ স্টাইলের ব্যকরণ এক রেখে একের পর এক এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়। প্রায় একই সময়ে জনপ্রিয়তা পায় ব্যাঙ্গস এবং ফ্রিঞ্জেস। চুল ফুলিয়ে হাই বা লো-সাইড পনিটেল বেঁধে, স্কার্ফ দিয়ে স্টাইলিং করার ট্রেন্ড শুরু হয়। 'কারাভান'-এর আশা পারেখ কিংবা 'পড়োসন'-এর সায়রা বানু, সেসময় প্রত্যেককেই স্পোর্ট করতে দেখা গিয়েছে পনিটেল আর স্কার্ফের জুটি!

## ফ্লিপড অনসম্বল

প্রায় একই সময় বুফোঁ হেয়ারস্টাইলের আর-একটি ধরনও খ্যাতির শীর্ষে উঠে আসে। আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বি-হাইভের ধাঁচের, তবে আদতে অনেকটাই আলাদা। সাধারণত বি-হাইভের ক্ষেত্রে চুলের সামনের অংশ কোনও একদিকে পার্টিং করে আঁচড়ানো হত। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনওরকম পার্টিং ছাড়াই চুল উলটে হাই পনিটেলের মতো বেঁধে দেওয়া হল। সেসময় ববিতার সিগনেচার হেয়ারস্টাইলে পরিণত হয়েছিল এই 'ফ্লিপড' হেয়ার ট্রেন্ড। পরবর্তীকালে এতে ইলাবোরেট হেয়ার ক্লিপ বা স্টেটমেন্ট অ্যাকসেসরিজ়ের ব্যবহার শুরু

হয়। 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস'-এ শর্মিলা ঠাকুরের বোল্ড হেয়ারডু থেকে 'পিয়া তু অব তো আ জা' গানে হেলেনের ক্যাবারে লুক, বরাবরই ফ্লিপড হেয়ারে নজর কেড়েছে এ ধরনের অ্যাকসেসরাইজ়েশন।

## সাইড ব্রেড উইথ ব্যাঙ্গস

ভারতীয় হেয়ারস্টাইলের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্টের সাক্ষী থেকেছে চিরন্তন বিনুনি। আর এই প্রসঙ্গে 'সাধনা কাট'-এর কথা না বললেই নয়! ষাটের শুরুতে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল তাঁর সিগনেচার হেয়ারস্টাইল। কপালে ফেলা ব্যাঙ্গস, ঈষৎ ফোলানো সাইড পার্ট করা চুল, একপেশে বিনুনি আর তাতে ফুলের ব্যবহার... পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের বুকে আলোড়ন তুলেছিল সাধনার এই এলিগ্যান্ট হেয়ারস্টাইল।

এতটা সময় পেরিয়ে এসেও এসব স্টেটমেন্টের কোনও বিকল্প তৈরি হয়নি। চুলের কাটে অভিনবত্ব এসেছে, রঙের বৈচিত্র্য বেড়েছে, অ্যাকসেসরাইজ়েশনও বদলেছে। তবে স্টাইলিংয়ে আর-কেউই ওই কয়েক যুগের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। সেই কারণেই আধুনিক সাজসজ্জাতেও এইসব 'ক্লাসিক' স্টাইল এতটা প্রাসঙ্গিক।

জনপ্রিয় 'সাধনা' কাট

সাধনার 'হম দোনো' ছবির এই হেয়ারস্টাইল রিক্রিয়েট করতে সাইড পার্ট করা চুল একপাশে এনে বিনুনি করে নিন। মাথার সামনের অংশের চুল ব্লো-ড্রাই করে ছেড়ে রাখুন। সঙ্গে লাগান পছন্দের ফুল।

**মডেল:** জুহি, অঙ্কিতা, তনুশ্রী
**মেক-আপ:** কাজু গুহ
**ফোন:** ৮০১৭৯৪২৬৫১
**হেয়ার:** আম্রপালি
**ফোন:** ৯০৭৩৮০৮০৬০
**স্টাইলিং:** বম্বে বাই আয়েশা
**ফোন:** ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
**সহযোগী:** দীপশিখা রায়
**শাড়ি:** উমাইরা
**ফোন:** ৮১০০১৮১৯১৪
**ছবি:** সোমনাথ রায়
**শুটিং কোর্ডিনেশন:** মৌমিতা সরকার,
**রূপায়ণে:** অসীম হালদার

# আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়

শুনেই মনে হচ্ছে তো, কী কঠিন কথা? আইসোমেট্রিক ওয়র্কআউট কিন্তু কঠিন নয় মোটেই। বুঝিয়ে দিলেন সেলেব্রিটি ফিটনেস ট্রেনার কুলদেপ শেঠি। আইসোমেট্রিকের অ-আ-ক-খ জেনে নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

আইসোমেট্রিক— কথাটা শুনলেই মনে হয় তো, এই রে, এক্ষুনি ইকুয়ালিটি, মেজ়ারমেন্ট, পদার্থবিজ্ঞানের ভারী ভারী সব শব্দ নিয়ে আলোচনা শুরু হবে? আর আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়? নির্ঘাত মেশিনপত্র নিয়ে কোনও কঠিন স্পেশ্যালাইজ়ড ট্রেনিং, যা জিম ছাড়া সম্ভবই নয়?

ভুল, ভুল। আইসোমেট্রিক ওয়র্কআউট আসলে অতি সহজ ওয়র্কআউটের পদ্ধতি, যা অনুসরণ করে বাড়িতেই শরীরচর্চা করতে পারেন যে কোনও বয়সের মানুষ। উপকারও প্রভূত, আর এক্সারসাইজ়গুলোর বেশিরভাগই আপনার চেনা। বিশ্বাস হচ্ছে না? একটু বিশদে বললেই হবে।

## আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় কী?

এমনিতে যখন আমরা ওয়র্কআউট করি, তখন 'মাসল লেংথ' পালটাতে থাকে— অর্থাৎ মাংসপেশির সংকোচন বা প্রসারণ হয়। ধরুন হাত গোটাচ্ছেন, বাইসেপ ফুলে উঠছে— অর্থাৎ মাসলের সংকোচন হল। আবার হাত সোজা করলেন, মাসল প্রসারিত হল। এখানেই অন্য শরীরচর্চার ধরনের সঙ্গে আইসোমেট্রিকের তফাত।

এক্সারসাইজ় মূলত তিন ধরনের হয়—

কনসেন্ট্রিক (যেখানে মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয়), অ্যাকসেন্ট্রিক (যেখানে মাংসপেশি প্রসারিত হয়) এবং আইসোমেট্রিক। আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় হল সেই সব 'স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ়' (অর্থাৎ যে সব এক্সারসাইজ়ে একই পজ়িশন ধরে রাখতে হয় কিছুক্ষণ, অন্তত বেশ কিছু মুহূর্ত), যেখানে মাসলের দৈর্ঘ্য বাড়ে-কমে না। বরং মাংসপেশির উপর চাপ পড়ে। মাসলকে টাইট করে, 'মাসল টেনশন' বিল্ড-আপ করা হয়। যখন মাংসপেশি বেশ কিছুক্ষণ 'সেমি-কনট্রাক্টেড' বা আংশিক সঙ্কুচিত থাকে, সোজা কথায় টাইট হয়ে যায় — সেই অবস্থাকে বলা হয় 'মাসল টেনশন'। ধরুন, এমনি সময় আমাদের অনেকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাসলে যে টান পড়ে, তখনও কিন্তু মাসল টেনশন হয়, কারণ চাপ পড়ে মাসলে। আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় হল সেই সব এক্সারসাইজ়, যেখানে এই মাসল টেনশনটাকেই ধরে রাখতে হয়। অর্থাৎ, মাসলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হয়। তার ফলে মাসলের ক্ষমতা বাড়ে, মাসল ভাল থাকে। সেই জন্য যে কোনও ফিটনেস রেজিমেই আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় রাখা উচিত। যে কোনও ধরনের স্পোর্টসম্যান, অ্যাথলিটরা নিজেদের ওয়র্কআউট রুটিনে আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় রাখেন, মাসলের ক্ষমতা এতে বাড়ে বলেই। খুব বেশিক্ষণের ব্যাপারও নয়— এই ধরনের শরীরচর্চার পিছনে ওয়র্কআউট রেজিমের মধ্যে থেকে মিনিটপাঁচেক দিলেই হবে।

## কাদের জন্য ভাল?

যে কোনও বয়সের মানুষের জন্যই আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় খুব উপকারী। বেশি বয়সিদের জন্য তো বিশেষ করে! কারণ তাঁরা এমনিতে খুব বেশি ওয়েট নিয়ে, বা মেশিন ব্যবহার করে শরীরচর্চা করতে পারেন না, যেটা অপেক্ষাকৃত কমবয়সিদের দ্বারা সহজে সম্ভব হয়। একটা বয়সের পর অনেকেরই হাঁটুতে বা হিপে অস্ত্রোপচার হয়। তাঁদের পক্ষেও ভারী ওজন নিয়ে শরীরচর্চা করা সম্ভব হয় না। তাঁরা 'কোর স্ট্রেংথেনিং'এর জন্য আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় করতেই পারেন।

একটা সোজাসাপটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। শিরদাঁড়া টান করে বসুন। এবার ডান পা-টা সামনে সোজা করে তুলে দিন। দশ অবধি গুনে, নামিয়ে নিন। অন্য পা-টাও একইভাবে তুলে রাখুন। এই এক্সারসাইজ় করলে লোয়ারবডি স্ট্রেংথ রীতিমতো বাড়ে, ওয়েটের ব্যবহার ছাড়াই। শরীরে যাঁদের কোথাও ব্যথা-বেদনা রয়েছে, তাঁদেরও আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় করতে কোনও সমস্যা নেই, ব্যথা বেড়ে যাওয়ার ভয় নেই। বরং নির্দিষ্ট কিছু চোট-আঘাত বা 'মাসল ইমব্যালেন্স'এর সমস্যায় রীতিমতো উপকারে আসে এই শরীরচর্চা। একমাত্র যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, যে কোনও ধরনের ওয়র্কআউটের ক্ষেত্রেই তাঁদের একটু সাবধানে থাকা উচিত। আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়ের ক্ষেত্রে আরও একটু বেশি, কারণ এতে শরীরের উপর একটু বেশি চাপ পড়ে। এঁদের তাই আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়ের ক্ষেত্রে 'ধীরে চলো' নীতি মেনে চলা উচিত। সোজা কথায়, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে কিছু না করাই ভাল।

## কী কী প্রয়োজন?

আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়ের মজা এখানেই। মেশিনপত্র, জিম সেট-আপ— কিছুই লাগে না। এমন অনেক ধরনের এক্সারসাইজ় রয়েছে, যেগুলো আপনি বাড়িতেই, এমনকী বিছানায় বসেই স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। এই কারণেও যাঁরা বয়স্ক মানুষ, সার্জারি হয়েছে, তাঁদের জন্য এই শরীরচর্চা খুব কাজের জিনিস। কেউ চাইলে ওয়েট নিয়েও আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় করতে পারেন। আবার না করলেও ক্ষতি নেই। কিছু কিছু এক্সারসাইজ়, যেমন প্ল্যাঙ্ক বা স্কোয়াট নিজেরাই করতে পারবেন। তবে যদি কোনও নির্দিষ্ট মাসল গ্রুপকে স্ট্রেংথেন করার জন্য আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়

চিত হয়ে শুয়ে হাতদুটো দু'পাশে আর পায়ের পাতাদুটো মাটিতে রাখতে হবে। এবার পায়ের পাতা মাটিতে রেখেই হিপ উপরে তুলতে হবে। গ্লুট ব্রিজ বা হিপ ব্রিজ বলা হয় একে।

করতে চান, তখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লাগবে। কোন মাসলের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরনের এক্সারসাইজ় তাঁদের করা উচিত, সেই শরীরচর্চার সঠিক পদ্ধতি কী, কোন অঙ্গের মুভমেন্ট কীভাবে হবে, কোন অ্যাঙ্গলে হবে— এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞই তাঁদের সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

## বাড়িতে করার জন্য

কয়েকটা সহজ শরীরচর্চার উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে যে, কীভাবে আপনি বাড়িতেই আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় করতে পারেন। দেখবেন, এই এক্সারসাইজ়গুলো আপনাদেরও একেবারে অচেনা নয়!

**প্ল্যাঙ্ক:** কোর স্ট্রেংথেনিং, স্পাইন মাসল, গ্লুট মাসল এবং হ্যামস্ট্রিং মাসলকে শক্তিশালী করার জন্য প্ল্যাঙ্কের তুলনা নেই। যাঁরা সবে সবে শরীরচর্চা শুরু করছেন, তাঁরা ফোরআর্ম প্ল্যাঙ্ক করতে পারেন— যেখানে উপুড় হয়ে শুয়ে বডি ওয়েটটা দেওয়া হয় পুরো ফোরআর্ম, অর্থাৎ হাতের উপরের অংশে। বারপাঁচেক ফোরআর্ম প্ল্যাঙ্ক করলে একটা সেট সম্পূর্ণ হয়। তারপর ধীরে ধীরে ফুল প্ল্যাঙ্কে যেতে পারেন। যদি শোল্ডার স্ট্রেংথ বা অবলিক স্ট্রেংথ বাড়াতে চান, সাইড প্ল্যাঙ্ক করতে পারেন।

**গ্লুট ব্রিজ:** চিত হয়ে শুয়ে হাতদুটো দু'পাশে আর পায়ের পাতাদুটো মাটিতে রাখতে হবে। এবার পায়ের পাতা মাটিতে রেখেই হিপ উপরে তুলতে হবে। এই এক্সারসাইজ়কে হিপ ব্রিজ-ও বলা হয়। বাট মাসলকে শক্তিশালী করার জন্য খুব ভাল।

**ভি-সিট:** শরীরের মাঝখানের অংশ, অ্যাবস ভাল রাখার জন্য এই এক্সারসাইজ়ের জুড়ি মেলা ভার। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে, হাত পিছনে রেখে বসুন। এবার 'কোর এনগেজ' করে, হিপ লিফট করুন। তারপর হিপ মেঝের উপর নামিয়ে, ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গলে পিছনে হেলে যান ধীরে ধীরে। পা দুটোকে সামনে তুলুন, যাতে শরীরটা ভি-এর মতো দেখতে লাগে। কিছুক্ষণ ধরে রেখে, নামিয়ে নিন। ১০-১৫ বার পরপর করুন।

এ ছাড়া রিভার্স প্ল্যাঙ্ক বা ওয়াল হ্যান্ডস্ট্যান্ডও খুব ভাল আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়। এখন শরীরচর্চার বিভিন্ন অনলাইন টিউটোরিয়াল পাওয়া যায় সহজেই। বুঝতে অসুবিধা হলে, এই বেসিক এক্সারসাইজ়গুলোর ক্ষেত্রে টিউটোরিয়ালেরও শরণ নিতে পারেন। চোখের সামনে কাউকে এক্সারসাইজ়টা করতে দেখলে, বুঝতেও সুবিধা হবে।

## নির্দিষ্ট ডায়েট প্রয়োজন?

আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়ের পুরো সুফল পেতে গেলে নির্দিষ্ট কোনও খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে হবে— এ রকম কোনও ব্যাপার নেই। সুস্থ এবং তরতাজা থাকতে গেলে, শরীরচর্চার পাশাপাশিই সাধারণভাবে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত। চিনি খাওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করতে পারলে খুব ভাল। জাঙ্ক ফুড নৈব নৈব চ! কিন্তু তা বাদে আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় করলে এটা আপনি খেতে পারবেনই না বা ওটা খেতে হবেই, এমন কোনও নিয়ম নেই।

## নামে কঠিন, কাজে সহজ

বুঝতেই পারছেন, 'আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ়' নামটা যতটা কঠিন, ব্যাপারটা ততটাই সহজ। এর জন্য না লাগে জিম, না কোনও যন্ত্রপাতি, না বিশেষ কোনও ডায়েট! অথচ মাসলের ক্ষমতা বাড়াতে এই শরীরচর্চার জুড়ি নেই। আপনি অ্যাথলিট হোন, বয়স্ক কোনও মানুষ হোন বা সাধারণভাবে ফিট থাকতে চান— আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ় আপনার কাজে আসবেই!

**যোগাযোগ:** info@kuldepsethi.com
**ছবি** (প্রতীকী): আইস্টক

ফ্যাশন ৪
অরণ্যের অনন্য আবেদন
কোথাও পোশাক জুড়ে ফুল,
লতাপাতার প্রিন্ট আর মোটিফ,
কোথাও উজ্জ্বল রঙের প্রাচুর্য।
সাজসজ্জা থেকে স্টাইলিং,
সবেতেই বন্য প্রকৃতির উন্মত্ততা।
অরণ্যের অনুপ্রেরণায় সাহসী হয়ে
ওঠার অঙ্গীকার...

নুডল স্ট্র্যাপ দেওয়া টিল ব্লু লং ড্রেস। একই রঙের হালকা শেডে পাতার মোটিফ জামা জুড়ে। কনট্রাস্টিং মেক-আপে স্বতন্ত্র সাজ। (বাঁদিকের পাতা)

পোশাক: রিমি নায়ক
ফোন: ৯৮৩১২১৬৭৬০
ইয়ারিং: করিশ্মাজ়

জামরঙা জংলি ফুলের মোটিফ কো-অর্ড সেটে। সঙ্গতে ব্ল্যাক হিল বুটস আর ডিফাইন্ড আই মেক-আপ। চাহনিতে শিকারির তীক্ষ্ণতা।

পোশাক: রিমি নায়ক
ওয়েবসাইট:
www.riminayakindia.com
গয়না: আঁকিবুকি অদিতি,
ফোন: ৯৭৪৮৪৬১১০৫

কালো শর্ট ড্রেসে
ভিন্টেজ ফ্লোরাল
প্রিন্ট। ড্রেসের
হেমলাইনে
মাল্টিকালার্ড ফ্রিঞ্জ।
টিম-আপ করা
হয়েছে এজি লেদার
বুটসের সঙ্গে।

পোশাক: সাস্যা
ফোন: ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩

পেস্তারঙা ব্রালেট টপের সঙ্গে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফ্লোরাল প্রিন্টেড ঢিলে ট্রাউজ়ার্স। জ্যাকেটের জমকালো প্রিন্টও নজর কাড়ে।

পোশাক: রিমি নায়ক
গয়না: করিশ্মাজ়, গোলপার্ক

জর্জেটের কালো
বডিকন ড্রেস।
আপারবডি জুড়ে
উজ্জ্বল রঙের ফ্রিলস।
এমন পোশাকে
স্ট্যান্ড আউট করতে
আত্মবিশ্বাসই
শেষ কথা!

পোশাক: লেবেল
মেঘা গর্গ
ইয়ারিং: অ্যাডরস
জুয়েলরি,
ফোন: ৮৯৮১০১১৯৮৭

কালো ক্রপড ব্লাউজ়ে জংলা ফুলের প্রিন্ট। বৈপরীত্য এনেছে ক্রোম অলিভ চেকড শর্টস্কার্ট। বোল্ড অ্যান্ড ব্যাডাস।

পোশাক: লেবেল মেঘা গর্গ, ফোন: ৯৮৩০৪৮৮২৮২
ইয়ারিং: অ্যাডরস জুয়েলারি
ব্যাঙ্গল: আঁকিবুকি অদিতি

সাদা লং ড্রেসে হলুদ-সবুজে ফুল-পাতার মোটিফ। পাফড স্লিভসে টাই-আপের ডিটেলিং। বাড়তি আবেদন যোগ করেছে পিঠের অভিনব কাট।

**পোশাক: রিমি নায়ক**
**গয়না: অ্যাডরস জুয়েলরি**

ওয়ান শোল্ডার পার্পল শর্ট ড্রেস, সঙ্গে ট্রেল। হাতা এবং নেকলাইনে অ্যাপ্লিক করা ফ্যাব্রিক ফ্লাওয়ার্স। রঙের তীব্রতা সত্যিই চোখে পড়ার মতো!

পোশাক: লেবেল মেঘা গর্গ
রিং: করিশ্মাজ়, গোলপার্ক
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭

ক্যানভাস জুড়ে সবুজের বিপ্লব! চিরতরুণ প্রকৃতির প্রেক্ষিতে ব্রাইট গ্রিন স্লিভলেস প্যান্টসুট। স্মার্ট, স্টাইলিশ এবং সেনশুয়াল।

পোশাক- সাস্যা
ব্যাঙ্গল: আঁকিবুকি অদিতি
ইয়ারিং: অ্যাডরস জুয়েলরি

পরিকল্পনা: সায়নী দাশশর্মা
শুটিং কোঅর্ডিনেশন: মৌমিতা সরকার
রূপায়ণে: পিয়ালী বালা

মডেল: জুহি, দময়ন্তী, প্রিয়ঙ্কা
ছবি: সোমনাথ রায়
মেক-আপ ও হেয়ার: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: দীপশিখা রায়
শুটিং লোকেশন: ইকো হাব, মিউ টাউন, কলকাতা
ফোন: ০৩৩ ৪০৩১৯০০০
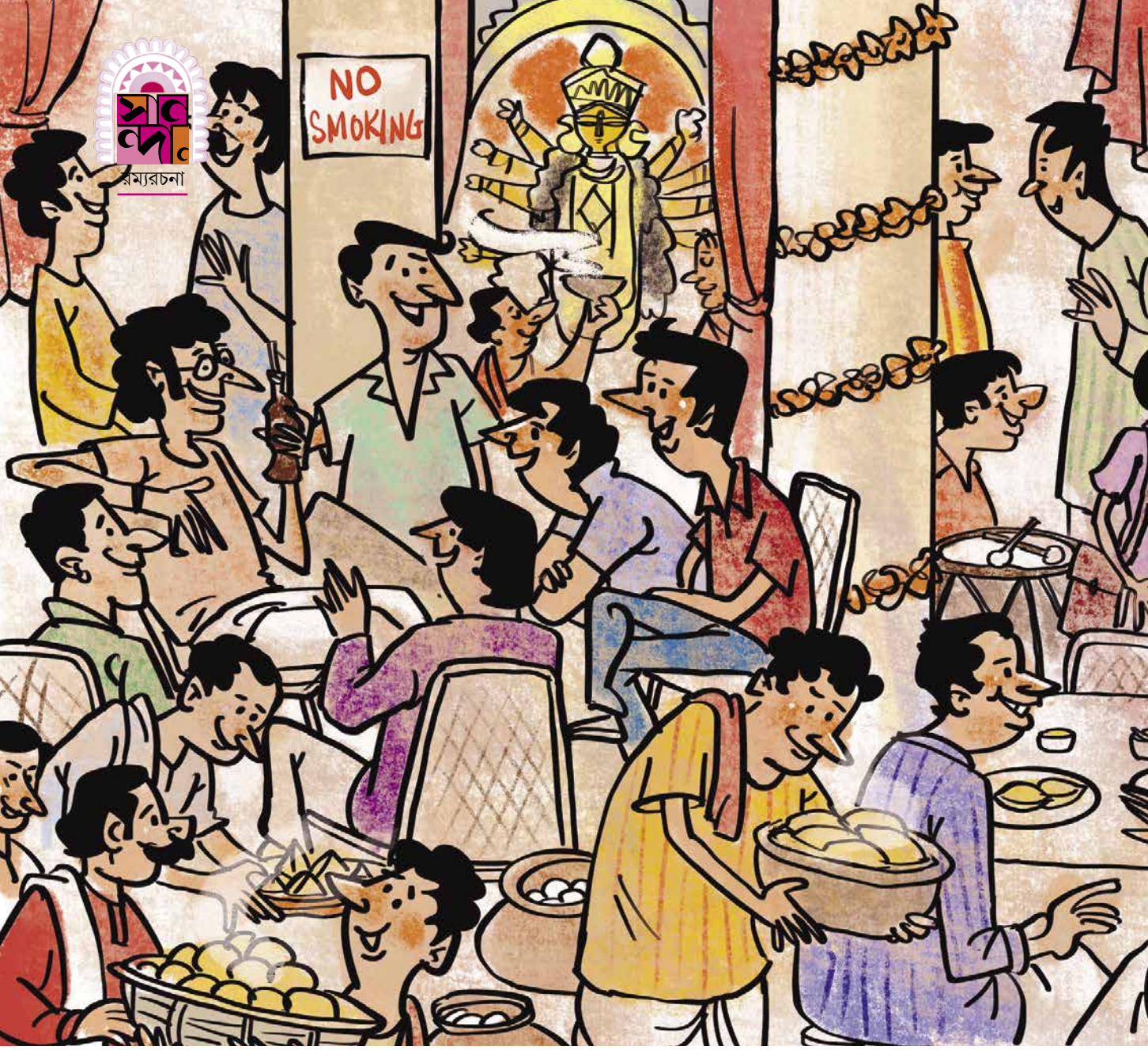
# বিগত দশকের শারদীয়া

আর সব কিছুর মতোই, সময়ের হাত ধরে উৎসবের চিরন্তন রীতিনীতিতেও বিস্তর বদল এসেছে গত এক দশকে। সেই সব পুরনো স্মৃতি ফিরে দেখলেন সায়নী দাশশর্মা।

অন্তত তিরিশটা বসন্ত যাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, এখনকার পুজো তাঁদের শৈশবে দেখা পুজোর চেয়ে ঠিক কতটা আলাদা, তাঁরা ঢের জানেন। আমার অবিশ্যি সেই বোধোদয় সম্প্রতিই হয়েছে। মূলত দু'টি কারণে। এক, জীবনের তিরিশ নম্বর বসন্তটির সঙ্গে আমার সদ্যই পরিচয় হয়েছে, আর দুই, কলকাতায় আঠাশটা পুজো কাটানোর পর সম্প্রতি বুঝেছি, দেশের সীমানার বাইরে পুজো কতটা অন্যরকম হতে পারে! আসলে হয়েছে কী, বিবাহসূত্রে কলকাতার মাটি ছেড়ে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী দূরে এসে পড়েছি গত দু'বছর হল। প্রথম বছরটা (যেটা কলকাতায় আমার উনত্রিশ নম্বর পুজো হলেও হতে পারত) ভাইরাসের ত্রাসে আশেপাশের ঝিল-নদী-নালা দেখেই কেটে গিয়েছে। বহুবার নাকে-কানে সরষের তেল দেওয়ার পরও পুজোর গন্ধ বা ঢাকের

বাদ্যি, কিছুই টের পাইনি। গোটা শহরে যে ক'টা লোকের বাস, কলকাতার যে কোনও পুজো মণ্ডপে একটা সন্ধেবেলাও তার চেয়ে বেশি ভিড় হয়। বছরের অন্যান্য সময় এত নৈঃশব্দ্য, এত শূন্যতা যাও বা মেনে নেওয়া যায়, পুজোর ক'দিন তা রীতিমতো অত্যাচার! সেই বছরই তাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, কলকাতায় হোক বা প্রবাসে, আগামী বছর পুজো আমি দেখেই ছাড়ব! শত হোক বাঙালি তো, ছোট থেকে শুনে বড় হয়েছি, দুর্গাপুজোয় প্যান্ডেলে পা না রাখলে ঠাকুর দুঃখ পান এবং খুব রাগও করেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে তাঁকে রাগাতে সাহস হল না। উপরন্তু একবার আমার জাঁদরেল প্রবাসী খুড়শ্বশুর ভীমনাগের সন্দেশে কামড় বসাতে বসাতে ভুরু নাচিয়ে বলেছিলেন, "এখানের দুর্গাপুজো দেখলে না দেশের পুজো-টুজো একদম ভুলে যাবে!" সেই থেকে আমার কৌতূহল আরও বেড়েছে। সেদিনই টের পেয়েছিলাম, পুজোর নিদ্রাহীন শহর, আলো ঝলমলে দিনরাত, অলিতে গলিতে রঙিন কাপড়ে মোড়া প্যান্ডেল, ঢাকের আওয়াজ, এসব তো বটেই, এমনকী পোস্টারময় রাস্তাঘাট, ভিড়ভাট্টা, লোকের চেঁচামেচি এবং ততোধিক জোরে মাইক, এসবের কদরও অন্য দেশের জল-হাওয়ায় তরতরিয়ে বাড়ে। বাঙালি মনের সেই সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, এই আশা নিয়েই গত বছর প্রবাসের পুজোয় বুক বেঁধেছিলাম। আর গোল বাধল সেখানেই। খুড়শ্বশুরের বাণী ফলল ঠিকই, কিন্তু উলটো হয়ে। ইউক্রেনিয়ান চার্চে দাঁড়িয়ে বোধনের উপাচার দেখতে দেখতে এক নিমেষে ফিরে গেলাম শৈশবের পুজোর দিনগুলোতে। প্রবাসের পুজোর অভিজ্ঞতা অন্য কোনওদিন নিশ্চয়ই শোনাব। আজ সেই পুরনো দিনের কথাই বলি বরং...

খুব ছোটও নই তখন, বয়স দুই অঙ্কের সারিতে ঢুকে পড়েছে ততদিনে। সেই সময়টায় পুজোর শুরু হত প্রায় মাসদুয়েক আগে থেকে, পুজোর শপিং দিয়ে। পুজোর জামাকাপড় কেনা তখন এক সাংঘাতিক ব্যাপার! কারণ, সারাবছরে ওই একবারই ভাল জামাকাপড় জুটত কপালে। এখনকার মতো তো আর মোবাইলের স্ক্রিনে আঙুল ছুঁইয়ে বাড়িতেই শপিং মল তুলে আনার উপায় ছিল না তখন। কেনাকাটা করতে ছুটতে হত নিউ মার্কেট কিংবা গড়িয়াহাটে। দোকানে দোকানে ঘুরে দীর্ঘক্ষণ ঝাড়াই-বাছাই করার পর যদি কিছু পছন্দ হয়, তাকে আবার এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ অবধি ধরে, ঝুল মেপে, পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ করে তারপর বিল করতে বলা হত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝার উপায় থাকত না, ঠিক কোন জামাটা ফেরার পথে সঙ্গী হবে। অনলাইন শপিংয়ে এইসব উত্তেজনা আর কোথায়! মনে পড়ে, অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের বেশিরভাগ শনি-রবিবারগুলোই এভাবে কাটত। তাছাড়া শুধু নিজের জামাকাপড় তো নয়, মাসির ছেলে, পিসির শাশুড়ি, জ্যাঠার জামাই... সকলের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকত। উলটোদিক থেকেও উপহার জুটত। কোনওবার নতুন জামার সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে বেশি হলে, বন্ধুদের গিয়ে কলার উঁচু করে বলে আসতাম। তাদের জন্যও অবশ্য উপহার থাকত। চুলের ক্লিপ, কানের দুল, টিপের পাতা, স্কুলে পুজোর ছুটি পড়ার আগের দু'দিন পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গী হত এগুলো, বন্ধুদের পুজোর গিফ্ট হিসেবে। যে ঠিকানায় থাকতাম, তার পিনকোডে 'কলকাতা' লেখা থাকত ঠিকই, তবে সেই পাড়ার পুজোকে কলকাতার পুজো বলা যায় কিনা, জানি না। কলকাতার পুজো বলে যে আলাদা কোনও পুজো হয়, তা-ই তো তখন জ্ঞানের সীমানার বাইরে। তখনকার পুজো, অন্তত কলকাতার আশেপাশের এলাকাগুলোতে পুজো তখন পাড়া-সর্বস্ব। একটা কমিটি ঠিক করা থাকত পুজোর। সারাবছর মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেও পুজোর মিটিংয়ে ঠিক গলা জড়াজড়ি করে চলে আসতেন সকলে। ষষ্ঠী থেকে দশমী, পুজোর সব আচার-অনুষ্ঠানের দায়িত্বও নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিতেন। ওই পাঁচ-ছ'দিন এক-একটা পাড়া এক-একটা পরিবারে পরিণত হত যেন। ছোট্ট একটা টেম্পো গাড়ি ভাড়া করা হত পঞ্চমীর রাতে। তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে বাবা-কাকু বা জেঠুর সঙ্গে হুটোপুটি করে তাতে উঠে পড়তাম সবাই। প্রতিমা আনার সে কী উত্তেজনা! যদিও প্রতিমার মুখ আড়াল করা থাকত খবরের কাগজে। আমরা উঁকিঝুঁকি মেরে মুখ দেখার চেষ্টা করলে বড়রা বলতেন, "ঠাকুরকে বিরক্ত করো না, বিশ্রাম নিতে দাও।" সেই রাতটুকুর জন্য তাঁর স্থান হত আধগড়া মণ্ডপে। এখন যেমন রথের পরে-পরেই বেশিরভাগ পাড়ায় খুঁটিপুজোর আয়োজন করা হয়, তখনকার দিনে এসবের নামগন্ধ ছিল না। যদিও আমাদের বা আশেপাশের পাড়াগুলো এসব ব্যাপারে একটু বেশিই উদাসীন ছিল কিনা, তা জোর দিয়ে বলতে পারি না। ঠিক চতুর্থীর দিন বাঁশে ভর্তি একটা ম্যাটাডর আসত পাড়ার মোড়ে, ষষ্ঠীর সকালের মধ্যেই দেখতাম দিব্যি রঙিন কাপড়ে সেজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মণ্ডপ। লাস্ট মিনিট টাচ-আপ যদিও চলত প্রায় অষ্টমীর সকাল অবধি। একদিকে অঞ্জলিতে মায়ের পায়ে ফুল পড়ছে, অন্যদিকে মণ্ডপের বাইরে তখনও বিশ্বকর্মারা পেরেকের ঠুকঠাকে ব্যস্ত। তবে তাদের থেকেও বেশি যদি কেউ ব্যস্ত থাকত, তা ছিল বাজারের মোড়ের কচুরির দোকানগুলো। অষ্টমীর রাতে দেশপ্রিয় পার্কে যদিও বা ঢোকা সম্ভব, অষ্টমীর সকালে কচুরির দোকানে

কোনওভাবেই প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তবে বাবা-কাকারা কীভাবে যেন সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলতেন। কচুরি-জিলিপি দিয়ে জলখাবারের পর্ব চুকিয়ে আবার সবাই এসে হাজির হতাম মণ্ডপে। পুজোর চারদিন বেশিরভাগ সময়টা সেখানেই কাটত। বাড়ি তখন স্রেফ রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই! দিনভর মণ্ডপে বসে বসে পুজোর রীতি-রেওয়াজ হাঁ করে গিলতাম পাড়ার বন্ধুরা। কারও বাড়িতে মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনরা এলে, তারাও যেন কীভাবে আমাদের বন্ধু হয়ে যেত ওই ক'দিনের জন্য। তখনও মোবাইল নামক বস্তুটির সঙ্গে আলাপ হয়নি কারওর। তার বদলে হাতে হাতে ঘুরে বেড়াত ক্যাপ-বন্দুক। এই খেলনাটির প্রতি কেন জানি না ছেলে-মেয়ে সকলেরই অমোঘ আকর্ষণ ছিল তখন। ক'দিনের জন্য ওটাই পাড়ার ডানপিটে বাচ্চাদের মুখ্য অস্ত্রে পরিণত হত। সারাবছর যে কাকু-জেঠুরা বাড়িতে নালিশ করতেন, সুযোগ পেলেই তাঁদের আশেপাশে গিয়ে বন্দুকের কলে চাপ দিত তারা। যদিও পুজো বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব দুষ্টুমি মাফ হয়ে যেত। ঠাকুর দেখতে যাওয়া হত সন্ধেগুলোয়। যে সময়টার কথা বলছি, তখন ষষ্ঠী-সপ্তমী অবধিও বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় মণ্ডপ ঘোরা যেত। এখন যেমন মহালয়ার আগে থেকেই লোকে মণ্ডপে বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে আসে, তখন সেসবের বালাই ছিল না। কারণ অন্য পাড়ার পুজোর চেয়ে নিজের পাড়ার পুজো দেখার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি। কোনও কোনও দিন অবশ্য আশেপাশের মণ্ডপ পরিক্রমায় বেরতাম বন্ধুরা মিলে। তবে তারও নির্দিষ্ট লক্ষণরেখা ছিল। সীতা লক্ষণরেখার বাইরে বেরিয়ে রাবণের খপ্পরে পড়েছিলেন। ছোটবেলায় রামায়ণের সেইসব পর্ব গুলে খেয়েছিলাম বলেই হয়তো কোনওদিনও ওই লক্ষ্মণরেখা পেরনোর সাহস হয়নি।

নবমীর দিনটা আমাদের পাড়ায় খাওয়াদাওয়ার বেশ একটা হিড়িক পড়ত। পুজোর তহবিল থেকে কিছু টাকা খরচ করে সকলকে খাওয়ানো হত ওইদিন। কোনওবার খিচুড়ি-ছ্যাঁচড়া, কোনওবার 'ফ্রাইড্রাইস' (এই উচ্চারণটা যে ভুল, তা অনেক পরে জেনেছি) আর চিলি চিকেন। বেশ একটা একান্নবর্তী পরিবারের মতো অনুভূতি হত ওইদিন। পাড়ার দাদা-কাকারাই খাবার পরিবেশন করতেন। এক কোণ থেকে পরপর ধেয়ে আসত খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি, পায়েসের বালতি। অন্য প্রান্তে পায়েস পৌঁছতে পৌঁছতে এপ্রান্ত থেকে পাতা গোটানো শুরু। পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা পরে গেলে যেমন লাস্টবেঞ্চের ছাত্রছাত্রীদের লেখার গতি বেড়ে যায়, ঠিক তেমনই পাতা তোলার সময় এলেই সকলের খাওয়ার গতিও বেড়ে যেত এক ধাক্কায়। নবমীর রাতে অনেকসময় পাড়ায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। শাঁখ বাজানো, উলু দেওয়া, শাড়ি পরা ইত্যাদি। যাঁরা জিততেন, তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হত বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে। বিসর্জনের পর ওই একটা অনুষ্ঠানের দিকেই চাতক পাখির মতো সকলে তাকিয়ে থাকতাম। অবশ্য আরও একটা রেওয়াজ ছিল, যার জন্য দশমীর মনখারাপ একটু হলেও কম অনুভব করতাম। বিজয়ার প্রণাম। প্রতিমা জলে পড়েছে কি পড়েনি, পুকুরপাড় থেকেই (ছোট পাড়া বলে আশেপাশের পুকুরেই ঠাকুর বিসর্জনের চল ছিল) শুরু হত প্রণামের ধুম! এত শ্রদ্ধা আর জীবনে কোনওদিন কাউকে দেখিয়েছি কিনা সন্দেহ! কাকু, জেঠু, মাসি, পিসি, যাকেই সামনে পেতাম, সক্কলকে পেন্নাম করা চাই-ই! কারণ একবার পায়ে হাত ছোঁয়ালে নাড়ু, মোয়া বা নগদ টাকা (আত্মীয় বা দাদু-দিদার থেকে), কিছু একটা প্রাপ্তি ঘটতই। এমনিতে লক্ষ্মীপুজো অবধি স্যার-ম্যাডামদের বাড়ির ছায়াটুকুও মাড়াত না কেউ। কিন্তু বিজয়ার প্রণাম পৌঁছে যেত তাঁদের বাড়িতেও। কেউ ভালবেসে মিষ্টি-রোল-চাউমিন খাওয়াতেন, কেউ ভূরিভোজের আয়োজন করতেন। এই টুকরো টুকরো প্রথাগুলোই এক হয়ে পুজোর সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা গোটা প্রজন্মের কাছে। আজ সেই পাড়া-সংস্কৃতিও প্রায় নেই, আর সেই নিবেদিতপ্রাণ পুজো ভক্তদের সংখ্যাও কমে এসেছে। শুধু রয়ে গিয়েছে পুরনো দিনের ছবিগুলো। স্মার্টফোনের ক্যামেরায় সেই সব ছবি তুলে রাখা হয়নি বলেই হয়তো আজও সেগুলো মনের মেমরিকার্ডে সযত্নে তুলে রাখা আছে...

**অলংকরণ:** রৌদ্র মিত্র

# গায়ক

## সিজার বাগচী

ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। অর্ণবের সেদিকে হুঁশ নেই। ওর চোয়াল শক্ত। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা বাষ্প প্রবলভাবে চাপছে। মৌসুমি তুলো দিয়ে অর্ণবের কপালের কেটে যাওয়া জায়গার রক্ত মুছতে-মুছতে সেই ঠোঁট দেখতে পেল। তুলোয় ওষুধ ঢেলে সেখানে লাগাল। ওষুধ ছোঁয়াতেই ঠোঁটে জ্বালা করে উঠল। অর্ণব আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কেঁদে ফেলল।

মৌসুমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "কাঁদিস না। কেন যাস ওই সব করতে?"

অর্ণব ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, "আমার কী দোষ? শুধু তো গান গাইতে চেয়েছিলাম..."

দীর্ঘশ্বাস চাপল মৌসুমি। কড়া কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। অর্ণবের গলায় সুর নেই। গান বলে ও যা করে সেটা হেঁড়ে গলার চিৎকার ছাড়া আর কিছু নয়। তবু ওর অদম্য জেদ। কেবল গাইতে চায়। কোনও ছোটখাটো আসর হোক কিংবা পাড়ার অনুষ্ঠান, অর্ণব ল্যাং ল্যাং করে হাজির। মৌসুমি অনেক বুঝিয়েছে। এই ব্যাপারে অর্ণব ছেলেমানুষ। কিছুতেই বুঝতে চায় না। বরং ভুলভাল যুক্তি দিয়ে নিজের না-পারাকে আড়াল করে।

মাঠের এদিকটা আলোছায়া। শীতকাল। হিম পড়ছে। ঘাস ভিজে। মৌসুমি সেই ভিজে ঘাসে বসে কিছুক্ষণ অর্ণবকে জড়িয়ে থাকল। ঠান্ডায় শরীর কেঁপে উঠছে। তবু নড়ল না। অর্ণব কাঁদছে। কাঁদুক। হালকা হবে। যা ধাক্কা আজ খেয়েছে, খুব কমজনই এমন ধাক্কা খায়। হঠাৎ ওর সব রাগ গিয়ে পড়ল শুভেন্দুদের উপর। কী দরকার ছিল ছেলেটাকে টেনে হিঁচড়ে মঞ্চ থেকে নামানোর? মাইক্রোফোন অফ করে দিলেই হত। অর্ণবের পক্ষে আর গান গাওয়া সম্ভব হত না। তার চেয়ে বড় কথা, কী দরকার ছিল ওকে মঞ্চে তোলার? শুভেন্দুরা কি জানে না অর্ণব কেমন গান গায়? সব জানে। তা হলে? মজা? তাই হবে। অর্ণবকে যখন টানতে-টানতে নীচে নামানো হচ্ছিল, তখন দর্শকদের মধ্যে সে কী হুল্লোড়! যেন সার্কাস চলছে। একজন তো চায়ের ভাঁড়ও
ছুড়ে মেরেছিল।

মৌসুমির কাঁধে মাথা রেখে অর্ণব ফুঁপিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ওর মায়া হল। কিছু তো করার নেই। অর্ণবকে ঘা খেয়ে বুঝতে হবে, গান ব্যাপারটা ওর জন্য নয়। তা ছাড়া মৌসুমি বহুদিন বুঝিয়েছে, "যদি গান গাইতেই চাস, আগে তালিম নে।"

অর্ণব তাতেও রাজি নয়। কিশোরকুমার কি গান শিখেছিলেন? এমন হাজার যুক্তি ও অহরহ দিয়ে থাকে।

এবার মাথা তুলল অর্ণব। জোরে নাক টানল। বলল, "আজ যে ছেলেগুলো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নামাল, একদিন দেখবি তারাই আমার পিছু-পিছু ঘুরছে।"

এ কথার জবাব হয় না।

মৌসুমি তাই শান্ত গলায় বলল, "বাড়ি যা। অনেক রাত হল। কাকিমা চিন্তা করবে।"

অর্ণব তাতে আমল দিল না। বলল, "এই খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে নিজে চ্যালেঞ্জ দিলাম..."

খারাপ কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল মৌসুমি। যে ছেলে একটু আগে মার খেয়েছে, সবার সামনে অপমানিত হয়েছে, তাকে নতুন করে আঘাত দিয়ে কী হবে? কথা ঘোরাতে ও বলল, "একা ফিরতে পারবি?"

মাথা নাড়ল অর্ণব। পারবে।

মৌসুমি উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি অর্ণবও। দু'জন পায়ে-পায়ে বড় রাস্তার দিকে হাঁটা দিল। সেখানে পৌঁছে মৌসুমি চলল এক দিকে। অর্ণব আর এক দিকে। খানিক গিয়ে ও পিছন ফিরে তাকাল। অন্ধকারে মৌসুমি হেঁটে যাচ্ছে। সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকল। অর্ণব জানে, সারা পৃথিবী ওকে ছেড়ে গেলেও এই মেয়ে যাবে না। সেই ক্লাস সেভেন থেকে দু'জনের সম্পর্ক। এখন তো ওরা এমএ পাশ করে ফেলেছে।

জোরে নিশ্বাস ছেড়ে অর্ণব এবার নিজের বাড়ির দিকে পা চালাল। দূরে অনুষ্ঠানের মঞ্চে এক কিশোরকণ্ঠী গেয়ে চলেছে, 'ম্যায় শায়ের বদনাম/ ও ও ও ম্যায় চলা...'

## ২

খোঁজ আনল মৌসুমিই। সেদিন দু'জনে উত্তরপাড়ার সাধুর ঘাটে বসে। আজ ঘাটে ভাল ভিড়। অর্ণব-মৌসুমি এক কোণে জায়গা পেয়েছে। মৌসুমি বলল, "সিঙ্গিং স্টার অ্যাপের কথা জানিস?"

"না। এটা কি কোনও কনটেস্ট?"

"উঁহু। গান গাইবার অ্যাপ। মোবাইলেই আছে। প্লে স্টোরে। ডাউনলোড কর। তোর কাজে আসবে।"

অবাক হল অর্ণব। বলল, "গান গাইবার অ্যাপ? সেটা কী?"

"সুদীপ্তাকে মনে আছে?"

"আছে। মোটা করে। কালো..."

"সুদীপ্তার সঙ্গে আজ কলেজ স্ট্রিটে দেখা। ও এখন চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে। পাশাপাশি গান গাইছে। অ্যাপে। ওটা একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মতো। নিজের গান পোস্ট করতে পারবি। দেখবি, সারা পৃথিবী তোর গান শুনছে।"

অর্ণবের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, "সারা পৃথিবী!"

"ইয়েস।"

"কিন্তু আমি কলেজ ক্যান্টিনে সুদীপ্তার গান শুনেছি। গলায় কোনও সুর নেই। সেই মেয়ের গান সারা পৃথিবী শুনছে!"

"ওই অ্যাপের সবচেয়ে বড় সুবিধে কী জানিস? ওখানে তোর সুর কারেকশন করে দেওয়া যাবে। যদি ভুল সুরে গান করিস, অ্যাপই সেটা ঠিক করে দেবে। তা ছাড়া কারাওকে আছে।"

অর্ণব ধড়ফড় করে উঠে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। প্লে স্টোরে গিয়ে সিঙ্গিং স্টার খুঁজে বের করা কঠিন হল না। ঘাটে বসেই ও সেটা ডাউনলোড করে নিল। বলল, "চল, আজ উঠি। বাড়ি গিয়ে এটাকে কাল্টিভেট করতে হবে।"

মৌসুমি বাধা দিল না। অর্ণব যে অ্যাপের খোঁজ পেলে এমন করবে, ও জানত। সুদীপ্তার কাছ থেকে গল্পে-গল্পে এই অ্যাপের কথা জেনে ও প্রথমে অবাক হয়েছিল। তারপর উশখুশ করছিল কতক্ষণে অর্ণবকে কথাটা বলবে। আগের দিন অর্ণবের মার খাওয়া ওকেও গভীরভাবে ধাক্কা দিয়েছে।

অনেকের অনেক স্বপ্ন থাকে। কিছু পূরণ হয়। বেশিটাই হয় না। তবু সেই সব মানুষজনেরা নিজের ভেতরে সেই স্বপ্নকে চেপে রেখে দেয়। হয়তো কাছের জনদের কিছু জানায়। কেউ-কেউ আবার সেটা পারে না। সবার কাছে বলে বেড়ায়। অর্ণব হল দ্বিতীয়দের দলে। হয়তো ছেলেটার গানের গলা নেই। তাই বলে ওর আবেগ তো ভুল নয়। সেই জন্য মৌসুমির এমন খারাপ লাগা। কারও দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে মঞ্চে তুলে হেনস্থা করা খুব বাজে কাজ। এই অ্যাপ যদি সত্যিই অর্ণবের গলা সুরে ফেলে দেয়, তা হলে ছেলেটার সেদিনের আঘাতের উপর একটা প্রলেপ পড়বে।

দু'জনে দ্রুত ঘাট থেকে বেরিয়ে এল। অর্ণব হাঁটা দিল বালির দিকে। চৈতলপাড়ায় ওদের বাড়ি। মৌসুমি এগোল উলটো দিকে। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ স্ট্রিটে ওর বাড়ি।

অর্ণবের বাড়ি ওখান থেকে হাঁটাপথ। তবু যেন রাস্তা ফুরোতে চাইছিল না। প্রায় ছুটতে-ছুটতে ও বাড়িতে ঢুকল। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে অ্যাপ নিয়ে পড়ল। সবটুকু আগে জানা দরকার। সেটা অবশ্য সহজে হয়ে গেল। অর্ণব বুঝল, এটাও এক ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া। প্রথমে নিজের ইমেল আইডি দিয়ে প্রোফাইল খুলতে হবে। তখন দেখা যাবে ওখানে অনেক ভাগ। শাস্ত্রীয় গান, লোকগান, ছবির গান, আধুনিক গান, বিদেশি গান। কোন-কোন ভাগে একজন গান গাইতে চাইছে, সেইগুলোয় ক্লিক করতে হবে। এর পর গান রেকর্ড করা। তবে শুধু কণ্ঠস্বর নয়, চাইলে গায়কের গান গাওয়ার ভিড়িয়োও তৈরি করে দেবে এই অ্যাপ। তা ছাড়া আছে অটো টিউন। কারাওকে। একবার এখানে গান রেকর্ড করলে সব নিজের থেকে হয়ে যাবে। এবার সেই গানকে ওই যে ভাগ কিংবা গ্রুপ তাতে পোস্ট করতে হবে।

সুদীপ্তা ভুল খোঁজ দেয়নি। এক-এক গ্রুপে কয়েক লক্ষ সদস্য। এবং তারা বিশ্বের নানা জায়গায় থাকে। কেউ থাকে মহারাষ্ট্রে, আবার কেউ নিউ জার্সিতে। গ্রুপে একবার পোস্ট হলে সেই গান পৌঁছে যাবে ওই লক্ষ-লক্ষ মানুষের কাছে। কারও গান যদি বেশি মানুষজন শোনে তা হলে পুরস্কারও পাওয়া যাবে। মানে পয়েন্ট। অনেক পয়েন্ট হলে অ্যাপের পক্ষ থেকে গায়ক কিংবা গায়িকাকে টাকা দেওয়া হবে। সেটাও আবার ডলারে।

ঘণ্টাখানেকেই পুরো বিষয়টা অর্ণব ধরে ফেলল। একটা গ্রুপে যোগ দিয়ে গান রেকর্ডও করল খালি গলায়। দেখল, ওর গাওয়া বেসুরো

গান কী অনায়াসে সুরে ফেলে দিয়েছে অ্যাপটা। ভারী আনন্দ হল। এখন আর গান গাওয়া কোনও ব্যাপার নয়। এবার ও চাইলে বিশ্বের যে কোনও গান গাইতে পারবে। অ্যাপ সঙ্গে-সঙ্গে সেটা নিখুঁত সুরে ফেলে দেবে। অনেকটা সেই রিলের ক্যামেরায় ছবি তোলার পর মোবাইলে ছবি তোলার মতো। আগে ছবি তোলা নিয়ে কত ঝামেলা ছিল। এখন পাঁচ বছরের বাচ্চাও খচাখচ ছবি তুলছে।
বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল অর্ণব। মৌসুমির প্রতি অদ্ভুত কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। ওই মেয়ে এমন সাফল্যের রাস্তা খুঁজে বের করেছে। এবার সত্যিই ও পাড়া থেকে আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিজের গান শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। গান গেয়ে রোজগারও করবে। ডলারে।

## ৩

গান রেকর্ডিং শুরু করার আগে অবশ্য অর্ণবকে জোরদার প্রস্তুতি নিতে হল। সেটা করতে ভাল খরচও পড়ল। জমানো টাকা কিছু ছিল। বাকি টাকা দিল মৌসুমি। ছাদের ঘরে ও একটা পুরোদস্তুর রেকর্ডিং স্টুডিয়ো তৈরি করল। মাউথপিস থেকে রেকর্ডার — অনেক কিছু কিনল। জানলাগুলো পাকাপাকি বন্ধ করে দিল। রেকর্ড করার সময় ফ্যান বন্ধ রাখতে হয়। সেটাও খেয়াল করল। না হলে গোঁ গোঁ আওয়াজ চলে আসবে।
এত বছর ধরে অর্ণব নানাজনকে ধরত পাড়া কিংবা কোনও হলের অনুষ্ঠানের জন্য। বাড়িতে এত আয়োজন করার প্রয়োজন পড়েনি। এবার পড়ল।
ছাদের ঘরের গুমোট গরমে এবার ও গান রেকর্ড করতে থাকল। প্রথমে ভেবেছিল কিশোরকুমারের গান গাইবে। তারপর মত পালটাল। একটা লোকগান রেকর্ড করল। সেই গান পোস্ট করার পর অল্প কয়েকজন ভাল বলল। কেউ খারাপ বলেনি। সব পোস্টই প্রশংসার। কোথাও বেশি, কোথাও কম। আরও একটা বিষয় ও দেখল। মন্তব্য করা মানুষজনদের একজন থাকেন নাগপুরে। আর একজন ত্রিবেন্দ্রামে। এত দূর-দূর থেকে লোকেরা ওর গান শুনেছে? অর্ণব উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনটাই তো ও চেয়েছিল। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে। সেটাই হচ্ছে এবার।
মৌসুমি ঠিকই বলেছে, “এখন গ্রাউন্ড ইভেন্ট করার চেয়ে ডিজিটাল ইভেন্ট করা ভাল। তাতে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনো যায়।”
অর্ণব সেই বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনোর রাস্তা পেয়ে গিয়েছে। এখন প্রয়োজন আরও বেশি করে গান পোস্ট করা। তা হলে আরও বেশি-বেশি লোকে ওর গান শুনবে। সেই গান ছড়িয়ে পড়বে চেনা-অচেনা নানা জায়গায়। এর পরের এক সপ্তাহে অর্ণব পুরোপুরি ডুবে গেল গান রেকর্ডিং এবং পোস্ট করায়।
ছাদের ঘরের গরমে ঘামতে-ঘামতে ও সেই সব গান রেকর্ড করত। তারপর রোজ দুটো করে গান তুলত নিজের প্রোফাইলে। সেই গান অনেকে শুনছে। প্রশংসাও করছে। এবারও অর্ণব খেয়াল করল, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের মতো জায়গা থেকে লোকে ওর গানকে তারিফ করছে।
অর্ণবের চোখ এখন সব সময় মোবাইলে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ও দেখতে থাকে, নতুন কী-কী মন্তব্য জমা হচ্ছে ওর গানের নীচে।
শুধু যে নিজের গানে ও চোখ রেখেছে তা ঠিক নয়। পাশাপাশি অন্য গায়কদের গানের দিকেও নজর রেখেছে। অর্ণব লক্ষ করেছে, ভক্তিগীতির চাহিদা বেশি। অতএব ও ইউটিউবে ভক্তিগীতি শুনতে থাকল। ইচ্ছে, ভক্তিগীতি গেয়ে পোস্ট করার।
এর মধ্যে রাস্তায় একদিন শুভেন্দুদের সঙ্গে দেখা। শুভেন্দু তো ওকে দেখেই হাঁক দিল, “আরে বস, কতদিন দেখিনি। নতুন ফাংশন আছে। করবে?”
শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়েছিল অনীক। শুভেন্দুই দোসর। অনীক খিক খিক করে হাসছিল।
অর্ণবের মনে হল একবার মোবাইল বের করে দেখায়, মাত্র কয়েকদিনে কতজন ওর গানের প্রশংসা করেছে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল। এখন নয়। এখনও সেই সময় আসেনি। আগে পয়েন্ট জমুক। ডলার আসুক অ্যাকাউন্টে। তখন শুভেন্দুদের মুখে সেই টাকা ছুড়ে মারা যাবে।
তাই শুভেন্দুর টিককিরির কোনও জবাব দিল না। হনহন করে রাস্তা পেরিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।
কিন্তু অর্ণবের এই সঙ্গীতচর্চায় প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বাবা। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ পাশ করার পর ও ঠিক করেছিল, সরকারি চাকরি পরীক্ষায় বসবে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কিংয়ের পরীক্ষাগুলোয়। সেই মতো প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। বাবার যদিও তাতে সায় ছিল না। ব্যাঙ্কের চাকরিতে কয়েক বছর অন্তর বদলি হতে হয়। নিজের বাড়িতে প্রায় থাকা হয় না। বাবা চেয়েছিলেন, ও পিএইচডি শেষ করে কলেজের চাকরির জন্য চেষ্টা করুক। নিদেনপক্ষে সরকারি স্কুলে চাকরি। অর্ণবের আবার পড়াতে একেবারে ভাল লাগে না। শেষ পর্যন্ত ছেলের মতকে বাবা মেনে নিয়েছেন।
তবে তিনি নজরে রাখেন ছেলেকে। মৌসুমির সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানেন। তাতে তাঁর আপত্তি নেই। মৌসুমি ভাল মেয়ে। কিন্তু অন্য কোনও দিকে অর্ণবের মন যাতে না যায়, সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। ছাদের ঘরে ও যখন রেকর্ডিং স্টুডিয়ো করল, তখন বাবা প্রথমে আপত্তি করেননি। ছেলের গান নিয়ে পাগলামির ব্যাপারে তিনি ওয়াকিবহাল। কিন্তু বিষয়টা যখন সেখানে থামল না, বরং বেড়েই চলল, তখন তিনি নড়েচড়ে বসলেন।
এক সন্ধেয় ডেকে পাঠালেন অর্ণবকে। সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, “কী শুরু করেছিস?”
“কী?” থতমত খেয়ে বলল অর্ণব।
“এখনও বুঝিয়ে বলতে হবে? সাতদিন ধরে বইপত্রের ধারেকাছে যাসনি। অম্বরের টিউশনিতেও যাচ্ছিস না। ব্যাপার কী? বাকি জীবন কি আমার ঘাড়ে বসে খাবি?”
আহত গলায় অর্ণব বলল, “যা করছি, সেখান থেকেও তো রোজগার হচ্ছে...”
“রোজগার হচ্ছে?” বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, “ওই হেঁড়ে গলার গান গেয়ে তুই রোজগার করবি? একটা হারমোনিয়াম দিলে কোনটা ‘সা’ আর কোনটা ‘মা’ বলতে পারবি? আদি স্বরগুলো কী-কী বল তো?”
মাথা হেঁট করে অর্ণব দাঁড়িয়ে থাকল। অস্ফুটে শুধু বলল, “একটাই রিকোয়েস্ট। আমি যে গাইতে পারি না, এই কথাটা প্লিজ় কখনও বোলো না।”
বাবা রেগে গিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। থেমে গেলেন। বরং বললেন, “শোন, আগে পড়াশোনা। তারপর গানবাজনা। পড়া ফাঁকি দিয়ে গান গাইতে দেখলে, ওই সাউন্ড সিস্টেম ফেলে দেব।”
এর পর আর কথা চলে না। অর্ণব নিজের ঘরে এল। বাবার কথাগুলো গলায় ফোটা মাছের কাঁটার মতো ওর মনে খচখচ করছে। কেউ কি বুঝবে না? খুব বেশি কিছু তো চায়নি। চেয়েছে গায়ক হতে। এটা কি বিরাট কোনও চাহিদা?

## ৪

অর্ণব কি ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে?
কিছুদিন ধরে প্রশ্নটা মৌসুমির মাথায় ঘুরছে। প্রায় এক মাস হতে চলল। অর্ণব আর তেমন ফোন-টোন করছে না। মাঝে একদিন বেরোনোর কথা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে অর্ণব সেটা বাতিল করল।

কেন? একটা নতুন গান অ্যাপে আপলোড করতে হবে। সারাদিন লোকাল কেবলের সমস্যা ছিল। ইন্টারনেটে কানেকশন পাওয়া যাচ্ছিল না। গান আপলোড করা যায়নি। বেরোনোর ঠিক আধঘণ্টা আগে কানেকশন এল। অতএব সেই কাজে অর্ণব হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মৌসুমিকে মেসেজ করে শুধু জানিয়ে দিল, 'আজ বেরোতে পারব না।'
কোনও ফোন নয়। কোনও ক্ষমা প্রার্থনা নয়। শুধু এক লাইনের সংবাদ। মৌসুমি তখন প্রায় রেডি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক বোলাচ্ছিল। আচমকা মেসেজ আসায় ও এতটাই হতভম্ব হয়ে গেল যে ধপ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। কী বলবে, কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।
অর্ণবের অবশ্য তাতে তেমন হেলদোল হল না।
এর পর প্রায় মাসদেড়েক বাদে দু'জনে ফের দেখা করল দোলতলা ঘাটে। সেদিন ঘাট ফাঁকা।
মৌসুমি তাই গলা চড়িয়ে বলল, "তুই এবার বাড়াবাড়ি করছিস! গান অনেকেই গায়। গানকে নিজের কেরিয়ার করতেও অনেকে চায়। তাই বলে সারাদিন মোবাইলে মুখ গুঁজে বসে থাকবি?"
"জানিস, আমার গাওয়া একটা হিন্দি ভক্তিমূলক গান উত্তর প্রদেশে ট্রেন্ডিং!" অর্ণব উত্তেজিত হয়ে বলল।
মৌসুমি আরও রেগে গেল। বলল, "তো?"
"তো মানে! আমার গান ট্রেন্ডিং হয়েছে। বলছিস, তো!" এবার অর্ণবও রেগে উঠল।
মৌসুমি দাঁতে দাঁত পিষল। বলল, "সামনে যে পরীক্ষাগুলো আসছে তার কী হবে?"
"বাবার মতো কথা বলিস না," অর্ণব এবার চিৎকার করে উঠল, "পড়াশোনাও করছি।"
"কেমন পড়াশোনা করছিস সেটা পরীক্ষার রেজ়াল্ট বেরোলেই বোঝা যাবে।"
"আমার রেজ়াল্ট নিয়ে মাথা ঘামাস না।"
"আলবাত ঘামাব। তোর রেজ়াল্টের সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে। তুই যতদিন না চাকরি পাবি, ততদিন আমাদের বিয়ে..."
"শোন, আমার এখন বিয়ে করার মুড নেই। আমি গানটাকেই কেরিয়ার করব ভাবছি।"
থমকে গেল মৌসুমি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অর্ণবের দিকে। ছেলেটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? একটা অ্যাপে কয়েকটা গান গেয়ে নিজেকে গায়ক ভাবছে? ওদিকে ওর বাড়িতে বাবা-মা সমানে চাপ দিচ্ছেন। বিশেষ করে মা। পাত্র হিসেবে অর্ণবকে মায়ের একদমই পছন্দ নয়। মায়ের মনে হয়েছে, ওই ছেলে কোনওদিন নিজের পায়ে ভালভাবে দাঁড়াতে পারবে না।
দিন পাঁচেক আগে ছোটমামা একটা সম্বন্ধ এনেছে। পাত্র ডব্লু বি সি এস অফিসার। মৌসুমি কিছু না ভেবে সেই পাত্রকে নাকচ করে দিয়েছে। বাড়িতে এখন সেই নিয়ে ধুন্ধুমার চলছে। ও ভেবেছিল, অর্ণবকে সব বলে একটা রাস্তা খুঁজবে। কিন্তু অর্ণব তো গানের জগতে বুঁদ।
এত বছর ধরে অর্ণবের অনেক ছেলেমানুষি মৌসুমি দেখেছে। কখনও কখনও প্রশ্রয়ও দিয়েছে। কিন্তু এবার আর পারল না। সব কিছুর একটা শেষ থাকে। সেই ক্লাস সেভেন থেকে সম্পর্ক। মৌসুমি কিছুতেই এই সম্পর্কের বাইরে পা ফেলতে চাইছিল না। এবার বুঝল, এই সম্পর্কের ভেতর থাকলে ওর ভবিষ্যৎও অর্ণবের কেরিয়ারের মতো অনিশ্চিত হয়ে যাবে।
নিজেকে শক্ত করল মৌসুমি। বলল, "যা বলছিস, ভেবে বলছিস?"
"না ভেবে বলব কেন!" অর্ণব তেড়িয়া হয়ে বলল।
"শোন, তা হলে এই সম্পর্কে এখনই ভেঙে ফেলা দরকার। কারণ, আমাকেও নিজের দিক দেখতে হবে।"
অর্ণব খানিকক্ষণ সময় নিল মৌসুমির কথা বুঝতে। সম্পর্ক ভাঙার কথা বলছে মৌসুমি! যে মেয়ে কোনওদিন ওকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবেনি। ওর হাজার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে। সেই মৌসুমি? হঠাৎ প্রবল রাগ হল অর্ণবের। মৌসুমির দিক থেকে কোনও প্রতিবাদ কিংবা আপত্তি আসতে পারে ও কল্পনা করেনি। সেই প্রতিবাদ যখন এল, তখন ওর মেজাজ গরম হয়ে গেল। প্রায় চিৎকার করে অর্ণব বলল, "ঠিক আছে। তুই তোর রাস্তা দেখ। আমি আমার রাস্তা দেখব।"
মৌসুমি স্থিরভাবে অর্ণবকে দেখল। বলল, "এটাই তোর শেষ কথা?"
"হ্যাঁ, আমি এখন পুরোপুরি গান নিয়ে থাকতে চাই।"
মৌসুমি আর কিছু বলল না। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। মাকে গিয়ে বলতে হবে, ওই অফিসার পাত্রকে বিয়ে করতে ও রাজি।

## ৫

বাবা আর কিছু বলেন না আজকাল। মাঝে-মাঝে মায়ের কাছে আফশোস করেন, "সবই আমার কপাল!"
মা আগে খুব চ্যাঁচামেচি করতেন। এখন কাঁদেন। কিন্তু কোনও কিছুই অর্ণবকে স্পর্শ করতে পারে না। কবে থেকে এমন হল? যেদিন মৌসুমি এসে বিয়ের কার্ড দিয়ে গেল? নাকি যেদিন ওর চারটে গান ট্রেন্ডিং হওয়া শুরু করল?
বিয়ের কার্ড দিতে মাসখানেক আগে এই ছাদের ঘরে এসেছিল মৌসুমি। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। শেষে ধরা গলায় বলেছিল, "তুই কি এখনও গান নিয়েই থাকবি? কিছু করবি না? আমি কিন্তু এখনও অপেক্ষা করছি।"
অর্ণব কোনও জবাব দেয়নি। ও তখন ভাবছিল, মৌসুমি বেরোলে নতুন তোলা গানের রেকর্ডিং শুরু করবে।
মৌসুমি এক সময় উঠে দাঁড়িয়েছিল। দরজার সামনে গিয়ে ইতস্তত গলায় বলেছিল, "আমার বিয়ের ডেট ১৪ ফাল্গুন। এখনও পনেরো দিন আছে। তুই কি..."
"যাব তোর বিয়েতে," গানের খাতা খুলতে-খুলতে অর্ণব উত্তর দিয়েছিল।
এখন দিনের বেশির ভাগ সময় ও চিলেকোঠার ঘরে থাকে। গরমে বসে গান রেকর্ড করে। শোনে। অ্যাপের নানা ধরনের গানের নীচে মন্তব্য করে। এখন ওর অনেক গানই ট্রেন্ডিং। একটা ভোজপুরি গান বিহারে ট্রেন্ডিং। একটা লোকগান গেয়েছে। সেটা আবার বাংলাদেশে ট্রেন্ডিং। দুটো হিন্দি ছবির গান হিমাচল প্রদেশের লোকে প্রচুর শুনছে।
প্রতি রাতে অর্ণব হিসেব কষে। কত পয়েন্ট জমল। এক লাখ পয়েন্ট হলে একশো ডলার আসবে। তখন সেই টাকা ঢুকবে ওর অ্যাকাউন্টে। সেই পয়েন্ট আসতে বেশি বাকি নেই। তিরানব্বই হাজার পয়েন্ট ও পেরিয়ে গিয়েছে।
অর্ণব জানে, ও কোনওদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাইতে পারবে না। কিন্তু সিঙ্গিং স্টার অ্যাপে ও একজন গায়ক। যে গায়কের গান দেশের নানা প্রান্তের লোক শুনছে। তারিফ করছে।
মোবাইলে রাখা মৌসুমির হাসিমুখের ছবির দিকে তাকিয়ে ও বিড় বিড় করে, "তুই বল, তুই তো সব জানিস। সবাই কেমন হাসত আমার গান শুনে। একবার মারতে-মারতে স্টেজ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। সেই আমি এবার একশো ডলার রোজগার করব গান গেয়ে। বল, আমি কি ভুল করেছি?"
মৌসুমির ছবি শুধু তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। কোনও জবাব দেয় না।

**অলংকরণ:** সৌমেন দাস

কলাপাতায় ভাপা বোয়াল

# ভাপের উত্তাপে!

তেল-মশলার আড়ম্বর না থাকলেও, স্বাদে-গন্ধে ভাপা পদের জুড়ি মেলা কঠিন। আমিষের কিছু ভাপা পদে উৎসবের এলাহি ভুরিভোজের আয়োজন করলেন ফুড কলামনিস্ট মণিদীপা সাহা। স্বাদের উষ্ণতায় মজলেন সায়নী দাশশর্মা।

উৎসবের রসনাবিলাস মানেই আমিষের বাহারি পদ। কোর্মা-কালিয়া-কোপ্তা তো রয়েইছে, তবে বাঙালির 'ভাপা'প্রীতি নিঃসন্দেহে এসবের ঊর্ধ্বে! যদিও ভাপা খাবারের প্রচলন এই বাংলার বুকে হয়নি। শোনা যায়, আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম সহ, চিন, জাপান, ইতালির মতো একাধিক দেশে ভাপা খাবারের চল ছিল, আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে। ঠিক কোথা থেকে এই রন্ধনপ্রণালীর সূত্রপাত, তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও, ভাপা রান্নার বর্তমান জনপ্রিয়তার নেপথ্যে পূর্ব এশিয়ার অবদান নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি। সাধারণত বাঁশের তৈরি স্টিমারে (পূর্ব এশিয়ায় স্টিলের বাসন ব্যবহারের কথাও শোনা যায়) মাছ বা ময়দার তৈরি বান, রুটি বা ডাম্পলিং জাতীয় খাবার রেখে, তা ভাপিয়ে খাওয়া হত প্রথমদিকে। তখন মশলাপাতির ব্যবহার প্রায় হতই না। ধীরে ধীরে রান্নায় সুগন্ধি হার্বস, মশলার ব্যবহার শুরু করে দক্ষিণ এশিয়া। কম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ডে যে ধরনের ভাপা রান্নার চল রয়েছে, বাংলার ভাপা রান্না অনেকটাই সেই ধাঁচের। পাতায় মুড়ে বা সরাসরি স্টিলের বাসনে বিভিন্ন মশলা, নারকেল, দুধ ইত্যাদির মিশ্রণে মাছ, ডিম, চিংড়ি মাখিয়ে ভাপিয়ে নেওয়া হয়। ঢিমে আঁচে, বাষ্পের উষ্ণতায় সব উপকরণ মিলেমিশে তৈরি করে অনন্য, তুরীয় এক স্বাদ। সাধারণত এই রন্ধনপ্রণালীতে মাছ আর চিংড়ির ব্যবহারই বেশি চোখে পড়ে, কারণ চিংড়ি বা মাছের নরম টেক্সচার ভাপায় মজে ভাল। তবে সুকৌশলে রান্না করলে মাংসও যে ভাপার স্বাদে মন্দ লাগবে না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। তারই প্রমাণস্বরূপ মাছ, মাংস, চিংড়ির কিছু ভাপা পদের সংকলন রইল। চেখেই দেখুন, নিরাশ হবেন না...

লাউপাতায় পমফ্রেট ভাপা

আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে এক ধরনের মাটির উনুনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যা আন্দাজ ৫০০০ বছর পুরনো ছিল। মনে করা হয়, খাবার ভাপানোর জন্যই ব্যবহার করা হত এই উনুন। তাঁরাই প্রথম ভাপা রান্নার প্রচলন করেছিলেন কিনা, তা যদিও অনিশ্চিত।

## কলাপাতায় ভাপা বোয়াল

**উপকরণ:** বোয়াল মাছ ৪০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৪টে, কালো ও সাদা সরষেবাটা ৪ টেবলচামচ, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পাতিলেবুর রস ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১

তোপসে টোম্যাটো ভাপে

চিমটে, টোম্যাটোবাটা ২ টেবলচামচ, সরষের তেল পরিমাণমতো, কলাপাতা কয়েকটা।

**প্রণালী:** বোয়াল মাছ খুব ভাল করে ধুয়ে লেবুর রস, অল্প নুন ও অল্প শুকনোলঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে রাখুন। এতে কয়েকটা কাঁচালঙ্কা ভেঙে দিন। ২০ মিনিট এভাবে ম্যারিনেট করে রাখুন। একটা বাটিতে দু'রকমের সরষেবাটা, টোম্যাটোবাটা, জিরেগুঁড়ো, অল্প শুকনোলঙ্কার গুঁড়ো, নুন ও সরষের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ভাল করে। মাছগুলো এই মিশ্রণে মাখিয়ে নিন। কলাপাতা ভাল করে ধুয়ে শুকনো করে নিন। একটা করে মশলা মাখানো মাছ একটা করে পাতার উপর রাখুন। উপরে একটা করে কাঁচালঙ্কা রেখে পাতা মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। এবার যে পাত্রে ভাপাবেন, সেটায় তেল মাখিয়ে ফুটন্ত জলের উপর পাত্রটি বসিয়ে ভিতরে পাতায় মোড়া মাছগুলো রাখুন। মিনিটকুড়ি মাছগুলো ভাপিয়ে কলাপাতা সহ পরিবেশন করুন।

## লাউপাতায় পমফ্রেট ভাপা

**উপকরণ:** পমফ্রেট মাছ ৪টে, লাউপাতা ৪টে, লেবুর রস ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টে, কালো ও সাদা সরষে ৪ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, সরষের তেল ৪ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** লাউপাতা ধুয়ে শুকনো করে মুছে নিন। মাছের গায়ে নুন, হলুদ এবং লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। অন্যদিকে মিক্সিতে কাঁচালঙ্কা, দু'রকম সরষে অল্প নুন দিয়ে বেটে নিন। একটা পাত্রে এই সরষেবাটা ঢেলে তাতে জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লেবুর রস ও অল্প সরষের তেল মিশিয়ে নিন। এতে মাছগুলো মাখিয়ে লাউপাতার উপর রেখে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। কড়াইতে জল গরম করে উপরে একটা ঝাঁঝরি রেখে তার উপর লাউপাতাগুলো রেখে ঢাকনা বন্ধ করে ২০ মিনিট ভাপিয়ে নিন। ১০ মিনিটের মাথায় পাতাগুলো একবার উলটে নিন। তৈরি পমফ্রেট ভাপা।

## তোপসে টোম্যাটো ভাপে

**উপকরণ:** তোপসেমাছ ৩০০ গ্রাম, পোস্ত ও সরষেবাটা ২ টেবলচামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (বাটা), কাঁচালঙ্কা ২টো, নুন ও হলুদ স্বাদমতো, সরষের তেল ৪ টেবলচামচ, কালোজিরে ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ চা-চামচ।

**প্রণালী:** মাছগুলো ধুয়ে একটা বাটিতে রাখুন। এরপর সব মশলা মিশিয়ে মাছগুলোর গায়ে মাখিয়ে দিন। উপর থেকে চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে ভাপিয়ে নিন ১৫ মিনিট। অন্য একটা কড়াইতে একটু সরষের তেল গরম করে ওতে কালোজিরে এবং কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরলে ফোড়নটা ভাপানো মাছের উপর ঢেলে দিন। ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে ঢাকনা বন্ধ করে কিছুক্ষণ রাখুন।

ডাব মালাই ইলিশ

ট্যাংরা মাছের পেঁয়াজ ভাপা

## ডাব মালাই ইলিশ

**উপকরণ:** ইলিশ মাছ ৪ টুকরো, ডাব ১টা (শাঁস সহ), সাদা ও কালো সরষে ২৫ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৪টে, হলুদগুঁড়ো সামান্য, নুন স্বাদমতো, সরষের তেল আন্দাজমতো, নারকেলের দুধ ৪ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** মাছের টুকরোগুলোতে নুন ও হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে রেখে দিন। ডাবের শাঁস বের করে নিন। এমনভাবে কাটবেন, যাতে খোলটা গোটা থাকে। এটা রেখে দিন সাজানোর জন্য। নারকেলের দুধের সঙ্গে ডাবের শাঁস একসঙ্গে বেটে নিন। এরপর ওতে দু'রকমের সরষে, অল্প নুন এবং কাঁচালঙ্কা দিয়ে আর-একবার বেটে নিন। একটা টিফিন কৌটোয় এই সরষেবাটা, সামান্য নুন, সামান্য হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে মাছের টুকরোগুলো দিয়ে মাখিয়ে নিন। উপর থেকে সরষের তেল ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে জলের উপর বসিয়ে ২০ মিনিট ভাপিয়ে নিন। নামিয়ে মাছগুলো ডাবের খোলের মধ্যে রেখে উপর থেকে খানিকটা মালাই রেখে চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে সাজিয়ে দিন।

## ট্যাংরা মাছের পেঁয়াজ ভাপা

**উপকরণ:** ট্যাংরা মাছ ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১/২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটোকুচি ১/২ কাপ, নুন ১ চা-চামচ, সরষের তেল ৪ টেবলচামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, গোটা কাঁচালঙ্কা ২টো, ধনেপাতা সামান্য।

চিংড়ি কাঁচা পোস্ত ভাপে

**প্রণালী:** ট্যাংরা মাছ ধুয়ে তাতে নুন, কাঁচালঙ্কাবাটা ও লেবুর রস দিয়ে ১০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন। তারপর একটা বড় পাত্রে মাছগুলো নিয়ে পেঁয়াজকুচি, টোম্যাটোকুচি, সরষের তেল, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও আদাবাটা দিয়ে হালকা হাতে মাখিয়ে নিন। পাত্রটা ভাপে বসান ২০ মিনিটের জন্য। এরপর মাছগুলো উলটে দিয়ে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। নুন-ঝাল চেখে দেখে নিন এই সময়। আরও ৫ মিনিট ভাপিয়ে নামিয়ে নিন।

## চিংড়ির কাঁচা পোস্ত ভাপে

**উপকরণ:** চিংড়ি ২০০ গ্রাম, পোস্ত ১০০ গ্রাম, চেরা কাঁচালঙ্কা ৪টে, নুন ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ ১টা, সরষের তেল ৪ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** প্রথমে চিংড়ি পরিষ্কার করে নুন মাখিয়ে কড়াইতে অল্প তেলে হালকা করে সাঁতলে তুলে নিন। মিক্সারে কাঁচা পোস্ত, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ আর অল্প নুন একসঙ্গে বেটে নিন। একটা টিফিন বক্সে ভাল করে তেল মাখিয়ে ভিতরে কাঁচাপোস্তবাটা, ভাজা চিংড়ি, স্বাদমতো নুন, সরষের তেল আর ২টো চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে হালকা নেড়েচেড়ে নিন। উপরে চিংড়ি ভাজার তেল ছড়িয়ে দিন খানিকটা। ঢাকনা বন্ধ করে ভাপে বসান ১৫ মিনিটের জন্য। কাঁচালঙ্কা ও সরষের তেল ছড়িয়ে নামান।

সাধারণত ভাপা রান্নায় মাছ আর চিংড়ির ব্যবহারই বেশি চোখে পড়ে, কারণ চিংড়ি বা মাছের নরম টেক্সচার ভাপায় মজে ভাল। তবে সুকৌশলে রান্না করলে মাংসও যে ভাপার স্বাদে তুরীয় অনুভূতি জাগাবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

## লেবুপাতায় চিংড়ি ভাপে

**উপকরণ:** চিংড়ি ২০০ গ্রাম, সরষে ১ টেবলচামচ, পোস্ত ১ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টে, হলুদগুঁড়ো সামান্য, নুন স্বাদমতো, টক দই ২ টেবলচামচ, লেবুর খোসা কুরনো ১ চিমটে, চিনি ১/২ চা-চামচ, লেবুপাতা ৪টে, শুকনোলঙ্কার গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, সরষের তেল ২ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** চিংড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। মিক্সিতে সরষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা অল্প জল আর নুন দিয়ে বেটে নিন। একটি বাটিতে চিংড়ির সঙ্গে এই মিশ্রণ মিশিয়ে নিন। অল্প শুকনোলঙ্কার গুঁড়ো এবং চিনি মেশান। এবার পুরোটা একটা টিফিন বক্সে ঢেলে উপর দিয়ে অল্প সরষের তেল ছড়িয়ে হালকা নেড়েচেড়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন। কড়াইতে জল গরম করে ওতে টিফিন বক্সটি বসিয়ে, কড়াই ঢেকে ২০ মিনিট মতো ভাপিয়ে নিন। তারপর টিফিন বক্সের ঢাকনা খুলে লেবুপাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিন। এই সময় কুরনো লেবুর খোসাও মেশান। আরও একটু তেল ছড়িয়ে ঢাকনা বন্ধ করে রাখুন মিনিটপনেরো। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

## কাঁচা আমের সরষে চিকেন ভাপা

**উপকরণ:** মুরগির মাংস ৪০০ গ্রাম, কাঁচা আমবাটা ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টে, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, সাদা ও কালো সরষে ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, টক দই ২ টেবলচামচ, চিনি ১/২ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবলচামচ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, সরষের তেল ৪ চা-চামচ, কাজু ও কিশমিশ ২ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেপাতা ১ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** চিকেন হালকা গরম জলে ধুয়ে রাখুন। চিকেনের টুকরোগুলো একটা বাটিতে নিয়ে ওতে টক দই, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো এবং অল্প নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে আধঘণ্টা রেখে দিন। দু'ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশিক্ষণ রাখতে পারলে আরও ভাল। মিক্সিতে দু'রকমের সরষে, কাঁচালঙ্কা, কাজু এবং কিশমিশ একসঙ্গে বেটে নিন। আধঘণ্টা পর চিকেনের সঙ্গে সব বাটা মশলা মিশিয়ে মেখে নিন। একটা বড় টিফিন বক্সে তেল মাখিয়ে ওতে চিকেনের মিশ্রণ রাখুন। উপর থেকে কাঁচা তেল ও কাঁচা আমবাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকনা বন্ধ করে আধঘণ্টা ভাপিয়ে নিন। তারপর ঢাকনা খুলে ধনেপাতা, সরষের তেল ও চেরা কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে নমিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কাঁচা আমের সরষে চিকেন ভাপা

## ভাপা গন্ধরাজ মাটন

**উপকরণ:** মাটন ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ৩-৪টে, গন্ধরাজ লেবুর রস ১ চা-চামচ, গন্ধরাজ লেবুর খোসা কুরনো ১/২ চা-চামচ, টক দই ৪ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, সরষের তেল ১ কাপ, চিনি ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাজু-পোস্তবাটা ২ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** মাটন অল্প জল আর একটু নুন দিয়ে প্রেশার কুকারে দু'টো সিটি দিয়ে নামিয়ে নিন। তারপর জল ঝরিয়ে আলাদা পাত্রে তুলে রাখুন। এবার এতে পেঁয়াজ-আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কাবাটা, স্বাদমতো নুন ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে মেখে নিন। আধঘণ্টা এভাবে ম্যারিনেট করে রাখুন মাংসটা। ছোট একটা হাঁড়ির মধ্যে তেল মাখিয়ে ম্যারিনেট করা মাটন দিন। তারপর হাঁড়ির মুখটা আটার লেচি দিয়ে আটকে ফুটন্ত গরম জলের উপর বসান। ৪৫ মিনিট মতো এভাবে মাংসটা ভাপাতে হবে। মাঝে মাঝে হাঁড়িটা ধরে একটু ঝাঁকিয়ে নেবেন। ৪৫ মিনিট পর আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। তবে ঢাকনা খুলবেন না। ঘণ্টাখানেক পর ঢাকনা খুলে কাজু ও পোস্তবাটা দিয়ে একটু সরষের তেল, বাকি চেরা কাঁচালঙ্কা ও গরমমশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে আরও ১৫ মিনিট ভাপে রাখুন। তারপর নামিয়ে লেবুর রস ও কুরনো লেবুর খোসা দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে আধঘণ্টা রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

ভাপা গন্ধরাজ মাটন

এবার পুজোয় কোর্মা-কালিয়ার বদলে ভাপা পদেই তাহলে কবজি ডুবনো যাক, কী বলেন?

**যোগাযোগ:** ৯০০৭৬১২৫৪৬, **ছবি:** শুভেন্দু চাকী

সানন্দা
ফ্যাশন ৫
উৎসবের দিনে সাবেকি সাজই তাঁর পছন্দ। মাল্টিকালার্ড সিল্কের পাঞ্জাবি। সঙ্গে সরু পাড়ের ধুতিতে বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য।
পোশাক: আনন্দ
ফোন: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫
সকল রসের ধারা...
সঙ্গীতের নির্জন সাধক আমান আলি খান। তাঁর সরোদের সুর আপ্লুত করে শ্রোতাদের। সারা বিশ্ব তাঁর ঘর হলেও ভালবাসেন বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। বাংলার সেরা উৎসবে স্টাইল স্টেটমেন্টের এক্সক্লুসিভ লুকবুক তুলে ধরল 'সানন্দা'।

উৎসবের
মরশুমে দুধসাদা
শেরওয়ানিতে
আভিজাত্যের
প্রকাশ।

পোশাক: রাঘবেন্দ্র
রাঠোর, জোধপুর
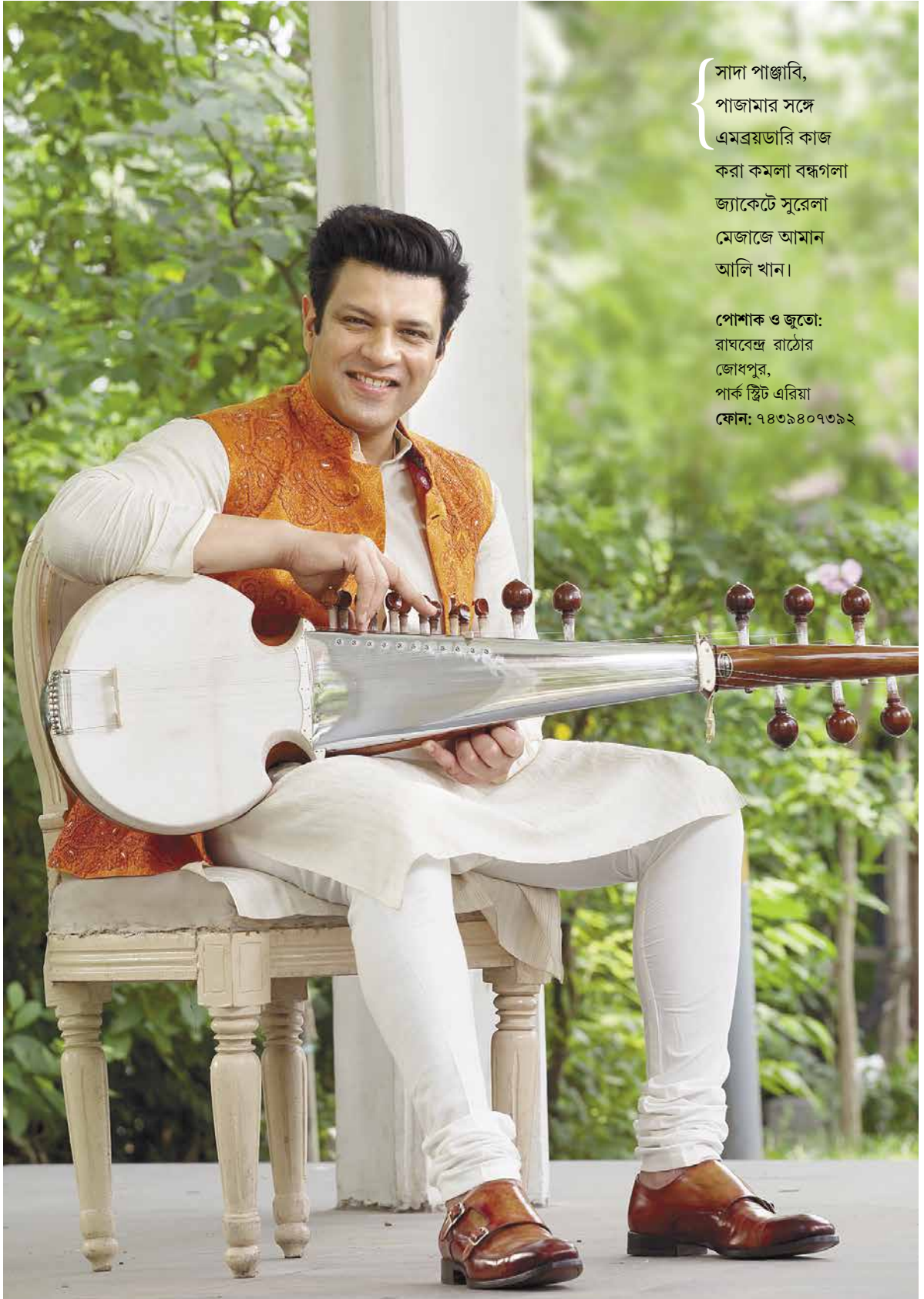
সাদা পাঞ্জাবি, পাজামার সঙ্গে এমব্রয়ডারি কাজ করা কমলা বন্ধগলা জ্যাকেটে সুরেলা মেজাজে আমান আলি খান।

**পোশাক ও জুতো:**
রাঘবেন্দ্র রাঠোর
জোধপুর,
পার্ক স্ট্রিট এরিয়া
**ফোন:** ৭৪৩৯৪০৭৩৯২

তাঁর সরোদের সুরে যেমন থাকে সুরের বৈচিত্র, তেমনি পোশাকেও রয়েছে অভিনবত্ব। পরনে পার্পল পাঞ্জাবি ও চওড়া পাড়ের ধুতি। যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে সাদা বন্ধগলা জ্যাকেট।

**জ্যাকেট ও জুতো:** রাঘবেন্দ্র রাঠোর, জোধপুর
**ধুতি:** আনন্দ

*এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি*

মেক-আপ: অনিরুদ্ধ চাকলাদার
ফোন: ৯৮৩০০৩৯৬৯৯
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: দীপশিখা রায়
লোকেশন: আইটিসি সোনার
ছবি: অমিত দাস

উপন্যাস ৩

# ঈশ্বরের অলৌকিক সন্তানেরা

নন্দিনী নাগ

মাসটা ফেব্রুয়ারি হলেও, সকাল দশটা বাজতে না-বাজতে বাইরেটা তেতে ওঠে। সূর্যের মেজাজও বেশ কড়া। মাঠের পাশে ছোট্ট একটা আম গাছ, সম্ভবত কলমের। এখনও প্রমাণ মানুষের উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। প্রখর রোদে গাছটার নিজেরই যেখানে ছায়া প্রয়োজন, সে আবার অন্যকে কী করে ছায়া দেবে!

তবু ওই গাছটার নীচে মেয়েটাকে যারা বসিয়ে রেখে গেছিল, তারা অন্তত মনে এই সান্ত্বনাটুকু পেয়েছিল যে, খোলা আকাশের নীচে তো আর বসিয়ে রাখেনি।

অবশ্য তারা আর কী-ই বা করতে পারত। স্পোর্টসের প্র্যাকটিস করাতে হবে, হাতে সময় কম। সবাইকেই মাঠে আনতে হবে, ক্লাসরুমে একা তো রেখে আসা যাবে না। যারা সরাসরি খেলায় অংশ নিতে পারবে না, তাদের মাঠের পাশে বসিয়ে রাখা ছাড়া আর উপায় কী! মেয়েটার ফরসা গাল রোদে তেতে গোলাপি হয়ে গেছিল, ঠোঁটদুটো শুকিয়ে কাঠ। মাথা নিচু করে একা-একা বসেছিল ও।

"সোনা! এই যে, এসে গেছি আমি!"

পরিচিত প্রিয় স্বর কানে যেতে মুখটা আলো হয়ে গেল মেয়েটার। হুইল চেয়ারের পা-দানিতে পায়ের চাপ দিয়ে ঝুঁকে বসা শরীরটাকে খাড়া করে ফেলল ঝিল। সিট বেল্ট দিয়ে বাঁধা না-থাকলে খানিকটা লাফিয়েই উঠত বোধ হয়।

"মা! আয়!" খুশিতে চিৎকার করে উঠল ও।

বাড়ির সমস্ত কাজ সামলে, অনেকগুলো যানবাহন বদলে, তবে তো মা বেচারার এসে পৌঁছনো! তাই তার দেরি হয়ে গেল। আর সকলের মা মাঠে এসে গেছে, অথচ নিজের মাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই হয়তো একা-একা মন খারাপ করে বসেছিল মেয়েটা। এই গরমে ওর গলা শুকিয়ে গেছে হয়তো, কিন্তু কে-ই বা সেটা খেয়াল করবেন, কে-ই বা দেবেন জল, সবাই তো ব্যস্ত। আর এই জন্যই তো প্র্যাকটিসের সময় মায়েদের মাঠে আসতে বলা। সবটাই বোঝে জাগরী, তাই কারও প্রতি ওর অনুযোগ নেই কোনও। নিজের একটা মাত্র মেয়েকে সামলাতে যেখানে সে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে এঁরা তো এতগুলো বাচ্চাকে সামলাচ্ছেন। দেরি করার জন্য জাগরীর নিজেরই কেমন খারাপ লাগছিল।

ঝিলের হুইল চেয়ারের পিছনে ওর স্কুলের ব্যাগ ঝোলানো। ওর মধ্যেই জলের বোতল, খাবার সবই দেওয়া আছে। অনেক সকালে উঠে জাগরী সে সব নিজে তৈরি করে ব্যাগে ভরে দিয়েছে প্রতি দিনের মতো, স্কুলের টিচাররাই খাইয়ে দেবেন। তবে ওই বোতলের জল আজ গরম হয়ে গেছে হয়তো বা। এত ক্ষণ ধরে রোদে রয়েছে তো! সেটা ভেবে নিজের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ঝিলকে অল্প-অল্প করে জল খাওয়াল জাগরী।

ঝিলের মুখের সমস্ত পেশি কর্মক্ষম নয়, তাই চুমুক দিয়ে জল খেতে পারে না ও। মুখে ঢেলে দিলেও জলের বেশ কিছুটা বাইরে বের হয়ে আসে, গিলতেও বেশ অসুবিধে হয় ওর। সেই জন্য, ওকে জল খাওয়ানোটা বেশ সমস্যার কাজ। তার উপরে আবার মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরে, তাই ওর শরীরে জলের

ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা খুবই। এই ব্যাপারটা নিয়ে সব সময়ই চিন্তিত থাকে জাগরী।

"মিসেস সেনগুপ্ত এসে গেছেন?"

"সরি! আমার একটু দেরি হয়ে গেল, খুব জ্যাম ছিল রাস্তায়।"

"না, না, ঠিক আছে। নো প্রবলেম। আমরা ওই ইভেন্টটা আবার প্র্যাকটিস করাব। আপনি ঝিলকে নিয়ে মাঠে চলে আসুন।"

মাঠে তত ক্ষণে আরও মায়েরা, তাদের হুইল চেয়ার-নির্ভর বাচ্চাদের নিয়ে পৌঁছে গেছেন। এই খেলাটা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক যত্ন করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন খেলাটাতে মায়েদের কী করণীয়।

হুইল চেয়ারে বসা এই ছেলেমেয়েদের হাতে একটা করে বেলুন থাকবে। বাঁশি বাজলে মায়েরা বাচ্চাদের হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে চুনের দাগ দেওয়া লাইনে পৌঁছে যাবেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে এমন ছেলেমেয়েরা, যারা এলোমেলো ভাবে পা ফেলে হলেও অন্তত হাঁটতে পারে। হুইল চেয়ারে বসা বাচ্চাদের হাত থেকে বেলুন নিয়ে তার পর ওই বাচ্চারা হেঁটে ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছবে।

সারাটা দিন ওদের খেলার প্র্যাকটিসে থেকে জাগরী অবাক হয়ে দেখল, হাঁটতে পারুক বা না-পারুক, বুদ্ধি থাক বা না-থাক, প্রতিটি বাচ্চাকেই কী অসাধারণ পরিকল্পনা করে এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা খেলায় অংশ নেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। স্পোর্টসের মাঠে যাতে প্রতিটা বাচ্চাই অংশ নিতে পারে নিজেদের অক্ষমতা ভুলে গিয়ে, তার জন্য প্রাণপাত করে পরিশ্রম করছেন এঁরা। ঝিলের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, ভাললাগায় চোখে জল চলে এল জাগরীর।

"এই যে ঝিলের মা! তুমি এখানে একা-একা বসে কেন? মেয়েকে নিয়ে ও দিকটাতে চলো, আমরা সবাই ও দিকে আছি।"

আন্তরিক ভাবে ডেকে নিয়ে গেলেন যে মহিলা, তাঁর নাম সুমিতা। এখানে সবাই ওঁকে ডাকে 'সুমিদি' বলে, সেটা পরে জেনেছিল জাগরী।

বিভিন্ন বয়সের জনা-পনেরো মহিলা গোল করে বসেছিলেন মাঠের এক পাশে। তাদের নিজেদের মধ্যে তুই-তোকারি করে কথা বলা শুনে জাগরীর বুঝতে অসুবিধে হল না এদের সখ্যতা অনেক দিনের।

ঝিলকে নিয়ে জাগরী ওখানে যেতেই সবাই হইহই করে উঠল।

"কী রে ঝিল, আজকে মা এসেছে, খুব খুশি তাই না?"

"হ্যাঁ-এ্যাঁ," চিৎকার করে উঠল ঝিল খুশিতে।

"তোমার মেয়ে আজকে সকালে স্কুলে এসেই আমাদের খবর দিয়েছে, মা আসবে। কীরে, তাই তো ঝিল?"

ওদের সঙ্গে ঝিলের অন্তরঙ্গতা দেখে জাগরী বুঝতে পারল, এরা ঝিলের খুব কাছের মানুষ, যথেষ্ট ভালওবাসে ওকে। অল্প সময়ের মধ্যে জাগরীকেও আপন করে নিল ওরা।

ঝিল স্কুলের বাসে যাওয়া-আসা করে, তাই ওর স্কুলে নিয়মিত আসতে হয় না জাগরীকে। মাঝেসাঝে আসে স্কুলের ফি জমা দিতে বা পেরেন্ট-টিচার মিটিংয়ে। তবে যখনই আসে, বেশির ভাগ সময়েই অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়ে বেরোয় বাড়ি থেকে। তাই কোনও রকমে স্কুলে দরকারি কাজটুকু মিটিয়ে তাড়াহুড়ো করে ছুটতে হয় ওকে। সেই জন্যই, আজ বন্ধুর মতো ডেকে নিল যারা, সেই অভিভাবকদের মধ্যে কয়েক জনের মুখ চেনা হলেও ভাল করে আলাপ-পরিচয় করা হয়নি আগে কখনও। এখন ওদের সঙ্গে গল্প করে বেশ ভাল লাগল জাগরীর। এই মায়েদের ছেলেমেয়েরা যদিও ভিন্ন-ভিন্ন বয়সের, তাই পড়েও আলাদা-আলাদা ক্লাসে, কিন্তু একটা জায়গায় তো সবাই এক। সেই সূত্রেই অসমবয়সি এতগুলো মহিলার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল এরা পরস্পরের নিকট আত্মীয়। আসলে এটাই তো এক মাত্র জায়গা যেখানে এরা অকপট থাকতে পারে, মনের সব কথা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। গোটা পৃথিবীতে এই বন্ধুমহলই হল সেই নিরাপদ স্থান, যেখানে বাচ্চাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত হতে হয় না।

## ২

"এই যে রুপুর মা! আজ কি রান্নাঘরে ঢোকার দরকার নেই? নাকি ছেলে নিয়ে বসে থাকলেই বাড়ির সকলের পেট ভরে যাবে?"

শাশুড়ির চিৎকারে একটু থতমত খেল বিন্দি, তবু সাহস সঞ্চয় করে বলল, "আপনি ছুটিকে একটু ভাতের জলটা বসিয়ে দিতে বলুন না, মা। রুপুকে আর-একটু ব্যায়াম করিয়ে নিয়েই আমি আসছি।"

বিন্দি এ বাড়ির বড় ছেলে শ্যামলের বৌ। শ্যামল লেখাপড়া তেমন করেনি। কোনও মতে বি কম পাশ করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ঢুকেছে বাপের দোকানে। সেই দোকানও তেমন ঠাটের নয়। মুদিখানা এবং কিছু-কিছু স্টেশনারি জিনিস বিক্রি হয়। ছেলে এসে ব্যবসায় ঢোকাতে বাবা যে তার হাতে সমস্ত স্বত্ব তুলে দিয়ে নিজে গৃহবাসী হয়েছেন এমন নয়, দোকান তাঁরই আছে। ছেলে সেখানে কাজ করে এই মাত্র। ছেলে কর্মচারী হলে সুবিধে অনেক। তাকে মাইনে বাবদ টাকা দিতে হয় না, আবার চুরি-চামারির ভয়টাও থাকে না। যৌথ পরিবারে থাকার সুবাদে খাওয়াপরার খরচ এক সঙ্গেই মিটে যায়, আর টাকাপয়সার দরকার হলে বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়।

শ্যামলের ছোট ভাই কমল চাকরি করে। ছুটির বাবা, মানে কমলের শ্বশুরমশাই সেটা জুটিয়ে দিয়েছেন, যদিও তখনও তিনি শ্বশুরমশাই হয়ে ওঠেননি। কমলের হবু শ্বশুরের দৃষ্টি যেমন সুদূরপ্রসারী ছিল, হাতও তেমন লম্বা ছিল। তিনি হিসেব করে দেখেছিলেন, তাঁর মাধ্যমিক-ফেল বিদ্যেধরী এক মাত্র আদুরে মেয়েটাকে মোটামুটি একটা ভাল ঘরে বিয়ে দিতে যে-পরিমাণ খরচা এবং কসরত করতে হবে, তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমে মেয়ের বেকার প্রেমিককে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এতে দ্বিমুখী সুবিধে। জামাই বাবাজি চিরকাল কৃতজ্ঞতাবশত বশে থাকবে। ফলে বধূ-নির্যাতনের যে-সব কথা আজকাল কানে আসে, সেই ভয়টা আর থাকে না। তা ছাড়া সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে, কন্যেটির রূপ-গুণের ত্রুটি ঢাকতে যে-পরিমাণ টাকা গুনাগার দিতে হত, সেটাও বেঁচে যাবে।

একেই বর চাকুরে, বাপের মুখাপেক্ষী নয়, তার উপরে আবার চাকরিটা জুটেছে শ্বশুরের কৃপায়, তাই এ বাড়িতে ছুটির খাতিরই আলাদা। সে নিজের ইচ্ছেতে কখনও কোনও কাজে হাত দিলে ভাল, কিন্তু শাশুড়ি তাকে কখনও কোনও হুকুম করেন না। আর মাঝেমধ্যে বিকেলের চা করাটা ছাড়া পরিবারের সকলের জন্য কখনও কোনওকিছু করতে ইচ্ছেও করে না ছুটির। সেটা এ বাড়ির সকলেই জানে। তা সত্ত্বেও বিন্দি যখন ছুটিকে ভাতের জল বসানোর কথা বলতে বলল শাশুড়িকে, তিনি আর মেজাজ ধরে রাখতে পারলেন না।

"থাক বাপু। অন্যায় হয়েছে তোমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে বলা। তুমি আগে তোমার রাজপুত্তুরের সেবা করো, আমিই ঢুকছি হেঁশেলে। তবে ওই জড় পদার্থের পিছনে এত সময় ঢেলে কী যে হাতি-ঘোড়া হবে তাও তো বুঝি না! মাঝখান থেকে যে-মানুষটা সারা দিন মুখে রক্ত তুলে খেটে মরছে সবার অন্ন জোগাড়ের জন্য, তেতে-পুড়ে এসে সে লোকটা ঠিক সময়ে দুটো ভাত পাবে না।
আজ আসুন উনি, আমি বলব ছেলেদের সংসার আলাদা করে দিতে। আমারও আর এত বড় সংসারের ঝক্কি সামলানোর ক্ষমতা নেই," গজগজ করতে-করতে তিনি ঢুকে

গেলেন রান্নাঘরে।

বিন্দি অনেক কথাই বলতে পারত। সে বলতে পারত, 'কোনদিন বাবা এসে ঠিক সময়ে খেতে পাননি, মা?' কিংবা এ-ও বলতে পারত, 'সংসারের সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা কে সামলায়, মা? আপনি না আমি?'

কিন্তু কিছুই বলল না। বরাবরই মুখচোরা সে, আর রুপু জন্মানোর পর তো ওর মুখের সব কথাই কেড়ে নিয়েছেন ভগবান। ছেলেটাকে ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে শুইয়ে রেখে রেডিয়ো চালিয়ে দিল বিন্দি। তার পর চুপচাপ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। এ দিকের কাজ তাড়াতাড়ি করে সেরে ফেলতেও তো হবে ওকে, তার পর খাওয়াদাওয়া সেরে তিনটের মধ্যে রুপুকে নিয়ে পৌঁছতে হবে ওর নতুন ইশকুলে।

রূপায়ণের বয়স এখন চার। জন্মের পর নাতির রাজপুত্রের মতো রূপ দেখে বড় সাধ করে নামটা রেখেছিলেন রুপুর ঠাকুরমা। নাতির ভুবনভোলানো সৌন্দর্যে প্রথম চার মাস এতটাই মজে ছিলেন তিনি যে, বৌমাকে বাপের বাড়িও যেতে দেননি। তাঁর সব সময় নাতিকে নিয়ে পড়ে থাকা দেখে, বিন্দির মা ঠাট্টা করে বলেছিল, "নেহাত তোর শাশুড়ির বুকে দুধটা নেই, না হলে ও টুকু সময়ও তুই ছেলেকে পেতিস না!"

চার মাস পার হওয়ার পরও রুপু যখন উপুড় হতে শিখল না, তখন বিন্দির মা ওর শাশুড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "ছেলেটা এখনও ওল্টানো শিখল না, দেখছেন তো দিদি!"

নাতির কপালে বড় করে কাজলের টিপ পরাতে-পরাতে তিনি বলেছিলেন, "হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয় গো! কেউ তাড়াতাড়ি শেখে, কেউ আস্তে-ধীরে।"

বিন্দির মা'র বিশ্বাস ছিল, নাতিকে সর্ব ক্ষণ ওর ঠাকুরমা কোলে করে রাখে বলেই সে কিছু শিখতে পারছে না। মেয়েকে সে কথা বলেওছিলেন তিনি।

"বিছানায় ফেলে না-রাখলে, একা-একা নড়াচড়া না-করতে দিলে ছেলেপিলে ওল্টানো, হামা দেওয়া এ সব শিখবে কী করে? যখনই আসি এ বাড়িতে, দেখি রুপু কারও-না-কারও কোলে। তুই বারণ করতে পারিস না?"

ভদ্রমহিলার অভিযোগে সত্যতা ছিল। তবে বিন্দির সাহস ছিল না শাশুড়িকে এ নিয়ে কিছু বলার, বাধ্য হয়ে ওর মাকেই সেই অপ্রিয় কাজটা করার দায়িত্ব নিতে হল।

"তবুও দিদি, চার মাস বয়স হয়ে গেল, এখন তো পারা উচিত। বাচ্চারা তো ছ'মাসে বসতে শিখে যায়। আপনি রুপুকে একটু বেশি সময় বিছানায় ফেলে রাখবেন তো এখন থেকে।"

বেয়ানের কথার মধ্যে যে-ইঙ্গিতটা ছিল, সেটা বুঝতে বিন্দির শাশুড়ির একটুও অসুবিধে হল না। তিনি মনে-মনে যারপরনাই চটলেও মুখে কিছু বললেন না। এর ফল স্বরূপ দেখা গেল, রুপুর দিদিমা যখনই নাতিকে দেখতে আসেন, ওর ঠাকুরমা নাতিকে বিছানায় শুইয়ে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

পাঁচ মাসে পড়েও রুপু নিজে থেকে ওল্টানো শিখল না। বরং উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে বিন্দি দেখল, ছেলে নিজে থেকে সোজা হওয়ার চেষ্টাও করে না, মাথা নিচু করেই শুয়ে থাকে। বিন্দি তখন ভয় পেয়ে রুপুর বাবাকে খোঁচানো শুরু করল।

"শুনছ! ছেলেটা এখনও কেন কিছু শিখছে না বলো তো! এই বয়সে বাচ্চারা কত দামাল হয়ে যায়, হাত-পা ছুড়ে কত খেলা করে! আমাদের রুপুটা শুধু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে! চলো না, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই!"

স্থানীয় এক জন শিশু বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে যাওয়া হল রূপায়ণকে। বয়স্ক ডাক্তার, অনেক ক্ষণ ধরে ওকে দেখে গম্ভীরমুখে বললেন, "ওর কিছু অসুবিধে আছে। কলকাতায় আমার পরিচিত এক জন ডাক্তারবাবুর ঠিকানা দিচ্ছি, এই বাচ্চাকে নিয়ে তাঁর কাছে যাও। উনি ভাল বলতে পারবেন এই অসুবিধের ব্যাপারে।"

"আমার রুপু ভাল হয়ে যাবে তো, ডাক্তারবাবু?" উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল বিন্দি।

ডাক্তারবাবু কিছু ক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ওঁর মুখের দিকে। হয়তো ভেবে নিচ্ছিলেন কতটা কী বলা উচিত। তার পর বললেন, "ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখো, যা করার তিনিই করবেন।"

বিন্দি তখনও জানত না ছেলের অসুখটা আসলে কী জাতের। তবু ডাক্তারবাবুর কথায় যে-ইঙ্গিতটা ছিল, সেটা বুঝতে পেরে মুখটা কালো হয়ে গেল বিন্দির। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কোনও রকমে সেটাকে সামলে, রুপুকে বুকে চেপে ধরে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এল বিন্দি।

## ৩

বরাবরই একটু ডাকাবুকো গোছের মেয়ে নয়নিকা এবং বেশ খোলামেলা প্রকৃতির। যেটাকে ও নিজে ঠিক বলে মনে করে, সত্যি বলে বিশ্বাস করে, সেটা মুখে প্রকাশ করতে কিংবা কাজে পালন করতে দ্বিধা করে না। আর সেই কাজের ফল কী হতে পারে ভবিষ্যতে, সেটা তলিয়ে বিচারও করে না। তবে ওর বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত সৎ আর জ্ঞানত কারও ক্ষতি করার কথাও চিন্তা করে না।

লেখাপড়া আর খেলাধুলো নিয়েই ছোটবেলাটা কেটে গেছে নয়নিকার। ভাল সাঁতারু ছিল। একটু বড় হতেই সাঁতার ক্লাবের কোচের নজরে পড়ে ওয়াটার পোলো খেলা শুরু করেছিল। জেলা আর রাজ্যস্তরে চ্যাম্পিয়ান হয়ে জাতীয়স্তরে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার ডাক পেয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছিল। কমার্স নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে, শেয়ার কেনাবেচার ব্যবসা করে এমন একটা ফার্মে চাকরিতে ঢুকল নয়নিকা। এ দিকে স্কুল আর কলেজ জীবন পার করে জীবনের তিন নম্বর পর্যায়ে, মানে রোজগার করা শুরু করে দেওয়ার পরও আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা গেল, নয়নিকার একটাও প্রেম হল না! অবশ্য এটা নিয়েও ওকে কখনও বিচলিত হতে দেখেনি বন্ধুরা। প্রেম থাকা বা না-থাকা, কোনওটাতেই ওর বিশেষ কিছু ভাবান্তর ছিল না। বন্ধুরা এ নিয়ে কিছু বললে নয়নিকা হাসতে-হাসতে বলত, "প্রেমটা আসলে সবার জন্য নয়।"

নয়নিকার অভিভাবকরা যখন বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র বাছাই করে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল, তখনও ওর ভিতরে রোমাঞ্চ কিংবা বিদ্রোহ কোনওটাই জাগেনি। সেই জ্ঞান হওয়া ইস্তক জীবনের প্রতিটি ধাপকে যেমন অবশ্য আচরণীয় জ্ঞান করে গ্রহণ করেছে, বাবা-মা'র পছন্দ করা এক জন অপরিচিত ছেলেকে বিয়ে করে তার সঙ্গে জীবন কাটানোটাকেও তেমন কর্তব্য হিসেবে ধরে নিয়ে হাসি মুখে বিয়ে করে বরের সঙ্গে নয়নিকা পাড়ি দিল ভিন রাজ্যে।

মুম্বইয়ের মতো ব্যস্ত নগরীতে জীবিকার খোঁজে আসা মানুষের ভিড় এত বেশি যে, কর্মস্থলে যেতে-আসতেই অনেকটা সময় চলে যেত অরুণের। তা ছাড়া পেশার চাপ তো ছিলই। সকাল আটটায় বেরিয়ে কোনওদিনই রাত দশটার আগে ফেরা হত না তার। এই দীর্ঘ সময় একা থাকাটা নিয়েও কোনও অভিযোগ ছিল না নয়নিকার। ও এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছিল। অরুণ হালকা ব্রেকফাস্ট করে সকালে বেরিয়ে যেত, লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল অফিসেই। রাতে বাড়িতে খেত, তাও আবার দই আর ফলের সঙ্গে সামান্য ওটস বা কর্নফ্লেকস জাতীয় হালকা খাবার। আর নয়নিকার নিজের খাওয়া নিয়ে কোনও কালেই বাহুল্য ছিল না, যা-হোক একটা কিছু দিয়ে পেট ভরালেই হল। বেশির ভাগ বাঙালি মেয়ের জীবনের একটা বড় সময় রান্নাঘরে কেটে যায় বলে যে প্রবাদ আছে, সেটা তাই নয়নিকার জন্য প্রযোজ্য হয়নি।

বাড়িতে বসে ফালতু সময় নষ্ট না-করে একটা ল্যাপটপ কিনে নিয়ে অনলাইনে কাজ করা শুরু করে দিয়েছিল ও। ই-কমার্সে কাজের তো আর অভাব নেই।

এই সাজিয়েগুছিয়ে নেওয়া জীবনের ছন্দ প্রথম কাটল যখন ও কনসিভ করল, আর সেই খবর পেয়ে অরুণের মা-বাবা মুম্বইতে এসে এক রকম জোর করেই ওকে নিয়ে গেল শ্রীরামপুরে, নিজেদের কাছে। প্রথম বংশধর আসতে চলেছে বাড়িতে, এই সময় বৌমাকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা ফেলে রাখা যায়! তার যে এখন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন!

মিতশ্রীর শাশুড়িও এই সময়ে যথেষ্ট আদর-যত্নে রেখেছিলেন ওকে। এমনকি বৌমার খাটাখাটুনি যাতে কম হয়, সে জন্য কলেজে যাওয়াও বন্ধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু বরাবরের অবিবেচক, অবাধ্য মেয়ে মিতু সেই উপদেশ কানে তুললে তো!

কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে-পড়তেই মিতশ্রী পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলল ছোট কাকার বন্ধুকে। অশোক ক্লাস নাইন-টেনে মিতুকে বাড়িতে অঙ্ক করাতে আসত। তার পর চাকরি পেয়ে যাওয়ায় টিউশনি ছেড়ে দিয়েছিল। তবে বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিলেও দু'জনের সম্পর্কটা দিব্যি টিকে ছিল। বয়সে অনেকটাই বড়, কাকার বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে প্রেম করছে, এই খবর জানার পর মিতুর মা-বাবা স্বাভাবিক ভাবেই বকাবকি শুরু করেছিলেন।

"তুই কি দেখলি ওই অশোকের মধ্যে যে ওকে ছাড়তে পারবি না? তোর বন্ধুরা যখন অল্পবয়সি বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে, তুই তখন একটা বুড়ো-হাবড়ার হাত ধরে ঘুরবি? দু'জনের পছন্দ-অপছন্দ সব কিছুই যখন আলাদা হবে, বর সব সময় যখন একটা গার্জেন-গার্জেন ভাব করবে তখন দেখিস কেমন লাগে!" মিতুর মা নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন মেয়েকে।

মিতুর বাবার আবার এত ধৈর্য নেই। ছোট ভাইয়ের বন্ধুকে জামাই হিসেবে ভাবার মতো কল্পনাশক্তি যে তাঁর নেই, এ কথা জানিয়ে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, "তুমি যদি অশোককে না ছাড়ো, তবে তোমাকেই আমি এই কলেজ ছাড়িয়ে বর্ধমানে তোমার মামার বাড়িতে রেখে আসব। ওখানে থেকেই লেখাপড়া করবে।"

বাবার এই সিদ্ধান্তের কথা চুপচাপ সেদিন শুনে গেছিল মিতশ্রী। মুখে কোনও বিরোধিতা করেনি। তবে এই ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যে অশোককে বিয়ে করে নিয়েছিল শুধু মাত্র বাবাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে, নিজের ইচ্ছের মালিক ও নিজেই।

চ্যালেঞ্জ করে বিয়েটা করে ফেললেও লেখাপড়াটা নষ্ট করেনি মিতু। কারণ সকলের মুখের উপর আরও একটা জবাব দেওয়ার ছিল ওর। গ্রাজুয়েশনে ফার্স্ট ক্লাসই পেল মিতশ্রী, মাস্টার্সে ভর্তি হতে কোনও সমস্যাই হল না।

এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষার তখনও তিন মাস বাকি। ফিল্ডওয়ার্ক করতে সে বছর পুরুলিয়া যাওয়া হবে, সেই সময়ই বিপত্তিটা টের পেল মিতু। নির্দিষ্ট তারিখের সাত দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন পিরিয়ড হল না, তখন ব্যাপারটা সবার আগে প্রিয় বন্ধু সুহানাকেই বলল।

"ডেট মিস করেছি রে! মনে হচ্ছে, কেস জন্ডিস!"

"অশোকদাকে বলেছিস?"

"খেপেছিস! ওর পেটে কোনও কথা থাকে না। শুনে এমন হাউমাউ শুরু করবে যে, বাড়ির সবাই তক্ষুনি জেনে যাবে। আর শাশুড়ি জানলে কিছুতেই আমাকে এই অবস্থায় পুরুলিয়ায় যেতে দেবে না! ফিল্ডওয়ার্কে না-যেতে পারলে তো গোটা বছরটাই নষ্ট!"

**বিন্দি তখনও জানত না ছেলের অসুখটা আসলে কী জাতের। তবু ডাক্তারবাবুর কথায় যে-ইঙ্গিতটা ছিল, সেটা বুঝতে পেরে মুখটা কালো হয়ে গেল বিন্দির।**

"সেটা ঠিক। আচ্ছা এক কাজ কর, একটা প্রেগন্যান্সি টেস্টের কিট কিনে টেস্ট করে নে। অ্যাটলিস্ট শিয়োর তো হয়ে নেওয়া যাবে!"

পুরুলিয়া যাওয়ার আগেই যে ও জানত প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা, এটা পরেও কোনওদিন কাউকে বলেনি মিতু। এমনকি অশোককেও না। যদিও প্রথম তিন মাস চোখে পড়ার মতো শরীরের কোনও পরিবর্তনই হয় না, তবু ওই সময়ে ভিড় ট্রেনে চড়ে নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যাওয়াটা শাশুড়ির পছন্দ ছিল না। উনি চাইছিলেন, বৌমা বাড়িতে বসে লেখাপড়া করে পরীক্ষাটা শুধু দিয়ে আসুক। তবে সেই ইচ্ছেটা উনি কার্যকর করতে পারেননি ছেলের জন্য। শরীর ভাল থাকলে মিতুর নিয়মিত ক্লাসে যাওয়ার ব্যাপারে অশোকের পুরোপুরি সমর্থন ছিল। ছেলে আর বৌয়ের এই হঠকারিতার জন্যই যে পরিবারে এত বড় একটা অনর্থ ঘটল, এই কথাটা মিতুর শাশুড়ি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আর জীবনভর সেই বিশ্বাস অন্যের মনে চারিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোনও কসুর তিনি করেননি।

অশোক এই সময়ে বদলি হয়ে গেছিল অন্য শহরে। প্রতি শনিবার রাতে বাড়িতে ফিরে সোমবার সকালে চলে যেত। নিজের বাবা-মা'র কাছে মিতুকে রেখে অশোক পুরোপুরি শান্তিতে থাকত। কারণ ও ভাল ভাবেই জানত, মা মিতুর খেয়াল ভাল করেই রাখবে। যে ভাবে তিনি বাড়ির অমতে হুট করে বিয়ে করে চলে আসা বৌমাকে আদর করে ঘরে বরণ করে তুলেছিলেন এবং মা'র মতো যত্ন করে এই চার বছর ধরে কলেজছাত্রী বৌয়ের টিফিন রেডি করে দিয়েছেন, তাকে লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাতে অশোকের ভরসা করাটাই স্বাভাবিক। ভরসা মিতুরও ছিল, তাই নিজের ফেলে আসা মা'র জায়গায় শাশুড়ি মাকে বসাতে দ্বিধা করেনি।

পরীক্ষা ভালই হয়েছিল মিতুর। তাই ফল নিয়ে উদ্বেগের কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বার চেক-আপে গেলে ডাক্তারের ভ্রূকুটি দেখতেই হত, আর তার একটাই কারণ, "ওজন বাড়ছে না! খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না!"

বাড়িতে ফিরে অশোক সেই কথা বলাতে ওর মা'র অহম আহত হল।

"কী বলতে চাস তুই? আমি ওর খাওয়ার ঠিকমতো যত্ন নিই না? পোয়াতির খাওয়াদাওয়া কেমন হবে সেটা কি আমি এখন তোর কাছ থেকে শিখব?"

এই গোলমালে মিতুর ভীষণ লজ্জাবোধ হল। একে তো মা-ছেলের বাগ্‌বিতণ্ডার কারণ সে নিজে, তার পর আবার ঝামেলার বিষয়টা হল 'খাওয়া'। এই নিয়ে কথা কাটাকাটিতে ওর নিজের অসম্মানিত লাগতে থাকে, তাই ইশারায় অশোককে বলল চুপ করে যেতে।

প্রায় রাতেই খাওয়ার পর বমি করে ফেলত মিতু। তার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেত প্রচণ্ড খিদেতে। বমির ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও শাশুড়ি-মা যেহেতু কিছু বলেননি,

তাই এই মাঝ রাতে খিদে পেয়ে যাওয়ার কথাটা মিতু ওঁকে বলতে পারেনি লজ্জায়। খাওয়া নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে হয়ে যাওয়া ওই গোলমালটাই ছিল লজ্জার বড় কারণ।

এখন অবশ্য মনে হয় মিতুর, ওটা ভুল ছিল। শুধু ভুল নয়, ঘোরতর অন্যায়ও। নিজের প্রতি অন্যায়, গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি অন্যায়।

## ৪

“এই যে গলিটা দেখছ, এটা গিয়ে উঠেছে ওই মোড়ে, বিশুর চায়ের দোকানের সামনে। ওখান থেকে তুমি ডাইনেও যেতে পারো, নয়তো বাঁয়ে। যদি ডান দিকটা ধরে রাস্তা যেমন-যেমন যাচ্ছে তেমন চলতে থাকো, তবে তুমি গিয়ে পৌঁছবে একটা তিন মাথার মোড়ে। তিন দিকে তিনটে বড় রাস্তা যাচ্ছে, যে-কোনও একটা ধরে চলা শুরু করতে পারো। আর যদি বামপন্থী হও, তবে গিয়ে পৌঁছবে একটা চার মাথায়। চার-চারটে রাস্তা পাবে, যে-কোনও একটা বেছে নিতে পারো।”

একটু থামল নিলয়, ঝোলা হাতড়ে সিগারেট বের করে দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঝোলাল। সেই সুযোগে মুখ খুলতে পারল জাগরী, “দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি তো পুরো আদ্যানাথের মেসোর বাড়ির ঠিকানা বলতে শুরু করলে! এত পথের ঠিকানা জেনে কী করব আমি?”

সিগারেটে তত ক্ষণে অগ্নিসংযোগ করা হয়ে গেছে নিলয়ের। লম্বা করে টেনে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইগুলো ধোঁয়াতে ভরে নিয়ে বলল, “এ সব কারও ঠিকানা নয়, জরি। ভেবে দেখো, প্রতিটা রাস্তারই একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। একটা পথের জীবন শেষ হলে, তবে আমাদের সামনে খুলে যায় আরও অনেকগুলো রাস্তা। এ বার কোনটা বেছে নিয়ে চলব, সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হয়। আমাদের জীবনও এই রাস্তাগুলোর মতোই। কার হাত ধরে, কার পায়ে পা মিলিয়ে কতটা হাঁটব, সেটারও একটা মাপ আছে। সেই পথটুকু ফুরিয়ে গেলে, আবার অন্য হাত, অন্য রাস্তা।”

জাগরী কথা বলল না আর, বাসস্টপ পর্যন্ত পথটুকু চুপচাপ হেঁটে চলল।

“রাগ করলে? আমি শুধু তোমাকে সত্যিটাই বোঝাতে চাইলাম, ভেবে দেখো পরে,” বাসস্টপে পৌঁছে নিলয় বলল।

রোজ কলেজ-ফেরত এই পথটুকু এক সঙ্গে আসে ওরা। জাগরী বাসে উঠে গেলে নিলয় উল্টো মুখে হাঁটা লাগায়। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তার পর বাড়ি ফেরে।

নিলয়ের কবিতা লেখার হাত খুব ভাল, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিতও হয়েছে। আর ওর হাতটাও খুব সুন্দর লাগে জাগরীর। কলেজ-ক্যান্টিনে আলাপচারিতার মাঝে, টেবিলের উপর আলগোছে রাখা ওর হাতের লম্বা-লম্বা আঙুলগুলোকে কত বার মনে-মনে স্পর্শ করেছে জাগরী। কিংবা দুই আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট ধরে যখন নিলয় কোনও গভীর আলোচনায় মগ্ন থাকে, তখনও মুগ্ধ হয়ে জাগরী তাকিয়ে থেকেছে নিলয়ের হাতের দিকে।

আজ ওরা গেছিল কফি হাউসে। কলেজ স্ট্রিটে বইপত্র কেনার ছিল কিছু, নিলয়ের একটা পত্রিকার অফিসেও যাওয়ার দরকার ছিল। সে সব সেরে কফি হাউসে যাওয়া, পায়ের আর পেটের খানিকটা আরামের খোঁজে। এই দুটোর কিছুটা শুশ্রূষা দরকার ছিল তখন, আবার অনেকটা পথ ফিরতে হবে তো ট্রেন ধরে!

মেনুকার্ডের উপর অন্যমনস্কভাবে রাখা নিলয়ের হাতের উপর নিজের হাতটা রেখেছিল জাগরী। অনেক দিনের ইচ্ছেপূরণের সুযোগ হাতছাড়া করেনি। কফি হাউসে কেউ কারও দিকে তাকিয়ে দেখে না, এখানে সবাই নিজেদের নিয়েই মশগুল। তা ছাড়া ওদের মফস্‌সলি কলেজ-ক্যান্টিনের মতো এখানে কেউ একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে এক সঙ্গে দেখলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে তাদের গিলে ফেলারও চেষ্টা করে না। তাই তো জড়তা কাটিয়ে জাগরী হাতটা রাখতে পেরেছিল নিলয়ের হাতের উপর। নিলয়ের চোখ ছিল সদ্য কেনা একটা বইয়ের পাতায়। সেখান থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল জাগরীর দিকে। তার পর প্রিয় কবির কয়েকটা লাইন উচ্চারণ করেছিল খুব আস্তে-আস্তে, প্রায় ফিসফিস করেই,

“হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়”

জাগরী হাত সরায়নি, ভুরু কুঁচকে বলেছিল, “কেন? কেন সহজ নয়?”

“পরে বলছি,” নিলয়ের চোখের তারায় রহস্যময় হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ফেরার পথে নানা বিষয়ে কথা হলেও, এই প্রসঙ্গে কোনও কথা হয়নি। জাগরী নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেনি আর কিছু। অমন রোম্যান্টিক একটা মুহূর্তে নিলয়ের ওই ট্যারাব্যাঁকা কথা ওর ভাল লাগেনি।

ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি ফেরার রাস্তায় নিলয় নিজে থেকেই সেই প্রসঙ্গ তুলল আর বুঝিয়ে দিল সারা জীবন একটা সম্পর্ককে বয়ে নিয়ে চলাটাকে সে মোটেও সহজ ভাবে না। বরং নিত্য নতুন রাস্তায় হাঁটার মতোই, জীবনের বাঁকে-বাঁকে নতুন-নতুন মানুষের সঙ্গে বাঁচতেই সে রোমাঞ্চ বোধ করে। নিলয়ের দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে এক বার হাসল জাগরী, বলল, “নাহ্! রাগ কেন করব!”

অন্য দিন, দু'-একটা বাস ছেড়ে দেয় ও, কারণ গল্প তখনও ফুরোয় না। আজ প্রথম যে-বাসটা এল, তাতেই উঠে পড়ল জাগরী।

“ মা, মা...”

“হ্যাঁ বল, কী বলছিস!”

“তুমি পুলিশকে বলে দেবে...”

“হ্যাঁ বল, পুলিশকে কী বলব?”

“তুমি পুলিশকে বলবে হ্যান্ডিক্যাপড বাচ্চা আছে।”

ঝিলের জড়ানো উচ্চারণে প্রথমে জাগরী বুঝতে পারেনি ‘হ্যান্ডিক্যাপড’ শব্দটা। দ্বিতীয় বার শুনে বুঝতে পেরে চমকে উঠল ও। বুকের মধ্যে একটা ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে কেউ যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল হৃৎপিণ্ডটা। এই পীড়াদায়ক শব্দটা ঝিল শিখল কোথা থেকে!

বেশ কিছু ক্ষণ হল সিগন্যালে ওদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, সামনে অনেক লম্বা ট্রাফিক। অনেক ক্ষণ ধরেই কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে মেয়েটা। “মা”, “মা” করে চলেছে। প্রথমটা খেয়াল করেনি জাগরী। সারা দিনই তো বকবক করে যায় ও, সব সময় ওর সব কথা মন দিয়ে শুনে ওঠাও হয় না। কিন্তু এখন হাত ধরে টানাটানি করছিল বলে জাগরীকে ওর দিকে মনটা দিতেই হল, আর তাতেই জানতে পারল ঝিলের মনের মধ্যেকার এই পরিণত ভাবনার কথা।

“বাচ্চা হাঁটতে পারে না, বলে দিয়ো পুলিশকে,” তখনও ঝিল ওর অপরিষ্কার উচ্চারণে কিছু বলে যাচ্ছিল।

গাড়ি থেমে আছে, সামনে ট্র্যাফিক পুলিশ। সবটা দেখে ও নিজের মতো করে ভেবেছে, হয়তো বা পুলিশ গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে। তাই নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিয়েছে মাকে। জাগরী জড়িয়ে ধরল মেয়েকে, ওর বুকের ভিতর থেকে উঠে আসছে কষ্টের দলা।

“কে বলেছে তুমি হ্যান্ডিক্যাপড! এমন কথা বলে না সোনা। হাঁটতে পারো না তাতে কী হয়েছে, আমরা তো গাড়ি করে, হুইল চেয়ারে করে ঘুরি। পুলিশ আঙ্কল তোমায় কিচ্ছু বলবে না, এই তো সিগন্যাল হয়ে গেল। এ বার গাড়ি ছেড়ে দেবে।”

মেয়েকে আশ্বাস দিলেও জাগরীর নিজের ভিতর থেকে কষ্টবোধটা গেল না। ঝিলের বয়স এখন পনেরো হলেও ওর বুদ্ধি অপরিণত, মনের বয়সও অনেক কম। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে তিন-চার বছরের শিশুর সমান। ও যে ‘হ্যান্ডিক্যাপড’, সেই

কথাটা লোকজনের মুখে বার-বার শোনার ফলে শিখেছে, নাকি এ নিয়ে ওর মনে কোনও কষ্ট আছে, সেটা বুঝে ওঠা বড় কঠিন। 'মনের কষ্ট' যে কী জিনিস, সেটা ঝিল উপলব্ধি করতে পারে কি না, জানে না জাগরী। কারণ সেই উপলব্ধিকে কখনও ভাষায় প্রকাশ করেনি ঝিল।

তবে মনে কষ্ট হওয়াটা তো স্বাভাবিক। চার পাশে যখন ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের দৌড়ঝাঁপ করে খেলে বেড়াতে দেখে, তখন নিশ্চয়ই ওরও ইচ্ছে করে, অবশ্যই ইচ্ছে করে, জাগরী নিঃসন্দেহ এই ব্যাপারে। সেটা যখন পারে না, তখন মন খারাপও নিশ্চয়ই হয়।

বছর দুয়েক আগে পাশের বাড়ির একটি বাচ্চার জন্মদিনে উপহার দেওয়ার জন্য একটা সাইকেল কিনে আনা হয়েছিল। সেটা দেখে ঝিল বলতে শুরু করেছিল, "আমার জন্য সাইকেল কিনবে না?"

কথাটা শুনে জাগরী আর সুজয় মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। যে-মেয়ে নিজে থেকে উঠে বসতে পারে না, তাকে সাইকেলে কি চড়ানো সম্ভব! ছোটবেলায় হলে পারা যেত, আর সেটা করা হয়েছেও। তিন-চার বছরের ঝিলকে ট্রাইসাইকেলে বসিয়ে, সিটের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সারা বাড়িতে ঘুরিয়েছে সুজয়। কিন্তু বাইসাইকেলে তো আর সেটা সম্ভব নয়!

"তোমার তো গাড়ি আছে, মা! তুমি তো গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যাও। আর এই সব সাইকেলে যে ছোট্ট বেবিরা চড়ে, তুমি কি ছোট্ট বেবি?" সুজয় মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

ঝিলও মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে ও ছোট্ট বেবি নয়। কিন্তু সাইকেলের কথাটা মাথা থেকে তাড়াতে পারল না। ঘুরে-ফিরে একই কথা ওর, "আমার জন্য সাইকেল কিনবে না?"

এক দিন সন্ধেবেলায় পাশের বাড়ির মাসিমা গল্প করতে এসেছিলেন জাগরীর সঙ্গে। তখনও ঝিলের সাইকেল কেনা হয়নি আর তাই ওর মন থেকে সেই ভাবনাও যায়নি। সাইকেল কেনা নিয়ে সেই প্রশ্ন করাও চলছে অনবরত। মাসিমাও বাড়িতে এসে শুনতে পেলেন ঝিলের সেই প্রশ্ন। তবে কথাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না।

"বৌমা, ঝিল কি বলছে?"

জাগরী বুঝিয়ে দিল মেয়ের কথা। এই ব্যাখ্যাকারের কিংবা বলা যায় দোভাষীর কাজটা ওকে সব সময়ই করতে হয়।

ব্যাপারটা শুনে সেই মাসিমা দুম করে ঝিলকে বলে বসলেন, "তুই কি হাঁটতে পারিস? তুই সাইকেল নিয়ে..."

মাসিমাকে কথাটা আর শেষ করতে দেয়নি জাগরী, ইশারায় থামিয়ে দিয়েছিল। আর পর দিনই ঝিলের জন্য একটা সাইকেল কিনে আনা হয়েছিল।

সেদিন মাসিমাকে থামাতে পারলেও, সবাইকে তো আর থামাতে পারে না জাগরী। থামানো যায় না। তারা নিজেদের কথা বলতে এত ব্যস্ত থাকে যে, অন্য মানুষের উপর সেই কথার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সেটা ভাবার সময় তাদের থাকে না।

ঝিলকে হুইল চেয়ারে দেখেও তাই প্রশ্ন করে, "মেয়ে হাঁটতে পারে না?"

"জন্ম থেকেই এ রকম? আহা রে কী কষ্ট! মেয়ে সন্তান! ডাক্তার কী বলেছে, ভাল হবে না?"

জাগরী বা সুজয় চায় না, ঝিলের সামনে এ সব কথা আলোচনা হোক। কিন্তু এই সব পরিচিত বা অপরিচিত দরদি মানুষেরা সেই কথা বুঝলে তো! হয়তো এ রকম কোনও কথোপকথন থেকেই ঝিল শিখে নিয়েছে এই 'হ্যান্ডিক্যাপড' শব্দটা।

'হ্যান্ডিক্যাপড' তো তবু এক রকম, কেউ-কেউ আবার বলে 'অ্যাবনর্মাল'। রাস্তায় ঝিলকে নিয়ে বেরিয়ে কত বার যে জাগরীকে দেখতে হয়েছে, এক জন কৌতূহলী পথচারী তার সঙ্গের জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, "দেখ! দেখ! বাবা-মা দু'জনেই কী সুন্দর, অথচ বাচ্চাটা অ্যাবনর্মাল।"

আগে জাগরীর ইচ্ছে করত ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করে, "নর্মাল কাকে বলে? আপনারা নিজেরা নর্মাল কি না, ভেবে দেখেছেন কখনও?"

এখন এ সব কথা গা-সওয়া হয়ে গেছে। যারা এ সব বলে, তারা তাদের অজ্ঞানতা থেকেই বলে, এটা ভেবে জাগরী সবাইকেই মনে-মনে ক্ষমা করে দেয় আজকাল, কাউকে কিছুই বলে না।

### ৫

ঘুমন্ত তুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল নয়নিকা, ঠিক যেন দেবশিশু। যত ক্ষণ এই ছেলে জেগে থাকে, তাকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করা যায় না, আবার চোখের সামনে ওর এই দামালপনাও সহ্য করা যায় না। যদিও নয়নিকা জানে, তুষ যা-যা করে তার কোনওটাই জেনে-বুঝে কিংবা অন্যকে জ্বালানোর জন্য করে না। তবু এক-এক সময় ওর কাণ্ডকারখানাগুলো অসহ্য লাগে নয়নিকার। কখনও তুষ বাথরুমে গিয়ে কমোডে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তো কখনও সাবানে বসাচ্ছে কামড়। কোনও সময় নিজেই উঠে বসে থাকছে আলমারির মাথায়। কখনও বা ধাক্কা মেরে ফেলে টিভিটা দিল ভেঙে। ওর ধ্বংসযজ্ঞের অত্যাচারে বাড়িতে খুব কম জিনিসই সঠিক আকার-আকৃতি বজায় রাখতে পেরেছে। এক দিন তো রান্নাঘরে ঢুকে গরম কড়াইতে হাতও দিয়ে ফেলেছিল! রান্নার দিদি দেখতে পেয়ে গেছিল তাই কোনও বড়সড় অনর্থ ঘটেনি। সারা ক্ষণ ওর এই দৌরাত্ম্য দেখতে-দেখতে নয়নিকারও ধৈর্যচ্যুতি হয়। কখনও-সখনও দুমদুম করে গোটা কয়েক বসিয়ে দেয় ছেলেটার পিঠে। কিন্তু তাতে কাঁদে না এই ছেলে, বরং ছেলের মা-ই কাঁদতে বসে রাগ কমার পরে, অনুতাপে। মার খেয়ে তুষ একটু থমকে যায়, কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মা'র দিকে। তার পর আবার নিজের কাজে ডুবে যায়। আগুনকে যে ভয় পেতে হয়, সেটাই বোঝে না যে-ছেলে, বকুনি কিংবা মারধোরের ভয় সে কি করে পাবে!

কথা বলে না তুষ। চার বছর বয়স হয়ে গেছে, কখনও 'মা' বলে ডাকেনি। যত জন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছে নয়নিকা, সকলেই ওকে ভরসা দিয়েছেন, "কথা বলে না মানে, এমন নয় যে বলতে পারবে না। ও কানে যখন শোনে, তখন কথা বলার ক্ষেত্রে কোনও রকম টেকনিক্যাল সমস্যা নেই। ওর ইচ্ছে করে না, তাই বলে না। তবে লেগে থাকতে হবে আপনাকে, হাল ছাড়লে কিন্তু চলবে না।"

হাল ছাড়েনি নয়নিকা। নিজের ভাষা ওকে বোঝানোর সঙ্গে-সঙ্গে চেষ্টা করছে তুষের ভাষা বুঝতে, ওর জগতে ঢোকার চেষ্টা করতে।

"ভাববেন না ওর বুদ্ধি নেই! হয়তো আমার-আপনার চাইতেও ওর বুদ্ধি অনেক বেশি। কিন্তু এরা আমাদের দুনিয়ার সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে চায় না বলে, আমরা ওদের বুঝতে পারি না। এরা নিজেদের তৈরি করে নেওয়া আলাদা জগতের মধ্যে বসবাস করে।"

"কিন্তু আমরা তা হলে কী করব? আমাদের কি কিছুই করার নেই?"

"আছে বইকি! ছোট থেকেই এই বাচ্চাদের ঠিক মতো ট্রেনিং করাতে পারলে অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা সম্ভব। এই দেখুন, এই ছেলেটিকে দেখছেন? এর নাম মায়াঙ্ক, ছেলেটি অটিস্টিক। মায়াঙ্ক যখন আপনার ছেলের বয়সি ছিল, তখন থেকেই ও আমার পেশেন্ট। এই ছেলেটি নর্মাল স্কুলেই পড়ে, এই বছর ক্লাস টেনের বোর্ডের পরীক্ষাতে এইট্টি ফোর পার্সেন্ট পেয়েছে!"

নিজের স্মার্ট ফোন থেকে মায়াঙ্কের ফটো বের করে দেখানোর সময় ডাক্তারবাবুকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল।

"আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাচ্চাকে স্পেশ্যাল স্কুলে ভর্তি করে দিন, আর অ্যাজ় আ পেরেন্ট আপনাদের দু'জনকেও কিছু ট্রেনিং নিতে হবে, কাউন্সেলিং করাতে হবে। আমি সমস্ত কন্টাক্টগুলো দিয়ে দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে দিন। মনে রাখবেন, ওর জন্য এক-একটা দিনও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে নয়নিকা আড় চোখে অরুণের থমথমে মুখটা দেখে নিয়েছিল। তুষ তখন সবে আঠারো মাসের শিশু। এক মাথা কোঁকড়া চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। ফুলো-ফুলো গাল নেড়ে এক নাগাড়ে কী সব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে চলেছে বাবার কোলে চড়ে। এই ছেলেকে দেখে কার সাধ্য বোঝে যে, ও আর পাঁচটা বাচ্চার মতো নয়! নয়নিকা কিন্তু বুঝেছিল একটা কিছু গোলমাল ওর আছে।

বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটতে শিখেছিল তুষ, এক বছরেই। নয়নিকা খুব খুশি হয়েছিল। ছেলেটাকে নিয়ে সারা দিন ফ্ল্যাটে একলা থাকতে হয়। অরুণ তো এ বাড়িতে বলতে গেলে পেয়িং গেস্ট। ছেলেটা চটপট সব শিখে গেলে ওকে একটা নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারলে একটু শান্তি হয়, একটু ঝাড়া হাত-পা হওয়া যায়। কিন্তু নয়নিকার সেই ইচ্ছের ডানাদুটো কাটা পড়ল কয়েক মাস বাদেই।

খটকাটা প্রথম লেগেছিল এক দিন মাঝ রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায়। ঘুমের ঘোরে অভ্যেস মতো পাশে হাত দিয়ে নয়নিকার মনে হয়েছিল, তুষ পাশে নেই! ঘোর কেটে গেছিল ওর। খাট থেকে পড়ে গেল নাকি বাচ্চাটা! তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে দেখল, তুষ বিছানাময় হেঁটে বেড়াচ্ছে নিজের মনে। মাঝ রাতে যে-কোনও বাচ্চারই ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তখন তারা হয় কাঁদে, নয়তো মাকে জাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিছানাময় অস্থির ভাবে কোনও বাচ্চার হেঁটে চলার কথা কখনও শুনেছে বলে মনে হল না নয়নিকার।

"তুষ! কী করছ তুমি! এসো, আমরা ঘুমোই।"

তুষের কানে কথা গেল কি না, বোঝা গেল না। মা'র গলা শুনে সে ফিরেও তাকাল না, যেমন হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছিল, তেমনই হাঁটতে থাকল। নয়নিকা এ বার জোর করে চেপে ধরে শোয়াল বটে ছেলেকে, তবে সে কেবলই উঠে যেতে চায়। এ দিকে বিছানায় এত সব লাফালাফি হুলস্থুল চলাতে বেচারা অরুণের ঘুম গেল ভেঙে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে বলল, "কী শুরু করেছ বলো তো তোমরা? রাতে কি একটু শান্তিতে ঘুমোতেও দেবে না?"

নয়নিকা বলতেই পারত, 'শুরু কি আর আমি করেছি? করেছে তো তোমার ছেলে!'

এটা না-বলে বরং ও বলল, "তুমি পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমোও। ছেলে ঘুমোচ্ছে না, তোমার ঘুমের ডিসটার্ব হবে।"

সেই রাতের কথা আর কাউকে কিছু জানায়নি নয়নিকা, এমনকি অরুণকেও নয়। বরং এর পর থেকে নিজেই একটু বেশি সতর্ক দৃষ্টি রাখা শুরু করেছিল তুষের দিকে। বাচ্চারা সাধারণত যেমন মা-ঘেঁষা হয়, মা'র চার পাশেই ঘুরে-ফিরে আসে, তুষ কিন্তু তেমনটা নয়। নিজের মনেই সারা দিন খেলে বেড়ায়, মা'র কোনও প্রয়োজন ওর আছে বলে মনে হয় না। এই ব্যাপারটাতে আগে কখনও কোনও সন্দেহ হয়নি নয়নিকার, বরং মনে-মনে খুশিই হয়েছিল।

"যাক বাবা! ছেলেটা বেশ স্বাবলম্বী হবে মনে হয়," এটা ভেবে নয়নিকা হাঁপ ছেড়েছিল। সারা দিন "ম্যা-ম্যা" করে ঘ্যানঘ্যান করা বাচ্চাকাচ্চা ওর একদম পছন্দ নয়। কিন্তু এখন তুষের সারা দিন নিজের মনে খেলে বেড়ানো ভাল করে লক্ষ করে নয়নিকার মনে হল, ও যেন সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। ডাকলেও তাকায় না, কাছে আসে না। অথচ কানে যে শোনে না, এমন নয়। টিভিতে কার্টুন চালিয়ে দিলে দিব্যি দেখে এবং শোনেও। কারণ তুষকে নিজের মনে দু'-একটা হিন্দি শব্দ বলতে শুনেছে নয়নিকা। টিভি ছাড়া ওগুলো শুনবে কোথায়! বাড়িতে তো আর ওরা কেউ হিন্দিতে কথা বলে না! আজকাল তুষের চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন উদাসীন লাগে নয়নিকার। অতটুকু বাচ্চা, কিন্তু তাকানো দেখলে মনে হয় কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, অনেক দূরের কিছু দেখছে।

ক'দিন ভাল করে দেখার পর অরুণের কাছে কথাটা পাড়ল নয়নিকা।

"তুষকে এক বার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা সমস্যা আছে ওর।"

"মানে? কী সমস্যা?"

"আমার মনে হচ্ছে তুষ চাইল্ড উইথ স্পেশ্যাল নিড, খুব সম্ভবত ও অটিস্টিক।"

অরুণের মাথায় বাজ পড়ল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিলিং-এর দিকে। এত সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে, তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন, কত রকম ইচ্ছেপূরণের আকাঙ্ক্ষা, সে কি না অটিস্টিক!

অরুণের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছিল নয়নিকা, এই ক'দিন ধরে ওর মনের মধ্যেও তো কম তোলপাড় চলেনি! কিন্তু সেই কষ্টটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে তো চলবে না, এগোতে হবে। সেটাই জীবনের দাবি।

অরুণের পাশে এসে দাঁড়াল নয়নিকা, হাত রাখল ওর কাঁধে।

"এখনই এত ভেঙে পড়ো না। আগে ডাক্তারের কাছে যাই, উনি কী বলেন শুনি। যা-ই হোক না কেন, মন শক্ত করে লড়াই করতে হবে।"

সেই থেকে মন শক্ত করেই তো লড়ে যাচ্ছে নয়নিকা, একাই।

ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুষকে বিশেষ স্কুলে ভর্তি করতে। কারণ 'অটিজ়ম'-এর এখনও পর্যন্ত কোনও ওষুধ নেই, শুধু দরকার ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ। আর সারা দিন এই বাচ্চাদের নানা রকম দরকারি কাজে ব্যস্ত রাখাটা খুব জরুরি। সেটার জন্য সঠিক পথ দেখাতে পারবেন 'অটিজ়ম' নিয়ে কাজ করেন যাঁরা, সেই বিশেষজ্ঞরাই।

মুম্বইয়ে যে-ক'টা অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুলের সন্ধান পেয়েছিল নয়নিকা, তার সবক'টাতেই এক-এক করে ছুটেছিল ও। পর দিন থেকেই। কিন্তু কোনওটাতেই এখন সিট নেই, এক বছরের আগে হবেও না।

"এটা তো নর্মাল স্কুল নয় মিসেস গাঙ্গুলি যে, পঁচিশের জায়গায় ছাব্বিশ জনকে ভর্তি করে নিলে কোনও সমস্যা হবে না। এখানে একটা-একটা করে বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, কারণ প্রত্যেকের প্রয়োজন আলাদা রকমের। তাই এখানে যাহা বাহান্ন, তাহা বাহান্নই, মোটেও তিপ্পান্ন করা যায় না তাকে," সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল নয়নিকার। আরও একটা বছর এই ছেলেকে বাড়িতে রেখে দিলে সমস্যা তো আরও বাড়বে। তখন? সেই সময় পথ দেখিয়েছিলেন নয়নিকার শাশুড়ি-মা।

"তুষকে নিয়ে তুমি বরং শ্রীরামপুরে চলে এসো বৌমা। এখানে এ রকম বাচ্চাদের একটা স্কুল আছে জানি। কাল তোমার শ্বশুরমশাইকে পাঠিয়ে দেব, সব খোঁজখবর নিয়ে আসার জন্য। বছর খানেক না হয় ও এই ইশকুলে যাক! তার পর মুম্বইয়ের ইশকুলে চান্স পেয়ে গেলে, তখন আবার ওখানে ফিরে যেয়ো।"

তাই করেছিল নয়নিকা। ছেলেকে নিয়ে শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই উঠেছিল। তুষকে ওখানকার অটিস্টিক বাচ্চাদের জন্য বিশেষ স্কুলটাতে ভর্তি করাতেও কোনও সমস্যা হয়নি। এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক মিটে যেতে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল নয়নিকা। কারণ তখনও ও জানত না যে, এই স্বস্তির

মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী নয়।

## ৬

"ডেলিভারি কোথায় হয়েছিল আপনার? হাসপাতালে?"

উত্তরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল বিন্দি।

"নর্মাল ডেলিভারি না সিজ়ার?"

রুপুর সমস্যার সঙ্গে এই প্রশ্নগুলো কী ভাবে যুক্ত, সেটা ঠিকমতো না বুঝতে পারলেও ডাক্তারবাবুর প্রশ্নগুলোর পর পর জবাব দিয়ে যাচ্ছিল বিন্দি।

রুপুকে অনেক সময় নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন ডাক্তার দত্তরায়। তার পরেও ওর সমস্যা নিয়ে উনি কোনও কথা বলেননি। এখন বাচ্চাটি 'সিজ়ারিয়ান বেবি' জানার পর বিড়বিড় করলেন তিনি, "তা হলে এমন তো হওয়ার কথা নয়!"

বিন্দি আর শ্যামল উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে ছিল ডা. দত্তরায়ের মুখের দিকে। একটু থেমে ডা. দত্তরায় আবার বললেন, "এই বাচ্চার ব্রেনের কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ওর শরীর ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না। ঠিক কতটা ড্যামেজ হয়েছে, কোন অংশটা ড্যামেজ হয়েছে, সেটা জানার জন্য কয়েকটা পরীক্ষা করাতে হবে। সেই পরীক্ষাগুলো আমি প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলাম, করিয়ে নিয়ে আসুন। তার পর আমরা আলোচনা করব কী ভাবে কী করা যায়।"

"আমার ছেলেটা কি আর ভাল হবে না, ডাক্তারবাবু?" বুক ফেটে বেরিয়ে আসা কান্নাটাকে কোনওমতে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল বিন্দি।

বিন্দির কষ্টটা যে ডাক্তারবাবু বুঝতে পারবেন না, এমন তো নয়!

তিনি নরম স্বরে বললেন, "দেখুন, একটা জিনিস আগে আপনাদের ভাল করে বুঝতে হবে। গাছের ডাল ভেঙে ফেললে সেখান থেকে আবার নতুন ডাল গজায়। আমাদের কোথাও কেটে গেলে আবার সেটা ঠিক জুড়ে যায়, গর্ত হয়ে গেলে মাংস-চামড়া গজিয়ে ভরাট হয়ে যায়। তার কারণ এ সব জায়গায় নতুন করে কোষ তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের ব্রেন যে-সব কোষ দিয়ে তৈরি, সেগুলো এক বার যদি মারা যায়, তবে আর নতুন করে জন্মায় না। তাই আপনার ছেলের ব্রেনের অলরেডি যেটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটা যে আর ঠিক করা যাবে না, এটা মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। আপনাদের দু'জনকেই মন শক্ত করতে হবে।"

"কিন্তু আমার ছেলেটার এ রকম কেন হল, ডাক্তারবাবু? আমার কি শরীরে কোনও দোষ ছিল?"

প্রায় তিরিশ বছর ধরে এই পেশায় আছেন ডা. দত্তরায়। তিনি জানেন, এই দেশের মানুষ এখনও পর্যন্ত সন্তানের কোনও সমস্যার জন্য মা-কেই দায়ী করে। এমনকি মা'র যদি চোখে পড়ার মতো কোনও অপরাধের খোঁজ না পায়, তবে পূর্বজন্মকেও টেনে আনতে কসুর করে না। খুলে বসে তার আগের জন্মের পাপের খতিয়ান। আর সেই সব মায়েরা অপরাধের দায়ভারে গুটিয়ে যায়। ক্রমশ লুকিয়ে ফেলে নিজেদের অস্তিত্ব। তাই এই অল্পবয়সি মা-র মনে যাতে কোনও ভুল ধারণা না জন্মায়, সেই ব্যাপারে সচেষ্ট হলেন ডা. দত্তরায়। কারণ মা যদি অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে সবচেয়ে ক্ষতি হবে এই শিশুটির, যার কিনা সব সময়ই অন্য আর পাঁচটা বাচ্চার চাইতে অনেক বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন।

"নিজেকে শুধু-শুধু দায়ী করবেন না, কারণ এখানে আপনার কিছুই করার ছিল না। বাচ্চার জন্মের পর ব্রেনে অক্সিজেন ঠিকমতো না-পৌঁছলে কিংবা মাথায় কোনও ভাবে চোট পেলে এমন হতে পারে। আমার বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এটাই সত্যি যে, ডেলিভারি করানোর সময় ডাক্তার-নার্সদের আরও একটু যত্ন নিয়ে কাজ করা উচিত ছিল!"

দোষটা কি ডাক্তারবাবুর ছিল? নাকি নার্সদের? নার্সিংহোমে সাদা পোশাক পরা যে-মহিলারা নার্স হিসেবে ডিউটি করছিল, তারা কি সত্যি-সত্যিই ডিগ্রি পাওয়া নার্স ছিল? নাকি আয়া হিসেবে কাজ করতে ঢুকে, সময়ের দাবি আর রোজকার মাজাঘষাতে আয়ার প্রচ্ছদ খসিয়ে ফেলে নার্স পদে উঠেছে?

এ সব প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তরই নেই মিতুর কাছে। উত্তর খোঁজার ইচ্ছেও নেই ওর। কী হবে এখন এই সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে! সময়কে তো আর পিছনের দিকে হাঁটানো যাবে না, ফলে শুধু-শুধু সময় আর শক্তি দুইয়েরই অপচয় হবে। পরিচিত অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিল, "নার্সিংহোম আর ডাক্তারের নামে মামলা ঠুকে দাও।" কিন্তু ওই পথে হাঁটতে মন সায় দেয়নি মিতুর, তাই অশোককেও নিষেধ করেছে।

"কী হবে বল মামলা করে? কেবল এক গাদা টাকা আর সময় নষ্ট। যদি শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেও যাই, তাতেই বা কী হবে? কিছু টাকা পাব ক্ষতিপূরণ হিসেবে, এই তো? কিন্তু ক্ষতি কি আমাদের সত্যি-সত্যি পূরণ হবে তাতে? আমার তো মনে হয়, ও সব চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের এখন সমস্ত মনোযোগ মেয়ের দিকে দেওয়া উচিত।"

মিতশ্রীর যুক্তি মেনে নিয়েছিল অশোক। বয়সে অশোকের চাইতে অনেকটা ছোট হলেও মিতুর চিন্তাভাবনা বরাবরই স্বচ্ছ আর যুক্তিযুক্ত, তাই স্ত্রীর চিন্তাভাবনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় অশোক।

সময়ের কয়েকটা দিন আগেই জন্মে গেছে কুট্টি। যে-রাতে মিতুকে আগাম প্রস্তুতি ছাড়াই নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছিল, সেই রাতে অশোক বাড়িতে ছিল না। অবশ্য থাকলেও যে চিত্রটা অন্য রকম কিছু হত, সে কথাটাও জোর দিয়ে বলা যায় না। এই ব্যাপারে যখনই মিতুকে কিছু বলতে গেছে অশোক, ও সঙ্গে-সঙ্গে থামিয়ে দিয়েছে।

"তুমি কেন শুধু-শুধু নিজেকে দোষী ভাবছ? কী কারণে এমন হয়েছে, তার সদুত্তর তো ডাক্তাররাও দিতে পারেননি। সুতরাং, তুমি বাড়িতে থাকলেই যে এমন হত না, তার কোনও গ্যারান্টি আছে?"

"আমি থাকলে আরও আগে নার্সিংহোমে অন্তত ভর্তি করতে পারতাম তো।"

"তা অবশ্যই পারতে, কিন্তু সেপটিসেমিয়া হয়ে যাওয়াটা কি ঠেকাতে পারতে?"

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে হল অশোককে। সেপটিসেমিয়া মানে রক্তে ইনফেকশন হয়ে গেছিল মিতুর, সম্ভবত অপারেশন থিয়েটার থেকেই, সেটাতে তো সত্যিই তার কিছু করার ছিল না।

"তবে? তাই বলছি শুধু-শুধু চিন্তা করে, নিজেকে দোষী ভেবে কষ্ট পেয়ে কী লাভ বলো! যেটা হওয়ার থাকে, সেটাই হয়, কারও ক্ষমতা নেই যে তাকে ঠেকায়। নিজের চোখেই তো দেখলে, আমার বাবা-মা কত চেষ্টা করেছিল, তবু কি পারল তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা ঠেকাতে?"

শেষ কথাটা বলে দুষ্টুমি-ভরা চোখে তাকিয়ে হাসল মিতু, সঙ্গে ভ্রু নাচিয়ে নিরুচ্চারে যেন অশোককে বলতে চাইল, 'কী, কেমন দিলাম!'

ব্যস, অমনি পরিবেশের ভার হালকা হয়ে গেল। মেয়েটার মধ্যে এই একটা ব্যাপার আছে, সব কিছুকে সহজ করে দেখতে জানে। ওর এই স্বভাবটা অশোকের খুব ভাল লাগে।

মিতুর নাকটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে অশোক বলল, "ঠিক বলেছিস! তা হলে আজ থেকে আর এ সব ভাবব না।"

তার পর মেয়েকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সারা দিন মিতুই সামলায় কুট্টিকে। অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলা অশোক ওকে নিয়ে খানিক ক্ষণ বাইরে ঘুরে এলে মিতু একটু স্বাধীনভাবে নিজের

সঙ্গে সময় কাটাতে পারে। তাতে কুট্টির একটু বেড়ানোও হয়, সেই সঙ্গে বাইরের দুনিয়াটাও চিনতে-জানতে পারে।

অশোক কুট্টিকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর মিতু নিজের শরীরটা বিছানায় ফেলে দিল। আপাতত ঘণ্টা দেড়েক নিশ্চিন্ত। তার পর বাড়িতে ফিরে অশোক আধ ঘণ্টা মেয়েকে নিয়ে কসরত করবে। বিশেষ ধরনের জুতো পরিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখবে, ধরে-ধরে একটু হাঁটানোর চেষ্টা করবে। তখন রাতের খাবারের ব্যবস্থা করবে মিতু।

চার বছর বয়স কুট্টির। এখনও হামা দিতেও শেখেনি। শুধু উঠে বসতে পারে। তাই হামা দেওয়া, দাঁড়ানো, হাঁটতে শেখানোর জন্য নিয়ম করে ওকে ব্যায়াম করাতে হয়। সকালে এই কাজটা মিতুই করে, আর রাতে অশোক। শুধু ব্যায়াম করানোই নয়, স্পিচ থেরাপিও করাতে হয়। এখনও কথা বলাও শেখেনি মেয়েটা। ডাক্তারবাবু বলেছেন, নিয়ম করে সমস্ত রকম থেরাপি চালিয়ে গেলে ফল মিলতে পারে, দেরিতে হলেও। আর

দেরি তো হবেই, কুট্টি যে মানসিক ভাবে পিছিয়ে থাকা শিশু, ডাক্তারেরা যাকে বলেন 'মেন্টালি রিটার্ডেড'।

তলপেটে একটা ব্যথা আর অস্বস্তি হওয়ায় ঘুম ভেঙে গেছিল সেদিন রাতে। অস্বস্তিটা ঠিক কী জাতীয়, বুঝতেও পারছিল না মিতু। এক বার মনে হয়েছিল, টয়লেট পাচ্ছে বোধ হয়। টয়লেটে যাওয়ার জন্য বিছানা ছেড়ে নামতেই কাণ্ডটা হয়েছিল, দু' পা বেয়ে নামতে শুরু করেছিল জলের ধারা। প্রথমটা মিতু ঠিক বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল, টয়লেট হয়ে গেল বোধ হয়! তার পর বুঝতে পারল, এই জলের ধারার উৎস অন্য,
এটা টয়লেট নয়। তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে পড়ার পরও যখন জলের স্রোত বন্ধ হল না, ভেজা বিছানাতে অস্বস্তি বাড়তে লাগল, সঙ্গে ভয়ও, তখন বালিশের পাশে রাখা ফোনটা নিয়ে মিতু ফোন করেছিল শাশুড়ি-মাকে। উনি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। শাশুড়ি-মা উঠে এসে সব দেখে শুনে বললেন, "তোমার তো জল ভেঙে গেল! ছেলেকে ফোন করি, ভর্তি করতে হবে।"

'জলভাঙা' বিষয়টা কী সঠিকভাবে বুঝতে না-পারলেও মিতু এটুকু বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটা গুরুতর। তখনও ওর সন্তান জন্মের নির্দিষ্ট দিন আসেনি। একুশ দিন বাকি ছিল। কিন্তু এখনই ভর্তি করার কথা শুনে ভয়ে ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কোনওমতে অশোকের নম্বরটা টিপে ফোনটা শাশুড়িকে দিয়ে দিয়েছিল।

অশোকের সঙ্গে শাশুড়ি-মা'র কী-কী কথা হয়েছিল ঠিক শোনেনি মিতু। কারণ তখন ওর পেটের যন্ত্রণাটাও বাড়ছিল, সঙ্গে একটা নীচের দিকের চাপ। হাত-পা তখন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল, নাকি অবশ, সেটা এখন আর মনে করতে পারে না। তবে একটা-দুটো ছিটকে আসা কথা কানে এসেছিল, "কী করে নিয়ে যাব? এত রাতে গাড়ি কোথায় পাব?"

ও দিকের জন কী বলেছিল, সেটা জানে না মিতু। তবে খানিক বাদে শাশুড়ি-মা বললেন, "ঠিক আছে। তুই সাবধানে আয়, তাড়াহুড়ো করে বিপদ বাঁধাস না।"

"কী বলল?"ফোন রাখার পর শাশুড়ি-মাকে জিজ্ঞেস করেছিল মিতু।

"ও নার্সিংহোমে ফোন করে সব ব্যবস্থা করে রাখছে, গাড়ি পাঠানোরও ব্যবস্থা করছে। গাড়ি এলেই আমরা রওনা দেব।"

মাঝ রাতে মানুষজনকে ফোন করে ঘুম থেকে তুলে গাড়ির ব্যবস্থা করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। বিশেষত মফস্‌সলে। গাড়ি পেলেই তো হবে না, গাড়ি চালাতে পারে এমন লোকও তো চাই। অশোকের বন্ধুদের মধ্যে যে দু'-এক জনের গাড়ি ছিল, তারা কেউ চালাতে পারত না। আর ওদের মফস্‌সলি নার্সিংহোমের নিজেদের অ্যাম্বুলেন্সও ছিল না। হাসপাতালে ভর্তি করা হলে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যেত বটে, কিন্তু তা হলে নিজের ডাক্তারবাবুকে পাওয়া যেত না। কারণ মিতুকে প্রথম থেকে যে-ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল, তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের চাপে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন বছর দুয়েক আগে। অগত্যা এক জন বন্ধুর ঘুম ভাঙিয়ে, তাকে দিয়ে ভাড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে পাঠাতে হল অশোককে। আর এটা করতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লেগে গেল। মিতুকে নিয়ে অশোকের বাবা, মা এবং ওই বন্ধুটি নার্সিংহোমে ভর্তি করতে পারল অবশেষে। তবে সব নিয়মকানুন পর্ব সেরে ওকে যখন অপারেশন টেবিলে তোলা হল, তখন দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মা'র পেটের ভিতরকার অন্ধকারের দুনিয়া থেকে আলোয় আসার জন্য বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করে বিফল হয়ে, তত ক্ষণে ক্লান্তিতে হাল ছেড়ে দিয়েছে শিশুটি।

## ৭

"ক্লান্তি আসবেই, তবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। সব সময় চেষ্টা করেই যেতে হবে, এক মুহূর্ত থামলে চলবে না," কথাটা বলেছিলেন মিসেস দেব।

আর এটাকেই এখন গুরুদেবের মন্ত্রের মতো করে সারা ক্ষণ জপ করে বিন্দি। নিজেকে তো বলেই মনে-মনে, এমনকি রুপুকেও বলে ব্যায়াম করানোর সময়। কথাটা শুনে রুপু কী বোঝে কে জানে, কিন্তু শুনলেই ফিক করে হেসে ফেলে। কয়েকটা ফিজিয়োথেরাপি আছে রুপুর, যেগুলো করাতে গেলে ছেলেটা ব্যথা পায় সম্ভবত। তাই করাতে দিতে চায় না, কাঁদে। বিন্দি দেখেছে, তখনও এই কথাটা ওর কানে-কানে বললেই চুপ করে যায়, হেসে ফেলে। বিন্দিও সুযোগটা কাজে লাগায়।

হাল তো ছাড়েনি বিন্দি, ছাড়লে রুপুর এ টুকুও হত না। লেখাপড়া খুব বেশি করেনি বিন্দি, নিজের বুদ্ধির উপর খুব বেশি ভরসাও রাখে না সব সময়, কিন্তু এই ব্যাপারটার সারবত্তা ও বুঝে গেছে। রুপুকে যখন পৃথিবীতে এনেছে সে, তখন এই অসহায় শিশুটাকে এই পৃথিবীতে টিকে থাকার উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্বও তার। তাই এই একটা ব্যাপারে শ্বশুর-শাশুড়ির মতের বিরুদ্ধে যেতেও বিন্দি ভয় পায়নি।

রুপুর যখন বছর তিনেক বয়স, তখন শাশুড়ি কথাটা পেড়েছিলেন। হয়তো শ্বশুরের সঙ্গে আগেই আলোচনা হয়ে গিয়ে থাকবে।

"বৌমা! তোমার এ বার আর-একটা বাচ্চা নেওয়া উচিত। না হলে তোমাদের অবর্তমানে এই ছেলেকে কে দেখবে!"

বিন্দি ভাল করেই জানত, যে-কোনও দিন এ রকম একটা প্রস্তাব আসবে। তাই মনে-মনে জবাব তৈরি করেই রেখেছিল। শ্যামলের সঙ্গে আলোচনাও করে রেখেছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে। শ্যামল যদিও প্রথমে বিন্দির মতো করে ভাবেনি বিষয়টা, তবে টাকাপয়সার কথাটা ভেবে থমকে গেছিল। আর শেষ পর্যন্ত বিন্দির মতেই মত দিয়েছিল। সেই সাহসে ভর করেই বিন্দি শাশুড়িকে বলল, "রুপুকে সুস্থ করে তোলার জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে মা, ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন। সংসারের কাজকর্ম সামলে, আরও একটা বাচ্চাকে বড় করার ঝক্কি-ঝামেলা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর তা ছাড়া আপনার ছেলেরও তো তেমন রোজগার নেই, আজকের দিনে দুটো বাচ্চাকে বড় করা..."

"তোমার এ ছেলে সুস্থ হবে বলে ভাবছ? আমাদের জ্ঞাতির সম্পর্কে এক জনের ছিল এমন ছেলে, সব সময় তো বিছানায় পড়ে থাকতেই দেখেছি। আর তা ছাড়া, বলতে নেই, এ সব ছেলেপিলে বাঁচেও না বেশি

দিন।”

“সে যাই হোক। আমি তো ওর মা, আমাকে চেষ্টা করে যেতেই হবে। আমি কি আমার সন্তানকে ফেলে দিতে পারি! ওর যত দিন আয়ু আছে, থাকবে। তাই বলে অবহেলায়, অযত্নে ওকে চলে যেতে দেব না আমি।”

বৌয়ের কাছে এমন বিদ্রোহী জবাব আশা করেননি শাশুড়ি। বিন্দি বরাবরই নরমসরম, মুখে-মুখে কথা বলে না। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, “ফেলতে তোমাকে কে বলেছে! তোমার মা’র কাছে দিয়ে দাও, কিংবা কোনও আশ্রম-টাশ্রমে। গোটা জীবনটা পড়ে আছে তোমাদের, কী-ই বা বয়স! আমি যা বলছি তোমাদের ভালর জন্যই বলছি।”

বিন্দির এ বার ধৈর্যচ্যুতি হল। এত ক্ষণ শান্তভাবে কথা বলছিল। এই কথা শোনার পর আর পারল না।

“একটা অসহায় শিশু, মা-বাবা থাকতেও তাকে অনাথ করে দেব? এ সব আপনি কী বলছেন! আপনি তো নিজেও এক জন মা! রুপু একটা মানুষ, ও আমাদের সন্তান। পুরনো ছেঁড়া জামাকাপড়ের মতো ওকে বাতিল করে দিয়ে একটা ভাল জামা কিনে আনার মতো, আর-একটা সন্তান আনা যায় নাকি! আমি এই কাজ করতে পারব না।”

শাশুড়ি অপমানিত হলেন, রাগও হল খুব। এ বার তাই ঝুলি থেকে বের করলেন ব্রহ্মাস্ত্র, “শ্যামল জানে তোমার এই আদিখ্যেতার কথা?”

“জানে বৈকি। তারও একই মত।”

শাশুড়ি আর কিছু বললেন না, নিজের মনে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। বৌয়ের স্পর্ধায় তিনি স্তম্ভিত। কোথায় এমন একটা ছেলের জন্ম দিয়েছে বলে লজ্জায় গুটিয়ে থাকবে, তা না এতটা বাড় বেড়েছে! তিনি এত দিন বুঝতে পারেননি, তলে-তলে এমন দুঃসাহস হয়েছে বিন্দির।

শাশুড়িকে কথাগুলো বলে ফেলে নিজের সাহসে নিজেই অবাক হয়ে গেল বিন্দি। মাত্র দু’বছর আগেও শাশুড়ির মুখের উপর একটা কথাও বলতে পারত না ও। উনি ভুল বলছেন সেটা বুঝতে পারলেও না। আর আজ এমন কটকট করে কথা শুনিয়ে দিতে পারল!

নিজের এই পরিবর্তনের জন্য মনে-মনে মিসেস দেবকে ধন্যবাদ জানাল ও। উনিই তো পথ দেখাচ্ছেন বিন্দিকে, বিন্দির মতো আরও মায়েদের। অথচ ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার কোনও কথাই ছিল না, হয়ে গেল একেবারে অযাচিত ভাবে।

ডাক্তারবাবুর করতে দেওয়া সমস্ত পরীক্ষার রিপোর্টগুলো নিয়ে ওরা দেখাতে গেছিল কলকাতায়। সব কিছু দেখে উনি বলেছিলেন, “এই বাচ্চার অসুখটার নাম সেরিব্রাল পলসি, মানে ব্রেনের প্যারালিসিস। আগের দিনই আপনাদের বলছিলাম, ওর মাথার কিছু কোষ মারা গেছে। তাই আর-পাঁচটা বাচ্চার মতো ও যে-সময়ে যেটা শেখার কথা, সেটা শিখতে পারছে না।”

“এই অসুখের কোনও চিকিৎসা হয় না?” শ্যামল জিজ্ঞেস করল।

“কোনও ওষুধ নেই এর জন্য, আগেই বলেছি। কারণ নতুন করে ব্রেনের কোষ তৈরি করা যায় না। তবে আশার কথা কি জানেন? আমাদের ব্রেনে যত কোষ আছে তার অর্ধেক কাজ করে, বাকি অর্ধেক চুপচাপ ঘুমোয়। চেষ্টা করলে ওই ঘুমন্ত কোষগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে, ওদের দিয়ে কাজ করানো যায়।”

এই কথা শুনে একটু আশার আলো দেখতে পেল বিন্দি। গত দু’মাসের মধ্যে এই প্রথম একটা ভাল কথা শুনল। তাই আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, “কী ভাবে?”

“যে ভাবে কুঁড়েদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়, সেই ভাবে। ওই কোষগুলোকে কাজগুলো শেখাতে হবে, ওদের নিয়মিত ট্রেনিং দিয়ে কাজের অভ্যেস তৈরি করিয়ে দিতে হবে।”

ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ই ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার একটা সরকারি হাসপাতালের, যেখানে এই রকম বাচ্চাদের চিকিৎসা হয়। আউটডোরে রোগীকে দেখাতে হবে, তার পর ওঁরা যে ব্যায়ামগুলো দেখিয়ে দেবেন, সেগুলোই বাড়িতে গিয়ে রোজ করাতে হবে। ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে, ওঁর সহকারীর কাছে সেই হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা বুঝে নিচ্ছিল শ্যামল। কলকাতার পথঘাট বিশেষ সড়গড় নয় ওর। একা থাকলে তবু ঠোক্কর খেতে-খেতে পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গে বৌ-বাচ্চা রয়েছে, সেই ঝামেলা পোষাবে না।

রোগীদের অপেক্ষা করার জন্য যে-ঘরটা রয়েছে, সেখানে বসে ছেলেকে খাইয়ে নিচ্ছিল বিন্দি। অনেকটা পথ যেতে হবে। ঘণ্টা চারেক লেগে যাবে বাড়ি পৌঁছতে। খিদে পেয়ে যাবে রুপুর। সঙ্গে ফ্লাস্কে গরম জল, দুধের কৌটো, ফিডিং বোতল এনেছে , আর-একটা বোতলে মিছরির জল। রাস্তায় কান্নাকাটি করলে মিছরির জলের বোতলটাই মুখে দিয়ে দেবে।

ছেলের মুখে দুধের বোতলটা গুঁজে দিয়ে বিন্দি ডাক্তারবাবুর বলা কথাগুলো ভাবছিল। অত দূর থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে রুপুর চিকিৎসা করানো কি সম্ভব হবে! তাও যদি টাকাপয়সা থাকত, একটা চেষ্টা করা যেত। গাড়ি ভাড়া করে মাসে এক বার করে কলকাতায় নিয়ে আসতে বিশেষ অসুবিধা হত না। ভগবানের যে কেমন বিচার! গরিবের ঘরে দিয়েছেন রাজার অসুখ!

“কোথা থেকে এসেছেন আপনি?”

নিজের ভাবনায় এমন ডুবে গেছিল বিন্দি যে, কখন ভদ্রমহিলা পাশের চেয়ারটাতে এসে বসেছেন খেয়ালই করেনি। এখন ওঁর প্রশ্নে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখতে পেল মহিলাকে, সঙ্গে বছর আটেকের একটা মেয়ে। একটা হুইল চেয়ারে মেয়েটা বসে আছে দেখে, বিন্দি বুঝতে পারল মেয়েটা হাঁটতে পারে না।

“রানাঘাট।”

মহিলাটিকে দেখে বিন্দির মনে ভরসা জেগেছিল, তাই উত্তর দিল। নয়তো মা’র দেওয়া শিক্ষাটাই কাজে লাগাত।

“রাস্তাঘাটে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলবি না। যাকে-তাকে হুটহাট করে বাড়ির ঠিকানা বলবি না,” মা শিখিয়েছিলেন ছোটবেলায়। এখন ওই মহিলার সঙ্গে থাকা মেয়েটিকে দেখে বিন্দি বুঝতে পারল, মহিলাটি যতই অপরিচিত হোন না কেন, বিন্দির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বইকি! অন্য এক সূত্রে তারা পরিচিত, তাই নির্ভয়ে মুখ খুলল ও।

মেয়েটা যে রুপুকে দেখে বেশ খুশি হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। “বাই, বাই” বলছিল আর কেমন হাসছিল। ওর মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছিল গলায় লাগানো একটা তোয়ালে রুমালে।

“হ্যাঁ সোনা! ছোট্ট ভাই!” বলতে-বলতে বেশ যত্ন করে ওর মুখটা মুছিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা।

বিন্দি মেয়েটাকে দেখছিল আর ভাবছিল রুপুও কি তা হলে এ রকমই হবে!

এই বয়সেই মেয়েটার চোখে চশমা, আর চশমার পিছনে ওর যে চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল, সেটা বেশ ভাল রকমের ট্যারা।

“আপনারা কোথায় থাকেন?”

বিন্দির মনে এখন অনেক প্রশ্ন। অনেক কিছু জানার আছে এই মহিলাটির কাছ থেকে, তাই ও ভাব জমাতে চাইল। অবশ্য এ জন্য ওকে বিশেষ চেষ্টা করতে হল না। ভদ্রমহিলা বেশি আলাপী, ভালমানুষ। বিন্দি যে এই পথে সদ্য হাঁটা শুরু করেছে, সেটা বুঝতে পেরে নিজে থেকেই অনেক কথা

বললেন, “আমার মেয়ের বয়স ন' বছর। মানে বুঝতেই পারছ ন'টা বছর ধরে লড়াই করছি আমি। কাজেই অভিজ্ঞতাও অনেক হয়েছে। তুমি যদি আমার পরামর্শ শোনো, বলতে পারি।”

‘আপনি’ থেকে তত ক্ষণে ‘তুমি’তে নেমে এসেছেন মহিলা। আর তাতেই তার আন্তরিকতার ছোঁয়াটাও ধরা পড়েছে বিন্দির কাছে। বিন্দি যেন হাতে চাঁদ পেল এই প্রস্তাবে, তাড়াতাড়ি বলল, “আপনার পরামর্শ পেলে তো খুবই উপকার হবে, দিদি! আমরা তো এ সব কিছুই জানি না, ছেলে নিয়ে একেবারে অথৈ জলে পড়ে গেছি।”

“প্রথম-প্রথম কেউই কিছু জানে না! আমিও কি আর কিছু জানতাম! তার পর যখন জলে পড়লাম, বাধ্য হয়ে সাঁতার শিখতে হল।”

ওই মহিলাই বলেছিলেন মিসেস দেব এর কথা। দিয়েছিলেন ফোন নাম্বার, ঠিকানা। বলেছিলেন, “ডাক্তারবাবু যে হাসপাতালে যেতে বলেছেন, সেখানে এক বার যেতে পারো। তবে তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। রানাঘাট থেকে এই ছেলেকে নিয়ে বার বার কী ভাবে আসা-যাওয়া করবে? বরং ওঁর সেন্টারে যাও, ওখানেই আসল কাজটা হবে। আর মিসেস দেবকে দেখলে, তাঁর সঙ্গে কথা বললে তোমরা মনের জোরও পাবে।”

“মিসেস দেব কি ডাক্তার?” তত ক্ষণে শ্যামলও চলে এসেছিল ওখানে, ভদ্রমহিলার কথাগুলো শুনেছিল, প্রশ্নটা সে-ই করল।

“না, ডাক্তার নয়, এক জন মা। আমাদের মতো একটা বাচ্চা ওঁকেও ভগবান দিয়েছেন। উনি কিন্তু তাতে দমে যাননি, এই বাচ্চাদের সঠিকভাবে থেরাপি করানোর জন্য একটা সেন্টার তৈরি করেছেন। আমাদের বাচ্চাদের জন্য আলাদা রকমের স্কুলও আছে ওঁর। আমার মেয়ে তো রোজ ওই স্কুলেই যায়। আমার মেয়ে যতটুকু যা শিখেছে, ওই স্কুলে গিয়েই শিখেছে।”

মেয়েটা মন দিয়ে মা'র কথা শুনছিল। ওর দিকে এত ক্ষণ বিন্দি বা শ্যামল মনোযোগ দেয়নি, কিন্তু এ বার ওর কথা ওঠাতে চোখ নিজে থেকেই চলে গেল হুইল চেয়ারে বসা বাচ্চা মেয়েটার দিকে। স্কুলের কথা, ম্যাডামের কথা শুনে অভ্যেসের বশেই সম্ভবত, বাচ্চাটা হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, “গুগ মর্ণিং আন্তি।”



“গুড মর্নিং ম্যাডাম!”

সম্ভাষণটা কানে গেছিল বটে, তবে জাগরী তাতে মুখ তুলে তাকায়নি, হাতে থাকা বইটাতেই নিমগ্ন ছিল।

জায়গাটা কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত। এত লোকজন থিকথিক করছে চার পাশে। এত হইচই কথাবার্তা চার পাশে। ফলে কে যে কার জন্য দিনের শুভারম্ভ চাইছে, বোঝা মুশকিল!

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক পুরনো অভ্যেস ছাড়তে হলেও এই নেশাটা জাগরীর আজও আছে। গোলপার্ক হোক কিংবা কলেজ স্ট্রিট, পুরনো বইয়ের দোকানে এসে বই ঘাঁটতে ওর আজও ভাল লাগে।

আজ হাতে বেশ খানিকটা সময় আছে, এমন ছুটি সচরাচর মেলে না। ঝিল আজ বাড়িতে ফিরবে না, ক্লাসের পর স্কুলেই থাকবে। এই ব্যবস্থাটা নতুন চালু হয়েছে ওদের স্কুলে। দশ বছরের বেশি বয়সিদের, বাবা-মাকে ছেড়ে থাকার অভ্যেস করানোর জন্য, আত্মনির্ভরতার প্রথম পাঠ হিসেবে মাসে এক দিন করে রাতে রেখে দেওয়া হয়। এ জন্য ওদের আলাদা ব্যবস্থা আছে। ঝিলকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে জাগরী তাই বই পাড়ায় চলে এসেছে, অনেক দিন পর এখানে অনেকটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরবে।

“জরি! তোমাকেই বলছি!”

এই নামে তো এক জনই ডাকত! অনেক বছর পর সেই নামটা কানে যেতে বুকের রক্ত ছলকে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল জাগরী।

“নিলয়!”

নিলয়ের সঙ্গে এই জীবনে আবার যে কখনও দেখা হয়ে যাবে, ভাবেনি জাগরী। চায়ওনি। সেই সব দিনগুলোতে, যখন তারা আরও বেশি কাছাকাছি আসতে পারত, তখন জাগরীই তো স্বেচ্ছায় সরে এসেছিল। এড়িয়ে গিয়েছিল সাক্ষাতের সম্ভাবনা। হাতের উপর হাত রাখার ব্যাপারটা নিলয়ের কাছে বেশ কঠিন, সেটা জানার পর থেকে কলেজেই নিলয়কে এড়িয়ে যাওয়া শুরু করেছিল জাগরী। একটা পরিণতিহীন সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। নিলয় প্রথম-প্রথম বুঝতে পারেনি। আগের মতোই বন্ধুত্ব আশা করে অপেক্ষায় থাকত, কিন্তু জাগরী সাড়া দেয়নি আর।

তার পর এম এ পড়তে জাগরীর কলকাতায় চলে আসা। পাশ করার পর বিয়ে। কলকাতাতেই পাকাপাকি বসবাস। নিলয়ের সঙ্গে পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অবশ্য, বাইরে যোগাযোগ না-থাকলেও ভিতরের টানটা কোনওদিনই মরেনি জাগরীর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর দু'বেলা যে-রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত, সেই রাস্তা প্রতি দিনই নিলয়কে মনে পড়ায়। কলেজ স্ট্রিটের গলিঘুঁজি, পুরনো বইয়ের দোকান, এ সমস্তই তো নিলয়ের সঙ্গে ঘুরে বেরিয়ে চেনা। পুরনো বইয়ের পাতা ওল্টানোর সময় যে গন্ধটা পাওয়া যায়, সেই গন্ধটা আজও নিলয়কে মনে পড়ায়। প্রথম বার জাগরীর কফি হাউসে আসা, সে-ও নিলয়ের সঙ্গেই। এম এ ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে কফি হাউসে এসে তাই ওর চোখ সব সময় খুঁজে বেড়াত সেই চেনা মানুষটাকে, যাকে সে নিজেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন মাঝে-মাঝেই মনে হয় জাগরীর, এতটা কঠিন সেই সময় না-হলেই বোধ হয় ভাল হত! না হয় বন্ধু হয়েই থাকা যেত যত দিন সম্ভব হত!

সকলের চোখ এড়িয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও খুঁজেছে জাগরী, কিন্তু নিলয় সান্যাল-এর কোনও কবিতা দেখেনি। ‘হয়তো কবিতা লেখাটাও ছেড়ে দিয়েছে, বড্ড খামখেয়ালি!’ ভেবে নিয়েছিল ও।

আর কোনওদিন নিলয়ের সঙ্গে দেখা হবে না, এটা যখন মোটামুটি মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে জাগরী, তখন, এতগুলো বছর পরে, সেই কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানের সামনেই নিলয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা স্বপ্ন দেখার মতো মনে হচ্ছিল ওর।

“কী দেখছ এমন হাঁ করে? খুব বদলে গেছি নাকি? সরে এসো, যদি লোকজনের ধাক্কা না খেতে চাও।”

জাগরীর হাত ধরে টান দিয়ে ওকে এক পাশে সরিয়ে আনল নিলয়। না হলে ও সত্যি-সত্যিই ধাক্কা খেত বিরাট এক বইয়ের বোঝা নিয়ে প্রায়-ছুটতে থাকা কলেজ স্ট্রিটের কোনও এক দোকান কর্মীর সঙ্গে।

“কফি হাউসে যাবে?” অত্যন্ত সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল নিলয়, যেন ওদের মধ্যেকার দীর্ঘ যোগাযোগহীনতাটা একটা বিভ্রম মাত্র, যেন গত কালও ওদের দেখা হয়েছিল।

নিলয়ের প্রশ্নের উত্তরে সম্মোহিতের মতো মাথা নাড়ল জাগরী, তার পর ওর পিছন-পিছন চলতে লাগল।

“ওর কাছে তোমার বড় কোনও ঋণ রয়ে গেছে, জরি। সেটা এ বার তোমাকে শোধ করতে হবে। তোমার সেবা নেওয়ার জন্যই ও তোমার কাছে এসেছে।”

ঝিলের কথা জানার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলল নিলয়, এক বারের জন্যও ওর মুখে দুঃখের ছাপ দেখা গেল না কিংবা “আহা, উহু” করতে শোনা গেল না।

“ইউ মিন পুবর্জন্মের ঋণ? তুমি এ সব

জন্মান্তরে বিশ্বাস করো?"

"বিশ্বাস না-করারও তো কিছু নেই। যা-কিছু আমরা জানি না, তা যে থাকতে পারে না, এটা বিশ্বাস করারই বা কী কারণ আছে বলো তো?"

এই নিলয়কে যত দেখছিল, অবাক হচ্ছিল জাগরী। অল্প বয়সে অমন স্বপ্নের জগতে অনেকেই বাস করে, তবে বয়স বাড়লে, বাস্তবের ছ্যাঁকা খেলেই সেই ঘোরের মধ্যে থাকা ভাবটা উবে যায়। কিন্তু এর তো উল্টো ব্যাপার হয়েছে! আগে নিলয় ছিল সিকি পাগল, এখন বারো আনাই খ্যাপাটে!

ঝিলের প্রসঙ্গটা বদলানোর জন্য জাগরী প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ নাকি?"

কথাটা শুনে থমকে গেল নিলয়। কফির কাপ থেকে মুখ তুলে মুচকি হাসল। চোখের দৃষ্টিটাও দুষ্টুমিমাখা। বলল, "ছেড়ে দিলে কি তুমি খুশি হতে? ও সব ছাইপাঁশ লেখা ছেড়ে দেওয়াই উচিত, তাই না?"

জাগরী একটু বিব্রত হল, কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হয়নি। কে যে কোন কথায় ব্যথা পায়, বোঝা দায়! পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, "না, না! আমি কি তাই বলেছি নাকি! আসলে তোমার লেখা কোথাও দেখি না তো, তাই আর কী..."

"আমার লেখা তুমি খোঁজো, জরি? সত্যি?"

"খুঁজি তো! যে-সব পত্রিকা নিয়মিত কবিতা ছাপে, তাতে কোনওদিন তোমার কবিতা দেখিনি। অবশ্য লিটল ম্যাগাজ়িনের কথা বলতে পারব না। এত কাগজ বেরোয়, সবগুলোর খবর রাখা তো সম্ভব হয় না।"

"খুশি হলাম খুব জানো! তুমি যে আমার কবিতা, মানে আমাকে খুঁজেছ এটা জেনে। না ছাড়িনি লেখা। তুমি 'অনুভব'-এর কবিতা পড়েছ কখনও?"

জাগরী এ বার সোজাসুজি তাকাল নিলয়ের চোখে। একটু থেমে বলল, "আমার প্রথম থেকেই মনে হত, 'অনুভব' হয়তো বা কারও ছদ্মনাম! তবে সেটা যে তুমি, জানলে আমি আরও মনোযোগ দিয়ে কবিতাগুলো পড়তাম! কিন্তু তুমি ছদ্মনামে কেন লিখছ?"

"ধরে নাও, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাই। পুলিশের চাকরি করা আর কবিতা লেখা, এক্কেবারে দুই বিপরীত মেরুর ঘটনা তো!"

"তুমি পুলিশ?" জাগরীর অবিশ্বাস্য লাগে।

"কেন, হলে অসুবিধা আছে? এক্ষুনি আবার পালিয়ে যাবে নাকি আমার কাছ থেকে?" হাসতে-হাসতেই বলল নিলয়, তবে খোঁচাটা লাগল জাগরীর।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, মানে, তোমাকে ঠিক পুলিশ হিসেবে ভাবা যায় না তো, তাই..."

এত ক্ষণ যে-মজা করার ভাবটা ছিল নিলয়ের মধ্যে, সেটা ছেড়ে দিয়ে বেশ সিরিয়াস হয়ে গেল ও।

"অনেক কিছুই আমরা ভাবতে পারি না, অথচ সেগুলোই ঘটে যায় আমাদের জীবনে, তাই না? আর তখন সেটা শুধু ভাবতে নয়, হাসি মুখে মেনেও নিতে হয় আমাদের!"

## ৯

"মেনে নেওয়া ছাড়া যখন আর কোনও উপায় নেই, তখন সেটা হাসি মুখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেনে নেওয়াই তো ভাল, তাই না? তাতে আখেরে উপকারই হয়, আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরও সময় পেতে পারি।"

"অবশ্যই! তুষের সমস্যা বুঝতে পারার পর আমি তো এক মুহূর্তও দেরি করিনি। মন খারাপ করে বসেও থাকিনি। স্বামী-সংসার সব ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে এখানে চলে এসেছি, যাতে ওর স্কুলিংটা শুরু করা যায়।"

"আমি সব জানি, আপনার শ্বশুরমশাই বলেছেন। আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ। আর তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি আজ।"

অটিস্টিক বাচ্চাদের বিশেষ স্কুল 'সানশাইন'-এর প্রিন্সিপাল চন্দ্রাণী মজুমদার ডেকে পাঠিয়েছিলেন নয়নিকাকে।

'সানশাইন'-এ ইতিমধ্যে ছ' মাস কেটে গেছে তুষের। এখনও পর্যন্ত যে বলার মতো কিছু শিখেছে, এমন নয়। তবে একটা নিয়মের মধ্যে আসছে একটু-একটু করে। নয়নিকাকেও শিখতে হচ্ছে অনেক কিছু। ওর সঙ্গে সব সময় কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে, কী ভাবে শেখাতে হবে রোজকার কাজকর্ম, কী ভাবে সব সময় ওকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে সেই সব।

"আপনি তো জানেন, এই বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের অনেক ধৈর্য রাখতে হয়, রাগারাগি করলে চলে না। কারণ ওরা যেটা করে, সেটা বুঝেশুনে করে না। তাই আর-পাঁচটা বাচ্চাকে দুষ্টুমির জন্য শাসন করা গেলেও আমাদের এই বিশেষ বাচ্চাদের মারধোর করে কোনও লাভ হবে না, বরং ক্ষতিই হবে।"

নয়নিকা বুঝতে পারল, কেন আজ প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কাছে ওর তলব পড়েছে। গত কাল সত্যিই তুষকে মেরেছে ও, অত্যন্ত নির্মমভাবেই মেরেছে। ম্যাডাম এক্ষুনি যে-কথাগুলো বললেন, সেগুলো যে ও জানে না তা তো নয়, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতি ওকে দিয়ে অনুচিত কাজটা করিয়ে নেয়। কাল যখন ছোট জা এসে নয়নিকাকে নালিশ করল, তুষ ওর মেয়েকে ধাক্কা মেরেছে, মেয়েটা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে, কাঁদছে, তখন হঠাৎ করেই ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল।

শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়িতে এসে ওঠার পর থেকে সর্ব ক্ষণ তুষকে নিয়ে সমস্যা চলছে। নয়নিকা চোখে-চোখেই রাখে, তবুও কোন ফাঁকে যে কী করে বসে ছেলেটা! আর তাই নিয়ে অন্য দুই জায়ের নালিশ, অশান্তি রোজকার ব্যাপার। মাঝে-মধ্যে শাশুড়ি-মাও তাতে সামিল হন।

কাল তাই তুষ ছোট বোন সানাইকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, এটা শোনার পর আর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেনি নয়নিকা। চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে তুষের মাথাটা ঠুকে দিয়েছিল। পরিস্থিতির উপরে রাগ, নিজের অসহায়তা, সব কিছুর বহিঃপ্রকাশ ছিল বলে, ওই আঘাতটা যথেষ্টই জোরে হয়েছিল। তুষের কপাল অনেকটা ফুলে রক্ত জমে আছে আজও। শ্বশুরমশাই এসে তুষকে ওর মা'র কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে না-গেলে হয়তো বা মাথাটা ফেটেই যেত ছেলেটার। তার পর থেকেই মনটা খারাপ নয়নিকার। রাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে অনেক।

চন্দ্রাণী ম্যাডাম প্রতিটা বাচ্চার প্রতি আলাদা করে নজর দেন। আজ নিশ্চয়ই তুষের কপালের ফোলাটা দেখে, ওর দাদুর কাছ থেকে গত কালের ব্যাপারটা শুনে নয়নিকাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

নয়নিকা চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। একটা অবোধ শিশুকে মারার জন্য অনুতাপে, কষ্টে এমনিতেই ও পুড়ছে কাল থেকে। এখন ম্যাডামের কথা শুনে আবার বাঁধ ভাঙল, জল গড়াতে থাকল দু'চোখ বেয়ে।

"চোখ মোছো, নয়নিকা। আমি সানশাইনের প্রিন্সিপাল হিসেবে নয়, তোমার বড় দিদি হিসেবে, এক জন মা হিসেবে তোমায় কিছু পরামর্শ দিতে চাই, শুনবে?"

'আপনি' থেকে 'তুমি-তে নেমে আসার মধ্যে যে-আন্তরিকতা ছিল, চন্দ্রাণীদির স্বরে যে-ভালবাসার ছোঁয়া ছিল, তাতে নয়নিকার যন্ত্রণায় খানিকটা প্রলেপ পড়ল। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল ও, নিজেকে সামলে নিল।

"বলুন দিদি!"

"আগে তোমায় একটা গল্প বলি। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। আর আঠারো বছর আগে আমার

বড় ছেলে জন্মায়। তার ঠিক দু'বছর পর ছোট ছেলে হল। দুটো ছেলেই অটিস্টিক। ছেলেদের নিয়ে এমনিতেই আমার কষ্ট ছিল, তার উপরে আবার পর পর দুটো 'অস্বাভাবিক' ছেলের জন্ম দেওয়াতে শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা, পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়দের কৌতূহল আর টিপ্পনী আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। যন্ত্রণায় যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল, তখন আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। অটিজ়ম নিয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম। দু'-দুটো অটিস্টিক বাচ্চাকে সামলে, কাজটা যে খুব-একটা সহজ ছিল না, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। অবশ্য তার আগে আমি আর-একটা কাজ করেছিলাম, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করেছিলাম।"

"আর আপনার স্বামী?"

"উনি আগাগোড়া আমার সঙ্গে ছিলেন বলেই কাজটা সহজ হয়েছে। উনিই তো শ্রীরামপুরে জমি কিনে এই দোতলা বাড়িটা করলেন ধার-দেনা করে, যাতে নীচের তলায় আমি স্কুল করতে পারি।"

"দিদি, আপনার ছেলেরা তা হলে এই স্কুলেই আছে? ওদের তো দেখিনি কোনওদিন?"

"না। ওরা এখন আর স্কুলে আসে না। খুব ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে অ্যাডোলেসেন্সের পর। আমার টিচারেরা আর ওদের সামলাতে পারে না। ওরা উপরেই থাকে। সহদেব আর বিদ্যুৎ আছে ওদের দেখাশোনা করার জন্য, আর আমি তো আছিই।"

"ওহ!" প্রশ্নটা না-করলেই হত, নয়নিকা ভাবছিল। এটা চন্দ্রাণীদির নিশ্চয়ই একটা কষ্টের জায়গা!

"ছেলের ভালর জন্যই তো মুম্বই থেকে স্বামী-সংসার ছেড়ে এসেছ, এ বার কিন্তু শ্বশুরবাড়িটাও তোমাকে ছাড়তে হবে। না হলে কাল যে-সমস্যা হয়েছে, সেই সমস্যা আরও বাড়বে। আর তার জন্য ক্ষতি হবে আমাদের বাচ্চাটার," চন্দ্রাণী ম্যাডাম প্রসঙ্গ বদলে কাজের কথায় চলে এলেন।

"আপনার কথায় মনের জোর পেলাম দিদি, আমি নিজেও ক'দিন ধরে ভাবছিলাম কথাটা। বাড়ির সবার সঙ্গে আলোচনা করে দেখি!"

"হ্যাঁ আলোচনা অবশ্যই করবে, তবে সিদ্ধান্তটা কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে। তোমার সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করছে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ।"

নয়নিকা উঠে পড়ল, হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, "আপনার মতো এক জন ব্যস্ত মানুষ যে আলাদা করে আমার কথা ভেবেছেন, আমাকে সময় দিয়েছেন, এ জন্য আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। শুধু 'ধন্যবাদ' বললে বড্ড কম বলা হয়, দিদি!"

"ধন্যবাদ দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই। আমি যা ভেবেছি, তুষের ভালর জন্যই ভেবেছি। আমাদের এই বাচ্চাগুলোকে একটু ভাল ভাবে বাঁচতে সাহায্য করা ছাড়া আমার জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নেই। আর, আমার পক্ষ থেকে যদি তোমার জন্য কোনও কিছু করার থাকে, তবে অবশ্যই বলবে। কোনও রকম দ্বিধা করবে না।"

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে নয়নিকা ভাবছিল কী ভাবে শ্বশুরবাড়িতে জানাবে যে, ও ছেলেকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়, একেবারে আলাদা বাড়িতে থাকতে চায়!

বরকে ছেড়ে, নিজের সংসার ছেড়ে, শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকার ব্যাপারটা যতটা সোজা ছিল, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে আলাদা থাকার পরিকল্পনা ততটাই কঠিন। নানা জন নানা কথা বলবে। স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কথা ওঠাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য বাইরের লোকেরা কে কী বলল, তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই নয়নিকার। ওর চিন্তার কারণ হল, এই প্রস্তাবটা শোনা মাত্রই অরুণ বেঁকে বসবে। শ্বশুর-শাশুড়িও ওদের দু'জনের আলাদা বাড়িতে উঠে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হবেন না। এখন তা হলে কী করবে ও? সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকবে! না কি আবার মুম্বইয়েই ফিরে যাবে!

তবে যাই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটা বিষয় ওর কাছে এই কয়েক মাসে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তুষকে নিয়ে এত জনের পরিবারে এক সঙ্গে থাকা অসম্ভব।

## ১০

বড়দিনে ওদের ছোট চার্চটা ভারী সুন্দর করে সেজে ওঠে আর তার সামনের মাঠটাতে বসে যায় ছোটখাটো মেলা। ফুচকা, ঘুগনি, পাঁপড় ভাজা, গজা এ সব বিশুদ্ধ বাঙালি খাবারের সঙ্গে বিক্রি হয় রোজ় কেক, যেটা বাংলার ঘরোয়া খাবার হিসেবে অতটা পরিচিত নয়, খ্রিস্টানরাই মূলত এটা বানায়। হিন্দু বাড়িতে বিজয়া দশমীতে গেলে অতিথিদের প্লেটে যেমন ঘরে বানানো নাড়ু-নিমকি অবশ্যই পড়ে, বড়দিনের নিমন্ত্রণেও তেমনই খ্রিস্টান বাড়িগুলোতে সাধারণ কেক-এর সঙ্গে রোজ় কেক থাকবেই।

শুধু কী আর খাবারদাবার! সস্তার খেলনা, সংসারের নানা জিনিসপত্র, ঝলমলে কানের দুল, হার, চুড়ি সমেত সাজগোজের নানা জিনিস, কাচের এবং মেলামাইনের নাম ভাঙিয়ে বিকোনো প্লাস্টিকের বাসনপত্র...কী নেই সেই মেলায়!

কিছু দরকার থাকুক না-থাকুক, এ সব রঙচঙে দোকানগুলো ঘুরে-ফিরে দেখতে বেশ ভাল লাগে মিতশ্রীর। ওর মনে হয়, প্রয়োজনীয় কিছু-একটা কেনার আছে ঠিকই, কিন্তু এখন সেটা মনে পড়ছে না। দোকানগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে সেই দরকারি জিনিসটা। কুট্টিকে কোলে নিয়ে মেলায় ঘুরছিল মিতশ্রী, আর দোকানগুলো দেখছিল যত্ন নিয়ে।

কুট্টিকে কোলে নিয়ে বেশি ক্ষণ হাঁটা যায় না, আবার ওকে বাড়িতে রেখেও আসা যায় না। তাই কিছু ক্ষণ পর পর ওকে কোল থেকে নামিয়ে একটু করে জিরিয়ে নিচ্ছিল মিতু। কুট্টি অবশ্য দাঁড়াতেও পারে না কেউ না-ধরলে, তাই ওকে ধরে-ধরেই দাঁড় করিয়ে রেখে নিজের কোমরটাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছিল ও।

"তুমি কি একাই এসেছ মাই ডিয়ার চাইল্ড?"

প্রশ্নকর্ত্রী এক জন বয়স্কা সিস্টার।

একটু হেসে মিতশ্রী ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল, ও একাই এসেছে।

সিস্টার কুট্টিকে আদর করলেন। তার পর বললেন, "তুমি যদি চাও, আমার সঙ্গে চার্চের ভিতরে আসতে পারো। তোমার বেবির জন্য আমি একটা জিনিস দিতে চাই, অবশ্য যদি তুমি বিশ্বাস রাখো।"

কোনওরকম মিরাক্‌লে বিশ্বাস নেই মিতশ্রীর। কিন্তু এই মুহূর্তে, বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর ভালবাসাকে অসম্মান করতে ইচ্ছে হল না, তাই ওঁর পিছু-পিছু গেল।

চার্চের ভিতরে বেশ ভিড়। প্রার্থনা চলছে। তা ছাড়াও অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা বড়দিনে চার্চের ভিতরের সাজসজ্জা দেখতে এসেছেন। সন্ন্যাসিনী ওখানে না-দাঁড়িয়ে ঢুকে গেলেন আরও ভিতরে।

একটা ছোট মাঠ পেরিয়ে বৃদ্ধা ঢুকলেন আর-একটি বাড়িতে, সঙ্গে মিতু আর কুট্টি।

"এই বাড়িতেই আমরা থাকি। এসো।"

চার্চের ভিতরে এমন একটা বড় বাড়ি আছে, জানত না মিতু। বাড়ির সামনে সযত্নলালিত বাগান আর তাতে ফুটে আছে মন ভাল করা গোলাপের দল। বৃদ্ধার পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে ও পৌঁছে গেল আরও একটা ঘরে। গিয়ে বুঝল, এটা সিস্টারদের নিজস্ব প্রার্থনার ঘর।

সন্ন্যাসিনী ধূপ ধরালেন, মোমবাতি জ্বালিয়ে মা মারিয়ার সামনে নত মস্তকে প্রার্থনা করলেন। তার পর মা মারিয়ার

আসনের নীচ থেকে বের করে আনলেন এক টুকরো লাল কাপড়।

“এটা বেবি মারিয়ার পবিত্র বস্ত্রখণ্ড, রোম থেকে এসেছে। এইটা এই শিশুটির বিছানার নীচে রেখে দিয়ো।”

কুট্টিকে আদর করলেন বৃদ্ধা। বললেন, “আমি রোজ তোমার সন্তানের জন্য প্রার্থনা করব।”

মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে বৃদ্ধার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মিতশ্রী, এ বার বাড়ি ফিরতে হবে।

“চিকিৎসায় বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়ে গেছে, এই সব স্পেশ্যাল চাইল্ডদের এখন অনেক রকমের চিকিৎসা হতে পারে। তুমি কি স্টেম সেল থেরাপির নাম শুনেছ?”

কফির কাপে লম্বা করে একটা চুমুক দিয়ে সিগারেটে টান দিল নিলয়। দীর্ঘ দু'দশক পরে দেখা হওয়ার প্রথম দিনেই জরির এক মাত্র সন্তান সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত জেনে মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল ওর, কিন্তু নিলয় সেটা প্রকাশ করেনি জরির সামনে। বরং ব্যাপারটা নিয়ে অদ্ভুত একটা নির্লিপ্তি দেখিয়ে ওই প্রসঙ্গটা ছেড়ে অন্য কথায় চলে গেছিল।

সেদিনের পর সেরিব্রাল পলসি নিয়ে অনেক রকম খোঁজ-খবর নিয়েছে নিলয়। এর আধুনিকতম চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণা কোথায় কী হচ্ছে, সেই সব জার্নালও পড়েছে। শেষ পর্যন্ত স্টেম সেল থেরাপি ছাড়া আর বিশেষ কিছু খুঁজে পায়নি। জরিকে মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে সেই সব কথাগুলো জানাবে বলে আজ কফি হাউসে ডেকে পাঠিয়েছে নিলয়।

জাগরী ‘স্টেম সেল থেরাপি’ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হলেও ব্যাপারটা বিশদে জানে না। বিদেশে অনেক জায়গায়, বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ায় এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার বেশ নামডাক আছে সুজয় বলেছিল বটে। তবে অনেকের কাছ থেকেই ওরা জেনেছে সেরিব্রাল পলসির ক্ষেত্রে এই চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে না। জাগরী সেই কথাটাই বলল নিলয়কে।

“স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট করালে যদি আমার মেয়েটা সেরে যেত, তা হলে শুধু দক্ষিণ কোরিয়া কেন, পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তেই চলে যেতাম। ঘটিবাটি বিক্রি করে হলেও চিকিৎসা করাতাম। কিন্তু ঝিলের বাবা অনেক জায়গা থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে, অন্য অনেক অসুখে ভাল কাজ করলেও সেরিব্রাল পলসির চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি সাকসেসফুল হয়নি।”

“তোমার মেয়ের বাবা ঠিকই শুনেছেন,” একটু থামল নিলয়, ছাই হতে থাকা সিগারেটটাতে একটা লম্বা টান দিয়ে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করল তাতে।

জাগরী লুকিয়ে তাকাল নিলয়ের দিকে, দেখে নিল ‘তোমার মেয়ের বাবা’ কথাটা বলার সময় নিলয়ের মুখের রঙে কোনও রকম পরিবর্তন হল কি না। কিন্তু আশ্চর্য এক নিরাসক্তির বর্ম নিলয়ের মুখে, চর্চা করে রপ্ত করা এই নির্লিপ্তি ওর মনের চিন্তার ছাপ মুখে আসতে দেয় না।

“স্টেম সেল হল সেই সব কোষ, যা থেকে কোষ বিভাজন হয়ে অন্যান্য দেহকোষ তৈরি হয়। তোমার মেয়ের ব্রেনের কিছু কোষ কোনও কারণে মারা গেছে, আর স্নায়ুকোষ নতুন করে তৈরি হয় না। তাই ও সেরে উঠতে পারছে না, এটাই হল মোদ্দা কথা। শরীরের অন্য কোথাও কেটে গিয়ে গর্ত হয়ে গেলেও সেটা ভরাট হয়ে যায়, কারণ নতুন করে কোষ জন্মায়। কিন্তু ব্রেনের বা নার্ভের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেই, এক বার যা গেল তা চিরতরেই গেল। স্টেম সেল থেকে যেহেতু নতুন কোষ জন্মায়, তাই নতুন করে স্নায়ুকোষ তৈরি করার এটাই এক মাত্র উপায়।”

প্রায় তিরিশ বছর ধরে এই পেশায় আছেন ডা. দত্তরায়। তিনি জানেন, এই দেশের মানুষ এখনও পর্যন্ত সন্তানের কোনও সমস্যার জন্য মা-কেই দায়ী করে।

জাগরী মনোযোগ দিয়ে শুনছিল নিলয়ের কথা। ঝিলের চিকিৎসার ব্যাপারে যেখানে যা কিছু নতুন শোনে, ভাল করে আত্মস্থ করে, খোঁজার চেষ্টা করে আশার আলো। তা যদি এক চিলতেও হয়, তা-ই সই। সুজয় স্টেম সেল চিকিৎসার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সহজ করে বোঝাতে পারেনি। এখন সবটা বুঝতে পেরে আরও অধৈর্য হয়ে গেল জাগরী, বলল, “তা হলে সেরিব্রাল পলসিতে কেন কাজ হচ্ছে না? স্টেম সেল থেকে কি নার্ভ সেলও তৈরি হয়?”

“তা হয়। তবে রোগীর নিজের দেহ থেকে কিংবা পরিণত মানুষের শরীর থেকে স্টেম সেল নিয়েই এই চিকিৎসাগুলো করা হয়তো, তাই তার কার্যকারিতা খুব একটা ভাল হয় না। যদি ভ্রূণের স্টেম সেল রোগীকে দেওয়া হয়, তা হলে দারুণ ফল পাওয়া যাবে।”

নিলয়ের কথা শুনে নড়েচড়ে বসল জাগরী। ওর চোখে খেলা করে গেল উৎসাহ আর খুশির আলো, যে-আলো গত দিন বা আজ এত ক্ষণ ধরে কথাবার্তার মধ্যে এক বারও দেখেনি নিলয়। এই জাগরীকে দেখে ভাল লাগল নিলয়ের, অনেক বছর আগেকার সেই হাসিখুশি মেয়েটাকে খুঁজে পেল ও।

“ভ্রূণের স্টেম সেল! মানে মানুষের না-জন্মানো বেবির? কিন্তু সেটা কী ভাবে সম্ভব?”

“কী ভাবে সম্ভব, কোথায় সম্ভব সে সব বলব বলেই তো তোমাকে আজ ডেকেছি। অবশ্য আমি নিজেও যেতে পারতাম তোমার বাড়িতে, তোমার মেয়েটাকে এক বার দেখে আসতাম, কিন্তু তুমি তো আমাকে যেতে বলোনি। আর তা ছাড়া আমি হুট করে চলে গেলে তোমার মিস্টার কী ভাবে নেবেন ব্যাপারটা, তাই...”

“এমা, ছি ছি! ও রকম করে বোলো না! আমার খারাপ লাগছে। নিশ্চয়ই আসবে তুমি আমার বাড়িতে। আমি সুজয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। ও কেন কিছু ভাববে! আসলে তুমিও তো বলোনি আমার বাড়িতে যেতে চাও। আমি কী করে বুঝব বলো!”

“মাথা খারাপ! সেদিন শুধু একটা কবিতার লাইন বলেছিলাম বলে ছেড়ে চলে গেলে আমাকে। এখন আবার যদি বলি বাড়িতে যেতে চাই, তা হলে হয়তো বাড়িটাই বদলে ফেলতে! তার চেয়ে আমার এই কফি হাউসই ভাল বাবা!”

নিলয় ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেও জাগরীর খারাপ লাগল। এক মুহূর্তে ওর চোখে ছায়া নেমে এল, মাথা নিচু করে ফেলল ও।

“এই জরি! রাগ করে না! আরে বাবা, একটু ইয়ার্কিও কি মারতে পারব না তোমার সঙ্গে! সত্যি বলছি, আমি ইয়ার্কি করছিলাম! এই, মুখটা ওঠাও, তাকাও আমার দিকে।”

টেবিলের উপরে রাখা ছিল জাগরীর হাত। নিলয় ওর কনুই স্পর্শ করল। জাগরী ওর জলে-ভরা দু'চোখের পূর্ণ দৃষ্টি রাখল নিলয়ের দুই চোখে। নিলয় নিজের হাতটা রাখল ওর হাতের উপর। তার পর ফিসফিস করে বলল, “চোখ মোছো, জরি, আমি

আছি তো।"

নিলয়ের গলার স্বরে শুধু নয়, ওর চোখেও জাগরী দেখতে পেল ভরসার ভাষা। নিজের উপচে আসা চোখের পাতাদুটো বন্ধ করল ও, মুছে নিল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের বিন্দু। চোখ না-খুলেই জাগরী শুনল, নিলয় বলছে, "সেদিন তো তুমি প্রথম দুটো লাইন শুনেই চলে গেলে। পরের লাইনদুটো আজ শোনো,

এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।"

## ১১

সহজে ঘুম পাড়ানো যায় না রুপুকে। ঘণ্টা খানেক কসরতের পর যদি বা ঘুমোল, সেটাও গভীর হয় না। কিছু ক্ষণ পর পরই ছটফট করে মুখ দিয়ে কেমন যেন শব্দ করতে থাকে। পাশে শুয়ে বিন্দিও ঘুমোতে পারে না। বার বার ঘুম ভেঙে যায়।

সারা দিন সংসারের কাজ, ছেলের জন্য খাটুনির পর রাতে যদি বিশ্রামটাও ঠিকঠাক না হয়, তা হলে শরীর তো জবাব দেবেই। বড় ক্লান্ত লাগে আজকাল। ক্রমশ যে দুর্বল হয়ে পড়ছে নিজে, সেটা বিন্দি বোঝে, কিন্তু বুঝেও তো কিছু করার নেই! ছেলেটা যখনই উঠে যায়, ওকে বুকের দুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে বিন্দি। কাজেই রুপুকে অন্য কারও কাছে দিয়ে নিজে যে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোবে, সে উপায়ও নেই। তা ছাড়া এ বাড়িতে রুপুকে দেখার মতো আছেটাই বা কে! শ্যামল সারা দিন দোকানে খেটে মরে, রাতে মড়ার মতো ঘুমায়, এক কাতেই রাত ভোর করে দেয়। পাশে ছেলে জেগে গেলেও টেরও পায় না। সেই সময় ওকে ডাকতে পারে না বিন্দি, মায়া হয়। দু'জনে যদি পালা করে রাত জাগতে পারত, তবে কিছুটা সুরাহা হত বিন্দির, কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটা আলাদা ঘরের প্রয়োজন, যেটা ওদের নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি আর তাদের দুই ছেলে-বৌ, প্রত্যেকের ভাগে একটা করেই ঘর। বসার ঘর বলেও আলাদা কিছু নেই এ বাড়িতে।

"তুই ক'দিন আমার কাছে গিয়ে থাকবি চল, বিনি। আর কিছু না-হোক সংসারের কাজকর্ম থেকে তো ছুটি পাবি, একটু বিশ্রাম হবে তোর। চেহারার কী ছিরি হয়েছে দেখেছিস!"

দিনে-দিনে মেয়েটাকে চোখের সামনে ক্ষয়ে যেতে দেখে, বিন্দির মা মেয়েকে নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

বিন্দির শাশুড়ি একদম পছন্দ করেন না বড় বৌয়ের বাপের বাড়ি গিয়ে থাকা। যাওয়ার কথা শুনলেই সব সময় বলেন, "এই তো এখান থেকে এখানে বাড়ি। তার উপরে তোমার মা প্রায়ই আসে। গিয়ে ঘুরে আসলেই তো হয়, থাকতে হবে কেন!" ওঁর এই একটাই কথা।

এত কাল শাশুড়ির কথা শুনে চলেছে বিন্দি। বিয়ের পর ও-বাড়িতে গিয়ে একটা রাতও কোনওদিন থাকেনি। সকালে গেলে বিকেলে ফিরে এসেছে। কিন্তু এ বারে মা'র কথায় সম্মতি জানাল ও। বলল, "তুমি এক বার বাবাকে বলো আমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে। তা হলে শাশুড়ি আর কিছুতেই 'না' বলতে পারবে না।"

বাপের বাড়ি গিয়ে ছেলেকে নিয়ে রাতে মা'র কাছে শুত বিন্দি। দু'-চার দিন যাওয়ার পর মা-ই ওর মনে ভাবনাটা ঢোকাল, "ছেলেটা ঠিক মতো ঘুমোয় না, ঘুমের মধ্যে এত অস্থির-অস্থির করে কেন! এত ছেলেপুলে দেখেছি, কই এমন তো কখনও দেখিনি! তুই জামাইকে বলে ছেলেকে নিয়ে কলকাতার ওই ডাক্তারবাবুর কাছে আবার যা।"

ডাক্তারবাবু মন দিয়ে শুনলেন বিন্দির সব কথা। তার পর একটা পরীক্ষা করিয়ে আনতে দিলেন। সেদিন আর ফেরা হল না ওদের। শিয়ালদার কাছে একটা সস্তার গেস্ট হাউস ভাড়া করে থেকে যেতে হল। পর দিন সকালে পরীক্ষার জন্য ডাক্তারবাবুর বলে দেওয়া জায়গায় যেতে হবে। এই পরীক্ষাটা করতে ছ'হাজার টাকা লাগবে শুনে বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল শ্যামল।

"আমার কাছে তো এত টাকা নেই। পরে এক দিন এসে পরীক্ষাটা করে নিলেই হবে।"

"ফিরে যাওয়ার দরকার নেই, আমার কাছে টাকা আছে।"

এ বার তৈরি হয়েই এসেছিল বিন্দি। এত দিন ধরে তিল তিল করে জমানো দশ হাজার টাকা এ বার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সেই টাকাই তুলে দিল শ্যামলের হাতে।

"এই ছেলে নিয়ে বার বার কলকাতা-বাড়ি করা যায় নাকি? রিপোর্ট নিয়ে একেবারে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েই ফিরব আমরা। তুমি ফোন করে তোমার বাবাকে জানিয়ে দাও।"

নরমসরম বিন্দিকে এত দিন খুব-একটা চালাকচতুর বলে মনে হয়নি শ্যামলের। তাই আকস্মিক ভাবে ওর এই পরিবর্তন, এই দৃঢ়তা দেখে একটু অবাকই হল ও, তবে বিন্দির কথা মতোই কাজ করল।

এম আর আই-এর রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, "ওর ব্রেনে একটা অসুবিধে আছে, তাই ঘুমের ভিতরে ওর কনভালসন মানে খিঁচুনি হয়। এই কনভালসন চোখে পড়ে না, এম আর আই করালেই এক মাত্র ধরা পড়ে। যে ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি, নিয়ম করে খাওয়াবেন। আর মেডিকেল কলেজের চোখের বিভাগে গিয়ে বাচ্চার চোখটা এক বার দেখিয়ে নেবেন।"

"চোখ দেখাতে হবে? ডাক্তারবাবু ওর কি চোখও খারাপ?" শ্যামলের গলায় এক জন ভেঙে-পড়া মানুষের আর্তি।

ডাক্তারবাবু শ্যামল আর বিন্দির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকালেন। তার পর মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে অস্ফুটে বললেন,

"আপনারা বাবা-মা। এই বাচ্চাটা যদি চোখে দেখতে পায়, তা হলে আপনাদের পরে সবচেয়ে বেশি খুশি হব আমি।"

শেষ পর্যন্ত ছেলেকে নিয়ে আবার মুম্বইতেই ফিরে যেতে হল নয়নিকাকে।

চন্দ্রাণী ম্যাডামের পরামর্শ অনুযায়ী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকার কথা ভাবলেই তো আর সেটা করে ফেলা যায় না, অনেকের অনুমতি দরকার হয়। শ্বশুরবাড়িতে কথাটা বলার আগে নয়নিকা তাই অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিল। চন্দ্রাণী ম্যাডাম সেদিন ওকে ডেকে পাঠিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো খুলে বলেছিল অরুণকে।

"এ বার বলো কী করব?"

বলটা অরুণের কোর্টেই পাঠিয়েছিল নয়নিকা, তুষের অভিভাবক তো সেও।

অরুণ তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

"পাগল নাকি! কলকাতার মতো একটা জায়গায় তুমি ছেলেকে নিয়ে একা-একা থাকবে কী করে? অসম্ভব। তুমি এখানেই চলে এসো।"

সেটা যদি সম্ভব হয় তা হলে নয়নিকাও তো স্বস্তি পায়, ছেলের ভালমন্দ সমস্ত দায়িত্ব একা ওর উপর বর্তায় না।

"সেটা হলেই তো ভাল হয়। তুমি তা হলে খোঁজ নাও, কোনও স্কুলে সিট আছে কি না, তুষের অ্যাডমিশন করানো যাবে কি না। আমি তোমাকে ঠিকানা পাঠাচ্ছি কয়েকটা স্কুলের।"

"খোঁজ-খবর নিতে যাওয়ার মতো এত সময় কোথায় আমার? তুমি বরং ছেলেকে নিয়ে ফিরে এসো, এখানে এসে যা খোঁজ করার করো। আমি তোমাদের এয়ার টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে এর পর আর কোনও অসুবিধে হয়নি নয়নিকার। বৌমা-নাতি ছেলের কাছে ফিরে যাবে, এতে নয়নিকার শ্বশুর-শাশুড়ি খুশিই হয়েছিলেন। বলতে গেলে শ্বশুরমশাই ছাড়া ও-বাড়ির বাকি সবাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এমন অদ্ভুত বাচ্চার দৌরাত্ম্যে এই একটা বছর তাঁরা নাজেহাল হয়ে গেছিলেন।

মুম্বই পৌঁছে একটু থিতু হয়ে নিয়ে নয়নিকা হন্যে হয়ে ক'টা দিন অটিস্টিক বাচ্চাদের স্কুলে-স্কুলে ঘুরে বেরিয়েছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। কোনও স্কুলে সিট নেই, কোনওটা আবার খুবই দূরে। কেউ আবার বাচ্চাকে ভর্তি না-করে মায়েদের ট্রেনিং দিয়ে দেয়, কী ভাবে এই বাচ্চাদের সারা দিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে। অরুণকে সেই কথা জানাতে ও বলল, "এটাই তো ভাল। তুমি বরং ট্রেনিং

নিয়ে নাও। তা হলে বাড়িতে বসে তুমিই তো ওকে শেখাতে পারবে। দরকার হলে অনলাইন কিছু কোর্স করে নিতে পারো বিদেশের সেন্টারগুলো থেকে। তা হলে ওদের চাইতেও বেশি এক্সপার্ট হয়ে যাবে।"

"কিন্তু সোস্যালাইজেশন? ওটাও তো জরুরি," নয়নিকা বলেছিল।

"আরে সে পরে হবে এখন। আগে তো তুমি শুরু করো, তার পর স্কুলে সিট পেলে ভর্তি করে দেওয়া যাবে।"

অরুণের কথাটা যথেষ্টই যুক্তিপূর্ণ। তাই নয়নিকা মেনে নিয়েছিল অরুণের কথা। অটিস্টিক বাচ্চাদের শেখানোর কৌশল রপ্ত করা আর সে সব তুষের উপর প্রয়োগ করে ওকে স্বাভাবিক জীবনে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ওর ইচ্ছে আর চেষ্টায় কোনও রকম ঘাটতি ছিল এ কথা বলা যাবে না, তবুও পারল না নয়নিকা।

অরুণ আগের মতোই বেরিয়ে যায় সাত সকালে। ফেরে রাত দশটায়। এই দীর্ঘ সময়টাতে বন্ধ একটা ফ্ল্যাটে, একটা অবুঝ-দামাল শিশুকে নিয়ে একদম একা থাকাটা যে কতটা কঠিন কাজ, সেটা এক মাত্র সে-ই বোঝে, যাকে এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সব সময় চোখে-চোখে রাখতে হয় তুষকে। কখনও সে টয়লেটে ঢুকে কমোডের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কখনও আবার ডাস্টবিনের ময়লা নিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে। বেয়ে-বেয়ে উঠে আলমারির মাথায় চড়ে বসেছিল এক দিন, দেখতে পেয়ে নয়নিকার ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছিল। যদি লাফ দিয়ে দিত ওখান থেকে? ব্যথা লাগবে যে, সেই বোধটাই তো নেই তুষের। ভয় পাওয়ার অনুভূতিও নেই ওর, ও বোঝেই না আগুন থেকে কী বিপদ হতে পারে! এক দিন রান্না করতে-করতে টয়লেটে গেছিল নয়নিকা, বেরিয়ে এসে দেখে, জ্বলন্ত উনুনের আগুনে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে ছেলে। তার পর থেকে বাথরুমে ঢুকলেও তুষকে সঙ্গে করে নিয়ে ঢোকে ও। অরুণ এ সব সমস্যার কথা শুনে তুষকে দেখার জন্য এক জন লোক রাখার কথা বলেছিল।

"তুমি যত ক্ষণ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবে, তত ক্ষণ ওকে দেখবে, এমন এক জন আয়া ডেকে নাও না। তা হলেই তো মিটে যায়।"

তাই করেছিল নয়নিকা, কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটল না। তিন-চার দিন কাজ করে আয়া আর এল না। কেনই বা আসবে! সামান্য ক'টা টাকার জন্য এত ঝক্কি কেন পোয়াতে যাবে সে, যখন এত ঝামেলা না-সয়েও এই টাকাটাই রোজগার করা যায়!

এত কাল যে-সব বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ সে করে এসেছে, তাদের খেলনা দিয়ে বসিয়ে রেখে একটু নজরে রাখলেই চলে যায়। সেই সময় নিজে বসে-বসে দিব্যি অন্য কাজ করা, টিভি দেখা কিংবা ঝিমোনোও চলে। বাচ্চা বেশি দুষ্টুমি করলে একটু ধমক-ধামক দিলে বা একটু ভয় দেখালেই কাজ হয়ে যায়। কিন্তু এই নতুন বাচ্চাটি, তুষ, মোটেও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে খেলা করে না। সারা বাড়ি চরকিপাক খাচ্ছে আর এটা ফেলছে, ওটা ভাঙছে, নানা রকম অনাসৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। ফলে আয়া মাসিকেও ওর পিছনে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। তার উপরে আবার কোনওকিছু বললে সাড়া দেয় না, বোঝাই যায় না কানে শোনে কি না। তাই ওকে বকেঝকে লাভ হয় না। গোদের উপর আবার বিষফোঁড়াও আছে। কোনওকিছুতে ভয়ও পায় না ছেলেটা। ভূত, পুলিশ, বাঘ-সিংহ সব কিছুই ফেল মেরে গেছে ওর কাছে। আয়া মাসির মনে হয়েছিল ছেলেটা পাগলা, না হলে হাত ধরে বাথরুম থেকে বের করে নিয়ে আসার সময় অমন করে কামড়ে দেয়!

ওই কামড় খাওয়ার পর দিন থেকেই আর এল না আয়া। সেন্টারের লোক এসে পেমেন্ট নিয়ে গেল আর জানিয়ে গেল, আগের আয়ার কাছে তুষের উৎপাতের গল্প শুনে আর কেউই এখানে কাজ করতে আসতে চাইছে না।

সারাটা দিন একা হাতে তুষের দেখাশোনা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে নয়নিকা। একটু-একটু করে অবসাদ দখল করে নিতে থাকে ওর মন আর মস্তিষ্ক।

## ১২

"বিয়ে কেন করলে না?"

এতগুলো বছর পেরিয়ে নতুন করে দেখাসাক্ষাৎ শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে নিলয়কে প্রশ্নটা করল জাগরী।

চল্লিশ পেরিয়ে গেছে নিলয়ের। এখনও বিয়ে করেনি মানে, ওই পথে ও যে আর হাঁটবে না, সেটা বোঝাই যায়।

আসলে নিলয়ের চির কুমার থেকে যাওয়ার পিছনে তার নিজের ভূমিকা কতটা, সেটাই বুঝে নিতে চাইছিল জাগরী।

ওদের প্রেমটা দানা বেঁধে ওঠার আগেই থমকে গেছে। জাগরী নিজে সম্পর্ক থেকে সরে এসেছে যদিও, তবু প্রতিশ্রুতি ভাঙার দায় নেই ওর। কারণ সম্পর্কটা তখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। জাগরী তো দিব্যি ভুলে ছিল সেই 'হলেও হতে পারত' সম্পর্কটাকে। মেয়ের সমস্যার কথাটা বাদ দিলে সুখেই সংসার করছে সুজয়কে নিয়ে। তা হলে নিলয় কেন বিয়ে করেনি? কবির মন তো! বলা যায় না, হয়তো ওই কুঁড়িটুকুকে আঁকড়ে ধরেই রয়ে গেছে নিলয়।

"সে অনেক কঠিন ব্যাপার। সহজে বলা যাবে না," নিলয় অন্যমনস্কভাবে বলল।

"বেশ তো। সহজে বলা না-গেলে কঠিন করেই বলো।"

"সেটাই তো বলতে চেষ্টা করেছিলাম সেদিন। 'সারাজীবন বইতে পারা সহজ নয়' যে কেন, সেটা না-শুনেই তো তুমি ছেড়ে চলে গেলে আমাকে প্রিয়া!"

"উফ! আবার সেই পুরনো কাসুন্দি! আমার সেদিন মনে হয়েছিল, তুমি সম্পর্কটা নিয়ে এগোতে উৎসাহী নও, তাই সরে এসেছিলাম। সেটা যদি আমার ভাবনার ভুল হয়, আমি ক্ষমা চাইছি। থাক! তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমারই জিজ্ঞেস করাটা অনুচিত হয়েছে," বেশ রাগী গলায় বলল জাগরী।

"অত রাগী হয়ে গেছ কেন তুমি, জরি! বিশ্বাস করো, তুমি আমাকে ছেড়ে গেছিলে বলে আমি তোমার উপর রাগ করিনি এক মুহূর্তের জন্যও। হ্যাঁ, কষ্ট পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু মনকে বুঝিয়েছিলাম, এতে আমাদের দু'জনেরই ভাল হল। আরও গভীরে যাওয়ার পর যদি সম্পর্ক ভেঙে যেত, তবে তার যন্ত্রণা আরও বেশি হত।"

জাগরী অবাক হয়ে গেল নিলয়ের কথা শুনে। এ ছেলে বলে কী! যে-সম্পর্ক কোনওদিন তৈরিই হতে পারল না, সেটা যে ভাঙতই, সে বিষয়ে ও এতটা নিশ্চিত ছিল কী ভাবে!

ও কেবল অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "মানে?"

"আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আর এক জন মানুষ আছে। তার উপস্থিতিকে মেনে নিয়ে কোনও মেয়েই আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না। আর আমিও পারব না তাকে একা ফেলে রেখে বৌ নিয়ে আলাদা থাকতে।"

নিলয় যে ঠাট্টা করে কথাগুলো বলেনি, সেটা ওর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল জাগরী। তাই ওর কথা শুনে জাগরী এতটাই বিস্মিত হয়ে গেল যে, ওর মুখে কোনও কথাই আর জোগাল না। শুধু এক রাশ প্রশ্নচিহ্ন-মাখানো চোখে তাকাল নিলয়ের দিকে।

"আমার ছোট ভাই, দু'বছরের ছোট আমার চেয়ে। মানসিক প্রতিবন্ধী, তোমরা এখন যাকে মেন্টালি রিটার্ডেড বলছ। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের ছোটবেলায় এই সব বাচ্চাদের নিয়ে একদমই সচেতন ছিল না মানুষ। বাবা-মায়েরাও এই রকম সন্তানদের উপস্থিতি গোপন রাখতেন। এখন যেটা তুমি তোমার মেয়ের জন্য করছ, সে সব আমাদের কালে

আশা করাই যেত না। এই সব বিশেষ সন্তানদের ওদের মতো করে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির লোকেরা বাইরেও বের করতেন না। বাড়ির এক কোণে অদরকারি জিনিসপত্রের মতো থেকে যেত এরা। লোকে এদের উপস্থিতির কথা জানতেও পারত না। আমি শুধু আমার বাবা-মাকে দোষ দিচ্ছি না, জরি, তখন এটাই সবাই করত। আর তা ছাড়া সাধারণ মানুষকে আর কী দোষ দেব বলো! তখন ডাক্তাররাই বলতেন যে, এ সব বাচ্চারা তেরো-চোদ্দো বছরের বেশি বাঁচে না। সুতরাং, এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই! আমার বাবা-মাও আর ভাইকে নিয়ে মাথা ঘামাননি। তবু ভাই বিনা যত্নেই দিব্যি টিকে গেছে ডাক্তারের ভবিষ্যৎ বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করে।"

জাগরী এ বার বেশ ছুঁতে পারছিল নিলয়কে, নিলয়ের ভিতরের অপ্রকাশিত মানুষটাকে। ওর তর্জনী স্পর্শ করল টেবিলের উপর রাখা নিলয়ের বাঁ-হাতের মধ্যমাকে, যেন বোঝাতে চাইল, 'আমি আছি তোমার সঙ্গে'।

"সমস্যাটা কী জানো?" হাতে-ধরা সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে নিলয় বলতে লাগল, "তুমি বা তোমার মতো মায়েরা এখন যেমন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা কাজ নিজের বাচ্চাকে শেখাতে দিনরাত প্রাণপাত করে চেষ্টা করছ, আমার বাবা-মায়েদের সময় সে সব শেখানোর কোনও তাগিদ ছিল না। ফলে ভাই শুধু শরীরেই বেড়েছে, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ কিছুই করতে পারে না। ওর স্নান, খাওয়া, জামাকাপড় পরা, বাথরুম-পায়খানা সবই করিয়ে দিতে হয়।"

"এটা খুবই সমস্যার ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু এ জন্য তো লোকও পাওয়া যায়। বেশ হাট্টাকাট্টা একটা ছেলেকে রেখে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়! সে কাজগুলো করবে, তোমরা চোখের দেখা দেখবে।"

"তোমরা বলতে এখন বাড়িতে আছি আমি আর মা। বাবা চলে গেছেন পাঁচ বছর। যদিও মাকেই এখন দেখে রাখলে ভাল হয়, তবু মা-ই সবটা দেখে রাখছেন এখনও পর্যন্ত। একটি ছেলেকে রেখেছি ভাইয়ের কাজ করার জন্য। তবে ও সামলাতে পারে না সব সময়, তখন আমাকেই ঠান্ডা করতে হয় ভাইকে।"

"কিন্তু মেন্টালি রিটার্ডেড বাচ্চারা তো খুব-একটা অবাধ্য হয় না, তা হলে..."

"আমার ভাই আর বাচ্চা নেই, জরি," জাগরীকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলল নিলয়, "আর সেটাই হল ওর সমস্যা। ভাই মাঝে-মাঝে ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, ভাঙচুর চালায়, চিৎকার করে, তখন ওর অন্য রূপ। প্রথম-প্রথম বাড়ির কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারত না। ভাই যখন ও রকম করত, ওকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখত। ও তাতে আরও অস্থির হয়ে পড়ত, দেওয়ালে মাথা ঠুকত, চিৎকার করত, গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলত। সেই সময়ে কাউকে সামনে পেলে কামড়ে দিত কিংবা ধাক্কা মেরে ফেলে দিত। ভয়ে তখন কেউ যেতে পারত না ওর কাছে, খাওয়াতেও পারত না। বেচারাকে তখন না-খেয়ে থাকতে হত। সেই সময় আমার খুব কষ্ট হত ভাইয়ের জন্য। এক দিন হঠাৎ করেই আমার মাথায় খেলে গেল বিষয়টা। ভাই যতই মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া হোক না কেন, জৈবিক চাহিদাগুলো তো ওর স্বাভাবিক নিয়মেই আছে। স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকলে সে সবের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত ভাই, কিন্তু সেটা তো ওর নেই! তাই ওই সময় ও জন্তুর মতোই আচরণ করে," তার পর একটু থেমে নিলয় বলল, "তুমি বোর হচ্ছ না তো এ সব শুনে?"

"ছি, ছি, বোর কেন হব? তুমি যে এতটা সহমর্মী, আগে বুঝতে পারিনি। তোমাকে এত দিন পরে নতুন করে চিনছি আমি। আমার তো নিজের সন্তান ঝিল, তা-ও মাঝেমধ্যে আমি বিরক্ত হয়ে যাই, রেগে যাই। অথচ তুমি ভাইয়ের ব্যাপারে কত কেয়ারিং। আমার খুব ভাল লাগছে শুনতে, তুমি বলে যাও।"

"দেখো জরি, ভাইয়ের পালস, ওর সমস্ত রকম চাহিদা এক মাত্র আমিই বুঝি, তাই আমি কাছে না-থাকলে ভাইটা অবহেলায়, অযত্নে মারা যাবে। এ বার তুমি বলো, বাড়ির মধ্যে এক জন অস্বাভাবিক মানুষের উপস্থিতিকে মেনে নিয়ে কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে? যদিও বা করে, ভাইয়ের মানসিক সমস্যার দোহাই দিয়ে অশান্তি করবে, আমাকে চাপ দেবে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য। কী দরকার ফালতু ঝুটঝামেলা ডেকে আনার! তার চেয়ে এই ভাল, পেশা আর নেশা নিয়ে বেশ আছি।"

সে দিন অফিস থেকে অশোক ফিরল বেশ উত্তেজিত হয়ে। এসেই আগে হাঁকডাক শুরু করে দিল, "মিতু! দারুণ একটা খবর পেয়েছি!"

মিতুর কাছে ভাল খবরের এখন দুটোই মাত্র ধরন হতে পারে, হয় মেয়ের জন্য কোনও একটা মিরাক্‌ল আর না হলে নিজের একটা চাকরি। এ দুটোর কোনওটাই যে হওয়া সম্ভব নয়, সেটা মিতু জানে বলে অশোকের উত্তেজনা ওর মধ্যে সাড়া জাগাতে পারল না। ধীর পায়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মিতশ্রী।

মেয়ের জন্মের দেড় বছরের মাথায় অশোক বদলি হয়ে গেল রানাঘাটে, অশোকের সঙ্গেই এ বার মিতশ্রী চলে এসেছে মেয়েকে নিয়ে। শ্বশুর-শাশুড়ি রয়ে গেছেন তাঁদের বাড়িতেই।

শাশুড়ি-মা অবশ্য বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন মেয়েটাকে আর-একটু বড় করে নিয়ে যেতে। কিন্তু মিতশ্রী রাজি হয়নি, কারণ ও তো জানত এই মেয়ের বয়স বাড়লেও, সে শিশুটিই থেকে যাবে। তাতে পরিচিত জায়গায় অনেক সমস্যা। লোকজন ডেকে-ডেকে মেয়েকে নিয়ে প্রশ্ন করবে, 'আহা', 'উহু' করবে, সেটা মোটেই ভাল লাগবে না। কেউ-কেউ তো আবার ওর অসাক্ষাতে এটাও বলে, "হবে না! নিজের মা-বাবার চোখের জল ফেলিয়েছে, এখন নিজে মা হয়ে চোখের জল ফেললে তবে তো সেই হিসেব মিলবে!"

মিতশ্রী জানে, যতই ও বাবা-মা'র অমতে বিয়ে করুক না কেন, তাঁরা কিন্তু কখনওই চাইবেন না যে তাঁদের মেয়ে এমন ভাবে চোখের জলের ঋণ শোধ দিক। চার পাশে থাকা এই সব 'সমব্যথী'দের হাত থেকে বাঁচাটা তো একটা কারণ বটেই, তা ছাড়াও অশোকের সঙ্গে থাকাটাও জরুরি মিতশ্রীর জন্য। অশোক যতটা বোঝে ওকে, যে ভাবে স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখে, সেটাও এখন খুব প্রয়োজন। না হলে অবসাদ কবেই ওকে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়েটুকু ফেলে যেত!

"তুমি ভাবতেই পারছ না মিতু, কী ভাল যে একটা খবর পেয়েছি আজ!"

"আগে তুমি হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খাও, তার পর শুনব," নিরুৎসাহিত গলায় বলল মিতশ্রী।

"চা পরে হবে, আগে তুমি শোনো। আমি তো প্রায় উড়তে-উড়তে এসেছি রাস্তাটুকু। আমাদের অফিসে এক ভদ্রলোক বললেন, ওঁর এক জন পরিচিতের ছেলে সেরিব্রাল পলসিতে ভুগছে। বাচ্চাটা হাঁটতে পারত না, কথাও বলতে পারত না। ওকে দিল্লির একটা ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেছিল ওরা, বছর খানেক রেখে চিকিৎসা করেছে। দিল্লি থেকে যখন ফিরল, তখন সেই ছেলে হাঁটতেও পারে, কথাও বলতে পারে। আমি বলেছি ওদের ফোন নম্বর, ঠিকানা এনে দিতে। যোগাযোগ করব। ওদের সঙ্গে কথা বলে সেই ইনস্টিটিউটের ঠিকানা নেব, তার পর আমরাও যাব মেয়েকে নিয়ে। যত টাকা লাগে লাগুক, দরকার হলে ধার করব। মেয়ে সুস্থ হয়ে গেলে আমাদের আর

কী চাই!”

এমন একটা খুশির খবর যে শুনতে পাবে, ভাবতেই পারেনি মিতশ্রী। অনেক দিন পর মনটা আনন্দে টলমল করে উঠল। চোখ উপচে জল গড়াল গাল বেয়ে।

“ধুর বোকা মেয়ে! কাঁদতে নেই!” মেয়ে-সমেত মিতুকে জড়িয়ে ধরল অশোক। অনেক দিন পর আজ নিজেকে খুব সুখী বলে মনে হচ্ছে।

মুকুলিকা দেব এক জন স্পেশ্যাল এডুকেটর। মানে বিশেষ শিশুদের বিশেষ ভাবে শেখান তিনি। এই যে বাচ্চাগুলো, যারা খুব সহজে কিছু বোঝে না, কিংবা বুঝতে পারলেও প্রকাশ করতে পারে না কথা বলতে পারে না বলে, নয়তো যা শোনে বা শেখে মনে রাখতে পারে না, তাদের নিয়েই কাজ করেন তিনি। এমনও বাচ্চা আছে, যে বলতে পারে সব, কিন্তু তার কথা অন্য কেউ ভাল করে বোঝে না, জিভের আর মুখের পেশির অসাড়তার কারণে তার উচ্চারণ সব জড়িয়ে-পাকিয়ে একাকার হয়ে যায় যে! কেউ হাতে পেনসিল ধরতে পারে না। কেউ চোখ দিয়ে দেখে বটে, কিন্তু সেই খবর তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কেননা সংযোগকারী সেতু যে-অপটিক নার্ভ, সেই নার্ভগুলোই যে নষ্ট হয়ে গেছে!

কী করবে তবে এই বাচ্চারা? স্কুলের দরজা তো বন্ধ ওদের জন্য। ওদের দেখে সমবয়সিরা কেউ ভাবে পাগল, কারণ বড়রা তাদেরকে সেরকমটাই শিখিয়েছে। ওদের কারও-কারও মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরে বলে, বাচ্চারা তো দূরের কথা, বড়রাই ঘেন্না পায়। তারা জানেই না মুখের পেশিগুলো নিয়ন্ত্রণে নেই বলে লালা কেন, জল গিলতেও অসুবিধে হয় এই বাচ্চাদের। তা হলে কি কিছুই শিখবে না ওরা? বিশেষভাবে যত্ন নিয়ে শেখালে, বিরাট কিছু পণ্ডিত না হোক, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সহজপাঠ তো এরা শিখে নিতে পারে!

মুকুলিকার দ্বিতীয় সন্তান সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত ছিল। সেই সময়ে সেরিব্রাল পলসি বা অটিজ়ম নিয়ে সচেতনতা সাধারণ মানুষের মধ্যে তো দূর অস্ত, ডাক্তারদেরও তেমন ছিল না। একটাই মার্কা সবার কপালে দেগে দেওয়া হত, ‘প্রতিবন্ধী’। তাদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত সুলুকসন্ধান দেওয়ার মতোও কেউ ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে এক দিন মুকুলিকার চোখে পড়ে গেল একটা খবর, অবশ্য তার জন্য কৃতিত্বটা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীরই প্রাপ্য। প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শনে এসেছিলেন বলেই না ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসি’ খবরের কাগজে অতটা জায়গা পেয়েছিল! যাই হোক, মুকুলিকা খবরের কাগজের ওই পাতাটা যত্ন করে রেখে দিল। তার পর এক দিন সুযোগ বুঝে দুই মেয়েকে নিজের মা’র জিম্মায় রেখে, কাউকে কিছু না-জানিয়ে চলে গেল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসির কলকাতার শাখাটিতে।

ছবিতে দেখে যা মনে হয়েছিল, তার চাইতে অনেক বড় ইনস্টিটিউট এটা। আর তাতে চলছে নানা রকমের কর্মযজ্ঞ। মুকুলিকা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। আর এত বাচ্চা এখানে আসে? তা হলে আরও কত

বাচ্চা যে এ রকম সমস্যা নিয়ে জন্মায়! এটা ভেবে এক মুহূর্তে নিজের মনের ভার হালকা হয়ে গেল ওর। এখানে এসে নিজে চোখে না-দেখলে মুকুলিকা তো কোনও দিন জানতেই পারত না, ওর সমস্যা কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। সেই মুহূর্ত থেকে ও আর সকলের সঙ্গে একই বেদনার গ্রন্থিতে যুক্ত হয়ে গেল, সেই সঙ্গে নিজের মানসিক বাধার দেওয়ালটা ভেঙে ফেলে মনে-মনে মুক্ত হয়ে গেল মুকুলিকা।

## ১৩

রূপায়ণকে ওরা একটা বিশেষ ভাবে ডিজ়াইন করা চেয়ারে বসিয়ে বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিল। তার পর ওর সামনে চেয়ারের হাতলের উপর একটা কাঠের বড় ট্রে লাগিয়ে সেটাকেও বেঁধে দিল চেয়ারের পিছন দিকে। রুপুর পা দুটোকে পা-দানিতে রেখে সেখানেও দুটো স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দিল। এত সব কায়দা করায় ছেলেটা বেশ টানটান হয়ে বসতে পারল চেয়ারে।

"বুঝতে পেরেছ তো রূপের মা, ওকে বাড়িতে এ রকম ভাবে যত ক্ষণ পারবে বসিয়ে রাখবে। এ ভাবে বসিয়েই ওকে খাওয়াবে। যে কাজগুলো ওকে বাড়িতে করানোর জন্য দেওয়া হচ্ছে, ওগুলোও এ ভাবে বসিয়েই করাবে। প্রথম-প্রথম রূপ ঝামেলা করতে পারে, কিন্তু তুমি খুলে দেবে না। এটা না-করলে কিন্তু ও বসতে শিখবে না।"

বিন্দি বাধ্য ছাত্রীর মতো ঘাড় নাড়ল।

তিন বছর বয়স হয়ে গেছে, এখনও রুপু বসতে শেখা তো দূরের কথা, হামাও দিতে শেখেনি। শুধু উপুড় হতে পারে। তা-ও শিখেছে 'দেবভূমি'-তে এনে রোজ ফিজ়িয়োথেরাপি করানোর পর। এখান থেকেই এই বিশেষ চেয়ারটা বানিয়ে দেওয়া হল, রুপুর মাপ নিয়ে।

নতুন চেয়ারে বসে রুপু এখন দিব্যি পড়াশোনা করছে আন্টির কাছে। আন্টি এক হাতে একটা লাল বল আর অন্য হাতে একটা কলা নিয়ে ওকে কলা চেনাচ্ছেন।

"রূপ কলা কোনটা? দেখাও।"

রুপু হাত বাড়াল কলার দিকে।

"ভেরি গুড! রূপ আবার দেখাও, বলো তো কলা কোনটা?"

এ বারে আন্টি কলা আর বল হাত বদল করেছেন। রূপ এ বার হাত বাড়াল বলের দিকে, কারণ ওর বাঁ হাতটাই বেশি চলে, আর আন্টির বাঁ হাতে এখন বল।

"না রূপ, ভাল করে দেখো, এটা কলা। আবার দেখাও, কলা কোনটা?"

বিন্দি মনোযোগ দিয়ে দেখে নিচ্ছে রুপুকে শেখানোর কায়দাগুলো। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওকেই তো আবার করাতে হবে এই কাজগুলো। সপ্তাহে তিন দিন রুপুকে নিয়ে 'দেবভূমি'-তে আসে বিন্দি। ফিজ়িয়োথেরাপি, স্পিচথেরাপি আর স্পেশ্যাল এডুকেশন করানো হয়। এখানে যা কিছু দেখিয়ে দেয়, সেগুলো প্রতি দিন রুপুকে বাড়িতে করাতে হয় নিয়ম করে। এখন বিন্দির খাটনি বেড়ে গেছে খুব, তবুও একটা দিনও বাদ দেয় না। অনেক ভোরে উঠে সংসারের কাজে হাত দেয়, তার পর ছেলের থেরাপি। যেভাবেই হোক, ছেলেটাকে ভাল করে তোলাটাই এখন ওর ধ্যানজ্ঞান।

মেডিকেল কলেজের চোখের বিভাগে নিয়ে গিয়ে রুপুর চোখও পরীক্ষা করিয়ে এনেছে ডাক্তারবাবুর কথা মতো। ওখান থেকে বলে দিয়েছেন, চোখ থেকে মস্তিষ্কে দেখার খবর বয়ে নিয়ে যায় যে সব নার্ভ, তার কিছু মরে গেছে ওর। তাই চোখে যে সব জিনিসের ছবি তৈরি হয়, মস্তিষ্কে তাদের সবার খবর পৌঁছতে পারে না। সেই জন্য ও যা দেখে, তাকে বুঝে উঠতে সমস্যা হয় রুপুর। এই সমস্যা চশমা বা ওষুধ দিয়ে ঠিক করা যাবে না। ও যত বড় হবে, সমস্যাটা আস্তে-আস্তে কিছুটা কমে আসবে। রুপু যে কী দেখতে পায় আর কী পায় না, বিন্দি বুঝতে পারে না। তবু অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে ওকে বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে বা বলে-বলে সে সব চেনানোর।

সেদিন 'দেবভূমি' থেকে বেরিয়ে রুপুকে কোলে নিয়ে রিকশার জন্য দাঁড়িয়েছিল বিন্দি। একটা মোটর সাইকেল ওকে পেরিয়ে বেরিয়ে গেল, তার পর আবার গাড়িটা ঘুরিয়ে এনে ওর সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দুপুরবেলা, ফাঁকা রাস্তাঘাট। এমন ভাবে বাইকটাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে বিন্দি একটু ভয় পেয়ে গেল।

বাইক আরোহী এবার মুখঢাকা হেলমেটটা খুলল।

"তুমি কৃষ্ণনগরের মেয়ে না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক..."

"তুমি মিতশ্রীর সঙ্গে স্কুলে পড়তে তো?"

বিন্দি মাথা নাড়ল। তবে এখনও ভদ্রলোককে চিনতে পারেনি ও।

"মিতু আমার বৌ। তোমাকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি অনেক বার। তোমার বন্ধু এখন এখানেই থাকে, চলো তোমাকে দেখতে পেলে খুব খুশি হবে।"

একটু দোনামনা করছিল বিন্দি। মিতুর নাম করেছে বলেই কি ওর সঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে? যদি খারাপ লোক হয়! ওর মনের দোলাচল অশোকের চোখ এড়াল না। তাই ও হাসতে-হাসতে বলল, "আমি বদলোক নই। আমার নাম অশোক। মিতুদের বাড়িতে আমাকেও তুমি দেখেছ, এখন হয়তো মনে পড়ছে না।"

"ও! আপনি অশোক মাস্...," বলেই থেমে গেল বিন্দি, গিলে ফেলল শব্দটাকে।

"হ্যাঁ। মাস্টারমশাই ছিলাম, এখন বরমশাই হয়েছি। এসো, বাইকে বসতে পারবে তো?"

আর কথা না-বাড়িয়ে বাইকে উঠে পড়ল বিন্দি। বাড়ি ফিরতে আজ দেরি হয়ে যাবে ঠিকই, শাশুড়ি গজগজ করবে, দু'-চার কথাও শোনাবে। তবে এত বছর পরে ছোটবেলার বন্ধুকে এমন আকস্মিক ভাবে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের কাছে ও সব তুচ্ছ।

বিন্দির সঙ্গে মিতশ্রীর বন্ধুত্ব সেই ক্লাস ওয়ান থেকে। বারো ক্লাস পর্যন্ত একই স্কুলে পড়েছে দু'জনে। কলেজে গিয়ে ছাড়াছাড়ি। বিন্দির বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, আর ও লেখাপড়াতেও মনোযোগী ছিল না। তাই কলেজে পড়াকালীনই বাড়ি থেকে ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পর যা হয়, স্কুলের বন্ধুদের কথা মাঝেমধ্যে মনে হলেও আর খুঁজে-খুঁজে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠা হয় না। বিশেষ করে বিন্দি বা মিতশ্রীর মতো মেয়েরা তো আরওই পেরে ওঠে না, কারণ সংসার আর সন্তান তাদের সময় সবটাই প্রায় খেয়ে ফেলে।

অশোকের সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধু বিন্দিকে আসতে দেখে মিতশ্রী তাই অবাক তো হলই, খুশিও হল খুব। অশোকও খুশি হল মিতুর খুশিতে, কারণ ও তো বোঝে স্কুলবেলার বন্ধুর সঙ্গে যেমন মনের আগল খুলে কথা বলতে পারে মানুষ, ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে যতটা ভাল লাগে, ততটা নির্ভেজাল আনন্দ আর কোনও কিছুতেই পাওয়া যায় না। বন্ধুকে পেয়ে মিতুর মন অনেকটা হালকা হবে। বিশেষত বিন্দিও যে মিতুর সমব্যথী হবে, সেটা ওর কোলের ছেলেটিকে দেখেই বুঝতে পেরে গেছে অশোক।

"তুই আজ আমার কাছে থেকে যা। তোর অশোকদা গিয়ে রুপুর ওষুধপত্র নিয়ে আসবে আর তোর বরকে জানিয়ে আসবে।"

এত দিন পর বন্ধুকে পেয়ে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না মিতশ্রীর, তাই আবদার করল। অশোকও সুর মেলাল, "থেকে যাও না! তোমার বরকেও না হয় আমি গিয়ে নিয়ে আসছি, বেশ আড্ডা হবে।"

"আজ না দাদা! শ্বশুরবাড়িতে ঝামেলা হবে। শাশুড়ি এমন কাণ্ড শুরু করে দেবে যে, শ্যামল সামলাতে পারবে না। তার চেয়ে, আগে থেকে বলে-কয়ে এসে অন্য আর-এক দিন থাকব।"

"কথা দিলি কিন্তু!"

"হ্যাঁ রে বাবা! আসতে তো হবেই। এত দিন পরে তোকে পেলাম, ছাড়ব নাকি! আমাদের তো পাঁচ জনের সংসার। সেখানে তোকে গিয়ে থাকতে বলতে পারব না। তবে মাঝে-মাঝে গিয়ে ঘুরে আসতে পারিস।"

"যাব তো। কালই যাব। কুট্টিকে নিয়ে বিকেলে ঘুরতে বেরোতে হয়, খুব ঘোরার নেশা ওর। কালই ঘুরতে-ঘুরতে চলে যাব। আর তোর সঙ্গে রুপুর স্কুলটাতেও যেতে হবে। আমার মেয়েটাকেও ভর্তি করে দেব ওখানে।"

একটি ঘণ্টা চোখের নিমেষে পার হয়ে গেল, কিন্তু মিতু আর বিন্দির মনে হল কোনও কথাই যেন বলা হল না। শুধু ছোটবেলাকার স্মৃতিচারণ নয়, এই মুহূর্তে ওদের বাঁচার লড়াইটা চালিয়ে যাওয়ার জন্যও দু'জনের দু'জনকে ভীষণ প্রয়োজন। একটা বাঁক বদলের পর, জীবন যে ওদের দু'জনকে একই রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে!

জীবনের নানা ওঠা-পড়া কখনও যার গায়ে লাগেনি, শেষ পর্যন্ত সে-ও আর পারল না। ফোন করে নিজের মাকে ডেকে পাঠাল নয়নিকা, মুম্বইতে এসে কয়েকটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য।

নয়নিকার মা'র এখনও কয়েক বছর চাকরি আছে। সমস্ত মধ্যবয়সি চাকুরিজীবী মহিলার যা হয়, বাইরে কাজের চাপ আর বাড়িতে সংসারের চাপ— এ দু'য়ের জাঁতাকলে তিনিও পিষ্ট। বৃদ্ধা শাশুড়ি আর তার রিটায়ার্ড অথচ নাবালক পুত্রকে বাড়িতে রেখে দিয়ে, এই কয়েক বছরে মেয়ের কাছে গিয়ে একটা দিনও তিনি থাকতে পারেননি। কিন্তু এ বারে মেয়ের ফোন পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। যে-মেয়ে কোনওদিনও নিজের অসুবিধের কথা বলে কাউকে বিব্রত করেনি, সে যখন মাকে ডাকছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। তাই শাশুড়িকে স্বামীর হেফাজতে আর স্বামীকে কাজের দিদির হেফাজতে রেখে নয়নিকার মা মেয়ের কাছে ক'টা দিন থেকে আসার পরিকল্পনা করে রওনা হলেন।

নাতিকে খুব বেশি কাছে পাননি তিনি। তাই নাতির সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব একটা গভীর ছিল না। নয়নিকা যখন ছেলেকে নিয়ে শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তখন কয়েক বার ও বাড়িতে গেছিলেন তিনি, সেখানেই তুষকে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, নাতি অত্যন্ত দামাল। হয়তো কথা বলতে পারে না বলেই তুষের প্রকাশভঙ্গি এমন উগ্র, এমনটাই ভেবেছিলেন তিনি। বড় হলে, কথা বলতে শিখলে, এই ছেলে নিজে থেকে ঠিক হয়ে যাবে, এ রকমই বিশ্বাস ছিল তাঁর। কিন্তু এ বারে কয়েকটা দিন নাতির সঙ্গে থেকে তিনি একেবারে নাজেহাল
হয়ে গেলেন।

তুষের মেজাজ-মর্জির তল পাওয়া ভার। এমনিতে তো সারা ক্ষণ অস্থিরতা আছেই, তার উপরে আবার খাওয়া নিয়েও এখন হাজার বায়নাক্কা। সেদিন দুপুরে ভাত না-খাইয়ে নয়নিকা ছেলেটাকে পরোটা খাওয়াচ্ছে দেখে অবাক হলেন তিনি।

"এ কী! তুই ওকে এখন পরোটা খাওয়াচ্ছিস কেন? ভাত কখন খাবে তা হলে?"

"খাবে না। এখন ওর এই ফেজ় চলছে, যত বার খাবে পরোটাই দিতে হবে, না হলে ও খাবেই না।"

"তাই বললে হয়! একটা ছোট বাচ্চা, তার খাবারের কোনও নিয়ম থাকবে না! খালি ওই সব হাবিজাবি খেলে পুষ্টি হবে?"

"আমি অনেক ভাবে চেষ্টা করেছি, পারিনি। দ্যাখো, তুমি পারো কি না!"

"ভাত এনে দে, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

উনি ভেবেছিলেন, মেয়ের হয়তো ধৈর্যের অভাব। তাই ভাতের বদলে পরোটা দিয়ে সংক্ষেপে কাজ সারতে চাইছে। কিন্তু তিনি তো অসীম ধৈর্য রাখেন, তাই নাতিকে ঠিক ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাইয়ে দিতে পারবেন, এই ভরসা তাঁর ছিল।

মা'র হাতে ছেলেকে খাওয়ানোর দায়িত্ব দিয়ে নয়নিকা গিয়ে বিছানায় একটু পিঠটা টান করেছিল। গত রাতে ছেলেটো ভাল করে ঘুমোয়নি, রাত দুটোয় উঠে পড়েছিল। ফলে নয়নিকারও ঘুম হয়নি। এখন বালিশে মাথা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চোখদুটোও জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎ একটা শব্দে চটকাটা ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে পাশের ঘরে গিয়ে দেখল সারা ঘরে ভাত ছিটানো। মা মেঝেতে বসে আর ভাতের থালাটা ভেঙে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে ঘরময়।

"আমি বুঝতেই পারিনি তুষ এতটা ক্ষেপে যাবে। অতটুকু ছেলের কী তেজ! থালাটা ছুড়ে মারল!" আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বললেন তুষের বেচারা দিদিমা।

নয়নিকা কোনও জবাব দিল না এই কথার। ও জানত, বেশি জোরাজুরি করতে গেলে এ রকমই কিছু একটা হবে। প্রায় চার বছর হতে চলল তুষকে নিয়ে আছে ও, ছেলের মতিগতি কিছুটা তো বুঝবেই।

"কোথায় লেগেছে তোমার?"

মাকে মেঝে থেকে ধরে-ধরে তুলল নয়নিকা। ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখল, সে নিবিষ্ট হয়ে কার্টুন দেখছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি এখানে, এই সব ভাঙচুরের ব্যাপারে কোনও ভূমিকাই নেই ওর।

"আমার লাগেনি। ভাতের উপর পা পড়ায় স্লিপ করে পড়ে গেছি। আমাকে ছাড়, তুই ওকে যা হয় খাওয়া। একটা দানা ভাতও ওর মুখে ঢোকাতে পারা যায়নি। আমি এ সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।"

সেদিন সন্ধেবেলা নয়নিকা তুষকে নিয়ে বসেছিল ওর থেরাপিস্টের দেওয়া কাজগুলো করাতে। অটিস্টিক বাচ্চাদের নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, সেই থেরাপিস্টরা বলেন, এদের সব সময় নানা রকমের কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে, কড়া নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখতে। সকাল-সন্ধে তাই নয়নিকাকে নিয়ম করে তুষকে দিয়ে ওর অপছন্দের কাজগুলো করাতে হয়। তার ফাঁকে-ফাঁকেই সংসারের কাজকর্মও দেখতে হয়। এখন অবশ্য মা আসায় সেই সব কাজ থেকে আপাতত ছুটি মিলেছে। মেয়ের আর নিজের জন্য চা করে নিয়ে এসে নয়নিকার মা বসলেন মেয়ে আর নাতির কাছে।

"আমাদের দেশে না হয় নেই, কিন্তু অন্য কোনও দেশেও অটিজ়মের ওষুধ নেই?" জানতে চাইলেন তিনি।

"নাহ! দিল্লির একটা সেন্টারের এক জন ডাক্তারবাবুর কাছে শুনেছিলাম, আমেরিকায় এক ধরনের চিকিৎসা হত। একটা প্যাচ লাগিয়ে দেওয়া হত চামড়ার উপর, যেটা অটিস্টিক বাচ্চাদের রক্ত থেকে পারদ বের করে নিত। উনি বলছিলেন, এই সব বাচ্চার ব্রেনে নাকি পারদ জমতে থাকে, সেটাই অটিজ়ম-এর কারণ।"

"ব্রেনে পারদ জমে? সে কী রে? পারদ শরীরে ঢোকে কী করে?"

"ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, জন্মের পর বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করা মাত্রই শরীরে পারদ ঢুকতে শুরু করে। তা ছাড়াও আরও কতকিছুর মধ্যে দিয়ে যে পারদ ঢোকে অল্প-অল্প করে, তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের সবারই ঢোকে, আবার শরীর সে সব বের করেও দেয়। কিন্তু এদের শরীরে নাকি সেই মেকানিজ়মটা থাকে না, তাই ব্রেনে পারদ জমতে থাকে।"

"বলিস কী রে! তা সেই প্যাচ এ দেশে পাওয়া যাবে না?"

"ওই ডাক্তারবাবুই বলছিলেন, এ দেশে সেই ওষুধ তৈরি করার কথা চলছিল বছর পনেরো আগে। কিন্তু এই চিকিৎসা মনে হয় সফল হয়নি, তাই ওই প্যাচের ব্যাপারটা আর এগোয়নি। এখন তো আবার শুনছি অটিজ়ম-এর ওষুধ ইঁদুরের উপর সফল হয়েছে, কিন্তু মানুষের উপর হয়নি। আরও হয়তো গবেষণা করতে হবে।"

বড় করে শ্বাস ছাড়লেন তুষের দিদিমা।

তাঁর মনে হল সবটাই ভাগ্য! না হলে তাঁদের ঘরেই কেন এমন একটা অদ্ভুত অসুখ দিয়ে পাঠালেন ভগবান, যার চিকিৎসা পর্যন্ত নেই!

"কী যে সব অদ্ভুত অসুখবিসুখ এখন হচ্ছে! তোরা যখন ছোট ছিলি, তখন এ সব রোগের নাম পর্যন্ত কোনওদিন শুনিনি।"

"তখনও ছিল, মা! শুধু মানুষের অ্যাওয়ারনেস ছিল না। তোমার মেয়ের মতো দুর্ভাগা মা এখন প্রায় ঘরে-ঘরেই পাবে। কারণ, সমীক্ষা বলছে ভারতে প্রতি আটষট্টি জনে এক জন মানুষ অটিস্টিক। আর আমেরিকায় তো সংখ্যাটা আরও বেশি। প্রতি ঊনষাট জনে এক জন। কাজেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কী হবে মা, যা হয়েছে তাকে মেনে নিতে হবে।"

"সে তো তুই মেনেই নিয়েছিস। কিন্তু এই ছেলেকে নিয়ে তোর এই এত দূরে একা ঘরে পড়ে থাকাটা নিজের চোখে দেখার পর থেকে আমি যে আর মেনে নিতে পারছি না! ওর সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে তোর নিজের শরীরের কি হাল হয়েছে দেখেছিস! তুই অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ছেলেকে দেখবে কে? শোন, আমি তোকে আমার সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ওখানে গিয়ে থাকলে তবু আমরা সবাই মিলে তুষকে দেখাশোনা করতে পারব। তুই তা হলে একটু বিশ্রাম পাবি। না হলে তো তুই মারা পড়বি। আমি আজকেই জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলব।"

নয়নিকা মা'র কথায় আপত্তি করল না। সত্যিই ও আর পারছে না এই অসম লড়াইটা লড়তে। ওর শরীর-মন একটু বিশ্রাম চাইছে, একটু মুক্তি চাইছে এই পরিবেশ থেকে। গত এক বছর ধরে তুষকে নিয়ে এই চার দেওয়ালের মধ্যে একই রুটিনের যাপন, ওকে ক্রমাগত বিষণ্ণ করে তুলছে।

## ১৪

নিলয়ের বলে দেওয়া ঠিকানায় ওরা পাঁচটা বাজার বেশ খানিকটা আগেই পৌঁছে গেল। ডাক্তারবাবুর তখন ক্লিনিকে আসার সময় হয়নি, আসেনওনি। নিলয়েরও আজ আসার কথা, সে-ও এসে পৌঁছয়নি এখনও। আসলে ওরাই বেশি আগে-আগে পৌঁছে গেছে। কারণটা ঝিলের ব্যস্ততা। বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা জানার পর থেকে ঝিল প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠেছিল, "কখন যাব? কখন যাব?" করে ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছিল ক্রমাগত।

মেয়ের মন রাখতে সুজয় বলল, "চলো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। দরকার হলে ওখানে গিয়ে বসে থাকব।"

তাই আগেভাগে পৌঁছে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে দেখানোর জন্য টিকিট করে, ওরা পলিক্লিনিকের বাইরে গাছের তলায় পাতা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

যাদবপুরের ভিতর দিকের এই পলিক্লিনিকটাতে রোগীর বিশেষ ভিড় থাকে না। তাই ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সময় নিয়ে কথা বলার জন্য এটাই আদর্শ জায়গা, এমনটাই বলে দিয়েছিল নিলয়।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার একটা সরকারি হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান। ওই হাসপাতালে তাঁর অধীনে একটি মেডিকেল টিম ভ্রূণের স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করছে। স্নায়ুকোষের অসুখে আক্রান্ত মানুষের শরীরে ভ্রূণের স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করে তাঁরা খুব ভাল সাফল্য পেয়েছে।

যে হেতু স্নায়ুকোষের বিভাজন হয় না, সেই জন্য নতুন করে তৈরি হতে পারে না এই কোষ। স্নায়ুর ক্ষয়ক্ষতিজনিত অসুখে ভোগা মানুষদের কোনও চিকিৎসাই তাই করা সম্ভব হয় না। এই প্রজেক্টটা তাই এই সব রোগীদের জন্য একটা বিরাট আনন্দের খবর। যাঁরা এখনও অবধি এই চিকিৎসা পেয়েছেন, তাঁদের সুস্থতার হারও খুব ভাল। আসলে ভ্রূণের স্টেম সেল তো ভীষণ কার্যকরী, এ-থেকেই পুরো শরীরটা তৈরি হয়, কাজেই এটা পরিণত মানুষের শরীরেও খুব দ্রুত কোষ বিভাজন করতে পারে।

নিলয়ের কাছে এই ব্যাপারে জানার পর অনেক আশা নিয়ে সুজয় আর জাগরী আজ ঝিলকে নিয়ে এসেছে, যদি এত দিনে একটা সঠিক চিকিৎসা করানো যায় মেয়েটার, যদি কিছুটা হলেও সুস্থ হয়ে ওঠে ঝিল। ঝিলের সমস্যাটাও তো স্নায়ুর ক্ষয়জনিত, ওর মস্তিষ্কের বেশ কিছু স্নায়ুকোষ নষ্ট হয়ে গেছে বলেই তো মেয়েটার এই সমস্যা। এই প্রজেক্টটা সরকারি, তবে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে বলেই হয়তো এত ভাল একটা প্রজেক্টের ব্যাপারে লোকজন তেমন কিছু খোঁজখবর রাখে না। কাগজেও কোনওরকম লেখালিখি হয়নি এ নিয়ে। পুলিশের যে-দপ্তরে এখন নিলয় আছে, তাতে সরকারি খবরাখবরগুলো সহজেই পেয়ে যায় ও। এই প্রজেক্টটার ব্যাপারে নিলয় আগে থেকেই জানত, তাই জাগরীর মেয়ের কথা জানার পর ও-ই যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ঝিলের রিপোর্টগুলো ভাল করে দেখলেন। ওর সমস্যাটাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয়, 'সেরিব্রাল পলসি', যার অর্থ হল মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ যদি নতুন করে নিজেদের তৈরি করতে পারত, তবে এটা কোনও সমস্যাই হত না। শুধু ঝিলের মতো সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্তরা নয়, যে-কোনও স্নায়ুর ক্ষয়জনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা।

"আমরা অ্যাবর্টেড ফিটাসের স্টেম সেল নিয়ে কাজ করছি। মৃত নয়, জীবিত স্টেম সেল চাই আমাদের, তাই অ্যাবর্টেড ফিটাস ইজ় দ্য চয়েস। সাকসেস রেটও খুব ভাল এটুকু বলতে পারি। বাকি সবই উপরওয়ালার ইচ্ছে।"

"এই ধরনের পরীক্ষা আর কোথাও হয়েছে? মানে বাইরের দেশে কোথাও?" সুজয় আগ্রহ সহকারে জানতে চাইল।

"নাহ! আমি যতদূর জানি, এই রকম কাজ আমরাই প্রথম করছি। বিদেশে ফিটাসের স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল, তবে ধর্মীয় আর মানবিক কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ জানেন তো! কিন্তু আমার কথা হল, আমরা তো আর ভ্রূণহত্যা করছি না। যে ভ্রূণগুলোকে আদৌ জন্মাতে দেওয়া হবে না বলে তাদের মায়েরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, তাদের সাহায্যে যদি জন্মে যাওয়া অসুস্থ মানুষগুলোকে সুস্থ জীবন দেওয়া যায়, তাতে অসুবিধে কোথায়!"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে জাগরীর মনের ভিতরে যেন আলো জ্বলে উঠল অনেক বছর পরে। যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়, ওর সামনে এক জন দেবদূত বসে আছেন, যাঁর হাতের স্পর্শে নিরাময় হয়ে যাবে ওর এত বছরের ক্ষতস্থান। আর এই দেবদূতের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভগবান নিলয়কে পাঠিয়েছেন, না হলে এত বছর পরে নিলয়ের সঙ্গে কেনই বা যোগাযোগ হবে! সর্বময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা, নিজের ভিতরে উপচাতে থাকা ভাললাগার অনুভূতি, এই দুই মিলেমিশে ভিজিয়ে দিল জাগরীর চোখ।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ধরুন কোনও কারণে আমার মেয়ের ক্ষেত্রে এই ট্রিটমেন্টটা সাকসেসফুল হল না। তাতে ওর কোনও ক্ষতি হবে না তো?" সাবধানী সুজয় সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে নিতে চাইল।

"না। যদি স্টেম সেল ওর শরীরে কাজ করে, তো আপনার মেয়ের অবস্থার উন্নতি হবে, না হলে ও যেমন আছে তেমনই থাকবে। নতুন করে আর অবস্থার কিছু অবনতি হবে না।"

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে জাগরী এত দিন ধরে বাক্সে তালা দিয়ে রাখা ইচ্ছেগুলোকে একে-একে বের করে এনে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। ঝিল যদি নিজে-নিজে উঠে দাঁড়াতে পারে, যদি হাঁটতে পারে, তবে সেই সব ইচ্ছে রূপ পাবে। ছোটবেলা থেকে লালন করে আসা কত স্বপ্নডানা ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে মনের

এক কোণে, সেগুলোকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে। আপাতত সামনে একটাই কাজ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, হাসপাতালে গিয়ে ঝিলের চিকিৎসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিয়ে স্টেম সেল পাওয়ার জন্য ওর নামটা রেজিস্ট্রেশন করে আসা। আর তার পর ওর ডাক আসার অপেক্ষায় থাকা।

"তোমাদের সবাইকে আমি আজকে কয়েকটা বাচ্চার ছবি দেখাব," মিসেস দেব এর গলা শুনে সবাই একটু নড়েচড়ে বসল।

ক্লাস করার জন্য বাচ্চাদের 'দেবভূমি'তে ঢুকিয়ে দিয়ে স্কুলের বাইরের দিকটাতে অভিভাবকদের বসার জন্য যে-ঘরটা আছে, সেখানে বসে মায়েরা একটু নিজেদের মধ্যে গল্পগাছা করে। সারা দিনের মধ্যে এই সময়টুকুই তাদের একটু হাঁপ ছাড়ার সময়, বিনোদনের সময়। টুকটাক আড্ডার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের সমস্যাগুলোও আলোচনা করে মায়েরা, বেশির ভাগ সময়েই সমাধানও মিলে যায় এই আড্ডা থেকেই।

এই ঘরে মাঝে-মাঝে মিসেস দেবও আসেন। কথা বলেন মায়েদের সঙ্গে। তাদের সমস্যার কথা শোনেন। নিজের সাধ্য মতো পরামর্শ দেন। বাচ্চাদের সমস্যা ছাড়াও মা-বাবাদেরও প্রায় সকলেরই একটা সমস্যা আছে। কম-বেশি মানসিক অবসাদে ভোগেন সকলেই, আর সেটা অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছু নয়। চব্বিশ ঘণ্টা এই বাচ্চাদের সঙ্গে কাটানোর একটা মানসিক চাপ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে মা-বাবার অবর্তমানে এদের দেখাশোনা করার দুঃসহ চিন্তার ভার।

মিসেস দেব বোঝেন সবই। তাই তিনি চেষ্টা করেন অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অবসাদ কিছুটা হলেও কাটাতে। কারণ মা-বাবারা যদি ভাল না-থাকেন, বাচ্চাগুলো কী ভাবে ভাল থাকবে! ওদের জগৎই তো এঁদের নিয়ে।

মিসেস দেব একটা ল্যাপটপ নিয়ে এসেছিলেন এই ঘরে। সেটা অন করে সবাইকে একটি মেয়ের ছবি দেখালেন। জীর্ণ চেহারার মেয়েটা বিছানার সঙ্গে একদম মিশে শুয়ে আছে। জামা-প্যান্টের বাইরে ওর হাত আর পায়ের যতটুকু বেরিয়ে আছে, তাকে কাঠি বললে ভুল কিছু বলা হয় না। সেই হাত-পায়ের হাড়গুলো বেঁকে গেছে। শরীরের মধ্যে কেবল জেগে আছে মুখটা।

"ইস!"

এক সঙ্গে অনেকে বলে উঠল ছবিটা দেখে।

মিসেস দেব ল্যাপটপ থেকে চোখ সরালেন। সকলের মুখগুলো এক বার দেখে নিয়ে বললেন, "এ হল রেহানা। বয়স সতেরো, ওজন মাত্র পঁচিশ কেজি। দেখেই বুঝতে পারছ, মেয়েটি সেরিব্রাল পলসিতে ভুগছে। দিনের মধ্যে পাঁচ থেকে ছ'বার ফিট হয়। ওর বাড়ির যা অবস্থা, তাতে ঠিকমতো খাওয়াই জোটে না, তার উপর মেয়ের চিকিৎসা। মেয়েটার গিলতে অসুবিধে হয়, তাই ভাল করে খেতেও পারে না। ওর মা বললেন, কোনওমতে গলা ভাত অল্প-অল্প করে একটুখানি খাইয়ে দেন। নিয়ম করে ফিটের ওষুধ খাওয়াতে পারলে ফিটটা বন্ধ হত হয়তো, তাতে মেয়েটা একটু ভাল থাকতে পারত!"

ঘরের ভিতরে এমন অসহ্য রকমের নীরবতা নেমে এল যে, দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক আওয়াজটা বড্ড বেশি জোরে কানে বাজতে থাকল। মিসেস দেব তত ক্ষণে চলে গেছেন পরের ছবিতে। কালো মতন একটা বাচ্চা ছেলের ছবি, শুয়ে-শুয়ে আঙুল চুষছে।

"এ হল বাবুয়া। দেড় বছর বয়স। সদ্য উপুড় হতে শিখেছে। অসুস্থ ছেলে জন্ম দেওয়ার অপরাধে ওর মা'র গায়ে আগুন দিয়ে দিয়েছিল ওর রিকশাচালক মাতাল বাবা। মা মারা গেছে, বাপ এখন জেলে। বাবুয়া থাকে ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরমা পাঁচ বাড়ি কাজ করে খান। নাতিকে ট্যাঁকে নিয়ে তো আর কাজে যাওয়া যায় না, তাই ওকে একা-ই ঘরে রেখে দিয়ে বেরোতে হয় তাঁকে। বাড়ি ফিরে ঠাকুরমা যখন খাওয়ান, তখনই খেতে পায় বাবুয়া।"

"আহা রে! পেচ্ছাপ-পায়খানা করে তার মধ্যেই তো পড়ে থাকে বেচারা!" ফুঁপিয়ে উঠলেন এক জন মা, সম্ভবত নিজের সন্তানকে অমন দুরবস্থার মধ্যে কল্পনা করেই তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

তত ক্ষণে মিসেস দেব চলে গেছেন পরের ছবিতে। এবারে ল্যাপটপের পর্দায় ফুটে উঠেছে একটার বদলে দুটো বাচ্চা।

"এদের দেখো। এরা দুই ভাইবোনই স্পেশ্যাল চাইল্ড, দু'জনেই শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধী। বাবা নেই। মাকে রোজগারে বেরোতে হয়। পাশাপাশি দু'জনকে শুইয়ে রেখে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে এদের মা কাজে বেরিয়ে যান। তখন ওদের খিদে-তেষ্টা পেলেও কিছু করার নেই। ওদের মা বলেছেন, 'ভাগ্যিস এদের মুখে বোল দেয়নি ভগবান! তা হলে তো চিল্লে পাড়া মাথায় করত, তখন লোক জড়ো হয়ে যেত আর সবাই এসে আমায় দুষত!'"

"দিদি! প্লিজ়, আর দেখাবেন না! সহ্য করতে পারছি না," এক জন মা বললেন কাঁদতে-কাঁদতে।

ল্যাপটপ বন্ধ করে দিলেন মিসেস দেব। তত ক্ষণে নীরবতা ভেঙে ঘরময় নাক টানার আওয়াজ। মিসেস দেব বললেন, "আমি তো বটেই, এই ঘরে আর যারা রয়েছ, আমরা সবাই অনেক লাকি, তাই না? আমাদের সন্তানদের চিকিৎসা অন্তত করতে পারি আমরা, তাদের যত্ন করে আগলে রাখতে পারি। কিন্তু আমাদের চার পাশে এমন অনেক মা-বাবারা আছেন, যাঁরা তাঁদের বাচ্চাদের জন্য সেটুকুও করতে পারেন না। এ জন্যও অন্তত আমাদের ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর মন খারাপ হলে এঁদের কথা ভেবে নিজেকে সুখী মনে করা উচিত, তাই তো?"

## ১৫

ঠিকানাটা পাওয়ার পর প্রথম যে-রবিবারটা পেল, সেই রবিবারেই অশোক পৌঁছে গেল কল্যাণীতে। ঠিকানা-অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্লকে পৌঁছে নম্বর মিলিয়ে বাড়ি খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধেই হল না। আগে থেকে টেলিফোনে খবর দিয়ে রেখেছিল অশোক। কী প্রয়োজনে অচেনা মানুষটির বাড়িতে বিনা আমন্ত্রণে আতিথ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে, তা বিশদে জানিয়ে রেখে দিয়েছিল।

বেল বাজাতে দরজা খুলে দিলেন যিনি, অশোক আন্দাজ করল তিনিই গৃহকর্তা।

"নমস্কার, আমি অশোক পাল। আপনাকে ফোন করেছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। আসুন, আমিই বিপুল দাস।"

অনাহুত অতিথির যত্ন-আত্তি করতে কোনওরকম ত্রুটি রাখেননি বিপুলবাবু। ফোনে কথা বলেই অশোকের মনে হয়েছিল মানুষটি বেশ ভাল। এখন বুঝতে পারল, ও যতটা ভেবেছিল তার চাইতেও বেশি ভালমানুষ বিপুল দাস।

"আমার মত যদি জানতে চান, তা হলে আমি বলব আপনি দেরি না-করে আপনার মেয়েকে দিল্লিতে নিয়ে যান। আমার ছেলেটাকে যখন ওখানে নিয়ে গেছিলাম তখন ওর বারো বছর বয়স, তখনও হামা টানে। আট মাস টানা ওদের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করিয়ে যখন ফিরলাম, তখন ছেলে হেঁটে ফিরল। এই যে দেখুন না, ভিডিয়ো করে রেখেছি আমি।"

বিপুলবাবু ছেলের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বেশ কিছু ভিডিয়ো করে রেখেছেন, সেগুলো সবই মনোযোগ দিয়ে দেখল অশোক। ঋদ্ধিকেও দেখল সামনাসামনি, এখন সে চোদ্দো বছরের ছেলে। চোখে চশমা, হালকা গোঁফের রেখা, চেহারাটা

একটু ভারীর দিকে। হেঁটেই এল ঋদ্ধি, তবে একেবারে নিজে-নিজে নয়। বিপুলবাবু ধরে-ধরে নিয়ে এলেন ছেলেকে।

"ইনি এক জন আঙ্কল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নাও, আঙ্কলকে গুড আফটারনুন বলো।"

"গুড আফটারনুন আঙ্কল," ঈষৎ জড়িয়ে-জড়িয়ে সম্ভাষণ জানাল ঋদ্ধি।

"গুড আফটারনুন বেটা। কেমন আছ তুমি?" অশোক ব্যাগ থেকে চকলেট বের করে ঋদ্ধির দিকে বাড়িয়ে ধরল। ও খুব খুশি হয়ে চকলেটের প্যাকেটটা নিল অশোকের হাত থেকে। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতেও ভুলল না।

"বছর খানেক হল আমরা দিল্লি থেকে এসেছি। তার পর এক বার গেছিলাম ফলো-আপ করাতে। ওখানে যেমন ভাল থেরাপি চলত, এখানে তো হয় না তেমন, তাই ঋদ্ধি একটু ডিটোরিয়েট করেছে। বাড়িতে এক জন ফিজ়িয়োথেরাপিস্ট রেখেছি, ওদের দেখিয়ে দেওয়া থেরাপিগুলোই করায়, তবু ঠিক ওখানকার মতো হয় না। ওদের হাতই অন্য রকম, দেখে এলাম তো! আমাদের এখানকার কেউই ও রকম থেরাপি করাতে পারে না।"

"তা হলে তো খুব সমস্যার কথা!"

"সমস্যাই তো! ওখানে ওরা ছেলেটাকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, সেটাও এরা ধরে রাখতে পারল না। কী করব বলুন, চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে তো আর দিল্লিতে পড়ে থাকতে পারব না। কাল হোক বা পরশু, ফিরে আসতেই হবে! তবে যদি থেকে যেতে পারতাম, ছেলেটার আরও উন্নতি হত!"

বিপুলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী, দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। সুতরাং, বেশ পয়সাকড়ি আছে। তাঁরা যদি চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে ছেলের চিকিৎসার জন্য দিল্লিবাসী হতে ভয় পান, তবে অশোকের মতো ছা-পোষা কেরানি কি আর পারবে!

"তবে টানা আটটা মাস থাকতেই হবে। ওদের প্রোগ্রামটাই আট মাসের। আগে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসুন অন্তত, ওরা কী অ্যাসেসমেন্ট করে সেটা দেখে নিন। তার পর সম্ভব হলে ট্রিটমেন্ট করাবেন, অসুবিধে হলে করাবেন না। সবটাই তো আপনার উপর।"

বিপুলবাবুর পরামর্শটা পছন্দ হল অশোকের। প্রয়োজনীয় ঠিকানা, ফোন নাম্বার লিখে নিয়ে ওঁকে আর এক প্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল অশোক।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে অশোকের মাথায় নতুন দুশ্চিন্তা ভর করল। চিকিৎসার খরচ, দিল্লির মতো বড় শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা, সব মিলিয়ে মোটা টাকার ধাক্কা। সেটা না হয় যেভাবেই হোক জোগাড় করা যাবে, দরকার হলে ব্যাঙ্ক থেকে ধারও করা যাবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, দিল্লির মতো জায়গায়, আটটা মাস মিতু একা মেয়েকে নিয়ে কী করে থাকবে! অশোকের পক্ষে টানা আট মাস ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়। এ দিকে ওর বাবা ভুগছেন অ্যালজ়াইমার্সে, তাঁকে ফেলে রেখে অশোকের মা-ও গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না। আর মিতুর বাড়ির দিক থেকেও কোনও ভরসা নেই, সে দিকটা তো এখনও পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তা হলে উপায়?

অশোকের কাছে সবটা শুনে উপায় একটা বের করল মিতুই।

"বিন্দিকে বলে দেখি না? যদি ও রুপুকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যায়?"

"তা হলে তো খুবই ভাল হয়! অ্যাসেসমেন্ট করানো হয়ে গেলে তোমাদের থাকার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি আর শ্যামল ফিরে এলাম। ওর পক্ষেও তো দোকান ফেলে থাকা সম্ভব নয়। তোমরা দু'জনে এক সঙ্গে থাকলে চিন্তা কিছুটা কম হয়। তার পর আমি আর শ্যামল না হয় পালা করে মাঝেমধ্যে যাব।"

"তা হলে আজ বিকেলেই চলো বিন্দিদের বাড়িতে যাই, দেরি করে লাভ নেই।"

রবিবার দোকান বন্ধ থাকে বলে শ্যামলও বাড়িতে ছিল সেদিন। অশোকের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা শুনে শ্যামল বলল, "দাদা! আপনার কথা শুনে মনে আশা জাগছে। ছেলেটা যদি ভাল হয়ে যায়, তা হলে আমার আর কিছুই দরকার নেই। কিন্তু দাদা, আমার একটাই সমস্যা। জানেনই তো, বাবার দোকানে খাটি। খাওয়াপরাটা চলে যায় তাতে। কিন্তু আপনি যা বললেন, তাতে তো অনেকগুলো টাকার ধাক্কা। এত টাকা আমি কোথায় পাব?"

শ্যামলের কথাটা মিথ্যে নয়। মিতু জানে, বিন্দি সবই বলেছে ওকে। শ্যামলের নিজস্ব রোজগার নেই বলে, শাশুড়ি-জা কেমন খারাপ আচরণ করে, সে সব কথাও বলেছে বিন্দি। এই পরিস্থিতিতে ওদের উপর জোর করা যায় না। আর বিন্দি না-গেলে মিতুর যাওয়ার পাল্লাটাও অসম্ভবের দিকেই ঝুঁকে থাকে।

শ্যামলের জবাবটা শোনার পর থেকে ওদের চার জনের মনের মধ্যেই নানা রকম ভাবনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কেউই কোনও কথা বলছিল না। প্রত্যেকেই ডুবে ছিল নিজস্ব সমস্যার সমাধানের সন্ধানে। শ্যামল ভাবছিল, বাবাকে বলবে বাড়ির ভাগ-বাবদ ওর প্রাপ্য টাকার কিছুটা দিতে। ছেলে সুস্থ হয়ে গেলে বস্তিতে গিয়ে বাস করতেও কোনও আপত্তি নেই। যদিও শ্যামল আটানব্বই ভাগ নিশ্চিত ছিল, বাবা কিছুতেই রাজি হবে না এই প্রস্তাবে। বাবা যদিও বা নিমরাজি হয়, মা বেঁকে বসবে। তা হলে আর-একটাই উপায় থাকে, পাড়ার ক্লাবে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ানো। যদি ওরা ছেলেটার চিকিৎসার জন্য বিল-টিল ছাপিয়ে চাঁদা তুলে দিতে পারে। ও স্থির করল, মিতুরা চলে গেলে এই ব্যাপারে বিন্দির সঙ্গে কথা বলবে।

বিন্দি ভাবছিল, মা-বাবার কাছেই চাইবে টাকা। না দিলে ঝামেলা করবে। বলবে, 'বাপের ব্যবসা-বাড়ি দেখে বিয়ে দিয়ে দিলে, ছেলের যে আলাদা রোজগার নেই, সে সব খোঁজখবরও নিলে না! আমাকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য এত তাড়া ছিল তোমাদের! ছেলেটা অসুস্থ না হলে আমি তোমাদের কাছে কোনওদিনই কিছু চাইতাম না, কিন্তু এখন আমি চাইতে বাধ্য হচ্ছি। আমারও তো একটা অধিকার আছে তোমাদের সম্পত্তিতে। সেখান থেকে এখন আমাকে টাকা দাও, আমি পরে আর কিছু দাবি করব না।'

মিতু ভাবছিল, মা-বাবার কাছে যাবে কি না। মেয়েটাকে নিয়ে যদি ওঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এক বার, তা হলে কি মা'র মন গলবে না? যদি মা-বাবা ক্ষমা করে দেয়, সম্পর্কটা জোড়া লাগে, তা হলে ওঁদের বলতে পারবে সঙ্গে গিয়ে থাকার জন্য। হিসেব মতো বাবা রিটায়ার করে গেছেন, ওঁরা দু'জন ঝাড়া হাত-পা। এখন যে নিজের লোকের বড়ই প্রয়োজন মিতুর।

অশোক চিন্তা করছিল, মেডিক্যাল লিভ যা জমেছে সেগুলো সব নিয়ে নেবে কি না। অবশ্য তাতেও সবটা কুলোবে না। সে ক্ষেত্রে অফিস স্পেশ্যাল লিভ দেবে কি না, যদি 'উইদাউট পে' হতে হয় সেটাতেও অসুবিধে নেই, তবুও ছুটি নিতেই হবে। এমন একটা চিকিৎসার সন্ধান পেয়ে সেটা হাতছাড়া করা চলবে না কিছুতেই।

নয়নিকা আর তুষকে নিয়ে অরুণের শাশুড়ি-মা বাড়ি ফিরে গেছেন সপ্তাহ খানেক হল। অবশ্য তিনি জামাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে, তার সম্মতি নিয়েই মেয়ে আর নাতিকে নিয়ে গেছেন। অরুণের খারাপ লাগলেও সম্মতি না-দিয়ে উপায় ছিল না, কারণ রবিবার বা অন্য ছুটির দিনগুলোতে বাড়িতে থেকে ও নিজের চোখেই দেখেছে, একা-একা ছেলেকে সামলানো নয়নিকার পক্ষে দিন-দিন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

"তোমার শ্বশুরমশাই রিটায়ার্ড মানুষ, সারা দিন বাড়িতেই থাকেন। তা ছাড়া আমি আছি, বুবাই আছে, কাজের মেয়েগুলো

আছে। আর আমাদের বাড়িতে সারা দিন লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। শুনলাম, তুষকে ডাক্তাররা বেশি মানুষের মধ্যে রাখতে বলেছেন, মেলামেশা করাতে বলেছেন। ওখানে গেলে সেটা তো অন্তত হবে! তার পর দেখো, এতটা বড় হয়ে গেল, তুষের মুখে একটা কথাও ফুটল না। অথচ ছেলে তো বোবা না। আমি খেয়াল করে শুনেছি, নিজের মনে ও কী সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে, কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই চুপ করে যায়। আমাদের বাড়িতে এত লোক বকবক করে সব সময়, সেগুলো কানে শুনতে-শুনতে এক সময় দেখবে ঠিক মুখে বুলি ফুটছে।”

শাশুড়ির কথাগুলো যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ছিল, অরুণ অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু এখন ওর ভীষণ খারাপ লাগছে, ফাঁকা বাড়িতে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। এ ভাবে সারা জীবন একা-একা থাকাই কি তবে ভবিতব্য? মনের ভিতর থেকে প্রশ্ন উঠে আসছে বার বার।

## ১৬

ঝিলের চিকিৎসা-সংক্রান্ত ফাইল নিয়ে পর দিন একাই হাসপাতালে গেছিল জাগরী। অ্যাপ্লিকেশন সহ সব কাগজপত্র জমা করে দিয়ে জাগরী দেখা করতে গেল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। মোটামুটি কত দিন পরে ডাক আসবে, এটা জেনে নেওয়ার দরকার ছিল। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে পাওয়া গেল না। সুতরাং, এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত অন্য এক জন ডাক্তারের সঙ্গেই কথা বলতে হল জাগরীকে।

“আপনার আগে আরও সাতাশি জনের অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে। আমরা সিরিয়াল অনুযায়ী সবাইকে ডেকে পাঠাব। সেটা এক মাসও হতে পারে এক বছরও হতে পারে। যেমন-যেমন আমরা অ্যাবর্টেড ফিটাস পাব, সেই ভাবেই কাজ এগোবে। তবে আমাদের তো ছোট হাসপাতাল, পেশেন্ট তো খুব বেশি আসে না এখানে। তার পর আবার আমাদের দরকার ফিটাসের স্টেম সেল, অ্যাবরশন যদি এখানে না হয় তা হলে তো আর সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। যদি আপনি এমন পেশেন্ট নিয়ে আসতে পারেন যিনি এখানে অ্যাবরশন করাবেন, তা হলে আপনারটা হয়ে যাবে।”

ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী এই মহিলা ডাক্তারের কথা শুনে আশার আলো দেখতে পেল জাগরী। হোক না সাতাশি জনের পিছনে নাম, তবু তো একটা পথের সন্ধান পাওয়া গেল। এখন শুধু দরকার এমন এক জন হবু মা’র, যে তার সুস্থ-সবল ভ্রূণটিকে জন্ম দিতে চায় না। তেমন কারও সন্ধান পেলে, তাকে যে-কোনও মূল্যে জাগরী রাজি করাবে এই হাসপাতালে গর্ভপাত করানোর জন্য। কাজটা একটু কঠিন বটে, তবে অসাধ্য কিছু নয়। অন্তত ঝিলের সুস্থ হয়ে ওঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিরিখে তো কিছুই নয়!

হাসপাতাল থেকে জাগরী বেরিয়ে এল প্রায় উড়তে-উড়তে। বাইরে এসে পর পর তিনটে ফোন করল জাগরী। সুজয়, নিলয় আর নিজের মাকে সমস্ত কথা জানিয়ে মনের খুশি ভাগ করে নিল। এত দিন ধরে তো কেবল দুঃখ আর মনখারাপই ভাগ করেছে প্রিয়জনদের সঙ্গে। আজ আনন্দ-সংবাদ দিতে পেরে নিজের মনটা আরও খুশিতে ভরে উঠল।

“এখন আমার একটাই কাজ মা। দিন-রাত এক করে এক জন মহিলাকে খুঁজে বের করা, যে অ্যাবরশন করাতে চায়। আমার মনে হয় না এটা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে।”

“খুঁজে পেলেই তো শুধু হবে না। সে আবার ওই হাসপাতালে যেতে রাজি হবে কি না, সেটাও তো দেখতে হবে!”

“এটা তুমি ঠিক বলেছ। আসল সবাই তো কাজটা চুপচাপ সেরে ফেলতে চায়, এই জন্য নার্সিংহোমে যেতেই পছন্দ করে। ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানান দিয়ে হাসপাতালে যেতে রাজি হবে কি না কে জানে!”

“এমন মহিলা কলকাতায় পেতে তোর কিন্তু অসুবিধেই হবে। বরং আমাদের এ দিকে অনেক মহিলা আসে একটু গ্রামের দিক থেকে, তাদের যদি তুই নিজের খরচে নিয়ে যাস, অপারেশনের ব্যবস্থা করে দিস, তবে রাজি হতে পারে। আমি কি গাইনিদের চেম্বারে জানিয়ে রাখব? যাতে এ রকম রোগী এলে আমাদের জানায়?”

“তুমি ঠিকই বলেছ মা! আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিয়ো, যাতে এমন পেশেন্ট পার্টি এলে ডাক্তারবাবু আমাকে ফোন করেন। তবে সব ডাক্তারবাবু এত ঝামেলা পোহাতে রাজি না-ও হতে পারেন! তা ছাড়া পেশেন্ট হাতছাড়া করতেও চাইবেন না হয়তো। তুমি বরং ডাক্তার সেনকে গিয়ে বলো আপাতত। ঝিল তো ওঁর হাতেই হয়েছিল, সুতরাং উনি নিশ্চয়ই রাজি হবেন। আমি দু’-এক দিনের মধ্যে যাচ্ছি ওখানে, নিজে গিয়ে আর কয়েক জন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে রাজি করাতে চেষ্টা করব।”

মা’র ফোনটা রেখে নিলয়কে ফোন করল জাগরী। আজ যে এত খুশি ও, সে তো নিলয়ের কারণেই। গত পনেরো বছরের মধ্যে এত আনন্দ আর কখনও পায়নি ও।

“তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ আজ? এক বার দেখা করতে পারবে?”

“সে কী! মেঘ না চাইতেই জল!”

“আমি আজ ভীষণ-ভীষণ খুশি! এত খুশি যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। জানো, আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। তার পর আমার মেয়েটা নিজে-নিজে উঠে বসবে, দাঁড়াবে, হাঁটবে! আমি আর ভাবতে পারছি না নিলয়! জানো, এই পনেরো বছরে নিজের জন্য কোনও কিছু চাওয়ার কথা আমি একেবারে ভুলে গেছি। আমার খুশি, আনন্দ বলতে আলাদা করে আর কিছুই নেই। শুধু মেয়েটার একটু সুস্থতা,ব্যস।”

“ডেট পেয়ে গেছ নাকি?”

“তা পাইনি, তবে সেটা পাওয়া আমার হাতেই। আমি যদি এক জন প্রেগন্যান্ট মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি যিনি ওখানে অ্যাবরশন করাবেন, তা হলেই হয়ে যাবে। তাই এত আনন্দ হচ্ছে আমার!”

“তুমি খুশি হলে আমিও খুশি, জরি। বিকেলে আসছি, সব শুনব তখন।”

ফোন রেখে জাগরীও বাসে উঠে পড়ল। ফিরে ঝিলকে স্নান-খাওয়া করাতে হবে। আজ স্কুল ছুটি ওর। বাড়িতে আয়ামাসির কাছে ঝিলকে রেখে বেরিয়েছে জাগরী।

“আমার গয়নাগুলো সব বিক্রি করে দেব, দেখি তাতে কত পাই!” রাতে বিছানায় শুয়ে বলল বিন্দি।

শ্যামল কিছু বলল না, বিন্দির আকুলতা বুঝতে পারছিল ও।

“কী গো! কিছু বলছ না যে!” বিন্দি আলতো ঠেলা মারল শ্যামলকে।

“তোমার গয়না তুমি বিক্রি করবে, আমি আর কী বলব বলো!” দীর্ঘশ্বাসের ছেড়ে বলল শ্যামল। ওই শ্বাসের মধ্যে মিশে থাকা ওর অক্ষমতার হাহাকার বিন্দির কান এড়াল না।

“আমার গয়না আবার কী! সবটাই আমাদের। ছেলেটাও আমাদের, সমস্যাটাও আমাদের। তোমার মত না নিয়ে আমি কি আজ অবধি কোনও কিছু করেছি?”

বিন্দির কথায় শ্যামলের ভাবান্তর হল। বিন্দির দিকে ফিরে শুল ও।

“কিন্তু তাতেও কি কুলোবে? চিকিৎসার খরচ, দিল্লির মতো জায়গায় অতদিন থাকার খরচ!”

“সেটা আমিও ভেবেছি। সবার আগে আমাদের বাড়ির পুরনো স্যাকরার কাছে যাব ভাবছি। মোটামুটি কত কী পাওয়া যাবে একটা আন্দাজ তো পাব! তার পর অশোকদার সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে, কত খরচ হতে পারে! তা ছাড়া আমার আর একটা প্ল্যান আছে...”

“কী প্ল্যান?”

“বাবাকে কিছু দিতে বলব। ও বাড়িতে আমারও তো একটা ভাগ আছে, বাবার সম্পত্তিতে আমারও তো কিছু পাওনা হবে। অন্য সময় হলে আমি এ সব কথা তুলতাম না। চাইতামও না কিছু, কিন্তু এখন তো আমার অন্যরকম পরিস্থিতি।”

শ্যামল চুপ করে থাকল। শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা চাওয়ার ব্যাপারটা ওর পছন্দ নয়, তবে এ ছাড়া উপায়ও তো নেই আর। আজ যদি এ রকম একটা খবর পেয়েও ছেলেটার চিকিৎসা না-করাতে পারে, তবে সারা জীবন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে। বিন্দিও ক্ষমা করতে পারবে না ওকে।

“কী গো! কী ভাবছ?” বিন্দি আবার খোঁচাল শ্যামলকে।

“আমার একটা এলআইসি করা আছে। ভাবছি ওটা নিয়ে কাল এক বার ব্যাঙ্কে যাব। শুনেছি এলআইসি জমা রেখে লোন পাওয়া যায়, দেখি কত কী দেবে বলে!”

বিন্দির ভয় ছিল শ্যামল হয়তো এই ব্যাপারটাতে বেঁকে বসবে। টাকাপয়সার চিন্তা পুরুষমানুষের সব চাইতে বড় চিন্তা, জানে ও। এখন শ্যামলকে সদর্থক ভাবনা ভাবতে দেখে ভীষণ খুশি হল ও। শ্যামলকে জড়িয়ে ধরে বলল, “কাল তা হলে আমি বাড়ি যাই? তুমি সকালে উঠে আমার যাওয়ার ব্যাপারে তোমার মাকে রাজি করিয়ো, তবে এ সব কথা এখনই কিছু বোলো না। আমি তা হলে সকাল-সকালই চলে যাব রুপুকে নিয়ে।”

কুট্টিকে ফিজ়িয়োথেরাপি করানোর জন্য সুমিত আসে রোজ সন্ধেবেলা।

মিসেস দেব বলেছেন, “এই সব বাচ্চারা কিন্তু খুব আলসে হয়। ওদের যদি আতুপুতু করো, তবে ওদেরই ক্ষতি হবে। রোজ দু’বেলা থেরাপি কিন্তু মাস্ট।”

“আমি নয়তো ওর বাবা রোজ করাই ম্যাডাম,” মিনমিন করে বলেছিল মিতু।

“কী-কী করাও? রোলিং, সিটিং,স্ট্যান্ডিং...এইগুলো তো?”

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল মিতু।

“শুধু এতে চলবে না। স্ট্রেচিং করাতে হবে। রেগুলার স্ট্রেচিং না-করালে পেশির এক্সটেনশন হবে না। এ দিকে হাড় তো বাড়তেই থাকবে, ফলে দু’দিন পরে দেখবে হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে, বেঁকে যাচ্ছে।”

যে-সব স্ট্রেচিং করাতে হবে সেগুলো দেখিয়ে দিয়েছিল সেন্টারের ফিজ়িয়োথেরাপিস্ট। সব দেখেশুনে অশোকই বলল, “সব কিছু সবাইকে দিয়ে কী আর হয়! এই সব ব্যায়াম করাতে পেশাগত দক্ষতা দরকার।”

তার পর থেকে রোজ সুমিত আসে থেরাপি করাতে, মিসেস দেবই ঠিক করে দিয়েছেন।

সুমিত যত ক্ষণ ব্যায়াম করায়, ওই ঘরে কারও ঢোকা নিষিদ্ধ। কারণ বাবা-মাকে দেখলে কুট্টির কান্না বেড়ে যায়। বাইরে থেকেই মেয়ের কান্না শোনে মিতু আর ছটফট করে। সুমিত বলেছে, “প্রথম-প্রথম ক’দিন কাঁদবে ম্যাডাম। স্টিফনেস এসে গেছে তো, স্ট্রেচ করতে গেলে ব্যথা লাগে। কিছু দিন করানোর পর টাইটনেসটা কমবে, তখন আর কাঁদবে না।”

সেই ভরসায় মন শক্ত করে আছে মিতু। কিন্তু মেয়ের কান্নাকাটি কিছুতেই আর কমছে না। প্রথম-প্রথম স্ট্রেচিং করানোর সময় কাঁদত। এখন ব্যাপারটা বুঝে গেছে, তাই সুমিতকে দেখলেই কাঁদতে শুরু করে, মাকে শক্ত করে ধরে থাকে, কিছুতেই যেতে চায় না ওর কাছে। জোর করে হাত ছাড়িয়ে তবে পাঠাতে হয়। ইন্সটিটিউটে গিয়েও একই কাণ্ড করে। স্পিচ থেরাপি বা স্পেশ্যাল এডুকেশনের ক্লাসে যেতে কোনও ঝামেলা করে না, কিন্তু ফিজ়িয়োথেরাপির ঘরের বাইরে থেকেই কান্না জুড়ে দেয়। ওর ব্যাপারস্যাপার দেখে মিসেস দেব বলেছেন, “তোমার মেয়ে কিন্তু খুব চালাক। খাটুনির কাজ মোটে করতে চায় না। আর এরা বাবা-মা’র দুর্বলতার কথা খুব ভাল বোঝে। জানে কাঁদলেই বাবা-মা কষ্ট পাবে, সেই অ্যাডভানটেজটা নেয়। তোমাদের কিন্তু অনেক শক্ত হতে হবে, এ সব কান্নাকাটিকে পাত্তা দিলে চলবে না।”

মিসেস দেব প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই ধরনের বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছেন, তাঁর কথার যথেষ্টই গুরুত্ব আছে। মিতু তাই সেন্টারে গিয়েও ফিজ়িয়োথেরাপির ঘরে ঢোকে না। বাড়িতে যখন সুমিত আসে, ও কানে হেডসেট লাগিয়ে গান শোনে, যাতে কান্নার আওয়াজ না পাওয়া যায়। অশোকের আজকাল অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়, ও ফেরার আগেই সুমিত ব্যায়াম করিয়ে চলে যায়। ফলে, মেয়ের এই প্রতিদিনের ঝামেলা, কান্নাকাটি ওকে আর দেখতে শুনতে হয় না।

সেদিন সন্ধেবেলা মেয়েকে সুমিতের কাছে দিয়ে বারান্দায় বসে ছিল মিতু। আলো জ্বালায়নি, অন্ধকারেই বসেছিল। মাথায় নানা ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যার কোনওটার রং সাদা কোনওটা বা কালো। এত অল্পবয়সেই জীবনকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখতে শিখে গেছে মিতু। পরিস্থিতিই ওকে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে, আনন্দ বা দুঃখ কোনও কিছুতেই এখন আর খুব বেশি হেলদোল হয় না ওর।

আজ সন্ধ্যায় বসে-বসে মিতশ্রী ভাবছিল আগামী দিনগুলো কথা।

অশোক মোটামুটি দিল্লিতে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল, ওরা উত্তর দিয়েছে। অফিসে ছুটির আবেদন করেছিল, সেটাও মঞ্জুর হয়ে গেছে। সামনের মাসে যাওয়া। ট্রেনের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। আপাতত ওরা গিয়ে মেয়ের অ্যাসেসমেন্টটা করিয়ে ফিরে আসবে। তার পর খরচের খতিয়ান নিয়ে সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করে চিকিৎসার জন্য গিয়ে থাকবে। ওরা জানিয়েছে, যে সব মায়েরা একা বাচ্চাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসেন, তাঁদের থাকার জন্য ওদের ওখানে হোস্টেলেরও ব্যবস্থা আছে। এ বার গিয়ে ওরা হোস্টেলটাও দেখে আসবে, তেমন বুঝলে মেয়েকে নিয়ে হোস্টেলেই থাকবে মিতু, অশোক মাঝেমধ্যে যাবে। অশোকের পক্ষে টানা আটটা মাস ছুটি নেওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।

এই সবই ভাবছিল মিতু। একে তো মেয়েকে নিয়ে একা-একা অচেনা জায়গায় থাকা, তার পর আবার ওদের হোস্টেলে। নিশ্চয়ই ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে হবে, একার জন্য একটা ঘর কি আর পাওয়া যাবে! তার মানে নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবে কিছু অবাঙালি। মাসের পর মাস হোস্টেলের অবাঙালিদের খাবার খাওয়া, অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে হিন্দি বা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলা, সব কিছুতেই সমস্যা। তবু তো মানিয়ে নিয়েই ওখানে থাকতে হবে।

এই সব ছেঁদো সমস্যার কথা অশোককে কিছুই বলেনি মিতু। অশোক এখন আগামী দিনে মেয়ের সুস্থতার স্বপ্নে মশগুল, সেই স্বপ্নের সামনে এ সব ফালতু সমস্যা এনে দাঁড় করিয়ে দেবে, এমন বেরসিক মিতু নয়।

এটা ছাড়া আরও একটা কথা অশোককে বলেনি মিতু। কয়েক দিন আগে মাকে একটা চিঠি লিখেছে ও। অনেক বার ভেবেছিল ফোন করবে, শেষ অবধি আর পারেনি। নাম্বারগুলো স্পর্শ করেও রিং হওয়ার আগেই কেটে দিয়েছে। আসলে মাঝে এতগুলো বছর চলে গেছে, রাগ কিংবা অভিমানের দেওয়াল টপকে কোনও পক্ষই এগিয়ে আসেনি। ফলে দেওয়াল আরও উঁচু হয়েছে, এখন সেই দেওয়াল ভাঙা খুব একটা সহজ নয়।

মিতু অনেক বারই ভেবেছিল, ওরই নত হওয়া উচিত। গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত বাবা-মা’র কাছে। কিন্তু মিতুও তো ওই বাবারই তো মেয়ে, জেদে সে-ও কম নয়। মেয়ে হওয়ার পর অভিমান আরও বেড়ে গেছে মিতুর, এক শহরে বাস করে মা-বাবা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন নাতনির জন্মের কথা, তার অসুস্থতার কথা।

মেয়ের জন্য না-হোক, নাতনির জন্য তো অন্তত তাঁদের উচিত ছিল মেয়েকে ক্ষমা করা, এই দুঃসময়ে ওর পাশে দাঁড়ানো। অথচ তাঁরা তাঁদের মান আর জেদ নিয়েই বসে আছেন।

এ সব ভেবে আবারও রাগ হয়ে গেছে মিতুর, আর যাওয়াই হয়নি মা-বাবার কাছে। তার পর তো অশোকের সঙ্গে চলেই এল রানাঘাটে, যেন একেবারে পালিয়ে বাঁচল এখানে এসে।

কিন্তু এখন দিল্লিতে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর থেকে মনটা আবার নরম হয়ে গেছে। জেদ-টেদ সব উধাও। চলে যাওয়ার আগে তাই ঠিক করেছে ক্ষমা চেয়ে নেবে বাবা-মা'র কাছে। যদি তাঁরা ক্ষমা করেন, তবে যাওয়ার আগে এক বার দেখা করে আসবে। এত বছরের জমে থাকা তুষার গলানোর জন্য ফোনে কয়েকটা কথা বলা একেবারেই অকার্যকর। দু'-চারটে শব্দ দিয়ে মনের অবস্থা বোঝানো খুবই কঠিন, মিতু জানে সেই ক্ষমতা নেই ওর। কথা বলার আগেই আবেগ এসে গলা চেপে ধরবে। কান্না গিলে নেবে সাজিয়ে রাখা সব শব্দ। তাই চিঠি লেখা। চিঠিতে মন খুলে সব লিখেছে মিতু। উজাড় করে দিয়েছে এত দিন ধরে জমিয়ে রাখা তার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অভিমান।

আবছা অন্ধকারে বাড়ির সামনের রাস্তায় একটা রিকশা এসে থামল। যতই অন্ধকার হোক, রিকশা থেকে যাঁরা নামলেন তাঁদের চিনতে এতটুকু অসুবিধে হল না মিতুর। বুকের ভিতরে কাঁপন ধরল ওর, এক ছুটে চলে গেল বাইরের দরজায়।

মা'র সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসতে পেরে বেশ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে নয়নিকা। বাবা রিটায়ার করেছেন। তুষকে বেশ কিছুটা সময় বাবার তত্ত্বাবধানে রাখা যায়। আপাতত বাড়িতেই থাকছে তুষ। স্কুলে ভর্তি করার চেষ্টা চলছে। এখানে এসে তুষ সকাল-বিকেল দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়। অবশ্য প্রথম-প্রথম বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে নয়নিকার মা আপত্তি করেছিলেন।

"ও যা দামাল বাচ্চা, রাস্তায় যদি হাত ছেড়ে চলে যায় তুমি সামলাতে পারবে? শেষে একটা বিপদ-আপদ ঘটে গেলে?"

"আমি শক্ত করে হাত ধরে থাকব। দেখাই যাক না নিয়ে গিয়ে, একঘেয়ে বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে নাকি ওর! রাস্তায় দশ রকমের জিনিস দেখে মনটা বদলাবে। যদি তেমন বুঝি, আর যাব না।"

তবে রাস্তায় কোনওরকম ঝামেলাই করে না তুষ। বরং, বেড়ানোটা ওর নেশা হয়ে গেছে। সকালে উঠেই দাদুর কাছে চলে যায়, জানে এ বার দাদু নিয়ে বেরোবে। বিকেলেও তাই, রোদ পড়তে-না-পড়তেই নানা ভাবে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে জামা বদলে দেওয়ার কথা। তার পর সোজা চলে যায় জুতো রাখার তাকের কাছে। মানে, 'এ বার জুতো পরিয়ে দাও, আমি বেড়াতে যাব।'

সে দিন তো এক কাণ্ডই করে ফেলল। রাতে উঠে বিছানা ছেড়ে নেমে হাঁটা লাগাল দাদুর ঘরের দিকে। ঘড়িতে তখন সবে দেড়টা। তুষের জন্মের পর থেকে নয়নিকার ঘুমও পাতলা হয়ে গেছে, ছেলে জেগে গেলে ওরও ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেকে ধরে আনার জন্য পিছন-পিছন ও গেল।

প্যাসেজে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলে, সেই আলোতে নয়নিকা দেখল তুষ বাবার ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে।

বাবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে

কুট্টিকে কোলে নিয়ে বেশি ক্ষণ হাঁটা যায় না, আবার ওকে বাড়িতে রেখেও আসা যায় না। তাই কিছু ক্ষণ পর পর ওকে কোল থেকে নামিয়ে একটু করে জিরিয়ে নিচ্ছিল মিতু।

আটকানো ছিল, ঢুকতে না-পেরে তুষ চিৎকার জুড়ে দিল। এত রাতে চিৎকার করলে বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে যাবে! নয়নিকা জোর করে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চলে আসতে চাইল, কিন্তু পারলে তো!

হাত-পা ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে তুষ এক বার জুতো রাখার ক্যাবিনেটের কাছে যায়, এক বার দাদুর ঘরের বন্ধ দরজায়। তুষের জুতোর তাকের দিকে যাওয়া দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারল নয়নিকা। যে হেতু ওর ঘুম ভেঙে গেছে, ও ভাবছে দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

"এখনও সকাল হয়নি বেটা। এখন ঘুমোতে চল। সকাল হলে বেড়াতে যাবে।"

নয়নিকার এ সব কথা তুষ বুঝলে তো! কিছুতেই ওকে নিয়ে যেতে পারল না নয়নিকা। চেঁচামেচিতে তত ক্ষণে সবারই ঘুম ভেঙে গেছে। ওর বাবা উঠে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, "এ ভাবে জোর-জবরদস্তি করে হবে না। দেখি, ছাড় ওকে।"

এত ক্ষণ তুষ এক নাগাড়ে মুখ দিয়ে একটা বিজাতীয় শব্দ করে নিজের রাগ-বিরক্তি প্রকাশ করছিল। এখন দাদুকে দেখে একেবারে চুপ করে গেছে। বুঝে গেছে, যেটা ও চাইছিল সেটা হবে এ বারে।

"এসো দাদুভাই।"

তুষ চুপচাপ দাদুর কোলে উঠে পড়ল। নয়নিকার বাবা এগোলেন দরজার দিকে।

"এ কী! তুমি এত রাতে বেরোবে ওকে নিয়ে? ও না হয় কিছু বোঝে না, তাই বলে কি তোমারও বোধবুদ্ধি চলে গেছে?"

নয়নিকার মা রে-রে করে উঠলেন।

মা'র কথায় কোনও উত্তর না-দিয়ে কাঠের দরজাটার তালা খুললেন বাবা। তার পর কোলাপসিবলের তালা খুলে বেরোলেন নাতিকে কোলে নিয়ে। তত ক্ষণে নয়নিকার দাদাও উঠে এসেছে ঘুম ভেঙে। বাবার পিছনে-পিছনে সে-ও বাইরে গেল।

ছেলের জন্য গোটা বাড়ির সকলের ঘুম চৌপাট হতে দেখে খুব খারাপ লাগছিল নয়নিকার, অসহায় লাগছিল। এই তো সবে শুরু, কোথায় গিয়ে যে থামবে এর পর! ভাবতে-ভাবতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ও।

"দেখেছ দাদুভাই, চার দিকে কেমন অন্ধকার! রাস্তায় একটা লোকও নেই। এ রকম রাস্তায় কি আমরা বেড়াতে যাই? আমরা তো যাই যখন রাস্তায় অনেক গাড়ি থাকে, লোকজন থাকে, আলো থাকে তখন। চলো এখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম থেকে উঠে যখন আলো হবে তখন যাব। কেমন?"

তুষ কী বুঝল কে জানে! তবে আর আপত্তি করল না ঘরে ঢুকতে। এর পর সকলে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও তুষকে ঘুম পাড়াতে পারল না নয়নিকা। বিছানায় বসে, দাঁড়িয়ে-লাফিয়ে, ঘরময় হেঁটে বেড়িয়ে শেষটায় যখন ঘুমোল ও, তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে।

## ১৭

"মা! ওমা! ডাক্তারবাবু কী বলল?"

"ডাক্তারবাবু বলেছেন তোমাকে একটা ইঞ্জেকশন দেবেন, তা হলে আমার ঝিল মা হাঁটতে পারবে।"

"আমি কাঁদব না।"

"না, না। তুমি তো সাহসী বাচ্চা। তুমি কেন কাঁদবে! তুমি তো ইঞ্জেকশনে ভয়ই পাও না।"

"শুধু বাবা আমার হাতটা ধরে থাকবে।"

"হ্যাঁ সোনা! বাবা হাতটা ধরে থাকবে, আমি তোমার পাশে বসে থাকব। তোমার কোনও ভয় নেই। এ বার ঝটপট খেয়ে নাও। তোমার খাওয়া হলে আমি খাব, শিখাপিসি খাবে। আমাদের খিদে পেয়ে গেছে তো!"

"গাড়ি করে হাসপাতালে যাব।"

"হ্যাঁ সোনা। ডাক্তারবাবু ডেকে পাঠালেই আমরা গাড়ি করে হাসপাতালে চলে যাব।"

নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারে না বলেই হয়তো ঝিলের বেড়াতে যাওয়ার ভীষণ নেশা। সব সময়েই গাড়ি করে বাইরে ঘুরতে যেতে চায়। আজও মা বেরোবে শুনে সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছিল ঝিল। ওকে ভাল করে বুঝিয়ে, তবে বেরোনোর ব্যাপারে সম্মতি পেয়েছিল জাগরী।

"আমি হাসপাতালে যাব সোনা। ওখানে বাচ্চারা যায় না।"

"তুমি নামবে, আমি গাড়িতে বসে থাকব।"

"আমি তো বাসে যাব। আর ডাক্তারবাবু হাসপাতালের জানলা দিয়ে তোমাকে দেখতে পেলে খুব রেগে যাবেন, আমাকে বকবেন।"

"কী বলবে?"

"বলবে আপনি কেন বাচ্চাকে এনেছেন?"

"তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবে।"

"হ্যাঁ সোনা। আমি এক্ষুনি চলে আসব। তুমি শিখাপিসির সঙ্গে একটু গল্প করো।"

সারা দিন কথার পৃষ্ঠে কথা বসিয়ে বকবক করেই যায় ঝিল। একই কথা বার বার বলে, তবুও ধৈর্য ধরে সব কথারই জবাব দিতে হয় জাগরীকে। কী আর করবে বেচারা! নিজে-নিজে খেলাধুলো করতে পারে না, বইপড়া, ছবি আঁকা এ সব কিছুই পারে না। সারাটা দিন কাটাবে কী করে! স্কুল থাকলে তবু বেশ কিছুটা সময় ভালভাবে কেটে যায়, কিন্তু ছুটির দিনগুলো কাটানোই সমস্যা। তখন মা'র সঙ্গেই বকবক করতে থাকে। ওর জগৎটাই মাকে ঘিরে, তাই জাগরীকেও সহিষ্ণুতা বাড়িয়েই যেতে হয়।

মস্তিষ্কের কিছু কোষের মৃত্যু হওয়ার জন্য ঝিলের এই শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতা। জাগরী ভাবে, স্টেম সেল থেকে যখন নতুন স্নায়ুকোষ তৈরি হবে, তখন মানসিক প্রতিবন্ধকতাও কমে যাবে নিশ্চয়ই। শুধু নিজে থেকে উঠে বসা কিংবা হাঁটা নয়, চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতাও বাড়বে। তাতে যদি সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করার মতো বুদ্ধি যদি না-ও হয়, তবুও নিজের মতো করে বেঁচে থাকার একটা রাস্তা যদি ওকে খুঁজে দেওয়া যায়, তা হলেই আর খুশির সীমা থাকবে না ওর। বাবা-মা'র অবর্তমানে যাতে মেয়েটা কিছু নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে, সেটাই এখন এক মাত্র লক্ষ্য জাগরীর।

বিন্দির বাবার এখন আর তেমন একটা টাকার জোর নেই। আগে অবশ্য ভালই চলত ব্যবসা। ক্যাসেটের দোকান ছিল। সিডির যুগেও ভালই চলত। কিন্তু শেষ অবধি পুরো ব্যবসাটাই পড়ে গেল স্মার্টফোন এসে যাওয়ায়। ব্যবসা যখন পড়ে আসছিল তখনই তড়িঘড়ি করে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিয়েছিলেন আশুতোষবাবু, বেশি দেখাদেখি বা খোঁজখবর করেননি। মেয়ের বিয়েটা দিয়ে একটু হালকা হতে চেয়েছিলেন। মেয়ের পিঠে ছেলেও আছে একটা। সে তখন স্কুলে পড়ছে, তার ভবিষ্যৎও তো ভাবতে হবে। দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কিছু দিন পুঁজি ভেঙে খেয়েছিলেন। তার পর ওই ঘরেই মুদিখানার দোকান দিয়েছেন আশুবাবু।

এ সব কথা তো আর অজানা নয় বিন্দির, তাই নিজের বিয়ে নিয়ে বাবা-মাকে কখনও দোষারোপ করে না ও।

কিন্তু এখন তো বিন্দির উভয়সঙ্কট। টাকা না হলে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারবে না, আবার বাবার কাছে টাকা চাওয়াটাও দারুণ লজ্জা আর অস্বস্তির। সেদিন ঝোঁকের মাথায় শ্যামলকে বলে ফেলেছিল, বাবার কাছে টাকা চাইবে। কিন্তু বাড়িতে আসার পর সারাটা দিন পার হয়ে গেলেও এখনও মুখ ফুটে টাকার কথা বলে উঠতে পারেনি। অথচ যা কিছু করার তাড়াতাড়িই করতে হবে।

এ বাড়িতে এলে মা'র সঙ্গেই রুপুকে নিয়ে শোয় বিন্দি। বাবা আর ভাই অন্য ঘরে শোয়, এটাই একটা সুবিধে। সেদিন রাতে শুয়ে অনেক ইতস্তত করার পর মা'র কাছে মুখ খুলল বিন্দি।

"কাল এক বার উত্তমজ্যাঠার দোকানে যাব মা।"

"কী গড়াবি?"

"গড়াব না, বিক্রি করব। বিয়েতে যা পেয়েছি, সেগুলো সব বিক্রি করে দেব।"

"মানে?"

সারা দিনের পরিশ্রমের পর বালিশে মাথা ছোঁয়ালেই চোখ জড়িয়ে আসে বিন্দির মা'র। আজও এসেছিল। ঘুম চোখেই মেয়ের কথা শুনছিলেন। এখন মেয়ের মুখে গয়না বিক্রির মতো অলক্ষুনে কথা শুনে তাঁর ঘুমের ঘোর কেটে গেল, বিছানায় উঠে বসলেন তিনি।

"কী বলছিস কী তুই? এখনও পাঁচ বছর পুরল না তোর বিয়ে হয়েছে, নতুন গয়না সব, ওগুলো বেচে দিবি? কী বলছিস তুই? কী হয়েছে তোদের?"

মিতুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হওয়ার কথা, মিতুর মেয়ের কথা, মাকে আগেই বলেছিল বিন্দি। এখন দিল্লির এই চিকিৎসার কথা, তার খরচের কথা মাকে সবটা খুলে বলল ও।

"ছেলেটার চিকিৎসাই যদি না-করাতে পারি, তবে আমার গয়না থেকে কী লাভ হবে বল? আমার ছেলে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে আর আমি এক গা গয়না পরে ঘুরে বেড়াব, এটা তো আর হতে পারে না।"

"এক গা গয়না আছে নাকি তোর! যে ক'টা আছে, সেগুলো বেচে ক'টা টাকাই বা পাবি? তাতে চিকিৎসার খরচা, ওখানে থাকা-খাওয়ার খরচা সব হবে?"

"জানি না। কিন্তু না-জেনে, হাত গুটিয়ে বসেও তো থাকতে পারছি না। তোমার জামাই বলল, এলআইসি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার নেবে, দেখি কত পায়। আর আমিও দেখি উত্তমজ্যাঠা কত কী বলে।"

"শ্বশুর-শাশুড়ি জানে তোর এই গয়না বেচার প্ল্যান?"

"খেপেছ? ওদের কিছুই জানাইনি। জানলেই বাগড়া দেবে।"

"আজ না হোক কাল তো জানাতেই হবে। টাকা কোথায় পেলি ওরা জিজ্ঞেস করবে না?"

"বলব আমার বাবা দিয়েছে।"

একটু চুপ করল বিন্দি। বাবাকে টাকা দিতে বলার একটা সুযোগ তৈরি হয়ে গেছে, সেটা ব্যবহার করতেই হবে। অতএব চোখ কান বুজে বলেই ফেলল, "আমাদের গ্রামের জমিটা বিক্রি হয়েছে না, মা? বাবা যদি আমাকে কিছু দিতে পারত খুব ভাল হত। বেশি না, গয়না বিক্রি আর এলআইসি বন্ধক দেওয়ার পর আর যতটা দরকার!"

"কাল সকালে কথা বলব তোর বাবার সঙ্গে। জমি বিক্রির টাকাগুলো কী করেছে, আমাকে খুলে বলেনি কিছু।"

দু'দিন বাদে বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এল বিন্দি। মা বলছিলেন আর কয়েকটা দিন থেকে যেতে, ও রাজি হয়নি। এখানে বসে আরাম করলে চলবে না, অনেক কাজ পড়ে।

উত্তমজ্যাঠা পুরনো দিনের মানুষ, বিন্দিকে চেনেন সেই ছোট্টবেলা থেকে। ওর মা'র বিয়ের গয়নাও উনিই বানিয়েছেন। বিন্দির গয়না বিক্রির প্রস্তাব শুনে মানুষটা হতভম্ব। বলেছিলেন, "বলিস কী রে! এই তো সেদিন বানালাম কত যত্ন করে, এত সুন্দর ডিজ়াইন দিয়ে। ক'দিন আর গায়ে দিলি!"

"আমার উপায় নেই জ্যাঠা। তুমি তো সবই জানো, তোমার কাছে লুকোনোর কিছু নেই। তাই তো তোমার কাছে ছুটে এলাম। ছেলেটার চিকিৎসার জন্য আমার যে অনেক টাকা দরকার এখন।"

বিন্দির কথা শুনে চোখটা ছলছল করে

উঠল স্বর্ণকার মশাইয়ের। বললেন, "ঠিক আছে রে মা! আমি এগুলো কিনে নেব সব। তবে এখনই আমি এগুলোতে হাত দিচ্ছি না। তুই যদি টাকাটা জোগাড় করতে পারিস বছরখানেকের মধ্যে, তা হলে তোর জিনিস তুই ফিরিয়ে নিয়ে যাস।"

টাকার ব্যবস্থা হতেই বিন্দি ছুটল মিতুর কাছে। মিতুরা যে দু'দিন বাদে দিল্লিতে যাচ্ছে কুট্টিকে নিয়ে, সে কথা জানাই ছিল ওর।

"শ্যামল ও বেলা এসে অশোকদার সঙ্গে কথা বলবে। আমি শুধু তোকে জানাতে এলাম, তোরা যখন পরের বার ট্রিটমেন্ট করাতে যাবি, তখন আমরাও যাব, টাকার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। তখন একবারে অ্যাসেসমেন্ট করিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিতে বলব। এবারে গিয়ে তোরা সব জেনে নিয়ে, আমাদের কথাটাও জানিয়ে, ডেট নিয়ে আসবি। কেমন?"

মিতু আনন্দে জড়িয়ে ধরল বিন্দিকে। ওর বুক থেকে বিরাট একটা ভার নেমে গেল। তা হলে এখন ওরা দু'জনে মিলেই ঘর ভাড়া করে বাচ্চাদের নিয়ে থেকে যেতে পারবে। হোস্টেলে থাকারও দরকার নেই, বয়স্ক মা-বাবাকে টেনে হিঁচড়ে পাহারাদারি করানোর জন্য নিয়ে যাওয়ারও দরকার নেই। বরং দুই বন্ধু এক সঙ্গে থাকলে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাস করাটাও বেশ আনন্দদায়ক হবে।

## ১৮

ঝিলকে নিয়ে মা'র কাছে ক'দিন থাকবে বলে চলে এল জাগরী। এই ক'দিন ও ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথা বলবে, যদি কারও চেম্বারে গর্ভপাত করাতে চায় এ রকম কেউ আসে, সেই খবরটা পাওয়ার জন্য। জাগরী নিজে বুঝিয়ে বলবে তাদের, যদি কাউকে রাজি করানো যায় কলকাতায় গিয়ে করানোর জন্য। তাকে নিয়ে যাওয়া, আবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব খরচ জাগরীই দেবে।

ঝিলের ডেলিভারি এখানেই হয়েছিল। পূর্ণ সময়ের পরে সিজ়ারিয়ান সেকশন হয়েছিল। জাগরীরও কোনও গোলমাল ছিল না শরীরে, আর বয়সটাও অল্পই ছিল। তবুও ঝিলের কেন যে এমন হল! নার্সিংহোমের ডিসচার্জ সামারিতে লেখা ছিল সেপটিসেমিয়া হয়েছিল ওর। আর পরবর্তীতে যখন আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হল, তখন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ বললেন 'আফটার বার্থ ট্রমা' ছিল ওর। রক্ত বিষিয়ে যাওয়াই হোক কিংবা জন্মের পরে কোনও আঘাত— দুটোতেই নার্সিংহোমের এবং ডাক্তারবাবুর একটা দায় থেকেই যায়। জাগরী বা সুজয় যদিও ডাক্তার সেনের কাছে এ নিয়ে কোনও জবাবদিহি চাইতে যায়নি বা মামলা-মকদ্দমা-ক্ষতিপূরণের পথেও হাঁটেনি, কারণ ওদের সব মনোযোগটাই ছিল ঝিলের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে।

"এ সব করে কি আর মেয়েটা সুস্থ হবে! বরং টাকা আর সময়, নিজেদের শক্তি সবটারই অপব্যয় হবে।"

ওদের দু'জনেরই যুক্তি এটাই ছিল।

তবে ওরা কিছু বলুক বা না-ই বলুক, ডাক্তার সেন তো জানেন সেদিন কি ঘটেছিল অপারেশন থিয়েটারে, তাই ঝিলকে নিয়ে ওঁর চেম্বারে গেলে উনি বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, একটু বদলে যাওয়া আচরণ করেন, এটা খেয়াল করে দেখেছে জাগরী।

প্রত্যাশা মতো ডাক্তার সেনই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন জাগরীর আবেদন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন এমন কাউকে পেলে সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ডেকে পাঠাবেন জাগরীকে।

"তুই তা হলে কিছু দিন এখানে থেকে যা," মা'র প্রস্তাবটা জাগরীর পছন্দ হল। আপাতত মা'র কাছেই কিছু দিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। যদিও কলকাতার হাসপাতালগুলোতেও যোগাযোগ করছে নিলয়, তবু জাগরীর মন বলছে, ও এখান থেকেই পাবে সেই পরশপাথর, যার ছোঁয়ায় নতুন জীবন পাবে ঝিল।

জাগরীর অনুমান মিথ্যে হয়নি। দিন পনেরো বাদে ডাক্তার সেন ফোন করলেন, "এক জনকে পেয়েছি, আমি একটু ব্যাপারটা বলে বসিয়ে রেখেছি চেম্বারে। আপনি এখন আসতে পারবেন?"

"দশ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।"

মফস্সলের এই একটা সুবিধে। ছোট জায়গা। কোনও কিছুর জন্যই বেশি দূরে যেতে হয় না। দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই যে-কোনও দরকারি জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি কিছুরই পরোয়া নেই। রিকশা, সাইকেল বা পায়ে হাঁটাই হল নির্ভরযোগ্য বাহন। রিকশারও কোনও অভাব নেই, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেই হল। সেই ভরসাতেই ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে দশ মিনিট সময় চেয়ে নিল জাগরী।

রিকশাটা চলে গেল যাত্রী নামিয়ে। আলো-আঁধারিতে দেখা যাচ্ছিল দুটো ছায়ামানুষ গ্রিলের দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে, হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এটাই কি সেই ঠিকানা, যেখানে আসার কথা ছিল!

যতই অন্ধকার কেটে বানানো ভাস্কর্য হোক না কেন, ওই দাঁড়ানোর ভঙ্গি, ওই চেহারার চলন তো চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয় মিতশ্রীর। সামনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে গেল গ্রিলের দরজাটার দিকে।

দরজার কড়াটা খুলে, মাটিতে নামিয়ে রাখা ব্যাগটা তুলে নিল। তার পর অত্যন্ত সহজ গলায় বলল, "এসো।"

ওঁরাও এমন জড়তাহীন ভাবে এগোতে থাকলেন মেয়ের পিছু-পিছু, যেন গত সপ্তাহেই ঘুরে গেছেন এ বাড়ি থেকে।

কুট্টিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন ওর দিদিমা, আর দাদু নানা ভাবে নাতনির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছেন— অফিস থেকে ফিরে সেদিন এই ছবিই দেখেছিল অশোক।

শ্বশুর-শাশুড়ি যে এত দিনের রাগ-অভিমান বিসর্জন দিয়ে এই বাড়িতে চলে আসতে পারেন, এ ব্যাপারে সামান্যতম আভাসও দেয়নি মিতু। তাই অশোকের বিস্ময় অত্যন্ত স্বাভাবিক। অবশ্য মিতুকেও দোষ দেওয়া যায় না, ও কেবল মা-বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে অবশ্য এই বাড়ির ঠিকানাটাও দেওয়া ছিল প্রত্যুত্তরের আশায়। তবে সেই চিঠি পেয়ে মা-বাবা যে চলে আসবে, সেটা ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে অশোক কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তার পর পারিবারিক ছবির এই সুন্দর ফ্রেমটা নষ্ট না-করে সে-ও সামিল হয়ে গেল তাতে। পাঁচিলের দু'ধারে থাকা দুই প্রতিপক্ষ কেউ কারও প্রতি তর্জনী প্রদর্শন না-করে দিব্যি পার করে দিল পাঁচিল ভেঙে ফেলার অস্বস্তিকর সময়টুকু।

এটা খুবই জরুরি ছিল দুই পক্ষের জন্য। বাইরে যতই সহজ আর স্বচ্ছন্দ মনে হোক না কেন, ভিতরে তো বাঁধের দেওয়ালে ফাটল ধরা শুরু হয়ে গেছে দুই দিকেই। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে যাওয়ার আগে কিছুটা সময় তো দরকার সব কিছু গুছিয়ে তোলার জন্য।

রাতে বিছানায় অন্ধকারের আড়ালে বরফ গলল মা-মেয়ের।

"এত কিছু ঘটে গেল, মাকে জানাতে তোর এত সময় লাগল?"

"তোমরাও তো একটাও খোঁজ নাওনি। কত বিপদের মধ্যে দিয়ে গেলাম, এক বারও এলে না। নিজেদের জেদ নিয়ে বসে রইলে!"

"জেদাজেদি তো তোরা বাপ-মেয়ে করলি! আমি মাঝখানে শাঁখের করাত। আমি অনেক বার তোর বাবাকে বলেছিলাম, যা হয়ে গেছে, গেছে! অশোক তো ছেলে খারাপ নয়, চলো মেয়ে-জামাইকে ডেকে পাঠাই। কিন্তু তোর বাবার এক গোঁ, 'আমি কেন ডেকে আনব! ওরা অন্যায় করেছে, ওরা নিজে থেকে আসবে!' আমি আর কী করে মানুষটার অমতে যাই!"

"তাই বলে আমার এত বড় বিপদ জেনেও নিজেদের জেদ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলে তোমরা?"

"বিশ্বাস কর, আমরা এ সব কিছুই জানতাম না। তুই চলে যাওয়ার মাস ছয়েক বাদেই তোর বাবা ইচ্ছে করে ট্রান্সফার নিয়ে নিল। আসলে চেনাজানা জায়গায়, পরিচিত লোকজনের মধ্যে আর ও থাকতে চাইছিল না। এই কয়েক বছর তো আমরা কালিম্পংয়ে ছিলাম, তোর বাবা রিটায়ার করার পর ফিরলাম। তোর ছোটকাকা অবশ্য জানিয়েছিল মেয়ে হয়েছে তোদের, শুধু এইটুকুই। আসলে সেও ভয় পায় দাদাকে। তোদের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে যদি দাদা রেগে যায়, চেঁচামেচি করে, তাই তোদের প্রসঙ্গ তোলেই না।"

কথায়-কথায় রাত হাঁটতে থাকল ভোরের দিকে। এক সময় ক্লান্তির জয় হল। ঘুম দখল নিল মা-মেয়ের চেতনার।

## ১৯

ট্রেন ছিল বিকেল চারটে পঞ্চাশে। শিয়ালদা স্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস। এই প্রথম বার ওদের সকলেরই রাজধানীতে ভ্রমণ। তাই সবার উচ্ছ্বাসই চোখে পড়ার মতো। মিতু তাও ছোটবেলায় বেশ কয়েক বার বাইরে বেড়াতে গেছে কিন্তু বিন্দি বা শ্যামলের এই প্রথম দূরপাল্লায় বেড়ানো।

শুধু রাজধানী এক্সপ্রেসে চেপে বাইরে গিয়ে একঘেয়ে জীবনের রোজনামচা থেকে মুক্তির আনন্দই নয়, ওদের চার জনের সঙ্গে রয়েছে একটা বড় স্বপ্ন, যে-স্বপ্নকে ছোঁয়ার ইচ্ছেতে ওরা বাজিতে লাগিয়ে দিয়েছে সবটুকু সঞ্চিত এবং ধার করে আনা অর্থ। সন্তানেরা সুস্থ হয়ে উঠলে যে-দেনার বোঝা একদমই ভারী বলে বোধ হবে না।

এক জনের বয়স তিন আর অন্য জনের প্রায় চার। কুট্টি বসতে শিখেছে বটে, রুপু এখনও বসতে শেখেনি। কুট্টি মা'র পাশে বসে আর রুপুর মা বাচ্চাটাকে কোলের মধ্যে একটা গর্ত মতো করে বসিয়ে রেখেছে। কুট্টির চোখের পেশি খানিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে চোখদুটো ট্যারা দেখায় আর রুপু ঠিক মতো দেখতে পায় না বলে, ওর দৃষ্টি কখন কোনদিকে পড়ছে দেখে বোঝা যায় না। অনেকটা অন্ধ মানুষদের মতো। তার উপরে আবার বসিয়ে রাখার কারণে মুখ দিয়ে লালাও ঝরছে অনবরত, যাতে সেই লালায় জামা ভিজে না-যায়, তাই গলায় একটা লালাপোষ পরানো। ট্রেনের সহযাত্রীরা এমন বিজাতীয় বাচ্চা আগে দেখেনি হয়তো, তাই আসা-যাওয়ার পথে অপার কৌতূহল নিয়ে ওদের দেখে চলেছে।

তাতে অবশ্য ওদের ভ্রুক্ষেপ নেই, ওরা নিজেদের ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনাতেই ব্যস্ত।

"ভাব তো আট মাস বাদে যখন ফিরব, তখন ওরা এখানে খেলে বেড়াবে!" ঝলমলে মুখে বলল মিতু। বিন্দি তার আশার ডালপালা কিঞ্চিৎ ছেঁটে রেখেছে, তাই বলল, "আট মাসে যদি এত কিছু না-শেখে, যদি হাঁটতে না-ও পারে, দাঁড়াতে পারলেই
আমার চলবে।"

"ওরা বলেছে, প্রথমে অনেক বেশি চাপে অক্সিজেন পাঠাবে ব্রেনে। তাতে যে

কোষগুলোতে অক্সিজেন পৌঁছতে পারেনি, যেগুলো মরো-মরো অবস্থায় আছে, সেগুলো বেঁচে উঠবে। ব্রেনের কোষগুলো যদি বেঁচে ওঠে, তা হলে বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা শিখে যেতে আর কত ক্ষণ!"

অশোকের চোখ-মুখও আগামীর স্বপ্নে উজ্জ্বল।

"আচ্ছা দাদা!" শ্যামল মুখ খুলল এ বারে, "যদি ওই হাই প্রেশারের অক্সিজেন দিয়ে ব্রেনের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ওদের ইনস্টিটিউটে গিয়ে আবার ফিজ়িয়োথেরাপি, স্পিচথেরাপি এ সব কেন করাতে হবে? এ সব করানোর জন্যও তো ওরা অনেকগুলো টাকা নিচ্ছে!"

শ্যামল আর বিন্দি এই প্রথম বার যাচ্ছে, ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে যা-কিছু জেনেছে ওরা, সবটাই অশোকের কাছ থেকে। তাই কিছু বুঝে নিতে হলে অশোককেই বার বার জিজ্ঞেস করতে হয়।

"আসলে সবটাই তো গবেষণামূলক, কেউই সঠিক করে বলতে পারে না যে, এতেই সব সেরে যাবে। ওরা চাইছে হাই প্রেশারে অক্সিজেন পাঠিয়ে কোষগুলোতে নতুন করে প্রাণ জাগাতে। সেইসঙ্গে পুরনো কনসেপ্ট থেকেও সরছে না। থেরাপিগুলো চালিয়ে ওই জেগে ওঠা কোষগুলোকে তাদের যে সব কাজগুলো করার কথা, সেগুলো মনে করিয়ে দিতে চাইছে বলা যেতে পারে। ডাক্তারবাবু তো সেরকমই বোঝালেন। বললেন, এতেই ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।"

নতুন দিল্লির বাঙালিমহল্লা চিত্তরঞ্জন পার্ক বেশ বড়লোকদের জায়গা। তাই ওখানে বাড়িভাড়াও বেশি। তবে চিত্তরঞ্জন পার্কের কাছে ব্যবসায়ীদের মহল্লায় এক পঞ্জাবি পরিবারের তিন তলার ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেওয়া বেশ সুবিধেজনক হল। ভাড়া সাধ্যের মধ্যে আর এখান থেকে একটা অটোতে চেপেই ইনস্টিটিউটে যাওয়া যাবে। এটা খুবই জরুরি। কারণ মাস খানেকের মধ্যে অশোক আর শ্যামল ফিরে যাবে, তখন দুটো বাচ্চাকে নিয়ে যাতায়াত করতে হবে মিতু আর বিন্দিকে। দিল্লির মতো জায়গায় যদি বেশি বার যানবাহন বদলে ওদের চলাফেরা করতে হয়, তবে ভীষণ মুশকিল হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বাসে-টাসে বার বার ওঠা-নামা করা বেশ কষ্টকর। তার চাইতে একটা অটোতে যদি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয় সেটা অনেক স্বস্তিদায়ক।

যৌথজীবন শুরু করল মিতু আর বিন্দি। খুব সকালে উঠে বাচ্চাদের নিয়ে পৌঁছে যেতে হয় হাসপাতালে। দিল্লি শহরের বাইরে আগ্রা যাওয়ার রাস্তায় সেটা। সেখান থেকে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে আবার ইনস্টিটিউটে। মাঝের সময়টাতে রান্নাবান্না, বাড়ির অন্য কাজ, বাচ্চাদের যত্ন। কোনও কাজের লোক রাখেনি ওরা টাকা বাঁচানোর জন্য। দুই বন্ধুতে হাতে হাত মিলিয়ে সবটা সামলে নেয়। ফিরতে-ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যায়। তখন আবার বাজার করা, রাতের রান্না সেই সঙ্গে বাচ্চাদের একপ্রস্থ ফিজ়িয়োথেরাপি করানো। এত কিছু করতে হলেও ওরা কিন্তু বেশ খুশিতে দিন কাটাচ্ছিল, কারণ ওদের চোখের সামনে একটা স্বপ্ন ছিল।

এত তাড়াতাড়ি যে স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব হবে, ভাবতেই পারেনি জাগরী। ডাক্তার সেন যে-মহিলাটিকে বসিয়ে

বিপুলবাবুর পরামর্শটা পছন্দ হল অশোকের। প্রয়োজনীয় ঠিকানা, ফোন নাম্বার লিখে নিয়ে ওঁকে আর এক প্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল অশোক।

রেখেছিলেন, তিনি এবং তাঁর স্বামী সহজেই রাজি হয়ে গেলেন জাগরীর প্রস্তাবে। মহিলার পিঠোপিঠি দুটো ছেলে আছে। তাঁত বোনা এদের পারিবারিক ব্যবসা। কিন্তু এখন এই সব ছোট-ছোট তাঁতের কারবারিদের ভীষণ দুর্দিন। তাঁতে বোনা কাপড়ের বাজার খুব পড়ে গেছে। মহিলার স্বামী বড় মহাজনের ঘরে কাজ নিয়েছেন। এই অবস্থায় তৃতীয় বারের জন্য গর্ভবতী হয়ে পড়ে সন্তানটা না-রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

সরকারি হাসপাতালে গর্ভপাত করাতে যাওয়ার ঝামেলা অনেক, তাই বাধ্য হয়ে ডাক্তার সেনের কাছে এসেছেন, তা ছাড়া এই ডাক্তারবাবুর হাতেই ছেলেদুটো জন্মেছিল বলে একটা চেনা-পরিচয় হয়ে গেছে। কলকাতায় গিয়ে গর্ভপাত করাতে ওঁর কোনও আপত্তি নেই, যেহেতু আসা-যাওয়া সমেত আনুষঙ্গিক খরচ সবটাই জাগরী দেবে। বরং এখানে করাতে যে-খরচ হত, সেটা বেঁচে যাওয়াতে মহিলার স্বামীকে বেশ খুশিই মনে হল।

শান্তিপুর থেকে গাড়িতে কলকাতায় যেতে সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লেগেই যায়। দিনের ব্যস্ত সময়ে রাস্তায় এত ট্রাফিক থাকে যে, গাড়ি থামতে-থামতে চলে। ঝিলকে নিয়ে খুব সকালে বের হওয়া যায় না, ওকে তৈরি করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। মহিলা, তার স্বামী আর ঝিলকে নিয়ে জাগরীর হাসপাতালে পৌঁছতে-পৌঁছতে বেলা একটা বেজে গেল। জাগরীর মা বলেছিলেন, "মেয়েটাকে আজকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার? ও বরং আমার কাছে থাক। শুধু-শুধু বেচারার কষ্ট হবে। তুই তো ওদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবি, ঝিল সঙ্গে না-থাকলেই বরং তোর সুবিধে হবে।"

"তা হবে। কিন্তু যদি ওরা আগামী কালই ঝিলকে নিয়ে যেতে বলে, তখন? আমি সুজয়কে হাসপাতালে চলে আসতে বলে দিচ্ছি। দু'জনে থাকলে অসুবিধে হবে না।"

মাকে যে কথাটা জাগরী বলেনি সেটা হল, শুধু সুজয় নয়, নিলয়কেও সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে ও বলেছিল, "যদি সম্ভব হয়, হাসপাতালে এসো।"

নিলয়ের জন্যই তো এত বড় একটা স্বপ্ন সফল হতে চলেছে, ওর উপস্থিতি সেখানে না-থাকলে চলে!

সুজয়, নিলয় পৌঁছে গেছিল জাগরী পৌঁছনোর আগেই। ওদের গাড়িটা হাসপাতাল চত্বরে ঢুকতে দু'জনেই এগিয়ে এল। সুজয় বলল, "ঝিলের কাছে আমি থাকছি। নিলয় বরং তোমার সঙ্গে ভিতরে যাক। আফটার অল পুলিশ তো, সুবিধে।"

যে-ঘরে সমস্ত কাগজপত্র জমা করে গেছিল সেদিন, সেই ঘরেই গেল জাগরী। ভিতরে বেশ কয়েক জন ছিলেন বলে ওদের তিন জনকে বাইরে দাঁড়াতে বলে জাগরী একাই ঢুকল। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ছিলেন আজ, সঙ্গে ওঁর সহকারী সেই মহিলা ডাক্তারটিও ছিলেন।

"হ্যাঁ বলুন, আপনি কী বলবেন?"

মহিলা ডাক্তারটি অন্য এক জনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে জাগরীর দিকে মন দিলেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় অন্যদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনি এ দিকে ফিরেও তাকালেন না।

"ম্যাডাম, আপনি বলেছিলেন অ্যাবরশন করাতে চায় এমন পেশেন্টকে নিয়ে

আসতে। আমি নিয়ে এসেছি।”

“ও। তা এখানে কেন এসেছেন! ওঁকে গাইনি বিভাগের আউটডোরে নিয়ে যান। অ্যাডমিট করাতে হবে তো!”

“ওহ! আজকে হবে না অ্যাবরশন?”

“তা কী করে হবে? ওঁকে অ্যাডমিট করে সমস্ত টেস্ট করাতে হবে, তার পর তো!”

“তা হলে আমার মেয়েকে কবে আনতে হবে?”

“মানে?”

“ম্যাডাম আমি আমার মেয়ের স্টেম সেল থেরাপি করানোর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। আপনি বলেছিলেন যদি অ্যাবরশন কেস নিয়ে আসতে পারি, তবে আমার মেয়েরটা হয়ে যাবে। সেইজন্যই...”

“আমি বলেছি এই কথা?” জাগরীকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে বলে উঠলেন ম্যাডাম, “আমি এই কথা আপনাকে বলতেই পারি না। আমাদের এখানে সিস্টেম বলে একটা জিনিস আছে! আমরা সবাইকেই পেশেন্ট পাঠানোর কথা বলি, যাতে কাজটাতে একটা গতি থাকে। তার মানে এই নয়, যে পেশেন্ট পাঠাবে তার কেসটা আগে হয়ে যাবে। সিরিয়াল অনুযায়ী সবাই ডাক পাবে। আপনি পেশেন্ট এনেছেন, খুব ভাল কথা। এখন তাকে অ্যাডমিট করে চলে যান। ওই ফিটাসের স্টেম সেল সেই পেশেন্ট পাবে, সিরিয়াল অনুযায়ী যার এখন পাওয়ার কথা।”

জাগরী বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এতটা ভুল সে শুনেছিল। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করাও যায় না, পাছে রেগে গিয়ে ঝিলের নামটাই ওরা বাদ দিয়ে দেয়। ডাক্তার মহিলাটির এমন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে মিথ্যা কথা বলাটাও হজম করতে পারছিল না জাগরী। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তো ছিলই। সব মিলিয়ে ওই ঘর থেকে বের হয়ে এল যখন জাগরী, সে তখন সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ, মুখচোখে প্রিয়জনের শবানুগমনের রিক্ততা।

“কী হয়েছে, জরি?” ওকে এ রকম চেহারায় কখনও দেখেনি আগে নিলয়, চমকে উঠল সে-ও।

জাগরীর মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছিল, পায়ের তলার মাটি কেমন যেন ঝুরঝুরে হয়ে সরে-সরে যাচ্ছিল, আর সে ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছিল সেই মাটির ভিতরে। ওর মনে হচ্ছিল চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার অনুভূতি বোধ হয় এমনই হয়।

সেই মুহূর্তে নিলয় জাপটে ধরে না-ফেললে জাগরী সত্যিই পড়ে যেত আর পাথরের শক্ত মেঝেতে ঠুকে গিয়ে মাথাটা ফেটে যেতেও পারত। কারণ বিশ্বাস এবং স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে তত ক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল জাগরী।

## ২০

দেশের নানা প্রান্ত থেকে বাবা-মায়েরা এসেছেন এই ইনস্টিটিউটে তাঁদের সন্তানদের নিয়ে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসেছে বিভিন্ন বয়সের বাচ্চারা। একদম মাস খানেক বয়সের শিশুও যেমন আছে, তেমন বারো-চোদ্দো বছর বয়সিরাও আছে। কেউ-কেউ আবার এসেছেন দ্বিতীয় বারের জন্য, প্রথম বার ট্রিটমেন্ট করিয়ে ভাল ফল পেয়েছেন বলে। যদিও নানা প্রদেশের মানুষ আছেন, তবে পঞ্জাবিদের সংখ্যাটাই যেন একটু বেশি বলে মনে হল ওদের। এদের কেউ আছেন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে, কেউ বা ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা করে দেওয়া গেস্ট হাউসে।

“এখানে না এলে জানতেই পারতাম না, সমস্যাটা কত মারাত্মক!” বিন্দি বলল।

“তবুও তো দেখ আমরা দু’জন এক সঙ্গে আছি। কত জন মা সম্পূর্ণ একা আছে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে!”

সন্ধেবেলা নতুন সংসারের কাজ করতে-করতে আলোচনা করে দুই বন্ধু মিলে।

“অভিনবের মায়ের অবস্থাটা ভাব এক বার। ওর বর ইউএসএ-তে থাকে, দরকার হলেও হুট করে আসতে পারবে না। একদম একা মেয়েটা।”

মাস খানেকের মধ্যে ওই ব্যাচে চিকিৎসা করাতে আসা সবার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছিল ওদের। ভাষা কোনও ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়নি। আসলে বাচ্চাদের নিয়ে এখানে চিকিৎসা করাতে আসা সব মা-বাবার তো একটাই ভাষা, বেদনার ভাষা। সে ভাষায় আদান-প্রদান যখন হয়, তখন সব কথা আপনিই পৌঁছে যায় বুকের দরজায়, কষ্ট করে আর কিছু বোঝাতে হয় না। এই ভাষার মাধ্যমে যারা অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারা হয়ে যায় পরস্পরের আত্মীয়। বিন্দি আর মিতুর ক্ষেত্রেও তাই হল। পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ কিংবা কর্নাটক থেকে আসা মানুষগুলো কয়েক দিনের মধ্যে হয়ে গেল পরস্পরের কাছের মানুষ।

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কুট্টি। বিন্দি আর মিতু তখনও বিছানায় যায়নি। বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে পরের দিনের কাজ খানিকটা এগিয়ে রাখছিল। এঁটো বাসনকোসন ওরা রাতেই মেজে রাখে। দিল্লির হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় ভোরবেলা কম্বল ছেড়ে উঠতে পারে না। এখন আর অক্সিজেন থেরাপি চলছে না। বারোটার সময় ইনস্টিটিউটে যাওয়া, তাই একটু বেলায় উঠলে অসুবিধে হয় না।

ধুপ করে একটা কিছু পড়ার শব্দ শুনে বাচ্চাদের ঘরে দৌড়ে গেল বিন্দি। ছুটে গিয়ে দেখল রুপু মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে।

“মিতু শিগগির এখানে আয়,” একটা হাঁক ছেড়ে ছেলেকে মেঝে থেকে তুলল বিন্দি। উঁচু চৌকি থেকে মেঝেতে পড়ে যাওয়ায় রূপের বেশ ভালই লেগেছে, কপালের মাঝখানটা দেখতে-দেখতে ফুলে উঠল।

জলপট্টি লাগিয়ে, ব্যথা কমানোর ওষুধ খাইয়ে ছেলেকে শান্ত করল বিন্দি। রুপুর অতটা লেগেছে দেখে বিন্দি খুব কষ্ট পাচ্ছিল, “আহা”, “ইস” করে যাচ্ছিল। মিতু হাসতে-হাসতে ওকে বলল, “তুই এত দুঃখ পাস না। আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি।”

“মানে?” অবাক হয়ে গেল বিন্দি, “খেপে গেলি নাকি তুই?”

“খুশি হব না! ভেবে দেখ, রুপু শুয়েছিল ওই কোণে। ওকে বিছানা থেকে পড়ে যেতে বার দুয়েক পাল্টি মেরে এই ধারে আসতে হয়েছে। ও সেটা নিজে-নিজে করেছে, তা-ও আবার ঘুমের মধ্যে। মুভমেন্টের এটাই সবে তো শুরু!”

মিতুর ব্যাখ্যা শুনে বিন্দিও খুশি হল খুব, “ঠিক তো! ব্যথা পেয়েছে সেরে যাবে, কিন্তু একটা মাইলস্টোন তো পেরোতে পেরেছে!”

মাইলস্টোন রুপু আরও একটা পার করে ফেলেছে এর মধ্যে। এখানে আসার আগে পর্যন্ত ও ঘাড় সোজা করে রাখতে পারত না। এমনিতে এই বাচ্চাদের একটা প্রবণতা থাকে মাথা নিচু করে রাখার, তবে রুপুর ব্যাপারটা সেটা নয়। ও ঘাড় তুলে রাখতেই পারত না, যেটা অন্য বাচ্চারা তিন মাসে শিখে যায়। ঘাড় শক্ত না-হলে বাকি মাইলস্টোনগুলোতে পৌঁছনোর কথা ভাবাই যায় না। সবটাই তো পর পর আসে। উচ্চচাপের অক্সিজেনের গুণেই হোক বা কড়া থেরাপির জন্যই হোক, মাস দুয়েক বাদে ঘাড় শক্ত হয়েছে ওর। এখন উপুড় করে শুইয়ে রাখলে মাথা উঁচু করে দেখে। রাস্তায় বেরোলে মা’র কাঁধে মাথা রেখে চলে না, বরং এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে দেখে। ইনস্টিটিউটের ডাক্তারবাবু বলেছেন, ঘাড় তুলতে পারলে চোখে দেখার ব্যাপারটাও ভাল হবে। এ সব ব্যাপার-স্যাপার দেখে মিতু হাসতে-হাসতে বলছিল বিন্দিকে, “শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা যে এত কঠিন, আমাদের বাচ্চাগুলোকে না-দেখলে কোনওদিন জানতেই পারতাম

না বল!”

“ঠিক বলেছিস! এটা তো এমনি-এমনি হয় বলেই কোনওদিন কেউ খেয়ালই করে না। এর পিছনে যে এত কলকাঠি আছে কে জানত!”

খুশি হওয়ার মতো খবর আরও কিছু আছে। দুটো বাচ্চার মুখেই একটা-দুটো করে বুলি ফুটছে কিছু দিন হল। আগে তো কান্না ছাড়া ওদের মুখে কোনও ভাষাই ছিল না। এখন ‘মা’, ‘বাবা’, ‘আয়’ এ সব বের হয়ে আসছে মাঝেমধ্যেই।

“যদি আমরা আট মাসের বদলে বাকি জীবনটা দিল্লিতেই থেকে যেতে পারতাম, তা হলে বেশ ভাল হত। এ রকম এক সঙ্গেই থাকতাম আমরা। খরচও কম হত, মনেও আনন্দ থাকত। আর আমাদের বাচ্চাগুলোরও
উন্নতি হত।”

এইসব স্বপ্ন আকাশকুসুম জেনেও মাঝেমাঝেই ওদের দু’জনের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই ভাবনাটাই।

শেষ পর্যন্ত তুষকে কলকাতার একটা নামকরা স্কুলে ভর্তি করাতে পারল নয়নিকা। বিশেষ বাচ্চাদের এই স্কুলটা মানসিক ভাবে পিছিয়ে থাকা শিশু আর অটিস্টিক বাচ্চাদের নিয়েই কাজ করে। এরা ছাত্রছাত্রীদের নানা দিকেই পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করে। ড্রইং করা, তবলা সহ নানা রকম বাজনা বাজানো এই সবের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বাচ্চাদের জীবনমুখী শিক্ষা দেওয়ার কাজে এই স্কুলের বেশ নামডাক আছে। যদি কিছু একটা শেখার প্রতি ভালবাসা জন্মায় ছেলেটার, যদি প্রথাগত পড়াশোনা না-ও হয়, তবুও তো কিছু একটা নিয়ে থাকতে পারবে তুষ। এটা ভেবে ভাল লাগছিল নয়নিকার। তুষের তো নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করে দেওয়া দরকার, যেটা নিয়ে ছেলেটা বাকি জীবনটা কাটাতে পারবে!

নয়নিকা পড়াশোনা করে জেনেছে, অটিস্টিক বাচ্চাদের অঙ্ক কষা, বাজনা বাজানোর ব্যাপারে প্রতিভা থাকে। ঠিকঠাক পদ্ধতিতে শেখাতে পারলে এরা পড়াশোনাতেও তাক লাগানো ফল করে। এরা নাকি খুবই মেধাবী হয়! সেই ‘ঠিকঠাক’ এগোনোর জন্যই তো এত সব চেষ্টা করে চলেছে নয়নিকা, বাকিটা ভবিষ্যতের হাতে।

তবে ভর্তি করা হয়ে গেলেও এখনই ওকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ওদের বাড়ি থেকে প্রতি দিন তুষকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া-আসা করা একেবারেই অসম্ভব। স্কুলের কাছাকাছি একটা ঘর ভাড়া করে ছেলেকে নিয়ে সেখানে থাকতে হবে নয়নিকাকে। স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে তাই কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছে ও।

প্রিন্সিপাল ভদ্রমহিলা বেশ সহানুভূতিশীল, হয়তো ভুক্তভোগী বলেই। উনি নয়নিকাকে প্রস্তাব দিয়েছেন, ঘরে বসে না-থেকে স্পেশ্যাল চাইল্ডদের এডুকেশনের কোর্স করে নিতে। তা হলে ওই স্কুলেই হয়তো বাচ্চাদের পড়ানোর চাকরি পেয়ে যেতে পারে নয়নিকা, সেই চেষ্টা উনি করবেন বলেছেন।

“কোথাও না-কোথাও আপনি কাজ পেয়েই যাবেন, স্পেশ্যাল এডুকেটরদের ভাল ডিম্যান্ড আছে। একেবারে বসে থাকার চেয়ে কিছু তো রোজগার করতে পারবেন,” একেবারে সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম।

নয়নিকাও সহমত। তুষকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পর অনেকটা সময় থাকবে ওর হাতে। তা ছাড়া চাকরি একটা সত্যিই দরকার। কলকাতার মতো জায়গায় আলাদা করে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হলে খরচ এক লাফে অনেকটা বেড়ে যাবে। আর তুষের স্কুলের টিউশন ফিটাও বড্ড বেশি, প্রাইভেট স্কুল তো!

অরুণের সঙ্গে সবটা নিয়েই আলোচনা করতে হবে।

স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা যখন ফোনে অরুণকে জানিয়েছিল নয়নিকা, তখন ও নিষেধ করেনি। কিন্তু সেটা অরুণ মন থেকে রাজি হয়েছে, নাকি বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে, সেটা নয়নিকা বুঝতে পারেনি। তবে যা-ই হোক, এখন আর পিছিয়ে আসার কোনও ভাবনাই নেই নয়নিকার। প্রতি মাসে খরচের অঙ্কটা জেনে অরুণ যদি গাঁইগুঁই করে, তবে নয়নিকাকেই ব্যবস্থা করতে হবে, যে করেই হোক। পুরনো অফিসে গিয়ে এর মধ্যে এক দিন কথা বলে আসবে। যদি আবার ফেরা যায়, তা হলে দেরি না-করে কাজ শুরু করে দেবে। মনে-মনে সব রকম রাস্তার কথাই ভেবে রেখেছে নয়নিকা।

## ২১

দরজা খুলে অরুণকে দেখে চমকে উঠল নয়নিকা। ফোনে কথা হয় প্রতি দিন, অথচ এক বারের জন্যেও সে জানায়নি এখানে আসার কথা।

“তুমি?”

“কেন খুশি হওনি?”

“সেটা বুঝে ওঠার সময় পেলাম কোথায়! তুমি কিছু না-জানিয়ে চলে এলে যে? কোনওরকম সমস্যা হয়েছে নাকি?” উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল নয়নিকা।

ওর মাথায় আগে যেটা এসেছিল, সেটা হল শ্বশুরবাড়িতে কারও কিছু হল কি না। কিন্তু তা হলে,অরুণের তো সেখানেই সরাসরি যাওয়ার কথা। এখানে কেন এল! আর আচমকা বউকে সারপ্রাইজ় দিতে চলে আসবে, এমন রোমান্টিক তো অরুণ নয়! তবে কী এমন হল?

“আরে আগে ভিতরে তো ঢুকতে দাও! বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে জেরা চালিয়ে যাবে নাকি!”

অপ্রস্তুত নয়নিকা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

জামাইয়ের গলা পেয়ে তত ক্ষণে নয়নিকার মা-ও বেরিয়ে এসেছেন, তিনিও মেয়েকে এবার ধমকালেন।

“এখানে আসতে হলে কি ওকে খবর দিয়ে আসতে হবে নাকি! নিজের বাড়ি, যখন খুশি আসবে। এতটা পথ এসেছে, আগে ফ্রেশ হয়ে চা-জলখাবার খাক! তার পর তোর ‘কী-কেন-কবে-কোথায়’ প্রশ্নমালা খুলে বসিস।”

নয়নিকা আর ঘাঁটায়নি। ধৈর্য রাখার পাঠে ও তুখোড় হয়ে গেছে মা হওয়ার পর থেকেই। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে সকলের সামনে কথাটা পাড়ল অরুণ।

“আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি!”

প্রত্যেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। নয়নিকার বাবার হাতের ভাত মুখে পৌঁছনোর আগেই থমকে গেল। মা’র হাতের হাতা ডালের বাটিতে আটকে গেল। তবে অন্যের ভাবনাকে মর্যাদা দেওয়ার অভ্যাস যেহেতু ওঁদের পরিবারে আছে, তাই কেউ কোনওরকম প্রশ্ন করলেন না। শুধু নয়নিকার দাদার মুখ ছিটকে বেরিয়ে গেল ‘সে কী!’ শব্দটা। আসলে এই বাজারে একটা চাকরি জোটানো কতটা কঠিন, সেটা ও হাড়ে-হাড়ে জানে বলেই বিস্ময়টাকে আর চাপতে পারল না। কথাটা শুনে নয়নিকার মাথায় বাজ পড়ল। অরুণ চাকরি ছেড়ে দিলে, তুষের জন্য যে-পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেটা টাকার অভাবে আর বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় বুঝেও সে চুপ করেই থাকল। কারণ অরুণের কথাটা আগে পুরোটা শোনাই যুক্তিসঙ্গত, এটাই মনে হচ্ছিল ওর।

সকলের হতভম্ব মুখগুলোতে এক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শ্বশুরমশাইকেই উদ্দেশ্য করে অরুণ বলল, “এই কয়েকটা মাসে আমি একটা জিনিস ফিল করলাম, জানেন! মুম্বাইতে আমি একা পড়ে থাকলে, টাকাটা রোজগার করতে পারব ঠিকই, কিন্তু সেটা কি একটা জীবন! এখানে নয়ন একা হাতে তুষকে সামলাবে, আর আমি কেবল টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েই আমার কর্তব্য করব, সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আপাতত কয়েকটা মাস একটু কষ্ট হবে, তার পর এখানে একটা কাজ আমি অবশ্যই পেয়ে

যাব, যদি না পাই ফ্রি-ল্যান্সিং করব, তবু আমার পরিবারের সঙ্গে তো থাকতে পারব। ছেলের দায়িত্ব আমিও কিছুটা নিলে নয়ন একটু ফ্রি হতে পারবে। আমি বুঝতে পারছি একটা অটিস্টিক বাচ্চার দেখাশোনা করার জন্য বাবা-মা দু'জনকেই প্রয়োজন। এখন আপনারা বলুন, আমি কি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি?"

"সাবাস! তুমি একদম ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। এই ক'দিন ধরে দাদুভাইকে দেখাশোনা করে আমি সমস্যাটা বুঝতে পারছি। আমি তো তাই চিন্তায় পড়ে গেছিলাম, মেয়েটা দাদুভাইকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে একা থাকবে কী করে! আমি না হয় রিটায়ার্ড মানুষ, এখন ওদের সঙ্গে কিছু দিন গিয়ে থাকলাম। কিন্তু এটা তো আর পার্মানেন্ট ব্যবস্থা হতে পারে না! এখন তোমার কথা শুনে আমি চিন্তামুক্ত হলাম," জামাইয়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন শ্বশুরমশাই।

নয়নিকার মা'র অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তিনিও খুব খুশি। মাত্র ক'বছর বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে মেয়ে-জামাই আলাদা থাকছে, এটা মন থেকে মেনে নিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। অথচ কিছুই করার নেই, জামাইয়ের বদলির চাকরি নয় যে এদিকে চলে আসবে। আর একলা ঘরে নাতিকে নিয়ে মেয়েটার কষ্ট নিজের চোখে দেখে, ওকে সঙ্গে না নিয়ে এসেও তিনি পারেননি। এখন এই ব্যবস্থায় শ্যাম আর কুল দুটোই রক্ষা হল বলে তাঁরও শান্তি। জামাইকে তাই তিনিও জোর গলায় সমর্থন জানালেন।

এক মাত্র নয়নিকাই কিছু বলল না। অরুণের এই সিদ্ধান্ত ওকে নতুন করে মানুষটাকে চেনাল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দুটোই এক সঙ্গে বেড়ে গিয়ে নয়নিকাকে এতটাই আবেগতাড়িত করে তুলল যে, ওর মতো ঘোর বাস্তববাদী মেয়েরও চোখ ভিজে গেল।

"একই চিকিৎসা দেওয়ার পরেও সব বাচ্চার প্রগ্রেস সমান হয় না। কেন যে হয় না, সেটা আমরাও জানি না। কার ব্রেন কতটা নিতে পারে, কী ভাবে নিতে পারে, এটা আমাদের কাছে এখনও অজানা। আসলে যেখানে যা ট্রিটমেন্ট চলছে, সেগুলো পুরোটাই পরীক্ষামূলক। আমরা শুধু সব রকমভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি।"

আট মাসের ট্রিটমেন্টের পুরো কোর্সটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে বাচ্চাদুটোর অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছিল। সেই রিপোর্ট হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তারবাবু রুপু আর কুট্টির বাবা-মায়েদের কথাগুলো বলেছিলেন। রিপোর্টে পাশাপাশি দুটো কলামে লেখা ছিল রুপু আর কুট্টির এখানে আসার সময়কার এবং এখান থেকে যাওয়ার সময়কার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা। তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে, ওরা কী অবস্থায় এসেছিল আর কী নিয়ে ফিরছে।

দু'জনের কেউই হাঁটতে শেখেনি, এমনকি রুপু উঠে বসতেও পারছে না নিজে থেকে। রুপু শুধু ঘাড় তুলতে পারে আর সাপোর্ট পেলে বসতে পারে। কুট্টি আগে থেকেই বসতে পারত, এখন সাপোর্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কিছু ক্ষণ, ব্যস এই পর্যন্তই। এ নিয়ে অবশ্য কোনও নালিশ নেই ওদের, কারণ ডাক্তারবাবুর কথা যে সত্যি, সেটা ওরা নিজেদের চোখেই দেখেছে। ওদের চেষ্টায় সত্যিই কোনও ফাঁকি ছিল না।

"চেষ্টায় তো কোনও ত্রুটি রাখিনি আমরাও!" নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দেয় মিতশ্রী কিংবা বিন্দি, কখনও-সখনও যখন দু'জনের দেখা হয়ে যায় মিসেস দেবের স্কুলে।

কুট্টি এখন আয়ামাসির সঙ্গে মাস মাইনে করা রিক্সায় চেপে 'দেবভূমি'তে যায়। দিনের বেলাটা আয়ামাসির কাছেই তো থাকতে হয় ওকে। মিতশ্রী একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছে, অশোকই জোর করে ওকে পরীক্ষায় বসিয়েছিল। ঘরে দিনরাত থেকে আর মেয়েকে নিয়ে ভেবে-ভেবে মিতশ্রী মানসিক অবসাদে ভুগছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাকরি পাওয়াটা ওর জন্য অত্যন্ত দরকারি হয়ে পড়েছিল।

রুপু অবশ্য এখনও ওর মা'র সঙ্গেই মিসেস দেব এর স্কুলে যায়, তবে সঙ্গে ওর ছোট ভাইটাও যায়। ভাইটার এখন বছর দেড়েক বয়স, পরিবারের চাপের কাছে শেষ পর্যন্ত মাথা নামাতে হয়েছে বিন্দিকে। শ্যামলও বলেছিল, "রুপুকে ভবিষ্যতে দেখাশোনা করার জন্যও তো কাউকে চাই, আমাদের অবর্তমানে ওর কী হবে সেটা এক বার অন্তত ভাবো!"

ভাবার মতো কথাই বটে, বিন্দিকেও তাই ভাবতে হল। তবে ছোটটার জন্মের আগের আর পরের সময় মিলিয়ে মোট দুটো বছর রুপুকে আর সেন্টারে নিয়ে আসতে পারেনি বিন্দি। বাড়িতে নিজেও ফিজিয়োথেরাপি করাতে পারেনি, ডাক্তারের নিষেধ ছিল। এই দু'বছর ধরে থেরাপি বন্ধ থাকায় ছেলেটার হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে অনেকটাই, বেঁকেও গেছে খানিকটা। বিন্দি কী আর করবে! বাকি জীবনটা যে-ভাই রুপুর দায়িত্ব নেবে, তাকে পৃথিবীতে আনার জন্য দুটো বছর তো ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে রুপুকে।

টালিগঞ্জে, ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দায় বিকেলের দিকে ঝিলকে নিয়ে বসে থাকে জাগরী আর সুজয়। নিলয়ও এসে বসে মাঝে-মাঝে। জাগরীর মেয়ে বলে নয়, ঝিলের প্রতি একটা আলাদা টান বোধ করে নিলয়, সেই টানেই আসে ও বার বার। মেয়েটার একটা অদ্ভুত মায়া আছে, ওকে ভাল না বেসে থাকাই যায় না।

জাগরীকে নিলয় একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়েছিল, যার ডানায় ভর করে ও আকাশের অনেকটা উঁচুতে উড়ে গেছিল। সেই উচ্চতা থেকে পতনের আঘাতে জাগরীর মনটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভ্রূণের স্টেম কোষ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ঝিলের পালা আসার অনেক আগেই। তার পর ঝিলকে নিয়ে ওরা গেছিল দিল্লির একটি হাসপাতালে, তখন সেখানেও স্টেম কোষ নিয়ে এই জাতীয় গবেষণা চলছিল। সেখানে অবশ্য ভ্রূণের স্টেম কোষ নয়, ঝিলের শরীর থেকে অস্থিমজ্জা নিয়ে, তা থেকে স্টেম কোষ বের করে সেটাই আবার ওকে দিয়েছিল। তবে এই চিকিৎসায় কোনও ফল মেলেনি। গবেষক ডাক্তারের কথা অনুযায়ী, হয়তো মিললেও মিলতে পারত যদি পেশেন্টকে বুস্টার ডোজ় দেওয়া হত। সেই বুস্টার ডোজ় ঝিলকে দেওয়া সম্ভব হয়নি আর, কারণ তার আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রজেক্টটাও মাঝ পথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ঝিলের সামনে এলে তাই ভীষণ একটা কষ্ট হয় নিলয়ের। হাঁটাচলা করতে পারে না বলেই সম্ভবত মেয়েটার মন সারা ক্ষণ বেরিয়ে বেড়ায়। হুইল চেয়ারে বসে-বসে মেয়েটা সব সময় বিশ্ব ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে।

"আঙ্কল! আঙ্কল!"

হাত বাড়িয়ে নিলয়ের হাতটা ধরে ঝিল।

"হ্যাঁ মা, বলো?"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"নিশ্চয়ই যাবে। কোথায় যাবে বল?"

"তোমার গাড়ি করে আমি একটু পাহাড়ে যাব।"

"বেশ তো মা! এই বার ছুটি পেলেই আমি, তুমি, মা-বাবা সবাই মিলে তা হলে দার্জিলিংয়ে যাব।"

আনন্দে খিলখিল করে হাসতে থাকে ঝিল।

"আঙ্কল!"

"বলো মা!"

"আমি তোমার পাশে বসে থাকব, সিটবেল্ট বেঁধে। আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নামব না।"

**অলংকরণ:** প্রসেনজিৎ নাথ

# আমাদের তুর্কিনাচন

স্থাপত্য থেকে রোজকার জীবন, ইতিহাস সেখানে সর্বত্র জীবন্ত। গরম হাওয়া-ভর্তি বেলুন, গুহার মধ্যে প্রাচীন শহর বা কাবাবের সুগন্ধমাখা সন্ধে— রুক্ষ বাস্তব থেকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে যাবে তুরস্ক-ভ্রমণ। সাক্ষী রইলেন কৌশিক সেন।

কাপাডোকিয়ায় হট এয়ার বেলুন রাইড

"The spider weaves the curtains in the palace of the Caesars
The owl calls the watches in the towers of Troy"
(বিজয়ী সুলতান মাহমুদ, ২৩ মে, ১৪৪৩ সাল, হাইয়া সোফিয়ার অলিন্দ থেকে)

এই শহরে দুই সাম্রাজ্যের ইতিহাস জড়ানো। নিওলিথিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রোঞ্জ যুগের সেই সব ধূসর রাজকাহিনী, পারসিক আর আয়োনিয়ান গ্রিক, ট্রোজান যুদ্ধের কাণ্ডকারখানা, আলেকজান্ডারের অশ্বখুরের শব্দ, নতুন হেলেনিস্টিক পৃথিবীর নির্মাণ— এই সবেরই সাক্ষী থেকেছে এই প্রাচীন প্রান্তর, নাম তার আনাতোলিয়া। সেখানে এশিয়া আর ইউরোপের সীমায় বসে আছে শহর ইস্তানবুল। এরোপ্লেন থেকে দেখতে পাচ্ছি, রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে বসফরাস স্ট্রেট। যে জলপথে কয়েক হাজার বছর ধরে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের যোগাযোগ, ইজিয়ান সমুদ্র থেকে ভূমধ্যসাগর, তারপর কৃষ্ণসাগর থেকে সি অফ মারমারা। অনেক শতাব্দীর মানবিক অভিযানের মধ্যমণি হয়েও যে শহরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এতকাল, একসময়ে তার নাম ছিল কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল, এখনকার নাম ইস্তানবুল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে শহর ছিল গ্রিক এবং রোমান সভ্যতার পীঠস্থান, খৃস্টধর্মের মহান আশ্রয়, ১৪৪৩ সাল থেকে সে-ই হয়ে উঠল অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, ইসলামীয় জগতের কেন্দ্রবিন্দু। তারপরে একদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্কের বলিষ্ঠ হাত ধরে সে আধুনিক পৃথিবীর পথে পা বাড়াল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বাধ্য করল পাততাড়ি গোটাতে। তাই নিয়ে বাঙালি কবি লিখলেন, 'কামাল তু নে কামাল কিয়া

টোপকাপি প্যালেসের থ্রোন রুম

মাস্ক অফ অ্যাপোলো

স্বাধীনতা যুদ্ধের মনুমেন্ট

ভাই'। চল্লিশ বছর আগে যে অপোগণ্ড কিশোরটি বীররসে আপ্লুত হয়ে পাড়ার ক্লাবে, রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় কামাল পাশা আবৃত্তি করেছিল, সে-ই আজ ইস্তানবুল এয়ারপোর্টের সামনে ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার পকেটে ওরহান পামুকের লেখা বই, যার নাম 'ইস্তানবুল'। আপাতত গন্তব্য পেরা প্যালেস হোটেল। পেরা প্যালেসকে বলা হয় মিউজিয়াম হোটেল। কেন না, সেই ১৮৯২ সাল থেকে স্বনামধন্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীরা এখানেই আতিথ্য গ্রহণ করতেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান, ব্রিটিশ, সোভিয়েত ও আমেরিকান গুপ্তচরের দল এখানেই চুপি চুপি আসর জমাত। অনেক রহস্য এবং ষড়যন্ত্রের গল্প মাখানো এই প্রাসাদের প্রতিটি সিঁড়ি ও সেলুন, আদ্যিকালের পুরনো লিফট কিংবা লাল কার্পেটে মোড়া ককটেল লাউঞ্জ। এই হোটেলের একটি ঘরে বসে পরামর্শ করতেন আধুনিক তুরস্কের জনক মুস্তাফা কামাল পাশা। বাঘের মতন মানুষটি এখনও সেই ঘরে, নিজের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের সঙ্গে সগর্বে বিরাজ করছেন। নিখুঁত রিয়্যালিস্টিক মূর্তিটি দেখে মাদাম তুসোকেও লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু হোটেলে বসে থাকার জন্য থোড়াই আমরা এতদূর ঠেঙিয়ে এসেছি!

রাত প্রায় এগারোটাই হবে তখন। হোটেলের কেতাদুরস্ত রেস্তরাঁয় জায়গা মেলা ভার, ওদিকে পেট চুঁইচুঁই। চট করে কিছু খাবারের সন্ধানে বাইরে বেরিয়েই আমরা তাজ্জব। আলো-ঝলমল বিরাট রাজপথ, নাম তার ইসতিকাল, সেখানে যানবাহন বলতে শুধু লাল রঙের ধীরগতি পুরনো ট্রাম। রাস্তা বেয়ে শয়ে শয়ে লোকজন স্রোতের মতো

কাপ্যাডোকিয়ার গুহা-গির্জা

বয়ে চলেছে, নানান কিসিমের কাবাব, আইসক্রিম, বাকলাভা (পেস্তা-বাদাম ঠাসা ঘোরতর মিষ্টি) এবং গ্রিল করা শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি সামুদ্রিক খাদ্য বিক্রি হচ্ছে দেদার। লক্ষ করলাম যে ভিড়ের মধ্যে ছেলে এবং মেয়েদের অনুপাত প্রায় সমান, অল্পবয়সিরা অতি অকাতরে ঘনিষ্ঠ এবং হাস্যময়। দুনিয়ায় হেন ফ্যাশন নেই, যা এই তল্লাটে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিকে গা-মাথা ঢাকা পরিচ্ছন্ন হিজাব, অন্যদিকে অতি সংক্ষিপ্ত পশ্চিমি অঙ্গশোভা, একে অন্যের পাশাপাশি বুক ফুলিয়ে চলেছে, কোথাও কোনও হুজ্জুতি-হাঙ্গামার চিহ্নমাত্র নেই। দু'দিকে অজস্র পানশালা, সমানে চলেছে মদ্যপান এবং জমকালো আলবোলায় ধূম্রসেবন। তরুণ তুরস্ক সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে। সাম্রাজ্য হারানোর বেদনা আর দুই বিপ্রতীপ সংস্কৃতির টানাটানির মধ্যে যে মানবিক বিপন্নতা, তার খবর রয়ে গিয়েছে শুধু শিল্পে আর সাহিত্যে। ওরহান পামুকের কল্যাণে পাঠকসমাজ ইতিমধ্যেই সেই তুর্কি 'হজুন' বা মেলাঙ্কলির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত, কিন্তু আজকের এই আলোকিত রাজপথে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

সড়ক ইসতিকাল, গিয়ে মিলেছে বিরাট এক চত্বরে, তার নাম টাক্সিম স্কোয়্যার। তার মাঝখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের মনুমেন্ট, তার উল্টোদিকে আলোকিত মসজিদ, মিনারেট, প্রাসাদ, হোটেল, রেস্টোরান্ট, ঝলমলে দোকানপাট আর সুসজ্জিত মানুষের নদী। মাথার উপরে ঝুলে থাকা ট্রামের তারগুলো কলকাতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এ সবের মধ্যিখানে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক যেন কাবাবের সুগন্ধের সঙ্গেই মিলেমিশে বিরাজ করছেন সর্বত্র।

পরদিন কাকভোরে উঠে সিটি ট্যুর। দিল্লি-আগ্রা-জয়পুর হোক, অথবা রোম, কায়রো বা ইস্তানবুল, পুরনো নগরদর্শনের একটা বাঁধা ছক আছে। গাইড আপনাকে কান ধরে এক তল্লাট থেকে আর এক তল্লাটে খেদিয়ে নিয়ে যাবে। একগাদা ভুলভাল বুকনি হজম করে, আপনি প্রাসাদ এবং ধ্বংসস্তূপের এধারে ওধারে ফটাফট ছবি তুলতে তুলতে দিনের শেষে হদ্দ কনফিউজ়ড হয়ে হোটেলে ফিরবেন। আমি অবশ্যই এই ছকের মানুষ নই, তাই গাইডকে নমস্কার জানিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম। আমার গন্তব্য ইস্তানবুলের সুলতান আহমেদ স্কোয়্যার, যেখানে সময়ের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পনেরোশো বছরের পুরনো হাইয়া সোফিয়া, সুবিখ্যাত নীল মসজিদ এবং অটোমান সুলতানদের প্রথম রাজকীয় বাসস্থান, টোপক্যাপি প্যালেস, গ্র্যান্ড বাজার ইত্যাদি। এই সবকিছুর মধ্যে মাথা তুলে হাইয়া সোফিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ৫২৫ খৃস্টাব্দ থেকে আজ অবধি, এক অদ্ভুত রাজকীয় বিষণ্ণতায়। তার ১৮০ ফুট উঁচু গম্বুজের মাঝখানে অতিকায় ঝাড়লণ্ঠনটি যেন আকাশ থেকে ঝুলে রয়েছে। একদিন যে ছিল সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মহান কীর্তি, বাইজানটিন সাম্রাজ্যের মধ্যমণি, খৃস্টান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গির্জা, পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই হয়ে উঠল ইসলামিক বিজয়ের বৃহত্তম প্রতীক। আধুনিক তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার হাইয়া সোফিয়াকে রাষ্ট্রীয় মিউজ়িয়াম বানিয়েছিল, ইদানীং তাকে আবার মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নামে যাই হোক, খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতীকচিহ্নগুলি এখনও মুছে ফেলা হয়নি। এমনকী, মূল প্রবেশদ্বারের উপরে এখনও বিরাজ করছেন মা মেরি, তাঁর দুই পাশে দুই মহান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন এবং জাস্টিনিয়ান। তাঁদের নিদর্শন এখন পড়ে
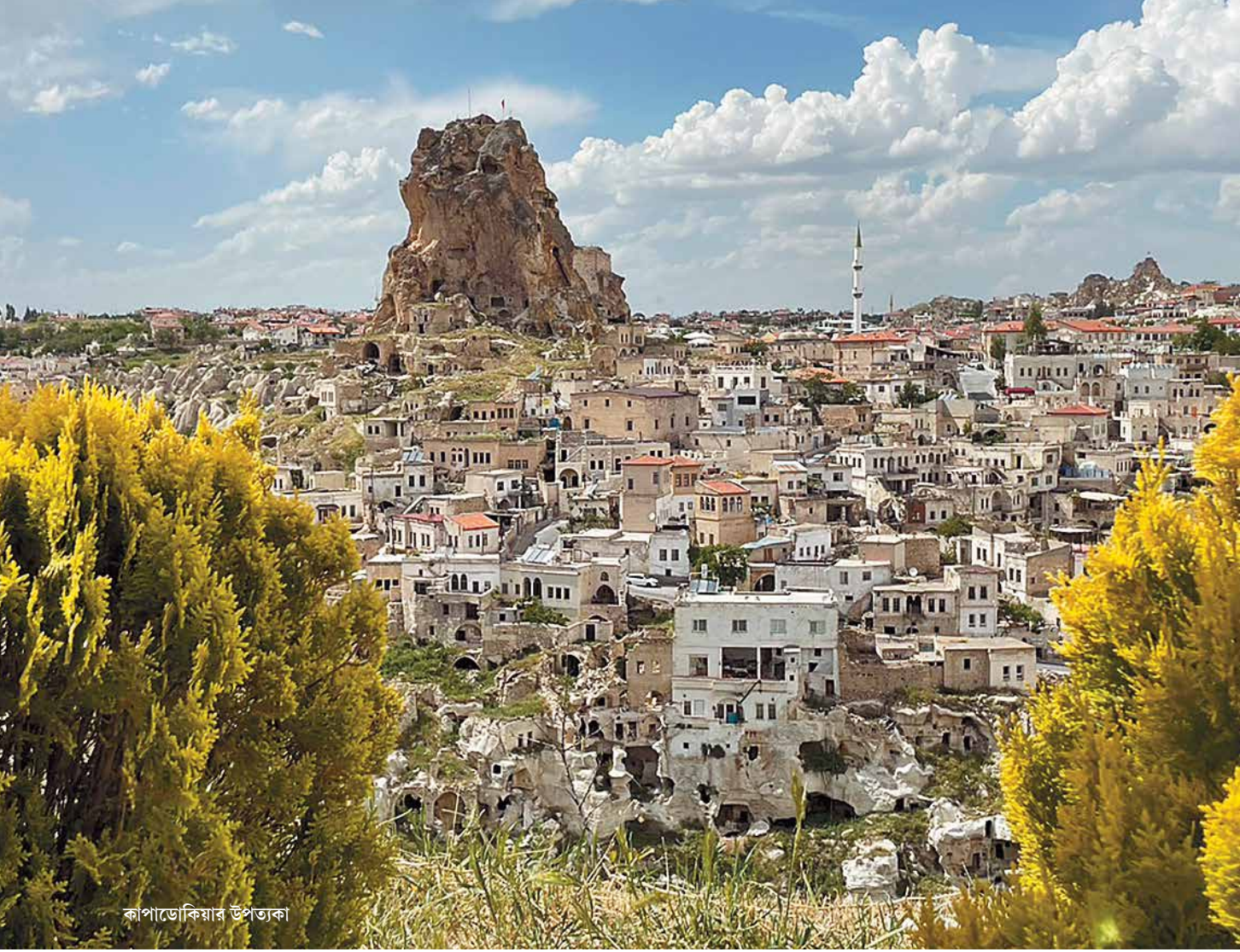
কাপাডোকিয়ার উপত্যকা

আনাতোলিয়া

আছে সামান্যই। ভিতরে পুরনো রোমান স্টেডিয়াম হিপোড্রোম। শহর তাকে প্রায় খেয়ে ফেলেছে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি ওবেলিস্ক এবং আদ্যিকালের বিখ্যাত এথেনিয়ান সার্পেন্টি কলামের তলাটুকু। বাকিটা ভেঙেচুরে বিদেশের মিউজিয়ামে চালান হয়ে গিয়েছে।

হাইয়া সোফিয়ার অন্দরমহলের বিবরণ দেব, এমন ক্ষমতা আমার নেই। কেন না মহত্বের কোনও অনুবাদ হয়না। তাজমহলের সামনে, সিস্টিন চ্যাপেলের ঐশ্বরিক ছাতের তলায়, হাইয়া সোফিয়ার গম্বুজের নিচে দাঁড়িয়ে যে অনুভূতি হয়, তা সোজা কথায় অনির্বচনীয়।

হাইয়া সোফিয়ার পাশেই সুলতান আহমেদ মসজিদ— যার ডাকনাম নীল মসজিদ বা ব্লু মস্ক— ছয়-ছয়খানা মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে। নীলাভ টাইলসে সাজানো এই বাদশাহী ইমারতটি টুরিস্ট-বন্দিত হলেও আমার ব্যক্তিগত পছন্দ, অনতিদূরে সুলেমানিয়া মসজিদ। আর্কিটেক্ট মিমান সিনানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন শ্রেষ্ঠতম অটোমান সুলতান, অদ্ভুতকীর্তি সুলেমান (Suleman the

হিপিড্রোমের কাছে বাইজ্যান্টাইন ধ্বংসস্তূপ

magnificient) এবং তাঁর ভালবাসার পাত্রী রক্সালেনা, অথবা হুরেম সুলতানা।
মহান সুলতান সুলেমান এবং ইউক্রেনিয় ক্রীতদাসী হুরেম সুলতানার রোমহর্ষক প্রেমের উপাখ্যান ঠিক করে বলার সময় আমার নেই এবং পাঠক হিসাবে আপনাদের সময় আরও কম। তাই সে চেষ্টায় ইতি টেনে আমিও পায়ে পায়ে তোপকাপি প্যালেসের দিকে রওনা হলাম। মধ্যযুগের রোম্যান্টিক কাহিনীরা পড়ে রইল পথের ধুলোয়, আপনারা চাইলেই তাদের অক্লেশে কুড়িয়ে নিতে পারেন, ইন্টারনেটে, ইউটিউবে। সেসব গল্পের শেষ নেই। ইদানীং 'দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট সেঞ্চুরি' নাম দিয়ে কয়েকশো ইপিসোডের একটি মহাভারতীয় সিরিয়াল তৈরি হয়েছে, চাইলে ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন।
তুর্কি ভাষায় তোপকাপি মানে কামান দরজা। যে কামান দেগে পুরনো কনস্ট্যান্টিনোপলের হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা থিওডোসিয়ান ওয়ালে ফাটল ধরিয়েছিলেন বিজয়ী সুলতান মাহমুদ। পনেরোশো থেকে সতেরশো সাল অবধি অটোমান সুলতানরা তাঁদের রাজকীয় দরবার, দেহরক্ষী জ্যানিসারি বাহিনী, খোজা এবং হারেম সমেত এই প্রাসাদে বিরাজ করতেন। তাঁদের প্রতাপে গোটা ইউরোপ কাঁপত। অষ্টাদশ শতক থেকে তাঁরা খোদায় মালুম কোন কারণে, সাবেক জীবনচর্চা শিকেয় তুলে, পাগড়ি এবং আলখাল্লা বিসর্জন দিয়ে, ফেজ টুপি এবং গলাবন্ধ কুর্তা গায়ে চাপিয়ে নবীন যুগের সাহেবিয়ানা রপ্ত করে ফেললেন। মধ্যযুগের তোপকাপি প্রাসাদ আর তাঁদের মনে ধরল না, ১৮৫৬ সালে সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ রাজসভা সরিয়ে নিয়ে গেলেন ইউরোপীয় কায়দার তৈরি দোলমাবাচি প্যালেসে। শহর ইস্তানবুলের এই দুই প্রাসাদ দর্শন করলেই, পশ্চিমি সভ্যতার কাছে প্রাচ্যের বৌদ্ধিক পরাজয়ের গল্পটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ঠিক ওই সময়ে আমরা যেমন বিলিতি বুলি শিখতে লেগেছিলাম, এঁরাও তেমনি কেতাকানুনে ফরাসি হয়ে উঠেছিলেন। আমরা ছিলাম পরাধীন, ওঁরা ছিলেন স্বাধীন শাসক। কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষে দেখা গেল দুই দেশেরই প্রায় একই রকম ছিবড়ে অবস্থা।

দোলমাবাচি প্যালেসের মূল প্রবেশদ্বার

**গুহার মধ্যে রয়েছে রীতিমতো শহর, গোলকধাঁধা, কবরস্থান। কিছু এলাকা বেশ ভৌতিক। গুহাগুলো নানা উপায়ে সুরক্ষিত। ভিতরে রয়েছে রান্নাঘর, শস্য জমানোর ব্যবস্থা।**

গ্র্যান্ড বাজারের আশপাশে ভিড়

প্রাসাদ ও মসজিদ দর্শন করতে করতে দিনপাঁচেক অক্লেশে কেটে যায়। এবং রাত্রের ইস্তানবুল সদাই জমজমাট।
পাঠক, আপনি আশাকরি যথেষ্ট সময় নিয়ে এসেছেন। যদি না-ও এসে থাকেন, তবুও কল্পনার পাখায় ভর করে মধ্যযুগে পাড়ি দেওয়া আপনার কে আটকায়!
এশিয়া এবং ইউরোপের মাঝখানে রয়েছে গ্যালাটা ব্রিজ। বসফরাস প্রণালীর উপর ঐতিহাসিক গোল্ডেন হর্ন এলাকায় বিখ্যাত এই সেতুটিকে প্রাচীনকাল থেকে বেশ কয়েকবার নতুন করে বানানো হয়েছে। তার ছায়ায় বসে কাবাব আর টাটকা মাছভাজা খাওয়ার আনন্দই আলাদা! কাছেই আছে গ্র্যান্ড বাজার আর স্পাইস মার্কেট। প্রচণ্ড দরদাম করে স্যুভেনির কেনার বিমলানন্দ লাভ করতে চান তো সেইদিকে রওনা দিন। রাস্তায় প্রচণ্ড ট্র্যাফিক, তাই যাতায়াতের জন্য ট্রামই প্রশস্ত।
ইস্তানবুল ভ্রমণ শেষ করে আমরা রওনা হলাম আনাতোলিয়া আবিষ্কারে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সঙ্গে এখানে মিশে রয়েছে খৃষ্টধর্মের সেই আদিযুগের গল্প, লুকিয়ে রাখা গির্জাঘর, গুহার মধ্যে বাইজান্টিন আমলের ছবি আঁকা মনাস্টেরি, মাটির তলায় শহর, পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। হাতে তিনমাস সময় এবং প্রত্নতত্ত্বে পি-এইচ-ডি না থাকলে এখানকার পুরো গল্পটা

নীল মসজিদ

**হাইয়া সোফিয়ার মূল প্রবেশদ্বারের উপরে বিরাজ করছেন মা মেরি, তাঁর দুই পাশে দুই মহান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন এবং জাস্টিনিয়ান। ভিতরে পুরনো রোমান স্টেডিয়াম হিপোড্রোম।**

ধারণায় আনা মুশকিল। কিন্তু আমরাও ঝানু ট্যুরিস্ট! তুর্কিস্থানে এসে এই তল্লাটের তিনটি বিশ্ববন্দিত আকর্ষণ, অর্থাৎ কাপাডোকিয়া, পামুকালি এবং এফেসাস (Cappadocia, Pamukkale and Ephesus) না দেখে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি জিওলজিস্ট নই, তাই কাপাডোকিয়ার এই উদভ্রান্ত ল্যান্ডস্কেপ কেমন করে পয়দা হল তার কোনও হদিশ আমার কাছ থেকে মিলবে না। আমি শুধু দেখতে পেলাম, এবড়োখেবড়ো মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে দৈত্যাকার সব উইটিবি আর ব্যাঙের ছাতা। পাথরের স্তম্ভ, তার মাথায় পাথরের মুকুট। লাল পাথরের টিলাগুলো বিলকুল ফাঁপা, সেখানে মানুষজনের বাস। আমাদের হোটেলও গুহার মধ্যে... গোটা শহরটাই যেন পাহাড়ের পেটে আধখানা সেঁধিয়ে আছে। খাওয়াদাওয়া করে তাড়াতাড়ি

কাপাডোকিয়ায় প্রকৃতির বিচিত্র রূপ

ইস্তানবুলে কাবাবের পসরা

দোলমাবাচি প্যালেসের সিলিং

আনাতোলিয়া

শুয়ে পড়লাম, কেন না পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতে সামনের মাঠে জমায়েত হতে হবে। কাপাডোকিয়ার সূর্যোদয় দেখতে হয় গরম হাওয়া ঠাসা বেলুনে চড়ে। সে এক মহা হইহই কাণ্ড! গ্যাসের আগুন জ্বালিয়ে বেলুনের পেটে গরম হাওয়া পাম্প করা হচ্ছে, সেই আগুনের আভায় টুরিস্টদের ভ্যাবাচ্যাকা মুখগুলো দেখলে মায়া হয়! বেলুনের তলায় ঝোলানো বেতের বাস্কেট, সেখানে লোকজনকে ঠেলাঠেলি করে বোঝাই করা হচ্ছে। বেলুন ফুলে উঠলেই সে ঊর্ধ্বগামী। আকাশ পরিষ্কার হতে না হতেই চতুর্দিকে শ'খানেক বেলুন, পায়ের তলায় পাথরের গ্যালারি, পাথরের মিনার, পাথরের দুর্গ। সবকিছুর উপরে আলগা আদরের মতো ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

বেলুন থেকে নেমেই আমাদের গন্তব্য গোরেম ওপেন এয়ার মিউজিয়াম— যেখানে আপনি স্তম্ভ এবং গুহার মাঝখানে মেঠো ফুল-ফোটা পাথুরে রাস্তায় হাঁটবেন। দেখতে পাবেন যে গুহাগুলো আসলে মঠ এবং গির্জা। আদি খ্রিষ্টানরা এখানে জমায়েত হত, প্রথম প্রথম রোমান রাজরোষ থেকে বাঁচার তাগিদে, তারপর বাইজ়ান্টিয়ামে খৃষ্টধর্মই যখন রাজধর্ম হয়ে দেখা দিল, তখন আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে। ততদিনে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, কিন্তু পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য দিব্যি বেঁচে রয়েছে কনস্টান্টিনোপ্‌লে। সেখানে কনস্ট্যানটাইন, থিওডোসিয়াস ও জাস্টিনিয়ানের মতো মহান শাসকদের হাত ধরে গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতির নবজন্ম হয়েছে। তার মাথার উপরে রয়েছেন একদা অত্যাচারিত প্রভু যিশুখৃষ্ট এবং করুণাময়ী মা মেরি। ইতিহাস এমনই বিচিত্র।

পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের ইতিমধ্যেই হাঁটু খুলে এসেছে, তখনও কাপাডোকিয়ার সিকিখানাও দেখা হয়নি। গুহার মধ্যে রয়েছে রীতিমতো শহর, গোলকধাঁধা এবং কবরস্থান। কিছু কিছু এলাকা রীতিমতো ভৌতিক। সেই আমলে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত, তাই গুহাগুলো নানা উপায়ে সুরক্ষিত। তার মধ্যেই রয়েছে রান্নাঘর আর শস্য জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা। সন্ধ্যা নাগাদ রণে ভঙ্গ দিতে হল, আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে হোটেলে ফিরলাম। সেখানে অপেক্ষা করছে হরেক রকমের কাবাব এবং তুর্কিদের জাতীয় সুরা, নাম তার রাকি। মৌরি চোলাই করে বস্তুটা তৈরি হয়। বেশ কড়া, চল্লিশ পার্সেন্টের বেশি অ্যালকোহল। এলাকার কুলিনারি স্পেশালিটি একধরনের হাঁড়িকাবাব, মুরগি বা ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি। অবশেষে কিছু ব্যথার

কটন প্যালেস
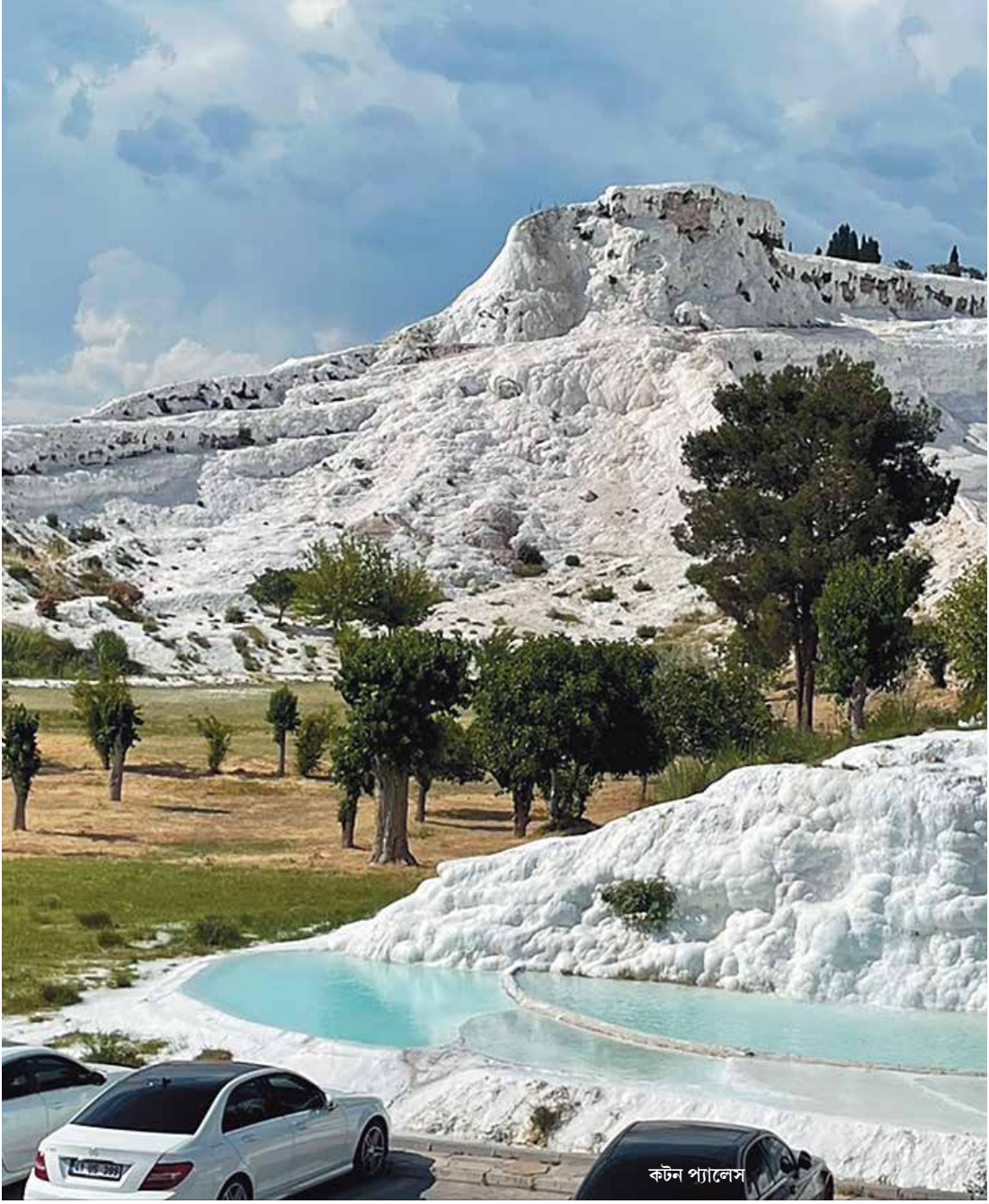
ওষুধ এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘুম।
পরের দিন একের পর এক উপত্যকায় যাত্রা। কোথাও গোলাপফুল আর অজস্র পায়রা, কোথাও উট চলেছে মুখটি তুলে, কোথাও ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের অদ্ভুত রং, আবার কোথাও সারি সারি প্রাকৃতিক চিমনি। এরা বলে ফেয়ারি চিমনি, এককালে সেখান থেকে আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া উঠত। ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে সুলতানি আমলের পুরনো হাভেলি আর হামাম। এ সবকিছুর উপরে রোদ্দুর আর হালকা মেঘের লুকোচুরি খেলায় মেতে আছে আনাতোলিয়ার ইন্দ্রনীল আকাশ।
এরই মধ্যে একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। এই দেশের সর্বত্র এক রকম পোর্সেলিনের চাক্তি পাওয়া যায়, তার উপরে একটা চোখ আঁকা থাকে। কুনজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য এই 'চোখ' বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। চোখের বদলে যদি ছোট একটি ঘটিতে নাম লিখে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে সুনজর অর্থাৎ ভালবাসার দৃষ্টি অক্ষয় হয়ে থাকে। কাপাডোকিয়ার স্বপ্ন উপত্যকা আর প্রেম উপত্যকা এই সব বস্তু ঝুলিয়ে রাখার আদর্শ জায়গা। দেখতে পেলাম লোকে দুটোই একসঙ্গে করছে, এবং আমার সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রেম-বোঝাই পরিবেশে নিজেরাও বেশ একটু আপ্লুত হয়ে পড়েছেন।
পরের দিন সকাল থেকে আবার আমাদের মুসাফিরির শুরু। এবারে লক্ষ্য ইজিয়ান সাগরের ধার ঘেঁষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রিক-রোমান-বাইজান্টিন প্রত্নগরীদের খবর নেওয়া। কিন্তু তার আগে এই অঞ্চলের আরেকটি প্রাকৃতিক চমৎকার না দেখলেই নয়। পামুকালি শহরে রয়েছে চুনাপাথরের এক অদ্ভুত ভাস্কর্য, যা দেখে মনে হয় সাদা বরফের স্তূপ। তার চারদিকে খেলা করে বেরায় সালফার মেশানো কুসুম কুসুম গরম জলের স্রোত। রয়েছে পাথরের কোলে এক প্রাকৃতিক সুইমিং পুল, তার জল নিরাময়ী, তার গন্ধে বহু শতাব্দীর রোমান্স। কথিত আছে যে মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা এবং রোমান জেনারেল মার্ক অ্যান্টনি একদা ভ্রমণকালে এই এলাকায়

ক্লিওপেট্রা পুল

পা দিয়েদিলেন। তাঁদেরই প্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছিল ক্লিওপেট্রা পুল, যা নাকি আজ অবধি সগর্বে বিরাজ করছে। এখনও তাতে নেমে স্নান করা যায়। একদিন যা ছিল শ্বেতপাথরে বাঁধানো রোমান স্নানাগার, এখন তার সবটাই ভেঙে পড়েছে জলের মধ্যে। উষ্ণ, ঈষৎ সবুজ জলধারার মধ্যে গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে মার্বেল করিন্থিয়ান স্তম্ভ, স্ট্যাচু এবং সোপান, যাদের শ্যাওলা মাখানো গায়ে লেখা আছে অতীত গৌরবগাথা। চারদিকে পেঁজা তুলোর মতন সাদা চুনাপাথরের পাহাড় আর লেক, যার পোশাকি নাম কটন প্যালেস।
কটন প্যালেস এবং ক্লিওপেট্রা পুল থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য প্রাচীন গ্রিক নগরী হিরাপোলিস, সেই যুগের আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল সেন্টার। উষ্ণ প্রস্রবণের চারদিকে গড়ে উঠেছিল হাসপাতাল, তার সাক্ষী হয়ে পাথরের গায়ে আঁকা আছে আমাদের অতিপরিচিত প্রতীকচিহ্ন— স্টাফ অফ এসক্লেপিয়াস। আমি জানি যে পাঠক এতক্ষণে অতিশয় ক্লান্ত। তা-ও আশা রাখি যে আমাদের হাত ধরে আপনিও শেষ অবধি ইজিয়ান সমুদ্রের কূলে, পাঁচশো খৃষ্টপুর্বাব্দের কোন এক ক্লান্ত সন্ধ্যাবেলায় এফেসাস নগরীর আর্টেমিস দেবীমন্দিরে হাজির

টোপকাপি প্যালেসে সুলতানের ছোরা

হতে চাইবেন। কলকাত্তাওয়ালি কালীর মতোই দেবী আর্টেমিস বহু শতাব্দী ধরে এই উপকূলীয় শহরের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, তাঁর মন্দির ঘিরে গড়ে উঠেছিল শহর, স্টেডিয়াম, অ্যাম্ফিথিয়েটার, লাইব্রেরি, গণিকালয়, সভাঘর, বিচারশালা, পার্ক এবং স্নানাগার। আজ সেই বৃহৎ এলাকা জুড়ে অপোগণ্ড টুরিস্ট এবং বিরক্ত গাইডদের এক ক্লান্ত প্রদর্শনী। দাঁড়িয়ে আছে রাজপথ, সারি সারি থাম, একদা বিখ্যাত লাইব্রেরীর পাথুরে কঙ্কাল।
এইভাবে সন্ধ্যা নামবে। পরদিন থেকে শুরু হবে আপনার লম্বা সফর, ধাপে ধাপে আবার বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে আসা। ছায়াময় প্রাচীন পৃথিবীর কবিতা তবুও আপনাকে তাড়া করে ফিরবে, উঁকি দেবে কেজো পৃথিবীর জানলায়।
**ছবি:** লেখক

সানন্দা
খেলা

হরমনপ্রীত কউর

পি. ভি সিন্ধু

সাক্ষী মালিক

মীরাবাই চানু

নিখাত জ়ারিন

# কমনওয়েলথে মেয়েরা

এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পারফরম্যান্স উজ্জ্বল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য মেয়েদের পারফরম্যান্স। চানু-নিখাত-সিন্ধুরা স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নবপ্রজন্মকে...

মোট ২২টি সোনা। আর তার মধ্যে মহিলা খেলোয়াড়দের ঝুলিতেই আটটি! সোনা-রুপো-ব্রোনজ় মিলিয়ে ভারতের পুরুষ খেলোয়াড়রা যেখানে পেয়েছেন মোট ৩৫টি মেডেল, সেখানে মহিলারাও কম যাননি! তাঁদের দখলে ২৬টি মেডেল। এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের সামগ্রিক সাফল্যের পাশাপাশি নজর কেড়েছে মেয়েদের সাফল্য। নিখাত জ়ারিন থেকে পি.ভি সিন্ধু, মীরাবাই চানু থেকে লন বলের মহিলা দল, অবনী লেখরা-ভাবিনা পটেলরা প্রমাণ করেছেন নিজেদের। অন্যতম বড় মঞ্চে। সবমিলিয়ে মেডেল ট্যালিতে ভারত শেষ করে চার নম্বরে। আর এতে সমান সমান কৃতিত্ব পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলিট উভয়েরই। কিন্তু কেন আলাদা করে মেয়েদের সাফল্যের কথা নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে হচ্ছে? এক সাক্ষাৎকারে বক্সিংয়ে মেডেল-জয়ী নিখাত জ়ারিন বলেছিলেন, "যেখানে ট্রেনিং করতাম, সেখানে এক প্রতিযোগিতায় দেখি বক্সিং বাদে অন্য সব খেলাতেই মেয়ে প্রতিযোগী আছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করি, বক্সিংয়ে মেয়েরা নেই কেন? এটা কি শুধু ছেলেদেরই খেলা?" 'ছেলেদের' খেলাতেও যে মেয়েরা সাফল্য পেতে পারেন তা দেখিয়েছেন চানু, মেরি কম, নিখাত, সাক্ষী মালিকরা। শুধু বক্সিং, ভারত্তোলন বা কুস্তির মতো খেলা নয়। সাধারণ বাড়িতে ক'জন মেয়েকেই বা এখনও এদেশে খেলাধুলো করতে উৎসাহ দেওয়া হয়? ক'জনই বা পেশাদার খেলাধুলোয় আসতে পারেন? খেললে মেয়েরা 'পুরুষালি' হয়ে যাবে, বিয়ে হবে না ইত্যাদি স্টিরিওটাইপগুলো এখনও এদেশে ভীষণরকম সত্যি। এমনিতেও খেলাধুলোকে তথাকথিত নিরাপদ কেরিয়ার

অপশন হিসেবে দেখেন না অনেকেই। ঠিক এই কারণে, অনেক মেয়েই ছোটবেলায় খেলাধুলো শুরু করলেও বড় হয়ে আর তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এত যেখানে প্রতিকূলতা, সেখানে কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের সাফল্য যদি আরও পাঁচজন মেয়েকে অনুপ্রেরণা দেয়, তা নিয়ে আলাদা করে তো লিখতেই হবে। রিও অলিম্পিকসে পদক জয়ের পরে সাক্ষী মালিক একবার বলেছিলেন, "আমি যে রাজ্যের মেয়ে, সেই হরিয়ানায় অনেক মহিলা কুস্তিগীর আছে। তবে তা ছেলেদের সমান-সমান সংখ্যার নয় অবশ্যই। জেন্ডার বায়াস আছে ঠিকই, তবে মেয়ে রেসলারদের সংখ্যাও খুব কম নয়। পরিস্থিতি দ্রুতই বদলাচ্ছে।" সাক্ষী বা গীতা-ববিতা-ভিনেশ ফোগতরা পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন অকাতরে। সিন্ধু বা সাইনারাও। অনেকেই এখনও সেটুকুও পান না। এখনও গড়পড়তা মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবা-মায়েরা মেয়েদের বলেন না, 'বিয়ে না করে, খেলাধুলো করো।' বা 'পড়াশোনার মতোই খেলাধুলোকেও সমান গুরুত্ব দাও।' কিন্তু পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।

লন বলে মেয়েদের সাফল্য

বেশ কিছু খেলায় এবার মেয়েদের সাফল্য তথাকথিত 'অফবিট' স্পোর্টসে নতুন প্রজন্মের উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে পারে নিঃসন্দেহে। যেমন, লন বল বা রেস ওয়কের মতো খেলা।

শ্রীজা আকুলা

## শ্রীজা আকুলা *(কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী)*

খেলাধুলোর ব্যাপারে আমার বাবা-মা সবসময় সমর্থন করেছেন। আর আমার কোচ সোমনাথ ঘোষের কথা তো বলবই। আমাদের দেশে এখনও হয়তো সব মেয়েরা এমন সমর্থন পান না ঠিকই। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন, ফেডারেশন এগিয়ে আসছে। অ্যাকাডেমি গড়ে উঠছে নতুন নতুন। একদম গ্রাসরুট লেভেলের মেয়েদের সাহায্য করছেন এরা। এবারে কমনওয়েলথ গেমস ও অলিম্পিকসে ভারতের মেয়েরা খুব ভাল পারফর্ম করেছেন। নতুন প্রজন্মকে এই সাফল্য নিশ্চয়ই আরও উৎসাহ দেবে। সরকারি-বেসরকারি অনেক সংস্থাই আজকাল খেলার পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে চাকরির সুযোগও দিচ্ছে। চাকরির সুযোগ বাড়লে তরুণ মেয়েরা আরও এগিয়ে আসবে। 'খেলো ইন্ডিয়া'র কথাও আমি আলাদা করে বলব এই প্রসঙ্গে। আর কমনওয়েলথ গেমসের সাফল্যে আমি খুশি, তবে পুরোপুরি তৃপ্ত নই।

আর পরিস্থিতি বদলানোর জন্য প্রয়োজন আরও বেশি সংখ্যক মেয়ে-চ্যাম্পিয়নদের। অলিম্পিকসের প্রস্তুতিপর্ব ধরা হয় কমনওয়েলথ গেমসকে। সেই নিরিখে ২০১০-এর মতো ফল না হলেও এবারে ভারতের সামগ্রিক পারফরম্যান্স বেশ ভাল। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে লন বল বা জ্যাভলিন থ্রোয়ের মতো খেলা থেকেও পদক এসেছে...এটা গুরুত্বপূর্ণ। টেবল টেনিস খেলোয়াড় সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় যেমন জানালেন, "একজন মেয়ে হিসেবে বড্ড ভাল লাগছে কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের এই সাফল্য। এই মাপের গেমসে পদক জয় নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার। আর পাঁচজনের মতো এই সাফল্য আমাকেও উদ্বুদ্ধ করেছে, আমিও চাইব আগামী

প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়

## রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়
*(অলিম্পিয়ান তিরন্দাজ ও প্রশিক্ষক)*

আমি যদি তিরন্দাজির কথা বলি, তাহলে সবসময় বলব মহিলাদের মেডেল পাওয়ার সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। মেয়েদের ফোকাস আমার মতে অনেকগুণ বেশি। এবছরে তিরন্দাজি বা শুটিংয়ের মতো খেলা নেই, যেগুলোতে মেডেলের সম্ভাবনা বরাবরই উজ্জ্বল ধরা হয়। তা সত্ত্বেও ভারত এতগুলো মেডেল জিতেছে। ২০১০-এর তুলনায় কমসংখ্যক হলেও, এই সাফল্য আশাপ্রদ। লন বলে মেডেল এসেছে, প্রিয়ঙ্কা গোস্বামী রেস ওয়কে মেডেল জিতেছেন। এরকম অনেক নতুন খেলোয়াড় পদক পেয়েছেন এবার। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যেসব খেলা থেকে মেডেলের সম্ভাবনা আছেই, তার বাইরেও অনেকে মেডেল জিতেছেন এবার। অ্যাথলেটিক্সে এত পদক এসেছে। কমনওয়েলথ গেমস হল প্রিপারেটরি টুর্নামেন্ট, অলিম্পিকসের জন্য। আমি সবসময় বলি মেয়েদের খেলাধুলোয় আনা খুব দরকার। তা সে ক্রিকেট বা অলিম্পিকস স্পোর্টস...যা-ই হোক না কেন। বাবা-মায়েদের বুঝতে হবে খেলা পেশা হতেই পারে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতোই এটাও পেশা...নাম-খ্যাতি-চাকরি যেমন পাবে তেমনই দেশের হয়ে খেলতেও পারবে। তিরন্দাজির ক্ষেত্রে বলি, আমার ট্রেনিং সেন্টারে এমন তিন-চারজন মেয়ে আছে যারা পড়াশোনাকে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ধরে। মূল ফোকাস খেলাধুলোয়। বাবা-মায়েরা লোন নিয়ে বিনিয়োগ করছেন সন্তানদের খেলাধুলোয়। হরিয়ানা বা অন্য কিছু রাজ্যে এমনটা ছিল। এখন বাংলাতেও মানসিকতা বদলাচ্ছে।
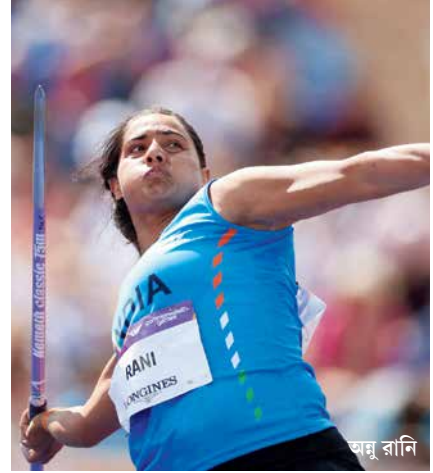
অন্নু রানি

ভাবিনা পটেল

কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিততে। আমি নিজে টোকিয়ো অলিম্পিকসে খেলেছি। সেবারেও সামগ্রিকভাবে মেয়েদের পারফরম্যান্স ছিল অনুপ্রেরণামূলক। সবমিলিয়ে মেয়েদের খেলাধুলো যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেভাবেই এগোক। সব পরিবারকে বলব, মেয়েদের খেলাধুলোয় আসতে আরও উৎসাহ দিন।" ক্রিকেট-পাগল দেশে একটা সময়ে নন-ক্রিকেটিং স্পোর্টসে আইকন হিসেবে উঠে আসেন পি.টি উষা। তারপর ২০০০ সালে অলিম্পিকসে কর্ণম মালেশ্বরী ভারত্তোলনে পদক পেয়ে ভাঙেন গ্লাস সিলিং। তারপরে অঞ্জু ববি জর্জ, ঝুলন গোস্বামী, মিতালি রাজ, মেরি কম, সাইনা নেহওয়াল, সানিয়া মির্জা থেকে পি.ভি সিন্ধু, হিমা দাস, মীরাবাই চানু, সাক্ষী মালিক... একের পর এক মহিলা স্পোর্টস আইকন পেয়েছি আমরা। এঁরাই প্রেরণা দিয়েছেন নতুন প্রজন্মকে। এখনকার প্রজন্ম ও তাঁদের বাবা-মায়েরা বুঝছেন খেলাধুলোও 'কেরিয়ার' অপশন হতে পারে। তাই, শুধু হরিয়ানা বা অন্ধ্রপ্রদেশ নয়, খাস বাংলাতেও এখন আগের তুলনায় মেয়ে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশি। এবারের কমনওয়েলথ গেমস বোধহয় সেই আশাই আরও একটু জাগিয়ে দিল। আরও একঝাঁক অনুপ্রেরণা, আরও একরাশ স্বপ্ন। পুরুষদের ক্রিকেট-পাগল দেশে মেয়েরাও সমানে-সমানে সফল হচ্ছেন, উঠে আসছে একের পর এক অলিম্পিক স্পোর্টস। এবারের বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমস থেকে সবচেয়ে বড়

> একটা সময়ে নন-ক্রিকেটিং স্পোর্টসে আইকন হিসেবে উঠে আসেন পি.টি উষা। ২০০০ সালে অলিম্পিকসে কর্ণম মালেশ্বরী ভারত্তোলনে পদক পেয়ে ভাঙেন গ্লাস সিলিং।

হিমা দাস

## সোমনাথ ঘোষ *(টেবল টেনিস প্রশিক্ষক)*

সরকারি সমর্থন না থাকলে খেলাধুলো বা বিশেষত মেয়েদের খেলাধুলোয় এত সাফল্য হয়তো আসত না। আমি সাফল্যের কৃতিত্ব আলাদা করে দেব ক্রীড়ামন্ত্রী কিরণ রিজিজুকে। প্রধানমন্ত্রী নিজে অ্যাথলিটদের উৎসাহ দেন। শুধু হায়দরাবাদ থেকেই পি.ভি সিন্ধু, নিখাত জ়ারিন আর শ্রীজা আকুলা... তিনজন মহিলা চ্যাম্পিয়ন পেয়েছি আমরা। এঁরাই বোধহয় নতুনদের অনুপ্রেরণা। এখনকার বাবা-মায়েরা অনেকেই ব্রড-মাইন্ডেড। তবুও এখনও অনেক বাড়িতেই সন্তানদের খেলাধুলোয় দিলে প্রশ্ন ওঠে, ‘পড়াশোনা না করিয়ে খেলাচ্ছ!’ এরমধ্যেও নিখাত বা শ্রীজার বাবা-মায়েরা সব বাধা পেরিয়ে মেয়েদের খেলতে প্রেরণা দিয়েছেন। হায়দরাবাদে আমার অ্যাকাডেমিতে মেয়েরা চেন্নাই, বাংলা, ওড়িশা, গোয়া থেকে এসে খেলছে। হস্টেলে পেয়িং গেস্ট থেকে খেলছে। এটা বড় ব্যাপার। তবে অলিম্পিকস স্পোর্টসের ক্ষেত্রে বলব, সাফল্যের পরে আমরা তাঁদের চিনতে শুরু করি। শ্রীজা আকুলাকে (এবারে কমনওয়েলথে টেবল টেনিস সোনাজয়ী) ১১ বছর ধরে কোচিং করাচ্ছি। ওর জন্য একটা সময়ে কত স্পনসর খুঁজেছি! শ্রীজা ও ওর বাবা-মা আমার উপর বরাবর ভরসা রেখেছেন। আমার কোচিংয়েই শ্রীজা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবছরে কমনওয়েলথ গেমসের আগে ও প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। সারাদিন অ্যাকাডেমিতেই থাকত। ওর জীবনে টেবল টেনিস ছাড়া কিছু নেই। এমনও হয়েছে, ও আমারও আগে চলে এসে প্র্যাকটিস করেছে।

**সোমনাথের সঙ্গে শ্রীজা**

নীতু ঘাংগাস

ভিনেশ ফোগত

রিংয়ে নিখাত

প্রাপ্তি বোধহয় এটাই:

### এক নজরে মেয়েদের সাফল্য:

মীরাবাই চানু *(ভারত্তোলন, সোনা)*
সাক্ষী মালিক *(কুস্তি, সোনা)*
ভিনেশ ফোগত *(কুস্তি, সোনা)*
ভাবিনা পটেল *(প্যারা টেবল টেনিস, সোনা)*
নীতু ঘাংগাস *(বক্সিং, সোনা)*
পিভি সিন্ধু *(ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলস, সোনা, মিক্সড টিম, রুপো)*
নিখাত জ়ারিন *(বক্সিং, সোনা)*
শ্রীজা আকুলা *(টেবল টেনিস, মিক্সড ডাবলস, সোনা)*
লন বলস *(সোনা, প্রতিযোগী: নয়নমণি সাইকিয়া, পিঙ্কি সিংহ, লাভলি চৌবে, রূপা রানি তিরকে)*
বিন্দিয়ারানি দেবী *(ভারত্তোলন, রুপো)*
সুশীলা দেবী *(জুডো, রুপো)*
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল *(রুপো, অধিনায়ক: হরমনপ্রীত কউর)*
গায়ত্রী গোপীচন্দ *(ব্যাডমিন্টন ডাবলস, মিক্সড টিম, রুপো)*
ট্রিসা জোলি *(ব্যাডমিন্টন ডাবলস, ব্রোনজ়, মিক্সড টিম, রুপো)*
আকর্ষি কশ্যপ *(ব্যাডমিন্টন মিক্সড টিম, রুপো)*
অশ্বিনী পোনাপ্পা *(ব্যাডমিন্টন মিক্সড টিম, রুপো)*
তুলিকা মান *(জুডো, রুপো)*
অংশু মালিক *(কুস্তি, রুপো)*
প্রিয়ঙ্কা গোস্বামী *(অ্যাথলেটিক্স, রুপো)*
পূজা গহলোত *(কুস্তি, ব্রোনজ়)*
পূজা সিহাগ *(কুস্তি, ব্রোনজ়)*
দিব্যা কাকরান *(কুস্তি, ব্রোনজ়)*
অন্নু রানি *(অ্যাথলেটিক্স, ব্রোনজ়)*
হরজিন্দর কউর *(ভারত্তোলন, ব্রোনজ়)*
জেসমিন লাম্বোরিয়া *(বক্সিং, ব্রোনজ়)*
সোনালবেন পটেল *(প্যারা টেবল টেনিস, ব্রোনজ়)*
দীপিকা পাল্লিকল *(স্কোয়াশ, মিক্সড ডাবলস, ব্রোনজ়)*
ভারতীয় মহিলা হকি দল *(ব্রোনজ়)*

> পরিকাঠামোগত সমস্যা ছাড়াও নতুন অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে স্পনসরশিপের সমস্যাও আছে। আমরা তাঁদের মূল্যায়ন করি সাফল্যের পরে।

**লেখা:** মধুরিমা সিংহ রায়

# নেপথ্য-নায়ক

এঁরা প্রত্যেকেই সিনেমার নেপথ্যের শিল্পী। প্রত্যেকেই বাঙালি, আর প্রত্যেকেই চুটিয়ে কাজ করছেন বলিউডে। এমনই সাত কুশীলবের সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

অর্কপ্রভ মুখোপাধ্যায়

## অর্কপ্রভ মুখোপাধ্যায়,

সংগীতশিল্পী-গীতিকার-কম্পোজ়ার
উল্লেখযোগ্য কাজ: জিসম ২, বরেলি কি বরফি, কেসরি, রুস্তম, গোল্ড, ভুজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি

জন্ম, পড়াশোনা সবই কলকাতায়। পার্ক সার্কাসের ডন বসকো-তে স্কুলিং শেষ করে প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, তারপরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করি। ইন্টার্নশিপ শেষ করি ২০০৭-এ। স্কুল-কলেজে পড়ার সময়ে গানকে পেশা হিসেবে নেওয়ার কথা মাথায় আসেনি কখনও। বাবা-মা গাইতেন অবশ্য। ছোটবেলায় রবীন্দ্রসংগীত শিখেছি, কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা সেভাবে ছিল না। স্কুলে-কলেজে ফেস্টে গাইতাম, আমাদের ব্যান্ডও ছিল। ইংরেজিতেই তখন গান লিখতাম, গান গাইতাম। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখে গ্লোবাল পোয়েট্রি কম্পিটিশনে প্রাইজ় মানি পেয়েছিলাম। সেই থেকে উপলব্ধি করলাম যে আমি কবিতা লিখতে পারি। বাংলায় গান গাইলেও বাংলায় লিখতে পারতাম না। ২০০৮-এ মুম্বই চলে আসি। বাবা-মাকে বলিনি তখন, কারণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে টপার ছিলাম। ডাক্তারি ছেড়ে মুম্বইতে গান করতে আসব, এটা বলার সাহস হয়নি তখন! বাবা ডাক্তার, মা অধ্যাপিকা। সাহিত্য-অ্যাকাডেমিকসের পরিবার আমার, আমিই প্রথম ছক ভাঙলাম বলতে পারেন। নিজের কম্পোজ় করা চারটে গান পুঁজি করে মুম্বই যাই। প্রথম তিনবছর স্ট্রাগল করেছি খুব, দু'তিনটে ছবি শুরু হয়েও শেষ হয়নি। অনেকবার প্রতারিতও হয়েছি। প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলাম প্রথম এক সপ্তাহ। ২০১১-র অক্টোবরে মহেশ ভট্টর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক অভিনেতা বন্ধুর সুবাদে। এক ঘণ্টার মধ্যে ভট্টসাহেব আমাকে 'জিসম ২' অফার করেন। ভোর ছ'টা নাগাদ উনি ফোন করে দশটা নাগাদ আসতে বলেন। নতুন অফিসের ঠিকানা খুঁজে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। উনি বলেন, সিডি রেখে যেতে। আমি জোরাজুরি করতে থাকি। ওঁর কাছে আমি বরাবর কৃতজ্ঞ থাকব। এরপরে 'হেট স্টোরি ২'-তে অরিজিৎ সিংহ প্রথম গান গায়। ও আমার ছোটভাইয়ের মতো, তখনও অত জনপ্রিয় হয়নি। অরিজিতের দাদা মেডিক্যাল কলেজে ছিল, আমি আগে থেকেই চিনতাম ওকে। 'রুস্তম'-এর 'তেরে সঙ্গ ইয়ারা'-তে অক্ষয় স্যারের সঙ্গে প্রথমবার কাজ করি, গীতিকার মনোজ মুনতাশিরের সঙ্গেও। অন্যতম ল্যান্ডমার্ক গান বলতে গেলে বলব

অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অর্ক

আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে অর্ক

ক্যামেরার পিছনে প্রসিত রায়

'বরেলি কি বরফি'র 'নজ়ম নজ়ম'-এর কথা। কর্ণ জোহরকে আমার দেওয়া প্রথম গান ছিল 'দরিয়া' আর 'সাথী রে'। আমি বলেছিলাম, অরিজিৎ গাইবে। উনি বলেন, 'ডোন্ট টাচ দিজ় সংগস। কিপ ইট অ্যাজ় ইট ইজ়।' অনেক গানের ক্ষেত্রেই ক্রিয়েটর যা চাইছেন, সংগীতশিল্পী হয়তো তা পুরোপুরি রেপ্লিকেট করতে পারেন না। ইরশাদ কামিল, মুনতাশির, রশমি ভিরাগের মতো গীতিকারদের সঙ্গে সহজেই কানেক্ট করতে পারি। 'তেরি মিট্টি' ('কেসরি') সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হল। বিদেশ থেকে কত মানুষ এই গানের সম্পর্কে এখনও আমাকে মেসেজ করেন। গত বছর শিকাগোতে এই গান নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি, অসামান্য। এই গানের ক্রেডিট হয়তো আমি নিতে পারব না, ইটস আ ওয়র্ক অফ গড। এরপরে 'ভূজ' (অজয় দেবগণ অভিনীত), 'সত্যমেব জয়তে' (জন আব্রাহাম অভিনীত), 'দেড় বিঘা জ়মিন' (প্রতীক গান্ধী অভিনীত), 'মিশন মজনু' (সিদ্ধার্থ মলহোত্র অভিনীত) আসছে। এছাড়া 'গান্ধী টকস' বলে একটি সাইলেন্ট ছবিতে প্রথমবার এ. আর. রহমানের জন্য লিরিকস লিখছি। মিকা সিংহ, আরমান মালিকের সঙ্গে সিঙ্গল আসছে। বাংলাতে ২০১৯-এ তিনটি ছবি করেছিলাম। কিন্তু একটি গানকে একাধিক ভাষায় তৈরি করার রাইটস না দিলে একটু সংশয়ে আছি কাজ করা নিয়ে। আই নিড টু রিটেন দ্য রাইটস। তবে কলকাতায় দু'মাস অন্তরই আসি। বাবা-মা থাকেন এখানে। পুজোর গানের পরিকল্পনা করছি।

## প্রসিত রায়,

পরিচালক
উল্লেখযোগ্য কাজ: পরী, পাতাল লোক, চাকদহ এক্সপ্রেস ইত্যাদি

প্রসিতের প্রথম ব্রেক 'পরী'

পুরোপুরি কলকাতার ছেলে আমি। ছোট থেকেই বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। দাদু (প্রণব রায়) লেখক ও গীতিকার ছিলেন। যদিও দাদুকে আমি কখনও দেখিনি। আমার জন্মের আগেই উনি প্রয়াত হয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে গানবাজনা, বই, সিনেমার মতো বিষয়গুলো নিয়ে সবসময়ই আলোচনা হত। ছোট থেকেই এই বিষয়গুলো আমাকে প্রভাবিত করেছিল। এখন যখন পিছন ফিরে দেখি, মনে হয় আমার কেরিয়ার বেছে নেওয়ার পিছনে ওই প্রভাব নিশ্চয়ই কাজ করেছিল। ছোট থেকেই ভাল ছবি দেখতে ভালবাসতাম। নিজের মতো করে গল্প বলার চেষ্টা ছিল। নব নালন্দাতে পড়তাম। স্কুলও ছিল সংস্কৃতি-ঋদ্ধ। আর কলকাতায় তো প্রত্যেক বাড়িতেই নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখার প্রয়াস থাকে। তবে সিনেমাকে পেশা হিসেবে নেব, এটা মোটামুটি কলেজে পড়ার সময়ে উপলব্ধি করলাম। গল্প শুনতে বা বলতে ভাল লাগত। মনে হল, এফটিআইআই বা এসআরএফটিআই-এর মতো প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে এই বিষয়গুলো শেখা যায়। 'সিটি অফ গড' বলে একটি ব্রাজ়িলিয়ান ছবি দেখেছিলাম। নন লিনিয়ার ন্যারেটিভে যে গল্প বলা যায়, ওই ছবি দেখেই বুঝতে পারলাম। এসআরএফটিআই-তে প্রথমবার সুযোগ পাইনি। অ্যাসিস্ট করতে শুরু করলাম, অল্প সময়ের জন্য। ২০০৭-০৮ নাগাদ মুম্বই শিফট করি। আশুতোষ গোয়ারিকর, বিশাল ভরদ্বাজ, রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরাদের অ্যাসিস্ট করতাম। এরপরে সুযোগ আসে অনুষ্কা শর্মা-কর্নেশ শর্মার প্রযোজনা সংস্থায় কাজ করার। ওঁদের আমার স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়, 'পরী'-তে সুযোগ পাই পরিচালনার। আই ওয়াজ় আ কিড ইন আ ক্যান্ডি

সেটে পরিচালক প্রসিত

স্টোর। এত বড় সেটে এসে পরিচালনা করার অভিজ্ঞতাটাই আলাদা। ‘পরী’র গল্প কলকাতার প্রেক্ষিতে। আমারই জায়গায়! অনুষ্কা-কর্নেশ বরাবর আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রথম ছবি ভীষণ স্পেশ্যাল। ‘পরী’ থেকে ‘পাতাল লোক’ একদম আলাদা। ‘পরী’ অ্যাটমোস্ফিয়ারিক হরর, ‘পাতাল লোক’ থ্রিলার। দ্বিতীয়টি একদমই আমার ডোমেনের নয়। উত্তর ভারতের বুন্দেলখণ্ডের গল্প। চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম যাতে দেখে কেউ না বলে, একজন বাঙালি বানিয়েছে তাই উত্তর ভারতের খুঁটিনাটিগুলো ধরতে পারেনি! বুন্দেলখণ্ডি শিখতে হয়েছিল। প্রথম ছবিতে অনুষ্কা শর্মা, দ্বিতীয় প্রজেক্টে নীরজ কবি, জয়দীপ অহলাওয়াতের মতো সিনিয়র নামী অভিনেতাদের পরিচালনা করতে হলেও, কখনও তা অনুভব করিনি। একটু ইনটিমিডেটিং ছিল অনুষ্কাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে। অল অফ দেম লাভ কোলাবরেশন। ‘পরী’তে বানতলায় বাঁশঝাড়ের ভিতরে শুট করেছি। কাদা, জঙ্গলে ভর্তি। সেখানে অনুষ্কাকে বলতেই ও খালি পায়ে হেঁটেছে। কর্নেশ আমার বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছে। আপাতত ‘চাকদহ এক্সপ্রেস’ নিয়ে ব্যস্ত আমি। এরপরে চাইব জঁর ভেঙে অন্য কিছু করার। তবে বাংলা ছবি করারও ইচ্ছে আছে খুব, ভাল গল্প পেলেই রাজি হব। কলকাতায় বাবা-মা আছেন, বন্ধুরাও আছেন। তাই প্রায়ই আসা-যাওয়া হয়।

অনিকেত মিত্র

## অনিকেত মিত্র

ভিশুয়াল আর্টিস্ট
উল্লেখযোগ্য কাজ: দিল বেচারা, পৃথ্বীরাজ, পন্নিয়ন সেলভান ওয়ান, রামসেতু, চাকদহ এক্সপ্রেস ইত্যাদি

আমি উত্তর কলকাতার ছেলে। শ্যামবাজার এভি থেকে ক্লাস টুয়েলভ কমপ্লিট করি। প্রত্যেকদিন স্কুল ছুটি হলেই আমি কুমোরটুলি চলে যেতাম। উত্তর কলকাতার হাতে আঁকা পোস্টার-সংস্কৃতিও আমাকে প্রভাবিত করে। বাবার সৌজন্যে অনেক সিনেমা দেখেছি। প্রচুর ফেস্টিভ্যালে গিয়েছি। গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে গ্রাফিক ডিজ়াইন অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড আর্ট নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে একটি এমএনসি-তে চাকরি করতাম। রোজকার গতেবাঁধা রুটিনে চাকরি করতে করতে মনে হল, শুধু টাকার পিছনে না ছুটে মনের খোরাক জোগানও জরুরি। এই ভেবে একদিন চাকরি ছেড়ে দিই। পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট ছোট শর্ট ফিল্ম বানাতাম। ‘আতর’ শর্ট ফিল্ম ২০১৭-তে মুম্বইয়ের MAMI ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিলেক্টেড হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের দশজন শর্ট

'পৃথ্বীরাজ'-এর দৃশ্যের স্টোরিবোর্ডিং

ফিল্মমেকারদের বাছাই করে মাস্টারক্লাস করানো হয়েছিল। সেখানে দেখলাম আমি বাদে বাকি সকলেরই ফিল্ম স্কুলের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা কাজের অভিজ্ঞতা আছে। যখন আমাকে বলা হয়, ছবিটি টেকনিক্যালি পিচ করতে হবে, আমি পুরো ছবিটা হাতে এঁকে ফেলি। এক রাতে। অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি, মুকেশ ছাবরা, রনি লাহিড়ী ছিলেন জুরি মেম্বার। তাঁরা আমার আঁকার খাতা দেখেন। আমি বলি, আমার টেকনিক্যাল ট্রেনিং নেই, কিন্তু আমি জানি কী শুট করতে চলেছি। মুকেশ ছাবরা বারবার খাতা উলটে দেখছিলেন। পরে উনি নম্বর নেন আমার। এরপর আমি কলকাতায় চলে আসি, চাকরি ছেড়ে কাজ খুঁজতে থাকি। কলকাতায় বিভিন্ন প্রোডাকশনে হাউজ়ে যাই, কিন্তু কাজ পাচ্ছিলাম না সেভাবে। এরই মাঝে ২০১৭-র শেষদিকে অফার আসে মুকেশ ছাবরার পরিচালনায় প্রথম ছবি 'দিল বেচারা'য় স্টোরিবোর্ড আর্টিস্ট হিসেবে কাজের। আমি তখন বেকার, দু'দিনের মধ্যে মুম্বই চলে আসি। ফেসবুকে এক পরিচিত বন্ধুর ছেড়ে যাওয়া ভাড়াবাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে শুরু করি। 'দিল বেচারার'-র প্রথম থেকে শেষ ফ্রেম অবধি আমি এঁকেছিলাম। সুব্রত চক্রবর্তী, অমিত রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সুব্রতদাই একদিন হঠাৎ করে ফোন করে বলেন যশরাজ ফিল্মসের অফিসে আসতে। 'পৃথ্বীরাজ' (অক্ষয় কুমার অভিনীত)-এ সই করি। এরপরে শ্যাম কৌশলের সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন সকালে ওঁর বাড়ি গেলাম ব্রেকফাস্ট করতে। সেদিনই উনি দু'টো ছবিতে সই করান—মামুট্টির 'মামাঙ্গম' আর মণি রত্নমের 'পন্নিয়ন সেলভান ওয়ান'। 'পিএস ওয়ান'-এ শ্যামস্যরের করা সব অ্যাকশন দৃশ্য আমার আঁকা। 'পৃথ্বীরাজ'-এর পরিচালক ড. চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীর সুবাদেই আমার পরের ছবি 'রামসেতু'তে সুযোগ পাই। 'রামসেতু'তে এক-দেড়বছর কাজ করেছি। অক্ষয় কুমারের লুক, সেটের কনসেপ্ট, অ্যাকশন সিন সব আমার ডিজ়াইন। প্রদীপ সরকারের সঙ্গে প্রচুর বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি। প্রসিত রায়ের 'চাকদহ এক্সপ্রেস' করছি। স্টোরিবোর্ড আর্টিস্ট হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছি। তারপরে কনসেপ্ট আর্টও ডেভেলপ করি। প্রথমে স্ক্রিপ্ট পড়ার পরে পরিচালক আমাকে এক-একটি দৃশ্য বোঝান। সেই অনুযায়ী আমি ফ্রেম বাই ফ্রেম আঁকতে শুরু করি। পুরো ইউনিটের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এই ছবি দেখেই প্রোডাকশন ডিজ়াইনার সেট তৈরি করবেন। কনসেপ্ট আর্টের ক্ষেত্রে, একটা সেট বা সিকুয়েন্সের ভিশুয়াল কেমন দেখতে হবে, কতটা নান্দনিক হবে...এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালক বা টেকনিশিয়ানের ভিশনকে কাগজে নিয়ে আসা আমার কাজ। বাংলা ছবিতে সেভাবে কাজ করিনি। কিন্তু একদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের তরফ থেকে আমাকে যোগাযোগ করা হয়। ওঁর 'সাজঘর' ছবির জন্য স্টোরিবোর্ড করছি আমি। কলকাতায় কম কাজ করি, কিন্তু বুম্বাদাকে না বলতে পারিনি। বাবা আমার এই সাফল্য দেখে যেতে পারলেন না, এটাই আফশোস।

অক্ষয়ের লুকের স্টোরিবোর্ডিং

## রীতা ঘোষ,

প্রোডাকশন ডিজ়াইনার

উল্লেখযোগ্য কাজ: 'সোনচিড়িয়া', 'মান্টো', 'রেড', 'মিশন মজনু' ইত্যাদি

রীতা ঘোষ

আমার জন্ম ও বড় হওয়া অসমের ডিব্রুগড়ের কাছে একটি ছোট্ট শহরে। ছবি আঁকার নেশা ছিল ছোট থেকেই। বরোদার এমএস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমার্শিয়াল অ্যাপ্লায়েড আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করি। এরপরে পুনের এফটিআইআই থেকে প্রোডাকশন ডিজ়াইনিংয়ের কোর্স করি। সেসময়ে একেবারেই কোনও ধারণা ছিল না সিনেমার আর্ট ডিরেকশন বা প্রোডাকশন ডিজ়াইনিং আসলে কী! কিন্তু বুঝলাম, 'আর্ট' সংক্রান্তই তো কিছু একটা হবে, তাই কোর্স করে ফেলি। তারপরেই কাজের সূত্রে মুম্বই শিফট করি। ২০০৯ সাল থেকে মুম্বইতে কাজ শুরু করি। প্রায় ১২ বছর হয়ে গেল এ শহরে! প্রথমে সহকারী শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করতাম। ধাপে ধাপে উঠতে হয় এই পেশায়। সহকারী শিল্প নির্দেশক থেকে শিল্প নির্দেশক, তারপর প্রোডাকশন ডিজ়াইনার। আসলে অনেক টেকনিক্যাল দিক থাকে কাজের। তাই, কাজের ব্যাপারে ভাল করে না জানলে সেটে কোনও বিপদ হতে পারে। বলিউডে প্রথম বড় ব্রেক ছিল 'রাজনীতি' (রণবীর কপূর-ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত)। এখনও অবধি যা কাজ করেছি তার মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জিং বলব অভিষেক চৌবের 'সোনচিড়িয়া' (সুশান্ত সিংহ রাজপুত অভিনীত)। একদম আলাদা পটভূমিতে কাজ করতে হয়েছিল। ওরকম জায়গা, ওরকম পরিস্থিতিতে কাজ করা বেশ কঠিন ছিল। 'মান্টো'র (নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি অভিনীত) কথাও বলব। শীতকালের রিফিউজি ক্যাম্প দেখানো হয়েছিল। শুট করেছিলাম গরমকালে। জুনিয়র আর্টিস্টরা সোয়েটার, কম্বল পরেছিল। ওঁদের দেখে আমি আরও মোটিভেটেড হয়েছিলাম। নন্দিতাদি (দাশ) সবসময় মোটিভেট করত। বলত, 'আমাদের এই ছবি বানাতেই হবে।' এরপরে আসছে 'মিশন মজনু' (সিদ্ধার্থ মলহোত্র অভিনীত), ওটিটি-তে 'বিহার ডায়েরিজ়' আছে। নন্দিতা দাশের আর একটি ছবিও করছি আমি। ওটিটি-তে একটু বেছে কাজ করি, কিন্তু ফিচার ফিল্ম করতেই বেশি ভাল লাগে। মাধ্যম হিসেবে খুব পার্থক্য পাই না। ওটিটি-তে অনেকদিন কাজ করতে হয়, কারণ এক বা একাধিক সিজ়ন। একাধিক এপিসোড। 'বিহার ডায়েরিজ়' করতে গিয়ে সেটা বুঝতে পেরেছি।
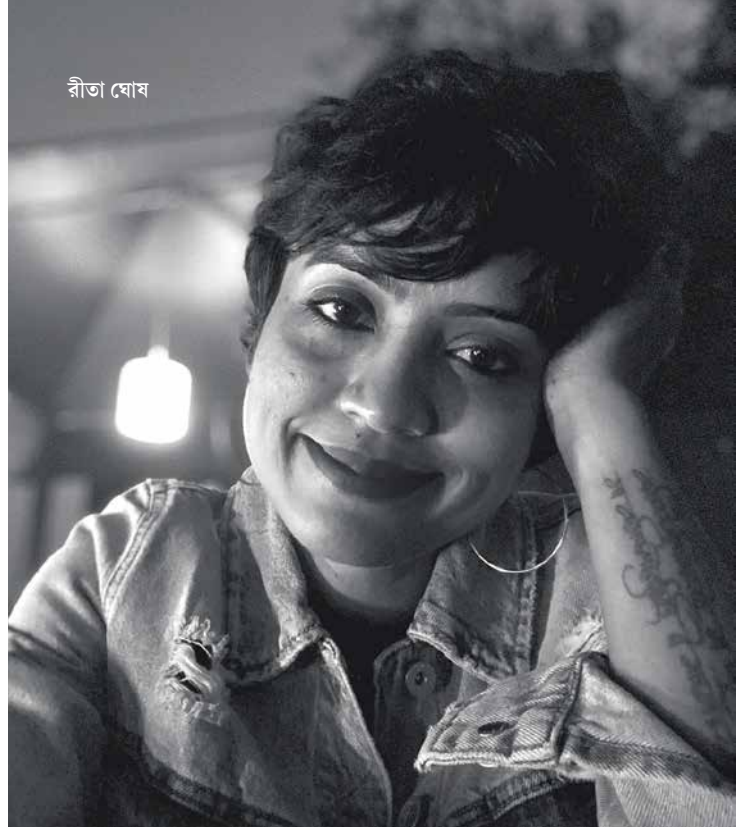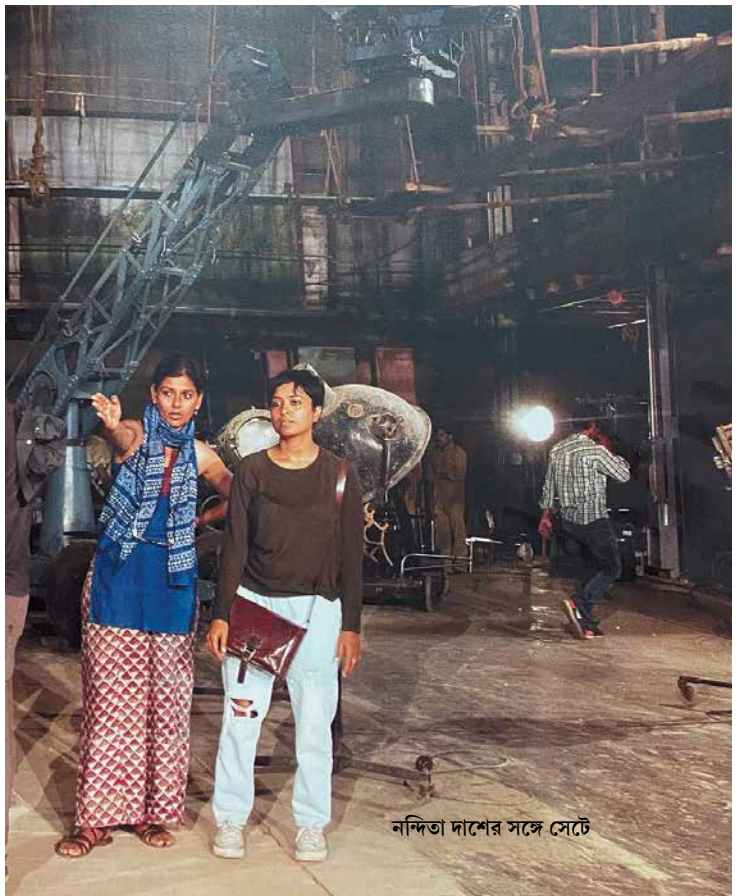
নন্দিতা দাশের সঙ্গে সেটে

আদিল হুসেনের সঙ্গে অভিরূপ বসু

## অভিরূপ বসু,

পরিচালক

উল্লেখযোগ্য কাজ: লালী, মিল ইত্যাদি

কলকাতাতেই জন্ম, বড় হওয়া আমার। স্কুলিং সাউথ পয়েন্টে, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশোনা। ২০১৬ সালে আমার কাছে সুযোগ আসে কান চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়ার। ওই বছরে আমিই সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে কান-এ প্রতিনিধিত্ব করি। একটি ট্যালেন্টস প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে গিয়েছিলাম। ততদিনে টুকটাক শর্ট ফিল্ম বানাতে শুরু করে দিয়েছি। মাত্র ২১ বছর বয়স ছিল। ইট ওয়াজ় আই ওপেনার। অনুরাগ কশ্যপের 'রামন রাঘব' সেবছর প্রদর্শিত হয়েছিল। ওঁর সঙ্গে প্যানেল শেয়ার করতে পারা বিশাল প্রাপ্তি ছিল। সেবছরেই প্রাগ ফিল্ম স্কুলে সুযোগ পাই পড়াশোনা করার। ইউরোপীয় সিনেমা বরাবরই প্রভাবিত করেছে। সত্যজিৎ রায়কে আবিষ্কার করার আগে থেকেই আমি গোদার, ত্রুফো দেখতাম। ভারতীয়-ইউরোপীয় সিনেমা হিসেবে তখন দেখিনি ঠিকই। কিন্তু প্রাগে যখন সুযোগ পেলাম পড়াশোনা করার, তখন মনে হল এতদিনের স্বপ্ন বোধহয় সত্যি হল! দু'বছর মতো ছিলাম ওখানে, পরিচালনা নিয়ে ডিগ্রি পাই ওখান থেকে। ২০১৮-তে ইতালির টাস্কানিতে মাস্টারক্লাস করার সুযোগ পাই। সারা পৃথিবী থেকে ওঁরা ২০জন ছাত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। আমি তারমধ্যে একজন ছিলাম। সপ্তাহান্তে রোমের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শুট করতাম, ইট ওয়াজ় আ সারিয়াল এক্সপিরিয়েন্স। এরপরে দেশে ফিরে প্রথম ছবি ছিল 'মিল', আদিল হুসেনের সঙ্গে। প্রচুর ফেস্টিভ্যালে যায় ছবিটি। ডেনমার্কের 'ওডেনস' ফেস্টিভ্যালে যাই, অনেক দরজা খুলে যায় আমার জন্য। এরপরে পঙ্কজ ত্রিপাঠির সঙ্গে 'লালী' করলাম। ২০১৯-এ উনি তখন নিজের সেরা সময়ে পৌঁছে গিয়েছেন। বললেন, ফোনে স্ক্রিপ্ট শুনতে চান। আমি জোরাজুরি করে মুম্বইয়ে দেখা করলাম। উনি রাজি হলেন, কলকাতায় শুট হল। 'লালী'র শুট করেছি ২০১৮-এ। বয়স তখন আমার ২৪! কোভিড-লকডাউনের জেরে ছবি রিলিজ় হতে চারটে বছর লেগে গেল। আমি যখন গল্প লিখি, কোনও অভিনেতা আমার মনের মধ্যে থাকেন। এখনও অবধি যাঁকে ভেবেছি, তিনিই রাজি হয়ে গিয়েছেন ছবি করতে। গত বছর একটি ছবি করলাম 'গুদগুদি', মুখ্য চরিত্রে রাজশ্রী দেশপাণ্ডে। গুজরাতের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে। গীতাঞ্জলি কুলকার্নির সঙ্গেও একটি ছবি শুট করলাম ('রাইনো চার্জ')। পরের বছর নতুন ফিচার শুরু হবে। তবে, এখনও যেহেতু আমার অত পরিচিতি নেই মেনস্ট্রিম সিনেমায়, আমি হয়তো আন-অ্যাপোলোজেটিক, পলিটিক্যাল ছবি বানাতে পারি। 'গুদগুদি'ই যেমন। স্টুডিও সিস্টেমে ঢুকে পড়লেও শিল্পের স্বাধীনতা থাকবে, সেটাই আশা করি। এর মাঝে আইফোনে একটি ছবির শুট করলাম ('গুড়িয়া'), চারজনের ক্রু নিয়ে, একদিনে। তাও আবার বাংলায়!

'লালী'র দৃশ্যে পঙ্কজ ত্রিপাঠি

একাধিক ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে ছবিটি। সেপ্টেম্বরে আদিল স্যারের সঙ্গে আবার শুট করছি, কলকাতাতেই। ছবিতে প্রথমবার আদিল স্যর একজন সমকামী মুসলিম পুরুষের চরিত্রে, ছবির নাম 'লিপস্টিক'। বেশ কয়েকজন ট্রান্সপার্সনকে আমরা কাস্ট করব। দারুণ সব অভিনেতাদের তরুণ পরিচালক হিসেবে পরিচালনা করতে কখনও অসুবিধে হয়নি। 'মিল'-এর ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক যা ভেবেছিলাম তা-ই পরদায় ফুটে উঠেছে। কারণ, সঠিক কাস্টিং পেয়েছিলাম। বড় অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করলে কাজটা সহজ হয়ে যায় আসলে! পঙ্কজ স্যর, আদিল স্যর পুরোপুরি সেটে সারেন্ডার করে দেন পরিচালকের কাছে।

জিষ্ণু ভট্টাচার্য

## জিষ্ণু ভট্টাচার্য

সিনেমাটোগ্রাফার
উল্লেখযোগ্য কাজ: 'পরী', 'ভেড়িয়া', 'যোদ্ধা' ইত্যাদি

আমার ছোটবেলা কেটেছে অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ি উপত্যকায়। সিনেমাটোগ্রাফি আমার জীবনে অ্যাক্সিডেন্টালি এসে পড়ে! কলকাতায় ফোটোগ্রাফি নিয়ে ডিপ্লোমা করছিলাম। কলকাতায় নানা টুকটাক কাজ করার পরে মুম্বই চলে আসি। আমার বন্ধু ও ডিওপি তুষার কান্তি রায় আর পরমবীর সিংহকে অ্যাসিস্ট করতাম সেসময়ে। কিন্তু বুঝলাম সহকারী হয়ে কাজ করা আমার দ্বারা হবে না! আই ওয়াজ় আ ব্যাড অ্যাসিস্ট্যান্ট। একটি মিডিয়া হাউজ়ে জয়েন করি, সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে ফিচার স্টোরি শুট করতাম। এরপরে একটি চ্যানেলের প্রোমো শুট করার অফার আসে। প্রোমো থেকে প্রথম টিভি বিজ্ঞাপন, তারপর প্রথম ফিচার ফিল্ম...সত্যিই জার্নিটা অসাধারণ। কত কিছু শিখেছি আমি! ২০১৬-য় আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম 'আজ্জি' মুক্তি পায়। ওই বছরেই অনুষ্কা শর্মা-কর্নেশ শর্মার প্রযোজনা সংস্থা 'ক্লিন স্লেট ফিল্মস' থেকে ফোন আসে। পরিচালক প্রসিত রায়ের সঙ্গে দেখা করি। অনুষ্কা শর্মার পরের ছবির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন উনি তখন। ইট ওয়াজ় আ বিগ মোমেন্ট ফর মি। 'পরী'তে ওঁর সঙ্গে কোলাবরেট করতে পারার অভিজ্ঞতা দারুণ। শুটিংয়ের পুরো সময়টা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল, কিন্তু কাজ যখন শেষ হল তখন এক অদ্ভুত ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশন পেয়েছিলাম। ওটিটি-তে 'আজিব দাস্তানস'-এ কাজ করেছি। তার আগে অবধি ওটিটি থেকে নিজেকে খানিকটা সরিয়েই রেখেছিলাম। কিন্তু যখন পরিচালকের সঙ্গে দেখা করার পরে যখন উনি গল্পটা শোনান, আমার গায়ে রীতিমতো কাঁটা দিচ্ছিল। লখনউতে শুটিং হয়েছিল। দুই মাধ্যমের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য হয়তো নেই, তবে আমার মনে হয় বড় পরদায় নিজের কাজ দেখতে পাওয়ার মধ্যে আলাদা পরিতৃপ্তি আছে। ডিওপি হিসেবে ছবির স্কেল আর বাজেটের মধ্যে সামঞ্জস্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ থাকে। যেমন, 'ভেড়িয়া'র (বরুণ ধাওয়ান অভিনীত) কথা বলি। অরুণাচল প্রদেশের জঙ্গলে কয়েক হাজার ঘন পাইন গাছ। তাকে নিরলস আলোকিত করতে হচ্ছে। এদিকে মুম্বইতে আমরা যে খরচে সব পাচ্ছিলাম, এখানে সবই তার দ্বিগুণ! কারণ, ট্রান্সপোর্টেশনের খরচ অনেকটাই বেশি ছিল। পরিচালক অমর কৌশিক চেয়েছিলেন এখানে শুট করতে যাতে অথেন্টিসিটি থাকে। আমরা একটা উপায় বের করলাম। অনেকগুলো বাঁশঝাড় তৈরি করলাম। গাছের উপর কালো দড়ি ঝুলিয়ে তাতে টিউবলাইট ঝুলিয়ে দিলাম। এভাবে চাঁদের আলো তৈরি করা হল। 'ভেড়িয়া' আমার প্যাশন প্রজেক্ট। এই রাজ্যে এতটা সময় কাটিয়েছি, তাই অরুণাচলকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পেরে ভাল লাগছিল। সবসময় যে জটিল ইকুইপমেন্ট লাগে শুটে তাও নয়। পরের বছর অমর কৌশিকের নতুন ছবি করছি। 'পুজা মেরি
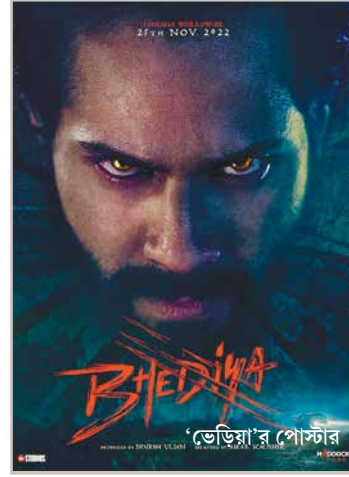
'ভেড়িয়া'র পোস্টার

'ভেড়িয়া'র লোকেশনে

তমাল সেন

জান' (হুমা কুরেশি-মৃণাল ঠাকুর অভিনীত) করব। কলকাতায় মা-বাবা থাকেন। স্ত্রী, সন্তান থাকেন অরুণাচল প্রদেশে। বাংলায় কাজ করারও ইচ্ছে রয়েছে। কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে কথাবার্তাও চলছে।

## তমাল সেন

লেখক
উল্লেখযোগ্য কাজ: মাই, চাকদহ এক্সপ্রেস, কালী ইত্যাদি

কলকাতাতেই জন্ম। বাবা ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। তাই কখনও শিলিগুড়ি, কখনও কলকাতায় কেটেছে ছোটবেলা। বেঙ্গালুরুতে হায়ার স্টাডিজ়ের জন্য গিয়েছিলাম। তারপর ফিল্ম স্কুলের সুবাদে আবার কলকাতায় ফিরে আসা। এসআরএফটিআই থেকে পরিচালনা ও স্ক্রিনপ্লে রাইটিং নিয়ে কোর্স করি। তারপর মুম্বইতে শিফট করি। ২০১১-র ডিসেম্বর নাগাদ। ওখানে সারভাইভ করা বেশ কঠিন ছিল প্রথমে। প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপনের কাজ করতাম। সেকেন্ড এডি, ফার্স্ট এডি-র ধাপ পেরিয়ে নিজে পরিচালনা করতে শুরু করলাম। সেসময়ে কাজ করতে করতে একটা ফিচার ছবির স্ক্রিপ্ট লিখলাম, 'দ্য গিফট'। এনএফডিসি প্রতিবছর একটি প্রোগ্রাম করে যেখানে ওরা ছ'টি স্ক্রিপ্ট বেছে নেয় ও সেগুলোকে মেন্টর করে। 'লাঞ্চবক্স', 'দম লগা কে হইশা', 'লিপস্টিক আন্ডার মাই বুরখা'-র মতো স্ক্রিপ্টও এই প্রোগ্রাম থেকেই বেরিয়েছে। আমার 'দ্য গিফট'-এর স্ক্রিপ্ট ছিল সেবারের তালিকায়। কিন্তু বাজেটের সমস্যা ইত্যাদি কারণে ছবি তৈরি পিছিয়ে যায়। এরপরে আমি অরিত্র সেন আর পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। ওঁদের সঙ্গে ওটিটি-তে আমার প্রথম কাজ 'কালী' (পাওলি দাম অভিনীত)। সিজ়ন ওয়ান পুরোটাই আমার লেখা। এই সিরিজ় লেখার পরেই অতুল মোঙ্গিয়ার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আসে। উনি সেসময়ে অনুষ্কা শর্মা-কর্নেশ শর্মার প্রোডাকশন হাউজ়ের জন্য 'মাই' (সাক্ষী তনওয়ার-রাইমা সেন অভিনীত)-এর কাজ শুরু করছিলেন। আমাকে প্রস্তাব দেন সিজ়ন ওয়ান লেখার। 'চাকদহ এক্সপ্রেস'-এর কাজ চলছে আপাতত। অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। এত বড় ক্যানভাসে একটি ফিচার ফিল্ম করার অভিজ্ঞতা আমার কাছে মনে রাখার মতো। এর বাইরেও একই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে আরও দু'-একটা কাজের কথা চলছে। ক্লিন স্লেট প্রোডাকশন হাউজ় খুবই সাপোর্টিভ বরাবর। কখনও কিছু চাপিয়ে দেয়নি ওঁরা আমার উপরে। কাজ করার পুরো স্বাধীনতা পেয়েছি ওঁদের থেকে। 'মাই'-এর প্রথম দিনে অতুল আমাদের বুঝিয়েছিলেন সিরিজ়ের বেসিক আইডিয়া কী। উনি বলেছিলেন, 'এই অবধি আমি ভেবেছি, এরপর তোমরা ভাবো।' খুব রিওয়ার্ডেড লাগে এরকম কোলাবরেটিভ কাজে। উই ডিসকভারড দ্য ডিটেলস অফ দ্য স্টোরি টুগেদার। ওটিটি আর ফিচারের ক্ষেত্রে লেখক হিসেবে কিছু পার্থক্য আছে। ফিল্মের ডেডলাইন অনেকবেশি ফ্লেক্সিবল। কিন্তু ওটিটি-তে কাজের পদ্ধতি অনেক বেশি অর্গ্যানাইজ়ড। রিলিজ় ডেট ভেবেই রাখা হয় আগে থেকে, তাই বোঝা যায় কতটা সময়ের মধ্যে লিখতে হবে। বা অমুক সময়ের মধ্যে আদৌ লেখা দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণত, একটি সিজ়ন লেখার জন্য ছ'-দশ মাস লাগে। এর চেয়ে কম বা বেশি সময় লাগতেই পারে, কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ, কী ধরনের রিলিজ় স্ট্র্যাটেজি এসবের উপরে ভিত্তি করে। আগামী প্রজেক্টের মধ্যে আমার লেখা কয়েকটি গল্প তৈরিই আছে, যেগুলো আমি নিজে পরিচালনা করতে চাই। কয়েকটি সিরিজ়ের শো রানার ও পরিচালক হিসেবেও বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে কথা চলছে। একটা গল্প লিখেছি, যা বোধহয় বাংলাতেই সিনেমা হিসেবে তৈরি করা সম্ভব।

মাই'-এর পোস্টার

আনন্দ
ফিটনেস ২
ফান-ফিটনেসে
হুলাহুপ
রোজ একঘেয়ে শরীরচর্চা করতে-করতে
ক্লান্ত? স্বাদ বদলে শিখে নিন হুলাহুপিং।
লিখেছেন তিতাস চট্টোপাধ্যায়।
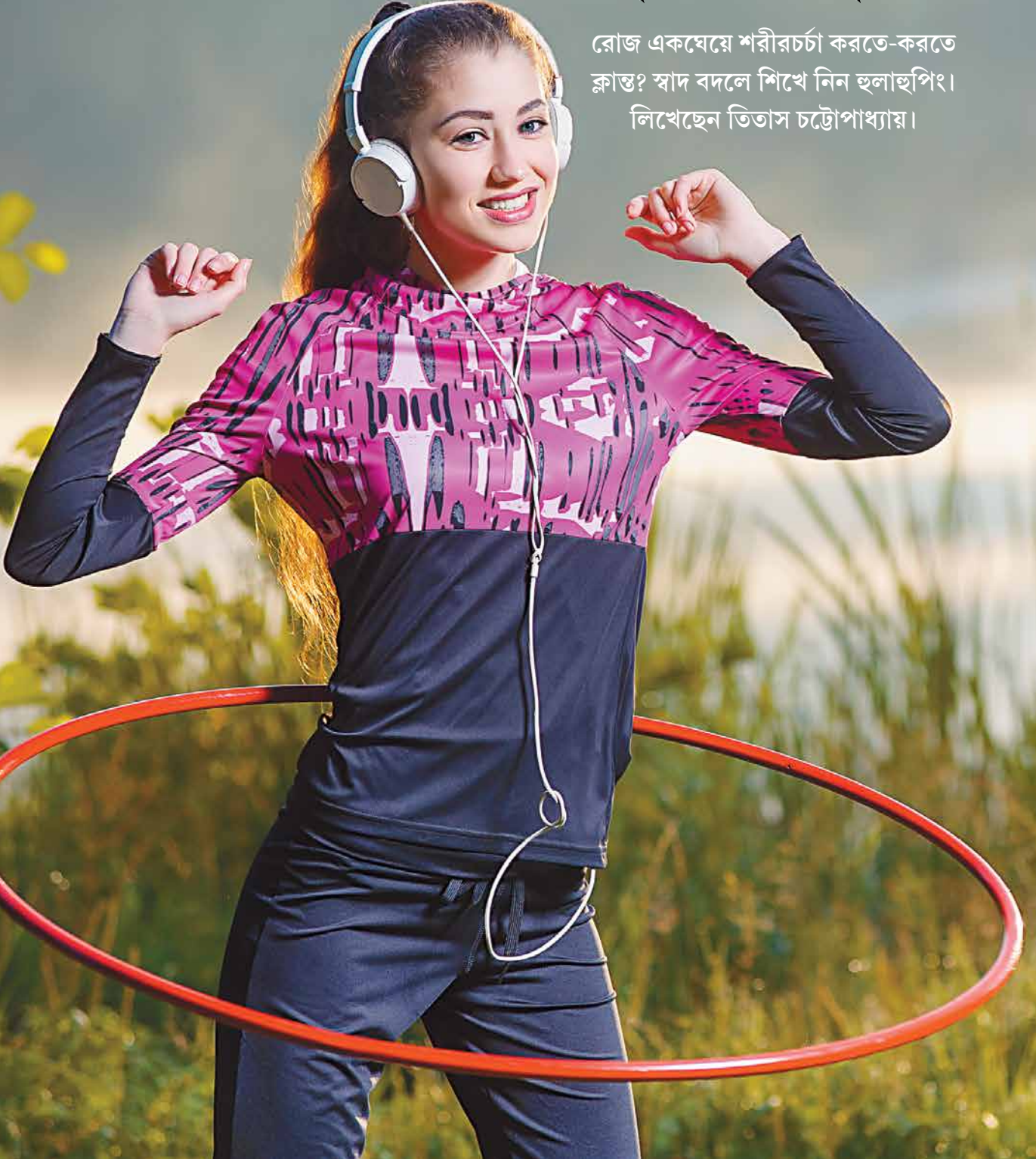
হুলাহুপ। ফিটনেস ফ্রিক যাঁরা, তাঁরা হয়তো এর নাম শুনে থাকবেন। আর যাঁরা শোনেননি, তাঁরা হয়তো ভাবছেন নতুন কোনও শরীরচর্চার কথা বলা হচ্ছে বোধহয়। কিন্তু না। হুলাহুপ একটা প্রাচীন শারীরিক ব্যায়াম পদ্ধতি। এতটাই প্রাচীন যে, কে কবে এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেছিল, বলা মুশকিল। জানা যায় প্রাচীন গ্রিক সভ্যতাতেও শরীরচর্চার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হত হুলাহুপ। হালেও এই শরীরচর্চার মাধ্যমে নিজেকে ফিট রাখেন অনেকেই। রোজ একঘেয়ে শরীরচর্চার মধ্যে অনেকে ঠিকমতো মোটিভেশন খুঁজে পান না। শরীরচর্চা করার সময় যদি ঠিকমতো সেটাকে উপভোগ করা না যায়, তা হলে কিন্তু সেটাই মোটিভেশন না খুঁজে পাওয়ার কারণ হয়। কিন্তু হুলাহুপ এমন একটা শরীরচর্চা, যাতে ব্যায়ামও হয়, আর সেটাকে উপভোগও করা যায়। তাই শারীরিক কসরতের স্বাদবদলের জন্য নিজের ফিটনেস রুটিনে নিয়ে আসতেই পারেন হুলাহুপ।

## কেন করবেন হুলাহুপ?

● আপনার যদি ওজন কমানোর লক্ষ্য থাকে, তা হলে ক্যালরি ঝরাতেই হবে। আর সেক্ষেত্রে হুলাহুপই হতে পারে আপনার সহায়। আমেরিকান কাউন্সিল অন এক্সারসাইজ়ের একটি গবেষণা বলছে, ৩০ মিনিটের এই হুলাহুপই যথেষ্ট বুট ক্যাম্প, কিক বক্সিংয়ের মতো শরীরচর্চার সঙ্গে টক্কর দিতে। আর শুধু তাই নয়, আর একটি রিপোর্ট বলছে, প্রতিদিন এক জন পুরুষ ও এক জন মহিলা যদি হুলাহুপিং করেন, তা হলে সেই পুরুষটি ২০০ ক্যালোরি ও মহিলাটি ১৬৫ ক্যালোরি পর্যন্ত ঝরাতে সক্ষম। বুঝতেই পারছেন, ফিট থাকতে কতটা কাজের হুলাহুপ!

● জিনস কিনতে গিয়ে কোমরের সাইজ়ের জন্য পছন্দের জিনস মিলছে না। কোমর ও শরীরের নীচের অংশ থেকে মেদ কমাতে চান? তা হলে চোখ বুজে আপনার ফিটনেস রুটিনে যোগ করুন হুলাহুপ। বিশেষ করে এই হুপিংটা যদি একটু ওজন নিয়ে করতে পারেন, তা হলে আরও ভাল হয়। একে বলা হয় ওয়েটেড হুলাহুপ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এই ওয়েটেড হুলাহুপিং করে মাত্র ৫-৬ সপ্তাহতেই কমানো গেছে কোমর ও শরীরের নীচের অংশের মেদ, আপনার কোমর হয়ে উঠেছে আরও তন্বী।

● যে কোনও কার্ডিয়োভাসকুলার এক্সারসাইজ় হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। এমনকী শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের মাত্রাও ঠিক রাখে, যার ফলে হৃদ্‌রোগজনিত সমস্যা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হয়। কাজেই একই রিদমে যদি হুপিং করা যায়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই হার্টরেট বাড়বে, ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়বে। পাশাপাশি এই শরীরচর্চা নিয়মিত করলে, তা মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও বাড়ায়। ফলে দৈনন্দিন স্ট্রেস কাটাতেও সহায় হতে পারে হুলাহুপ।

● "হুলাহুপ কেবলমাত্র শারীরিক নয়, মানসিকভাবে ভাল থাকতেও আমাদের সহায়তা করে। এমনিতেই এটা একটা কোর এক্সারসাইজ়, যা নিয়মিত অভ্যাস করলে ফিট থাকা যায়। শরীরও হয়ে ওঠে ছিপছিপে, মেদহীন। রোজ এই শরীরচর্চা অভ্যাস করলে শরীরের মোটর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরে একটা ব্যালান্সও আনে। শরীরচর্চা হিসেবে তো বটেই, এমনকী এটা নাচের এক ধরনের ফর্ম হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে," বলছিলেন হুলাহুপিং ফিটনেস ট্রেনার সুপ্রিয়া শ্রীবাস্তব। শরীরের কোর মাসল ছাড়াও শরীরের নীচের অংশ যেমন কোয়াড্রিসেপস, হ্যামস্ট্রিংস, গ্লুটস এই
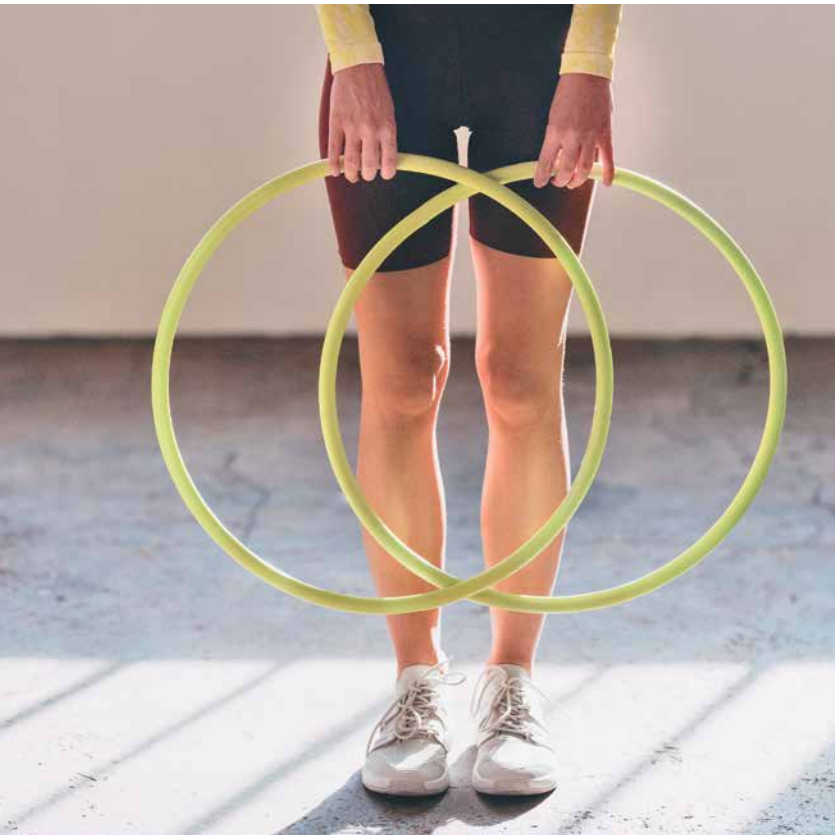
সুপ্রিয়া শ্রীবাস্তব
ছবি: গৌতম কুমার রেড্ডি

পেশিগুলোরও মেদ ঝরাতে সাহায্য করে হুলাহুপ।

## কীভাবে হুলাহুপকে নিজের ফিটনেস রুটিনে আনবেন?

আপনার ফিটনেস রুটিনে ওয়ার্ম আপ হিসেবেই শুরু করতে পারেন হুলাহুপ। তবে প্রাথমিক শুরুর ধাপটা হতে পারে ওয়েস্ট হুপিং, যেটা শরীরের বিভিন্ন কোর মাসলগুলোকে সক্রিয় করে। সুপ্রিয়ার মতে, এটা কার্ডিয়ো হিসেবেও বেশ ভাল। কারণ এটা পরবর্তী যে কোনও ধরনের শরীরচর্চার জন্য অ্যাবসগুলোকে প্রস্তুত করে তোলে। তবে পুরো অভ্যাসটাই নিয়মিত রুটিনে ধীরে-ধীরে আনার চেষ্টা করুন। প্রথমদিকে বেশ কয়েক বার হুপ পড়ে যেতেই পারে, কিন্তু হাল ছাড়বেন না।

## কতক্ষণ ধরে হুলাহুপ করা উচিত?

সুপ্রিয়া শ্রীবাস্তব বলছেন, “এ ক্ষেত্রে এ রকম কোনও ধরাবাঁধা সময় হয় না। কেউ ৫ মিনিটও করতে পারেন, আবার কারও যদি ভাল লেগে যায়, দিনে পাঁচ ঘণ্টাও করতে পারেন। তবে যদি ক্যালোরি ঝরানোই কারও মূল উদ্দেশ্য হয়, তা হলে রোজ ঘড়ি ধরে ৩০ মিনিট করে হুপিং করলেই যথেষ্ট।”

## হুলাহুপের জন্য সঠিক ওয়েট বাছবেন কী করে?

হুলাহুপ করতে একটা ঠিকমতো ওয়েটের দরকার হয়। সেই রকম ওয়েটই বাছা উচিত, যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। আবার খুব একটা হালকা ওজনও বাছা উচিত নয়। তবে যদি কেউ প্রথম শুরু করেন, তা হলে তাঁর ক্ষেত্রে ২০০-৩০০ গ্রাম ওজন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ এর চেয়ে বেশি হলে আহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। শুরুর দিকে হুপের সাইজ় ৩৬-৪২’এর মধ্যে হওয়াই ভাল।

আমেরিকান কাউন্সিল অন এক্সারসাইজ়ের একটি গবেষণা বলছে, ৩০ মিনিটের এই হুলাহুপই যথেষ্ট বুট ক্যাম্প, কিক বক্সিংয়ের মতো শরীরচর্চার সঙ্গে টক্কর দিতে।

## সতর্কতা

- একটানা হুলাহুপ করতে-করতে কোমরে ব্যথা পাচ্ছেন? তা হলে কিন্তু মাঝে-মাঝেই ব্রেক নেওয়া দরকার। যেহেতু শরীরের চার দিকে এই ভাবে কোনও জিনিস ঘোরানোর অভ্যেস আমাদের থাকে না, তাই প্রথম প্রথম বেশিমাত্রায় করলে কালশিটেও পড়তে পারে। তবে এ ছাড়া এই শরীরচর্চা থেকে কোনও রকম বিপদ হওয়ার আশঙ্কা নেই।
- হুলাহুপ করার সময় সোজা থাকার চেষ্টা করুন। কোনওভাবে কোমর থেকে সামনের দিকে ঝুঁকবেন না।
- কারও যদি পিঠে কোনও আঘাত থেকে থাকে, তা হলে হুলাহুপ করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে করাই ভাল।

**তথ্য সহায়তা:** এষণা কুটি
**ছবি:** আইস্টক

# রূপচর্চায় ‘গ্রিন’ মুভমেন্ট

উৎসবের সাজকথায় বোটানিক্যাল বিউটি প্র্যাকটিস ও প্ল্যান্ট-বেসড রূপরুটিনের তাৎপর্য তুলে ধরলেন জনপ্রিয় অর্গ্যানিক বিউটি ব্র্যান্ডের ফাউন্ডার মেঘা আশার। লিখছেন সায়নী দাশশর্মা।

সকলের পরিবেশ-সচেতনতা যত বাড়ছে, ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ‘বোটানিক্যাল’ বা ‘প্ল্যান্ট-বেসড’ রূপচর্চার পদ্ধতি। সহজ ভাষায় বললে, প্রাকৃতিক, ভেষজ উপাদানে সমৃদ্ধ পরিচর্যার রীতি। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, এ আর নতুন কী! আয়ুর্বেদেও তো ভেষজ উপাদানের কথাই বলা রয়েছে। খুব ভুল ভাবেননি ঠিকই, তবে আধুনিক প্ল্যান্ট-বেসড রূপচর্চা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারেই সীমিত নয়। উপকরণ প্রাকৃতিক হওয়ার পাশাপাশি ত্বকে বা পরিবেশের উপর তার কোনও রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা, তা একেবারে খাঁটি রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এবং সর্বোপরি ত্বক ও চুলের সমস্যায় তা কার্যকরী কিনা... এসবকিছুর প্রতিই লক্ষ রাখে এই আধুনিক বিউটি মুভমেন্ট। উৎসবের প্রস্তুতিপর্বে একঘেয়ে রূপচর্চার রুটিন থেকে বিরতি নিতে চাইলে, এই নতুন, পরিবেশ-বান্ধব রূপযজ্ঞে সামিল হতে পারেন। তবে

প্রথমে প্ল্যান্ট-বেসড উপাদানের ব্যবহারবিধি এবং তাদের কার্যকারিতার কথা বিশদে জেনে নিন...

বোটানিক্যাল প্রডাক্ট হলেও, প্রত্যেকের নেপথ্যেই কোনও না কোনও বিজ্ঞান রয়েছে। আধুনিক সব ভেষজ প্রডাক্টই (ভাল গুণমানের) মূলত বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির মিশেলে তৈরি।

## হোলিস্টিক ওয়েলনেসের অঙ্গ

এদেশে সেল্ফ কেয়ার রুটিনে বোটানিক্যাল বা ভেষজ উপাদানের ব্যবহার নতুন নয়। তবে গত পাঁচ-ছ'বছরে এই ধরনের উপাদানের জনপ্রিয়তা অনেকটাই বেড়েছে। এর প্রধান কারণ, ক্রেতাদের সচেতনতা সার্বিকভাবে বেড়েছে। কিছু বছর আগেও কসমেটিক্স বা যে কোনও স্কিনকেয়ার প্রডাক্টের উপাদান বা পরিবেশের উপর তার প্রভাব নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবতেন না। কিন্তু এখন সকলের পরিবেশ-সচেতনতা বেড়েছে, পাশাপাশি ত্বকে কোন উপাদানের প্রভাব কেমন বা তাতে কোনওরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা, সে বিষয়েও সকলে সতর্ক থাকছেন। তাছাড়া ত্বকে বা চুলে ঠিক কোন ধরনের প্রডাক্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়েও আধুনিক ক্রেতারা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। ফলে যেসব উপাদান সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল এবং যা নিশ্চিতভাবে ত্বকের উপকার করবে, তেমন উপাদানই ব্যবহার করতে চাইছেন সকলে। ভেষজ বা প্ল্যান্ট-বেসড উপকরণ যেহেতু নতুন নয়, তাই সহজেই তার উপর ভরসা করতে পারছেন সকলে। তাছাড়া এখন সাস্টেনেবিলিটির কথাও ভাবছেন সবাই। ফলে প্রাণিজ উপাদানের চেয়ে প্রাকৃতিক উপাদানের চাহিদা বাড়ছে। অনেকে মনে করেন, প্রডাক্ট প্ল্যান্ট-বেসড হলেই তা ক্রুয়েল্টি-ফ্রি এবং এথিক্যাল হবে। যদিও সবক্ষেত্রে তা সত্যি নাও হতে পারে।

হোলিস্টিক ওয়েলনেসের কথাও যদি ধরা হয়, তাহলেও প্ল্যান্ট-বেসড উপাদান অন্যান্য উপাদানের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, ইন্টেলেকচুয়াল, স্পিরিচুয়াল এবং ইমোশনাল ওয়েলবিয়িং, এই সবকিছুই

হোলিস্টিক ওয়েলনেসের মধ্যে পড়ে। বায়োলজিক্যালি ভাবলেও, আমরা বরাবরই প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত। সবুজ রং দেখলে যে আমাদের শরীর-মন শান্ত হয় বা চোখের আরাম হয়, এ তো প্রমাণিত সত্য। তাছাড়া আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন বিজ্ঞান, অর্থাৎ আয়ুর্বেদেও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সমাধান হিসেবে প্রাকৃতিক, ভেষজ উপাদানের উল্লেখ রয়েছে। তাই যতই আমরা কৃত্রিম উপাদানের দিকে ঝুঁকি না কেন, প্রাকৃতিক উপাদানের স্থান আমাদের জীবনে চিরন্তন। খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে সৌন্দর্য, সবক্ষেত্রেই আজ প্ল্যান্ট-বেসড উপাদানের বিপুল চাহিদা, 'ভেগান' মুভমেন্টের ঝড় উঠেছে চতুর্দিকে। পাশাপাশি প্রসেসড বা রিফাইন্ড দ্রব্যের নিম্নমুখী চাহিদাও এতে বিস্তর প্রভাব ফেলছে। সবমিলিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সকলের ঝোঁক বাড়ছে প্রাকৃতিক উপকরণ, তথা প্ল্যান্ট-বেসড উপাদানের প্রতি। এবং ভবিষ্যতে যে এই চাহিদা আরও বাড়বে, তা বর্তমান কনজ়িউমার-বিহেভিয়ার দেখে সহজেই অনুমেয়।

## সঠিক উপাদান বাছতে শিখুন

কোনও প্রসাধনী প্রাকৃতিক হলেই যে তা ভাল হবে, তার কোনও মানে নেই। অর্গ্যানিক বা ভেগান বিউটি ব্র্যান্ডের সংখ্যা দিনদিন যে হারে বাড়ছে, তাতে ভাল মানের প্রডাক্ট বাছাও কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেক ব্র্যান্ডই এখন অর্গ্যানিক, প্রাকৃতিক প্রডাক্টের নামে 'গ্রিনওয়াশিং' করছে। 'ন্যাচারাল' তকমা দেওয়া থাকলেই তা প্ল্যান্ট-বেসড বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। যদি কোনও প্রডাক্ট সম্পূর্ণরূপে ভেষজ বা প্ল্যান্ট-বেসড হয়, অর্থাৎ ভেগান হয়, তা ত্বক এবং চুলের পক্ষে ভাল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু 'ন্যাচারাল' উপাদান মাত্রেই যে তা ভেষজ হবে, তা নয়। যেমন, মৌমাছি-প্রাপ্ত মোম বা বিজ়ওয়্যাক্সকে প্রাকৃতিক উপাদান বলা চলে, তবে এটি কোনওভাবেই প্ল্যান্ট-বেসড নয়। একইভাবে 'অর্গ্যানিক' এবং 'প্রাকৃতিক' উপাদানও এক নয়। অর্গ্যানিক এক ধরনের কৃষিপদ্ধতি, যেখানে কোনও কৃত্রিম রাসায়নিক জৈবনাশক, কীটনাশক বা সারের ব্যবহার হয় না। ফলে যে উপাদান বেছে নিচ্ছেন, তা অর্গ্যানিক না শুধু প্রাকৃতিক, তা বোঝা জরুরি। উপাদান সঠিক কিনা, তা বুঝতে কয়েকটা কথা মাথায় রাখুন।

> বায়োলজিক্যালি আমরা বরাবরই প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত। সবুজ রং দেখলে যে আমাদের শরীর-মন শান্ত হয়, এ তো প্রমাণিত সত্য। আয়ুর্বেদেও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভেষজ উপাদানের উল্লেখ আছে।

- **প্রশ্ন করুন:** যে ব্র্যান্ডের প্রডাক্ট কিনছেন, সেই ব্র্যান্ড সম্পর্কে সচেতন হন। সরাসরি তাদের প্রডাক্ট তৈরির পদ্ধতি এবং উপকরণ সম্পর্কে জানতে চান। তারা কোন ধরনের প্রসাধনী তৈরি করছে এবং আপনিও সেরকম প্রসাধনীই চান কিনা, তা নিজের চিন্তাভাবনা দিয়ে বুঝতে হবে।
- **খোঁজখবর করুন:** ইন্টারনেটে বা বন্ধুর থেকে ভাল রিভিউ পেলে তা কিনতেই পারেন। তবে একথাও মনে রাখবেন যে, আপনার ত্বক, চুল বাকি সকলের চেয়ে আলাদা। অনেকসময় ত্বক বা চুলের ধরন এক হলেও একই উপাদান দু'জনের ক্ষেত্রে সমান ফল দেয় না। ফলে কোনও প্রসাধনী কেনার আগে নিজে তার খোঁজখবর নিন। বিশেষত কোনও অ্যালার্জি থাকলে, অবশ্যই দেখেশুনে উপাদান বেছে নিন, সেইমতোই প্রডাক্ট কিনুন।
- **'সার্টিফায়েড' কিনা লক্ষ রাখুন:** কোনও প্রডাক্ট সত্যিই 'অর্গ্যানিক' বা '১০০ শতাংশ প্ল্যান্ট-বেসড' কিনা, তা বোঝার সবচেয়ে

নিরাপদ এবং সহজ উপায় বোতলের গায়ে আঁটা লেবেল ভাল করে পড়ে দেখা। যদি 'সার্টিফায়েড অর্গ্যানিক' বা 'সার্টিফায়েড ক্রুয়েল্টি-ফ্রি' হয়, সেক্ষেত্রে বুঝবেন ঠিক প্রডাক্ট ব্যবহার করছেন।

## কোন সমস্যায় কোন উপাদান?

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, প্ল্যান্ট-বেসড বা বোটানিক্যাল প্রডাক্ট মানে কিন্তু কেমিক্যাল-ফ্রি প্রডাক্ট নয়। কারণ, প্রতিটি প্রাকৃতিক উপাদানেরই কোনও না কোনও রাসায়নিক ফর্মুলা রয়েছে। সেই অর্থে জলও কিন্তু এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান। তাই সেল্ফকেয়ার রুটিন বোটানিক্যাল বা প্ল্যান্ট-বেসড করে তুলতে চাইলে, উপাদানের চেয়েও বেশি জরুরি, তা কোথায় উৎপন্ন হচ্ছে এবং কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা। প্রকৃতিতে কোনও উপাদান যে অবস্থায় বা যে রাসায়নিক গঠনে পাওয়া যায়, তা-ই যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার গুণমান এবং কার্যকারিতা নিয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। এবার আসি উপকরণ এবং তার ব্যবহার-প্রসঙ্গে। ত্বক এবং চুলের জন্য অসংখ্য বোটানিক্যাল বা প্ল্যান্ট-বেসড উপাদান রয়েছে আমাদের চারপাশে, যা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—

- পাকা চুল কমাতে বা প্রি-ম্যাচিওর গ্রেয়িং প্রতিরোধ করতে ভৃঙ্গরাজ বা কেশুতপাতার কোনও বিকল্প নেই। চুল ঘন এবং দ্রুত লম্বা করতেও এই ভেষজ দারুণ উপকারী। এই পাতা তেলে ফুটিয়ে বা বেটে নিয়মিত লাগাতে পারেন।
- রুক্ষ এবং শুষ্ক চুলের সমস্যায় কাজে আসতে পারে যে কোনও প্ল্যান্ট-বেসড বাটার বা নাট বাটার। এছাড়া কোল্ড-প্রেসড প্ল্যান্ট অয়েলও স্ক্যাল্প গভীর থেকে নারিশ করে চুল কোমল এবং নরম রাখতে সাহায্য করবে।
- স্ক্যাল্পের ইরিটেশন বা চুলকানির মতো সমস্যা হলে, তার অব্যর্থ সমাধান নিমপাতা। নিমের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপকরণ খুব কমই রয়েছে প্রকৃতিতে। নিম ছাড়া টি-ট্রি অয়েলও স্ক্যাল্পের ইরিটেশন কমানোর পক্ষে উপযোগী।
- রুক্ষ, নির্জীব ত্বকে নিমেষে জেল্লা এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে হলুদ। এতে থাকে কারকিউমিন নামক শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল নষ্ট করে ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তোলে।
- ত্বকের দৃঢ়তা বাড়াতে এবং ত্বক তরুণ রাখতে কার্যকরী চন্দন। আলফা-স্যান্টাললে সমৃদ্ধ এই বিশেষ উপাদানেরও অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাংগাল ক্ষমতা রয়েছে। পাশাপাশি এটিও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর হওয়ায় ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের ক্ষতির হাত থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

## এক্সপার্ট'স অ্যাডভাইস

### 'প্রাকৃতিক' প্রডাক্ট চেনার উপায়

সঠিক প্রডাক্ট বেছে নিতে, প্রডাক্টের কিছু বিশেষত্বের প্রতি খেয়াল রাখুন।

- সাধারণত সব প্রাকৃতিক প্রডাক্টেরই কোনও 'অ্যাক্টিভেটর' প্রয়োজন হয়। জল বা অন্য কোনও হাইড্রসল ছাড়া সরাসরি তা ত্বকে ব্যবহার করা যায় না।
- এই ধরনের প্রডাক্টের পোটেন্সি বা কার্যকারিতা এতটাই বেশি হয় যে, খুব সামান্য পরিমাণই যথেষ্ট।
- প্রাকৃতিক প্রডাক্টে সারফেকট্যান্টের ব্যবহার খুব কম হয়, ফলে তা চট করে ফেনা তৈরি করতে পারে না। বরং কোমলভাবে ত্বক ও চুল পরিষ্কার করে।
- যেহেতু কৃত্রিম রাসায়নিক বা জল দিয়ে এই ধরনের প্রডাক্ট পাতলা করা যায় না, তাই তাদের ঘনত্বও সাধারণত বেশি হয়। একই কারণে, যে প্রডাক্ট যে ধরনের ত্বক বা চুলের জন্য তৈরি, তা সেই ধরনের ত্বক এবং চুলেই সবচেয়ে কার্যকরী।

করার সময় ত্বক এবং চুলের ধরন এবং প্রয়োজনের কথা মনে রাখা বিশেষভাবে জরুরি।

## ‘প্ল্যান্ট-বেসড’ পরিচর্যার রীতি

দোকানে এখন প্ল্যান্ট-বেসড প্রডাক্টের অসংখ্য অপশন। তবে সুন্দর ত্বক এবং চুল পেতে হলে কেনা প্রডাক্টই একমাত্র ভরসা নয়। চিরন্তন ঘরোয়া উপকরণ দিয়েও নিয়মিত ত্বক ও চুলের যত্ন নিতে পারেন। আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতির জন্যও, কিছু সহজ ডু ইট ইয়োরসেল্ফ রেসিপি জেনে রাখতে পারেন।

অনেকেই মনে করেন, প্ল্যান্ট-বেসড প্রডাক্টের কার্যকারিতা কৃত্রিম কেমিক্যাল-বেসড প্রডাক্টের মতো নয়। এই ধারণা নিতান্তই ভুল। প্ল্যান্ট-বেসড প্রডাক্টের বিপুল জনপ্রিয়তাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

● ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভিটামিন-সি। প্রকৃতির নানা উপাদান থেকে ভিটামিন-সি পাওয়া সম্ভব। লেবু তার মধ্যে অন্যতম। ভিটামিন-সি শুধুই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট নয়, এটি ত্বকের বয়স প্রতিরোধক হিসেবেও অত্যন্ত কার্যকরী। উৎসবের মরশুমে যাঁরা চেহারায় উজ্জ্বলতা আনতে চাইছেন, তাঁদের পক্ষেও এই ভিটামিন আদর্শ।

● লেবু ছাড়া ভিটামিন-সি-এর আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ-উৎস হল কাকাডু প্লাম। বলা হয়, এই প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেই ভিটামিন-সি-এর মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া এতে রয়েছে গ্যালিক এবং ইল্যাজিক অ্যাসিড, যা মেচেতা এবং অন্যান্য দাগছোপ কমিয়ে ত্বক ইভন টোনড রাখতে সাহায্য করে।

● আর-একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হল কফি। এটি অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান হিসেবেও জনপ্রিয়। কফির ক্যাফেন ত্বক ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে এবং সর্বোপরি ত্বকের দাগছোপ প্রতিরোধ করতে অব্যর্থ।

এর বাইরেও অসংখ্য চেনা প্ল্যান্ট-বেসড বা প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, যা রোজকার পরিচর্যার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে অনায়াসেই। তবে, তা রুটিনে সামিল

● একটা পাকা কলা চটকে নিন। ওতে ১/৪ চা-চামচ খাঁটি হলুদগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ ফেসমাস্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। নিমেষে ত্বকে লাবণ্য এনে দেবে ভিটামিন এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টসে সমৃদ্ধ এই মাস্ক। যদি কলা বা হলুদ ব্যবহার করতে না চান, সেক্ষেত্রে আর্গান অয়েল এবং অ্যাভোকাডোর ক্বাথ মিশিয়ে নিন। অথবা হোহোবা অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন নিয়মিত। ত্বক মুহূর্তের মধ্যে নরম হবে এবং দীপ্তিতে

উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

● যদি তৈলাক্ত প্রকৃতির ত্বক হয়, পুদিনা পাতা, শসা এবং অ্যালোভেরার মিশ্রণ হালকা ময়শ্চারাইজ়ারের কাজ করবে। ত্বক তরতাজা হবে, আবার তেলতেলেভাবও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

● গোলাপ জলের মতো চিরন্তন উপকরণকে তুচ্ছ ভাববেন না যেন! গোলাপ জলের মতো ভার্সেটাইল প্ল্যান্ট-বেসড উপকরণ খুব কমই রয়েছে। মুলতানি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে খুব ভাল ক্লেনজ়ারের কাজ করবে গোলাপ জল। ১৫-২০ মিনিট ত্বকে লাগিয়ে রাখতে হবে শুধু। দেখবেন, ত্বকের সব অশুদ্ধি এবং ধুলোবালি নিমেষে দূর হবে। ত্বকের পিএইচ ব্যালান্সও বজায় থাকবে।

● পাকা পেঁপেও প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে ভীষণ উপযোগী। পেঁপের প্যাপাইন উৎসেচক এক্সফোলিয়েটর হিসেবে খুব কার্যকরী। তাই ট্যান পড়া ত্বকের পক্ষে পেঁপে খুব উপকারী। ১ টেবলচামচ পেঁপের ক্বাথ ১ টেবলচামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মুখে বা শরীরের ট্যান পড়া অংশে লাগান। ১৫-২০ মিনিট পর ধুয়ে নেবেন। জলের সঙ্গে সঙ্গে ট্যানও চিরতরে বিদায় নেবে!

● রান্নায় আলু প্রায় প্রতিদিনই ব্যবহার করেন সকলে। খোসা ছাড়ানোর পর সেগুলো ফেলে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন। আলুর খোসা ত্বক মসৃণ এবং কোমল করে তোলার ক্ষমতা রাখে। উজ্জ্বলতাও বাড়ায়। তাই চোখের কালি দূর করার পক্ষে ভীষণ ভাল। সদ্য ছাড়ানো আলুর খোসা বা আলুর টুকরো সরাসরি চোখের নীচে রাখুন। আলুর রস বের করে তা-ও তুলোয় করে লাগাতে পারেন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে উপযুক্ত টোনার এবং ময়শ্চারাইজ়ার বা ফেশিয়াল অয়েল লাগিয়ে নিন।

● চটজলদি স্পট ট্রিটমেন্ট চান? এক্ষেত্রেও চোখ বুজে ভরসা রাখতে পারেন নিমের উপর। কয়েকটা নিমপাতা জলে ভিজিয়ে নিন, যাতে নরম হয়ে যায়। তারপর বেটে অ্যাকনের উপর লাগান। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। অ্যাকনের লালচে এবং ফোলাভাব অনেকটাই কমে যাবে।

পরিশেষে বলি, ধৈর্য্য হারাবেন না। হয়তো এমন উপকরণ বেছে নিলেন, যা আপনার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয় এবং তা থেকে কোনও ফলই পেলেন না। বা হয়তো কোনও উপকরণ থেকে অ্যালার্জির সমস্যা হল। এতে যদি প্ল্যান্ট-বেসড উপকরণের উপর থেকেই ভরসা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে চলবে না। মনে রাখবেন, কোনও উপকরণই সকলের ত্বকে বা চুলে সমান প্রভাব ফেলে না। তাই কোনও উপাদান পুরোপুরি বাতিল করার আগে একটু সময় দিন। অ্যালার্জি রয়েছে কিনা, তা জানতে প্যাচটেস্ট করুন। এতে কোন ফর্মুলেশন প্রকৃতপক্ষে আপনার জন্য আদর্শ, তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

আসন্ন উৎসবের দিনগুলো আরও সুন্দর হয়ে উঠুক সকলের, শুভেচ্ছা রইল!

**তথ্য সহায়তা:** জুসি কেমিস্ট্রি
**ওয়েবসাইট:** www.juicychemistry.com

**মডেল:** শ্রীলগ্না, মুনমুন, **মেক-আপ:** নবীন দাস **ফোন:** ৯৮৩১২৩৩৬১৮ , **পোশাক:** কিয়ারা সেন, **ফোন:** ৯০৫১৪৭৩৬০৬ **লোকেশন:** ক্লাব ভর্দে ভিস্তা, **ফোন:** ০৩৩ ২৪২৩৯৯০০, **ছবি:** সোমনাথ রায়

# পুজোয় Popup Trend

পুজোর দিনগুলোতে প্রকৃতির মতো ফ্যাশনেও থাকুক হরেক রঙের ছোঁয়া! এমনই কিছু পপআপ কালার ট্রেন্ডে সাজলেন অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। ক্যানভাস সাজালেন মৌমিতা সরকার।

গোলাপি রং মানেই প্রেম, প্যাশন, নস্ট্যালজিয়া। তাই পুজোর সাজে পোশাক ও মেক-আপেও গোলাপি রঙের ছোঁয়া। পোশাক: সাস্যা

পুজো মানেই চারিদিকে ঝলমলে রঙিন আলো। অলওভার পপআপ মাল্টিকালার্ড সিকুইনের কাজ করা পোশাকে ফেস্টিভ ভাইবস।

**পোশাক:** হর্ষবর্ধন জালান
**ফোন:** ৯৯০৩৩৭১৮৩০

পেঁজা তুলোয় ভরা শরতের নীল আকাশ। পোশাকেও যেন তারই আভাস। ডিপ নেকলাইনের ক্রিসক্রস প্যাটার্নের টপ। সঙ্গে সাদা সাইড স্ট্রাইপড নীল ট্রাউজ়ার্স। সাদা স্টিলেটোয় কমপ্লিট লুক।

পোশাক: সাস্যা
ফোন: ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩

সুন্দর প্রকৃতি ও সুস্বাস্থ্যের প্রতিচ্ছবি সবুজ রং। শারদ উৎসবে প্রকৃতি যেমন সুন্দর করে সেজে ওঠে, তেমনই স্নিগ্ধ সবুজের ছোঁয়া পোশাকে। স্ট্র্যাপি হল্টার নেক ড্রেসে পুজোর আবহে সেজেছেন সৌরসেনী।

পোশাক: সাস্যা

মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: গিনি হালদার
ফোন: ৭৪৩৯৭০৩৬২০
স্টাইলিং ও গয়না: মাধব
ফোন: ৯৮৭৫৩৭৬৯৭৮
ছবি: সোমনাথ রায়

# সাফল্য আসলে একটা আপেক্ষিক শব্দ

প্রায় পঞ্চাশ বছরের সফল কেরিয়ার, ঈর্ষণীয় কাজের পোর্টফোলিয়ো। ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনার,আর্কিটেকচারাল রেস্টোরার ও আসবাব-শিল্পী সুনীতা কোহলির সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

**লাহোরে জন্মেছেন, বড় হওয়া লখনউতে। সারা বিশ্ব ঘুরেছেন। বিভিন্ন দেশ ঘোরা, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা আপনার ডিজ়াইনকে কতটা প্রভাবিত করেছে?**

লাহোরে জন্মেছিলাম। দেশভাগের ঠিক আগের সময়ে। লখনউয়ে বড় হয়েছি। লাহোর ছেড়ে আসার সময়ে উদ্বাস্তু হিসেবে হয়তো অন্য কোনও রাজ্যেও থাকতে পারতাম আমরা। কিন্তু আমার বাবা লখনউকে বেছে নেন। কলেজছাত্র হিসেবে উনি একবার এসেছিলেন লখনউয়ে। ওঁর মনে হত, এ শহরেও লাহোরের মতোই আভিজাত্য আছে। ১৯৯৪ সালে আমি প্রথম লাহোর যাই। আমার স্বামী, তৎকালীন আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। আই ওয়াজ় স্টান্ড বাই দ্য বিউটি অফ লাহোর। এমন আভিজাত্য, আতিথেয়তা, চার্ম...মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর দুই শহরেই ভাল খাবারকে গুরুত্ব

১৯৯২-তে কলকাতার ওবেরয় গ্র্যান্ডে মাদার টেরিজ়ার হাত থেকে মহিলা শিরোমণি সম্মান নিচ্ছেন

১৯৯২-তে রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্মশ্রী পুরস্কার নিচ্ছেন সুনীতা

দেন মানুষরা। আমি নানা দেশ ঘুরেছি বলে, বিভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি বলে তা আমার ডিজ়াইনকেও প্রভাবিত করেছে। মাল্টিকালচারালিজ়ম একজনের 'ভিশুয়াল ভোকাবুলারি'তে সংযোজন ঘটায়। শুধু বিদেশ নয়, ভারতের মধ্যেও আমি আর্কিয়োলজিক্যাল ও আর্কিটেকচারাল জায়গায় ঘুরতে যেতে পছন্দ করি। কোভিডের আগে একবার রায়পুরে গিয়েছিলাম, 'লখনউ কুকবুক'-এর লঞ্চ উপলক্ষে। সেখানে সিরপুরে সাতের শতকের লক্ষ্মণ মন্দিরে যাই। কলকাতাতেও যখন এসেছিলাম, বিষ্ণুপুরে গিয়েছি। দু'জায়গাতেই ইটের কাঠামোগুলো বেশ দেখার মতো!

**আপনি যখন পেশাদার ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিং শুরু করেছিলেন, প্রায় কেউই এদেশে এ বিষয়টি নিয়ে জানত না! নতুন পথ মাড়াবেন, একটুও ঝুঁকি মনে হয়নি?**

> লখনউয়ে আমার বড় হওয়া, বাবা-মায়ের প্রভাব এই দুই বিষয় ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিংয়ের প্রতি আমার ভালবাসা জাগায়। লখনউয়ে অ্যান্টিকের দোকানে অসামান্য জিনিস পাওয়া যেত।

অন্যদের কথা কী বলব, আমি নিজেও জানতাম না বিশেষ (হাসি)! তাই ঝুঁকিপূর্ণ পেশা কি না, তা নিয়ে ভাবারও প্রশ্ন ছিল না। ইট ওয়াজ় নেভার আ কেরিয়ার চয়েস। পরিকল্পনা ছাড়াই এই পেশায় এসেছিলাম। কিন্তু আমি খুশি তার জন্য। লখনউয়ে আমার বড় হওয়া, বাবা-মায়ের প্রভাব এই দুই বিষয় ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিংয়ের প্রতি আমার ভালবাসা জাগায়। লখনউয়ে সেসময়ে অ্যান্টিকের দোকানে অসামান্য সব জিনিস পাওয়া যেত। কলকাতাতেও। তালুকদারি বেল্ট সেসময়ে লখনউ থেকে কলকাতা অবধি বিস্তৃত ছিল। দুই শহরই তাই হেরিটেজে ঋদ্ধ ছিল। আমার প্রথম চাকরি ছিল লরেটো কলেজে পড়ানোর, সেটাও পরিকল্পনামাফিক হয়নি। বই লেখার বিষয়টিও যেমন হয়ে গিয়েছিল, না-ভেবেচিন্তেই। তাই, অনেককিছু আনপ্ল্যানড ছিল আমার জীবনে...আমি খুশি যে সেই সবকিছুই হয়েছে।

**প্রথম এমন কোন প্রজেক্টের কথা বলবেন, যা আপনাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল যে আপনার সামনে সফল কেরিয়ারের রাস্তা খোলা?**

খাজুরাহোর ওবেরয় হোটেল। আমার প্রথম বড় প্রজেক্ট। ১৯৭৫-৭৬ সালের কথা। খাজুরাহোয় সেসময়ে মন্দিরের চারপাশের ব্যারিকেডিং, এত ধরনের দোকান... এসব কিছুই ছিল না। থাকার জায়গাও

ছয়ের দশকের লখনউ থেকে সংগৃহীত অ্যান্টিক ল্যাম্প, সঙ্গে মরক্কোর অ্যামোনাইট

সুনীতা কোহলির বাড়ির লিভিং রুম, দেওয়ালে উনিশ শতকে নাথওয়াড়া পিছওয়াই শিল্পকলা

সেভাবে ছিল না। এই কাজ খুব ভালভাবে গৃহীত হল। এখানে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম। এই কাজের সূত্রেই মিশরেও কাজ পাই। শুরুর দিকে আসবাব সংগ্রহ করতাম। ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারিং আমার শুরুর দিকের কেরিয়ারের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল। ১৯৭১-এর পরের কথা বলছি। কেউ কেউ আমাকে বলতেন, ভবিষ্যতের জ্যানিস ক্রুফট। এক প্রখ্যাত সাংবাদিক আমার তুলনা করেছিলেন প্যারিসের এক নামী ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনারের সঙ্গে। যা-ই হোক, আমি মন দিয়ে কাজটা করতাম। সংগীতশিল্পীদের মতোই ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনারদেরও ভগবান-প্রদত্ত 'হুনর' থাকতে হয়।

**বিয়ের পরে আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে পুরনো আসবাবের দোকানে ঘুরতেন। অ্যান্টিক আসবাবের খোঁজে। স্থাপত্য-শিল্পী হিসেবে শুরু কি সেখান থেকেই?**
পরিকল্পনামাফিক নয়, তবে বাই চান্স আমি একজন অ্যান্টিকোয়েরিয়ন হয়ে গিয়েছিলাম। সে সময়ে অরিজিন্যাল সব ব্র্যান্ডের অয়েল ল্যাম্প পাওয়া যেত, যা সহজেই ইলেকট্রিক্যাল ল্যাম্পে রূপান্তরিত করা যেত। উনিশ শতকের অরিজিনাল সব আসবাব পাওয়া যেত। আগেই বললাম, লখনউ সেসময়ে তালুকদারি বেল্টের অন্তর্গত ছিল। তালুকদারদের একাধিক বাড়ি থাকত। ব্রিটিশদেরও মুসৌরি বা দেরাদুনের মতো জায়গায় বাড়ি থাকত। আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের পরিবারের এই দুই জায়গাতেই বাসস্থান ছিল। তাই আমিও পরিচিত ছিলাম এই দুই শহরের সঙ্গে। এখানে ছোট ছোট অনেক দোকান ছিল, অ্যান্টিক শপের। ১৯৭২ থেকে আসবাব বানানো, ল্যাম্পস বিক্রি করা শুরু করি। একবার আমার এক বন্ধু নীলম খন্নার উদ্যোগে এক প্রদর্শনী হয়েছিল। সব বিক্রি হয়ে গিয়েছিল আমার সামগ্রী! প্রায় ৫০ বছর হয়ে গেল আসবাব বানানোর ক্ষেত্রে। ইট্স ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ইন দ্য কান্ট্রি। আমার মেয়ে কোহেলিকা একজন স্থপতি, আবার ট্রেন্ড কার্পেন্টারও। শি ইজ় ইনোভেটিভ, ক্রিয়েটিভ অ্যাজ় অ্যান আর্কিটেক্ট। ক্লাসিক্যাল, কলোনিয়াল ফার্নিচার, আর্ট ডেকর সবধরনের স্টাইল নিয়ে কাজ করি।

**এত দীর্ঘ কেরিয়ারে এত সাফল্য। দেশ-বিদেশে খ্যাতি। তবুও রোজ নিজের কাজকে ভালবাসার মন্ত্রটা কী? একটুও একঘেয়ে লাগে না কখনও?**

জানি না এতটা সফল কি না! সাফল্য আসলে একটা আপেক্ষিক শব্দ। হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে একাধিক আইকনিক বড় প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আর নিজের কাজকে কীভাবে প্রতিদিন উপভোগ করি? আমার পেশাটাই তো এমন। খুব ইন্টারেস্টিং! একঘেয়েমির কোনও জায়গাই নেই। প্রতিদিনই নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন কোনও অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ। রোজই নতুন কিছু শেখার সুযোগ। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে অবশ্য অনেক বন্ধুকে আমি বলি, 'ইন নেক্সট লাইফ আই ওয়ান্ট টু বি আ লেডি অফ লেজ়ার'।

**আর্কিটেকচারাল কনজ়ার্ভেশন নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। এ ব্যাপারে একটু বলুন...**

একাধিক আইকনিক পাবলিক বিল্ডিংয়ের রেস্টোরেশনের কাজ করেছি আমি। ১৯৮২-তে হায়দরাবাদ হাউজ় আর রাষ্ট্রপতি ভবনের একটা অংশ রেস্টোর করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। রানি এলিজ়াবেথ সেসময়ে কমনওয়েলথ কনফারেন্স উপলক্ষে ভারতে আসছিলেন। এছাড়া দিল্লির ওবেরয় হোটেলের পাঁচটি তলা নির্মাণ করি, যেখানে ডেলিগেটদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৮২ থেকে '৮৫ অবধি রাষ্ট্রপতি ভবনের সংস্কারের কাজ করি। ১৯৮৯-তে হায়দরাবাদ হাউজ়ের কাজে মগ্ন ছিলাম। ওই আইকনিক বিল্ডিংগুলির অ্যাটিক থেকে বেসমেন্ট অবধি সামগ্রিক সংরক্ষণ করেছিলাম। ১৯৮৫ নাগাদ পার্লামেন্ট হাউজ়ের আংশিক সংরক্ষণের কাজও করি। ক্যাবিনেট হাউজ়, প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন (তখন ৫ নম্বর রেসকোর্স রোড ছিল ঠিকানা) সবেরই কনজ়ার্ভেশনের দায়িত্বে ছিলাম। ২০০৪-এ প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের বাসভবনেও কাজ করি, ৩ নম্বর রেসকোর্স রোড ঠিকানায়। ২০০৪-২০০৮ অবধি রাষ্ট্রপতি ভবনের কাজও করেছি, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভিজ়িটের প্রাক্কালে। এই কাজটির প্রেক্ষিত একটু বলি। সরকার একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি (হাই পাওয়ার্ড কমিটি) গঠন করেছিল, যাঁদের সংসদে জবাবদিহি করতে হত। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, আমি প্রজেক্টের যাবতীয় ড্রয়িং ও পরিকল্পনা করব। ১৯৮৬-তে বেঙ্গালুরুর সন্নিকটে SAARC বৈঠকের জন্য হেডস অফ স্টেটসের রিট্রিটের একটি বিশেষ জায়গার নির্মাণকাজ শেষ করতে হয়েছিল তিন মাসের মধ্যে। বেঙ্গালুরুর
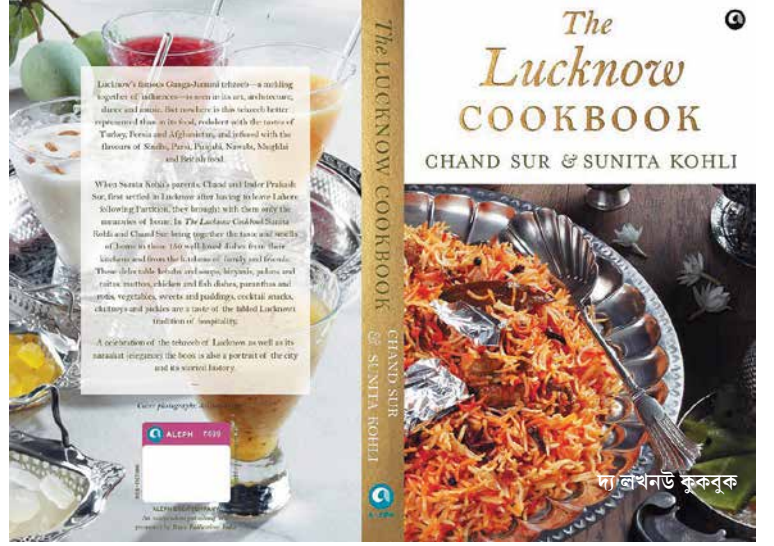
দ্য লখনউ কুকবুক

দিল্লির লুটইয়েনস বাংলো জ়োনের রেসিডেন্সের এন্ট্রান্স

মিশরের লাগজ়ারি নাইল ক্রুজ়ারে দ্য ওবেরয় ফাইলাই-তে সেকুলার অন্দরসাজ

আমি মাল্টিটাস্কার নই। এক সময়ে একটি কাজেই মনোযোগ দিতে পারি। হয়তো অনেকে আমাকে মাল্টিটাস্কার ভাবেন, কারণ প্রায় আধ ডজন প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করি বলে।

কাছেই কাবান পার্কে ছিল এটি, ম্যাসিভ মনোলিথিক গ্র্যানাইট আউটক্রপিংয়ের উপরে। খুবই অরক্ষিত, অনাদরে পড়েছিল জায়গাটি। মেঝে ভেঙে গিয়েছিল, বাথরুম ছিল না। ইট ওয়াজ় আ ম্যাসিভ প্রজেক্ট টু বি ডান অ্যান্ড ডেলিভার্ড অন টাইম। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য রাষ্ট্রনেতার আসার সময় ছিল ন'টা। আমি প্রজেক্ট ডেলিভার করি ভোর চারটে নাগাদ! একজন স্থপতি বা ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনার দীর্ঘদিন ধরে যে কাজটি করেছেন, তার কনজ়ার্ভেশনের নেপথ্যে থাকে প্রচুর গবেষণা।

**রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর অফিস-সহ একাধিক বড় প্রজেক্টের পরিকল্পনা থেকে এগজ়িকিউশন... নেপথ্যের গল্প একটু বলুন না...**

রিসার্চ, রিসার্চ অ্যান্ড রিসার্চ। আর তারপর সেই গবেষণাকে সৃজনশীল পদ্ধতিতে ব্যবহার করে নিরলস পরিশ্রম করা। যেমন ধরুন, সাউথ ব্লকের ক্ষেত্রে দেওয়ালের ভিতরের ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং বা প্যাসেজে ফ্ল্যাগস্টোন ফ্লোরিং ছাড়াও সাত মিটার দীর্ঘ পাইপ ছিল। ইট ক্যারিজ় উইথ ইট অল দ্য ওয়্যারিং। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সেসব পরিষ্কার করা হয়নি। মাকড়সার জালে ভর্তি সেই পাইপ পরিষ্কার করা, ডেড ওয়্যার সরিয়ে দেওয়া...এসবও কিন্তু কনজ়ার্ভেশনের অঙ্গ। ফ্লোরিংয়ের নীচে কী আছে, দেওয়ালের ভিতরের ওয়্যারিং কী অবস্থায় আছে...এসবও পরিশ্রমসাপেক্ষ। খুব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। আর্কিটেকচারাল কনজ়ার্ভেশন নিয়ে আর একটি কথা বলি। পিএমও আর মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে একটি বিশাল কোর্টইয়ার্ড ছিল। এই জায়গাটিকে নানা কাজে ব্যবহার করা হত, ড্রাইভারদের থাকার কটেজও এখানেই ছিল। ওঁদের থাকার বিকল্প ব্যবস্থা করে আমি কোর্টইয়ার্ডকে নতুন রূপদান করি। প্রায় ৫০ বছর আগের কথা এটি। হায়দরাবাদ হাউজ়ের দু'টি কোর্টইয়ার্ডে ঘাস ছিল, মথে খাওয়া লনের মতো দেখতে লাগত! লাটইয়েনস, হায়দরাবাদ হাউজ়ের ডিজ়াইনে যে মেটেরিয়াল ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলোই আমি এখানে ব্যবহার করি। ইট সিমড দে হ্যাভ বিন দেয়ার ফরএভার। নায়লা ফোর্টের কোনও জানলা, দরজা, কোর্টইয়ার্ড ছিল না। রাজপুত স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল এই ২০০ বছরের পুরনো ফোর্ট। প্রচুর পড়াশোনা করি, তারপর দরজা, জানলা, কোর্টইয়ার্ড সব গড়ে তুলি।

**কলকাতায় অনেকবার এসেছেন। এই শহরের সঙ্গে আপনার স্মৃতি কীরকম?**

হ্যাঁ, অনেকবার কলকাতায় গিয়েছি। প্রায় প্রতিটি ট্রিপই স্মৃতিমেদুর করে তোলে। 'লখনউ কুকবুক'-এ (আমি আমার মায়ের সঙ্গে লিখেছি) একটি চিঠির কথা আছে। ৩০ অক্টোবর, ১৯৪৭-এ বাবা আমার মাকে লিখেছিলেন চিঠি। বইয়ের ইন্ট্রোডাকশনের অংশ এটি। মা সেসময়ে রায়পুরে

ছিলেন, দেরাদুনের কাছে। আমার দাদু পাকিস্তানের কোয়েটা ছেড়ে এসেছিলেন, হাতে প্রায় কোনও অর্থ ছিল না। এই বাড়িতে এসে ওঠেন, এখানে ভাড়া খুব কম ছিল। কারণ, বাড়িতে জলের ব্যবস্থাও ছিল না! আমার মাসিও পরে লখনউয়ে থাকতে শুরু করেন। দেশভাগের আগে মাসির বিয়ে হয়েছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারে। লাহোর থেকে এদেশে আসার মাঝে তাঁর প্রথম সন্তানের মিসক্যারেজ হয় যায়। আমার বাবা এই চিঠিতে লেখেন, আমাকে, মাসিকে সকলকে নিয়ে তিনি কলকাতায় যাবেন। দেরাদুনে রিফিউজি পরিবেশ থেকে একটু নিস্তার পাব আমরা। ১৯৪৭-এর বড়দিনে সেটাই আমার প্রথম ট্রিপ ছিল কলকাতায়। আমার বাবার এক বন্ধু ছিলেন, কলকাতায়। ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাল বন্ধুত্ব। এরপরে রাজভবনের ডকুমেন্টেশনের জন্য কলকাতায় গিয়েছি। ওবেরয় বলরুমে আমাকে মহিলা শিরোমণি পুরস্কার দেওয়া হয়। কার হাত থেকে নিয়েছিলাম জানেন? স্বয়ং মাদার টেরিজ়া! দু'বার কলকাতায় গিয়েছি সাহিত্য উৎসবে। মেয়েরা যখন ছোট ছিল, ইকুয়েস্ট্রিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য টলি ক্লাব ও ফোর্ট উইলিয়ামসেও এসেছি। বড় মেয়ের প্রতিযোগিতার সময়ে প্রায় ফ্যামিলি হলিডে-ই ছিল বলতে পারেন। আমার বোন রেখা সুরিয়া সেমি ক্লাসিক্যাল মিউজ়িশিয়ান। ও-ও একবছর গিরিজা দেবীর কাছে তালিম নিয়েছে, কলকাতায়। কলকাতার কাঁথাস্টিচ, কালীঘাটের পটচিত্র, এখানকার সোশ্যাল লাইফ সব প্রিয়। ঢাকাই, হাতে বোনা শাড়ি খুব পছন্দের।

**কলকাতায় অসংখ্য হেরিটেজ বিল্ডিং রয়েছে। ভবিষ্যতে এমন কোনও বিল্ডিং রিমডেল বা কনজ়ার্ভ করার ইচ্ছে আছে?**

যদি আমাকে বলা হয়, অ্যাসাইন করা হয় কোনও হেরিটেজ বিল্ডিং রিমডেলিং করার জন্য, আমি অত্যন্ত খুশি হব। আই উইল ফিল ডিপলি অনার্ড। কলকাতার কবরস্থান সংক্রান্ত একটি অ্যাডভাইসরি বোর্ডে আমি আছি। কিন্তু সেই বোর্ডটি এডিনবরা-স্থিত। লর্ড চার্লস স্প্রুস এই প্রজেক্টের পুরোধা।

**এতকিছু একসঙ্গে ব্যালান্স করে চলেন কী করে?**

আমি একদমই মাল্টিটাস্কার নই। এক সময়ে একটি কাজেই নিজের মনোযোগ নিয়ত করি আমি। হয়তো অনেকে আমাকে মাল্টিটাস্কার ভাবেন, কারণ প্রায় আধ ডজন প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করি...কিন্তু একটি সময়ে একটা কাজের উপরেই পুরো মনোযোগ থাকে।

**অবসরে কী করেন?**

পড়তে খুব ভালবাসি। বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করি। সামটাইমস দ্য গ্রেটেস্ট লাগজ়ারি অফ লেজ়ার ইজ় টু ডু অ্যাবসলিউটলি নাথিং।

**আপনার মেয়ে কোহেলিকা কোহলিও আপনারই দেখানো পথে হেঁটেছেন। আপনি নিশ্চয়ই ওঁর জীবনের অনুপ্রেরণা?**

মনে হয় না। আমরা দু'জনে স্বতন্ত্র দুই পেশাদার মহিলা। ও খুবই ক্রিয়েটিভ আর্কিটেক্ট। ২০০৪-এর শেষের দিকে নিউইয়র্কের প্র্যাট ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশোনা করে ও যখন ফিরল, তারপরে প্রচুর পরিশ্রম করেছে নিজের জায়গা তৈরি করতে। নিজের পরিচিতি নিজে তৈরি করতে আমার মেয়ের পরিচয় বহন করেনি কখনও। স্থাপত্য নিয়ে পড়াশোনা ওর। ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিং নিয়ে পড়াশোনা না করলেও, ওর মধ্যে সহজাতভাবে তা আসে। কারণ, আমার স্টুডিয়োতেই ও বড় হয়েছে। ওর যখন আট-ন'বছর বয়স, আমার মিশর যাওয়ার আগে দেখতাম আমাদের ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে, কাজের ড্রয়িং নিয়ে ব্যস্ত! ওটা হয়তো একধরনের প্রভাব বলতে পারেন। আর বাড়িতে সবসময়ই বই, ট্র্যাভেল, মিউজ়িয়ম আর প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গায় যাওয়ার উপরে জোর দেওয়া হত। কোহেলিকা কলকাতায় কয়েকটা দারুণ প্রজেক্টে কাজ করেছে। আমার খুব গর্ব হয় এটা বলতে। এরপর যখন ও কলকাতায় আবার কাজ করতে যাবে, আমিও যাব ওর সঙ্গে। তাহলে আরও একবার কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ পাব...

গুরুগ্রামে ক্যাটরিওনায় K2India-র অ্যাপার্টমেন্ট

উপন্যাস ৪

# যারা পরিযায়ী

অনীক চক্রবর্তী

রবীন্দ্র সরোবর মেট্রোয় আত্রেয়ীদিকে দেখে ঋক ঠিক করল সে আজ সুইসাইড করবে না।

বিকেল ঢলে এসেছে। যে মেট্রোটা এখুনি ঢুকল সেটা ভিজে ঝুপ্পুস হয়ে আছে একদম। ভিতরে এসি, ঝকঝকে আলো, সাধারণ লোকজন। মোটা কাচের জানলার বাইরে লম্বা লম্বা বৃষ্টির দাগ।

ঋক টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছিল। এ শহরে মরতে গেলেও লাইন দিতে হয়। তখনই দেখল আত্রেয়ী কার্ড পাঞ্চ করে বেরোচ্ছে। এই সময়টায় ভিড়টা একটু বেশিই। তবু চোখে পড়ল। একটা সাদা কুর্তি, নীল লেগিন্স। কুর্তিটার বুকের কাছে ফুল-ফুল এমব্রয়ডারি। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, ক্ল্যাচার ক্লিপ দিয়ে আলগোছে আটকানো চুল। একটা ছোট্ট টিপ পরেছে, আবার কালো। এমনিতে পরে না। বছর তিনেক আগের এক বৃষ্টির রাতে আত্রেয়ীর কোলে মাথা রেখে ঋক হঠাৎ বলেছিল, পারলে ছোট্ট টিপ পরিস একটা। ভাল লাগবে তোকে। সিঁড়ির চার-পাঁচ ধাপ নীচ থেকে আত্রেয়ীকে দেখতে দেখতে উঠছিল ঋক। শরীর ভারী হয়েছে এই কয়েক বছরে। খুব বেশিক্ষণ স্নান করেনি বোধহয়, কুর্তির পিঠের কাছটা অল্প ভিজে আছে। নাকি মেট্রো ধরতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছে? কে জানে। একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে।

“এক্সকিউজ় মি ম্যাম, জাহান্নামে

যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে বলতে পারবেন?" আত্রেয়ীর পিঠে টোকা দেয় ঋক।

"ও মাই গড। ওএমজি!" মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে অল্প নেচে ওঠে আত্রেয়ী।

"বিশ্বাস করতে পারছি না একদম।"

আত্রেয়ী সটান জড়িয়ে ধরে ঋককে, "কেমন আছিস তুই? উফ্, দাড়ি রেখেছিস আবার। যা তা হ্যান্ডসাম লাগছে তো!"

ঋক হেসে ফেলে। বলে, "দিব্যি আছি। তোর খবর কী? এপাশে?"

আত্রেয়ীও হেসে ওঠে। ডানদিকের গজদাঁতটা দেখা যায়। মেট্রোর সুড়ঙ্গ থেকে ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসছে গেটের মুখ পর্যন্ত। ও কপাল থেকে ভেজা চুল সরায় অভ্যস্ত হাতে। বলে, "ওই আর কী।"

"ওই আর কী মানে কী আবার? রবীন্দ্র সরোবরে আত্রেয়ী মল্লিক মানেই ডেট।
তাই তো?"

"হ্যাঁ, খেজুরই বটে। খেজুরে আলাপ করতে যাচ্ছি বলতে পারিস।"

"ওরে বয়স তো হল। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে থিতু হ এবার... বাই দ্য ওয়ে, মৃণালদা কেমন আছে?"

"টিসিএস, মোহনবাগান আর নেটফ্লিক্সে বিন্দাস!" তারপর ঋকের পেটে হালকা মেরে বলে, "তা তুইও আর কী কচি। দু'-একটা দাড়িও তো পেকেছে দেখতে পাচ্ছি।"

ঋক আওয়াজ করে একটা ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তোর চেয়ে পাক্কা দু'বছরের কচি রে," তারপর রাস্তার উল্টো দিকের বিলবোর্ডের দিকে ইশারা

করে ঋক বলে, ''কোহলিরও দাড়ি পেকেছে। সে সব তো কেউ দেখতে পাস না তোরা।"

পাশ দিয়ে একটা অফিসফেরত লোক যেতে যেতে ঋকের কথা শুনেই হেসে ফেলে বোধহয়। তারপর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ফুটপাথে ছুড়ে ফেলে। জুতো চেপে আগুনটা নেভাতে গিয়েও মিস করে যায়।

সামনের সিগন্যালে গাড়িগুলো থেমে আছে। আলো সবুজ হতে এখনও এক মিনিটের বেশি বাকি। তবু কেউ কেউ হর্ন দিচ্ছে তারস্বরে। ঋক ভাবছিল, এ পৃথিবীর সবার এত তাড়া কেন কে জানে! সবার এত দৌড় আর বিরক্তি আর চিৎকার মহাবিশ্বের একটা অণুতেও কোনও ছাপ রেখে যাবে না। আসলে সমস্ত মানুষই কোথাও গিয়ে এটা জানে না কি? সে তার ভিতরে বসে থাকা এই প্রকাণ্ড অসহায়তাটা তো আর মুখ ফুটে বলে উঠতে পারে না। তাই সামাজিক স্কেলে সেটাকে মান্যতা দিতে প্রাণপণে চিৎকার করে এভাবেই। অথচ তাদের সামনেই এক হাতে একটা বেলুন আর অন্য হাতে দাদুর হাত ধরে একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে জ়েব্রা ক্রসিং দিয়ে। সে আজ পৃথিবী সম্বন্ধে যে একটা সুন্দর কথা জেনেছে সেটাই হাত নেড়ে নেড়ে জানাচ্ছে দাদুকে। দাদু কিচ্ছু জানে না। বাস-অটো-গাড়ির লোকগুলো কিচ্ছু জানে না।

"কোহলি কে পাস গাড়ি হ্যায়, বাংলা হ্যায়, অনুষ্কা হ্যায়। তেরে পাস ক্যা হ্যায়?"

"হুম্... মেরে পাস? মেরে পাস আপকি ইয়াদে হ্যায় ম্যাডাম!"

খিলখিল করে হেসে ওঠে আত্রেয়ী। "ওরেহ্, কবি, কবি! শালা গাড়ির প্যাঁ পোঁ, লোকের ক্যাচক্যাচের মধ্যেও মেট্রোর গেটে দাঁড়িয়ে এরকম ইনস্ট্যান্ট পিক আপ লাইন কে দেয় ভাই?"

"ঋক। ঋক স্যানচেজ়," তারপর একটু থেমে বলে, "ওই, আজকের ডেটটা কাটিয়ে দে না।"

"পাগল! আমার পেছনে তিন মাস ধরে টানা পড়ে থেকেছে, তারপর রাজি হয়েছি। সে কীসব গিফ্‌ট টিফ্‌ট এনে পৌনে এক ঘণ্টা ধরে বসে আছে আবার। এখন কাটিয়ে দিলে সবই কাটাকুটি হয়ে যাবে। কী দেখতে রে, উফ্!" বলে চোখ টিপল আত্রেয়ী।

একদম একই রকম আছে মেয়েটা। অবশ্য একটা বয়সের পরে মানুষ খুব কিছু বদলায়ও না বোধহয়। ঋক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আত্রেয়ীর দিকে। তারপর বলে, "ওরে ছাড় তো। কিচ্ছু কাটাকুটি হবে না। ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিস, সে ব্যাটা শোয়ার আগে কোত্থাও যাবে না। ছেলে জাতি অদ্ভুত হ্যাংলা বুঝলি? সব অপমান গিলে, লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পড়ে থাকবে।"

"তারপর একবার শুয়ে পড়লেই সব ভুলে তিন বছর একটা 'কেমন আছিস'-এর রিপ্লাইও দেবে না হোয়াটসঅ্যাপে।"

নিয়ন আলো পেরিয়ে দূরে দৃষ্টি চলে যায় ঋকের। মেঘগুলো কেমন চান করে গা মোছার পর নিংড়ে নেওয়া ভেজা গামছার মতো টাঙানো আছে আকাশের তারে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ওর। এটা ছদ্ম নয়।

"চুপ করে থাকিস না, বল কিছু।"

"অভিমান আমারও তো হয়, অভিমান আমারও তো হয়... যাবি আমার সঙ্গে? একটু বলার সুযোগটা দে অন্তত।"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে আত্রেয়ীর বুক থেকেও। ও যে ঋককে চিনেছিল, এভাবে রিকোয়েস্ট করা সেই ঋকের ধাতে নেই। কেমন একটা অসহায় লাগছে ওকে। মুচকি হেসে ঋক এর চুল ঘেঁটে দেয় আত্রেয়ী।

"সত্যিই আজ আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না বাবু। কিন্তু না ঋক, যাব না তোর সঙ্গে।"

"প্লিজ়।"

আত্রেয়ীর কড়ে আঙুলে আঙুল জড়ায় ঋক। আইসক্রিমের মতো একটা বিকেল। তার মধ্যে দিয়ে একদল পাখি ভি আকারের একটা শেপ তৈরি করে উড়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। ঋকের মনে হল ওরা সবাই মিলে কোথাও ম্যাচ জিতে এসেছে যেন। ভিক্ট্রি ল্যাপ দিচ্ছে গ্যালারির সামনে ঘুরে ঘুরে। বাচ্চা মেয়েটা আর তার দাদুকে আর দেখা যাচ্ছে না। সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেছে। গাড়িগুলোরও তারস্বরে চিৎকার থামেনি।

"আঙুলে আঙুল রাখলেও হাত ধরা বারণ..."

"জাস্ট আজকের সন্ধেটা। আর কখনও বলব না।"

"তুইও জানিস ঋক এটা শুধু সন্ধের ব্যাপার না। এমনিতে আমার পিরিয়ড চলছে, কিন্তু না-চললেও আজ তোর সঙ্গে কোথাও যাব না। প্লিজ় আমাকে আর জোর করিস না," তারপর একটু থেমে আত্রেয়ী বলে, "পিং করিস মাঝে-সাঝে। পুরনো নম্বরটাই আছে। আর সম্ভব হলে নিজেকে গুছিয়ে নিস। ভাল থাকিস।"

আর একবার ঋককে জড়িয়ে ধরে রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় আত্রেয়ী। নীচে নেমে ঋক শুনতে পেল সেন্ট্রালে কেউ একজন ঝাঁপ দিয়েছে। ট্রেন বন্ধ আপাতত।

২

বেশ স্নিগ্ধ হাওয়া দিচ্ছে একটা। শ্রীতমা ঠিক এরকম জীবনটা চাননি। তিনি যে আসলে কেমন জীবন চেয়েছিলেন তা এখন আর তাঁর মনেও পড়ে না। মাঝে-মধ্যে স্নান করার পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে আয়নার দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। দেবাশিস অফিসে। হয়তো তার কাউন্টারের সামনে ভিড় এখন। ব্যস্ত হাতে টাকা গুনতে গুনতে নতুন যে মেয়েটা ক্রেডিট কার্ড গছানোর জন্য নতুন জয়েন করেছে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে। ইলোরা হয়তো ওয়ার্ডে। সার্জারি পোস্টিং চলছে বলেছিল। সেদিন মোবাইলে ছবি দেখিয়ে বলেছিল, "এই দেখো মা, এই যে পায়ের পাতায় কালো হয়ে যাওয়া পার্টটা দেখছ এটাকে বলে গ্যাংগ্রিন। কেটে বাদ দেওয়া হবে দু'দিন পরে।"

আয়নায় নিজেকে দেখতে থাকেন তিনি। নিজেকে কতদিন যে দেখেননি ভাল করে। সুশ্রী গোলগাল মুখ, টানা টানা চোখ। বয়সের তুলনায় শরীরে মেদের পরিমাণ বরং কমই। ঠোঁটের উপর একটা ছোট্ট তিল। সেটা দেখতে দেখতে অয়নের কথা মনে পড়ে যায় ওঁর। ক্লাস ইলেভেন কি তখন? অয়ন গভীর চুমু খেয়ে বলেছিল, কেন জানি না এই তিলটার কথা বোধহয় আমার সারাজীবন মনে থাকবে। সারাজীবন অনেকখানি সময়। অয়নের মনে আছে এই কথাটা? সে কোথায় এখন? বেঁচে আছে? শ্রীতমার কিন্তু ওর এই কথাটা মনে রয়ে গেছে কীভাবে। সিঁথির সামনের দিকে দু'-একটা কাচা-পাকা চুল। হেনা করা হয়নি বেশ কিছুদিন। আয়নার এক পাশে ফোটোফ্রেমে দেবাশিসের কোলে ইলোরা, তিনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে, পিছনে সমুদ্র।

কাল বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে অনেকক্ষণ। তারপর বোধ হয় আজ ভোররাতের দিকেও হয়েছে। দুপুরের স্নিগ্ধ রোদ এখন জানলা গলে বিছানায় এসে গা এলিয়ে আছে। ফ্ল্যাটের জানলায় চোখ রাখলে অনেক নীচে, দূরে বড় রাস্তা দেখা যায়। গাড়িঘোড়া-মানুষজন চলে যায় নিজের মতো। এখানে তাদের আওয়াজ পৌঁছয় না। সেই নৈঃশব্দের ভিতর দিয়েই ঘড়ির কাঁটার একঘেয়ে টিক টিক আওয়াজ ভেসে আসছে। হোয়াটসঅ্যাপ খোলেন শ্রীতমাদেবী। নির্বাণ কবিতা পাঠিয়েছে একটা।

''ছবির মতো আকাশ,/ আর আকাশের নীচে সেই বোকা মানুষ/ যার কথায় কথায় চোখে জল আসে।/ আর যখন চোখে জল নেই,/ তখন চোখের মণিতে এক ছায়াভরা বুড়ো আম গাছের

নীচে/ বিরাট দুপুর, আটচালা ঘরের বারান্দায়/ মানুষজন রংবেরং বিড়ালের ছানা/ উঠোন থেকে খড়ের টুকরো মুখে করে ছুটে পালাচ্ছে/ ছাই ছাই ধানি ইঁদুর।/এ ছবির কোথাও সে নেই।/ তবুও আটচালা ঘর, রঙিন বিড়াল/ আর ধানি ইঁদুরের ত্রস্ত চলাফেরা/সারা দুপুর বারান্দায় কারা সুপুরি কাটছে/ধান থেকে চাল কুটো বাছছে তো বাছছেই।/কথায় কথায় তার চোখে জল আসে।''

কবিতাটা তিনবার পড়লেন শ্রীতমাদেবী।

"তোমার লেখা? পুরোটা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কেমন একটা মায়া আছে। বারবার পড়তে ইচ্ছে করে।"

ডেলিভার্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোড়া নীল টিক ভেসে ওঠে।

"নাহ, আমার না। ফেসবুকে দেখলাম। কবিতা সম্ভবত বোঝার কিছু নেই।''

"এ আবার কেমন কথা? সব কিছুই বোঝার আছে।"

স্মাইলি পাঠায় নির্বাণ, "উঁহু, সব কিছু একেবারেই বোঝার নেই। কবিতা আসলে একটা ছবি। সম্ভব বা অসম্ভব একটা ব্যাপার। কবি রং-তুলি দিয়ে তো আঁকতে পারেন না। তাই তিনি শব্দ দিয়ে এঁকেছেন। তুমি সেই আঁকাটাকে দেখতে পেলে, ওই যে মায়া মায়া মনে হল, মন কেমন করে উঠল, হয়তো বা সেটাই কবিতা।"

"যাহ। আর ধরো কোনও কবিতা পড়ে যদি আমার কিছুই মনে না হয়?"

"এমন কিছুও হতে পারে যাকে আমরা নাম দিতে পারিনি এখনও পর্যন্ত।"

"উঁহু, ধরো কিচ্ছু হল না।"

"তাহলে হয়তো সেটা কবিতা হয়নি। বা হয়তো সেটা তোমার কবিতা নয়। শুধু যিনি লিখেছেন তার কবিতা।"

"তাহলে তিনি লিখলেন কেন? ছাপালেন কেন? পড়ালেন কেন?"

"এ মা, লিখবেন নাই বা কেন? সবকিছুর এত কারণ থাকতে হবে কেন? সবকিছু তোমার জন্য বা কারও জন্য হতেই হবে কেন? তার নিজের ওভাবে দেখতে, লিখতে ভাল লেগেছে, তিনি লিখে ফেলেছেন।"

"সব কিছুর কারণ থাকে নির্বাণ। তুমি ছোট এখনও, বড় হও, বুঝতে পারবে।"

"এত বড় হতে চাই না শ্রী," অনেকক্ষণ চুপ থাকেন শ্রীতমাদেবী। বুঝতে পারেন না কী বলবেন। আদৌ কিছু বলাটা উচিত হবে কি না।

"নির্বাণ..."

"বলো।"

"তুমি আমাকে ভালবাসো?"

"জানি না। হ্যাঁ মনে হয়।"

"অনন্যাকে?"

"বাসি।"

"অনন্যা তোমাকে বাসে?"

"প্রব্যাবলি।"

"তুমি তো অনেক পড়াশুনো করো, জানো, বোঝো। আমাকে একটা কথা বলো।"

"আমি খুব কিছু বুঝি না সে রকম। তাও বলো, চেষ্টা করি।"

"এক, তুমি যদি আমাকে ভালবাসো তাহলে কি তুমি অনন্যাকে ঠকাচ্ছ না? আর দুই, তুমি যদি আমাকে ভালবাসো তাহলে বাসো কেন? মানে একজন পঁয়তাল্লিশের মহিলাকে একজন তিরিশের পুরুষ কেন ভালবাসবে?"

"আগে দুইয়েরটা বলি?"

"হ্যাঁ।"

"সবাই ভালবাসতে পারে বা জানে ব্যাপারটা এরকম নয়। কিন্তু তারপরেও যে মানুষ পারে, সে অন্যজনকে কেন ভালবাসে আমি জানি না। সম্ভবত কেউই ঠিক জানে না। সবাই বড় বড় কথা বলে জানার ভান করে। কিন্তু সত্যি করে ভালবাসলে সেটা মিথ্যে নয়। আর সেখানে তিরিশ-পঁয়তাল্লিশ খুব ম্যাটার করে বলেও শুনিনি।"

নির্বাণ টাইপ করছে। কাচের জানলার ওপাশে দুটো চড়াই বসে কথাবার্তা বলছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন মন ভরে গেল শ্রীতমার।

"এবার প্রথমটা। তার আগে তুমি বলো, তুমি কি মনে করো ভালবাসা কোনও পাত্রে মেপে রাখা জিনিস যে একজনকে দিলে অন্যজনের জন্য কম পড়ে যায়?"

"বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ। কিন্তু সেরকম হলে তো বিশ্বাস, ভরসা বলে কিছুই থাকবে না।"

"আমার, তোমার মধ্যে বিশ্বাস, ভরসা নেই? আমার, অনন্যার মধ্যে বিশ্বাস, ভরসা নেই?"

"আছে। কিন্তু বলতে চাইছি ঘর-সংসার তো সবার ভেসে যাবে তাহলে। সবাই এভাবে লুকিয়ে সবাইকে ভালবাসলে।"

"নিজেই একদম পয়েন্ট পেড়ে ফেলেছ বুঝলে? ব্যাপারটা আসলে ঘর-সংসারের। যেখানে সেই হিসেব নেই, কিন্তু ভালবাসা আছে সেখানে তাই বাকি সব্বাই ঘেঁটে যায়, আর আমাদেরও ছোটবেলা থেকে ঘেঁটে রাখা হয়। হয়তো একদিন কাউকেই কিছু লুকোতে হবে না।"

"তুমি এত অল্প বয়সে এত বোঝো কী করে নির্বাণ?"

"হা হা। তিরিশখানা বছর বোঝার জন্য খুব অল্প নয়। যাক, আপনার অপরাধবোধ কম হল একটু?"

"কে জানে! একটা ছবি দেবে?"

"ছবি দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই কিন্তু।"

"দাও বলছি..."

সেন্ট্রাল স্টেশনের মেডিক্যাল কলেজের দিকের গেটটা দিয়ে বেরোলেই একটা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শহরের পায়ের কাছে পড়ে থাকা জৌলুসহীন, অস্বস্তিকর, ধূসর একটা পোস্টকার্ড। একটা ময়লা ফেলার জায়গা। একটু বৃষ্টি হলেই ওই ফুটপাথ দিয়ে পেরোনো যায় না এক রকম। তার উপর ত্রিপল খাটিয়ে তার নীচে পাঁচজনের একটা ফ্যামিলি। এসব পেরিয়ে ছ'নম্বর গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে স্বর্ণময়ী হস্টেলের সামনে ইলোরাকে দেখতে পেল ঋক। শুধু ইলোরা নয় অবশ্য। পাশে জাভেদদা। সোমবার, তাই আরআইও-র সামনে একটু বেশিই লম্বা লাইন। চিৎকার-চেঁচামেচি-বাচ্চার কান্না—"তোর বাপকে গিয়ে বল," "দাদা ট্রপিক্যালের গেট কোনটা?"

এরই মধ্যে ঋক দেখতে পেল দুটো মানুষ সিলুয়েটে দ্রুত পায়ে ইমার্জেন্সির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাভেদদা হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বলছে আর ইলোরা হেসে উঠছে খিলখিল করে।

গত সপ্তাহেই আসরে সৌর একবার খিল্লি করেছিল "ভাই, জাভেদদার হাইটটা দেখেছিস তো? তোর থেকে পাক্কা হাফ ফুটের ডিফারেন্স। আর কে না জানে হাইট আর লেন্থের সমানুপাতিক সম্পর্ক কিন্তু," সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল।

"বিরক্ত করিস না। তোর নিজের তো ফিমোসিস।"

"ভাই সিঙ্গল মানুষ। কিন্তু তোকে পুরো একটা হেরিটেজ সাইট সামলাতে হয়। হাজার টুরিস্টের ভিড়।"

আবার এক রাউন্ড হো হো। সৌর ফুল ফর্মে আছে আজ। ঋক কিছু বলে না। গ্লাস শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতা শহরে এত আলো যে রাতের আকাশে তারা দেখা যায় না। তার বর্ধমানের গ্রামে এই সময় গোছা গোছা তারা ফুটে থাকে আকাশের গায়ে। তাদের দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে ওর খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় এলিয়েন আছে। হয়তো লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে কোনও এক এলিয়েন ঠিক এভাবেই এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মহাবিশ্বের বিস্তার নাকি তিরানব্বই বিলিয়ন আলোকবর্ষ জুড়ে। তিরানব্বই বিলিয়নে কতগুলো শূন্য, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ঋকের। নেশা হয়ে গেছে খুব।

সৌর বলে, "ইয়ার্কি মারছিলাম তো।

দিল পে লে লিয়া?”
হঠাৎ সৌরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে ঋক। আত্রেয়ীর কথা মনে পড়ে যায় ওর, আবার।
জাভেদদা আর ইলোরা বাঁকে মিলিয়ে যায়। ঋকের সাইকি পোস্টিং চলছে এখন। পনেরো দিন শান্তি একটু। তারপর মেডিসিনের বাকি থাকা পনেরো দিন। আবার সেই অ্যাকিউট ওয়ার্ডের নরক!
ইলোরার আজ পোস্ট-অ্যাডমিশন ডে। চাপ থাকবে। ওয়ার্ডে ঢুকে ইলোরাকে একটা টেক্সট করে রাখল ঋক, “ফ্রি হয়ে বলিস একবার, ছাদে যাব। ভাল লাগছে না কিছু।”
এমনিতে মাঝে মাঝেই ঋকের জাস্ট কিচ্ছু ভাল লাগে না। কিন্তু এবারেরটা আলাদা কেমন। বিষাদ বলে একটা শব্দ আছে না? গায়ে মাথায় সারাদিন লেগে থাকা এই জিনিসটা সম্ভবত বিষাদ। খারাপ লাগার সঙ্গে তার যে এতটা পার্থক্য, ঋক আগে তা বুঝতে পারেনি কখনও এবং ফেজ়টা কাটছে না কিছুতেই। আর সবথেকে বড় মুশকিলটা হয়েছে ঋক ঠিক নিজেও জানে না সে কেন এতটা বিষণ্ণ। ব্যাপারটা শুধু মাথার ভিতর হচ্ছে সেটাও না। খিদে নেই, হস্টেলে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে সারাদিন। সারা গায়ে হাত পায়ে ব্যথা। সেক্স-এডুকেশনের নতুন সিজ়ন এসেছে, সেটাও দেখতে ইচ্ছে করছে না। পরশু রাতে সৌর এসেছিল রুমে। ওদের সিল্ক রুট টুরের ছবিগুলো নিতে। উঠে ওকে হার্ড ড্রাইভটা দেওয়ার মতোও ক্ষমতা ছিল না ঋকের। ওর শুধু বারবার মনে পড়ছিল জুলুকে গিয়ে ও রয়ে যেতে চেয়েছিল। পাহাড়ের বাঁকে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে। একটা পাহাড়ি লোমওয়ালা কুকুর। বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট বাগান হয়তো। সকালবেলা উঠে দেখবে মেঘ এসে চোখের সামনে সব কিছু ঢেকে দিয়েছে। ইলোরা থাকবে না। সৌর থাকবে না। দত্ত থাকবে না। শুধু ও আর কুকুরটা। কুকুরটার নাম দেবে জুলু। এর বেশি তো আর কিছু চাওয়ার ছিল না ঋকের।

৩

এমসিএইচের ছাদে এসে ইলোরা দেখল ঋক চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে আছে। কালকের বৃষ্টিতে ছাদটা একটু ভিজে ভিজে। ছাদের ডান দিকের কোণে দুটো বিয়ারের ক্যান, গোটা কতক সিগারেটের ডেডবডি, চিপসের একটা প্যাকেট পড়ে। ঋক যে দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে বসে আছে তাতে অদ্ভুত সুন্দর একটা হাতের লেখায় কেউ লিখে রেখেছে, ‘ইন দ্য অ্যান্ড ইট ডাজ়ন্ট ইভেন ম্যাটার’। ইলোরা শেষবার যখন ছাদে এসেছিল তখন লেখাটা ছিল না।
আজ সারাদিন ঝকঝকে রোদ ছিল। এখন আকাশ থেকে চুঁইয়ে সন্ধে নেমে আসছে গোটা শহরে। হাসপাতালের আলোগুলো জ্বলে উঠছে একে একে।
“ওই!”
ঋক চোখ খোলে। ইলোরার চোখে-মুখে পোস্ট অ্যাডডের ব্যস্ততা আর ক্লান্তির ছাপ লেগে আছে। তবু ওকে সেই কতকাল পেরিয়ে ফুটে থাকা স্নিগ্ধ গুহাচিত্রের মতোই দেখাচ্ছে। একটা হলুদ টপ আর জিন্স পরেছে। আঙুলে সিগনেচার কালো নেলপলিশ। ইলোরা ছাড়া আর কোনও মেয়েকে ঋক চেনে না যে রিলিজিয়াসলি কালো নেলপলিশ পরে। অবশ্য কালো নেলপলিশটা জাস্ট শখ নয়। ইলোরা মৃত্যুবিলাসী। কালো নেলপলিশ ওর সেই বিলাসকে, ইচ্ছেকেই ধারণ করে। ইলোরা সম্ভবত কিছুই কারণ ছাড়া, গভীরতা ছাড়া করে না। যেমন ওর বাঁ-পায়ের গোড়ালির একটু উপরে একটা ট্যাটু— পাহাড় আর দু’-তিনটে পাইন গাছের অবয়ব। ইলোরা পাহাড় ভালবাসে। আজ পাঁচ বছর ধরে দেখছে ঋক। তাও প্রতিবার ইলোরাকে দেখলে ওর মনে হয় ইলোরার চেয়ে সুন্দর মানুষ, গভীর মানুষ সম্ভবত এ পৃথিবীতে জন্মায়নি।
ঋকের পাশে এসে গা ঘেঁষে বসে ইলোরা।
“কী হয়েছে তোর?”
“কী হবে আমার? ব্যাগে জল থাকলে দে তো।”
ইলোরা বোতল বের করে দেয়। ঋক ঢকঢক করে হাফ বোতল খালি করে। বলে, “তোর খবর কী? কাল রাতে কথা বললি না ঠিক করে। আজও পাত্তা নেই কোনও।”
“সার্জারি অ্যাড ডে, পোস্ট অ্যাড ডে মিলিয়ে কী ঝড় যায়, তুই জানিস না?”
“ঠিক আছে।”
“কিচ্ছু ঠিক নেই। কী হয়েছে তোর বল?” ইলোরার গলায় স্নেহ ঝরে পড়ে নাকি উষ্মা, ঋক বুঝতে পারে না।
একটু চুপ করে থাকে ও। মাথার উপর দিয়ে শান্ত, ঋজু, রুপোলি মাছের মতো একটা প্লেন চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। তারপর বলে, “আমি জানি না রে আমার
কী হয়েছে।”
এতগুলো বছর ঋককে দেখছে ইলোরা, ওর চোখে এরকম কষ্ট আগে দেখেনি কখনও। ইলোরা ভাবছিল ঋক যদি একটু কাঁদতে পারত তাহলে ভাল হত হয়তো।
ইলোরা হাত রাখে ঋকের মাথায়। বলে, “একটু বলার চেষ্টা করে তো দেখ।”
“আমার একটা ক্রাইসিস হচ্ছে রে। খুব ডিপ সিটেড। বেরোতে পারছি না।”
সত্যি বলতে কী, এই মুহূর্তে ইলোরার এসব শুনতে খুব একটা ভাল লাগছিল না। এমনিতেই টায়ার্ড। খিদেও পাচ্ছে। পুঁটিরামে গিয়ে কচুরি খেতে ইচ্ছে করছিল ওর।
“কবে থেকে হচ্ছে এরকম?”
“এক মাস ধরেই। লাস্ট এক সপ্তাহে বেড়েছে। মাথার মধ্যে কী চলছে বুঝতে পারছি না। সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছি।”
“সায়নদার সঙ্গে কথা বল না রে একবার। সাইকিয়াট্রি পোস্টিংই তো চলছে।”
“কী হবে কথা বলে? সেই তো ডিপ্রেশন ডায়াগনোজ় করবে। প্রোডেপ শুরু করবে।”
কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যায় ইলোরা। তারপর বলে, “তুই সবটা বলছিস না ঋক। কী হয়েছে?”
“শালা লালবাজারে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে যেন।”
হেসে ফেলে ইলোরা।
“ইজ় ইট সামথিং অ্যাবাউট মি?”
“তোর যদি মনে হচ্ছে তুই একটা কারণ হতে পারিস তাহলে তুই-ই বল?”
বিশাল বড় ছাদটা অসহায় প্রৌঢ়ের মতো পড়ে আছে। এ জীবনে কত রাগ-অভিমান-ভালবাসা-কামনার গল্প সে চোখের সামনে দেখেছে। সে মাঝে মাঝে ভেবেছে গল্পগুলো যদি একটু অন্যরকম হতে পারত। নায়ক যদি একটা অসামান্য মেয়েকে একটা কথা একটু অন্যভাবে বলত। নায়িকা যদি প্রচণ্ড নেশার ঘোরে একটা সামান্য ছেলের গালে সপাটে থাপ্পড় মেরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে না যেত। এখন বয়স হয়েছে। সে জানে, গল্পদের বদলানো যায় না।
“এই প্যাসিভ-অ্যাগ্রেসিভ খেলাটা এখন খেলিস না ঋক। প্লাস তুই যেমনই থাক, তোর ইনসিকিওরিটির দায় তুই আমার ওপর চাপিয়ে দিতে পারিস না।”
“জাভেদদা আর তোর মধ্যে কী চলছে?”
“নাথিং। কিচ্ছু না। একজন পিজিটি আর তার ইউনিটের একজন ইন্টার্নের মধ্যে যা চলে, যেটুকু চলে, তার বাইরে কিচ্ছু নয়।”
“এটা বলিস না প্লিজ়। আর পিজিটি আর তার ইউনিটের ইন্টার্নের সম্পর্ক কতটা হয়, কতদূর হয় আমার না-জানার কথা নয়।”
“ব্যস, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করারও কোনও মানে নেই। তুই সবই জানিস। তোর ডিপ্রেশন তুই নিজে ডায়াগনোজ় করছিস, আমার সম্পর্কও তুই ডায়াগনোজ় করছিস।”

"তুই আমার সঙ্গে গত দু'সপ্তাহ ধরে কথা বলেছিস ঠিক করে? জানতে চেয়েছিস একবারও কী হয়েছে? যতবার বলেছি দেখা কর একবার, অ্যাভয়েড করেছিস। আমার ডিপ্রেশন আমি সায়নদার কাছে না গিয়ে নিজে ডায়াগনোজ় করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ পাঁচ বছর ধরে আমাকে, আমার মাথার মধ্যে কী চলে তাকে সায়নদা চেনে না ইলোরা, তুই চিনিস। তাই তোর কাছেই বাধ্য হয়ে বলেছি। তোর কাছে সেটার সমাধান যদি সায়নদার কাছে যাওয়া হয় তাহলে আমি তোকে কেন বলব? তোর কোলে কেন মাথা রাখতে চাইব? সায়নদার কোলেই রাখি না হয়?"

ইলোরা ফুঁসে ওঠে, "আমার সার্জারি পোস্টিং চলছে ঋক। তোর সাইকি। তোর কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে, জীবন নিয়ে, তাদের রহস্য নিয়ে পড়ে পড়ে রোমান্স করার সময় আছে। এগজ়িস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসে ভোগার বিলাসিতা আছে। আমার সেই সময় বা বিলাসিতা কোনওটাই নেই।"

গলা চড়ায় ঋকও, "এগজ়িস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসটা বিলাসিতা নয়। আর তুই এটা অস্বীকার করিস না যে জাভেদদা তোকে লাইন দিচ্ছে না।"

"কে আমাকে লাইন দিচ্ছে আমি সারাক্ষণ বসে বসে তার হিসেব রাখি না ঋক। আমারও নিজের জীবন আছে, কাজ আছে, চিন্তা আছে। বলা ভাল জীবন নিয়ে কী করছি, কী করব সেই দুশ্চিন্তা আছে। তার ওপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে রোমান্টিসিজ়ম নিয়ে নিজের জীবনে চরম ইমম্যাচিয়োর, স্বার্থপর আর ওভার-পজ়েসিভ একজন বয়ফ্রেন্ড আছে।"

ঋক খুব চাইছিল ইলোরা চুপ করুক একটু। ও নিজেও চুপ করে থাকবে। তারপর ওকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরবে ইলোরা। ওকে বলবে, "সারাদিন খাইনি। একটা সিগারেট ধরা না রে," ঋক দু'টান দিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দেবে। ইলোরা কাউন্টার নিয়ে সেই ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে গান ভাসিয়ে দেবে— "কেন এমন, কবে হঠাৎ, কিসের হাওয়া, তখন বিকেল/ বলা বারণ..."

কিন্তু ইলোরা আপাতত চুপ করছে না। ঋক যদিও শুনতে পাচ্ছে না কিছুই। ওর মাথার ভিতর বহুদিন ধরে অভিমানের একটা স্তূপ জমে ছিল, ইলোরা সেখানে কাউন্টারে নেওয়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মাথার ভিতর তারই আলো আর আওয়াজ।

"আমি স্বার্থপর?"

"হ্যাঁ ঋক, তুই স্বার্থপর। এবং শুধু তাই না, তুই একজন হিপোক্রিট। দুটোর কোনটা হওয়া তুলনামূলকভাবে ভাল আমি জানি না। কিন্তু তুই যেহেতু দুটোই, তাই তোর ক্ষেত্রে কোনও কনফিউশনের জায়গা নেই। তুই কিসের পজ়েসিভনেস দেখাস আমার ওপর? তুই নিজে শুয়ে বেড়াসনি? বেড়াস না এখনও? তোর শুয়ে বেড়ানোটা নিজেকে এক্সপ্লোর করা আর আমার সহজ হয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলাটা অর্গি, তাই তো?"

ঋকের কিছুই বলার নেই। দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে ও। প্লেনটাকে দেখা যাচ্ছে না আর। শুধু একটা সাদা সরলরেখা পড়ে রয়েছে ওর চলে যাওয়ার চিহ্ন নিয়ে।

একটানা কথা বলার জন্যই হোক অথবা সারাদিনের ক্লান্তি অথবা রাগে, ইলোরা হাঁপাচ্ছিল প্রায়। তবু তার মধ্যে বলল, "চুপ করে থাকিস না ঋক। তোর খারাপ থাকার বাহানায় এড়িয়ে যাস না। বল, তোর কি পাল্টা কিছু বলার আছে?"

"না রে, নেই। থাকলেও সত্যি আমি এই মুহূর্তে পারছি না বলতে, কথা সাজাতে। সরি।"

"ওয়াও! দ্য গ্রেট কথাশিল্পী, যার কাছে পৃথিবীর সব কথা আর উত্তর রেডিমেড সাজানো থাকে সেই ঋক ব্যানার্জি বাকরুদ্ধ! কত বড় সৌভাগ্য আমার।"

ঋককে আর বেশি কষ্ট না-দিয়ে ইলোরার মোবাইল শব্দ করে বেজে উঠল। অন্ধকারের ভিতর স্ক্রিন আলো করে ভেসে ওঠা নামটা মিস করার কোনও উপায়ই ছিল না।

"হ্যাঁ, পুঁটিরামের সামনেই দাঁড়াও। আসছি আমি, পাঁচ মিনিটে," তারপর ফোনটা কেটে ইলোরা বলে, "হস্টেল ফিরে চান করে নিস। আর পারলে সায়নদার সঙ্গে কথা বলিস কাল।"

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওর নেমে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে ঋক। তারপর একটা সিগারেট ধরায়।

"কেন শরীর, কেমন হাওয়া, আরশিমহল, কাকে পোড়ায়/ বলা বারণ।

"দূরের স্টিমার, আলোর তারিখ, নিজে মানুষ, কী যে কখন/ বলা বারণ।"

গানটার ভিতর কেমন মায়া আছে। মানুষকে মরতে দেয় না কিছুতেই।

## ৪

অন্ধকারের ভিতর মোবাইল স্ক্রিনের আলো লেগে আছে একলা মুখে। পুরনো ছবির ফোল্ডারের ভিতর কত স্মৃতি, কত মানুষ ধরা থাকে। হস্টেলের ছাদের উপর বড় চৌকো চৌকো জলের ট্যাঙ্কি। দু'হাতে ভর দিয়ে ওগুলোর উপরে উঠে বেশ শুয়ে থাকা যায়। কত রাত হয়েছে কে জানে। বছর তিনেক আগের কথা। বাতাসে ভেসে থাকা অদৃশ্য ভয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তখনও ঘরের ভিতর স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে পড়েনি। খবরের কাগজ জুড়ে মানুষের কান্না আর ভেসে যাওয়া লাশের ছবি জায়গা করে নেয়নি রুটিন করে। বরং এক সপ্তাহের জন্য শিরোনামে উঠে এসেছিল মেডিক্যাল কলেজ আর সৌরদীপ, দেবাদিত্য, প্রতীক নামগুলো। মেডিক্যাল কলেজে থাকতে গেলে নাকি পলিটিক্সে জড়াতেই হবে। ঋকের ঝকঝকে রেজ়াল্ট দেখে ওকে কথাটা বলেছিল ওর এক দাদা। সে অবশ্য আরজি কর-এর। তবু মেডিক্যাল কলেজ যে রাজনীতির আখড়া এ কথাটা কলকাতার সব কলেজই মোটামুটি জানে। ঋক কোনওদিনই রাজনীতি বোঝে না, বুঝতেও চায়নি। পলিটিক্সের ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল দিন কয়েক যেতে না-যেতেই। এক সকালে হঠাৎ অচেনা নম্বর থেকে ফোন। বর্ধমানেরই কোনও এক দাদা। কনগ্র্যাচুলেশন্‌স, কেমন আছিস, বাড়ির সবাই কেমন ইত্যাদির পরে এমবিবিএস-এর সাড়ে চার বছরের কোন ইয়ারে কী বিষয়, অ্যানাটমি-ফিজ়িয়োলজি-বায়োকেমিস্ট্রির জন্য কী কী বই পড়া উচিত, বোন-সেট জোগাড় করতে কতটা ঝক্কি পোহাতে হয় এবং সে কীভাবে হেল্প করে দেবে সে সব জানল। কথায় কথায় এল হস্টেলের প্রসঙ্গ। হস্টেলের রুমে তার সঙ্গেই থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র নিজে থেকে ফোন করেছে তাকে, সাহায্য করার কথা বলেছে! ঋকের নিজেকে সেলেব্রিটি মনে হচ্ছিল।

ভুল ভাঙল যখন সেদিন সন্ধেতেই আবার আর-এক জনের ফোন এল। কনগ্র্যাচুলেশন থেকে হস্টেলের পার্টটা একই। শুধু আগের হস্টেল ঠিক কতটা উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেপুলের নিজে হাতে গড়া রৌরব নরক তা নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে বক্তিমে চলল। অবশ্য সব হস্টেল এরকম খারাপ নয়। এই দাদার হস্টেল ভাল, মেসের খাবার মুখে লেগে থাকে, বছর শেষে গোছা গোছা অনার্স আসে।

পরের দিন আবার ফোন প্রথমজনের। রিসিভ না-করে উপায় নেই। কীভাবে যেন সে জানে ঋকের কাছে অন্য ফোনও এসেছে। ঋককে এবার পাক্কা একঘণ্টার লেকচার ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হল। একটু কনফিউজ়ড এবং অনেকটা বিরক্ত লাগছিল ওর। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। এভাবে দেড়মাস চলার পরে অ্যাডমিশনের দিন ঋক তিন তিন খানা হস্টেল সার্ভে করে যে হস্টেলের সামনে একটা কৃষ্ণচূড়া

গাছ আছে সেটাতেই যাবে ঠিক করল। হস্টেলের সেই দাদা ঋককে মেসে নিয়ে গিয়ে মাংস-ভাত খাওয়াল, আর নিজের ট্যালির খাতায় মনে মনে একটা দাগ কেটে বেশ কলার তুলে ঘুরে বেড়াল বিকেল পর্যন্ত। নিজের কনভিন্স করার ক্ষমতার উপর সে আজ নিঃসন্দেহ। স্বাগতার সঙ্গে সে কফি হাউসে গিয়ে আজকেই বলবে স্বাগতার কেন ওকে ভালবাসাটা প্রয়োজন। অথবা, স্বাগতা কীভাবে নিজে না-জানলেও কথাবার্তায় বেরিয়ে পড়ে যে সে ভালবাসে ওকে।

ঋক যতটা পারত এড়িয়ে যেত, যায় রাজনীতিকে। কিন্তু হস্টেলের নিজের একটা বাস্তুতন্ত্র আছে। প্রতি দু'দিনে একবার করে মিটিং হয়। সেখানে নিজের দলের কথা হয়, হস্টেলের নিয়মনীতির কথা হয়, কলেজ ইলেকশনের কথা হয়। প্রত্যেক ইয়ারেই দু'-তিনজন করে নেতা আছে। তারা আবেগতাড়িত গলায় মিটিং করে। বোঝায় তারা কেন আলাদা, শ্রেষ্ঠতর। ওদের ইয়ার থেকেও কীভাবে যেন দেবাদিত্য, ভাস্কর নেতা হয়ে গেছে এর মধ্যেই। অন্য হস্টেলেও নিশ্চয়ই একই মিটিং চলে। তা না হলে একই ইয়ারের ছেলেপুলেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে না কেন? সারাক্ষণ যেন একটা চাপা আক্রোশ। সবাই আড়ালে মাপছে সবাইকে। অজান্তেই একটা খাদ্য-পিরামিড তৈরি হয়ে গেছে। সবাই চেষ্টা করছে উপরে থাকার। ঋকের মজা লাগে বেশ। আবার কখনও খারাপও লাগে। যখন দেবাদিত্য ওকে দূরে ঠেলে দেয়। মরিশাস থেকে শুরু করে মদ খাওয়া, প্রেম থেকে শুর করে পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে বক্তব্য আছে দেবার। তা থাকুক, অসুবিধে নেই। কিন্তু দুম করে কয়েক মাসের মধ্যে দেবা বদলে গেল কেমন। ফাইনাল ইয়ারের প্রতীকদা, সুজাতদার সঙ্গে ওঠা-বসা বাড়ল। একের পর এক ক্লাস বাঙ্ক শুরু করল। অনেক রাতেই হস্টেলের বাইরে কাটাত। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে সব ভাসা ভাসা উত্তর। ওরা যখন ফসিলস শুনছে, দেবা তখন গণসঙ্গীত—"হেই সামালো ধান হো/ কাস্তেটা দাও শান হো।" ওরা যখন আমেরিকান পাই দেখছে সৌরর রুমে, দেবা তখন 'ভি ফর ভেনডেটা'। দেবা আর সৌরর সঙ্গে ঋকের একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছিল। কলেজে ভোট হয়নি প্রায় তিন বছর। যেদিন হবে সেদিনই দেবাদিত্যরা হারবে। কারণ ওদের হাতে শুধুই হস্টেলের ছেলেপুলে। খুব বেশি হলে হয়তো স্বর্ণময়ী থেকে দু'-তিনজন আর ডে-স্কলারদের হাতে জনা পাঁচ। আর ওদের দিকে ডে-স্কলারের পুরো মাসটাই। প্লাস হস্টেলাইট্স তো আছেই। তবু একদিন রাতে দেবা মিটিং নিয়ে বলেছিল কেন ভোটটা হওয়া প্রয়োজন। ভারী ভারী কথা সব। মতপ্রকাশের অধিকার, গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, ক্যাম্পাস রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা! একসঙ্গে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হবে পরের দিন।

"প্রিন্সিপালের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখতে হবে বুঝলি? একটা লোক যখন তোকে ক্লাসে পড়াতে আসছে সে তোর টিচার। কিন্তু সে যখন প্রিন্সিপালের চেয়ারে বসে আছে সে সিস্টেমের পক্ষ থেকে বেঁধে দেওয়া একজন মানুষ যার কাজ হল স্ট্যাটাস কিউ বজায় রাখা। সেই চেয়ারের সামনে তুই যখন তোর দাবি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিস সে কিন্তু তোকে তার ছাত্র হিসেবে দেখছে না। দেখছে তার স্ট্যাটাস কিউকে একজন চ্যালেঞ্জ করছে এইভাবে। ফলে তুইও তাকে টিচার হিসেবে দেখিস না, তোর চ্যালেঞ্জার হিসেবে দেখ। অন্তত একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে।"

দেবার দিকে তাকিয়ে ভাল লেগেছিল ঋকের। ঝকঝক করছে কথায়, কনফিডেন্সে। বন্ধুত্ব না-ই হোক, ও বড় তো হয়ে গেছে।

ডেপুটেশন দিতে যাওয়া হল। দেবার হাতে লেটারহেড, সবাই ওর পাশে, পিছনে। উজ্জ্বল স্যর কাগজটা নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুড়ে ফেলে বললেন, "এটা আমার কলেজ, কবে ভোট হবে, ভোট আদৌ হবে কি না সেটা আমি ঠিক করব।"

দেবা টেবিল চাপড়ে বলল, "এটা আপনার নয় স্যর, এটা আমাদের কলেজ। ছাত্রদের কলেজ। আমরা আছি বলেই আপনি প্রিন্সিপাল।"

উজ্জ্বল স্যর চেয়ার ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা দেবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তোমার কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারি," তারপর আমাদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, ''এবং তোমাদেরও!''

ঋকের মাথার ভিতরটা অদ্ভুত ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। দেবা হেসে বলেছিল, "কেরিয়ার ইজ় জাস্ট আ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি কনসেপ্ট স্যর। তার আগে-পরের স্ট্রাগলটুকুই আমি আপনি, আমরা সবাই। ওটাকে আপনি চাইলেও শেষ করতে পারবেন না।"

তার দু'দিনের মাথায় নতুন করে হস্টেল অ্যালটমেন্টের নোটিশ বেরোয়। জানিয়ে দেওয়া হল, নিম্নলিখিত ছাত্ররা ইললিগাল বোর্ডার। তাতে প্রথমেই জ্বলজ্বল করছে দেবাদিত্য বসুর নাম। যেন অবিলম্বে হস্টেল খালি করে দেওয়া হয়।

"Remember remember, the fifth of November..."

জিবি মিটিং এর শুরুতে শুধু এইটুকু বলেছিল দেবা। আর বলেছিল, কাল প্রিন্সিপালের অফিসের সামনে, ঠিক এগারোটা। ঘেরাও চলেছিল সন্ধে পর্যন্ত। সঙ্গে গান, কবিতা, স্লোগান। সাতটায় প্রিন্সিপালের রুম থেকে সুপার স্যর বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, ''আমি তোমাদের ঠিক পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে করিডর খালি না হলে বাকিটার দায়িত্ব আমাদের কারও নয়।''

দেবা বলেছিল, ''দায়িত্ব নিলে পুরোটাই নিন স্যর, শুধু ক্ষমতাটুকুর নেবেন না।''

তারপর পুলিশ। স্লোগান। হুমকি। চিৎকার। করিডরের লাইট নিভিয়ে টেনেহিঁচড়ে সব মিলিয়ে একশো দশ জনকে তুলে নিয়ে যাওয়া লালবাজারে। রাত দেড়টায় হস্টেল ফিরেছিল ওরা। তারপরেও স্লোগানে স্লোগানে ভেঙে যাওয়া গলায় দেবা মিটিং করেছিল— "এটা শুধু আমার বা আমাদের পাঁচজনের ব্যাপার নয় কিন্তু। এটা ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের ভয়েস থাকবে কি না, আমাদের খারাপ ছেলে, অবাধ্য ছেলে হওয়ার অধিকার থাকবে কি না এবং সবশেষে আমাদের মতো একটা সংগঠন থাকবে কি না তার লড়াই। কাল থেকে অ্যাড ব্লকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। দরকার হলে অনশন হবে। তৈরি থাকিস সবাই।"

দরকার হয়েছিল। কারণ টানা চারদিন অবস্থানের পরেও প্রিন্সিপাল নিজের জায়গায় অনড় ছিলেন। দেবাদিত্য সহ আরও চারজনকে হস্টেল ফাঁকা করতে হবে। প্রত্যেকের বাড়িতে প্রিন্সিপাল নিজে দায়িত্ব নিয়ে ফোন করেছিলেন। এবং অবশ্যই, ভোট-টোট হওয়াটা এই মুহূর্তে কোনও অপশনই নয়।

সৌর কীভাবে যেন দুম করে বদলে গেল এর মধ্যে। সারাক্ষণ টিটি বোর্ডে পড়ে থাকা, তিনটে গার্লফ্রেন্ড সামলানো, জীবনে একটা মুহূর্তের জন্যও সিরিয়াস হবে না ঠিক করা সৌরদীপ ভৌমিক প্রতিটা ইয়ারে গিয়ে ডায়াসিং করল, লিফলেটিং করল, ফেসবুকে পোস্ট দিল একের পর-এক। আর লিস্টে কোথাও নাম না-থাকা সত্ত্বেও পাঁচ নম্বর দিনে গিয়ে দেবা, অনিন্দ্য আর কৌশিকের সঙ্গে শুয়ে পড়ল অনশন মঞ্চে।

ঋক রাজনীতি বোঝে না, দেবা বা সৌরর মতো এত সাহসও নেই ওর। তবু ও টানা আটদিন ওদের পাশে বসে ছিল অনশন মঞ্চে। হাওয়ায় হাওয়ায় গোটা কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল ওদের আন্দোলনের কথা। বিভিন্ন কলেজ থেকে, সংগঠন থেকে অথবা একাই অনেকে এসেছিলেন। দেবার মা সেই মেদিনীপুর থেকে এসে মৌসুমী ভৌমিক গেয়েছিলেন, "আমি শুনেছি

সেদিন তুমি...” যাদবপুর থেকে এসেছিল অনিমেষদা, মৃত্তিকাদি। প্রেসিডেন্সি থেকে এসেছিল নির্বাণদা, পুরোটা সময় পড়ে ছিল মঞ্চে। কত কথা, হাসি, গান। মিডিয়ার ভিড়।

আর এসেছিল জাভেদ আলি ওয়ারসি। লম্বা, সুদর্শন, চোখে কালো ফ্রেমের একটা চশমা। আরজি কর-এর ফাইনাল ইয়ার। সোজা টানটান শরীর নিয়ে একটু দ্রুত পায়ে হাঁটে। স্পষ্ট, কাটা কাটা উচ্চারণ। মঞ্চের মাইক্রোফোনটা খুলে রেখে সামনে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “এই ছেলেগুলো আমার ভাই। আপনারা জানেন কি না জানি না, কিন্তু আটদিন না-খেয়ে থাকলে শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। এদের কারও কিছু হয়ে গেলে কলকাতা শহর ছাড়িয়ে, এ রাজ্যের প্রত্যেকটা মেডিক্যাল কলেজে আগুন জ্বলবে, দেখে নেবেন আপনারা,” তারপর পাশে রাখা গিটারটা তুলে নিয়ে গেয়ে উঠেছিল।

ওরা, ওদের আগুনটা জিতে গিয়েছিল। অনশনের এগারো দিনের মাথায় আগের নোটিশ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন প্রিন্সিপাল স্যর। বিজয় মিছিল বেরিয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে। প্রতীকদা আর ইন্দ্রর কাঁধে সৌর, নির্বাণদা আর জাভেদদার কাঁধে দেবা। পরের দিন কাগজে আধপাতা জোড়া ছবি ছাপা হয়েছিল দেবার। ট্যাঙ্কির উপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আজ কত কথা মনে পড়ে গেল ঋকের। প্রতীকদা এমএলই দিয়ে আপাতত স্টেটসে। দেবা ফাইনাল ইয়ারটা পাশ করে হাওয়ায় উবে গেল। কোথায় আছে এখন, কী করছে কেউ জানে না। নির্বাণদা চাকরির চেষ্টা করছে এদিক ওদিক আর টিউশনি। যোগাযোগটা রয়ে গেছে এখনও।

আরজি কর-এর ছাত্র, মেডিক্যাল কলেজের পিজিটি জাভেদ আলি ওয়ারসি কি এখনও আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা রাখে? আবির মাখা গালে গিটার নিয়ে গান গায় কলেজ স্কোয়ারে?

## ৫

জুতো খুলে নিজের রুমে গিয়ে ইলোরা পিঠের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলল বিছানার উপরে। তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

শ্রীতমা বুঝতে পারলেন আজ মেয়ের সামনে ঘেঁষা যাবে না। কিন্তু রাত তো হয়েছে। খেয়ে এসেছে কি না সেটাও বুঝতে পারছেন না। অনেকদিন পরে আজ একটু ভাল-মন্দ রান্না করেছিলেন—চিকেন রেশমি বাটার মসালা আর পায়েস। দেবাশিস মোবাইলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে সোফায়। অথবা কোনও বই-টই পড়ছে হয়তো। টিভিতে খবর চলছে নিজের মতো। শেষ মেট্রো চলে গেছে আওয়াজ করে। মেঘ ডাকার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মধ্যে।

এই সবকিছুর মধ্যে কয়েকটা লাইন কিছুতেই মাথা থেকে বেরোচ্ছে না শ্রীতমার।

‘‘পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,/ জানি আমি; —তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়/ কী নিয়ে থাকিবে বলো; —একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের/ দিয়েছে চেতনা,/ তারপর ঝরে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না/ হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের— প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত/ বাসনা/ফুরোত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—’’

কাল সন্ধে থেকে আজ এখনও পর্যন্ত কতবার যে কবিতাটা পড়েছে। মন ভাল লাগায় অবশ হয়ে আসে পড়তে পড়তে। ইচ্ছে করে প্রতিটা শব্দ, লাইন মনে গেঁথে নিতে। শ্রীতমা প্রায় একঘণ্টা মতো অপেক্ষা করলেন। দেবাশিস খেয়ে শুয়ে পড়েছে। খেতে খেতে টুকটাক কথা, “তুমি খাবে না?” “ইলোরা কি খেয়ে এসেছে?”

এ-সংসার নিয়ে, তাদের দু’জনকে নিয়ে দেবাশিস খুব ভাবিত, এমনটা কোনওদিনই মনে হত না। আজকাল আরও বেশি করে সেটা বোঝা যায়। সম্ভবত দেবাশিসও বোঝাতে চায় সেটা। বাইরে থাকলে নিজের ডিউটি আর ক্লাব। আর বাড়িতে থাকলে পড়ে থাকে মোবাইল আর বই নিয়ে। ওর এই একটা জিনিসকে কিছুটা হিংসেই করে শ্রীতমা— বই পড়ার অভ্যেস। একটা দেওয়াল ভর্তি শুধু নানান স্বাদের বাংলা আর ইংরেজি বই। শ্রীতমা বার কয়েক চেষ্টা করেছে বইটই পড়তে, পেরে ওঠেনি।

টিভিতে সান্ধ্য সিরিয়ালের রিপিট টেলিকাস্ট হচ্ছে এখন। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। নির্বাণের কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। কিন্তু কাল এই কবিতাটা পাঠানোর পর থেকেই কথা বলছে না ঠিক করে।

শ্রীতমা দু’বার নক করলেন। তিন নম্বর বার করতে যাবেন, তার আগেই ইলোরা দরজা খুলে দিল। ওকে ক্লান্ত লাগছে। শুধু ক্লান্ত নয়, যেন মনের উপর দিয়েও হঠাৎ ঝড় বয়ে গেছে ওর আর তাতে কিছুটা ভেঙে পড়েছে মেয়েটা। নিজের মেয়েকে চেনেন শ্রীতমা। ইলোরা একটা ঋজু বটগাছের মতো মানুষ। ঝড়বৃষ্টি এলে তিনি মেয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ান। ভেঙে পড়া শব্দবন্ধটা ওর সঙ্গে যায় না। ঘরে ঢুকে বিছানার উপর মেয়ের গা ঘেঁষে বসেন শ্রীতমা।

“কী হয়েছে রে?”

“ডিউটির চাপ মা, আর কী হবে।”

তারপর একটু থেমে ইলোরা বলে, “তোমার কী হয়েছে? কেমন জানি লাগছে।”

মৃদু হাসেন শ্রীতমা, “আমাকে আবার কেমন লাগবে?”

“খোয়া হুয়া।”

“খোয়া শুধু চাঁদ হয় নাকি?”

“উঁহু, ক্ষীরও হয়। আর চাঁদ য্যায়সি তুম!” শ্রীতমার কোলে মাথা রাখে ইলোরা।

হেসে ফেলেন শ্রীতমা। মেয়ের চুলে বিলি কেটে দেন। বলেন, “তোর সঙ্গে কথায় পারব না বাবা!’’ তারপর ইলোরার মাথায় হাত রেখে বলেন, ‘‘তোর সঙ্গে অনেক কিছুতেই পারব না, তবে কী হয়েছে বলতে পারিস। সমাধান করতে পারব না হয়তো, কিন্তু শুনতে তো পারি।”

ইলোরা একটু ইতস্তত করতে থাকে। শ্রীতমা সেটা বুঝতে পেরেই আবার বলেন, “বল না। মা-ই তো!”

“আমি একটা অদ্ভুত ফেজের মধ্যে আছি মা। ঋকের সঙ্গে আমার রিলেশনটা সম্ভবত থাকবে না আর। ও খারাপ আছে খুব। এরকম একটা টাইমে রিলেশনটা ভেঙে গেলে আরও খারাপ থাকবে। এবার এই যে রিলেশনটা ভেঙে যাবে, তাতে আমার খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমার কষ্ট না-হওয়াটায় আমার নিজেকে স্বার্থপরও লাগছে, খারাপ লাগছে... জানি না বোঝাতে পারলাম কিনা।”

“এটা না বোঝার কী আছে বুড়ু? মেয়ের চুল ঘেঁটে দিতে থাকেন শ্রীতমা। তারপর বলেন, “প্রেমটা কি ভেতর থেকেই ভাঙছে নাকি বাইরে থেকে?”

ইলোরা অবাক হয়। মা প্রেম-ট্রেম নিয়ে এত গুছিয়ে কথা বলতে পারে জানা ছিল না তো! বলে, “মোস্টলি ভেতর থেকেই।”

বৃষ্টিটা বেড়েছে একটু। পাশের ঘর থেকে দেবাশিসের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। ইলোরা উঠে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসে। তারপর হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে শ্রীতমার। বলে, “এবার তোমার পালা। কী হয়েছে বলো দেখি?

“তুই জাজ করবি না তো?”

“না, নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি। তোমার মেয়েকে যতটা ছোট ভাবো সে ততটাও নয়।”

একটু সময় নেন শ্রীতমা। তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “আমার একটা ছেলেকে ভাল লাগে। কথা বলতে, শুনতে, ছোটখাটো জিনিস শেয়ার করতে ভাল লাগে।”

ইলোরা উত্তেজনায় নেচেই উঠল

প্রায়, "উউ, কী করেছটা কী? কবে থেকে? ছেলে নাকি লোক? কীভাবে হল? কেমন দেখতে? দেখা-টেখা করেছ? সব বলো।"

শ্রীতমা হেসে ওঠেন, "বলব। খেয়ে নে আগে। আর, তুই কবিতা বুঝিস? তোকে একটা কবিতা পড়াচ্ছি দাঁড়া।"

এই মেয়েটাকে আগে কোথাও একটা দেখেছে সৌর। দুটো কামরার মাঝখানের জায়গাটায় একটা লোকের গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে আছে। হাসিতে মশগুল, ঢলে ঢলে পড়ছে লোকটার গায়ের উপর। কামরার বাকি লোকজন অথবা পড়ে থাকা বাকি পৃথিবীর প্রতি একেবারেই খেয়াল-টেয়াল নেই।

সৌরকে দেখে অবশ্য চিনতে পেরেছিল আত্রেয়ী। মানে নামটা খেয়াল পড়ছিল না ঠিক। কিন্তু ঋকের যে ভাল বন্ধু সেটা খেয়াল পড়েছিল। এমনিতে আগে কখনও কথা-টথা হয়নি। দুম করে গিয়ে কিছু বলাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে

পারছিল না। কী বলবে সেটাও অবশ্য একটা প্রশ্ন। তার উপর শুভর সঙ্গে লেপটে থাকতে বেশ ভাল লাগছিল ওর। দমদম এখনও অনেকটা। এই মুডটা ও নষ্ট করতে চায় না।

হঠাৎ সিনিয়র সিটিজ়েন সিট থেকে এক প্রৌঢ় রুক্ষ গলায় বলে উঠল, "একটু সরে দাঁড়ালে ভাল হয় না? সমাজ বলে একটা ব্যাপার তো আছে নাকি?"

পাশের ভদ্রমহিলা ফুট কাটলেন, "এই জেনারেশনের কি আর সেসব সেন্স বা চক্ষুলজ্জা বলে কিছু আছে?"

প্রথমজন আবার বললেন, "এসবই শিক্ষাদীক্ষা আর বাড়ির কালচারের ব্যাপার বুঝলেন না?"

"হ্যাঁ দাদা। মাথায় সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা-পলা নেই। শুধু গতর দেখে বুঝতে হবে বিয়ে হয়েছে কি না। অবশ্য বিয়ে হলেও বা কী? দেখেই তো বুঝতে পারছেন সব। কেউ তো আর নিজের বরের সঙ্গে মেট্রোর ভেতর লটরপটর করে না।"

সৌর লক্ষ করল মেয়েটার ফরসা মুখটা লাল হয়ে গেছে। সে বোধহয় অনেক কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু রাগে বা অপমানে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু সে এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়ায় না নিজের জায়গা থেকে।

"কী হল, কানে কথা যাচ্ছে না? এর পরের স্টেশনে দু'জনকে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে দিলে তখন কানে কথা ঢুকবে?"

আত্রেয়ী এবার ছিটকে সিনিয়র সিটিজ়েন সিটের সামনে চলে এল, "সাহস থাকে তো নামিয়ে দেখান। আর শুনুন, আমি আমার বরের সঙ্গে ঘরের ভেতরে বা পরপুরুষের সঙ্গে বাইরে নষ্টামো করি, আপনি আপনার মেশিন আর মরালিটিটা নিজের প্যান্টের ভেতরেই রাখুন বুঝলেন।" তারপর ভদ্রমহিলার দিকে আঙুল তুলে বলল, "গতর দেখে বুঝতে পারছেন বিয়ে হয়েছে কিনা? গেস করতে হবে না। হয়েছে। এক-দু'বছর নয়, ছয় বছর। আর শিক্ষা বা চক্ষুলজ্জা আপনার জেনারেশনের থেকে কিছুটা বেশিই আছে, তাই মেট্রোয় বন্ধুর গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে থেকেছি শুধু। আপনার জেনারেশনের মতো ঘরের ভেতর ঢুকে থেকে চারটে করে বাচ্চা পয়দা করে নিজের জীবন, বাচ্চাগুলোর জীবন আর পৃথিবীটাকে শেষ করিনি।"

উল্টোদিকের সিনিয়র সিটিজ়েন সিট থেকেও দু'-তিনজন উঠে আসে এবার। আত্রেয়ীদের ধাক্কা দেয়। টেনে নামাতে চায়। চিৎকার-চেঁচামেচি-খিস্তিখাস্তা। ট্রেন শ্যামবাজারে ঢুকছে। গেট খুলতেই আত্রেয়ীদের ধাক্কা মেরে নামিয়ে দেয় লোকজন। সেই প্রৌঢ়র কলার ধরে আছে আত্রেয়ী, তাকেও টেনে নামিয়েছে প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্মে থাকা পুলিশগুলো ছুটে এসেছে। জনতা পুরোদমে মজা নিচ্ছে, ভিডিয়ো করছে মোবাইলে।

এত দ্রুত গোটা ব্যাপারটা সৌরর চোখের সামনে ঘটে গেল যে ও কী করবে বুঝতে পারছিল না। মেয়েটাকেও চেনা চেনা লাগছিল। এরকম একটা অবস্থায় তাকে ফেলে চলে যেতে মন চাইছিল না কেমন। এমনিতে ও দমদমেই নামত। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার একেবারে আগের মুহূর্তে নেমে গেল শ্যামবাজারে।

"আপনি কি এঁর হাজ়ব্যান্ড?"

লোকটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটায় সে খুব একটা ঘাবড়ায়নি। সে বলল, "না, বন্ধু।"

পুলিশটি টেনে টেনে বলল, "অ, বন্ধু! তা দেখে তো শিক্ষিত ভদ্রসভ্যই মনে হয়। নিজেরা যা করছেন করুন। কিন্তু রাস্তাঘাটে জনসমক্ষে এসব করা কি ঠিক হচ্ছে?"

আত্রেয়ীকে সামলাচ্ছে একজন মহিলা কনস্টেবল। লোকটি আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি প্লিজ় কোনও কথা বলবে না। লেট মি হ্যান্ডল দিস।"

তারপর সে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে। বিখ্যাত দৈনিকের নাম জ্বলজ্বল করছে বড় বড় ফন্টে। নীচে লেখা—শুভময় দত্ত, সিনিয়র সাব-এডিটর।

তারপর দৃঢ় গলায় বলল, "শুনুন, ওকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চুমু খাইনি। বা বুকে হাতটাতও দিইনি। এবার আপনিও যদি এই ভদ্রলোক আর তার শাগরেদদের মতো মরাল পুলিশিং মারান, নিশ্চিত থাকতে পারেন কাল পাঁচ বা ছয়ের পাতায় আপনার ছবিসহ নাম আসবে। এবং নেক্সট দিনও। খবর চব্বিশে আমার বন্ধু আছে, তাকে দিয়ে সন্ধের দিকে একটা প্যানেল ডিসকাশনও অ্যারেঞ্জ করিয়ে দেব হয়তো। আপনার ডিপার্টমেন্ট এতদিনের চেষ্টায় এরকম দারুণ একটা ধবধবে ইমেজ বানিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেটায় চুনা লাগবে। তারপর বসের থেকে তলব আসবে, চিঠিচাপাটি চলবে, এ দরজা থেকে ও দরজা মাথা নামিয়ে ঘুরতে হবে কে জানে কতদিন। প্রোমোশন আটকে যাবে হয়তো একবছর। পৃথিবীর সবকিছুতে গলা বাড়িয়ে অফেন্ডেড হওয়া, সেক্স-স্টার্ভড একটা বুড়োভামের জন্য এত ঝক্কি পোষাবে?"

পরের দিন পেপারে খবর বেরোল না কিন্তু ফেসবুক আর টুইটারে আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়া লোকজনের মাঝে আত্রেয়ী আর শুভময়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা ভাইরাল হয়ে গেল।

## ৬

ক্যান্টিনের দরজায় গত বছরের ফেস্টের ছবি— চড়া আলোর ভিতর

এক কাপল হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর। তাদের সামনে শূন্যে হাত তুলে অসংখ্য ছেলেমেয়ে। তাদের কাউকেই চেনা যায় না আলাদা করে, শুধু অবয়বটুকু বোঝা যায়। ঋক উপরের তলায় গিয়ে দেখল ডানদিকের একেবারে কোণের টেবিলে জাভেদদা বসে আছে। একাই। সামনের প্লেটে হাফ খাওয়া এগ চাউমিন, প্লেটের পাশে একটা স্প্রাইট আর তার পাশেই একটা গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট। সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। ওপাশের দেওয়ালে একটা জানলা, তার বাইরে একটা পেয়ারাগাছ। এদিক-ওদিক কয়েকজন ছেলেপুলে ক্লাস শেষে টেবিল দখল করে আড্ডা মারছে নিজেদের মতো।

ঋক একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেল। দুম করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। গিয়ে কথা বলারও কোনও প্রশ্ন নেই। পাশের টেবিলে বসে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে আধঘণ্টা ধরে চাউমিনও গেলা যায় না। ধরা যাক সেটাও না হয় করল, কিন্তু তার মধ্যে যদি ইলোরা এসে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বের করে? জাভেদদাকে বলে, লাইটারটা দাও তো? তারপর চোখাচোখি হয়ে যায় ওদের? সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ঋক ঠিক জানেও না ওর মাথার মধ্যে এই যে সম্ভব-অসম্ভবের গল্পটা চলছে সেটা জাভেদদা জানে কি না? তাকে আদৌ চেনে কি না? ঋক বলে যে এ পৃথিবীতে একজন কেউ আছে যার জীবনের গল্পে সে অলরেডি কোনও একটা ভাবে ঢুকে বসে আছে এটা সেই মানুষটা জানে কি না, ঋকের নিজের দিক থেকে অন্তত এইটুকু জানাটা খুব প্রয়োজন।

বরুণদা তার চেনা বিরক্তিমাখা মুখটা নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বলল, "চাউমিন নাকি পরোটা-চিকেন? তাড়াতাড়ি বলো।"

বরুণদার তাড়াতাড়ি লগ্নে জন্ম। সেই পুরনো ক্যান্টিন থেকে দেখে আসছে, বরুণদা এই পাঁচ বছরে একবারও ধীরেসুস্থে অর্ডার নেয়নি। খাবার আসবে কিন্তু সেই আধ ঘণ্টা পেরিয়ে।

ঋক ফাঁকা টেবিলটায় বসে ঘাড় গুঁজে মোবাইল ঘাঁটতে শুরু করল। এমনিতে কিছুই দেখছিল না। শুধু স্ক্রল করছিল ইনস্টায়। মোবাইল জিনিসটা বেশ ভাল। এমনিতে অনেক কাজে তো লাগেই, তার উপর কাউকে অ্যাভয়েড করতে চাইলে বা নিজে ডিস্টার্বড না হতে চাইলে চুপচাপ মোবাইল খুলে বসে থাকো। সামাজিকভাবে অ্যাকসেপ্টেড যে তুমি বিরক্ত হতে বা করতে চাও না।

কিন্তু ঋকের ইনফিনিট স্ক্রলিং বাধাপ্রাপ্ত হল।

"লাইটার আছে?"

সুদূর সান্তোরিনির নীল জল আর বিকিনি সুন্দরী থেকে ঋক দুম করে, ৮৮ কলেজ স্ট্রিটের ক্যান্টিনে এসে পড়ল বলেই হোক বা মাথার ভেতর সম্ভব-অসম্ভব গল্পগুলো ঘেঁটে যাওয়াতেই হোক, ঋক চমকাল একটু।

"হ্যাঁ? ইয়ে লাইটার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। না, লাইটার মনে হয় নেই, দেশলাই আছে।"

"আরে কিছু একটা হলেই হবে, দে। তারপর ফস করে সিগারেটটা ধরিয়ে জানলা দিয়ে একমুখ ধোঁয়া গলিয়ে জাভেদ বলল, "ইন্টার্ন তো, না?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় পোস্টিং চলছে?"

"মেডিসিন। এখন সাইকি চলছে। আর দিন তিনেক আছে।"

"গুড গুড। সাইকি ভাল সাবজেক্ট, কাজের সাবজেক্ট। না তো ইউজিতে পড়ানো হয়, না তো ইন্টার্নশিপে সেরকম এক্সপোজার পাওয়া যায়," তারপর আবার ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "মেডিসিন, মানে নেক্সট পোস্টিং সার্জারি তো?"

"হ্যাঁ।"

জাভেদ এর মধ্যে টেবিলের উল্টোদিকের ফাঁকা চেয়ারে এসে বসেছে। ঋকের কিছু একটা অসুবিধে হচ্ছিল। ঠিক কী সেটা ও বলতে পারবে না। এর মধ্যেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বরুণদা কুড়ি মিনিটের মাথায় খাবার দিয়ে গেল।

"তুই কি এমনিতেই কম কথা বলিস নাকি এখন কথা বলতে ভাল লাগছে না?"

ঋক হাসল। কাঁটা চামচের গায়ে চাউমিন জড়াতে জড়াতে বলল, "আরে না না সেরকম কিছু নয়।"

"কীরকম কিছু নয়?"

ঋক ঠিক কী বলবে বুঝতে পারছিল না। অসুবিধেটা, অস্বস্তিটা বেড়েছে। মাথার ভেতর থেকে নেমে হাতে-পায়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

"আরে এভাবে বলা যায় না কি? বলা নেই কওয়া নেই, তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় নেই, আমি হঠাৎ করে বলতে শুরু করব আমার কী অসুবিধে? আমি বলবই বা কেন আর তুমি শুনবেই বা কেন?"

জাভেদ হাসে। বলে, "আলাপ পরিচয় আছে জনাব। আপনিই জানেন না।"

মানে ইলোরা বলেছে ঋকের কথা? নাকি সৌর? জাভেদদার ইউনিটেই পোস্টিং ছিল ওর।

"তুমি যখন জানো তাহলে তুমিই বলে ফেলো।"

"তার আগে বল, তুই আমার সম্বন্ধে কী জানিস? আর আমার ওপর কতটা খেপে আছিস?"

"আমি তোমার সম্বন্ধে খুব বিশাল কিছু জানি না। আবার একেবারে কিছুই জানি না তাও নয়।"

ছেলেমেয়েগুলো উঠে গেছে একে একে। পেয়ারা গাছটার ফাঁক দিয়ে, জানলার ফাঁক দিয়ে ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের মাথার বিশাল আলোটা চুঁইয়ে এসে পড়ছে টেবিলে। ক্যান্টিনের এফএম-এ গান বাজছে, "আজ থেকে এক হাজার শীতবসন্ত শেষে/ এই পথেই যদি আসি আবার।"

"দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিলি না কিন্তু।"

"তা নিয়ে তোমার কি খুব যায় আসার কথা?"

জাভেদ হেসে ওঠে। মোটা কাচের চশমার ভিতর দিয়ে দুটো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, গালে দু'দিনের শেভ না করা দাড়ি, হাতা গুটিয়ে রাখা মেরুনরঙা শার্ট, মাথাজোড়া উসকো-খুসকো চুল—সবাই হেসে ওঠে জাভেদের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা মুসলমান শব্দটা শুনলে তোর ঠিক কী মনে হয়? বা ধর, এই যে আমার নাম জাভেদ, শুধু এই নামটুকু শুনে আমাকে নিয়ে তোর মধ্যে ঠিক কী কী অনুভূতি হয়?"

"আমি ভাবিনি সেভাবে কখনও।"

"ভাব এখন। তোকে এটুকু কথা দিতে পারি আমি জাজ করব না। বা শেষপর্যন্ত করার চেষ্টা করব না।"

ঋক খাওয়া শেষ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। একটু সময় নিয়ে বলল, "একটা অস্বস্তি হয়। একটা নেগেটিভ ফিলিং। অন্যরকম কিছু একটা।"

জাভেদ হেসে একটা সিগারেট বের করে ঋকের দিকে এগিয়ে দিল। আর-একটা নিজে নিল। তারপর আগুন বাড়িয়ে দিল ঋকের দিকে। বলল, "এটা আমি বা আমরা জানি, জানিস তো। আমার নামটুকু শুনেই তোর এই নেগেটিভ ফিলিংটা।"

"আমার নাম শুনে, বা হিন্দু শব্দটা শুনে তোমার মধ্যেও কি এই নেগেটিভ ফিলিংটা হয় না?"

"হয়, একদম হয়। কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তোরটা তাচ্ছিল্যের, ঘেন্নার। আমারটা ভয়ের, অপরাধবোধের। অথচ দেখ, আমি কি কিছু অপরাধ করেছি? নাকি তোকে ভয় পাওয়ার সত্যিই কোনও কারণ আছে? কিন্তু ওই আর কী, হয়ে গেছে জানিস। এদেশে জাভেদ নাম নিয়ে বেঁচে থাকার অনেক জ্বালা।"

"যেমন পাশের দেশে ঋক নাম নিয়ে বেঁচে থাকার।"

"ইয়েস, অফকোর্স," তারপর হেসে বলে, "আন্দোলনের সময় যখন

দেখেছিলাম তখন তো পলিটিক্সের ধার দিয়েও যেতিস বলে মনে হয় না। এখন বেশ লায়েক হয়েছিস দেখছি।”

“তুমি মুভমেন্টের সময় খেয়াল করেছিলে আমাকে?”

“ওই আর কী,” ধোঁয়া ছাড়ে জাভেদ। আর একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

“তুমি হঠাৎ হিন্দু-মুসলমানের কথা তুললে কেন?”

“বলছি। আমি ধর্ম টর্ম নিয়ে থিয়োরি ক্লাস নিতে বসিনি ঠিক। আমি শুধু তোকে বোঝাতে চাইছিলাম মাইনরিটির যে ক্রাইসিস সেটা মেজরিটি হিসেবে তুই কিছুতেই ধারণ করতে পারবি না। মেজরিটি হিসেবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ক্রাইসিসকে তুই দারুণ থিয়োরি টিয়োরি পড়ে বুঝে উঠে কনশাসলি কাটাতেও পারবি না। মানে তুই হয়তো তোর মনের দিক থেকে খুবই সৎ, উদ্দেশ্যের দিক থেকে খুবই মহান, তবু একটা ফাঁক রয়ে যাবে। আমিও মাইনরিটি হিসেবে হাজার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেও, দুর্দান্ত ল্যাপ-কোলে করেও, অসম্ভব ভাল স্লোগান দিয়েও আমার ভেতরে বসে থাকা এই ইনসিকিয়োরিটিটাকে কাটাতে পারব না। তোর সমান হতে পারব না।”

“বুঝলাম। তার মানে চেষ্টা-টেষ্টা করার কোনও মানেই নেই? আমাদের সদিচ্ছারও কোনও দাম নেই, তাই তো?”

সোজাসুজি ঋকের দিকে তাকায় জাভেদদা। তারপর বলে, “আছে। একটা সৎ চেষ্টার মানে আছে ঋক, থাকে।” তারপর সিগারেটের শেষটুকু মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে নিভিয়ে বলে, “আমি হিন্দু-মুসলিম নয় শুধু। আরও একটা জিনিস বলতে চাইছি তোকে।”

“বলো,” ঋকের অস্বস্তিটা বেড়েছে কেমন। সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে।

“মাইনরিটি কিন্তু শুধু ধর্মের দিক থেকে হয় না। নিজের ভাবনাচিন্তার দিক থেকে হয়, নিজের প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে হয়। নিজের অনুভবের দিক থেকে হয়। সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা দেখছে, সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। তোর অন্য কিছু মনে হচ্ছে। খুব গভীর, কেঁদে ফেলার মতো কিছু। তুই কিন্তু এখানে মাইনরিটি। ফলে ভাবনার দিক থেকে মেজরিটির ভেতর তোর একটা ক্রাইসিস থাকবেই, ইনসিকিয়োরিটি থাকবেই। শুধু এটাই বলার, এটাকে নেগেটিভলি নিস না।”

“তাহলে কী করব? স্লোগান দেব? লড়াই করব?”

আবার হেসে ওঠে জাভেদদা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঋকের কাঁধে হাত রাখে।

“উঁহু, লড়াই না রে। চেষ্টা কর। সৎ চেষ্টা। স্লোগান দিয়ে লড়াই করার চেয়ে সেটা কম কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। চল টাটা, দেখা হবে আবার।”

ঋক একটা সিগারেট বের করল ব্যাগ থেকে। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে দু’বার মিস করল। হাত কাঁপছে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সিগারেটটা ধরাল ও। তারপর হুড়মুড় করে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কনস্ট্রাকশন সাইটটার দিকে। ওখানেই পুরনো ক্যান্টিনটা ছিল। এখন বড় বড় গর্ত, দুই মানুষ উঁচু হয়ে থাকা মাটি, লোহার রড, টিনের বেড়া। পুরনো ক্যান্টিনে এরকমই এক সন্ধেয় ইলোরাকে প্রথম চুমু খেয়েছিল ঋক। জীবনের প্রথম চুমু। মনে হয়েছিল এরপরে মরে গেলেও ওর কোনও কষ্ট থাকবে না। কিন্তু ঋক মরেনি, কষ্টও রয়ে গেছে তার নিজের নিয়ম মতো। ঋক সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দেয়। বৃষ্টি এল। ওকে আজ ভিজতে হবে।

আর এই অদ্ভুত অনুভূতিটাকে সে ঠিক কী নাম দিতে পারে তার সৎ চেষ্টা করতে হবে।

## ৭

গোটা শহরটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে বৃষ্টির দাগ ভুলে শরৎকে ডেকে নিতে। এখন একটা বাজে। এর মধ্যেই ব্যাঙ্কের বাবুরা সব টিফিনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মনে হচ্ছে। কাউন্টারের সামনে লাইন, তবু হেলদোল নেই কোনও। এক কিউবিকল থেকে পাশের কিউবিকলে খোশগল্প জুড়েছে কোথাও। নির্বাণ সামনের চেয়ারে বসে বসে দেখছিল। গত মাসে পেপারে একটা ছোটগল্প বেরিয়েছিল ওর— চোরাবালি। তারই চেক ড্রপ করতে এসেছে। সেটা খুব বেশি হলেও দশ-পনেরো মিনিটের কাজ। তার জন্য লাইন দেওয়ারও দরকার নেই। এখন ব্যাঙ্কে চেক ড্রপ করা থেকে শুরু করে বেশিরভাগ কাজই বেশ সহজ হয়ে গেছে। আজ বিকেলে বালিগঞ্জের টিউশনিটা আছে, তাও সেটা ছ’টায়। এই মাঝের পুরো সময়টা সে ফাঁকা। বাইরে ঝকঝকে রোদ, আকাশটা দেখতেও খারাপ লাগছে না। তুলো তুলো মেঘ আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইউনিভার্সিটির বারান্দায় গিয়ে বসে থাকাই যায়। কিন্তু চেনা লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ঠিক। তারা জিজ্ঞেস করবে, তারপর, কী করছিস ভাই? চাকরি-বাকরি? অনন্যা? বা হয়তো কিছুই জিজ্ঞেস করবে না এসব। নির্বাণের তবু মনে হবে তারা জিজ্ঞেস করতে চাইছে। শুধু ভদ্রতার খাতিরে পারছে না। এর চেয়ে এসির ভেতর যতক্ষণ পারা যায় বসে থাকা ভাল।

কাউন্টারের ভদ্রলোকটিকে বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছিল নির্বাণের। কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে মনে পড়ছিল না। সুপুরুষ, কাচাপাকা চুল, বাহারি গোঁফ। এই বয়সেও মাথায় ঈর্ষণীয় চুল। চশমার পেছন থেকে উজ্জ্বল দুটো চোখ একবার কম্পিউটারের স্ক্রিন আর-একবার জিন্স-টপের সুন্দরীর কোর্টে টেনিস বলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মানুষ দেখতে ভাল লাগে নির্বাণের। গল্পের উপাদান পাওয়া যায়। হয়তো কবিতাও ফুটে ওঠে কখনও। তবে মনের কলকব্জা ঠিক না থাকলে চোখ যা দেখছে তা মাথায় পৌঁছয় ঠিক, কিন্তু হাত বেয়ে কাগজে আর নেমে আসে না।

নীচে কাচের কিউবিকলে এক বান্ডিল টাকা নিয়ে বসে আছে সে। অনেকদিন হল নির্বাণের মন ভাল নেই। আবার খারাপও নেই। মন কিছু একটা থাকা ভাল, এরকম ফ্ল্যাটলাইন খুব খারাপ।

মোবাইল খুলে দেখে অনন্যার তিনখানা মিসড কল। শ্রীতমা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছে— ‘ঠিক আছ তুমি? কথা বলছ না কেন? আই মিস ইউ।’ আর দিশা লিখেছে, ‘হোমওয়ার্ক হয়নি কিন্তু। বাপির কাছে নালিশ করবে না। আজ নীল স্কার্টটা পরে বসব।’ ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে যায় নির্বাণের। যে বয়সে শরীর হরমোনে ভেসে যায়, পৃথিবীর সব মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, তাদের নিয়ে গোপন ডায়েরিতে নিষিদ্ধ ইচ্ছে লেখে মানুষ—তার সেই বয়সটা কেটেছে মিশনের কড়া গণ্ডিতে। সেসব পেরিয়ে কলেজে এসেও সে এতই মুখচোরা ছিল, মাথার মধ্যে মেয়েদের এমন উদ্ভট সব ছবি সাজানো ছিল যে কতকাল সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে মিশতেই পারেনি তাদের সঙ্গে। আর আজ! একই জীবন—সময়ে সময়ে তার কত বাহার। একই ভালবাসা—পরতে পরতে তার কত রূপ। ফেসবুক খোলে নির্বাণ। শ্রীতমার প্রোফাইলে গিয়ে ফটোগুলো স্টক করতেই চিনতে পারে কাউন্টারের ভদ্রলোককে। দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তাই এত চেনা
চেনা লাগছিল।

শ্রীতমাকে একটা রিপ্লাই করে ও, ‘ভাল আছি। চাপ চলছে একটু আর কী,’ তারপর একটু সময় নেয়, ‘বলছিলাম, দেখা করবে নেক্সট উইকে?’

একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গেল সৌরর। ও একটা পাহাড়ে গেছে। সিকিমের দিকেই হবে বোধহয়। পাইন বনের ভেতর দিয়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে একটা সিঁড়ি পেয়েছে কোথা থেকে। সিমেন্টের বাঁধানো সিঁড়ি।

একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। উপরে উঠছে তো উঠছেই। একটা ধূসর রঙের বিশাল বড় পাখি ওর পাশেই ভেসে ভেসে, ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। উঠতে উঠতে ও একটা ভিউ পয়েন্টে চলে এল। সামনে রেলিং দেওয়া চাতাল। দূরে পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে সূর্য ডুবছে। আকাশের গায়ে গাঢ় রং লেপটে আছে। আর রেলিংয়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেট্রোর মেয়েটা। সৌর একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তবু এগিয়ে গেল ও। মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিশাল বড় পাখিটা ওদের দু'জনের মাথার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই, মানুষ নেই, দৃশ্য নেই। মেয়েটা এবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সৌরর সারা শরীরে চিনচিনে ব্যথা। মেয়েটা সৌরকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রাখতেই হঠাৎ সেই পাখিটা সাঁ করে নেমে এল ওদের দিকে। চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। ডানায় সারা আকাশ ঢেকে ফেলেছে যেন। মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। কেমন ভাবে যেন দু'জনেই বুঝে গেল, বাঁচতে গেলে লাফ দিতে হবে খাদে। মেয়েটা চোখের সামনে রেলিং টপকে লাফ দিল নীচে। পাখিটার বিশাল বড় থাবা আর ঝকঝকে নখ দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল সৌরর। স্বপ্নে নাকি মরা যায় না কিছুতেই।

ঘড়িতে দেখল সাড়ে চারটে বাজে। মাথার পাশের জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা আওয়াজ করে ঘুরছে। ফ্যাকাসে একটা চাঁদ ঝুলে আছে আকাশ থেকে। চারতলায় রুম ওর। ছাদে কারা যেন এখনও হিহি-হোহো করছে। সারারাত পার্টি হয়েছে আজ।

ফেসবুক খুলল সৌর। টাইমলাইন ছেয়ে গেছে গত সন্ধের মেট্রোর ঘটনাটায়। পক্ষে- বিপক্ষে কত মতামত, কত লেখা, কত গালাগালি, কত বেশ করেছে। কারা আবার কল দিয়েছে, আজ বিকেলে শ্যামবাজার মেট্রোর সামনে জমায়েত করে সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরবে। এসব পেরিয়ে দু'তিনটে ভিডিয়ো, ছবি আর তার কমেন্ট সেকশন ঘেঁটেই আত্রেয়ীর প্রোফাইলটা পেয়ে গেল সৌর। আত্রেয়ী মল্লিক। লিভস ইন ব্যারাকপুর। ম্যারেড টু মৃণাল রায়। দুটো মানুষ কি ঘুমোচ্ছে এখন? নাকি প্রচণ্ড ঝগড়ার পরে জেগে বসে আছে?

এতক্ষণে সৌরর মনে পড়ল ঋকের এককালীন 'নিষিদ্ধ প্রেম'কে। এর আগে দু'-একবারই ওদের একসঙ্গে দেখেছে ও। একবার কলেজ স্কোয়ারে, আর-একবার সম্ভবত সেন্ট্রাল মেট্রোতেই। বহুবার ঋককে খুঁচিয়েছে সৌর। পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারেনি। তবে সেসব হয়েও গেল আজ তিন বছর। ঋক কি জানে কালকের ঘটনাটা? নাকি ও নিজেই একবার বলবে? ফেসবুক বোদ্ধারা আপাতত পাবলিক ডিসপ্লে অব অ্যাফেকশন ভার্সাস মরাল পুলিশিং এর লাইনে বিভক্ত। সম্ভবত পাবলিক এখনও বাকি তথ্যটুকু খুঁড়ে বের করার সময় সুযোগ পায়নি। একজন বিবাহিতা মহিলা মেট্রোয় পরপুরুষের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে জানলে এসব বিতর্ক কোথায় পিছনের লাইনে চলে যাবে। এ সমাজে পরীক্ষার খাতা দেখা শুরুই হয় মেয়ের চরিত্র ঠিক আছে ধরে নিয়ে। সেখানে বাই চান্স কিছু এদিক ওদিক হলে লাল কালিতে মাইনাস পঞ্চাশ বসিয়ে তারপরে বাকি সব তর্ক- বিতর্ক। সৌর একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রাখল

মাইনরিটি কিন্তু শুধু ধর্মের দিক থেকে হয় না। নিজের ভাবনাচিন্তার দিক থেকে হয়, নিজের প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে হয়। নিজের অনুভবের দিক থেকে হয়।

আত্রেয়ীকে। তারপর উঠে সিগারেট ধরাল। খুব খিদে পাচ্ছে। গায়ে টি-শার্টটা গলিয়ে ইমার্জেন্সির দিকে হাঁটা লাগায় ও।

মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি গেটের উল্টো ফুট শুধু সারাদিন নয়, সারা রাতও জেগে থাকে। তবে সবটুকু নয়। হাতে গোনা তিন-চারটে দোকান। শিবুদা বানায় চা-ডিমটোস্ট-ঘুগনি। পাশে পরেশদার ঠেলায় সিগারেট-গুটখা। একটু দূরে আর-একটা চায়ের স্টল। জোলো চা বানায়, শিবুদার মতো টেস্ট নেই।

পাঠক, খুব বৃষ্টি-বাদলার দিন না হলে সারারাত শিবুদার দোকানে সৌরদের কাউকে না-কাউকে আপনি পাবেনই। কারও হয়তো পোস্ট-জন্মদিন সেলিব্রেশন, কিছুজনের এমনিই ঘুম টুম কম পায়, কেউ কেউ আবার মাঝরাতে আপস্ট্রিম কালার অথবা ওয়েকিং লাইফ দেখে উঠে উদাস হয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে রাতের কলেজস্ট্রিটে। নাইট ডিউটিতে থাকা ইন্টার্নের সঙ্গে কখনও দেখা হয়ে যায় অন্য হস্টেলে গিয়ে ওঠা একই মফস্সলের সেকেন্ড ইয়ারের। পুরনো ঝগড়া ভুলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিজেদের স্কুলের গল্প করে তারা। আবার মেডিসিনের পিজিটি ভোররাতে ঘুম কাটাতে এসে দেখে একশো বারো নম্বর বেডের পেশেন্টের মেয়েটি অন্যমনস্ক হয়ে চুমুক দিচ্ছে চায়ে। সারাদিন ছুটেছে সে। বাবার জন্য দু'ব্যাগ রক্ত, ওষুধ, ইঞ্জেকশন—যখন যা বলেছে এনে দিয়েছে। এখন রাস্তার ফটফটে সাদা আলোর নীচে এই শেষরাতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মেয়েটিকে দেখাচ্ছে কোনও দেবীর মতো।

"শিবুদা, দুটো স্পেশাল চা দিয়ো। আর ডিমটোস্ট, দু'প্লেট," একশো বারো নম্বর খুব বেশি হলে আর আটচল্লিশ ঘণ্টা মতো টানবে। মেয়েটির কাছে এই পিজিটিকেই ডেথ ডিক্লেয়ার করতে হবে। তার আগে এই ভোররাতে তরুণ ডাক্তারটি তার কাছে গিয়ে মুচকি হেসে চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেবে— "আরে, এত অস্বস্তিতে পড়তে হবে না, নিন নিন।"

তবে আজ অবস্থাটা একটু অন্যরকম। সৌর হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকেই দেখল গেটের সামনে অনেক লোকের জটলা। প্রেসিডেন্সির দিক থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকছে শব্দ করে। আর রাস্তার নেড়ি গুলো তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে। গেটের সামনে এসে সৌর দেখল ভেজা রাস্তার ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাজা রক্তের ছাপ। একটা ফিতে-ছেঁড়া চপ্পল। ব্যাকগ্রাউন্ডে অভ্যস্ত হাতে দুটো ডিম ফাটিয়ে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া সসপ্যানে ছড়িয়ে নিচ্ছে শিবুদা। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ। কারা যেন একটা ভয়ঙ্কর হিংসার চিহ্ন এঁকে রাখতে গিয়েও পারেনি। অসময়ের ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর শিবুদা মিলে আটকে দিয়েছে। সৌরকে দেখে সসপ্যানে ডিমের অন্য পিঠটা উলটে দিয়ে শিবুদা বলল, "পুরো ফাটাফাটি রক্তারক্তি কেস বুঝলে। বাজে মিস করে গেলে!"

## ৮

"দেখুন মশায়, লিখতে গেলে পড়তে হবে বুঝলেন? ভাল বই পড়তে হবে, ভাল সিনেমা দেখতে হবে, ভাল গান শুনতে হবে। এদিকে আমরা আটকে আছি মিডিয়ক্রিটি, ব্যবসা আর নস্টালজিয়ায়। তাহলে আর ভাল সিনেমা-সাহিত্যটা হবে কোত্থেকে?"

জানলার বাইরে অন্ধকার। মাঝে

মাঝে দূরে বিন্দু বিন্দু আলো। তারপর অন্ধকারকে চমকে দিয়ে হঠাৎ এক-একটা উজ্জ্বল স্টেশন। এসব কিছুকে ছাড়িয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে হু হু করে। আলো-অন্ধকার কোনওদিকেই যেন কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই তার। উল্টোদিকের ভদ্রলোকও কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে গত দেড় ঘণ্টা ধরে পৃথিবীর যাবতীয় টপিকের উপর লেকচার দিয়ে চলেছেন পাশের জনকে। সবসময় খুব যে বাজে বকছেন তা নয়। তবে মানুষের সবসময় যে পৃথিবীর সব ভাল ভাল কাজের কথা শোনার মুড থাকে এরকমও নয়।

সওয়া দশটা বাজে এখন। ট্রেন সম্ভবত বোলপুর পেরিয়েছে। এই কামরাটায় লোকজন একটু কম। স্টেশন থেকে রুটি আর আলুর দম নিয়ে নিয়েছিল ছেলেটা। একটু আগে যখন দু'হাজার আটের সাবপ্রাইম মর্টগেজ় ক্রাইসিস আর বিশ্বজোড়া রিসেশন নিয়ে বক্তৃতাটা চলছিল তখনই খেয়ে নিয়েছে সে। সেরকম আর-একটি রিসেশন নাকি আসতে চলেছে। পৃথিবীতে সবকিছুই যে খারাপ থেকে খারাপতর হয়ে অবশ্যম্ভাবী খারাপতম হতে চলেছে এরকমটা গত পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছে ছেলেটি। সে জানলার রডে মুখ রেখে দূরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাথার ভেতর একটা গান বাজছে ওর। দমকা হাওয়ায় তার কথাগুলো ছেলেটির চুল বেয়ে উড়ে যাচ্ছে দূরের দিকে।

সারারাত জ্বলেছে নিবিড়
ধূসর নীলাভ এক তারা
তারই কিছু রং নাও তুমি
শহরে জোনাকি জ্বলে না— নয়তো
কুড়োতাম সে আগুন নীল...

"হোয়াট ডু ইউ থিংক ইয়ং ম্যান?"

হু হু হাওয়ায় মাথার ভিতর উড়তে থাকা গানের ঘুড়ি কাটা পড়ল ছেলেটির। সে সদা চঞ্চল চোখদুটো নিয়ে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

"হুঁ?"

"তোমাদের জেনারেশন কি খুব স্বার্থপর হয়ে গেছে? তোমরা কেরিয়ার, গাড়িবাড়ি, সোশ্যাল স্ট্যাটাস ছাড়া আর কোনওদিকে তাকাও কি? তোমার সামনেই যখন আলোচনাটা হচ্ছে তখন তোমার মতামত নেওয়াটা উচিত আমাদের। হেঁ হেঁ," কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে দুই ভদ্রলোক মাপতে থাকে ছেলেটিকে।

ছেলেটি স্মিত হাসে, "আমি? ইয়ে, মানে আমার খুব কিছু বলার নেই। আপনাদের কথা শুনতেই ভাল লাগছে, বলুন না।"

"নিজের জেনারেশনকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে তোমার কিছু বলার নেই, এ আবার কেমন কথা? তাহলে বলতে হয় তোমাদের জেনারেশন নিজেকে নিয়ে এভালুয়েটও করে না।"

ছেলেটা হাসিটুকু মুখে ঝুলিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোক চশমা খুলে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তারপর আর-একবার খোঁচা দেন, "নাকি তোমাদের জেনারেশন নিজের বৃত্তের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে বলতে গেলে কথাও খুঁজে পাও না?"

ছেলেটি ভদ্রলোকের দিকে সোজা তাকায়। তারপর বলে, "জেনারেশন কেন, কোনও কিছু নিয়েই এরকম জেনারেলাইজ়েশন করাটা ঠিক নয় হয়তো। আমাদের জেনারেশনের সবাই খুব স্বার্থপর কি না বা আপনার জেনারেশনের সবাই নিজের নিজের বৃত্তের বাইরে অন্য ব্যাসার্ধ বা পরিধিদের খোঁজ রাখে কি না সেই আলোচনাটারও কোনও মানে হয় না। আমরা কেউ আমাদের জেনারেশনের অফিশিয়াল মুখপাত্র নই। না-ই আমরা সাদা-কালো-ধূসরতা মিলিয়ে নিজের জেনারেশনের সবকিছুকে বুঝতে পারি বা ধারণ করতে পারি। ফলে ওসব আমার জেনারেশন-আপনার জেনারেশন নিয়ে মনে হওয়া বা এভালুয়েশন করা বলে কিছু হয় না। আমরা খুব বেশি হলে নিজের নিজের বায়াস সহ নিজেদের সামান্য মনে হওয়াগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে পারি আর শেষে জিতে গেলাম ভেবে বাকি
রাতটা মিষ্টি ঘুম দিয়ে সকালে উঠে আবার যে যার বায়াসড জীবনে ফিরে যেতে পারি। নাথিং এলস।"

ভদ্রলোকের চশমা হাতেই রয়ে গিয়েছে। তিনি দৃশ্যতই চমকেছেন একটু।

"তাহলে তোমার মতে কোনও কিছু নিয়েই বড় করে আলোচনা করা যাবে না? পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া যাবে না? হলোকস্ট নিয়েও তুমি সাদায় আর আমি কালোতে বায়াসড হতে পারি? মব লিঞ্চিং নিয়েও আমাদের কিছু মনে হওয়াটা ভিত্তিহীন?"

"সেটা বলছি না। হলোকস্ট খারাপ, মব লিঞ্চিং খারাপ। আমি-আপনি সেগুলো বিশ্বাস করতেই পারি। বিতর্কসভায় সেগুলো বলে হাততালি কুড়োতেই পারি। কিন্তু আমি- আপনি আবার সময় এলেই মবের পার্টও হয়ে যেতে পারি। টিভিতে আগুন লেগেছে খবর দেখে মুখে চুকচুক করেও ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি হয়ে উঠতে পারি। আপনি দিনের শেষে সুসভ্য, রুচিশীল, যুক্তিপূর্ণ হোমো সেপিয়েন্সের ক্লাবে নাম লেখাতেই পারেন কিন্তু ভোলার উপায় নেই আপনার পূর্বপুরুষরাই তার সহোদরদের ঝাড়ে-বংশে খুন করেছে একককালে। আপনি জানবেন নিশ্চয়ই, এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র জীব যাদের জেনাসে একটি মাত্র স্পিসিজ়। ফলে আমাদের এই সামাজিক, সুসভ্য, লজিক্যাল মুখোশ আর ব্যক্তিগত, হিংস্র, ইরর্যাশনাল মুখগুলোর মধ্যে কোনও মিল নেই। আমরা আজন্ম হিপোক্রিট। নিজেদের সেলফ থেকে ডিটাচড। হিপোক্রিটদের, বিচ্ছিন্নদের যুক্তি দেওয়া বা মনে হওয়াটা ভিত্তিহীন নয়, জাস্ট পয়েন্টলেস।"

পাশের ভদ্রলোক একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আছেন ছেলেটির দিকে। প্রশ্নকর্তা ভদ্রলোকটি একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "আই অ্যাম রিয়েলি ইমপ্রেসড। কিন্তু এবার তুমি আমাকে বলো, এই যে তুমি এত অল্প বয়সে নিজেকে এত নির্লিপ্ত হয়ে দেখতে শিখেছ, তাতে লাভটা কী হচ্ছে? তুমি রোজকার জীবনে কি কম কনফিউজড থাকো? বা নিজে আর-একটু বেশি ভাল থাকতে পারো? অন্যকে রাখতে পারো?"

ছেলেটি জানলার বাইরে তাকায়। আর-একটা আলোয় সাজানো স্টেশন পেরিয়ে গেল ট্রেনটা। কাল সকাল সকাল নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা। তারপর জোড়বাংলা হয়ে রঙ্গারুন— ঘণ্টাতিনেক লেগে যাবে হয়তো। বিজনদার সঙ্গে যা কথা হয়েছে সেই মতো রঙ্গারুনে দশ-বারো দিন হয়তো থাকবে। সিংলায় একটা যোগাযোগ হয়েছে, সেখানে এক সপ্তাহ। তারপর হাতে টাকাপয়সা থাকলে বা কোনও ব্যবস্থা করতে পারলে সিকিমে কোথাও। নয়তো ফিরে আসবে। দেখা যাক।

তারপর বলে, "পারি না। থাকি না। কিন্তু তাতে খুব কিছু যায় আসে না আমার। শুধু ভাল থাকতে পারা বা খুব কনফিডেন্টলি এক্ষুনি সব জেনে ফেলা, কোনওটাই তো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ইনফ্যাক্ট, জীবনের উদ্দেশ্য-বিধেয় বলে কিছু হয় বলেও আমি মনে করি না," একটু দম নেয় ছেলেটি, হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে। তারপর বলে, "তবে আমাকে এই ডিটাচমেন্টটা খুব তাড়িয়ে বেড়ায়। বিচ্ছিন্নতা। এলিয়েনেশন। আমরা আমাদের কাজ থেকে, অন্য মানুষ থেকে, নিজেদের থেকে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি যতটা পারি এগুলোর কাছে ফিরতে চাই। শুধু প্যাসিভলি চাই না। অ্যাক্টিভলি সেই ইচ্ছেটার পেছনে সময় দিই, খাটনি দিই। এক রাতে এক হাজারখানা কথা বলে কী লাভ বলুন তো যদি সারাজীবনে তার ভেতর থেকে দু'-একটা ইচ্ছে বাঁচাতেই না পারলাম?"

ভদ্রলোক চুপ করে তাকিয়ে থাকেন

ছেলেটির দিকে। তার নিজের ছেলে এই বয়সিই হবে। হঠাৎ করে মুগ্ধতাটা প্রকাশ করতে চান না তিনি। পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে ছেলেটির দিকে এগিয়ে দেন শুধু—রাজীবাক্ষ রক্ষিত, স্টারলিং রিসর্ট, দার্জিলিং। তারপর একটু থেমে বলেন, "জানি না প্রয়োজন হবে কি না তোমার। কিন্তু কখনও হলে যোগাযোগ করতে দু'বার ভেবো না।"

ছেলেটি হেসে কার্ডটা নেয়। বলে, ''সম্ভবত হবে। আমি আপনার শহরের কাছাকাছিই যাচ্ছি।''

"আরে বাহ্, দারুণ ব্যাপার তো। কোথায়? পারপাস?"

"আপাতত রঙ্গারুন। সেখানকার চা বাগানে লোকজনের চিকিৎসা করব দিন দশেক। তারপর..."

"ওয়েট, ওয়েট। তুমি ডাক্তার?"

"নাহ, খাতায় কলমে হইনি এখনও। তবে মানুষের সর্দি-জ্বর অথবা সুগার-প্রেশার সামলাতে যতটুকু বিদ্যে দরকার সেটুকু আছে আর কী।"

রাজীবাক্ষ বাবু মুগ্ধতাটা ঢাকতে পারছেন না পুরোটা। ট্রেন রামপুরহাট ঢুকছে। তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, বাই এনি চান্স তোমার ছবি কি একবার পেপারে বেরিয়েছিল?

ছেলেটি মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ, দেবাদিত্য। আপনারা কেউ চা খাবেন?"

"আরে আমি দিচ্ছি। তিনটে নাও। বাই দ্য ওয়ে, দেবাদিত্য কী? সারনেম?"

মুচকি হাসে ও। "শুধু দেবাদিত্য, সারনেম নেই..."

তারপর জানলার রডের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে চা-ওয়ালাকে ডাকে, "দাদা, চা দেবেন তিনটে।"

তারপর দু'জনের দিকে চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিতে দিতে হেসে বলে, "অবাক হবেন না এত। অচেনা লোককে আপনি দিয়ে বলাটা অভ্যেস আমার। আমাদের এই আপনি-তুমি-তুই এর হায়ারআর্কিটা একটা দুর্দান্ত থিসিসের টপিক হতে পারে বুঝলেন। অলরেডি কেউ নামিয়ে দিয়ে গেছে কি না কে জানে। যাকগে, আপনার সম্বোধনটার মধ্যে শুরুতে হায়ারআর্কি থাকলেও পরে স্নেহ ছিল। আপনাকে আমি জাজ তো করিইনি বরং ভালই লেগেছে।"

"তুমি শুধু বোদ্ধা তা-ই নও, রীতিমতো ভদ্রও দেখছি।"

চায়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে দেবাদিত্য বলে, "দুটো জিনিস মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ এরকম তো নয়। একই সঙ্গে দুটো হওয়াই যায়।"

ট্রেনের জানলার বাইরে অন্ধকার আর হাওয়া বাড়ে। দেবাদিত্য বসুর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ছুঁয়ে তারা পাহাড়ের দিকে চলে যায়। আর তাদের সঙ্গে ভেসে উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে যায় একটা অসমাপ্ত গানের ঘুড়ি। কাল দুপুরে, পাহাড়ি নদীর পাশে ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হবে তার। ততক্ষণ সে ঘুমোক।

## ৯

একটা ঘুমিয়ে পড়া সময় হঠাৎ করেই মানুষের কোলাহলে জেগে উঠল বিছানার পাশে। খুব কিছু ভেবে ওঠার আগেই জোলো হাওয়া এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল, বদলে দিয়ে গেল কয়েকটা মানুষের জীবন।

বহুদিন পরে ঋকের ভাল লাগছিল হঠাৎ। নিজেকে, হস্টেলের সামনের সেই প্রথম দিনের কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে, জল জমে থাকা বৌবাজার মোড়টাকে। কিন্তু এই যে ভাললাগাটা তাতে ওর বেশ অস্বস্তিও হচ্ছিল। যেন এরকমটা হওয়ার কথা নয়। যেন ভাল থাকাটা প্রাপ্য নয় ওর। এই ক্ষণস্থায়ী ভাললাগাটা নিয়েও বা ও কী করবে? রাতে খাওয়া দাওয়া করে ছাদে গিয়ে ট্যাঙ্কির উপরে শুয়ে ছিল ঋক। একটা জয়েন্ট নিয়ে এসেছিল। সেটা ধরিয়ে গান চালায় ও। বৃষ্টি হচ্ছে না এখন। তবে আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ঠিক তেরো দিন হয়ে গেল ইলোরার সঙ্গে একটাও কথা হয়নি। ইলোরার খুব কিছু যায়ও আসে না তাতে। ঋক জানে। ওর যায় আসে কি না সেটা ও নিজেও বুঝতে পারছে না। কিন্তু ঋক যে বেশ কিছু জিনিস জানে না সেটা নিয়ে ও শিয়োর। সন্ধে থেকে যদিও সেসব জানার চেষ্টা করে যাচ্ছে ও।

যেমন ওর শরীরে, মাথার মধ্যে এই যে একটা মানুষকে নিয়ে উথালপাথাল হাওয়া দিচ্ছে, কয়েক ঘণ্টা আগের প্রতিটা কথা-দৃশ্য-হাসিকে বারবার ফিরে দেখতে ইচ্ছে করছে, ফেসবুকে গিয়ে প্রোফাইল পিকচারের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে, নিজের মনে একটা নাম বলে উঠতে ইচ্ছে করছে— সব মিলিয়ে এই ব্যাপারটার নাম ঠিক কি? এটা হচ্ছেটাই বা কেন? কোনও অল্টারনেট রিয়েলিটিতেই তো এরকমটা হওয়ার কথা নয় ওর। মোবাইল স্ক্রিনে এই নামটা ভেসে উঠতে দেখেই তো ওর রাগ হয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল সেদিন। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। তাহলে অভিমানটা ঠিক কেন হয়েছিল ও কি সেদিন বুঝতেই পারেনি? আমাদের অবচেতন যা জানে তা কি আমরা সচেতনভাবে জানতে ভয় পাই? ফেরার সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে নিজেদের মুখোমুখি বসতে, নিজেদের স্বীকার করতে অস্বীকার করি?

জয়েন্টটা অর্ধেক শেষ করে ঋক। মাথার পাশে রাহত ফতেহ আলি খান। মাথার ওপর ফালি ফালি মেঘের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে জেগে ওঠা বুড়ো চাঁদ। টি-শার্টের ভিতর দিয়ে শরীর ছুঁয়ে যাওয়া কিশোর হাওয়া।

আত্রেয়ীর কথা খুব মনে পড়ছিল ঋকের। ওর ভিতর একটা কেয়ারলেস মানুষ ছিল যে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ঋকের জন্য কেয়ার করত, ওকে আগলে রাখত। একটা ফেসবুক চ্যাট থেকে একটা সম্পর্ক খোলস বদলে বদলে কী দ্রুততায় প্রজাপতি হয়ে ওঠে। তারপর একদিন তার মৃত্যুও হয়। মাত্র দু'বছরে একটা জীবনচক্র পূর্ণ হয়ে যায়। তবু কোথাও একটা সুতো রয়ে যায় তার। কী অদ্ভুত আবেশে গভীর রাতের নেশার ভিতর, পৃথিবীর যাবতীয় ভালর ভিতর, প্রশ্রয়ের ভিতর ফিরে ফিরে আসে তার ডানার রং। আবার কত সম্পর্ক বছরের পর-বছর ধরে নামহীন ধূসর পোকার মতো পড়ে থাকে। কোন মুগ্ধতার ভিতর একদিন তাদের পথচলা শুরু হয়েছিল সেসব মনে পড়ে না আর। তারা চলে গেলেই যেন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তবু কী এক অভ্যেসে অথবা ক্লান্তিতে সেসব সম্পর্ক নিজেই নিজেকে টেনে নিয়ে যায়। আর নিজেদের মুখোমুখি বসতে, নিজেদের স্বীকার করতে অস্বীকার করা দুটো মানুষ এক জরাগ্রস্ত সম্পর্কের বেঢপ পেটের ভিতর আটকে থেকে ঘষটে চলে আজীবন কাল।

তাল কাটল ঋকের। নীচের ইয়ারের একটা গ্রুপ এসেছে ছাদে। কারও একটা জন্মদিন। কেক-কাটা, হইহই, চিৎকার। এই গ্রুপটার সঙ্গে কোনওদিনই খুব একটা ক্লোজ় নয় ঋক। ছেলেগুলো খুব লাউড, চালচলনে একটা মারি তো গন্ডার লুটি তো ভান্ডার ভাব সব সময়। শুধু কলেজে কাজের জন্য অথবা মেসে খাবার টেবিলে ভদ্রতার খাতিরে যতটুকু সম্পর্ক রাখতে হয়। কাল বিকেলে এদের মধ্যে পল্লব, সুমিত আর ওদের ইয়ারেরই তিন-চারজন মেয়ে ক্যান্টিনে বসে ছিল। পল্লব যে ঋকদের দিকে তাকিয়েই চাপা খিল্লি করছিল, মেয়েগুলো যে ওদের ইঙ্গিতেই হো হো করে হেসে উঠে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছিল সেটা চোখ এড়ায়নি ওর।

হস্টেলে মাস কয়েক যেতে না-যেতে প্রতিটা ইয়ারের ভিতরেই এরকম ছোট-বড় গ্রুপ তৈরি হয়ে যায়। কোনওটা মুখচোরাদের, কোনওটা গেমারদের, কোনওটা পড়াকুদের, কোনওটা সিরিয়াস বোদ্ধাদের তো কোনওটা আবার পল্লবদের মতো 'সুপার-ক্যাজ়'দের। ব্যাপারটা একটা ইয়ারের মধ্যেই আটকে থাকে এরকম নয়। বেশিরভাগ সময়েই

সেকেন্ড ইয়ারের সিনেমা পাগল ছেলে ফাইনাল ইয়ারের সিনেমাওয়ালা গ্রুপে জুটে যায়। রিফার আর স্টাফ হাতবদল হয় ইয়ার থেকে ইয়ারে। হস্টেলে না-চাইলেও সবার দুটো পরিচয়—একটা নিজের, একটা গ্রুপের। ওপেন সিক্রেট। জয়েন্টটা শেষ করে নীচে নেমে এল ঋক। খিদে পেয়েছে বেশ। শিবুদার দোকানে গিয়ে ডিমটোস্ট আর চা খেতে হবে। এর বেশি ভাবতে পারছে না আপাতত।

এমনিতে অ্যাডমিশন ডে-র দিন চাপ থাকেই। তবে আজ একটু বেশিই যেন। সারাদিনে একবারের জন্যও বসতে পারেনি ইলোরা। গোটা ওয়ার্ড ছুটে ছুটে যাদের ইমার্জেন্সি ওটি হবে তাদের স্যাম্পেল পাঠানো, ব্লাড রিকুইজ়িশন, চ্যানেল করা, ফাইল লেখা। তার মধ্যে পেট ব্যথা নিজের। গত একবছর ধরেই মাঝে মাঝে ব্যথাটা হয় ওর। ও পাত্তা দেয়নি। অনেক উদ্ভট কাজের মতোই ইলোরার ব্যথা সহ্য করতেও বেশ ভাল লাগে। এরই মধ্যে আজ বিকেলে একচোট হয়ে গেল।

ফ্লোরের একটা পেশেন্টের ব্লাড টানছিল ইলোরা। আর পেশেন্টের সঙ্গে থাকা লোকটা হাঁ করে ওর ক্লিভেজের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাথা গরম করতে ইচ্ছে করলেও ইলোরা চুপচাপ ব্লাড টেনে টেবিলে এসে বসল। টেবিল থেকে জাভেদ দেখছিল গোটা ঘটনাটা।

"লোকটাকে লাথি মেরে বাইরে বের করে দেব কি?"

"না, দরকার নেই। অভ্যেস আছে।"

"এটা বাসট্রাম নয়, আর তুইও নো-ওয়ান নোস। এটা মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি ওয়ার্ড, তুই একজন জুনিয়র ডাক্তার যে ওর পেশেন্টের ব্লাড টেনে দিলে তার সার্জারি হবে।"

"ছাড়ো, ভাল লাগছে না এসব। প্লাস, তোমাকে আমার শরীরের ট্র্যাফিক গার্ডের চাকরি দিইনি। যদি কিছু বলার থাকে আমি নিজেই বলতে পারব।"

"এরকম করে কথা বলছিস কেন? কিছু হয়েছে?"

"তুমি জানো না কী হয়েছে?"

"মানে, আরও কিছু হয়েছে?"

"মা ডিস্টার্বড আছে। জুঁই গাছটায় আলো করে ফুল ফুটেছে। আর কাল রাত থেকে পেট ব্যথা করছে। আর বলার মতো কিছু হয়নি। বা হলেও মনে পড়ছে না এখন।"

জাভেদ তাকিয়ে থাকে ইলোরার দিকে। এত সহজ, সুন্দর, খামখেয়ালি অথচ গভীর মেয়ে ও আগে কোনওদিন দেখেনি। একটু রাগই দেখায় ও। বলে, "এতক্ষণ বলিসনি কেন পেট ব্যথার কথা? গিয়ে রেস্ট নে। আমি বিপ্রকে বলে দিচ্ছি বাকি ব্লাডগুলো টেনে দিতে।"

"অসুবিধে হচ্ছে না আমার। ব্যথা সহ্য করার অভ্যেস আছে। আর তুমি গার্জিয়ানগিরিটা বন্ধ করো প্লিজ়, ভাল লাগছে না।"

"ঠিক আছে, করছি," তারপর একটু থেমে বলে, "জাস্ট আস্কিং, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট পেন? হাউ ডু ইউ পারসিভ দ্য কনসেপ্ট?"

রিকুইজ়িশন স্লিপের উপরে একটা পাহাড়ের স্কেচ করছিল ইলোরা। সূর্য উঠছে, কয়েকটা পাইন গাছ, দুটো আবছা মানুষ।

"ব্যথা কোনও কনসেপ্ট না। ব্যথা সবচেয়ে ন্যাচারাল, সবচেয়ে সত্যি একটা ব্যাপার। হাউ ডু ইউ নো ইফ সামথিং ইজ় রিয়েল অর আ ফিকশন?"

"জানি না। বল।"

"সিম্পল। শুধু জিজ্ঞেস করো, ক্যান ইট সাফার? ব্যথা অনুভব করতে পারে? বোমায় একজন সামান্য জওয়ানের হাত উড়ে গেলে সে সাফার করে, তার প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কিন্তু সে যার জন্য লড়ছে, সেই দেশ নামক জিনিসটার কিন্তু কিচ্ছু হয় না। তাই সামান্য জওয়ান সত্যি, রিয়েল। সে যাকে বিশ্বাস করে যুদ্ধে নেমেছে সেই অসামান্য দেশ একটা ফিকশন, কনসেপ্ট।"

এক গাদা কাজ পড়ে আছে। ইমার্জেন্সি থেকে কল এসেছে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না জাভেদের।

"কিন্তু সে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা কনসেপ্ট। একজন সামান্য জওয়ান থেকে শুরু করে কোটি কোটি লোক যাতে বিশ্বাস করে। নয় কি?"

"অবশ্যই। ধর্মও তাই। টাকাও তাই। আমি তুমি এগুলোয় বিশ্বাস করি। বাধ্য হই। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের বাবা-কাকারা বিশ্বাস করে এসেছে, আজও করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশ বা ধর্ম সাফার করতে পারে না, টাকা সাফার করতে পারে না। আমরা যন্ত্রণা পাই—শারীরিক বা মানসিক যে ফর্মেই হোক না কেন। তাই আমরা রিয়েল। ধর্ম ফিকশন।"

"কী ভাল বললি!" তারপর একটু থেমে জাভেদ বলল, "তা তুই যন্ত্রণা পেতে ভালবাসিস কেন?"

"পেতে ভালবাসি বলছি না তো। আমরা কেউ যন্ত্রণা পেতে ভালবাসি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইটস্ ইনএভিটেবল। সে আসুক সেটা সচেতনভাবে চাই না, কিন্তু এসেই যদি পড়ে তাহলে তার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে ভাল লাগে। নিজেকে রিয়েল মনে হয়।"

"ইন্টারেস্টিং। কিন্তু একটা কথা বল, আমাদের পেশার দিক থেকে এটা কি পরস্পরবিরোধী নয়?"

"আগে আমি নিজের, তার অনেক পরে পেশার।"

ইলোরার হাত থেকে রিকুইজ়িশন স্লিপটা নিয়ে টানা হাতের লেখায় লেখে জাভেদ।

"ইউ আর নট হেল্পিং জাভেদদা। তুমি আমার জায়গাটা জানো। তুমি সবটুকু জানার পরে আমাকে ভরসাও দিয়েছিলে যে তুমি বন্ধু হিসেবে পাশে থাকবে। সেটা তুমি করছ কি না নিজেই বলো। তুমি আরও ঘাঁটছ আমাকে।"

"তুই নিজে ঘেঁটে আছিস। সেটা থেকে বেরোতেও চাস না। আর তুই আমার ফিলিংটা জানিস না এরকম নয়।"

"নট মাই প্রবলেম স্যর। আমি নিজের ব্রেকআপ সামলাব, ঋক কী অবস্থায় পড়ে আছে সেই চিন্তা সামলাব, আমার গিল্ট সামলাব, তোমার ফিলিং সামলাব—পারব না জাস্ট। ওকে?"

জাভেদ অবাক হয়ে যায়, "এই তুই-ই একটু আগে এত বড় বড় কথা বললি, আবার এই তুইই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এত ইনসেনসিটিভ হতে পারিস কীভাবে?"

ইলোরা টেবিল থেকে উঠতে উঠতে বলে— "দেখে নিলে তো? এবার তুমিই উত্তরটা খোঁজো। পেলে জানিয়ো আমাকে।"

ঋক কতক্ষণ ধরে হাঁটছে ও নিজে জানে না। ডান হাতে পিজি হস্টেল, বাঁ হাতে সারি দিয়ে ভ্যান রিকশাগুলো পড়ে আছে। রাস্তার বড় আলোগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ফুটপাতের উপরে নেমে এসেছে যেন। লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা লোকজন সেই আলোর নীচে, রিকশার উপরে মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। নেড়ির দল চিৎকার করছে ওকে দেখে। সামনে হাড়কাটা গলি। ওর একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখা যাবে গাঢ় লিপস্টিক পরে আট থেকে আটান্নর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে দরজায় হেলান দিয়ে।

ও মেডিক্যাল কলেজের দেওয়ালকে বাঁ হাতে রেখে কলেজ স্ট্রিট ধরে। রাতের বাইক, হন্ডা সিটি মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ করে। ঋকের হঠাৎ খুব একা লাগছিল। হস্টেল থেকে বেরোনোর আগে সৌরকে একবার ডাকলে হত।

এখন ক'টা বাজে? অন্তত দুটো তো হবেই। আজ কী বার যেন? মাথার ভেতর সব অগোছালো হয়ে আছে। সেটায় অবশ্য ভালই লাগছে ওর। ঋকের মনে হয় সে ইদানীং বেশ ভালই আছে। খারাপ ছিল এককালে। সেসব ও মনে করতে চায় না।

ঋক দূর থেকেই দেখতে পায় শিবুদা উনুনে কয়লা দিয়েছে। এরপরে ঘুগনি চাপাবে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিও কি শুরু হল? পরেশদার ঠেলার সামনে জাভেদদা না? আর তার এক হাত দূরেই—গলায়

স্টেথো, পিঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা চুল, নীল কুর্তিতে—চেষ্টা করলেও ভুল হওয়ার নয়, ইলোরা। দু'জনের হাতেই সিগারেট। ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

''দেখেছিলাম আলোর নীচে, অপূর্ব সে আলো,

স্বীকার করি দুজনকেই মানিয়েছিল ভাল।''

ঋক এগিয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। ইলোরার দিকে তাকিয়ে বলে, "কেমন আছিস? অ্যাড ডে-র চাপ কেমন যাচ্ছে?" তারপর জাভেদদার দিকে ফিরে বলে, "বস, সিগারেট হবে একটা?"

জাভেদ কোনও কথা না-বলে প্যাকেট এগিয়ে দেয়। ইলোরা ঋককে দেখছিল চুপচাপ। দেখতে ভাল লাগছিল না খারাপ সেটা বুঝতে পারছিল না। বলে, "তোর এভাবে বেরোনো উচিত হয়নি ঋক। ইউ আর স্টোনড। চোখ লাল হয়ে আছে পুরো!"

"সো?" ঋক ধোঁয়া ছাড়ে এক মুখ।

"এই রাতে রাস্তায় গাড়িঘোড়ার কী অবস্থা থাকে জানিস না তুই?"

"সো?"

"নাথিং, ঠিক আছে।"

শিবুদার চায়ের দোকানের সামনে একে একে জড়ো হয় পল্লবদের গ্যাংটা। ওরা কলেজের ভিতরটা দিয়ে এসেছে। গলা পর্যন্ত গিলে এসেছে সবাই। হাসি, খিল্লি, বাওয়ালে মুহূর্তের মধ্যে শান্ত জায়গাটা মুখর হয়ে ওঠে।

হঠাৎ ঋকদের দিকে নজর ঘোরে ছেলেগুলোর। সঙ্গে সঙ্গে আবার একপ্রস্থ হাসির ঢেউ ওঠে গ্রুপের মধ্যে।

"শালা বারমুডার চেয়েও বড় ট্রায়াঙ্গল তো বস!"

"অন্য কলেজ থেকে এসে আমাদের কলেজের পাখি উড়িয়ে নিয়ে যাবে? এ অপমান কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না ভাই!" অনিন্দ্য খিলখিল করে হেসে ওঠে।

"খাঁচার এরকম অবস্থা হলে পাখি তো উড়বেই ভাই। ম্যাকাও-এর জন্য যদি তিন ইঞ্চির দাঁড় রাখো তাহলে কী আর সে থাকে?"

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। ইলোরার ফরসা মুখটা লাল হয়ে আছে। ঋক আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ঝুলিয়ে এগিয়ে যায় পল্লবের দিকে। ওর মাথার ভিতর শুধু চড়া আলো, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর তার নীচে নামহীন দু'-একটা মুখ। আর ওর শরীরের ভিতর, হাতের ভেতর শিবুদার সদ্য কয়লা দেওয়া একটা গোটা উনুন।

"তোর প্রবলেমটা কোথায় পল্লব?"

"তোমার প্রবলেমটা কোথায় ঋকদা? ওখানে? সে তো ডেফিনিটলি আছে! আর কোথাও?"

পাশ থেকে সুমিত দেঁতো হাসি দেয়— "ঋকদা না দি, সেটা আগে কনফার্ম হওয়া দরকার।"

জাভেদ আর ইলোরা ঋককে এবং ঋক নিজেকে সামলানোর আগেই ওর শরীরের ভিতর জ্বলতে থাকা পুরো উনুনটা হাত বেয়ে নেমে এল সুমিতের চোয়ালে। সুমিত ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। ঠোঁট কেটে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

পল্লব, অনিন্দ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে ঋকের উপর। ঋক ধাক্কা খেয়ে দোকানের পাশে রাখা ইটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। চুল ভিজে রক্ত গড়িয়ে পড়ল ফুটপাতে, রাস্তায়। আর সব অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে ও দেখতে পেল উস্কোখুস্কো চুল, শেভ না-করা দাড়ি আর মোটা কাচের চশমায় একটা লোক ওর মাথাটা দু'হাতে তুলে নিচ্ছে নিজের কোলে।

## ১০

নির্বাণের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। কবিতাটা পড়ে শ্রীতমা উঠে চুপ করে বসে থাকে, অনেকক্ষণ। ব্যালকনি থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো হাওয়া তেজ-কমে আসা রোদের সঙ্গে মিশে ঢুকে আসছে ঘরের ভিতর। এই তো সেদিন—এক সপ্তাহ আগেই, ময়দানে আর ভিক্টোরিয়ায় এমন গোছানো একটা দুপুর আর তার পাশ দিয়ে কতকাল পরে শ্রীতমার হেঁটে যাওয়া ছিল। কুড়ি বছর আগের নির্ভার হাসি ছিল, মিউজিয়ামের সামনের ফুটপাতে ঝুমকো দুল পছন্দ করা ছিল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালের সামনে পাপড়ি চাট ছিল। আজ দুপুরটা একই আছে, শুধু দেওয়ালের সঙ্গে ম্যাচিং করা পর্দাগুলো ওর মতোই বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে।

"কি করে এরকম কয়েকটা লাইন লিখতে পারো বলো তো? একই সঙ্গে ভালও লাগায়, আবার কষ্টও দেয়? ভালবাসায় কেয়ারলেস হয়ে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে, আবার পাশাপাশি অপরাধবোধও কাজ করে?"

নির্বাণ কিছু বলে না। বালিশে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

শ্রীতমা হেলান দেয় ওর গায়ে, "বলো কিছু, অস্বস্তি হচ্ছে খুব।"

"একটা সিগারেট ধরানো যাবে?"

"রুমে গন্ধ থাকবে না?"

"ভেন্টিলেশন ভালই তো। চারঘণ্টা পেরিয়ে থাকার কথা না।"

"ধরাও তাহলে। আর প্লিজ় বলো কিছু। ভাল লাগছে না আমার নির্বাণ। বিহ্বল লাগছে সব মিলিয়ে।"

একবুক ধোঁয়া ছাড়ে নির্বাণ। শ্রীতমার মনে হয় ধোঁয়া ছাড়ার বাহানায় জমে থাকা বেশ কিছু দীর্ঘশ্বাসও উড়িয়ে দেয় ও।

"আমারও খুব কম কিছু ওভারওয়েলমড লাগছে না শ্রী। আর এরকম নয় যে আমার কষ্ট হয় না, ভেতরে অপরাধবোধ কাজ করে না। কী করছি, কেন করছি, সবাই মিলে একসঙ্গে কষ্ট পাওয়ার এত আয়োজন নিজে দায়িত্ব নিয়ে কেনই বা করছি সে সব মনে হয় না।"

"তুমি প্লিজ় একবার বলো আমরা ঠিক করছি তো?"

"শরীরের আবার ঠিক ভুল কী?"

"এখন এরকম ভাসা ভাসা কথা শুনতে ভাল লাগছে না নির্বাণ।"

দূরে আওয়াজ করে একটা মেট্রো চলে যায়। এক স্টেশন থেকে আর-এক স্টেশন। মানুষ নিজের নিজের জায়গায় ওঠে, নেমে যায়। তারপর অন্য মানুষ পেটে নিয়ে সে ফিরে আসে আবার। এরকম দুপুরের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য, দুটো মানুষের সুখ- বিহ্বলতা-অপরাধবোধ-নিরাপত্তাহীনতার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য এ শহরের সময় নেই।

নির্বাণ সিগারেটটা শেষ করে ফিল্টারটা ছাইভরা অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে দেয়। পাথরের উপর কাজ করা দামি অ্যাশট্রে। গোটাকতক ক্লাসিকের ফিল্টার পড়ে আছে তাতে।

"তুমি আমার কথা ইলোরাকে ঠিক কতটা বলেছ?"

"অনেকটাই— কথা বলতে ভাল লাগে। তোমার ভাল-খারাপ থাকার ওপর আমার ভাল-খারাপ থাকাটা ডিপেন্ড করে।"

"আর? গত দশদিনের কথা বলেছ? আজকের কথা বলবে?"

"হ্যাঁ, সেদিন ফিরে এসেই বলেছিলাম ওকে। পরশুর হোয়াটস্যাপ চ্যাটের কথাটাও," তারপর নির্বাণের চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে শ্রীতমা বলে, "কিন্তু আজকেরটা বলতে পারব না হয়তো। জানি না।"

"একটা কথা বলো আমাকে, তোমার কাছে এই পুরোটাই কি জীবনটাকে আর-একটু রঙিন করার চেষ্টা নয়? মানে কিছুই না-হওয়ার জায়গায় অন্তত একটা কিছু হোক? বোর হতে হতে হাঁপিয়ে উঠেছ?"

হাওয়া এসে খেলা করে ঘরের ভিতর। পাশাপাশি থাকা দুটো মানুষের মাঝের শূন্যস্থানে।

হঠাৎ চোখ ভিজে যায় শ্রীতমার। ও সরে আসে বিছানার একপাশে।

"তুমি শুধু আমার বোরডম কাটানোর মানুষ? ঠিক আছে। কিন্তু সেটাই যদি হয়

তাহলে সেই চেষ্টাটা কে না করছে নির্বাণ? তুমি করছ না?"

নির্বাণ ছুঁতে যায় শ্রীতমাকে। আরও সরে বসে শ্রীতমা।

"সরি, আমি ওভাবে বলতে চাইনি।"

"না ঠিক আছে। সরো।"

"শ্রী প্লিজ়। এটা অস্বীকার করবে তোমার গোছানো সংসার আছে, সিকিয়োরিটি আছে, বারোশো স্কোয়ারফিটের হাওয়া খেলে যাওয়া ফ্ল্যাট আছে, মডিউলার কিচেনে নাম না-জানা চিকেন ডিশ আছে, উইকএন্ডে বান্ধবীদের সঙ্গে সিটি সেন্টার আছে, ডাক্তার মেয়ে আছে, তার সঙ্গে মন খুলে শেয়ার করার উপায় আছে। আমার কী আছে? ফ্রাস্টেশন ছাড়া? ইনসিকিয়োরিটি ছাড়া? কিছু একটার জন্য অপেক্ষা ছাড়া?"

"এগুলো থাকাটা কি আমার দোষ নির্বাণ? নাকি তোমার না-থাকাটায় আমি খুব চাইলেও কিছু করে উঠতে পারব? আমার ইচ্ছে হয় না তোমার পাশে দাঁড়াতে? কিন্তু সেটা পসিবল কি? নাকি তুমি এগুলো জানো না কিছু? জানতে না? কিন্তু এটাও বা তুমি কীভাবে বলতে পারলে যে তোমার সঙ্গে এই সবটাই শুধু আমার বোরিং জীবনকে একটু রঙিন করার চেষ্টা?"

নির্বাণ চুপ করে বড় আয়নাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজেদের দেখা যাচ্ছে সেখানে। ঠিক পাশেই ফটোফ্রেম। ইলোরার মুখে শ্রীতমার মুখ বসানো পুরো। সেই আন্দোলনের সময় ইলোরাকে একদিন দেখেছিল নির্বাণ। অনশন মঞ্চের একদিকে বসেছিল। আর-একদিন কলেজ স্কোয়ারে। আলাপ করার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি। আর আজ? এই রোদ-হাওয়ার ওপাশে কে বসে বসে কাগজের ঠোঙায় জীবনের গল্পগুলো লিখছে? সে এবার বিসিএস-এর দৌড়টায় নির্বাণকে জিতিয়ে দিতে পারে না?

বৃষ্টি আর শরতের খেলায় আপাতত দ্বিতীয়জন জিতে গেছে। সে চুপিচুপি এসে জড়িয়ে ধরেছে এ শহরকে। এই ইট-কাঠের শহরকে যতটুকু পারে আর কী। মানুষ, জ্যাম, উঁচু উঁচু বাড়ি, হর্ন পেরিয়েও সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সবুজ দেখতে ভাল লাগে এ সময়। মাথার উপর থেকে ঝরে পড়ে বয়স ফুরিয়ে-যাওয়া পাতা। গাছেদের ভিতর দিয়ে তেজ কমে আসা রোদ এসে পড়ে থাকে ফুটপাতে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। গুঁড়ো গুঁড়ো হাওয়া ময়দান-ভিক্টোরিয়া-লেক গার্ডেনের উঁচু ব্যালকনি ছুঁয়ে ইলোরার চুলে হাত বুলিয়ে ডুবে যায় লেকের জলে।

মেট্রো থেকে নেমে হাঁটছিল ইলোরা। রাসবিহারী হয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের এই রাস্তাটা বড় প্রিয় ওর। স্কুল থেকে বেরিয়ে শাঁওলির সঙ্গে গল্প করতে করতে কত কতদিন এই রাস্তায় ঘুরেছে। আজ অবশ্য একাই। ইয়ারফোনে রাহত ফতেহ আলি খান। পাশের দেওয়ালে একটা মেয়ের গ্রাফিতি—পুরোটাই কালো, অবয়বটুকু বোঝা যাচ্ছে শুধু। ছোট করে কাটা চুল, একটা স্কার্ট পরা। হঠাৎ দেখে ব্যাঙ্কসির 'বেলুন গার্ল' কে মনে পড়ে যায়। যদিও এই মেয়েটি সামান্য, নাম না-জানা একজন। নীচে লেখা 'Missing girl—Call 1098.'

শাঁওলিও তো হারিয়েই গেছে। এই নম্বরে কল করে ইলোরা যদি বলে, আমি একদিন এ পৃথিবীর তীব্রতম ভালবাসা পেয়েছিলাম যে মেয়েটির কাছ থেকে, যার হাত ধরে প্ল্যান করেছিলাম যা-ই হয়ে যাক না কেন, সারাজীবন থেকে যাব একসঙ্গে, সে হারিয়ে গেছে, তাকে যেভাবেই হোক খুঁজে দিন প্লিজ়— হয় না?

যেমন ঋককে নিয়ে, ওর সঙ্গে আলোয় বাঁচা এই এতগুলো বছরকে নিয়ে একটা সময় চলে গেছে। তাকে চাইলেও আর ছুঁতে পারছে না ইলোরা। এটা তো শুধু গত একমাস নয়, অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল। কেন হচ্ছিল তা ও জানে না। ওর কষ্ট হয়েছে, অসহায় লেগেছে, নিজেকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করেছে সময় সময়। কিন্তু কোনও কিছু করেই ও আর সময়টাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এখানে মৈনাক কেউ না, জাভেদ কেউ না। ও আর ঋক ফুরিয়ে গেছে। যেমন ও আর শাঁওলি ফুরিয়ে গেছিল একদিন।

"এক্সকিউজ় মি, একটু ব্যাগটা সরাবেন? আসলে অন্য কোথাও জায়গা নেই তো, তাই আর কী..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই!" কান থেকে ইয়ারফোন খোলে ইলোরা।

মেয়েটির মুখটা হাসি হাসি। কিন্তু সেই স্থায়ী হাসিমুখের উপরে একটা কষ্টের প্রলেপ পড়ে আছে যেন। মেয়েটি প্রাণপণে সেটা তুলতে চাইছে। এই প্রসাধন তার
জন্য নয়।

রোদ পড়ে আসছে। একটা ট্রেন ছেড়ে-যাওয়া বিকেল জাগছে চরাচর জুড়ে।

ইলোরা থমকায় একটু, "ওয়েট, আপনাকে আমি চিনি, না?"

আত্রেয়ী একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেছে দুম করে। আর-একটু হাঁটলে খালি বেঞ্চ পাওয়াই যেত নিশ্চয়ই। না হয় বাঁধানো পাড়েই পা ঝুলিয়ে বসত।

তারপর হেসে বলল, "আমাকে এখন সবাই চেনে। আপনিই বা চিনবেন না কেন!"

"শুধু ভাইরাল ভিডিয়োর জন্য চিনি না কিন্তু!"

আত্রেয়ী কী বলবে বুঝতে পারছে না। ও লেকের ওপাশে গাছগুলোর মাথা পেরিয়ে জেগে থাকা বহুতলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, "আমিও চিনি তোমাকে। সরি, তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে কোরো না।"

একটা বড় জয়েন্ট শেষ করেছিল ওরা দু'জনে। এই চেনা জানা সবকিছুর বাইরে পড়ে থাকা ঋকের জন্যই ইলোরা একদিন সাড়া দিয়েছিল ওর ভালবাসার ডাকে, পাগল হয়েছিল। সেই ঋক মাথায় চারখানা স্টিচ নিয়ে অবজ়ারভেশন ওয়ার্ডে শুয়ে আছে এখন।

ইলোরা হেসে ফেলে, বলে "কী অদ্ভুত, না?"

আত্রেয়ীও হাসে, "হ্যাঁ, খুব অকওয়ার্ডও," তারপর একটু থেমে বলে, "তুমি কি আমার ওপর রেগে আছ? বা ঘেন্না? কথা বলতে না-চাইলে আমি ওপাশে গিয়ে বসতেই পারি কিন্তু। সরি, এরকম একটা অবস্থায় ফেলার জন্য।"

"একেবারেই রেগে টেগে নেই। আর ঘৃণা খুব স্ট্রং একটা শব্দ, ইউজ় করবেন না এভাবে। আমি এ পৃথিবীর কাউকেই ঘৃণা করি বলে মনে হয় না।"

"বেশ," তারপর ইলোরার দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী বলে, "আমি ঠিক জানি না আমার কী বলা উচিত, বুঝতে পারছি না। সরি।"

ইলোরা আবার হাসে। বলে, "আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। বাই দ্য ওয়ে, 'তুমি' বলি? তাতেই দু'জনে বেশি কম্ফর্টেবল হব।"

মুখের থমথমে প্রলেপটা এক নিমেষে কোথায় ধুয়ে যায় আত্রেয়ীর। বলে, "অবশ্যই," তারপর কিছু বলতে গিয়েও দূরে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোলের উপর পড়ে থাকা ব্যাগটা নিয়ে অযথাই খুটখুট করতে থাকে।

"আরে এত কী ভাবছ, কী মুশকিল? এরকম হলে তো সত্যিই উঠে যেতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, তোমাকে কিন্তু ছবির থেকেও দেখতে সুন্দর!"

"ধুস। থ্যাঙ্কস। আর তোমাকেও। ঋকের পছন্দ আছে বলতে হবে!" মুখ টিপে হেসে ওঠে আত্রেয়ী।

ইলোরা বলে না কিছু, একটা ভদ্রতার হাসি ঝুলিয়ে রাখে ঠোঁটে।

"এই, আমি সরি তোমাকে হার্ট করে থাকলে। সত্যিই এভাবে কথা বলাটা দু'জনের জন্যই অস্বস্তিকর, বুঝতে পারছি। আমি উঠি। আর হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কয়েক দিন আগে। তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করোনি কিছু, কিন্তু না-বললে আমার অস্বস্তিটা কাটছে না। আমাদের আর কথা হয় না, প্রায় তিন বছর। ওকে সেদিন হঠাৎ দেখলাম, খুব

ডিস্টার্বড ছিল। পরে একবার খোঁজ নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু নিজের জীবনেও এত কিছু সামলাতে হচ্ছে যে সময় করে উঠতে পারিনি আর। আশা করি ও ঠিক আছে এখন," তারপর হঠাৎ ইলোরার হাত ছুঁয়ে বলে, "তোমরা ভাল থেকো খুব, ঠিক আছে?"

ইলোরা ধীরে ধীরে বলে, "ঋক ঠিক নেই আত্রেয়ীদি। আমাদেরও আর ভাল থাকার প্রশ্ন নেই। তুমি বসো এখানে, আমি এমনিতেই উঠতাম। ভাল থেকো, সাবধানে থেকো তুমি। আমার কাছে নম্বর আছে তোমার, একটা পিং করে রাখব, সেভ করে নিও। আসি।"

দুটো মাছ ঘাই মেরে ওঠে সামনে। যে হাওয়া আর সময়টা বহুদূর থেকে বয়ে এসে ডুবে গিয়েছিল লেকের জলে তারা মুহূর্তের জন্য হলেও ভেসে ওঠে। তারপর তারা চিরতরে মিলিয়ে যায় অনন্তকাল ধরে চলতে থাকা গল্পের ভিতর।

অবজ়ারভেশন ওয়ার্ডে ডানদিকের একদম কোণের বেডটায় ঋক চোখ বুজে শুয়ে ছিল। মাথায় ব্যান্ডেজ। জেগে না ঘুমিয়ে কে জানে। কাল ইমার্জেন্সিতে স্টিচ হওয়ার পরে সৌর হস্টেল চলে গেছিল। জাভেদদা নিজেই সেলাই করেছিল। তার মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে ঋকের। সারারাত জাগা, নেশার ঘোর থেকে বেরোতে পারেনি, বেশ কিছুটা রক্তও বেরিয়েছে, তার উপর মাথায় ধাক্কা লেগে একরকম অজ্ঞান হয়ে গেছিল। সব মিলিয়ে অবজ়ারভেশন ওয়ার্ডে থাকাটা প্রয়োজন। সিটি স্ক্যান রিপোর্ট ঠিক থাকলে আর ও নিজে সুস্থ বোধ করলে বিকেলেই ছেড়ে দেওয়া যাবে না হয়।

"কী ব্যাপার বল তো? ভিলেনদের হাতে মার খেয়ে ব্যাটম্যান মাথায় স্টিচ নিয়ে হাসপাতালের বেডে পড়ে আছে আর বারো ঘণ্টা পর রবিনের উদয় হচ্ছে। এ তো মেনে নেওয়া যায় না।"

সৌর হাসে। একটা স্যালাইন সেট রেডি করছে পারিজাতদি। ওর সঙ্গে সৌরর একেবারে ভাইফোঁটা-রাখি বাঁধা লেভেলের দিদি-ভাইয়ের সম্পর্ক।

"আরে শুধু হাসলে হবে? হাসপাতাল তো একেবারে জিওটি-র সেট হয়ে গেছে রে। হিরো, হিরোইন, ভিলেন, রোমান্স, অ্যাকশন। ভাই, আমরা ডিউটির চাপে দু'-একটা এপিসোড মিস করে গেলে আপডেট দিয়ে দিস প্লিজ়।"

সৌর হেসে বলে, "এই বলছ ব্যাটম্যান, এই বলছ জিওটি। কী কনফিউজড মাইরি তুমি।"

"ওই হল, সব এক গাঁজাখুরি। আমরা সারা সন্ধে সিরিয়াল দেখলে খোঁচা মারিস। আর তোর সিরিয়ালে সব ড্রাগন, জোম্বি, আর ভাই-দিদি-পিসি-ভাইপো সবাই সবার সঙ্গে শুয়ে বেড়াচ্ছে। যত্তসব। শালা ফটফট করে ইংরেজিতে বললে আর হেবি হেবি লোকেশনে ড্রাগন আর যুদ্ধ দেখালে সব আধুনিক, উন্নত হয়ে যায় বল? হুঁহ।"

"হয়েছে বাবা। আর খোঁচাব না তোমার দুটো বৌ চারটে ননদ আর ব্যাকগ্রাউন্ডে কড়াৎ কড়াৎ মিউজ়িকওয়ালা ক্যাচাল সহ সিরিয়ালকে। এবার বলো তো আমাদের ব্যাটম্যানের কী খবর?"

পারিজাতদি সিরিঞ্জে অ্যামোক্সিক্ল্যাভ লোড করতে করতে বলে, "ভালই তো আছে। একটু আগে বিপি দেখলাম, একদম ঠিকঠাক। খাওয়া-দাওয়া করে এই একটু আগেও মোবাইল ঘাঁটছিল, এখন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে," তারপর একটু থেমে সৌরর দিকে ঝুঁকে গলার পর্দা একঘর নামিয়ে বলে, "জাভেদ ওর কে হয় রে?"

মাইনরিটি কিন্তু শুধু ধর্মের দিক থেকে হয় না। নিজের ভাবনাচিন্তার দিক থেকে হয়, নিজের প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে হয়। নিজের অনুভবের দিক থেকে হয়।

সৌর হাসে, "কে হবে আবার? জাভেদদা আমাদের সবাইকেই একটু বেশি কেয়ার করে। আমাদের সঙ্গে একটু আলাদা গল্প আছে জাভেদদার, বলব পরে দাঁড়াও।"

"ঠিক আছে," তারপর চোখ টিপে বলে, "হেবি দেখতে কিন্তু, উফ!"

"লাইন করে দেব কি, বলো?"

একটা ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে পারিজাতদি, ''ওসবের বয়স কি আর আছে সৌরবাবু? যা, দেখে আয় তোর বন্ধুকে। আমারও একগাদা কাজ আছে, যাই। পরে ভাটাব।"

আবার পাহাড়ে গেছে ঋক। জুলুকই হবে সম্ভবত। সন্ধে নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে ব্যালকনি। ওদের রুমের ভিতর থেকে হাসি- আড্ডা- গান ভেসে আসছে। এটুকু ছাড়া বাকি চরাচর এক মৌন ঋষির মতো স্থির বসে আছে। সৌর আছে, দেবা আছে, ইলোরা আছে। আর আছে আত্রেয়ী, জাভেদদা। ওরা তিনজনে হেলান দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দূরে। জাভেদদা আর আত্রেয়ীদির মধ্যে সিগারেট হাতবদল হচ্ছে। আত্রেয়ীর তো সিগারেটের গন্ধে গা গোলায়, তবু ও কী সুন্দর টান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে পাইন গাছের দিকে। এই বাড়িটার সামনে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা—সেখানে একটা কাঠের টুল পেতে শিবুদা উনুনে আগুন দিয়েছে। আঁচটা একটু বাড়লেই ঘুগনি বসানো হবে।

আত্রেয়ী গুনগুন করে গান করছিল আকাশ থেকে নেমে আসা মেঘের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ জাভেদদা আত্রেয়ীর আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বলল, ''একবার আমার সঙ্গে হেঁটে আসবে সামনের রাস্তাটায়? জাস্ট আজকের সন্ধেটা, আর কখনও বলব না।''

আত্রেয়ী হেসে ওঠে, ''যাওয়াই যায়।''

ঋকের গলার কাছে একদলা মেঘ এসে আটকে আছে। ওর কষ্ট হচ্ছে খুব। জাভেদদাকে, আত্রেয়ীকে একবার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। বলতে ইচ্ছে করছে, তোমরা যেখানেই যাও আমাকে নিয়ে যেয়ো। আমি তোমাদের ডিস্টার্ব করব না, শুধু পাশাপাশি হাঁটব একটু। কিন্তু ঋকের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ওরাও কেউ ঋকের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। দু'জনে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এমন সময় নীচের রাস্তা দিয়ে পল্লব, অনিন্দ্য, সুমিত একটা বিশাল বড় গাড়িতে তারস্বরে গান বাজাতে বাজাতে উঠে এল। পাহাড়ের এই সন্ধেটা, এই মেঘ, এই অভিমান—সবকিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে। রুমের ভিতর থেকে সৌরদের আওয়াজও আসছে না আর। পল্লবরা ঋকের সামনে এসে ঘিরে দাঁড়াল। সুমিত বলল, ''তুমি এখানে একা ঋকদা। ওই দেখো নীচে, সবাই হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে অন্য পাহাড়ে। ওদের সঙ্গে যেতে হলে এই ব্যালকনি থেকে লাফ দাও এক্ষুনি। নাহ, আমাদের সঙ্গে এসো। বাইরে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে, আমরা কম্বলের তলায় নিজেদের গরম করি একটু।''

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পল্লব এগিয়ে আসছে, ঋকের ঠিক পিছনেই ব্যালকনি, সেখান থেকে সরাসরি নীচে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সৌর,

দেবা, ইলোরা, আত্রেয়ীদি, জাভেদদা সবাই গল্প করতে করতে মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তার বাঁকে। পল্লব এসে ঋকের হাত ধরল। ঋক যে কোনও সময় ঝাঁপ দেবে ব্যালকনি থেকে, শুধু শেষতম সাহসটুকু জড়ো করে উঠতে পারছে না এখনও...

"ওই, ঠিক আছিস? চোখ টোখ খোল বাবা একবার, দেখে ভরসা পাই। ওরে ওঠ বাবা, ওঠ।"

সৌরকে দেখে হাসে ঋক। মাথাটা দপদপ করছে এখনও।

"তুই তো আলাদা লেভেলে খেলছিস ভাই। শেষ পর্যন্ত সিমপ্যাথি ভোটে হেভিওয়েট প্রার্থীকে হারানোর প্ল্যান?"

ঋক হাসে, "পেছনে লাগিস না।" তারপর হাফ-শেষ স্যালাইন বোতলের দিকে তাকিয়ে বলে, "ভাল লাগছে না এখানে। হস্টেল যাব।"

"জাভেদদাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিই, তারপর গেলেই হয়।"

"জাভেদদাকে আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে! সিটি-তে কিচ্ছু নেই, ভাইটালস স্টেবল, ব্যথাও কমে গেছে। হস্টেল গিয়ে একবার জানিয়ে দিস তুই, তাহলেই হবে।"

"ওহে তুমি তোমার রিলেশনের টানাপড়েন আর মান-অভিমানের পালা রিলেশানের মধ্যেই রাখো বস। নিজে ছড়িয়ে লাট করে যখন ফুটপাতের উপর চোখ উল্টে পড়েছিলে তখন এই লোকটাই প্রায় একা তোমাকে ইমার্জেন্সিতে তুলে এনে নিজে হাতে চারখানা স্টিচ করেছে। সে তোমার ট্রিটিং ডক্টর। অতএব ভদ্রতার জায়গা ছেড়েও, পেশেন্ট এথিক্সের জায়গা থেকে সে যতক্ষণ না তোকে ডিসচার্জ করছে ততক্ষণ তুই এ বিছানা ছাড়বি না, বুঝলি?"

ঋক চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে থাকে। তারপর বলে, "তুই স্বপ্নে বিশ্বাস করিস?"

"স্বপ্নে বিশ্বাসটা আবার কী কেস? মানে কুলদেবী স্বপ্নে এসে ইডেন বিল্ডিংয়ের পশ্চিম কোণে যেখানে খুঁড়তে বলবে সেখানে খুঁড়লেই একঘড়া সোনা পাওয়া যাবে এরকম?"

"ইয়ার্কি মারিস না। বল না!"

"আরে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। স্বপ্নে বিশ্বাস-টিশ্বাস আবার কী? মানে জিজ্ঞেস করছিস স্বপ্নের কোনও মানে আছে কি না, বাস্তবের সঙ্গে কোনও লিঙ্ক আছে কি না, তাই তো?"

"হুঁ।"

"আমি জানি না। তুই-ই তো এককালে ফ্রয়েড কপচেছিলি ভাই। আজ আবার নিজের ভ্যালিডেশন চাইছিস কেন? নাকি সেখানেও ঘেঁটেছিস?"

ঋক ফেসবুক খুলে ভিডিয়োটা দেখায় সৌরকে। বলে, "চিনিস এই মেয়েটাকে?"

ওয়ার্ডের ভিতর একটা পুরনো হয়ে যাওয়া হাওয়া তার শরীরে গুঁড়ো গুঁড়ো গল্প ভরে সৌরর চুল, বাঁ-হাতের ট্যাটু, জিন্সের পকেট ছুঁয়ে পাক খেয়ে যায় একবার। ও অনেক কিছু বলে উঠতে চায়, কিন্তু শব্দে ধরতে পারছে না তাদের।

"চিনি না, আবার চিনিয়ো," তারপর একটু থেমে ঋকের দিকে তাকিয়ে সৌর বলে, "এই ঘটনাটা আমি লাইভ দেখেছি রে। খুব কিছু করে উঠতে পারিনি যদিও।"

ঋক দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা। বলে, "একের পর-এক ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে সৌর। আমাদের জড়িয়েই ঘটছে, কিন্তু কেউই কিছু করে উঠতে পারছে না। এটাতেই হেল্পলেস লাগে আর কী।"

"স্বাভাবিক। ছোট থেকে নীতিকথা পড়ে বিশ্বাস করে এসেছিস, বড় হয়ে সন্দীপ মাহেশ্বরী বিশ্বাস করিয়ে এসেছে যে তোর জীবনে যা যা ঘটছে বা ঘটবে সেগুলোয় তোর খুব কন্ট্রোল থাকে। সেগুলোয় তোর অনেক কিছু বলার এবং করার থাকে। সেই বিশ্বাসটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে অসহায় লাগারই কথা।"

এই সৌর খুব অল্প চেনা, কিন্তু ঋকের ভীষণ প্রিয়। সৌরর ট্যাটুটায় আঙুল বোলায় ঋক। সেরোটোনিন-এর রিং স্ট্রাকচার। বলে, "তুই এসে ঘুম ভাঙানোর আগে আত্রেয়ীদির স্বপ্ন দেখলাম জানিস? তোরাও সবাই ছিলি। জুলুকে গেছি আবার।"

সৌর মুচকি হাসে। চেতনে, অবচেতনে একটা গল্প বয়ে চলেছে সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে। সেটা কে লিখছে, সে কী চায়, সে গল্পের কোনও মানে আছে কি না তা সৌর, ঋক, ইলোরা, আত্রেয়ী, নির্বাণ, শ্রীতমা কেউ জানে না। সেই গল্প থেকে বেরিয়ে আসারও কি উপায় আছে কোনও? জাভেদদাকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

## ১১

নতুন শহরে প্রাচীন গল্পের মতো, উইম্বলডন রানার্সের রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠেছে একটা। রাস্তার দু'পাশে বহুতল, চড়া আলো, মাথার উপর জড়িয়ে থাকা
তার পেরিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাকে। আবার বাঁক ঘুরতেই হারিয়ে যাচ্ছে পরক্ষণে।

এইটবি থেকে টালিগঞ্জ মেট্রো পর্যন্ত এই অটো রুটটার সঙ্গে অনেক গল্প জড়িয়ে আছে জাভেদের। সেই কোন কালে প্রথমবার দাদার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি এসেছিল। তখন ভাড়া ছিল ছ'টাকা। চওড়া রাস্তা পেরিয়ে বিক্রমগড়ে ঢুকলেই রাস্তা সরু হয়ে আসে। দোকান, বাড়িগুলো রাস্তার ওপর যেন ঝুঁকে পড়ে খুব উৎসুক হয়ে অটো, লোকজন দেখতে থাকে। এখন ধাপে ধাপে ভাড়া বেড়ে চোদ্দো। ছয় থেকে চোদ্দোর ভিতর দাদার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে গেল, মৃত্তিকার সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ভিউ আর গ্রিন জোন জুড়ে কিশোরী হাওয়ার মতো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল, হোক কলরব হয়ে গেল, মৃত্তিকা আইবিএম জয়েন করে বেঙ্গালুরু আর বাবা ক্যানসারের যন্ত্রণা পেরিয়ে আর-একটু দূরে চলে গেল। এ পৃথিবীতে যন্ত্রণার চেয়ে ধ্রুবক সত্যি যেমন নেই তেমন তার চেয়ে স্নেহশীল অথচ কড়া শিক্ষকও আর হয় না। সে হাতে ধরে বড় করে দেয় মানুষকে, তাকে তৈরি করে রোদ-ঘাম-রক্ত-অন্ধকার মেখে পড়ে থাকা পৃথিবীর জন্য।

আজ অবশ্য ইউনিভার্সিটি আসেনি জাভেদ। আসবেই বা আর কার জন্য। ওয়ার্ল্ড ভিউ আর গ্রিন জোন জুড়ে চার দিকে সব নতুন মুখ, নতুন কথা। দাদার সূত্রেই হোক অথবা হোক কলরব— মেডিক্যালের আন্দোলন জুড়ে যাদের সঙ্গে জীবন জুড়ে গিয়েছিল তারা সময়ের নিয়মেই, জীবনের নিয়মেই দূরে সরে গেছে। প্রত্যেকে লড়ছে নিজের নিজের লড়াইগুলো, হাঁপ ছাড়ার সময় নেই।

থিসিসের কাজে বিজনদার দোকানে এসেছিল ও। কেপিসি পেরিয়ে বাঁ হাতের ফুটপাতে একটা ছোট্ট গলির ভেতর মিত্র জেরক্স। এক ছাদের তলায় ফটোকপি, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং, থিসিসের কাজের পাশাপাশি ট্রেনের টিকিট, কনডাক্টেড টুর, ডিক্যাথলনের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ। বিজনদাকে আর কী কী ব্যবসা করবে জিজ্ঞেস করলে একমুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মধ্যে থেকে হেসে বলে, "মদ, মেয়ে আর মানবিকতা ছাড়া সবকিছু বিক্রি করব বস। দেখতে
থাকো শুধু!"

অটো বিক্রমগড় বাজারের কাছে থামল একবার। এখানে দু'-একজন যাত্রী নামেই, আবার ভরেও যায়। বিক্রমগড় জায়গাটা এই পুরো অঞ্চলটার মধ্যে একটা কসমোপলিটান আইল্যান্ড যেন। পুরনো লোক, পুরনো সময়, চেনা পরিধানের মাঝেই খিলখিলিয়ে হেঁটে যায় হট প্যান্ট, সিগারেট, পিঠে ট্যাটু করা অন্য জনপদের মানুষেরা। বয়স্ক চোখেরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় নিজেদের মতো করে। জাভেদের পাশেই একটা সদ্য কুড়ির কাপল বসে ছিল। চাঁদ আর মানুষ দেখতে দেখতেই জাভেদ আড়চোখে দেখছিল ওদের। ছেলেটি আলগোছে কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে আছে মেয়েটাকে। মেয়েটা হাত নেড়ে নেড়ে কত কিছু

বলছে, পরমুহূর্তেই হেসে গড়িয়ে পড়ছে ছেলেটার গায়ে। ওর ভাল লাগছিল বেশ।

আর ঋকের কথা মনে পড়ছিল। কোথাও একটা জীবন জড়িয়ে গেছে দুটো মানুষের। একটা লম্বা ক্ষতের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কেউ একজন নিপুণ হাতে একে একে সেলাই করছে সেই ক্ষত। প্রতিটা সেলাইয়ের সঙ্গে দু'পারের মানুষগুলো কাছাকাছি আসছে, জুড়ে যাচ্ছে নিবিড়ভাবে। এখান থেকে ফেরার পথ নেই। জোর করে দূরে যেতে চাইলে হাঁ হয়ে যাবে ক্ষতস্থান, রক্ত আর যন্ত্রণা এসে স্থির পড়ে থাকবে সেখানে।

অটো টালিগঞ্জ স্ট্যান্ডে ঢুকছে। ছেলেটা ছাড়তে এসেছিল মেয়েটিকে। আপাতত এই এতদূরই ছিল ওদের পথ। ওরা এবার চলে যাবে অন্য অন্য দিকে। পুরনো মেট্রো বিল্ডিংয়ের সামনের আলো-আঁধারের ভিতর ওরা সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য জড়িয়ে ধরে নিজেদের। আরও কিছুক্ষণ থাকত। এ শহর তা অনুমোদন করে না।

বাঙুরের নতুন বিল্ডিংটার মাথার পাশে চাঁদটার দিকে আর-একবার তাকায় জাভেদ। একটা সিগারেট ধরায়। মোবাইল খুলে দেখে একটা আননোন নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা লাইন এসে জমে আছে, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে— ঋক।' প্রোফাইল পিকচারে 'দ্য ট্রুম্যান শো'র শেষ সিনে দু'হাত প্রসারিত জিম ক্যারি। ঋক 'ইটারনাল সানশাইন অব দ্য স্পটলেস মাইন্ড' দেখেছে?

ঠিক তখনই মেট্রোর সামনে একটা ক্রুদ্ধ মব জড়ো হচ্ছে গলায় স্লোগান আর হাতে হকিস্টিক নিয়ে। কথার ফুলকি উড়ছে হাওয়ায়।

এখানের হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় শিশুদের হাসি, ফুলের গন্ধ। তার মধ্যে বসেই সকাল-দুপুরটা ক্যাম্পে কাটে। দুপুর বলতে ওই দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত। তারপর যা পায় মুখে তুলে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ে দেবাদিত্য। এখানে একটাই চা-কারখানা আছে। কিন্তু সেটা বন্ধ। চা-পাতা তুলে, ওজন করে, বস্তায় ভরে সেগুলো দার্জিলিংয়ের একটা কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই বন্ধ কারখানার সামনেই একটা টেবিল-চেয়ার পেতে ও বসে। একটা বিপি মেশিন, স্টেথো, বিজনদার সংগঠনেরই একটা সাদা প্যাড। বেশির ভাগ লোকেরই কোমর-পিঠে ব্যথা, ঘুমের অসুবিধে, বেশ কিছুজনের প্রেশার বেশি। বাচ্চাদের সর্দি-জ্বর। মেয়েদের অ্যানিমিয়া। এখানে চাইলেই খসখস করে দুটো ব্লাড টেস্ট আর চারটে ওষুধ লিখে দেওয়া যায় না। তাই ভরসা রাখতে হয় নিজের শেখা ক্লিনিক্সের ওপর, চোখ-কান খোলা রেখে মানুষের জীবন দেখতে হয়, ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতে হয়। তবেই রোগ সামনে আসে। তবু কি ও সবকিছু বুঝতে পারে? অস্বস্তি হয় ভিতরে।

একা একা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা সমতল জায়গা দেখে বসেছিল দেবা। সূর্য ঢলে আসছে পাহাড়ের শরীরের ওপাশে। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে নেশা লাগে এ সময়। বাঁকুড়ার গ্রামে পড়ে থাকা মায়ের কথা— বোনের কথা মনে পড়ে যায়। বৃষ্টি এলে টালির চাল বেয়ে রান্নাঘর ভেসে যাওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। ঋক-সৌরর কথা মনে পড়ে যায়। মৈত্রেয়ীর কথা মনে পড়ে যায়। সবার থেকে, এসব স্মৃতির থেকে, লড়াইয়ের থেকে আজ কতদূরে পড়ে আছে ও। নিজেকে মাঝে মাঝে স্বার্থপর মনে হয় দেবার। পরিবার-কেরিয়ার-রাজনীতি-বন্ধুত্ব—ও খুব চেষ্টা করেও কোনওদিনই কারও হতে পারল না। এই ঘরে ফেরা সূর্য আর পাখিদের মাঝে, হু হু হাওয়ার মাঝে ইচ্ছে করে সময়ের পাকদণ্ডি বেয়ে ফিরে গিয়ে জীবনটাকে চোখ-বুজে একটু সহজ করে ফেলতে। হায়, জীবন কী নিষ্ঠুরভাবে একমুখী!

"এতদূরে চলে এসেছেন স্যর! তা কেমন লাগছে এখানে?" একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজলদা। দাদা না বলে অবশ্য কাকু বলাই উচিত। বিজনদার সঙ্গেই সংগঠন করেন। পাহাড়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, গোলগাল চেহারা। পাজামা-পাঞ্জাবি আর চশমায় একটু গম্ভীর গম্ভীর মনে হলেও মুখ খুললেই ঝরে পড়ে অমায়িক হাসি আর আত্মীয়তাবোধ।

দেবাদিত্য হাসে, "হ্যাঁ কাজলদা, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। তা একটু কষ্ট করে স্যর আর আপনিটা কি ছাড়া যায় না? এসে থেকে কতবার রিকোয়েস্ট করলাম বলুন তো?"

চশমাটা খুলে পকেটে ঢোকায় কাজলদা। তারপর দেবার কাঁধে হাত রেখে হেসে বলে, "ও আর ক'টা দিন থাকুন, হয়ে যাবে ঠিক।"

"তার কি আর উপায় আছে!"

"আরে উপায় করলেই উপায় আছে!" তারপর দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "যাকগে, কাল যে পেটফোলা বাচ্চাটাকে দেখলেন, কী মনে হচ্ছে বলুন তো? খারাপ কিছু? বাপটা মরল গত বছর। ওর মা-টা আমার কাছে এসে মাঝে মাঝেই কাঁদে, জানেন স্যর?"

দেবাদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কাজলদা।"

কাজলদা একটু চুপ করে থেকে বলে, "আপনি ইন্টার্নশিপটা করলেন না কেন?"

"ভাল লাগছিল না। ফাইনাল ইয়ার পেরিয়ে উঠে হাঁপিয়ে গেছিলাম একেবারে। আর পারছিলাম না।"

"আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তবু সাহস করে বলি। এই বয়সেই এরকম হাঁপিয়ে গেলে তো হবে না স্যর। মানুষের জন্য কাজ করতে হলে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। নিজের অনেক ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ভাল লাগা-খারাপ লাগাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। ডাক্তারি করতে গেলে সেটা শেষ পর্যন্ত শিখতে হয়। একটা শরীরকে বোঝা, তার দায়িত্ব নেওয়া তো খুব কম কিছু নয় বলুন?"

দ্রুত সন্ধে নামছে পাহাড়ে, উপত্যকায়। একটু পরে মায়াবী চাঁদের আলোয় ভেসে যাবে চরাচর। ফেরার পথ ধরে দেবাদিত্য।

## ১২

এতদিনের সেই চেনা ল্যান্ডস্কেপটা হঠাৎই বদলে গেল। হঠাৎ নয় অবশ্য। সাধারণ মানুষের ভিতর ঘৃণার চাষাবাদের জন্য সময় লাগে, তার মাটি তৈরি করতে হয় নিষ্ঠাভরে। এ শহরে কারা যেন চোখের আড়ালে সেটুকু করেছে এতদিন।

অটো স্ট্যান্ড থেকে টালিগঞ্জ মেট্রোর দিকে হাঁটা লাগালে ডান হাতে পুরনো মেট্রো বিল্ডিংয়ের গায়ে কয়েকখানা তেলেভাজা আর সিগারেট-গুটখার দোকান চোখে পড়ে। আর বাঁ হাতে চায়ের দোকান ছাড়িয়ে দু'পা এগিয়ে গেলে দেখা পাওয়া যায় একটা ছোট্ট মন্দিরের। ভিতরে শিবলিঙ্গ, মা কালীর ফটো। শিবরাত্রির দিন মেয়ে-বৌরা জড়ো হয় সামনে। পুরুত ঠাকুর ওই দিন বেশ ব্যস্ত থাকেন। একটা ছোট্ট চাঁদোয়া খাটানো হয়। বক্সে তারস্বরে গান বাজে, ''আমার এই হরিনাম যাবে সেদিন সঙ্গে গো/ আমি হেলেদুলে যাব শ্মশানঘাটে।'' আর ভিড় বাড়ে কালীপুজোর দিন। ভোগ হয়, তারস্বরে গান হয়, চায়ের দোকানে বিক্রিবাটা হয় জমিয়ে। বাকি দিন ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক মানুষ দ্রুত পায়ে পেরিয়ে যায় ফুটপাথ।

নির্বাণ সেই যে সেদিন বেরিয়ে গেল আর কোনও যোগাযোগ নেই। শ্রীতমা হোয়াটস্যাপ করেছে, রিপ্লাই নেই। বাধ্য হয়ে ফোনও করেছে, ধরেনি। একদিকে কষ্টে নীল হয়ে যাচ্ছিল, আর অন্যদিকে নিজেকে বড্ড খেলো লাগছিল শ্রীতমার। মানুষ কীভাবে এত মিথ্যে হতে পারে, অবোধ্য হতে পারে, ভুল হতে পারে? কী দরকার ছিল তাহলে এত কথা, এত অনুভব, এত কবিতা, এত স্মৃতির? একটা ভারী মেঘ এসে ঢেকে রেখেছে ওকে, ওলট-পালট করে দিচ্ছে সব চিন্তাস্রোত। বুকের উপর ভারী হয়ে পড়ে আছে একটা বিশাল বাটখারা। কোথাও সেটাকে গিয়ে

রেখে এলে একটু শ্বাস নিতে পারত ও। ইলোরা ডিউটি থেকে ফিরে চোখ বুজে শুয়ে গান শুনছিল। শ্রীতমা নক করলেন।

"দরজা খোলা আছে মা।"

শ্রীতমা মেয়ের মাথার কাছে বসলেন।

"বাবা ফেরেনি এখনও?"

"উঁহু। একটু আগে ফোন করেছিল, পার্টি আছে। ফিরতে রাত হবে," বিছানার চাদর খুঁটতে থাকেন শ্রীতমা।

ইলোরা উঠে বসে। জড়ানো গলায় বলে, "কী হয়েছে বলো তো। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে বোধহয় বত্রিশবার জিজ্ঞেস করলাম।"

"তুই কি মদ খেয়ে এসেছিস বুড়ু?"

"বিয়ার মা। বিয়ারটা মদ নয়।"

শ্রীতমা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। জোছনায় ভেসে যাচ্ছে শহর।

"ছাদে যাবি?"

"যাব। তার আগে কাবার্ড থেকে বিপির বোতলটা আর দুটো গ্লাস নিয়ে এসো প্লিজ়।"

"তুই ইয়ার্কি মারছিস নাকি নেশার ঘোরে ভুল বকছিস?"

"একেবারেই ইয়ার্কি মারছি না মা। আর নেশাটা হাফ হয়ে রয়ে গেছে। পুরো নেশা করে সত্যিই একটু ভুল বকতে ইচ্ছে করছে।"

"তোর বাবা এসে দেখবে বোতল খালি, তখন?"

"বাবা কিচ্ছু দেখে না মা। দেখলে বুঝত মানুষ, সম্পর্ক, টান সবটুকু কবে শেষ হয়ে গিয়ে গোটা বাড়িটাই খালি হয়ে পড়ে আছে।"

দুটো গ্লাসের ভিতর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। শ্রীতমা কিছুতেই খেতে চায়নি। মেয়ের জোরের কাছে হার মানতে হয়েছে শেষে। এত উঁচু থেকে শহরের অনেকখানি দেখা যায়। মাথার উপর অপার্থিব আকাশ। নীচে ঝলমলে তবু সারাদিনের শেষে ক্লান্ত শহর। মাঝখানে মা-মেয়ে নিজেদের মুখোমুখি বসে ভাল থাকতে চাইছে।

"কী অদ্ভুত ভাল! জীবনানন্দ, না?"

"হ্যাঁ রে," তারপর দূরে আবছা ভেসে থাকা মেট্রোর লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে শ্রীতমা ধীরে ধীরে বলেন, "কী অদ্ভুত না বুড়ু? একটা মানুষ সেই কতবছর আগে এরকম ক'টা লাইন লিখে গেছে। তার সেই ফিলিংস, সেই উচ্চারণ, সেই লাইনগুলো আজ এতদিন পরে আমি-তুই বসে পড়ছি আবার, শুনছি, ছুঁতে পারছি। আবার দেখ, আমার মধ্যে যে মানুষটা কবিতার প্রতি টান তৈরি করল, পড়তে শেখাল সে আজ আর নেই। কিন্তু এই অনুভবটার মধ্যে, অভিজ্ঞতাটার মধ্যে, সময়টার মধ্যে কি সে-ও কোথাও ধরা নেই? থাকছে না?"

"কিছুই পুরোপুরি হারিয়ে যায় না মা। মানুষ, তার সৃষ্টি, তার স্মৃতি, তার তৈরি করা মুহূর্ত— হয়তো সবই রয়ে যায়। কে জানে।"

শ্রীতমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দারুণ হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায় তা। ইলোরা গলা জড়িয়ে ধরে শ্রীতমার, "তোমার যা ইচ্ছে হয়, যেভাবে ইচ্ছে হয় বলবে একটু?"

"আমার কষ্ট হচ্ছে বুড়ু। নিজেকে খেলো লাগছে খুব।"

"কষ্টটা স্বাভাবিক মা। তুমি নিজেকে যেটুকু ফিল করতে দিয়েছ, একটা প্লেটোনিক ভাসা ভাসা জায়গা থেকে বেরিয়ে একবার হলেও যে সাহসটুকু করেছ সেটা তোমার বয়সে এসে তোমার মতো একজন মানুষের করাটা খুবই রেয়ার। এবং এই গোটা প্রসেসটা যেহেতু নিখাদভাবে তোমার নিজেকে উজাড় করে দেওয়া তাই তোমার কষ্টটা, নিজেকে খেলো লাগাটাও খুব খাঁটি।"

"তাহলে বল এবার কী করব আমি?"

"আপাতত আগে গ্লাসটা খালি করবে, বাকিটা বলছি।"

"মাথা ঝিমঝিম করছে রে।"

ইলোরা দুটো গ্লাসই ভর্তি করে। তারপর বলে, "করুক, তোমার আমার জন্য কোথাও কেউ অপেক্ষা করছে না।"

চাঁদের দিকে তাকিয়েই হোক, নেশার জন্যই হোক অথবা মেয়ের কথা শুনেই হোক, চোখ ছলছল করে ওঠে শ্রীতমার। বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়।

"তুই এই কথাটা কেন বলছিস বুড়ু? তোর জন্য, তোর একটু ভালবাসা পাওয়ার জন্য ছেলেরা হন্যে হয়ে পড়ে নেই বল?"

ইলোরা হাসে, "ব্যাপারটা ওরকম নয় গো। তোমরা ভাবো আমাদের সময় আছে, শরীর আছে, সুযোগ আছে। শুধু আমরাই জানি আমাদের সব থেকেও কিছুই নেই," তারপর একটা চুমুক দিয়ে বলে, "আমার কথা ছাড়ো। এবার শোনো তুমি কী করবে। তুমি স্বীকার করবে মা, মেনে নেবে। কষ্টটাকে, অভিমানটাকে, পাওয়া এবং হারানোটাকে।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী? তার আগে এই যে এত কিছু হল সব আগে থেকে জেনে ফেলতে, প্ল্যান করে গুছিয়ে ফেলতে পেরেছ কি? পারোনি তো। তার পরেরটাও পারবে না শিয়োর। শুধু নিজেকে তৈরি রাখো। ভালবাসা পাওয়ার জন্য, হারিয়ে ফেলে কষ্টটার জন্যও।"

শ্রীতমা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। ইলোরা জড়িয়ে ধরে মা কে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কেউ কোনও কথা বলে না। তবু চাঁদের আলোর নীচে দীর্ঘ কবিতার মতো তারা দু'জন দু'জনকে ছুঁয়ে থাকে অসীম সময়ের জন্য।

"গ্লাসটা শেষ করো, নামব এবার," ইলোরা ফস করে সিগারেট ধরায় একটা।

"বদভ্যাসের তো আর কিছুই বাকি নেই দেখছি," শ্রীতমা টলছে পুরো।

ইলোরা হাসে, "পুরো বখে গেছি। যাকগে, ইয়ে, শোনো না, তোমার অর্গ্যাজ়ম হয়েছিল?"

"বুড়ু, চুপ। একদম চুপ বলছি!"

হেসে গড়িয়ে পড়ে ইলোরা, "আরে বলো না বাবা, উফ!"

"আমি তোর সঙ্গে কোনও কথাই বলতে চাই না।"

"হি হি। বলতে হবে না। তোমাকে আমি একটা জিনিস দেব ঠিক আছে? খুব কাজের। রাত্তিরে পিঠ ব্যথা হলে ম্যাসাজ করো, আবার দুপুরে মিস করলে... হিহি... মাল্টিপারপাস পুরো। আগে জীবনে
আনন্দ চাই বুঝলেন শ্রীতমা মুখুজ্জে, পরে জীবনানন্দ।"

কান্না-হাসি পেরিয়ে মা-মেয়ে উঠে দাঁড়ায় পরস্পরের ভরসায়। অনেকটা পথ ফেরা বাকি এখনও।

কফি হাউসের সামনেই দাঁড়িয়েছিল আত্রেয়ী। এমনিতে কারও জন্য অপেক্ষা করতে হলে মাথা চিড়বিড় করে ওর। কিন্তু এখন খুব একটা খারাপ লাগছে না। রাস্তাঘাট, বইয়ের দোকান, মানুষজন দেখছিল ও।

এত বছর পরে প্রথমবারের জন্য মৃণালকে পজ়েসিভ দেখল আত্রেয়ী। আজ শনিবার। একটু দেরি করে উঠেছে মৃণাল। তারপর শেভ করে গিটার নিয়ে টুংটাং করছিল সোফায়। আত্রেয়ী স্নান করে ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোচ্ছিল। মৃণাল এসে পিছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে।

"আজ বেরোতেই হবে?"

"এমনি করো না। তোমাকে পরশু বলেছি সবটাই।"

"ঠিক আছে, সাবধানে যাও। কী আর বলব।"

আত্রেয়ী হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল ঘেঁটে দেয় মৃণালের, "তুমি মুখ এরকম করে থাকলে কী করে বেরোব বলো তো?"

"নাহ, কিচ্ছু করছি না আমি," তারপর ওর কাঁধে মাথা রেখে বলে, "সন্ধের আগে ফিরলে নেটফ্লিক্সে একটা কিছু দেখতে
পারি একসঙ্গে।"

"তুমি বেছে রাখো, দেখব। আর টেবিলে ডিমের ঝোল, শাক, ডাল সব রাখা আছে। ঠিক সময়ে রাইস কুকারে ভাতটা করে খেয়ে নিয়ো প্লিজ়।"

"নেব। আর হ্যাঁ, ঝামেলা-টামেলা

একটু অ্যাভয়েড করো ইতু। কলকাতা শহরটা তো আর তোমার-আমার বোঝাপড়া জানে না।"

ঝলমলে দুপুর এখন। দরজায়, দেওয়ালে সাঁটানো পোস্টারগুলো দেখছিল ও— রক্তদান শিবির, বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান, সম্প্রীতি রক্ষার জন্য মানববন্ধন। প্রেসিডেন্সির সামনেটায় একটা জটলা। দোকানিরা তাদের হাতের নাগালে থাকা প্রত্যেককেই একবার রুটিন করে জিজ্ঞেস করছে, "ও দাদা এই যে এদিকে, কী বই লাগবে বলুন না।"

"কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছিস?"

ঋককে গত সপ্তাহের চেয়ে অনেকটা সুস্থ লাগছে। এই দুপুরের আলোটুকু লেগে আছে ওর চোখে-মুখে-গলায়।

"দু'ঘণ্টা। ভাবছিলাম চলে যাব, তারপর মায়া হল।"

"ভাগ, দশ মিনিট আগে পৌঁছে এখন মায়াদেবী হয়ে আপারহ্যান্ড নিচ্ছে শালা!"

"দশ মিনিট হোক বা দু'ঘণ্টা, তুই-ই এ পৃথিবীর একমাত্র জন যার জন্য আত্রেয়ী মল্লিক দাঁড়িয়ে থাকে।"

"দশ দিন হোক বা দু'দশক, তুই-ই এ পৃথিবীর একমাত্র জন যার জন্য ঋক স্যানচেজ়ের দাঁড়িয়ে থাকে।"

হো হো করে হেসে ওঠে আত্রেয়ী, "খুবই বাজে এবং বাড়াবাড়ি, কিন্তু স্যর ফর্মে ফিরেছেন দেখে ভাল লাগছে।"

একপ্লেট কাটলেট আর একটা করে কোল্ড কফি নিয়ে উপরের ব্যালকনিতে বসেছিল ওরা। গোটা জায়গাটা গমগম করছে। আত্রেয়ী ফর্কে একটা ছোট টুকরো তুলে ঋকের দিকে এগিয়ে দেয়। ঋক সেটা শেষ করে আত্রেয়ীর দিকে তাকায়, বলে "ভাল লাগছে রে, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"কাটলেটটা না আমাকে না সব মিলিয়ে?"

"কাটলেটটাকে আর সব মিলিয়ে। তোকে কোনওদিন ভাল লেগেছে আমার বল?"

"জানি তো," তারপর কোল্ড কফিতে একটা চুমুক দিয়ে আত্রেয়ী বলে, "তারপর? ঠিক আছিস একটু?"

"আমি কী আছি আমি নিজেই ঠিক জানি না রে। তোকে বললে তুই হয়তো বুঝতে পারবি, বা বলতে গিয়ে আমি নিজেই বুঝতে পারব। তাই এতবার করে বলা।"

"শুরু কর। আর হ্যাঁ, বরাবরের মতো একদম কাঁচা ভার্সনটাই শুনব কিন্তু। ভেজে মশলা মেরে ঝোল বানিয়ে গরম গরম সার্ভ করবি না," ঋক হাসে। টেবিলের উপরে আলগোছে পড়ে থাকা আত্রেয়ীর আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, "আমি জানি না কোত্থেকে শুরু করব বা কতটা গুছিয়ে বলতে পারব, বাট, চেষ্টা করছি। আমার একটা লম্বা ফেজ় ধরে কিচ্ছু ভাল লাগছে না।"

"আমি তোর এরকম কোনও ফেজ দেখিনি বলছিস? শুরুতে যখন তিন-চার মাস পাগলের মতো অবস্থা দু'জনের, তুই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বসে মিস করছিস, আমি ওদিকে কেরলে বসে মিস করছি তখন দুম করে অফ হয়ে যাসনি তুই? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কী হল, কষ্ট হচ্ছে তোকে ছুঁতে না-পারার, তুই ওদিকে সন্ন্যাস নিয়ে বসে আছিস।"

"সেটা এক সপ্তাহের ছিল রে। প্লাস আমি জানতাম আমি কেন ওরকমটা করছি। এই ফেজ়টা দু'মাসের বেশি হয়ে গেল কাটছে না। এবং আমি জানি না এর শুরু কীভাবে হল, শেষই বা কীভাবে হবে। এখন কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমি

> ঋকের গলার কাছে একদলা মেঘ এসে আটকে আছে। ওর কষ্ট হচ্ছে খুব। জাভেদদাকে, আত্রেয়ীকে একবার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

এরকমই। আমার নতুন করে কিছু ভাবার নেই, এক্সপিরিয়েন্স করার নেই, কথা বলার নেই। বা, বলেও কী হবে? দিস হোল ওয়ার্ল্ড ইজ় ফাকড আপ, উই অ্যাজ় আ স্পিসিজ় আর ডুমড। আমি এখানে আকাশের দিকে থুতু আর চিৎকার ছুড়ে কী করব? ছুড়বই বা কেন?"

"তুই-ই একবার বলেছিলি না? সেই বেক'স ট্রায়াড না কী যেন!" তারপর ঋকের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে আত্রেয়ী বলে, "তোর কি ওষুধ খাওয়া উচিত নয়?"

"সবকিছুর এত নাম দিয়ে কী হবে বল তো? ডিফাইন করে কী হবে? ওষুধ খেয়ে শরীরে কিছু কেমিক্যাল বেশি ঝরিয়ে কী হবে? যে পৃথিবীর ভেতর থেকে, বাস্তবের মাটি থেকে এই ক্রাইসিসগুলো, প্রশ্নগুলো উঠে আসছে সেগুলো চেঞ্জ হবে কি?"

"আমি জানি না ঋক। আর সত্যি বলতে কী, আমি ভাবিও না এগুলো নিয়ে। তুই আগেও বলেছিস আমাকে, আমার শুনতে ভাল লেগেছে। এক-দু'বার ভেবেওছি। কিন্তু ওটুকুই। যার ওপর আমার কোনও কন্ট্রোল নেই, সে নেই— আমি সেগুলো ভেবে খারাপ থাকতে পারব না।"

"ব্যাপারটা এত অ্যাক্টিভ নয় রে। যদি হয়ও, আমি জানি না তুই বা বাকিরা কীভাবে পারিস। তোর কি মনে হয় আমি নিজেকে আটকাতে চাই না? ভাবনার, খারাপ থাকার এই চক্রব্যূহটা থেকে বেরতে চাই না? আমি জাস্ট পারছি না!"

আত্রেয়ীর চোখ ছলছল করে উঠল হঠাৎ, "আমি জানি না ঋক তোকে কী বলব, কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে খুব!"

ঋক হাসে। "ধ্যাত, এরকম করিস না। আমি তোকে কিছু করতে বলছি না, শুধু নিজে একটু বলতে চাইছি, নিজের কথাগুলো নিজে শুনতে চাইছি। তুই আমাকে সেটুকু জায়গা দে, তাহলেই হবে।"

"তুই তোর জায়গাটা আমার কাছে জানিস।"

ঋক একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "আরও বলার আছে ইতু..."

হেসে ওঠে আত্রেয়ী, "আমাকে আমার বর ছাড়া কেউ এই নামে ডাকে না," তারপর কাটলেটের শেষ টুকরোটা ফর্কে গেঁথে ঋকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "বলে ফেলো ডার্লিং।"

"প্লিজ় জাজ করিস না।"

"করিনি কখনও। আজও করব না।"

কাঁটা-চামচ দিয়ে গত দেড়মাসকে, নিজের কষ্ট-অভিমান-রাগ-ভালবাসা-অসহায়তাকে ঋক সাবধানে কেটে কেটে সাজিয়ে রাখে ফাঁকা প্লেটের উপর। কফি লেগে-থাকা গ্লাসে নতুন খুঁজে পাওয়া নিজেকে ঢেলে দিয়ে তুলে দেয় আত্রেয়ীর কাছে। ওর দু'হাতের ভিতর উপুড় করে দেয় বুকের নীচে বাঁচিয়ে রাখা জল। আত্রেয়ী মানুষ ভুলে, সময় ভুলে, নিজেকে ভুলে হাতের ভিতর ঋককে নিয়ে স্থির বসে থাকে।

তারপর হঠাৎ ওয়েটারকে ডেকে বিল দিতে বলে। আর ঋকের দিকে ফিরে বলে, "এটা তোর ট্রিট। পাশ করার, প্লাস এতক্ষণ তোর বকবক শুনলাম তার জন্য। জলদি মিটিয়ে দে। তারপর চল।"

"কোথায়?"

"জানি না। এখান থেকে কোথাও একটা।"

শক্ত করে ঋকের হাত চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে আত্রেয়ী। একটু কাঁপছে ও। দ্রুত পায়ে সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে প্রেসিডেন্সির ভিতরে ঢোকে

দু'জন।

"তোর হলটা কী?" ঋক ভেবলে গেছে একটু।

"চুপ, একদম চুপ। ধরে নে পাগল হয়ে গেছি আমি।"

ডান হাতে মেন বিল্ডিংয়ের করিডরে ছেলেপুলেরা এদিক ওদিক বসে আড্ডা মারছে। গিটার ভেসে আসছে সিঁড়ির সামনে থেকে। তাদের পিছনে জেগে আছে দেওয়াল লিখন, আমাদের মন্দিরে আগামী সকালের আজান হোক। মাঠে ফুটবল নিয়ে কসরত চলছে, একটু পরেই ম্যাচ শুরু হবে।

এই সবকিছুকে পেরিয়ে দু'জনে গিয়ে ঢোকে ডিরোজিও বিল্ডিংয়ে। নীচে অল্প কিছুজন দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। আত্রেয়ী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। ফাঁকা করিডর। সোহাগি রোদ এসে লুটিয়ে আছে পায়ের কাছে। ফাঁকা ক্লাসরুম। শরীর উপচে ওঠা ভালবাসা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ডায়াস থেকে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর দিকে। তারপর চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে বেঞ্চের উপর, পড়ে থাকছে মেঝে জুড়ে।

আত্রেয়ী দরজা বন্ধ করে দু'হাতের ভেতর, বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে ঋককে। ওর চুলের ভিতর কাঁপা কাঁপা হাতে আঙুল বোলায়। তারপর ঋকের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। আত্রেয়ীর কোমর জড়িয়ে ধরে সমুদ্রের মতো আদরে ভেসে যায় ঋক। আর মনে হয় ওর সঙ্গেই ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে এই ক্লাসরুম, এই ক্যাম্পাস, এই শহর-মহাদেশ সহ একটা গোটা ছায়াপথ। ওর ঠোঁট দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় আত্রেয়ীর ঘাড়ে-গলায়-পিঠে। আত্রেয়ীও ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয় নিজেকে। শরীরে ডেকে নেবে ঋকের শরীরের প্রতিটা অণুকে, বিরহের প্রতিটা দাগকে, সোহাগের প্রতিটা তরঙ্গকে। তাদের মুক্তি নেই, আর উপায় নেই পিছু ফিরে স্বাভাবিকত্বে ফিরে আসার। অবশেষে এই ভালবাসার ভিতর ডুবে গিয়ে সিঙ্গুলারিটিতে চিরস্থায়ী হবে এই বিকেল, দুটো মানুষ, তাদের শরীর জুড়ে বয়ে যাওয়া রঙিন সৌরঝড়। আত্রেয়ীর দ্রুত হয়ে ওঠা রক্তস্রোতের মধ্যে ভেসে বেড়ায় অপেক্ষায় নীল হয়ে থাকা রাত। ঋকের ঘামে ভিজে যাওয়া স্যান্ডো গেঞ্জির মধ্যে ফুটে থাকে আশ্রয়ের ফুল। এ মুহূর্তে দু'জনে পরস্পরের শরীরের প্রতিটা অণুর ভিতর ঢুকে মিশে যেতে চাওয়ার এই ইচ্ছেটুকুই, এই ভিসুভিয়াস আবেগটুকুই পৃথিবীর একমাত্র সত্যি।

"কেন?" আত্রেয়ীর বুকে শুয়ে ওর কানের পাশ দিয়ে বয়ে আসা এলোমেলো চুলগুলোকে গুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে ঋক। আত্রেয়ী চোখ বন্ধ করেই বলল, "জানি না বাবু। সবকিছু জানতেও নেই।"

"এই যে চোখের কোণ উপচে ভিজে যাওয়া গাল, সেটুকু?"

"এটা ভালবাসার, আবেগের। তোর মতো খাঁটি একটা মানুষকে ছুঁতে পারার আনন্দের।"

ঋক গালে গাল ঘষে ভিজিয়ে নেয় নিজেকে। তারপর বলে, "ওঠ এবার, ফিরতে হবে তোকে। অনেকটা পথ..."

আত্রেয়ী দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঋককে। বলে, "আজ আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না রে," বলেই কিছু একটা মনে পড়ায় হেসে ওঠে।

হেসে ওঠে ঋকও।

সন্ধের আগে আর বাড়ি ফেরা হবে না আত্রেয়ীর। মৃণালের ডাউনলোড ফোল্ডারে দিগন্তে একলা সন্ধেতারার মতো জ্বলজ্বল করছে বিফোর সানরাইজ়।

## ১৪

জাভেদ স্ক্রাব পরে হাত ধুয়ে রেডি হচ্ছিল। হুইপলস আছে একটা, অন্তত ঘণ্টা চার-পাঁচের গল্প। খোদ গৌতম স্যারের সঙ্গে হুইপলসে এস-টু হিসেবে নামার সুযোগ তো আর রোজ রোজ আসে না! তাই ভিতরে ভিতরে বেশ একটু উত্তেজিতই ছিল ও।

ওটিতে ঢুকে দেখে নীলাদ্রি আর শুভজিৎদা অলরেডি টেবিল জুড়ে দাঁড়িয়ে।

"কী ব্যাপার বস? এটায় তো আমার নামার কথা ছিল!"

"তুই নাম, কে বারণ করেছে! স্কিন ক্লোজ় করবি।"

"স্কিন ক্লোজ় করাটা ইন্টার্নের কাজ নীলু, তাহলে সার্জারিতে পিজি কেন করতে এসেছি!"

"সে তুই-ই জানিস ভাই। তাও আমাদের কলেজে! তোর নিজের কলেজেই থেকে যেতে পারতিস, অথবা অন্য জায়গায় যেতে হলে ন্যাশনালে যেতিস, তোরই পাড়া! ভাই-বেরাদররা এসে ভাঙচুর করতে চাইলে তুই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যেতিস, আমাদের সুবিধে হত একটু!" শুভজিৎ কান এঁটো করা হাসি হেসে ওঠে। নীলাদ্রিও হেসে ওঠে।

কান লাল হয়ে ওঠে জাভেদের, "অত্যন্ত ইনসেনসিটিভ কমেন্ট শুভদা। নামের পাশে ডিগ্রি ঝুলিয়ে তোমরা নিজের কলিগকে আউটকাস্ট করবে, তাকে নিয়ে মিডল এজ কমেন্ট করবে আর আমাকে পৃথিবীর সবকিছু ক্যাজ় নেওয়ার দায় নিতে হবে?"

"ওরে আমার সেনসিটিভ মডার্ন এজ আকবর সাব, আগে নিজেদের দিক থেকে সত্যি করেই একটু শান্তি প্র্যাক্টিস কর তারপর না হয় পাল্টা কথা বলতে আসিস।"

স্যর ওটিতে ঢোকায় আচমকা ছাই ঠেলে বেরিয়ে আসা আগুনটা আপাতত ওয়েলকাম-ম্যাটের তলায় চলে যায়। তবু তার মধ্যেই শুভজিৎ চাপা গলায় বলে, "মুখে কুলুপ এঁটে ফরসেপ আর কটারি এগিয়ে দিলে লাস্টে স্কিন ক্লোজ়টা করতে দেব। আর না এঁটে বেশি হিরোগিরি মারালে সেটাও দেব না। যা করার করে নিস!"

বুকের ভিতর অনেকখানি যন্ত্রণার বারুদ নিয়েও জাভেদ মুখে কিছু বলে না। বলতে পারে না। গ্লাভস খুলে, গাউন খুলে ছুড়ে দেয় ওটির বাইরে করিডরে। তারপর চেঞ্জ করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায় ডিএইচবি বিল্ডিং থেকে। দিন কয়েক ধরেই পেটটা মাঝে মাঝে ব্যথা করছে সৌরর। ব্যথাটা ডান পাঁজরার নীচের দিকটায় হচ্ছে। পরশু রাতে তো বেশ গা-গুলিয়েই হল। ড্রটিন-ডিএস অবশ্য ম্যাজিকের মতো কাজ করে, একটা মেরে দিতে জ্বালায়নি আর।

এখন পড়ন্ত বিকেলের রোদ আর গান-আড্ডা-প্রেমে নন্দন চত্বর ভেসে যাচ্ছে। আজ শনিবার, লোকজন একটু বেশিই। সদন মেট্রোর এক্সাইডের গেটটা দিয়ে বেরিয়ে আগে জমিয়ে এক প্লেট মোমো গিলল সৌর। তারপর কানে ইয়ারফোন গুঁজে গগনেন্দ্রর গেট দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক অলস ঘুরে বেড়াল একটু। ছ'টা যদিও বেজে গেছে কিন্তু প্রথম ডেটে অত পাংচুয়াল হলে হয় না। মেয়েরা টেকেন ফর গ্র্যান্টেড ধরে নেয়। গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে একটু। কিন্তু সেসবকে আজ পাত্তা দিচ্ছে না সৌর। ইউরিনালের পাশের দোকানটা থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া উড়িয়ে দেয় ও। ডেনিমের উপর কালো কুর্তা পরেছে। হাতে সদ্য কেনা স্মার্টওয়াচ। ট্রিমড দাড়ি, চুলে জেল। বহুদিন পরে মাঞ্জা মেরে সৌরর বেশ ভালই লাগছিল। মাঞ্জা তো একটু মারতেই হয়, সৌরদীপ ভৌমিক বহুদিন পরে মাঠে নেমেছে কি না। এ তো শুধু অন্যের কাছে ফার্স্ট ইম্প্রেশনের ব্যাপার নয়, এ হল বচনা-অ্যায়-হাসিনো সৌর যে ফুরিয়ে যায়নি, নিজের কাছে সেটুকু প্রমাণ করারও ডার্বি ম্যাচ!

অকাদেমির দিকের গেটটা দিয়ে বেরিয়ে নন্দনের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই মোহরকুঞ্জের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা রূপসাকে দেখতে পেল সৌর। হাইট ওর মতোই হবে, টানটান শরীর, ত্বকের উপর পিছলে যাচ্ছে বিকেল। একটা কচি কলাপাতা রঙা কুর্তি আর সাদা লেগিংস, কাঁধে লেদারের ব্যাগ। রূপসার সঙ্গে সৌরর ফেসবুক বন্ধুত্বের

আয়ু আজ বিকেল মিলিয়ে ঠিক সাড়ে বাইশ দিন। জেভিয়ার্সে ইংলিশ অনার্স, পাশাপাশি টুকটাক মডেলিং। বায়বীয় বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়ে প্রথম ডেটে পরিণত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় যদিও। সৌরর নিজের রেকর্ড বারো দিন। তবে সেসব কতকালের কথা। সৌর তখন আপার কাটে বাউন্ডারির বাইরে ফেলত দুনিয়ার সেরা ফাস্ট বোলারদের। এখন সেহওয়াগের চেহারা ভারী হয়েছে, চোখে চশমা।

মেয়েটার চোখে একটা কিছু আছে। একটা সহজ উৎসব, একটা গভীর ডাক, একটা গোধূলির রং। সে কাজল দিয়ে ঘিরে রেখেছে এই সবকিছু। শরীরের ত্রিমাত্রিক বাউন্ডারিতে ধারণ করে রেখেছে দু'চোখের ভিতর ঘটে চলা এই অবিরাম উদযাপনকে। নিজেকে ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছে করে তার কাছে যেতে, তার ছায়ায় বসে হৃদয় ছুঁয়ে দেখতে, বেহিসেবি হতে।

"হাই... রূপসা, রাইট?"

"ওহ হাই ডাক্তারবাবু!" দু'চোখে ঝিলিক খেলে যায় মেয়েটির।

"এই আস্তে ম্যাডাম। লোকজন হয় বদহজমের ওষুধ লিখে দিতে বলবে নয় চশমখোর বলে তাড়া করবে!" তারপর একটু থেমে রূপসার দিকে তাকিয়ে সৌর বলে, "ইউ আর বিউটিফুল!"

হেসে ওঠে রূপসা, "অ্যান্ড ইউ আর ফ্লার্টি। বাই দ্য ওয়ে, থ্যাঙ্কিউ!"

"কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সুন্দর বললে সেটা কি আর ফ্লার্ট হয় ম্যাডাম, নাকি তাজমহলকে অসাধারণ বললে বাড়িয়ে বলা হয়? সেটা শুধু আমাদের ভোকাব্যুলারির অসহায়তাকেই প্রকাশ করে ফেলে।"

"খেয়েছে! তুমি হয় হেবি প্রেমিক মেটেরিয়াল নয় ডেসপারেট প্লে-বয় কিছু একটা হবে দেখছি।"

"দুটোই হতে পারি, এরকম হয়-নয়ের ভেন ডায়াগ্রামই বা আঁকছ কেন? চলো, ভিতরে গিয়ে বসি একটু, তোমাকে একখানা গোটা মানুষ আবিষ্কারের সুযোগ করে দিই।"

"ওহো, ডাক্তারবাবু তো অসুস্থ করে দেবে!" হাসতে গিয়ে গালে টোল পড়ে রূপসার।

"সব অসুস্থতার একটাই ওষুধ ম্যাডাম! খাওয়ার আগে একচামচ করে প্রেম, দিনে তিনবার!"

"ম্যান। ইউ আর গুড!"

"অ্যান্ড স্টিল ইউ আর বিউটিফুল।"

ময়দান থেকে হাওয়া এসে দুটো মানুষের হাসি-কথা-গল্পের ভিতর মিশিয়ে নেয় নন্দন থেকে ভেসে আসা গানের সুর, তারপর উড়িয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার দিকে। সন্ধে নামছে ছইয়ের উপর। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে ওর হাতে হাত রাখতে খুব ইচ্ছে করছে সৌরর। কিন্তু কেন জানে না, দুরন্ত ফর্মে থেকেও আজ ওর সাহস হচ্ছে না এটুকু স্টেপ আউট করার। অগত্যা সেই অদৃশ্য গল্প-বলা লোকটা হাওয়া পাঠায় ওর জন্য।

"অলি পাবে যাবে?"

"সাড়ে সাতটা বাজে কিন্তু, এখন অলিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে তোমার। চাপ নেই তো?"

"তুমি আছ, আর চাপ থাকতে পারে?"

সৌর হেসে ওঠে, "বলছ যা চাপ সেটা আমার ওপরই আছে?"

"আমি এরকম কিছু বলছি না। আবার অস্বীকারও করছি না।"

"হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি, সুন্দরীদের মন এডিশন।"

"কত সুন্দরীর মন ছুঁয়ে দেখেছেন ডাক্তারবাবু?"

সিরিয়াস মুখে আঙুলের কর গোনে সৌর। রূপসা হেসে উঠে একটা আলতো ঘুষি মারে ওকে, "ধ্যাত। হাঁটো দেখি।"

কার জন্য হাওয়া বয়, মানুষ? এলোপাথাড়ি, দিগ্‌ভ্রান্ত, গল্পের গুঁড়ো-লেগে থাকা হাওয়া? তুমি জানো না। শুধু এটুকু জেনো, সেই হাওয়ার সামনে মানুষ আসলে শুকনো পাতার মতোই অসহায়।

ওরা গগনেন্দ্র পেরিয়ে এক্সাইড থেকে বাস ধরবে, এমন সময় সৌরর মোবাইল বেজে উঠল। জাভেদদা।

"বলুন স্যর!"

"সৌর... কোথায় তুই?"

আজ এতগুলো বছর একটা মানুষকে চেনে সৌর। ভেঙে পড়া, আহত, কাতর শব্দগুলোর কোনওটাই তার সঙ্গে যায় না। ওর শরীরে রক্তস্রোত বেড়ে গেল হঠাৎ।

"কী হয়েছে জাভেদদা?"

"সেরকম কিছু নয় রে। তুই বাইরে বোধহয়... ক্যাম্পাসে এলে একবার দেখা করতে পারবি?" কেটে কেটে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথাগুলো বলে জাভেদ।

"জাভেদদা বলো? আজ তো তোমার মেজর ওটি ডে, কোথায় তুমি? গলা এরকম লাগছে কেন?"

"রুমে... আমি ঠিক আছি সৌর। তবে আর কতক্ষণ থাকব জানি না... তুই দেখা করে যাস একবার।"

সৌর দাঁড়িয়ে পড়ে পুলিশ চৌকির সামনে। কাঁপছে ও। রূপসা বিহ্বল হয়ে ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ফোনের ওপাশে যে কিছু একটা ঘটে গেছে বুঝতে পারে ও। সেই আশঙ্কার ছাপ পড়ে ওর চোখে, ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে।

"আমি সরি রূপসা, এক্সট্রিমলি সরি। আমাকে একটু ফিরতে হবে এখন।"

"আরে সরি কিসের? সবকিছু ঠিক আছে?" অসহায়তা লেগে আছে রূপসার গলায়।

"না। জানি না। হোপফুলি... আমি সত্যিই সরি রূপসা। তুমি সাবধানে ফেরো। কথা হবে..." কথা জড়িয়ে যায় সৌরর। তারপর ওর হাত ছাড়িয়ে রাস্তা ক্রস করে দ্রুত। মেট্রোর গেটে পৌঁছে ঋকের নম্বর ডায়াল করে ও, ''ফোনটা তোল। প্লিজ়, ফোনটা তোল...''

সুড়ঙ্গ থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে এসে ঘাড় ছুঁয়ে যায় সৌরর। সে হাওয়ার ভিতর একটা জড়-বিষাদ আছে। জীবিত মানুষকে ছুঁয়ে দিলে সে মুহূর্তে নীল হয়ে যায়।

## ১৫

"ফোনটা তুলবে একবার? কথা আছে। হোয়াটসঅ্যাপে অনেকটা লিখতে হবে, প্লাস বোঝাতেও পারব না হয়তো। প্লিজ়?"

শ্রীতমা অনেকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'বার পড়ে মেসেজটা। তারপর আবার জানলার বাইরে তাকায়। সন্ধে নামছে জানলা জুড়ে। আলো আর মানুষ নিয়ে এসি মেট্রো চলে যাচ্ছে এক স্টেশন থেকে পরেরটায়।

আবার ফোন। শ্রীতমা ভলিউম বাটন চেপে সাইলেন্ট করে। পুরো রিং হয়ে যেতে দেয়। ইলোরা ফেরেনি। দুপুরে জানিয়েছে আজ দেরি হবে। দেবাশিস কোথায়, কখন ফিরবে ও জানে না। বা জানত হয়তো, ভুলে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে এখন। অনিন্দিতা বেরতে বলছিল, নন্দনের দিকে ঘুরে আসবে একবার। কাটিয়ে দিয়েছে ও।

"বলো!"

"ফোনটা ধরছ না কেন?"

"বাড়িতে সবাই আছে, অসুবিধে হবে কথা বলতে। বলো, কেমন আছ? কী খবর?"

"ওই আর কী। প্রিপারেশন, টিউশন... কবিতা দিয়ে বাস্তবকে পেরোতে না পারার কষ্ট।"

"অনন্যা?"

"আমাদের ব্রেক-আপ হয়ে গেছে শ্রী।"

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীতমা— "খারাপ লাগল শুনে।"

"তুমি কেমন আছ?"

"যেমন থাকে ভালবাসার মানুষ, অপমানে।"

"শ্রী... এরকম বোলো না প্লিজ়!"

"আমি তোমাকে কিছু বলছি না তো। আমি নিজের কথা বলছি, বাই সাম চান্স তুমি সেই কথাটার উল্টোদিকে।"

"এরকম করছ তুমি? আয়্যাম সরি

সেদিনের জন্য।"

"সরি বলার কিছু হয়নি নির্বাণ। আমার ঠিক ওরকম একটা মোমেন্টে ওরকম একটা কথায় কষ্ট হয়েছিল খুব। পরে ভেবে দেখেছি, তোমার ইনসিকিয়োরিটিটা বুঝতে পেরেছি কিছুটা।"

"থ্যাঙ্কস।"

"যদিও সেটুকু পেরিয়ে তোমার দুম করে বেরিয়ে যাওয়াটা, যোগাযোগ না-রাখাটা জাস্টিফায়েড হয়ে যায় না। তাতে আমার এই গোটা কষ্টটা মিথ্যে হয়ে যায় না।"

"আমি ওজন্যই ফোন করছিলাম শ্রী। প্লিজ়, আমাকে বলতে তো দাও একটু।"

টেবিলের উপর শুকনো ফুল। তার পাশে খালি গ্লাস। একপাশে ড্রেসিং টেবিল লাগোয়া আয়না। আয়নার ওদিকে হুবহু এক অথচ অন্য একটা বিপরীত পৃথিবী থাকে। সমান্তরাল। তাকে দেখা যায় শুধু, ছোঁয়া যায় না, বাঁচা যায় না।

বাইরে অন্ধকার জমছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপে শ্রীতমা। তারপর সবটুকু জোর আঙুলে নামিয়ে আনে।

"নির্বাণ... ইটস্ ওভার!"

মুহূর্তকাল চুপ সব। তারপর শব্দ করে ফোনটা বেজে ওঠে আবার। শ্রীতমা বেজে যেতে দেয় তাকে।

"কী বলছ তুমি! কেন বলছ এরকম? একবার ফোনটা তুলবে শ্রী?"

একটু সময় নেয় নির্বাণ, "আমার এক মাসের মাথায় পরীক্ষা শ্রীতমা, কী করে পারছ আমাকে এরকম একটা অবস্থায় ফেলে যেতে?"

"সবকিছুর এত কারণ থাকতে হবে কেন? তবু বলি, আমি আর তোমার প্রতি কোনও টান অনুভব করছি না নির্বাণ। সরি, এরকম একটা সময়ে এই কথাটা তোমাকে শুনতে হচ্ছে। আই উইশ আমি একেবারে অন্যকিছু বা একই কথা অন্যভাবে বলতে পারতাম।"

নিস্তব্ধতা নেমে আসে এ শহরে। জানলা গলে ঢুকে আসে একলা মানুষের ঘরের ভিতর। ঝিম-ধরা মাথার ভিতর।

"আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"আমারও হচ্ছে নির্বাণ। কিন্তু দু'জনের কষ্টের কারণগুলো সম্ভবত আলাদা। তোমার কষ্ট হচ্ছে তোমার পৌরুষ এই রিজেকশনটা মেনে নিতে পারছে না বলে। আমার হচ্ছে আমি একটা ভালবাসাকে, একটা সময়কে চিরতরে হারিয়ে ফেললাম বলে। আশা করি আমরা সবাই একদিন নিজের মতো করে কষ্ট গুলো পেরিয়ে যেতে পারব।"

নির্বাণ চুপ করে থাকে।

সাতটা বাজে। এখানে জানলা গলে কলেজ স্ট্রিটের ব্যস্ততা আর সিঁড়ির সামনে থেকে ভেসে আসা গিটারের আওয়াজ বেঞ্চে এসে পড়ছে। তার মধ্যে শুয়ে ঋক ধোঁয়া উড়িয়ে দেয় সিলিংয়ের দিকে। পাশে আত্রেয়ী। উঠবে উঠবে করেও কেউই উঠতে পারেনি এখনও। কখন উঠবে, গার্ড বা অন্য কেউ এসে তাড়িয়ে না দিলে আজ আদৌ উঠবে কি না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন।

ঋকের মোবাইল সাইলেন্ট ছিল, এখন খুলে দেখে সৌরর তিনখানা মিসড কল। খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মোবাইলে কথা বলতে গেলেই সৌরর গায়ে জ্বর আসে। একদম ওর মতোই। কিছু বলার থাকলে ওরা হোয়াটস্যাপ করে। খুব দরকারে হয়তো একটা আধ মিনিটের কল। অবশ্য এটা শুধু ওদের দু'জনের ব্যাপার নয়। এখন সবাই সরাসরি কথা বলার পরিবর্তে টেক্সটিংয়েই স্বচ্ছন্দ।

"কল করেছিলি?"

"কোথায় তুই?" সৌরর গলায় ক্ষোভ-দুশ্চিন্তা-রাগ সব মিলেমিশে আছে।

ঋক উঠে বসে, "কী হয়েছে ম্যান? তুই কোথায়?"

"পারলে জাভেদদার রুমে আয়। আর্জেন্ট!"

সেই অদ্ভুত চিনচিনে ব্যথাটা ঋকের মাথা থেকে নেমে দু'হাত বেয়ে সারা শরীরে দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

"কী হয়েছে রে? সব ঠিক আছে?" আত্রেয়ীর গলায় স্নেহ ছাড়া, আশ্রয় ছাড়া কিছু নেই অবশ্য।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে উঠে পড়ে ঋক, "জানি না রে, তবে কিছু একটা হয়েছে। আমাকে ফিরতে হবে ইতু। তোরও অনেক দেরি হয়ে গেল তো, ওঠ!"

ওরা দ্রুত পায়ে ডিরোজিও থেকে বেরিয়ে আসে। আত্রেয়ীর ঘেঁটে যাওয়া চুল, ঋকের গালে কাজলের দাগ, কোনও মতে ইন-করা জামা। মাঠে বসে আড্ডা মারা ছেলেপুলেরা তাকায় ওদের দিকে। ঋক লম্বা লম্বা পা ফেলে।

"সেন্ট্রাল পর্যন্ত যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল রে, কিন্তু... সরি। দিনটা এভাবে শেষ হওয়ার কথা ছিল না।"

মুচকি হাসে আত্রেয়ী। তারপর মেডিক্যালের ইমার্জেন্সি গেটের সামনে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স-মানুষ চিৎকারের মধ্যে দাঁড়িয়েও ঋককে জড়িয়ে ধরে। এই ক'দিন আগে, ঠিক রাস্তার উল্টো ফুটেই এক ভোরবেলায় ঋক পড়েছিল রক্তের ভিতর।

"দিনটা নিজেরা বয়ে নিয়ে বেড়ালেই আর শেষ হবে না, আজীবন চলতে থাকবে... সাবধানে থাকিস বাবু। টাটা!"

পিজি হস্টেলের সামনের মোড়টায় একটা ছোট্ট মন্দির। তার পাশেই বাবলুদার চায়ের স্টল। দুটো নেড়ি শুয়ে আছে হলুদ আলোর নীচে। মন্দিরের সামনের ঠেলায় পেয়ারা বিক্রি করে একটা লোক, সে অবশ্য এখন নেই। ঋক দ্রুত পায়ে মোড় পেরিয়ে হস্টেলে ঢোকে। পিজি হস্টেলটা ওদের চেয়ে অনেক ছোট, একটু ঘুপচি মতো। লম্বা লম্বা বাড়িগুলো ঘিরে আছে চারপাশ থেকে। ভরদুপুর সূর্য যখন মাথার উপরে তখনই একটু রোদ এসে ঢোকে সামনের চাতালে। সেটুকু আলো-হাওয়া দিয়ে সারাদিন টানা যায় না। দোতলায় করিডরের একেবারে শেষ রুমটা জাভেদের। ঋক ঢুকে দেখল সৌর চেয়ারে বসে আছে। দড়িতে রাজ্যের টি-শার্ট-স্যান্ডো গেঞ্জি-জাঙিয়া। সেখানেও যাদের জায়গা হয়নি তারা দড়ি বেয়ে নেমে এসেছে পাশের রিভলভিং চেয়ারটায়। টেবিলের পাশে ছোট্ট একটা র‍্যাক। তাতে টি-পট, ব্লুটুথ স্পিকার, বেইলি অ্যান্ড লাভ। খাটের উপর জাভেদদা শুয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে সিলিংয়ের দিকে।

"কোথায় পড়ে ছিলি?"

"জাহান্নামে। কী হয়েছে আমাকে এবার কেউ বলবে একটু প্লিজ়?"

"পরে বলছি। আগে বল দত্ত কোথায় জানিস কি?"

"ওর তো ব্লাড ব্যাঙ্ক চলছিল, ফাঁকাই থাকবে। বাট ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় জানি না... সৌর, প্লিজ় বল কী হয়েছে!"

"তুই নিজে জিজ্ঞেস করতে পারছিস না জাভেদদাকে? তোদের প্রবলেমটা কী একটু খুলে বলবি ভাই? প্লাস আমাকেও বোঝাবি?"

জাভেদদা চোখ খোলে, তারপর হেসে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয় ঋকের দিকে। ঋক সেটা ধরিয়ে একবুক ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "তোমায় তাহলে খাতা নিয়ে বসতে হবে ম্যান, নোট-টোট নিতে হবে। নাহলে ফার্স্ট ইয়ারের অ্যানাটমি ক্লাসের মতো সব মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সেই ক্লাসটা একটু পরে নিই? এখন আমার ওপর একটু দয়া করা হোক?"

"ব্যাপার সেরকম কিছু নয়। একজনকে অর্থোতে অ্যাডমিট করতে হবে," তারপর সৌর কেটে কেটে বলে গোটা ঘটনাটা।

"ভালই হল। ওই শুয়োরের বাচ্চার ওপর আমার পুরনো রাগ। দত্তকে কল কর।"

জাভেদদা গলা চড়ায় এবার, "তোরা থামবি একটু প্লিজ়? আমার এসব ভাল লাগছে না এখন। প্লাস এসব

ডিপার্টমেন্টের ভেতরের জিনিস সৌর, ছাড়। আমাকে এর মধ্যেই আরও দুটো বছর কাটিয়ে বেরোতে হবে।"

"বস, তুমি এটার মধ্যে ঢুকবে না। ঢুকলে তোমাকেও অ্যাডমিট করব!" সৌর ফোন ওঠায়।

"কোথায় ডার্লিং?... একটা কাজ আছে, ভালয় ভালয় মিটলে রাতে স্টার্লিং... ওহ, কী সুন্দর ছন্দ মিলিয়ে দিলাম! আয় কুইক, পাঁচ নম্বর গেটের সামনে।"

"সৌর প্লিজ়, কী হচ্ছে কী এটা? তোকে আমি এ জন্য ডাকলাম? জাস্ট একটু চুপ করে বস না, দুটো কথা বল।"

"বলব তো। রাতে বলব। শুনব। তোমাদের কেলাস অ্যাটেন্ড করব। ট্রিট তোমার। হাজার টাকা পেটিএম করে রাখো, আসছি আমরা।"

জাভেদ কিছুটা অসহায় হয়ে ঋকের দিকে তাকায়। ঋক উঠে হাত রাখে জাভেদদার কাঁধে।

"তুমি তোমার পলিটিক্যাল কনশাসনেসের প্র্যাক্টিস, ধৈর্যের পরীক্ষা আর সৎ চেষ্টা-টেষ্টা পরে সময় করে করো। আজ সরি," তারপর কিছুটা ইতস্তত করে বলে,
"ও জানে?"
"না।"

প্রলয় দত্ত ছেলে হিসেবে এমনিতে ভালই। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না, ছ'ফুট এক, চুলে মোহক, খুব রিসেন্টলি ওয়েট মেশিনে সেঞ্চুরি করেছে। খুব আউট না-থাকলে এই ওজন আর ভরকেন্দ্র সামলে ও একটু দ্রুত পায়েই হাঁটে। তা দেখে লোকজন আওয়াজ দেয়, প্রলয় আসছে। সকালে নিজের ডিউটি আর হস্টেল ফিরে কল অফ ডিউটি, এই মোটামুটি দত্তর জীবন। সঙ্গে টুকটাক র‍্যাপ। রুমে ঢুকলেই চোখে পড়বে দেওয়ালের একদিকে এমিনেম আর অন্যদিকে ধোনির লাইফ-সাইজ় ছবি। দোষের মধ্যে ওই একটু দুমদাম মাথা-গরমের রোগ। এমনিতে নিজের বাপ ছাড়া ও এ পৃথিবীর কাউকেই পাত্তা দেয় না, ভয়-টয় পাওয়া দূরের কথা। তবে ঋক আর সৌরকে ও কেন এতটা প্রশ্রয় দেয় সেটা কেউই ঠিক জানে না।

"কী কেস ভাই? বেশ গোলাগুলি করছিলাম কৈলাসে বসে, এই ভরসন্ধেয় মর্ত্যধামে ডেকে আনলি কেন?"

"একটা শুয়োরের বাচ্চা কেস। আমরাই সামলে নেব, তুই জাস্ট ব্যাক-আপে থাক।"

"তোমরা থর- আয়রন ম্যান আর আমি ব্যাক-আপ দেওয়ার হকআই?"

"ম্যান, তুমি আমাদের হাল্ক। আসলি রুপে এলে প্রলয় হয়ে যাবে, তাই শুধু ব্রুস ব্যানার হয়ে পাশে থাকতে বলছি।"

তারপর সৌর ডায়াল করে, "হ্যাঁ শুভজিৎদা, কোথায় আছ?... আরে আর কত ডিউটি করবে... শোনো, আরে শোনো তো আগে, রাখার জন্য এত ব্যস্ত হলে হবে? কথা আছে বলেই না কল করেছি... বলছি ক্যান্টিনের সামনেটায় আসতে পারবে একটু? ইলোরাও আছে... হ্যাঁ, ইট্‌স অ্যাবাউট হিম... হ্যাঁ, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে... প্লিজ়, তাড়াতাড়ি একটু..."

ক্যান্টিনের সামনেটায় আলো-আঁধারি। ঋক-সৌর দাঁড়িয়ে কাউন্টারে ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। একটু জ্বর জ্বর লাগছে কেমন সৌরর। কিন্তু ওর ধরা-বাঁধা অলস জীবনে হঠাৎ একের পর-এক এতকিছু ঘটছে যে ও ঠিক করে নিজেকে পাত্তা দিতেও পারছিল না। দত্ত চুপচাপ রেলিংয়ে বসে মোবাইল খুটখুট করছে ওদিকে। শুভজিৎ আর নীলাদ্রি জোরে পা চালিয়ে এসেছে, হাঁপাচ্ছে এখন।

"কী ব্যাপার সৌর? পুরো গ্যাং? ইলোরা কই?"

ঋক সিগারেটটা ফেলে আবার সেই ভোররাতের আগুনটাকে ডান হাতের মুঠোয় নামিয়ে আনে। তারপর দু'পা এগিয়ে শুভজিতের চোয়াল লক্ষ করে সোজা ঘুষি চালায়। শুভজিৎ পড়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে দত্ত ধরে নেয় ওকে— "আরে স্যর এখনই ওয়াক আউট করলে হবে, এই তো সবে ম্যাচ শুরু!"

নীলাদ্রি জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও গোটা ব্যাপারটা প্রসেস পারছে না ঠিক। প্যান্টের পকেট হাতড়ে মোবাইল বের করে নীলাদ্রি, কাউকে একটা ফোন করতে যায়।

সৌর এগিয়ে এসে নীলাদ্রির কলার ধরে, "কথাটা মন দিয়ে শোনো নীলুদা। তোমার সঙ্গে দু'-একবার কাউন্টারে সিগারেট খেয়েছি। মুশকিলটা হল আমাদের ফাইট ক্লাবের প্রথম রুল হচ্ছে নিজের কাউন্টার-ব্রোদের গায়ে হাত তোলা যায় না। এবার এমনটা নয় যে আমার রুলটুল মেনে চলার খুব দায় আছে, তবু ওই আর কী, একটু আটকাবে হয়তো। কিন্তু তুমি সেজন্য চাপ নিয়ো না, ওরা কেউ তোমার কাউন্টার-ব্রো নয়। ফলে ম্যান্ডিবল ডিসলোকেট করতে না-চাইলে যতটা জোরে পা চালিয়ে এসেছিলে ঠিক তার ডাবল স্পিডে ফিরে যাও। আমাদের টাইম লাগবে একটু।"

ওদিকে আচমকা ঘুষিটা খেয়ে টলে গেছে শুভজিৎ। ও নিজেকে প্রাণপণে ছাড়াতে চাইছে দত্তর হাত থেকে। তার মধ্যেই চিৎকার করে বলল, "তোদের কাউকে ছাড়ব না ঋক।"

নীলাদ্রি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এটা একটু বাড়াবাড়ি করছিস না তোরা সৌর?"

"আমাদের বাড়াবাড়ি দেখোনি নীলুদা," তারপর অন্যদিকে ফিরে সৌর দু'স্টেপ নিয়ে জুতোসহ পা চালায় শুভজিতের পেটে। ব্র্যান্ডেড শার্টে সস্তা কিটোর ছাপ পড়ে যায়। শুভজিৎ ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে বসে পড়ে রাস্তার উপর।

ঋক এগিয়ে এসে চোয়াল তুলে ধরে শুভজিতের। হলুদ হ্যালোজেন আলোর নীচে বড় সামান্য লাগছে শুভজিতকে।

"কী বলেছিলি, ন্যাশনালে গিয়ে গার্ড দিতে? হিরোগিরি না-মেরে মুখে কুলুপ এঁটে স্কিন ক্লোজ় করতে? এ কলেজের একমাত্র হিন্দুবীর, মাচো হিরো তুই, তাই তো?"

"ঋক ওসব ক্যাজুয়ালি বলা কথা, প্লিজ়। ব্যাপারটা এতদূর হয়ে যাবে আমরা কেউ বুঝিনি!" নীলাদ্রি শেষবার বোঝাতে চায়।

"বুঝলাম না নীলুদা। নামের সামনে ডাক্তার লাগিয়ে, ফেসবুকে পাবলিকের কাছে হেবি কলার তুলে তারপর নিজের কলিগকেই ধর্মের কার্ড খেলে আউটকাস্ট করাটা ক্যাজুয়াল? তাকে অন্য কলেজে যেতে বলাটা ক্যাজুয়াল? তোমরা যখন জানো গোটা ঘটনাটা কী হয়েছে তখন গৌতম স্যরকে

সম্পূর্ণ মিথ্যে বুঝিয়ে স্যরকে দিয়ে ফোন করিয়ে তাকে ভগবানের জায়গায় বসানো একটা মানুষকে নোংরাভাবে খিস্তি খাওয়ানোটা ক্যাজুয়াল? তোমাদের জন্য একটা শক্তপোক্ত মানুষের হঠাৎ এক বিকেলে সুইসাইড করতে যাওয়াটা ক্যাজুয়াল?" শেষটুকুতে ভাঙা গলায় ঋকের চিৎকার নতুন অডিটোরিয়ামের দেওয়ালে ধাক্কা লেগে ছড়িয়ে পড়ল গোটা ক্যাম্পাসে।

"বুঝতে পারিনি আমরা, সরি!"

"বান... তোমরা কেজি-টু তে পড়ো? নিজের ব্লাডারের ওপর কন্ট্রোল না থাকায় বাথরুমে যাওয়ার আগেই প্যান্টু ভিজিয়ে ফেলেছ? ড্যামনামিটা অন্য জায়গায় গিয়ে করো নীলুদা, এটা মেডিক্যাল কলেজ!" হাত-পা কাঁপছে ঋকের।

সৌর শুভজিতের দিকে ফেরে এবার, "আর হ্যাঁ, সরি বলার থাকলে শুধু নিজেরটা বলো। এর আলাদা করে অনেকগুলো সরি বলার আছে।"

শুভজিৎ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "তোরা কীভাবে কমপ্লিশন পাস দেখে নেব।"

দত্ত হঠাৎ এক হাত দিয়ে শুভজিতের টুঁটি ধরে মাটি থেকে হেঁচড়ে উঠিয়ে ক্যান্টিনের দেওয়ালে চেপে ধরে, "আর-একবার বলে দেখাও প্লিজ়।"

শুভজিৎ খাবি খায়।

ঋক আর সৌর এসে ছাড়ায় কোনও মতে। তারপর আবার ঋক চোয়াল টিপে ধরে ওর, "মন দিয়ে শোন। তুই যে শঙ্খদার হাত মাথায় আছে ভেবে এত তড়পাচ্ছিস না, তাকে জিজ্ঞেস করিস প্রলয় দত্ত নামটা শুনলে কোথাও এখনও টনটন করে কী না। আর প্রদীপ ভৌমিককে চিনিস? আইপিএস? কলকাতা পুলিশের পেজ থেকে রহস্য রোববার লেখে? সিএমের পাশে ছবি বেরোয়? এই যে মিষ্টি ভদ্রসভ্য দেখতে ছেলেটাকে দেখছিস, এরই বাপ হয়। বাপকে ফোন করে যদি এক্ষুনি বলে যে কলিগকে ধর্মের বেসিসে ডিসক্রিমিনেট করেছিস, র‍্যাগ করেছিস, তাহলে দশ মিনিটের ভিতর লালবাজারে নিয়ে গিয়ে এমন ডান্ডা দেবে যে অ্যাপ ক্যাবেও ফিরতে পারবি না। আর আমি হলাম ঋক স্যানচেজ়। দ্য বিগ আর, ঘোষিত বাইপোলার, এখন ম্যানিয়াতে আছি। অতএব থ্রেটটা তুই মারবি না এখানে, আমি মারব, আমরা মারব, ওকে? আর এরপর মুখটা খুলে সরি ছাড়া অন্য কিছু বেরোলে থ্রেটের জায়গায় অন্য কিছু মারব, লিগনো ছাড়াই। বুঝেছিস?"

ঋক একটানা কথাগুলো বলে চোয়াল ছেড়ে দেয় শুভজিতের। তারপর ফেরার পথ ধরেও আবার ব্যাক করে। দড়াম করে আর-একটা ঘুষি চালায়। তার কিছুটা শুভজিতের চোয়ালে পড়ে, বাকিটা ক্যান্টিনের দেওয়ালে। ও হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, "রিপিট কর আমার সঙ্গে— কাল সকালের মধ্যে সবার সামনে ক্ষমা চেয়ে যদি আমরা জাভেদকে ডিপার্টমেন্টে না ফেরাতে পারি তাহলে সার্জারি ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হবে আর এই কলেজের প্রতিটা দেওয়ালে আমাদের দু'জনের ছবিসহ পোস্টার পড়বে।"

নীলাদ্রি বলে, "আমি কথা দিচ্ছি ঋক, সব ঠিক করে নেব আমরা।"

দত্ত এগিয়ে আসে। ডান হাত মুঠো, শিরা জেগে আছে স্পষ্ট। ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে আলোর নীচে, "রিপিট!"

সৌর নিজে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর নীলাদ্রির দিকে এগিয়ে দেয় একটা, "রিপিট নীলুদা, ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অপশন।"

মেট্রোর সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসা সেই বিষাদ হাওয়াটা পাক খেয়ে যায় শহরের আনাচকানাচে। ক্যান্টিনের অন্ধকার দেওয়ালটায় দুটো টিকটিকি শুয়ে আছে। ওদের চোখে কষ্ট। হলুদ আলোর নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত কয়েকটা পোকা।

"চুল ঢাকে ঘুম, ভুল করিডর, কে পলাতক, নীলচে সময়/ বলা বারণ।

"কোন সে রাখাল, বিষাদ চরায়, হঠাৎ কখন, হাইওয়ে বাঁশি/ বলা বারণ।"

## ১৬

সকাল থেকে বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত মেঘ। এখন চাঁদের আলোয় বারান্দায় এসে দাঁড়ালে হাড়ের মধ্যে কাঁপন ধরছে রীতিমতো। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। আজ ডিমের ঝোল হয়েছিল, আর গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। তামাংজির ঘরেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। খেয়ে উঠে হাসি-আড্ডা-গান। বড় ভাল লাগছিল দেবাদিত্যর। এখন অবশ্য কোথাও মানুষ নেই, শব্দ নেই, মেঘ নেই। নিস্তব্ধ চরাচর ছেয়ে আছে অপার্থিব জ্যোৎস্না। মাঝে মাঝে নাম না-জানা পাখিদের ডাক ভেসে আসছে নীচের উপত্যকা থেকে। একপাশে আলোর গয়না পরে কারও অপেক্ষায় বসে আছে মোহময়ী দার্জিলিং। আর সামনে তাকালেই দিগন্ত জুড়ে শুয়ে আছেন বুদ্ধদেব।

একমাস হয়ে গেল। দেবা রঙ্গারুন ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারল না। মাঝে একবার তাকদা-লামাহাট্টায় গিয়েছিল দিনতিনেকের জন্য। রাজীবাক্ষবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে একদিনের জন্য গিয়েছিল দার্জিলিং শহরেও। তিনি কী যে খুশি হয়েছিলেন দেবাদিত্যকে দেখে। আপ্যায়নে খামতি রাখেননি একটুও। এমনকি রিসর্টের ডাক্তার হয়ে রয়ে যাওয়ার অফারও দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এক তো ওর গলায় কাঁটার মতো খচখচ করে বাকি পড়ে থাকা ইন্টার্নশিপটা। তার উপরে দেবার মন টেকেনি কোথাও। এই জায়গাটার মধ্যে, এই মানুষগুলোর মধ্যে একটা সমান্তরাল, অন্য পৃথিবী আছে যা দেবাদিত্য কোনও একদিন স্বপ্নে দেখেছিল হয়তো। সেই স্বপ্নের ভিতর কখনও সত্যিই একটা কাঠের বিছানায় ঘুমোতে যেতে পারবে, ঘুম ভেঙে উঠে দেখতে পারবে বারান্দা-জোড়া কুয়াশায় ভেজা ফুল, কিছু সহজ মানুষ, জলের মতো টলটলে একটা জীবন—ও ভাবতে পারেনি।

এই যে চোখ জুড়ে আসা ঘুমের ওপাশে এখন ওর সামনে এরকম একটা চাঁদ-ধোয়া চরাচর পড়ে আছে, ওর মনে হচ্ছে ও এতদিন যে পৃথিবীর কথা শুনে এসেছে, জেনে এসেছে, এটা তার বাইরে জেগে থাকা অন্য একটা গ্রহ— এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায় না? এই পিছুটান, মনের ভিতর এত ঢেউ, নিজের সঙ্গে অনন্ত কথা কাটাকাটি পেরিয়ে শান্তিতে স্থির হওয়া যায় না এরকম একটা রাতের কাছে এসে? অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই তো হলই, এবার জিতে ফেলা যায় না নিজের সঙ্গে চলা এই দমবন্ধকর লড়াইটআপনি কীভাবে পেরেছিলেন সিদ্ধার্থ? রাজপাট, সংসার সুখ, চেনা বৃত্ত ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন বোধির কাছে? স্থৈর্যের কাছে? নির্মোহ জীবনের কাছে? কীভাবে জিততে পেরেছিলেন নিজের সঙ্গে অনবরত চলা এই লড়াইটা?

জীবনকে তার মতো করে দেখো দেবাদিত্য। তোমার চাপানো প্রলেপটুকু সরিয়ে, অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশনের এই অনন্ত সাইকেল পেরিয়ে জীবন-মানুষ-পৃথিবীকে-নিজেকে তার সত্যতায় দেখো।

সে কীভাবে সম্ভব ভগবান? আমিই তো প্রসেস করছি সব। জীবনকে, মানুষকে, নিজেকে। এই আমিটা তো আবার একটা সিস্টেমের পার্ট, বিবর্তনের ফসল, সোসাইটির কনস্ট্রাক্টের অংশ। একটা জিনিস ভাল বা খারাপ যাই হোক, তাকে সেভাবে দেখাটা ঠিক বা ভুল যাই হোক, আমার তো একটা পাঠ থাকবেই।

থাকুক। কিন্তু এর পরেও সেই জিনিসটার একটা প্রাইমারি ফর্ম আছে দেবাদিত্য। তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। ঠিক এই মুহূর্তে এরকম জ্যোৎস্না-ভেজা চরাচর দেখে ঠিক কী মনে হচ্ছে?

একটা অসম্ভব ভাল লাগা, একটা সুখ, অসীম শান্তি।

ধরো এখনই মেঘ এসে ঢেকে দিল দূরের দার্জিলিং শহর, পাহাড়, আমাকে... কেমন লাগবে?

খারাপ লাগবে অবশ্যই, বিরক্ত লাগবে। অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই।

আমি ঠিক এটাই বলছি দেবাদিত্য। এই সুখটাও তোমার প্রলেপ, বিরক্তিটাও তা-ই। কিন্তু তুমি শুধু সুখের প্রলেপটুকু চাও। যদিও তাকে সত্যিই উপভোগ করতে জানো কি? কারণ তুমি তো বিলক্ষণ জানো সুখ ক্ষণস্থায়ী, এই বুঝি হুড়মুড় করে এসে পড়ল দুঃখের মেঘ। তাই তুমি সুখের জ্যোৎস্নার ভেতর বসেও সেই মেঘের জন্য অপেক্ষা করো দুরুদুরু বুকে। তোমার এই সুখ-দুঃখ-দুশ্চিন্তার প্রলেপের বাইরেও কিন্তু একটা সত্যিকারের মেঘ আছে, চাঁদ আছে, পাহাড়-নদী-অরণ্য আছে। তারা এমনিই আছে, তাদের জায়গা থেকেই আছে। তুমিও তাদেরকে সেই প্রাইমারি জায়গাটা থেকেই দেখার চেষ্টা করো।

কিন্তু ভগবান এ তো চেতনার বেসিক আরগুমেন্ট। আমরা না-থাকলেও, আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন না-থাকলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানা থাকত কি না সেই প্রশ্ন। যার কোনও উত্তর হয় না।

উত্তর হয় দেবাদিত্য। সে থাকত। আমরা ইউনিভার্সের কাছে এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নই। তার ওপর আমরা আমাদের ইগো দিয়ে তার প্রতিটা কণার ওপর অনবরত, আজীবন প্রলেপ দিয়ে বেড়াচ্ছি। আর তাই সাফার করছি। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, ডোন্ট সাফার। বাইরের পৃথিবী, নিজের ভেতরের পৃথিবীকে তোমার প্রলেপ ছাড়া, রংবেরঙের চশমা ছাড়া দেখা প্র্যাকটিস করো।

ভাল-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে? বেশ, তা-ই হোক। এবার তবে বলে দিন আমি কী করব ভগবান?

অসীম নিস্তব্ধ পৃথিবীর উপত্যকার ওপর দিয়ে হঠাৎ শব্দ করে ডেকে উড়ে যায় কোনও রাতচরা পাখি। হু হু ঠান্ডায় কেঁপে ওঠে মানুষ।

দেবাদিত্য চোখ খুলে দেখে জ্যোৎস্নার চাদর গায়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ শুয়ে আছেন। বরাবরের মতোই মৌন।

ছাদের উপর জ্যোৎস্না এসে গা এলিয়ে আছে। ইলোরা তার ভিতরেই শুয়ে ছিল। এখানে কলেজ স্ট্রিটের ব্যস্ততা, ইমার্জেন্সির হট্টগোল, স্বজন হারানোর শোক কিছুই এসে পৌঁছয় না। ক'টা বাজে এখন কে জানে। বাড়ি ফিরতে হবে।

শেষ দিনের কথা মনে পড়ে ইলোরার। ঋকের সঙ্গে ও কি আর কোনওদিন এই ছাদে শুয়ে থাকতে পারবে? চুমু খেতে পারবে? শরীর উদ্‌যাপন করতে পারবে এই শহরকে ভুলে? ফিরে বাঁচতে পারবে মৈনাকের সঙ্গে ঝড়ের মতো কাটানো দুটো মাস?

ঝড়ই তো। যার কোনও নাম ছিল না, পরিচয় ছিল না, উদ্দেশ্য-বিধেয় ছিল না। গোটা কলেজ জীবনে নিজের যে ব্যাচমেটের সঙ্গে একবারও কথা হয়নি, ইন্টার্নশিপে উঠে সেই কো-ইন্টার্নের সঙ্গেই হঠাৎ আগুনখেলায় পুড়ে গেল ইলোরা। গোপন, নিষিদ্ধ সেই আগুন। তার ভিতর কোনও মন দেওয়া নেওয়ার গল্প নেই, নস্টালজিয়া জবজবে স্মৃতি তৈরির সময় নেই, মুহূর্তের জন্যও ভাবার ইচ্ছে নেই ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুধু পৃথিবীকে লুকিয়ে বায়োকেম বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে, ট্রপিক্যালের অন্ধকারে, এমসিএইচের এই ছাদে আগুন ছোঁয়ার নেশা। ঠিক দু'মাস। তারপর গোটা জনপদকে হতবাক করে সেই ঝড় হঠাৎ যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই হারিয়ে গেল একদিন। শুধু দুটো শরীরের খাঁজে খাঁজে পড়ে থাকল সেই আগুনের গোপন কিছু দাগ।

আওয়াজ করে ফোনটা বেজে উঠল। ভলিউম বাটনটা চেপে সাইলেন্ট করে ইলোরা, রিং হয়ে যেতে দেয় পুরো।

"ফোনটা তোল একবার প্লিজ়। কথা আছে।"

"বলো।"

"কোথায় আছিস তুই?"

"রাত ন'টার সময় কোথায় থাকব জাভেদদা? বাড়িতে। বলো, কী এত আর্জেন্ট কথা?" ফোনের ওপাশে চুপচাপ একটু। ভালবাসা হাতবদল হয় আড়ালে।

"কোথায় আছিস ইলোরা? একটু আসতে পারবি?"

"ঋক! তুই কোথায়? তোরা কোথায়? তোদের সবার গলা এরকম লাগছে কেন?"

"সব বলব। তুই আজকের রাতটা একটু ম্যানেজ করতে পারবি? প্লিজ়? যদি বলিস বাড়ি থেকে পিক-আপ করে নেব।"

ইলোরা চাঁদের দিকে তাকায়। কত লক্ষ বছর ধরে সে পৃথিবীর দিকে এভাবেই তাকিয়ে আছে অপলক। তার চোখের সামনেই কত হত্যা, কত মৃত্যু, কত ভালবাসা! সে মানুষকে বলে দিতে পারে না অসীম দ্বিধার মাঝে কী হতে পারে মানুষের সঠিকতম উত্তর?

"এভাবে হয় না ঋক। তোদের সবার ইমপালসে তাল মেলালে হয় না আমার। আমাকে একটু বল আগে কী ব্যাপার!"

"একটু ভরসা কর ইলোরা। একবার। সেদিনও তো চলেই গেছিলি একা ফেলে, যেদিন তোকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। আজ নিজের জন্য কিচ্ছু বলছি না। শুধু একটু ভরসা করতে বলছি আমাকে। আমাদেরকে। উই নিড ইউ রে।"

"কতক্ষণের প্ল্যান?"

ঋক হাসে, "খুব অন্যরকম কিছু না হলে সারা রাতের ধর।"

ঋককে কতদিন পরে হাসতে শুনল ইলোরা। কতদিন পরে সেই পুরনো ঋকটাকে কথা বলতে শুনল। কতদিন পরে মানুষের কাছে নিজের আড়াল, রেজ়িস্ট্যান্স ভেঙে পড়তে দেখল...

"এমসিএইচ টপে আয় তোরা। আমি এখানেই আছি! জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। একাই।"

"দ্য নাইট ইজ় ইয়ং অ্যান্ড ইউ আর ক্রেজ়ি। আসছি। ও হ্যাঁ, সৌর আর দত্তও থাকবে কিন্তু। চাপ নেই তো?"

"ওদের চাপ আছে কি না জিজ্ঞেস করে নে বরং। আর দত্তকে বল ওর সেই ম্যাগনামটা নিয়ে আসতে।"

পাশ থেকে দত্তর গলা পাওয়া গেল, "জো আজ্ঞা ম্যাম।"

সৌর ফোন কেড়ে বলে, "তোর ওপর আমার সেই কবেকার চাপ বল তো? এরকম রোম্যান্টিক রাতে এমসিএইচ টপে ইলোরা মুখার্জি সামনে থাকলে কথা দিতে পারছি না যে চাপ হবে না।"

হেসে ওঠে ইলোরা, "আমি এখন নির্ভেজাল সিঙ্গল কিন্তু ডার্লিং। মওকায় চওকা মারতে পারলে মেরে নাও!"

ফোনের ওপাশে ইলোরা, এপাশে সবাই হেসে ওঠে একসঙ্গে। মুমূর্ষু, জ্বরে হলুদ হয়ে যাওয়া সেই হাওয়াটা এই জ্যোৎস্নার ভিতর ঠেলে নিয়ে আসছে একটা মলিন মেঘখণ্ডকে। পেটমোটা টিকটিকি দুটো এখন ঘোলাটে চোখে ঝিমোচ্ছে অন্ধকারে। রাত হলে বড় ক্লান্ত দেখায় সবাইকে।

## ১৭

চাঁদটা গা ঢাকা দিয়ে আছে ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের ওপাশে। হাওয়া কিছুটা কমে এসেছে। তবে গুমট নয়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা, খোলামেলা ছাদের ভিতর গোটা পাঁচেক মানুষের জন্য হাওয়া পাঠাতে এ শহর কার্পণ্য করে না।

ফুল ভলিউমে ট্রান্স মিউজ়িক বাজছিল দত্তর মোবাইলে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে জায়গাটা। এখান থেকে অবশ্য ধোঁয়া-হাসি-গান কিছুই পৌঁছয় না নীচের পৃথিবীতে। ইমার্জেন্সি গেট দিয়ে ব্যস্ত অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে আওয়াজ করে। নেড়িগুলো ঘুরে বেড়ায় ফুটপাত জুড়ে। শিবুদা চা বানায় মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর ক্লান্ত মেয়ের জন্য।

দত্তর গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল সৌর। ঠিক পাশেই আধশোয়া ইলোরা। তার পাশে জাভেদদা। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে ঋক।

ইলোরার চোখ লাল। সেই ঝিমধরা চোখের ভিতর যে অবাস্তব পৃথিবী জাগছে, ওর চোখের পাতাগুলো প্রাণপণে ঢেকে রাখতে চাইছে তাকে। ও হেসে লুটিয়ে পড়ছিল সৌরর গায়ে, "ভাই এসব বলিউডি ঝাড়পিট এই বয়সে এসে কে করে? উফ, আমাকে ডাকলি না কেন রে? নিদেনপক্ষে কেউ একটা রেকর্ড করে রাখতিস।"

"এসব বলিউডি ঝাড়পিট না ডার্লিং, এ হল টাইলার ডারডেন-খচিত ফাইট ক্লাব।"

ঋক উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ। এক হাতে গ্লাস। অন্য হাতে আধ খাওয়া সিগারেটটা কায়দা করে দু'আঙুল দিয়ে ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতো ছুড়ে দেয় দূরে।

জাভেদ ম্লান হাসে, "কিন্তু আজকের ঘটনাটায় আমার অস্বস্তি হচ্ছে ঋক। ছ'ঘণ্টা কেটে গেছে, এবার মাথা ঠান্ডা করে শোন একটু। প্রথমত, অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমার প্রবলেম আছে। একটা ঘৃণার উত্তর এভাবে দেওয়া যায়? একটা জটিল, সামাজিক, দিনের পর-দিন ধরে চলে আসা প্রবলেমকে এভাবে ইনডিভিজুয়াল লেভেলে হিরোগিরি করে মেটানো যায়? আর আমি তোকে বলে রাখছি শোন, ব্যাপারটা এখানে থামবে না। কারণ এটা শুধু আমার আর আমাকে ঘিরে চারটে লোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার নয় রে। এর রুট অনেক গভীরে।"

সৌর গ্লাস খালি করে। উঁচু গলায় বলে, "আমি এত বুঝি না জাভেদদা। কিসের সমাধান কীভাবে হয়, কোন লেভেলে হয়, কোন অ্যাপ্রোচ ঠিক, তোমাদের এসব জটিল জটিল জিনিস বুঝি না আমি। আমি শুধু জানি যাকে ভালবাসি তার পাশে থাকতে হয়," তারপর দত্তর দিকে ফিরে বলল, "বানা আর-একটা।"

সৌরর কথায় হুঁশ ফিরল ওর, "একটু সামলে ম্যান, তুমি আজ শুরু থেকেই স্টেপ আউট করে খেলছ। রাত আভি বাকি হ্যায়, এরকম করলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যাবে তো একটু পরেই।"

ঋক সৌরকে জড়িয়ে ধরে। জড়ানো গলায় বলে, "উইথ মাই ব্রো," তারপর জাভেদের দিকে ফিরে বলে, "তোমার ওসব থিয়োরি রাখো জাভেদদা। এ পৃথিবীর সবাই আসলে খুব ভাল, সন্টুমন্টু, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আর সব দোষ আসলে সিস্টেম নামে কোনও একটা অদৃশ্য ভিলেনের— ব্যাপারটা এরকম নয়। সবকিছু খুব সুস্থতা দিয়ে, আলোচনা দিয়ে মিটে গেলে পৃথিবীটা এরকম হারামির হাট হত না। আর হ্যাঁ, তোমার বিশ্ব উদ্ধারের দায় আছে বস। আমাদের নেই। আমরা ছোট করে ভাবি, এক্ষুনি ভাবি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়ে ভাবি। তুমি, তোমরা বড় করে, গভীর করে ভেবে এবং অতি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত মরে না গিয়ে সব সমাধান করে ফেললে আমাদের ডেকো, মাথা মুড়িয়ে দলে ভিড়ে যাব সেদিন।"

এই ঋক ইলোরার বড্ড কাছের। জীবন্ত, টগবগে, তীক্ষ্ণ। ঋককে দেখে, ওদেরকে দেখে বড্ড ভাল লাগছিল ইলোরার। গলগল করে একবুক ধোঁয়া উড়িয়ে ও হঠাৎ বলে ওঠে, "যে মানুষ অন্য একজন মানুষের পাশ থেকে মসৃণভাবে সরে যায়, পারমাণবিক পৃথিবীর বিরুদ্ধে তার কোনও কথা বলারই অধিকার নেই।"

সৌর হাততালি দিয়ে ওঠে, "ওফফ, পুরো বাণী তো ডার্লিং। আজ থেকে তোমার আর-এক নাম বাণী কপুর।"

"এসব আমাদের মতো অধমের মুখ থেকে বেরলে বর্তে যেতাম!" তারপর সৌরর পেটে হালকা ঘুষি মেরে ইলোরা বলে, "ভাস্কর চক্রবর্তী রে। সেই কবে শুনেছিলাম, কীভাবে যেন এখনও মনে রয়ে গেছে এই লাইনটা।"

ঋক ঝিমধরা চোখে তাকিয়ে থাকে ইলোরার দিকে। সেই দৃষ্টিতে মুগ্ধতা আছে, সম্ভ্রম আছে, আর লেগে আছে সামান্য বিষাদ। ইলোরার দিকে তাকিয়ে আছে আরও একটা মানুষ। যেটুকু চাঁদের আলো এসে পড়ছে এই জনপদে, তার নীচে আজ কারও লুকোনোর জায়গা নেই। পেটের ব্যথাটা ফিরে এসেছে সৌরর। ও সেটাকে পাত্তা না দিয়েই একটু গলা খাঁকারি দেয়। তারপর জড়ানো গলায় বলে, "ইয়ে, আমার নোট না হলেও একটু ফুটনোট চাই। ঋক স্যর, আপনি বলেছিলেন কিন্তু।"

"তেরে লিয়ে জান ভি হাজির ভাই। এসব নোট-ফুটনোট তো দূর কী বাত। বলো, কী শুনতে চাও। কী জানতে চাও।"

"তোদের এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যটা খোলসা কর আজ," তারপর দত্তর হাত থেকে ওর গ্লাসটা নিয়ে খালি করে সৌর। দত্ত চোখ পাকায়, "এটা কী হল ম্যান? হাল্ক স্ম্যাশ খেয়ে যাবে কিন্তু এবার!"

ঋক চুমুক দিয়ে গ্লাস ওঠায় আকাশের দিকে। তারপর বলে, "তার জন্যই তো এত আয়োজন। কিন্তু একটাই শর্তে। আমাকে বলতে দিতে হবে। আমার যখন বলার ছিল অনেক কিছু, কিন্তু গোছাতে পারার মতো কথা ছিল না তখন সবারটা শুনেছি। আজ কথা আছে, নেশা আছে, সবাই আছে। আজ আমি বলব।"

জাভেদ হাসে, "রাজি," তারপর ইলোরার দিকে সিগারেট এগিয়ে দেয়। ইলোরা কাউন্টার নেয়। কিছু বলে না অবশ্য। তবু ওর ঠোঁটে লেগে থাকা প্রশ্রয়টুকু ঋক জানে। সৌরর দিকে ফিরে ঋক বলে, "তুই ভালবেসেছিস কাউকে?"

সৌর হো হো করে হাসে, "ডোন্ট নো ব্রো। গুচ্ছ প্রেমট্রেম তো করেছি। মা-বাপকেও তো ভালই বাসি। এগুলো কি কোনওটাই কাউন্ট হবে না?"

"মা-বাপটা কাউন্ট হবে না। ওটা অন্য ডোমেন। একটা আনকন্ডিশনাল ভালবাসার সামাজিক চাপ, স্নেহ, শ্রদ্ধা..."

"বাচ্চার লাইফের ওপর, তার ডিসিশনের ওপর দখলদারিত্ব," দত্ত মুখের কথা কেড়ে নেয় ঋকের।

"ইয়েস। আর ওটায় কেমন একটা ডিফল্ট বাধ্যতা আছে দু'দিক থেকে। অভ্যেস আছে। অনেক জটিল কেস। আমি সহজ সাধারণ প্রেম-পিরিতের কথাই বলছি"

"মানে ওই মন কেমন করা? টাওয়েল জড়িয়ে 'যব সে তেরে ন্যায়না'? একসঙ্গে বুড়ো হওয়া, মরে-টরে যাওয়ার ইচ্ছে টাইপ? নাহ ভাই, সেসব হয়নি কখনও..." তারপর একটা লম্বা চুমুক মেরে সৌর বলে, "হোয়াই ইভরিথিং ইজ় সো কমপ্লিকেটেড উইথ ইউ অল ব্রো?"

ঋক হাসে, "এখনও তো কমপ্লিকেশনের কিছু শুরুই হয়নি ব্রো। যাকগে এবার বলি, আমি ভালবেসেছি রে। খুব অ্যাক্টিভলি বেসেছি এরকম নয়। ছক করে মেয়ে আমিও তুলেছি। কিন্তু ভালবাসা বলতে আমি অন্য কিছুর কথা বলছি। যেমন আমি এই মেয়েটাকে ভালবেসেছিলাম। এখনও খারাপ বাসি না। বিয়ে করে সংসার পাতব বলে ছক করে প্রেম করিনি, হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, লাইফ ইজ় হার্ড, সামটাইমস উই জাস্ট সাক। এটাই আমি, আমরা সবাই। কিন্তু যে মানুষ অন্য একজন মানুষের পাশ থেকে মসৃণভাবে সরে যায়, পারমাণবিক পৃথিবীর বিরুদ্ধে তার কোনও কথা বলারই অধিকার নেই। তাই না?"

আলো এসে পড়ছে ঋকের চোখে-মুখে। ওকে বড় অন্যরকম দেখায়।

ইলোরা ওর চোখে চোখ রাখে, বলে, "আমি তোর পাশ থেকে সরে যাইনি ঋক। আমরা ফুরিয়ে গেছি জাস্ট। তুই বললি না, আমাদের ভালবাসা অ্যাক্টিভলি হয় নি? সেরকম ফুরিয়ে যাওয়াটাও অ্যাক্টিভলি হয়নি। আমি কোনওদিন আমাদের ভালবাসাটাকে অস্বীকার করিনি। আজ যখন সেটা ফুরিয়ে গেছে তাকেও কোন জায়গা থেকে অস্বীকার করব তাহলে?" তারপর একটু দম নিয়ে বলে, "আর তুই কি ভাবছিস এটায় আমার কষ্ট হচ্ছে না? হয় না? বাট এগেন..." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলোরা।

ঋক ধোঁয়া ওড়ায় আকাশের দিকে, “আমি তোকে ব্লেম করছিনা ইলোরা, না-ই আমি সে জায়গায় আছি। বাট এগেন, একটা মানুষ যখন অন্ধকারের মধ্যে এভাবে পড়ে থাকে, কী করবে বুঝে পায় না, সব ভুলে আলোর দিকে ছুটতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে নিজেকেও আহত করে, তখন প্রেমিক বা প্রেমিকা হিসেবে নয়, একজন চেনা মানুষ হিসেবেই তার পাশ থেকে এভাবে সরে যেতে নেই রে।”

“এগেন, আমি তোর পাশ থেকে সরে যাইনি ঋক। লাইফ ইজ় হার্ড, সামটাইমস উই জাস্ট সাক। সবসময় আমাদের অনেক কিছু করার থাকে না,” ইলোরার গলায় উষ্মা।

“এই প্লিজ়। এত ভাল মুডটাকে এরকম শাক, চচ্চড়ি, ঘ্যাঁট দিয়ে ঘেঁটে দিস না তো তোরা!” সৌর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়ায়। এক ঢোকে হাতের গ্লাসটা খালি করে পুরোটা। তারপর টলতে টলতে ঋকের দিকে ফিরে বলে, “এই যদি তোর ক্লাস হয় তাহলে আমি বাঙ্ক মারলাম ভাই। আমার পরীক্ষায় জীবনেও এসব প্রশ্নপত্র থাকবে না।”

ঋক হাসে, “সরি ম্যান। এটুকু ইনএভিটেবল ছিল। কিন্তু এখনও ক্লাস বাকি আছে অনেক।”

“আমি কম্ফর্টেবল নই ঋক। তবে তুই কন্টিনিউ করতে পারিস।”

“সত্যি তো সব সময় খুব কম্ফর্টেবল হয়না জাভেদদা। সেই তুমিই একদিন বলেছিলে না? আজ আমি শুধু সেই সৎ চেষ্টাটুকুই করতে চাইছি,” সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয় ঋক। তারপর বলে যায়, “দত্ত, সৌর, ইলোরা, জাভেদদা... আমি ভালবেসেছি। অন্যজন আমাকে বেসেছে। হ্যাঁ ইলোরা, একবার না, বেশ কয়েকবার। যত বড় হয়েছি, নিজেকে চিনেছি, অন্যকে চিনতে চেয়েছি, তত সেগুলোর ফর্ম বদলে গেছে। উল্টোটা আরও বেশি সত্যি— একটা ভালবাসা হওয়ার পর নিজেকে আর-একটু বেশি চিনতে পেরেছি। কারণ, ভালবেসে ফেলে আমি নিজেকে লুকোতে পারিনি কোনওদিন। অন্যের কাছে, নিজের কাছে।”

“বল ঋক, এত ইতস্তত করিস না। এখানে যারা আছে তারা সবাই চেনে তোকে। তোর জন্য কেয়ার করে। তুই শুধু উচ্চারণটুকু না করলে তারা কিছুই বোঝে না এরকম নয়,” ইলোরা কাঁধে হাত রাখে ঋকের। এখন রাত গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘের চাদরের মধ্যে আবার গা ঢাকা দিয়েছে বয়স্ক চাঁদ। শহরের ফুসফুসে যতটুকু হাওয়া বাকি আছে সে তা পাঠাচ্ছে জেগে থাকা মানুষদের। নীচ থেকে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না আর। শিবুদার দোকানের সামনেটা ফাঁকা, সে ঢুলছে এখন।

ঋককে, ইলোরাকে পেরিয়ে সৌরর দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল এ শহরের দূরতম স্কাইস্ক্র্যাপারের দিকে। সেসব ঝাপসা এখন। তবু তারা আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেটের ভিতর মানুষ— তারা কেউ হা-ক্লান্ত ঘুমিয়ে, কেউ একলা জেগে। কেউ প্রিয়জনের শরীরে শরীর ঘষে আলো জ্বালিয়ে নিচ্ছে, কেউ কেউ আবার দুরন্ত অভিমানের উথালপাথাল ঢেউয়ের পাশে অন্ধকারে বসে আছে নিজেদের থেকে মুখ ফিরিয়ে। এইসব কিছুকে নিঃশব্দে ছুঁয়ে থাকতে চেয়েছিল সৌর। এই সব দৃশ্যের পাশেই কোথাও একটা রয়ে যেতে চেয়েছিল। একটা অনশন মঞ্চে, একটা মেট্রোর কামরায়, একটা স্বপ্নের ভিতর। মেঘ এসে ঢেকে দেওয়া জুলুকের সন্ধের কাছে, অবজ়ারভেশন ওয়ার্ডের মাঝখানে পারিজাতদির স্নেহে, মোহরকুঞ্জের সামনে দাঁড়ানো একটা মেয়ের চোখের ছায়ায়। বড় দেরি হয়ে গেছে কি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঋক, “আমি... আমি জাভেদদাকে ভালবাসি...” আর ঠিক তখনই সৌরর পেটের ভিতর থেকে অসহ্য যন্ত্রণার একটা ড্রিল মেশিন পাক দিয়ে ওঠে, ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায় পিঠ ভেদ করে। অন্ধকার থেকে জেগে ওঠা একটা ভয়ঙ্কর পোকা ওর পাকস্থলী বেয়ে, গলা বেয়ে উঠে আসে বাইরে। বমিতে ভেসে যায় খবরের কাগজ-চানাচুর-সিগারেটের প্যাকেট। শিবুদা ঢুলতে ঢুলতে জেগে ওঠে হঠাৎ। সসপ্যান থেকে চা উথলে উঠে কয়লা ভিজিয়ে উনুন নিভিয়ে ফেলেছে। আবার আঁচ দিতে হবে। ব্যাজার মুখে একটা বিড়ি ধরায় ও।

## ১৮

টেবিলে কাপটা রাখতে গিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে ছেলেটার হাত কেঁপে যাওয়ায় কিছুটা চা ছলকে পড়েছে প্লেটের ওপর। ছেলেটা বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে তাতে। সে দু’বার “সরি ম্যাম” বলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলে যাচ্ছে। যেন শুধু সরি-তে মেটার নয়। এরকম বড়সড় একটা অপরাধের জন্য আরও বেশ অনেকখানি শাস্তি পাওয়ার কথা তার। ক্যাফেটা খুব ছিমছাম। এখন প্রায় ফাঁকা। বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে বলে এমনিতেই এই জায়গাটায় হট্টগোল কম। ঠিক বাইরেই বেশ ঝাঁকড়া একটা রাধাচূড়া গাছ। তার ওপাশে রাস্তা পেরিয়ে বড়সড় একটা পুকুর। পুকুরটাকে ঘিরে একটা বাঁধানো রাস্তা, কয়েকটা বেঞ্চ, কিছু কেয়ারি করা গাছ। দূরের দিকের বেঞ্চে কমবয়সি একটা কাপল হাতে হাত রেখে বসে আছে। বিক্রমগড়ের সেই কাপলটা কী না কে জানে। সাদাচুল কিছু মানুষ তাদের পেরিয়ে পেরিয়ে হাঁটছে রাস্তা ধরে। এদের সবাইকে ঘিরে সন্ধে নামছে ঘরে ফেরা পাখির মতো।

শ্রীতমা কিছুটা বাধ্য হয়েই বাইরে থেকে চোখ ফেরালেন ছেলেটার দিকে। তারপর সামান্য হেসে বললেন, “ইটস্ ওকে। আমাকে আর-একটা সুগার দিয়ে যাবে?”

এক কাপ চায়ের সামনে বসে আগে কোনওদিন এত কিছু ভাবেনি শ্রীতমা। হোয়াটসঅ্যাপে এসে পড়ে থাকা গত রাতের কবিতাটা আর-একবার পড়ে ও। কবে যেন কবিতা আর চেষ্টা করে বুঝতে হয় না। নিজের জীবন, অন্যের অনুভবের ফুল ফুটে ওঠে বহু দূরে বসে থাকা কোনও অদৃশ্য মানুষের কিছু লাইনের ভিতর।

সেই রাতে ইলোরার বলা কথাটা মনে পড়ে শ্রীতমার। একটা মানুষ, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি, জীবন কোথাও পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। নিজেদের মতো করেই রয়ে যায় সময়ের পকেটে। সে পকেটে আলগোছে হাত দিলে হঠাৎ হাতে ঠেকে নরম ফুল। মন কেমন করে ওঠে। শুধু সেই ফুলটুকু নিয়ে ফেরা যায় না আর কোথাও।

ডায়েরিটা টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ আঁকিবুকি কাটে শ্রীতমা। মনের ভিতর নরম কাদার তালের মতো অনেক কথা পড়ে আছে। তাদের নিজ হাতে গড়ে নিতে হবে নির্দিষ্ট শেপে। তারপর তারা সময় পাবে, রোদ পাবে। তবেই না তাতে রাখা যাবে কিছু ফুল অথবা ছলকে ওঠা চা। সে কাজ এতখানি কঠিন তা আগে কোনওদিন বুঝতে পারেনি ও।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করে শ্রীতমা। হাত বেয়ে কিছুতেই নেমে আসছে না একটা শব্দও। মাথার ভিতর থেকে একটা নাম, কিছু কষ্ট, অভিমান যাচ্ছে না কিছুতেই। তাদের অন্ধকার জালের ভিতর আটকে যাচ্ছে যাবতীয় শব্দ। বারবার মনে হচ্ছে শেষ হওয়ার ছিল, কিন্তু কিছুতেই এভাবে শেষ হওয়ার কথা ছিল না।

ডায়েরিটা বন্ধ করে ফোনবুকটা খোলে শ্রীতমা।

“কোথায় আছ নির্বাণ? একবার দেখা করতে পারবে? এখনই?”

ডাইনিংয়ের বড় ফ্লাওয়ার ভাসটা থেকে ফুলগুলো বের করে ধুলো ঝাড়ছিল আত্রেয়ী। প্লাস্টিকের রংবেরঙের ফুল, লম্বা লম্বা পাতা। একপাশে লেদারের কালো সোফা। পড়ন্ত বিকেলের আলো জানলা গলে এসে আধশোয়া হয়ে আছে সেখানে।

যেমন কাঁটার মতো জেগে আছে পাঁচ দিন আগের বিকেল-সন্ধেটা। ঋক ওর জীবনের অদ্ভুত একটা অধ্যায় যাকে ও জড়িয়ে ধরে সুখে, স্বস্তিতে দিনের পর-দিন বেঁচে থাকতেও পারেনি আবার হাজার বিরহে, হাজার দূরত্বেও যাকে অস্বীকার করে ভুলে যেতে পারেনি। ঋক ওর জীবনে যে ঝড় বয়ে এনেছিল তার জন্য আত্রেয়ী তৈরি ছিল না। এ পৃথিবীর আর কারও জন্য এতখানি ভালবাসা, টান, আকর্ষণ কি অনুভব করেছে আত্রেয়ী? যতবার ভেবেছে সেই ঝড়টা, ওদের সময়টা শেষ হয়ে গেছে ততবার কোনও এক নাম না-জানা গল্পকারের অমোঘ কলমের টানে ওরা ফিরে ফিরে এসেছে নিজেদের কাছে।

কিন্তু এই পাঁচটা দিনে ও কি আত্রেয়ীর মেসেজের একটা রিপ্লাইও দিতে পারত না? একবার বলতে পারত না, "হ্যাঁ রে, ঠিক আছি"? বলতে পারত না, "আমিও মিস করছি তোকে"? আত্রেয়ী জানে এখান থেকে কিছুই নতুন করে শুরু হওয়ার নেই, না তো সেসব কেউ চায়। আত্রেয়ী খুব দূরের কথা ভাবতে পারে না, বড় করে ভাবতে পারে না। চায়ও তো নি কখনও। ও নিজের আবেগটার একটা স্বীকৃতি চায় শুধু।

এসব ভাবতে ভাবতেই চ্যানেল ঘোরাচ্ছিল আত্রেয়ী। কিছু দেখার ইচ্ছে নেই। টিভিতে কিছু দেখার থাকেও না এই সময়টায়। কিন্তু মানুষকে তো কিছু একটা করতে হবে!

তখনই ওর চোখ আটকে গেল খবরের চ্যানেলে। ব্রেকিং নিউজ়ের ফিতে, মেডিক্যাল কলেজের গেট, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্স। আর এই সবকিছুর উপরে ভেসে আছে মেট্রোর ভিতরের সেই টান টানা চোখের ছটফটে ছেলেটা না? ওর নতুন ফেসবুক ফ্রেন্ড? ঋকের 'পেয়ার্ড ইলেকট্রন'?

হঠাৎ সন্ধেটা এত ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? সোফাটা এক বিষণ্ণ দৈত্যের মতো গিলে নিতে চাইছে কেন তাকে? প্লাস্টিকের ফুল-পাতাগুলো অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা প্রাণহীন সরীসৃপের মতো এগিয়ে আসছে কেন তারই বুকের দিকে?

আত্রেয়ী পাগলের মতো হাতড়ে মোবাইলটা তোলে। ফোনটা তোল ঋক, প্লিজ়!

"আপনি যে নম্বরটি ডায়াল করেছেন, সেটি বর্তমানে সুইচড অফ আছে।"

## ১৯

ঠিক কী হয়েছে বা হতে চলেছে সেটা জাভেদ ছাড়া আর কেউই যে ধারণা করতে পারেনি তার একটা কারণ যদি হয় জাভেদ ওদের চেয়ে পৃথিবী আর মানুষের রোগকে কয়েকটা বছর বেশি দেখেছে তবে দ্বিতীয়টা হল ওদের মধ্যে ঠিক সেই মুহূর্তে শারীরিক ভাবে সবচেয়ে সুস্থ আর মনের দিক থেকে সবচেয়ে আবেগহীন মানুষটাও ছিল ওই।

ইলোরা ঋকের হাত শক্ত করে ধরে স্থির দাঁড়িয়েছিল। ভিতরটা একটু কাঁপছেও যেন ওর। সেটা ঋকের শেষ কথাটুকুর জন্য নাকি ছাদের উপর হঠাৎ লুটিয়ে পড়া সৌরর জন্য নাকি মাথার ভিতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে সময়কে থামিয়ে এই মুহূর্তে ওর নিজের প্রসেস করার সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য সেটা ও নিজেও জানে না। দত্ত ওদিকে কিছুটা বিরক্তই, "বলেছিলাম একটু রয়েসয়ে গিলতে, শালা এত ভাল স্টোরিটার এরকম অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স কে ঘটায় ভাই!"

"সৌর, এই সৌর। ওঠ। হস্টেল চল। অনেক ছড়িয়েছিস," ঋক হাত ধরে টেনে তুলতে যায় সৌরকে।

সৌর গোঙাচ্ছিল। ওর মুখ দিয়ে অস্ফুটে কিছু শব্দ আর মদ- বমির অনেকটা তীব্র গন্ধ বেরিয়ে আসে।

"মোবাইলের আলোটা এদিকে ধর প্রলয়। ঋক, ইলোরা তোরা ওদিকে সরে দাঁড়া চুপচাপ। সম্ভব হলে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দে একটু," দৃঢ় গলায় বলে জাভেদ।

তারপর নীচু হয়ে সৌরর পালসে হাত রাখে, "সৌর... সৌর। কী অসুবিধে হচ্ছে বল একটু, প্লিজ়!"

"পেটে... পেটে অসম্ভব ব্যথা জাভেদদা..." সৌর কোনওমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে।

"কখন থেকে? এই? কখন থেকে বল? সৌর?"

"এক সপ্তাহ... জাভেদদা... কষ্ট হচ্ছে। জল দাও একটু।"

জাভেদের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। কষ্টে নাকি রাগে নাকি অনিবার্যের আশঙ্কায় কে জানে, "হোয়াট দ্য... তুই নিজে ইন্টার্ন হয়ে এক সপ্তাহ ধরে পেট ব্যথা চেপে রেখে তারপরেও ছ'পেগ বাকার্ডি কীভাবে
খেতে পারিস সৌর! সৌর... চোখ খোলা রাখ প্লিজ়..."

মাঝরাতের এই থম মেরে থাকা শহর, এই অন্ধকার, এই জমে থাকা মেঘের দল— সব নেমে এসেছে জাভেদের মাথার ভিতর। সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে। ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। হাউহাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। ঋককে ঝাঁকিয়ে দু'গালে সজোরে দুটো চড় মেরে বলতে ইচ্ছে করছিল "সুস্থ হ ঋক, বড় বিপদ ঘটে গেছে, আমি সামলাতে পারব না একা!"

ইলোরার চোখ লাল। পায়ের তলায় ছাদটা বড় ঠান্ডা হয়ে আছে। মেঘের ভিতর থেকে চাঁদটাকে ভীষণ নরম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটু চেষ্টা করলেই উঠে গিয়ে মেঘটেঘ সরিয়ে চাঁদের গায়ে এলিয়ে পড়ে থাকা যায়। কিন্তু জাভেদদা বলছে একটা বিপদ ঘটে গেছে। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে ইলোরার। মা তো সব বিপদ সামলে নেয়, এটাও নিত ঠিক। ও যে কিছুই পারে না...

দত্তর চোখও লাল, তার উপর ও এই গোটা পরিস্থিতিটার গ্র্যাভিটিটা বুঝতে পারেনি সম্ভবত। কিন্তু বাকিটুকু কেউ পারলে সেটা দত্তই পারবে। ভাবার সময় নেই বেশি। জাভেদ প্রায় চিৎকার করে, "সৌর চোখ খোলা রাখ প্লিজ়, কথা বল আমার সঙ্গে। প্রলয় তুই হাত ধরে ওপাশ থেকে সৌরকে তোল, আমি পা দুটো ধরছি। ইমিডিয়েটলি ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে।"

ঋক ওদিক থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "জাভেদদা, তুমি একটু বেশি রিয়্যাক্ট করছ। মদ খেয়ে ছড়িয়েছে। ভাল করে ঘুমোতে দাও একটু, ঠিক হয়ে যাবে।"

এতক্ষণ চেপে রাখা কষ্ট-রাগ-আশঙ্কার সবটুকু জাভেদের মাথার ভিতর হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। ও এগিয়ে গিয়ে সজোরে একটা থাপ্পড় মারল ঋককে...

"ওকে এখন ভাল করে ঘুমোতে দিলে ও কাল উঠতে পারবে না ঋক। আর আমরা কোনওদিন ঘুমোতে পারব না! প্লিজ় সুস্থ
হ একবার..."

প্রলয় আর জাভেদ যখন কোনওমতে ধরাধরি করে সৌরকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে এল ঘড়িতে তখন আড়াইটা। সারাদিন উচ্ছল তরুণের মতো জেগে থাকা মেডিক্যাল কলেজ চত্বর, এমসিএইচ-এর সিঁড়ি, ইমার্জেন্সি এখন স্মৃতিভ্রষ্ট একলা বৃদ্ধের মতো উদাস শুয়ে আছে। চোখে ঘুম নেই তার, যদিও ভীষণ ক্লান্ত।

সৌর আর-একবার বমি করে ইমার্জেন্সির মেঝেয়। বমি, মদের গন্ধে ভুরভুর করে জায়গাটা।

জাভেদ চিৎকার করে, "কে আছিস? একটা স্যালাইনের সেট রেডি কর। আর ড্রটিন-জোফার লোড কর একটা করে, কুইক!"

অভিষেক, সৌম্য বেরিয়ে আসে ঘুম চোখে। তবু চোয়াল শক্ত ওদের, চোখ-মুখ অদ্ভুত রকমের নিরুত্তাপ। সৌম্য এগিয়ে এসে জাভেদের সামনে দাঁড়ায়,

"তুমি ভেতরে ঢুকবে না জাভেদদা। কাল সকালে আগে মিটিং হবে, তারপরে তুমি এই কলেজে, এই ইমার্জেন্সিতে পা রাখবে কি না সেটা ডিসাইড করা হবে। তোমাকে দাদার মতো দেখি, কিন্তু তুমি এই কথাটা না-মানলে আমি নিজেকে কতটা কন্ট্রোল করতে পারব সেই কথা দিতে পারছি না!"

"সৌম্য... প্লিজ়, আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় করিস। আমি তোদের কেউ নই। কিন্তু সৌর তোদের বন্ধু। ইটস্ ইমার্জেন্সি, প্লিজ়!" জাভেদের গলা ভেঙে আসে।

"সেটা আমরা বুঝব জাভেদদা। আমাদের একজন হয়েও যে এই কলেজের একজন সিনিয়রের গায়ে হাত তোলে আর তারপর নেশা করে ছড়িয়ে লাট করে আবার আমাদের কাছেই আসতে হয় তাকে ইমার্জেন্সি বেসিসে কতটা পাত্তা দেওয়া যায় সেটা আমাদের বুঝে নিতে দাও। তবে নিজের শাগরেদদের ফুঁসলিয়ে যে নিজেরই কলিগদের মার খাওয়ায় সে যে সত্যিই এই কলেজের কেউ নয়, আমাদের কেউ নয় সেটা তুমি না বলে দিলেও সবাই জেনে গেছে। তুমি ফোটো এখান থেকে!" অভিষেক ধাক্কা দেয় জাভেদকে।

দত্ত এগিয়ে আসে। পাশ থেকে স্যালাইনের বোতল ঝোলানোর স্ট্যান্ডটা ডান হাতে তুলে নেয় শক্ত করে, "সৌম্য, অভিষেক... আমি এমনিতেই গুছিয়ে কথা বলতে পারি না ম্যান, জানিসই। এখন এতটাই হাই আর সৌর এভাবে পড়ে আছে, আরওই পারব না। শুধু বলছি, এই লাফড়াবাজিগুলো এখন বন্ধ কর প্লিজ়। প্লিজ় বলছি। আমি। আগে শুনেছিস কি না কোনওদিন জানি না। তবে এরপরেও যদি এটা বন্ধ না করিস তাহলে কাল সকালে কী হবে সেটা পরের ব্যাপার, তবে মিটিং করার জন্য তোরা যে থাকতে পারবি না সেটা জেনে রাখিস।"

একটু পিছিয়ে যায় অভিষেক, "প্রলয়, তোকে আমরা চিনি। তুই এদের নোস। আমরা সৌরকে স্ট্রেচারে নিচ্ছি, তুই থাক। কিন্তু জাভেদদা থাকবে না ম্যান এখানে"

প্রলয় স্ট্যান্ডটা ওঠায়, "জাভেদদা থাকবে অভি। সৌরর জন্য থাকতে হবে জাভেদদাকে," তারপর অভিষেকের চোখে চোখ রেখে বলে, "আমাকে চিনিস না তুই। আর হ্যাঁ, আমি কারও না।"

এতক্ষণ পরে এরকম তীব্র আলোর নীচে দেখছে বলে হয়তো অথবা সত্যি সত্যিই সৌরকে বড় ফ্যাকাসে লাগছে জাভেদের। কপালটা বেশ গরম। পালসে হাত দিয়ে দেখল সেটাও একশো কুড়ির উপরে। স্ট্রেচারের উপর পড়ে আছে ও, চোখ বোজা, বাম হাতে স্যালাইনের নল। আর ডান হাতটা দিয়ে জাভেদের টি-শার্টের কোনাটা ধরে আছে। যেন প্রাণপণে আঁকড়ে আছে প্রিয়জনকে। যেন এখনও অনেক পাত্তা না দেওয়া বাকি, বকা খাওয়া বাকি। অনেক ভুল করা বাকি, ঠিক করা বাকি। বৃদ্ধ পৃথিবী সমস্ত প্রাণোচ্ছল মানুষকে তাদের বাকি পড়ে থাকা কাজ গোছানোর সময় দিক।

এমনিতেই শনিবারের ভোররাতে মাথা খুঁড়লেও কোথাও একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি হবে না। কালকেও কখন হয়, কোথায় হয় কে জানে! আর্জেন্ট ব্লাডও পাঠাতে হবে ইনভেস্টিগেশনের জন্য। ও একা কীভাবে করবে এত কিছু! তার উপর এই ক্যাম্পাসের প্রতিটা মানুষ, এই বিল্ডিংগুলোর প্রতিটা ইট জাভেদকে বয়কট করেছে আজ। এ শহরের বুকে ও যে ভুল করেনি, ফেলে আসা সন্ধেয় ও যে আঘাত করেনি, এ জীবনের রঙ্গমঞ্চে ও যে অপরাধে অপরাধী নয় সেই প্রতিটি ভুল, প্রতিটি আঘাত, প্রতিটা অপরাধের দায় আজ শুধু তারই। লড়াই করতে জাভেদ ভয় পায় না। কিন্তু ঘৃণার এই অসম, নিষ্ফলা, অনন্ত খেলার ভেতর একা একা ছুটতে গিয়ে বড় অসহায় লাগে, একা লাগে, ক্লান্ত লাগে ওর।

"সৌর... সৌর, চোখ খোল... ভাল লাগছে রে একটু? ব্যথাটা কমেছে?"

সৌর শুনতে পায়, কিন্তু খুব চেয়েও চোখ খুলতে পারে না। ওর শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো ওর ইচ্ছাধীন নেই আর। ওর নিজের কিছু ইচ্ছে আছে কী না সেটাও জানে না ও। ও ভাবতে চাইছে একটু ঠিক করে, নিজেকে বলতে চাইছে, "This too shall pass champ", জাভেদদার পাশে থাকতে চাইছে খুব। কিন্তু এই শরীরটা, ওর স্নায়ুতন্ত্র, ওর ইচ্ছের কিছুই এখন আর ওর কন্ট্রোলে নেই। ও শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারছে— ওর পেটের ভিতর যন্ত্রণার সেই ড্রিল মেশিনটা এখনও চলছে। সৌর প্রাণপণে চাইছে সেটা যেন বন্ধ হয় কোনওমতে। যন্ত্রণা সর্বভুক, তার হাত থেকে নিস্তার নেই কিছুর।

ঋক আর ইলোরা যখন পরস্পরের ভরসায় সিঁড়ি দিয়ে কোনওমতে নেমে এল তখন সবে সকালের আলো ফুটছে। ঋক খুব চেয়েছিল জাভেদ আর প্রলয়ের সঙ্গে নেমে আসতে, কিন্তু কিছুতেই পারেনি। ওর শরীরের ভেতর শুধু অ্যালকোহল না, ভেসে বেড়াচ্ছিল তীব্র অভিমান, কষ্ট আর ভয়। সবটুকু মিলিয়েই চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল ওর, আর পা টলছিল অসহায়ভাবে।

ডানদিকের দূরতম কোনায় একটা স্ট্রেচারের উপর সৌর শুয়ে আছে। পাশে জাভেদদা দাঁড়িয়ে। করিডরের এইটুকু পথ মনে হচ্ছে কী বিস্তীর্ণ মরুভূমি! গলা শুকিয়ে আছে ঋকের, কোথাও কেউ নেই। সৌরর কাছে একটা মরুদ্যান আছে, সেখানে পৌঁছতে হবে। সে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগে তার কাছে গিয়ে আঁজলা ভরে একটু জল খেতে হবে। বালিয়াড়ি পেরিয়ে, ধু ধু শূন্যতা পেরিয়ে ঋক অশক্ত পা চালায়।

"জাভেদদা... কেমন আছে সৌর? দত্ত কোথায়?"

সকালের আলো মাখা ক্লান্ত, ধূসর ঋকের দিকে তাকায় জাভেদ। সদ্য নিজেকে হারিয়ে, একটা অন্ধকারকে হারিয়ে বেঁচে উঠেছিল ও। আবার মেঘ করে এসেছে ভীষণ। জীবন কাউকেই থামতে দিচ্ছে না, গোছাতে দিচ্ছে না একটুও।

"আমি জানি না রে। দত্ত কোথায় তাও জানি না। বমি করেনি আর, কিন্তু টেম্পারেচার আছে। বিপি লো, ট্যাকিও আছে ভাল। আর অ্যাবডোমেনের কী অবস্থা নিজেই হাত দিয়ে দেখ..."

সৌরর গেঞ্জিটা ওঠায় ঋক। শক্ত হয়ে আছে গোটা পেটটা। হাত দিতে গেলেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে ও।

"রাত থেকে একের পর-এক কল করে যাচ্ছি ঋক। হাউসস্টাফ কে আছে চিনি না, আইসিইউতে নাকি একটাও বেড নেই। আমার কলও তুলছে না এখন আর। ইউএসজি করতে হবে, ব্লাড পাঠাতে হবে, ভাইটালস মনিটর করতে হবে। এখানে বেড না পাওয়া গেলে হয়তো শিফট করতে হবে। এর মধ্যে কাকুকে ফোন করে কী বলব, কী করে বলব কিচ্ছু জানি না। এত এত অপরাধের দায় আমার ওপর! এইটা কীভাবে নিই? সারাজীবনেও চোখ তুলে তাকাতে পারব না আমি। আমার সব কিছু ঘেঁটে যাচ্ছে রে..." তারপর একটু চুপ থেকে ঋকের দিকে তাকায় জাভেদদা, "আমি সরি ঋক। আমি সরি। ফর এভরিথিং!"

মাথার ভেতরটা ফাঁকা। হাতে-পায়ের সমস্ত শিরশিরানি হারিয়ে গিয়ে শুধু ভোঁতা চামড়ায় মোড়া একটা শরীর পড়ে আছে। সব কথা হারিয়ে গেছে আবার। ঋকের নিজেকে জড় পদার্থ মনে হচ্ছিল।

"কাকুকে কলটা করা প্রয়োজন জাভেদদা। সবদিক দিয়েই। আমি করছি," তারপর ইলোরার দিকে ফেরে ও, "তুই বাড়ি চলে যা ইলোরা। রেস্ট নে। আমরা সামলে নেব ঠিক।"

সৌর যখন পার্কস্ট্রিটের এক নার্সিং হোমের আইসিইউ-তে ঢুকছে তখন সূর্য দিগন্তের অনেকখানি উপরে এবং ওর

প্রেশার প্রায় ততটাই নীচে নেমে গেছে। এ শহরের মানুষজন অলস রবিবারের সকালে বাজারের ব্যাগ হাতে লাইন দিয়েছে মাংসের দোকানের সামনে। কোনও রান্নাঘরে লুচি ভাজা হচ্ছে, তার গন্ধ ভেসে আসছে বারান্দা পর্যন্ত। ক্লাস ইলেভেনের একটা মেয়ে গিটার শিখতে যাচ্ছে অটোতে করে। একটা মানুষ অনেক ঠিক- ভুল পেরিয়ে তাদের সবার কাছে পৌঁছতে চেয়েছিল রোদ পড়ে আসা বিকেলবেলায়। তাদের সবার স্বপ্নের ভেতর স্থায়ী হতে চেয়েছিল ঘুম ভেঙে যাওয়া ভোরে। তারা কেউ সেই মানুষটার নাম, তার স্বপ্নের খবর জানে না।

## ২০

সূর্য উঠে গেছে কিন্তু এখনও বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। সৌর জানলার পাশে একটা বিছানায় শুয়েছিল। গায়ে পাতলা কম্বল। জানলা জুড়ে জেগে আছে সবুজ উপত্যকা, তাকে ছাড়িয়ে দিগন্তে শুয়ে আছে সুবিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওর অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু গলার ভেতর একটা বিদঘুটে নল ঢোকানো আছে। ও কথা বলতে পারছে না। যদিও সেটুকু ছাড়া ওর সেরকম কষ্ট হচ্ছে না শরীরে। বরং এই ঠান্ডায় এরকম অলস শুয়ে থাকতে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে, প্রজাপতি, ফুল আর পাখিদের দেখতে খুব ভাল লাগছিল ওর।

আর ভাল লাগছিল দেবার দিকে তাকিয়ে থাকতে। বিছানার পাশে একটা বেতের মোড়া, সেখানে দেবা বসে আছে। গায়ে একটা চাদর। কতদিন পরে ওকে দেখল সৌর। মুখটা একইরকম হাসি হাসি, গালে বহুদিনের না-কাটা দাড়ি-গোঁফ। কিন্তু এই সবকিছুর ভেতরে জেগে রয়েছে একজোড়া সজাগ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। যেন সারাক্ষণ সবকিছু দেখতে চায়, শুষে নিতে চায়। তারপর সেই সবকিছুকে প্রসেস করে, সংশ্লেষ করে ও স্থাপন করতে চায় নিজের নতুন কোনও মতবাদ।

দেবা ওর মাথায় হাত রেখে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনও কথা না বললেও সৌর বুঝতে পারছে, ছুঁতে পারছে দেবাকে। ওকে আর দূরের দীর্ঘ সরলরেখা মনে হচ্ছে না। বরং ও নিজের সরলরেখাটাকে নিজেই গুটিয়ে এনে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে। তার ভেতরে আলো, ছায়া, বন্ধুত্ব, একলামি, সহজ জীবন, দীর্ঘ লড়াই সবই আছে। দেবা সেই বৃত্তের ভেতর ডেকে নিচ্ছে ওর কলেজের প্রথম বন্ধুকে।

আর ডেকে নিচ্ছে মোহরকুঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটাকে। সৌরর হাত ধরে আছে রূপসা। ওর টানা টানা চোখে ভয়, বিহ্বলতা, আশ্রয়। তবু ও হাত ছাড়ছে না। বলছে, "রাত হবে তো কী? তুমি থাকবে তো। অলি পাব থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে, ঠিক আছে?"

দেবা ওঠে ওর বিছানার পাশ থেকে। ওদের দিকে তাকায়, বলে, "আমি এবার বেরোব সৌর। অনেকটা রাস্তা ফিরতে হবে," তারপর একটু থেমে বলে, "আর তোরা সাবধানে যাস। বিকেলের পরে পাহাড়ের রাস্তায় যাবি না, জন্তু জানোয়ার আছে।"

সৌরর অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে দেবাকে, রূপসাকে। বলতে পারছে না। ওর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে বালিশে। হাতটা একটু মুঠো করে ও দেবার দিকে ওঠায়। দোলায় দু'পাশে। নিজের ঘোরের ভেতর সৌরদীপ ভৌমিক একা হলেও এই নার্সিংহোমে সে কোনও সামান্য পেশেন্ট নয়। সে যে শুধু মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্ন ডাক্তার তা নয়, সে হল প্রদীপ ভৌমিকের ছেলে। এই দু'দিনে রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে একের পর-এক ফোন এসেছে আইসিইউ ইনচার্জ থেকে শুরু করে নার্সিংহোমের সুপার-ম্যানেজমেন্ট-মালিক সবার কাছেই— যা করতে হয় করুন, কিন্তু দু'দিন আগেই উড়ে বেড়ানো একটা মানুষ যেন এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

নীচে অল্প কিছুজন দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। আত্রেয়ী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। ফাঁকা করিডর। সোহাগী রোদ এসে লুটিয়ে আছে পায়ের কাছে।

তাদের কিছুতেই বলা যাচ্ছে না যে আইসিইউতে শুয়ে থাকা মানুষের শরীরের সামনে ক্ষমতা, অর্থ, প্রতিপত্তি কিছুই কাজ করে না। তাদের কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না যে নিজের বাইল ডাক্টে পাথর পুষে রেখে যখন একটা মানুষ গলা পর্যন্ত নেশা করতে যায় তখন যে ভয়ঙ্করতম বিপদ ঘনিয়ে আসে তার জন্য আসলে ঠিক কেউই দায়ী নয়। ভরসা দিয়ে ওঠা যাচ্ছে না যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কারণ সত্যিই যখন একটা মানুষ কিছু প্যারামিটারের সমষ্টি হয়ে যায় তখন সবকিছু এত সহজে, সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ঠিক হয়ে যায় না। তার দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর তাবড় ডাক্তাররা আসলে নিজেদের শিখে আসা সমস্ত প্রক্রিয়া আর ওষুধ প্রয়োগ করে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকেন যেন সবকিছু ঠিক হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। এবং রোগটার নাম যখন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, আর মানুষটা যখন ভেন্টিলেটরে ঢুকে গেছে তখন সবকিছু ঠিক হওয়ার জন্য সেই ছটফটে মানুষটার লড়াই করার দিকেই তাকিয়ে থাকে সবাই।

এই দুটো দিন ঋক আর জাভেদ সারাদিন ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে থেকেছে, ভিজিটিং আওয়ারে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে সৌরর বেডের পাশে, আর রাতে নিজেদের সারাদিনের দখল করা জায়গাতেই বসে ঢুলেছে। এই দুটো দিনে সৌরর শরীর একবারও নিজের প্রয়োজনীয় লড়াই করে উঠতে পারেনি। সৌরর ফ্যামিলির কেউ ওদের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেনি। কলেজের, ডিপার্টমেন্টের কেউ একবারও খোঁজ নিয়ে যায় নি। ওরা চুপচাপ পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস চেপে গেছে। পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে নিজেদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আর নিজেদের সবটুকু ইচ্ছেশক্তি দিয়ে সারাদিন চেয়ে গেছে যেন স্বর্ণেন্দু স্যর ওদের একবার বলে, "সৌর স্টেবল অনেক, আমরা ট্রাই করছি এক্সটিউবেট করার। তোরা বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আয় একবার..."

এই দুটো দিনে ওরা বড় হয়ে গেছে দু'দশক। আজ সকালে ইলোরা এসেছিল। ঋক জীবনে প্রথমবারের জন্য কাঁদতে দেখেছিল ওকে। ঋককে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেছিল, "আমি জানিনা রে কী বলতে হয়... সব ঠিক হয়ে যাবে ঋক... সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে ইলোরা। তুই এভাবে ভেঙে পড়িস না," ঋক শান্ত, স্থির, আবেগহীন।

"সেদিনের সন্ধে, রাতের পুরো ঘটনাটা খুব বাজে এফেক্ট ফেলেছে রে ক্যাম্পাসে। ভেতরে- বাইরে অনেক লোকে চাপ দিচ্ছে এনকোয়ারি কমিটি ফর্ম করার জন্য। আমাদের ডাকা হতে পারে।"

"জানি, দত্ত কল করেছিল," তারপর একটু থেমে ঋক বলে, "আমাদের না ইলোরা। তুই এর বাইরে থাকবি। কারও জানার প্রয়োজন নেই তুই রাতে এমসিএইচ টপে ছিলি।"

"আই অ্যাম সরি ঋক, কিন্তু এই টাইমে আমার এই ক্লিনচিটটা নিতে ইচ্ছে করছে না। প্লাস আমি তোকে, তোদেরকে একা ফেলে যেতে পারব না এই কন্ডিশনে!"

ঋক খুব ধীরে ধীরে, দৃঢ় গলায় বলে, "তুই পাশে থাক ইলোরা। সেটা অনেকভাবেই থাকতে পারবি। কিন্তু আমাদের যতটুকুই দায় থাক সেটা তোর নয়। তোকে এই গোটাটার মধ্যে জড়িয়েছি আমি-আমরা। প্লাস, তুই এগিয়ে এলে আমাদের কারওই খুব সুবিধে হবে না রে। লোকে মুখরোচক গল্প ফাঁদবে, এমন অ্যাঙ্গল এনে ঢোকাবে যেখানে গোটা ঘটনার ফ্লোটা আরও ঘেঁটে যায়, অন্যদিকে চলে যায়, জটিল হয়ে যায়। সেটা এই মুহূর্তে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

জাভেদ তাকিয়ে থাকে ঋকের দিকে। ওর গালে শেভ না-করা দাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দানা দানা দুশ্চিন্তা, চশমার ওপাশে জেগে আছে অসহায়তা। তবু তার ভিতরেও ঋককে দেখে এই মুহূর্তে হঠাৎ নিজের দাদার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কেন জাভেদের?

হঠাৎ আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ইলোরা, "আমি সরি ঋক... সরি!"

নার্সিংহোমের সামনের ফুটপাতে এক শহর লোকের সামনে ঋক আর-একবার জড়িয়ে ধরে ইলোরাকে। সে আলিঙ্গনে সাহস আছে, স্নেহ আছে, আশ্রয় আছে, "সরি, বলার মতো কিচ্ছু করিসনি তুই ইলোরা। এমনি করে না, শান্ত হ। সিগারেট ধরাব একটা?"

এখন সাড়ে ন'টা। ঝকঝক করছে আকাশ। তার গায়ে লেগে থাকা চাঁদটা একটু ম্লান। দিগন্তে শুয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও এখন দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। হু হু ঠান্ডা হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। সৌরর ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল। কেউ একটু জানলাটা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। কিন্তু দেবা তো চলে গেছে। কোথায় একটা ফিরতে হবে বলল না? রূপসা কই? ও কি নিজেই চলে যেতে বলেছে রূপসাকে? রূপসা কি খুব অভিমান করেছে তাতে? ওর ঠিক মনে পড়ছে না এখন। গলার ভেতর সেই নলটা এখনও ঢুকে আছে, আর চারপাশে যান্ত্রিক আওয়াজ। এরকম একটা পরিবেশে এই আওয়াজটা খুবই বেমানান। এখানে রাতচরা পাখিদের ডানার আওয়াজ থাকবে, হঠাৎ কোনও বুনো জন্তুর ডাক শোনা যাবে দূরে, অথবা তামাংজির ঘর থেকে ক্ষীণ ভেসে আসবে হাসি-গল্প-গান। কিন্তু এখানে এখন সেসব কিচ্ছু নেই।

খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছে সৌর। উঠতে হবে। কিন্তু সৌর উঠতে পারছে না বিছানা ছেড়ে, স্বপ্নটা ছেড়ে। ও চিৎকার করে ডাকতে যায়— ঋক, জাভেদদা, দেবা, রূপসা কাউকে একটা। গলা দিয়ে আওয়াজ আসে না ওর কিছুতেই। শুধু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে বালিশে।

যান্ত্রিক আওয়াজগুলো কমে আসে ধীরে ধীরে। ওর বুকের ওপর কেউ বা কারা চেপে বসছে যেন, বারবার। পাখিটা একে একে তাদের সবাইকে সরিয়ে সৌরকে তুলে নেয় তার থাবায়, তারপর উড়ে চলে যায় শুয়ে থাকা বুদ্ধের দিকে।

## ২১

দেবাদিত্য আধশোয়া হয়ে শুয়ে ছিল। সামান্য ক্লান্ত। জানলার বাইরে একটু দূরেই চা-বাগানটা দেখা যাচ্ছে। এই ক'দিনে ও চা চাষের পদ্ধতি শিখেছে। পাতা তোলা শিখেছে। ডিম আর মাংস রান্না করা শিখেছে। বিজনদার কাছে নেপালি ভাষা শিখতে শুরু করেছে। নতুন একটা হোমস্টে বানানোর প্ল্যান করা থেকে শুরু করে হাত লাগিয়েছে বাড়ি বানানোর কাজেও। চোখ লেগে এসেছিল একটু। এমন সময় আওয়াজ করে ঘরের দরজা ঠেলে বিজনদা ঢুকল। একটু জোরেই পা চালিয়ে এসেছে যেন।

বিছানায় বসে বিজনদা ফেসবুক খুলল।

"এই ছেলেটাকে চিনিস দেবা? মেডিক্যাল কলেজ লেখা দেখলাম, প্লাস যদ্দুর মনে পড়ল তোদের মুভমেন্টের সময় একেও দেখেছিলাম বোধহয়। তাই ছুটে এলাম তোকে খবরটা দিতে।"

দেবা উঠে বসল। দু'-তিনবার ছবিটা দেখল, সঙ্গে লেখা পোস্টটা পড়ল। জানলা দিয়ে একটা অসম্ভব কষ্টের মেঘ ঢুকে এসে ঘিরে ধরেছে ওকে। একের পর-এক স্মৃতির বাষ্প এসে ঢেকে দিচ্ছে, ঝাপসা করে দিচ্ছে সব। ও নিজের মোবাইলটা হাতড়ে ঋকের নম্বর বের করে। কতদিন দেখা নেই, কথা নেই মানুষগুলোর সঙ্গে। ওদের মোবাইলের মেমরি কার্ডে আদৌ আছে ওর নাম?

'আপনি যে নম্বরটি ডায়াল করেছেন তা বর্তমানে সুইচড অফ আছে।'

জাভেদদা? জাভেদদার মনে আছে ওকে? আদৌ আছে এই নম্বরটা? মানুষের আগেও তার ঠিকানা পাল্টে যায়। এক মানুষ আরেক চেনা মানুষের পুরনো ঠিকানায় গিয়ে দেখে লেখা আছে, "বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। আপনি যে ঠিকানাটি খুঁজছেন তা আর উপলব্ধ নয়।"

আর একজনের কাছেই ছুটে যাওয়া যায় এখন। যদিও দেবার অস্বস্তি হচ্ছে তাকে কল করতে। সে স্বঘোষিত 'অরাজনৈতিক'—দেবাদিত্যর সঙ্গে এককালে বেশ কিছুটা কথা কাটাকাটি পেরিয়ে আর কোনওদিনই সেভাবে কথাবার্তা হয়নি। দেবা বলেছিল, "ইলোরা, অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় না রে। সবটাই রাজনীতি।"

তার উত্তরে ইলোরা বলেছিল, "তোর কথাটার মধ্যে একদিকে একটা গর্ববোধ আছে দেবা, যে আমিই সবটা বুঝে ফেলেছি। আর অন্যদিকে একটা প্রচ্ছন্ন থ্রেট বা প্ররোচনা আছে, যে ভাই তুমি আমার বোঝাটা বোঝো। কিন্তু তোর চশমার মতোই বাকি সব্বাই তার তার চশমা লাগিয়ে একই কথা বলতে পারে তো। যে সবটাই দর্শন, বা সবটাই বিজ্ঞান, বা সবটাই স্পিরিচুয়ালিটি। তুই একভাবে পৃথিবীটা দেখিস, সেই দেখাটায় তুই কনভিন্সড, তাকেই পুরো সেট মনে করিস। কিন্তু আমার অন্য দেখা থাকতেই পারে, অন্য সেট এবং সাবসেট থাকতেই পারে।"

"সেটাও একটা রাজনীতির পার্ট।"

"আগে যুক্তিবাদী হ তারপরে না হয় রাজনৈতিক হবি। সবকিছুই তোর টেমপ্লেটে পড়তে হবে, তবেই তুই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবি, বা তোকে এক্ষুনি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলতে হবে এর তো কোনওটাই নয় দেবা। এত ইনসিকিয়োরিটি নিয়ে আর যাই কর রাজনীতি করিস না।"

সেই থার্ড ইয়ারের দেবাদিত্যর কাছ থেকে আজকের দেবাদিত্য অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, ওর সঙ্গে ইলোরার আর কোনওদিনই কথাবার্তা হয়নি। এত বড় আন্দোলনে যে দুয়েকবার অনশন মঞ্চে এসেছিল ইলোরা সেটাও ঋকের সঙ্গে দেখা করতে। পথ কখনও এক ছিল না, তবু হঠাৎ কোনও রাস্তার পাশে দেখা হয়ে গেলেও দু'জনে দু'জনকে পেরিয়ে গেছে অন্যদিকে তাকিয়ে।

কেটে যাওয়ার ঠিক আগে ফোনটা তুলল ইলোরা, "দেবা! বল..."

গলায় প্রাণ নেই, শুধু কাতর কিছু চাওয়া আছে।

"ইলোরা... এটা কী দেখছি রে! বিশ্বাস করতে পারছি না! কখন হল, কীভাবে হল এত কিছু? ঋক কোথায়? তুই কোথায়? ঠিক আছিস তোরা?"

"তুই কোথায় আছিস জানি না দেবা, আর আমরা কেমন আছি সেটাও জানি না ঠিক। তবে তুই এখানে থাকলে হয়তো এত কিছু ঘটত না, আর আমরাও আরেকটু ভাল থাকতে পারতাম।"

ফোনটা কেটে ব্যাগ গোছায়

দেবাদিত্য। দুপুর পড়ে এসেছে এখন। খুব চেষ্টা করলেও কি এনজেপি থেকে ফেরার কিছু পাওয়া যাবে না আজই?

বিজনদা ওর কাঁধে হাত রাখে, "আমি বুঝতে পারছি দেবাদিত্য, এই সময় ইমোশনাল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মাথাটাও ঠান্ডা রাখতে হবে, তাই না?"

"আমার মাথা ঠান্ডাই বিজনদা। আমাকে ফিরতে হবে একবার। তবে আবার আসব এখানে। কারণ আমার হয়তো অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই!"

"তুই একবার না, দশবার যা, ফিরে আয়। আমার কিচ্ছু বলার নেই দেবা। কিন্তু এখন এভাবে বেরিয়ে তুই যাবিটা কোথায়? তার চেয়ে কাল সকাল সকাল বেরো।"

দেবাদিত্য চার্জার, ব্রাশ, চিরুনি ঢোকায় দ্রুত হাতে। বালিশের পাশ থেকে তুলে নেয় রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তারপর জিন্সটা পায়ে গলিয়ে বলে, "তুমি চিন্তা করো না বিজনদা। আমি কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে রাতটা স্টেশনেই থেকে যাব। কিন্তু নিজেকে অন্তত বলতে পারব যে কিছু মানুষের আমাকে দরকার এটা শোনার পরে আমি যতখানি পারি তাদের কাছাকাছি যেতে পেরেছি। আর হ্যাঁ, আমার নিজেকেও নিজের অনেকখানি দরকার গো। নিজের কাছে পৌঁছনোর দরকার। এখানে সবার থেকে, সবকিছুর থেকে দূরে মনে হচ্ছে।"

বিজনদা স্মিত হাসেন। তারপর দেবাদিত্যকে আলতো জড়িয়ে ধরে বলেন, "বুঝেছি আমি। ঘরে সেরকম কিছু নেই, একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে বেরো। সাবধানে যাস, আর যোগাযোগটা রাখিস।"

দেবাদিত্য বাইরে বেরিয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকায় একবার। পড়ন্ত রোদের নীচে সিদ্ধার্থ শুয়ে আছেন। দেবার শরীর ছুঁয়ে, উপত্যকা বেয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে উত্তরের দিকে।

"আপনার সঙ্গে অনেক বিতর্ক বাকি কিন্তু। আসি।"

কাজলদা এগিয়ে আসে, "তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি একটু দেবাদিত্য, চলো।"

মোড়ের সিগন্যালে আটকে ছিল গাড়িগুলো। আলতো হাওয়ায় বিকেলের গা থেকে খুচরো পাতা ঝরে পড়ছে সন্ধের ফুটপাথে। হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটির জন্য ফোন করার বার্তা এখনও জেগে রয়েছে দেওয়ালে।

তার পাশ দিয়েই হাঁটছিল শ্রীতমা আর নির্বাণ। হাতে হাত ধরে হেঁটে যাওয়া অল্পবয়সিদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। ব্যস্ত মানুষদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছিল রাস্তা। আর নিজেরা চেষ্টা করছিল বলার মতো কথা খুঁজে পাওয়ার। অল্প কয়েকটা দিনের ভেতর মানুষ কীভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলে, চেনা কথাদের হারিয়ে ফেলে।

সামনের গেটটা দিয়ে সরোবরের ভেতরে ঢুকে আসে ওরা। জলের চার দিকে কত কত মানুষ, কথা, জীবন। একটা আলাদা বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে তাকে ঘিরে। সেখানে মিথোজীবিতা আছে, পরজীবিতা আছে। পাওয়া না-পাওয়া আছে, হার-জিত আছে। সে নিজের নিয়মেই রঙিন, সচল, বহুমুখী। তার ভেতর নিস্তব্ধতা বড় বেমানান লাগে।

শ্রীতমাই ভাঙে সেই নিস্তব্ধতাটা, "এদিকটায় এসো নির্বাণ। বসি।"

পিঠের ব্যাগটা একপাশে রাখে নির্বাণ। তারপর দূরের বহুতলের দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ।

"নির্বাণ আমার একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এমনও নয়। এই অস্বস্তিটা তোমার কাছে ছাড়া রাখার জায়গাও নেই। তাই তোমাকে আসতে বলা।"

"এই তো, নিজের টিউশন কাটিয়ে, পড়াশুনো কাটিয়ে তোমার অস্বস্তি দূর করার জন্যই এক ফোনে ছুটে এসেছি। বলো," নির্বাণের গলা নিরুত্তাপ। তবু ভেতরের আঁচটুকু ফুটে ওঠে স্পষ্ট।

শ্রীতমা কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে নির্বাণের দিকে। কথা গোছানোর সময় নেয়। গলার নীচে, বুকের ভেতর এত এত কথা জমে আছে, অনুভব জমে আছে যে তাদের বাইরে বের করে সাজিয়ে তুলতে ভয় হয়, সময় লাগে। তবু সময় হলে মানুষ সঠিক কথা সঠিকভাবে বলতে পারে কি?

"একবার বলবে নির্বাণ, এই সবটুকুই কি তোমার কাছে একটা বড় এক্সপেরিমেন্টের পার্ট ছিল? বা হারতে হারতে কোথাও একটা জিতে যাওয়ার সুযোগ? বা তোমারই ভাষায়, জীবনটাকে আরেকটু রঙিন করার চেষ্টা? তুমি সেদিন অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলে, আমি দিই নি। আজ হয়তো আমার জন্যই আমি স্বার্থপরের মতো তোমার সেই বাকি থাকা কথাগুলো শুনতে চাই।"

নির্বাণের চোখে জলের ছায়া পড়ে। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর হঠাৎ শ্রীতমার আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বলে, "আমি তোমার কোনও প্রশ্নেরই ঠিক উত্তর জানি বলে মনে হয় না। সৎ হয়ে স্বীকার করলে হয়তো সবক'টা উত্তরই কিছুটা হ্যাঁ, আবার অনেকখানিই না।"

নির্বাণ শ্রীতমার দিকে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, "আমরা সবাই আমাদের ইনসিকিয়োরিটির কাছে, জীবনের কাছে অসহায় শ্রী। সবাই সেটুকু পেরিয়েই চেষ্টা করছি অন্যের কাছে পৌঁছতে। কিছু সময় পারছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো পারছি না। তা বলে যেটুকু সময় আঙুলে আঙুল জড়িয়ে আছি, যেটুকু সময় ছিলাম সেটা মিথ্যে নয়। আমি নিজের দিক থেকে এটুকুই বলতে পারি।"

শ্রীতমার চোখ ভিজে যায়। ওড়নার খুঁট দিয়ে দ্রুত চোখ মোছে ও। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "কী অদ্ভুত না নির্বাণ? আমরা আছি— একইরকম দেখতে, একইরকম ভাবনাচিন্তা করা দুটো মানুষই আছি। কিন্তু আমরা যে ভালবাসাটা খুঁজে পেয়েছিলাম নিজেদের মধ্যে সেটাকে আর চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছি না, ধারণ করতে পারছি না।"

নির্বাণ হাত রাখে শ্রীতমার মাথায়, "এরকমই হয়তো হয় শ্রী। সেটাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হয়তো বড় হওয়া, জীবন। তবে একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে..."

"বলো," নির্বাণের কাঁধে মাথা রাখে শ্রীতমা।

"আমি বিশ্বাস করি জানো, একটা লতাগাছের বেড়ে উঠতে, বেঁচে থাকতে যেমন বেসিক জল-মাটি-হাওয়া ছাড়াও খুব প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকেই একটা অবলম্বন লাগে— ভালবাসার ক্ষেত্রেও তাই। দু'জনে মিলে একটা কিছু তৈরি করতে হয়, দুটো মানুষের থেকে একটু বেশি কিছু। একটা লড়াই, একটা কিছুকে পেরিয়ে যাওয়া, একটা স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারের ভেতর কাঠ খুঁজে এনে একটু আগুন জ্বালানো। এই প্রসেসটাকে ধরেই বেঁচে থাকে, বেড়ে ওঠে ভালবাসাটা। সবকিছু থাকল অথচ এই যৌথ প্রসেসটা থাকল না, তাহলে তুমি যতই তাকে আবেগের জল-হাওয়া দাও, একের পর এক প্রতিশ্রুতির মাটি-টাটি দাও, সে বাঁচবে না। আমাদের কাছে সব আছে শ্রী— আবেগ, ইচ্ছে, প্রতিশ্রুতি, শরীর, অর্থ। শুধু কেউ ওই প্রসেসটার দিকে তাকাচ্ছি না।"

শ্রীতমার বুকের ওপর থেকে অনেকখানি ভার যেন নেমে যায় হঠাৎ, "কী ভাল বললে নির্বাণ। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে ভালবাসার লতাগাছটা তো নেই। কিন্তু আমরা সেই খুঁটিটা কি তৈরি করতে পারি না? দু'জন চেনা মানুষ হিসেবে?
বন্ধু হিসেবে?"

নির্বাণ মুচকি হাসে, "আমি থিয়োরিতে বরাবরই ভাল, কিন্তু প্র্যাক্টিক্যালেই ছড়াই। তুমি তো নিজের কাছে ফিরে এসেছ, বেড়ে উঠেছ আরও। তুমিই বলো।"

শ্রীতমার মাথার ভিতর বসে থাকা নরম শব্দেরা জেগে উঠছে একে একে। তাদের যেটুকু রোদ, সময় আর স্থৈর্য

প্রয়োজন সেসব পেরিয়েও এবার পাওয়া যাবে আর-একটা হাত। তারপর একটা ফুলদানি তৈরি হলে এরকমই কোনও এক বিকেলে তাতে আবার নিজেকে ঝেড়েমুছে সাজিয়ে রাখতে পারবে আত্রেয়ীর মতো কেউ।

## ২২

“স্যর... স্যর, ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে।”

প্রদীপ ভৌমিক টেবিল থেকে মাথা তুলে দেখলেন বেয়ারার দাঁড়িয়ে আছে কাঁচুমাচু মুখে। ঘড়িতে এখন মাঝ দুপুর। এসি চলছে বাইশে। টেবিলের উপরে রাখা চা জুড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল।

“আমি এখন মিট করতে পারব না অজয়। বলে দাও পরে আসতে,” খুব ক্লান্ত গলায় কেটে কেটে বললেন প্রদীপ ভৌমিক।

“স্যর, বলল আপনি ওকে চেনেন— দেবাদিত্য বসু। রিকোয়েস্ট করছে বারবার দেখা করার জন্য।”

একটা সন্ধের কথা মনে পড়ে গেল প্রদীপ ভৌমিকের। আর একটা টগবগে, প্রাণোচ্ছল, সপ্রতিভ ছেলের মুখ। সৌর নিজে ফোন করেছিল সেই সন্ধেয়, “বাবা, ঋক আর দেবাদিত্য লালবাজারের লকআপে আছে। দেখো একটু, যেন কোনও অসুবিধে না হয়।”

সেই সন্ধেয় দেবাদিত্য নামক একটা আগুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আইপিএস প্রদীপ ভৌমিকের। বহু ওঠাপড়ার মাঝেও, বহু সাধারণ-দৈনন্দিন-নিয়মমাফিকের মাঝেও তাকে ভোলা সম্ভব হয়নি আজও।

এই ক’বছরে কাঁধ পর্যন্ত চুলটুকু ছাড়া আর খুব কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি? একইরকম ঝকঝকে চোখমুখ, মেদহীন চেহারা, দ্রুত চলন। অবশ্য মানুষের কতটুকু পরিবর্তন আর চোখে দেখতে পারি আমরা? তিন বছরে বাইরের চেয়ে ভেতরটা বদলে যায় অনেকখানি। রাজনীতি, ভালবাসা, রুচিবোধ। অথবা সার্থকতার সংজ্ঞা, জীবনের অর্থ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। সে প্রাণপণে নিজের বর্তমানটাকে গুছিয়ে তুলে রাখতে চায়, বাঁধ দিয়ে রাখতে চায়, সবার কাছে সোচ্চারে জানিয়ে দিতে চায় এই হল তার পরিচয়— স্থির, সুগঠিত, শাশ্বত। কিন্তু সময় এসে, জীবনের স্রোত এসে ঠিক ভেঙে দিয়ে যায় সেই বাঁধ। অসহায় মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নতুন বিশ্বাস, অনুভব, পরিচয়ের নামহীন দ্বীপে। নিজের কাছে, অন্যের কাছে পরিচয় গঠনের এই অনবরত ভাঙা-গড়ার খেলাতেই বয়ে যায় একটা গোটা জীবন।

“এইরকম একটা সময়ে আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য সরি। আমি নিজেও মানসিকভাবে খুব স্টেবল নেই। কিন্তু মনে হল দেখা করাটা প্রয়োজন স্যর,” কাঁধের রুকস্যাকটা একদিকে চেয়ারের ওপর নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল দেবাদিত্য।

“বলো দেবাদিত্য। টায়ার্ড লাগছে খুব তোমাকে...”

স্মিত হাসে দেবা, “হ্যাঁ স্যর, একটু জার্নি হয়েছে আর কী,” তারপর একটু ইতস্তত করে বলে, “আমাকে আপনার মনে আছে?”

“হ্যাঁ। এমনিতে পেশার জায়গা থেকেই মানুষজনকে মনে রাখার একটা অভ্যেস বা ইনস্টিংক্ট তৈরি হয়ে যায়। তার বাইরেও সৌরর বন্ধু হিসেবে মনে আছে বই কী। বলো... তার আগে বসো। কী নেবে? কোল্ড ড্রিঙ্কস, চা, কফি?”

আচমকা ঝড় এসে সব ওলট-পালট করে দেওয়ার পরেও মানুষ কীভাবে এত স্বাভাবিক, সংযত থাকতে পারে!

“কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই না স্যর, এই সময় চা বা কফিও থাক। শুধু জল বলুন।”

“ইনডিভিজুয়াল আইডিয়ালিজ্‌ম দিয়ে বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রিকে কীভাবে আটকাবে কমরেড দেবাদিত্য? তুমি তো রোনাল্ডোও নও,” মুচকি হাসেন প্রদীপ ভৌমিক। হাসে দেবাদিত্যও, “পারব না স্যর। হয়তো অন্য কেউ পারবে। বা হয়তো কেউই পারবে না। গ্যালন গ্যালন জল উঠিয়ে তা দিয়ে এক বোতল কার্বনেটেড ড্রিকস বানিয়ে, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, কোটি কোটি টাকা মুনাফা করবে কয়েকজন, আর আমরা কোনওদিকে না তাকিয়ে পাগলের মতো তা কনজ়িউম করে আর শরীরে একের পর এক রোগ পুষে চুপচাপ চলে যাব,” একটু থেমে দেবাদিত্য আবার বলে, “এসব থাকুক স্যর... আমি সৌরকে নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। কীভাবে শুরু করব বা কতটা বলা ঠিক হবে বুঝতে পারছি না।”

“এত অস্বস্তি তোমাকে মানায় না দেবাদিত্য, বলো।”

“সৌর আর আমার বন্ধুত্বটা হয়তো আপনি জানেন স্যর। সেটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ফর্মে থাকেনি। কিন্তু সময় যত গিয়েছে সেটা নিজের মতো করে আরও গভীর হয়েছে বলেই আমার ধারণা। আমি খবরটা পাওয়ার পর গত চব্বিশ ঘণ্টা কী অসম্ভব কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছি সেটা আপনার কাছে বলতে আমার কোনও অস্বস্তি নেই। গত চারমাস এখানে ছিলাম না, একটু আগেই ফিরেছি। কারও সঙ্গে, কোনও কিছুর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। ফলে আমি যেটুকু শুনেছি সেটা অন্যের কাছ থেকেই। আর আপনাকে সম্পর্কের জায়গা থেকেই হোক বা পেশাগত জায়গা থেকে— কোনও কিছু বলার ধৃষ্টতা আমি দেখাতে পারি না...” একটু থেমে গলা ভেজায় দেবাদিত্য, “তবু বলি, ইটস অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করেই কলেজে আর-একটা ভয়ানক খেলা খেলার প্ল্যান চলছে। আমি বা আপনি দু’জনেই জানি স্যর, জীবনে কোনওদিন কোনও জায়গায় সৌর নিজেকে ইউজ়ড হতে দেয়নি, অন্যকে সে সুযোগ দেয়নি। আমি আফটার লাইফে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আজ যদি সৌর ওর চলে যাওয়ার পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে ও যেটুকু সময় আমাদের কাছে ছিল, যে বিশ্বাস আর জীবনবোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেটার অপমান হবে।”

প্রদীপ ভৌমিক পেপারওয়েটটাকে টেবিলের ওপর স্পিন করাতে করাতে সামান্য হেসে বললেন, “তুমি শুধু সুবক্তাই নও, তুমি খুব ভাল ম্যানিপুলেটরও। কিন্তু কলেজ অথরিটির ওপর আমার কোনও
সে নেই।”

“তারপরেও আপনি নিজের জায়গা থেকে ক্লিয়ার থাকলে অনেক কিছু করতে পারেন স্যর।”

প্রদীপ ভৌমিক পেপারওয়েটটা থামিয়ে সরাসরি তাকান দেবাদিত্যর দিকে, “আমি নিজের জায়গা থেকে ক্লিয়ার দেবাদিত্য। যত কষ্টকরই হোক, সত্যিটা আমাকে মেনে নিতেই হবে। এবং আমি সেই প্রসেসটার মধ্যে আছি। এরকম নয় যে পেশা আমাকে আবেগহীন হতে শিখিয়েছে, পেরেছে। বাড়ি ফিরলে আমিও বাবা, আইপিএস প্রদীপ ভৌমিকের একমাত্র ছেলে যে আবার ডাক্তার সে গলা পর্যন্ত নেশা করে এরকম একটা বিপদ ঘটিয়ে ফেলেছে শোনার পরেও আমি তার বাবা, সে আইসিইউ থেকে স্ট্রেচারে শুয়ে বেরিয়ে আসার পরেও আমি তার বাবা। আমাকে এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে দেবাদিত্য, এই শোক সামলাতে শিখতে হচ্ছে,” তারপর একটু থেমে বলেন, “কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি সেই প্রসেসটায় না ঢুকে শুধু নি-জার্ক রিয়্যাকশনে অন্য কারও ঘাড়ে বন্দুক রাখব।”

“সেই ভরসার জায়গা থেকেই আপনার কাছে আসা। সৌর যে মানুষগুলোর পাশে থাকতে চেয়েছিল, যাদের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়তে চেয়েছিল, আজ ওর এই অ্যাক্সিডেন্টটা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হলে আর আমি বা আমরা সেটাকে নিজের মতো করে আটকাতে চাইলে সেটা

তো ম্যানিপুলেশন নয় স্যর, সেটা লজিক্যালিই নিজেদের জায়গা থেকে আমার বা আমাদের সামান্য কর্তব্যবোধ।"

"আবারও বলি, আমি নিজের কোনও পার্সোনাল ভেন্ডেটার জায়গা থেকে কিছু করব না। কিন্তু একটা অফিসিয়াল প্রসেস থাকে, সেটা তার মতো করেই চলবে। কলেজ অথরিটি যদি এনকোয়ারি কমিটির সিদ্ধান্ত নেয়, তার উদ্দেশ্য বিধেয় যা-ই হোক না কেন, সেটা গঠিত হবে, সে তার নিজের মতো করেই কাজ করবে। তার ওপর মিডিয়ায় এসেছে গোটা ব্যাপারটা, বুঝতেই পারছো। আর কলেজের যে আবহাওয়া সেটা সামলানোও আমার কাজ নয়। সেটা তোমাকেই সামলাতে হবে, এবং সেটা এই আমার সঙ্গে লালবাজারে এসে কথা বলার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ দেবাদিত্য।"

দেবাদিত্য উঠে দাঁড়ায়। এখনও অনেকখানি কাজ পড়ে আছে বইকি। স্মিত হেসে বলে, "জানি স্যর। তবে গোটাটায় একটা রিলিজিয়াস অ্যাঙ্গল টানা হচ্ছে। সেটা হলে শুধু তার লেজটুকু তো নয়, মাথাটাও বেরিয়ে আসবে। আর সেটা কলেজের জন্য খুব একটা ভাল ইম্প্রেশন হবে না হয়তো। উজ্জ্বল স্যর এটা বুঝবেন না এমন নয়, তবুও আপনাকে একবার বলে রাখা জাস্ট। আর আপনি আপনার জায়গা থেকেই যদি একটা স্টেটমেন্ট দেন, সেটা ফেসবুকে হলেও, তাহলে সৌরও হয়তো খুশিই হবে, আর আমার কাজটা একটু হলেও সহজ হয়ে যাবে। রিকোয়েস্টই করছি স্যর, আপনাকে ম্যানিপুলেট করার ধৃষ্টতা বা সাহস কোনওটাই আমার নেই। আসছি।"

রুকস্যাকটা উঠিয়ে নেয় দেবা। তারপর একটা নম্বর ডায়াল করে। সম্ভবত প্রয়োজন হবে না, কিন্তু কথা বলে রাখতে ক্ষতি কী।

"কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু! হোয়াট আ সারপ্রাইজ়! বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য" ফোনের ওপাশ থেকে হেসে বলেন শুভময় দত্ত।

"কতদিন পরে কথা হচ্ছে শুভময়দা, ভাল আছ তো?" তারপর একটু গলা নামিয়ে দেবাদিত্য বলে, "শোনো না, টালিগঞ্জের কেসটা মনে আছে তো? কভার করবে? আমি তোমাকে খাঁটি সোর্স দিয়ে দেব... একদম একশো শতাংশ... কিন্তু আমার একটা হেল্প চাই। হয়তো প্রয়োজন হবে না, তবু ব্যাকআপে থেকো একটু।"

প্রদীপ ভৌমিক ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ বেয়ারারকে ডেকে বলেন, "শ্যামলকে বলো ওকে গাড়িতে করে হস্টেল পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসে যেন। আর ব্যাগে একটা জলের বোতল দিয়ে দাও।"

## ২৩

স্ট্রেচারের আওয়াজ, দু'-একটা অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধের গন্ধ। এসব ছাড়া এই দুপুরেও গোটা কলেজ চত্বরটা থম মেরে আছে। আউটডোর শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। শুধু ইমার্জেন্সি আর ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনেটায় মানুষের ভিড়। কয়েকশো মিটারের দু'পারে একদিকে জীবনের উৎসব, অন্যদিকে মৃত্যুর হাতছানি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের সামনেটায় জটলা। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্সিপাল রুমের সামনের করিডরে। সবাই জানে কী কী হয়েছে, কিন্তু কেউই জানে না ঠিক কী হতে চলেছে। নিজেদের দিক থেকেও কি করার আছে কিছু? কে জানে! সম্মিলিত অনিশ্চয়তার, কনফিউশনের এই ধোঁয়া ঢাকা পথ বেয়েই ঘরে ঢোকে অস্বস্তিকর অবিশ্বাস, বন্ধুহীন ভবিষ্যৎ। মানুষ মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। সেই শূন্যস্থানে এসে চুপ করে বসে থাকে ভারী বাতাস।

রুমের ভেতর পিন পড়লেও আওয়াজ শোনা যাবে। তোয়ালে মোড়া লেদারের বিশাল রিভলভিং চেয়ারটায় উজ্জ্বল বিশ্বাস। টেবিলের চারপাশে সুপার, ডীন এবং প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেন্টের এইচওডি। আর রুমের একপ্রান্তে বসে আছে প্রলয়, ঋক, জাভেদ। প্রলয় একটু আগে ঘুম থেকে উঠে এসেছে সম্ভবত। একটা চ্যুইংগাম চিবোচ্ছিল এতক্ষণ, ডিন স্যর বলার পরে ফেলে এসেছে।

"যেটা বলছিলাম— এই কলেজে দিনের পর দিন যা ইচ্ছে তাই হয়ে যাবে, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবে আর আমাদের দিক থেকে কোনও স্টেপ নেওয়া হবে না সেটা হয় না। নাউ ইটস্ আপ টু অল অফ ইউ হোয়াট শুড বি ডান!"

সবাই মাথা নাড়ে প্রিন্সিপালের কথায়। সুপার বলেন, "সৌরদীপের মতো একজন মেধাবী, শান্তশিষ্ট ছেলেকে কে বা কারা ফুসলে এরকম একটা পরিণতির দিকে ঠেলে দিল সেটা আমাদেরকেই দেখতে হবে।"

"এখানে দেখার কী আছে! সবটাই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এই কলেজের যা ক্যারেকটারিস্টিক্স, ব্রাদারহুড, ইউনিটি তার কোনওটাই ডক্টর জাভেদ ক্যারি করে না। এই গোটা জিনিসটাই জাভেদের ওভার-রিয়্যাকশন আর তার চ্যালাদের দিয়ে নিজের গায়ের ঝাল মেটানোর ফলাফল," গৌতম স্যরের কথা শুনে জাভেদ ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। প্রিন্সিপাল ওর দিকে আঙুল উঁচিয়ে কড়া গলায় বলেন, "ইউ আর নট অ্যালাউড টু স্পিক আনলেস ইউ আর টোল্ড টু ডক্টর জাভেদ। সিট ডাউন।"

ঋক পাশ থেকে জাভেদের হাত ধরে টান দেয়, "প্লিজ় জাভেদদা, বসো।"

"অ্যান্ড হু আর দিজ গাইজ়? জাভেদের সেই চ্যালারা নাকি?" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন মহুয়া ম্যাডাম।

ঋক হাত তোলে, "অ্যাম আই অ্যালাউড, স্যর?" তারপর অপেক্ষা না-করেই বলে, "আমি ঋক। ও প্রলয়। দু'জনেই সৌরদীপের বন্ধু।"

"আচ্ছা? সৌরদীপের বন্ধু? তা তোমরা যদি ওর বন্ধু হও তাহলে বন্ধুত্বের ডেফিনিশনটাই চেঞ্জ করতে হবে তো!"

ঋক চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হাত ওঠায় আবার, "ম্যাম, স্যর, আমরাও মানসিকভাবে খুব স্বাভাবিক আছি এরকম নয়। কিন্তু আমি বা আমরা এমন কিছুও করিনি যাতে এই মুহূর্তে এরকম একটা কথা ডিজ়ার্ভ করি।"

রুম জোড়া প্রতিটি মানুষের চোখ ঋকের দিকে ঘোরে। প্রিন্সিপাল স্যর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া আটকে দিতে পারি, অ্যান্ড ইউ ডিজ়ার্ভ এভরি বিট অফ দ্যাট। সেটা না চাইলে জাস্ট শাট আপ।"

"তাহলে স্যর আমরা বাইরেই ওয়েট করি না হয়। আপনারা ধীরে সুস্থে ডিসিশন নিন, হয়ে গেলে আমাদের ডেকে শুনিয়ে দেবেন। এখানে বসে বসে সবারই বিপি বাড়িয়ে লাভ কী?" প্রলয় দত্ত নির্বিকার।

প্রিন্সিপাল স্যর টেবিল চাপড়ে আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই বাইরে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। মানুষে মানুষের শূন্যস্থানে বসে থাকা ভারি বাতাস সরিয়ে উত্তেজনা, বিস্ময়ের ঢেউ উঠে এল করিডরে। তারপর তা এসে ধাক্কা মারল প্রিন্সিপালের চেম্বারের দরজায়।

সে দরজা ঠেলে গার্ড ভেতরে এসে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্যর একজন ভেতরে আসতে চাইছে।"

"হোয়াট দ্য হেল! আমরা কি এখানে খোশগল্প করছি বলে মনে হয় যে যে কেউ ভেতরে এসে একটু আড্ডা মেরে যাবে? তোমার ডিউটিটা তাহলে কী যদি এটুকু বলতে না পারো কাউকে?"

গার্ড হাত কচলায়, "স্যর... দেবাদিত্য বসু।"

বাইশে এসি চললেও রুমের ভেতরটা হঠাৎই গরম হয়ে উঠল যেন। ঋক,

জাভেদ, প্রলয়ের চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ। রক্তস্রোত বেড়ে গেছে রুমের ভেতরে সবারই। এগারো দিনের একটা উদ্ধত স্পর্ধা, আবিরে মোড়া একটা পুরনো আগুন, এ কলেজের আনাচকানাচে মিথ হয়ে রয়ে যাওয়া একটা বছর একুশের ছেলেকে এই করিডর, এই ডু'নট ডিস্টার্বের লাল আলো, এই চেয়ার-টেবিল-মানুষজন কেউই ভুলতে পারেনি।

"ওয়েট করতে বলো। প্রিন্সিপাল রুমটা কোনও ট্যুরিস্ট প্লেস নয় যে যার ইচ্ছে যখন ইচ্ছে এসে ঘুরে দেখে সেলফি তুলে যাবে"

"সরি স্যর, সেলফি তোলার মতো সময়, বিলাসিতা বা মানসিক অবস্থা থাকলে আপনি যতক্ষণ বলতেন অপেক্ষা করে যেতাম"— দরজা ঠেলে রুমে ঢোকে দেবাদিত্য। উত্তেজনায় জাভেদের হাত চেপে ধরে ঋক।

"দেবাদিত্য, ইউ হ্যাভ বিন অ্যাবসেন্ট ফ্রম ইয়োর ইন্টার্নশিপ ডিউটিজ ফর মান্থস। আজ তোমার এত অডাসিটি হয় কী করে যখন হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা সবাই তার সমাধান করার চেষ্টা করছি তখন তুমি এসে সেই প্রসেসটাকে হ্যাম্পার করতে চাইছ?"

"কারণ এখানে সমাধান কিছুই হচ্ছে না স্যর, এখানে স্কেপগোট খোঁজার অফিসিয়াল মিটিং বসেছে। আর আমার ইন্টার্নশিপের ডিউটি আমি করে দেব স্যর, উইদাউট স্টাইপেন্ডেই। সেটার সঙ্গে অযথা এই ঘটনাটাকে জুড়বেন না।"

"স্কেপগোট! হু ডু ইউ থিংক ইউ আর? আমরা এখানে সবাই চার অক্ষর বসে আছি আর তুমিই এসেছ জাস্টিস দিতে?"

"স্যর, লেটস নট টক ইন দিস টোন, প্লিজ়। সেটা হলে আমিও এই টোনে কথা বলব না। আর জিজ্ঞেসই যখন করছেন তখন একটু পয়েন্টেই কথা হোক না হয়?" তারপর কাউকে বলার সুযোগ না দিয়েই দেবা বলল, "আপনারা ঠিক কীসের সমাধান করতে চাইছেন স্যর? ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। এই তিনজনের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা ঠিক কী? পয়জ়নিং এর? নাকি নেশা করার? নাকি তার আগে ডিপার্টমেন্টে, ক্যাম্পাসে যে ঘটনা গুলো ঘটে গেছে সেটার দায় চাপানোর? অলরেডি প্রমাণিত, ইট ওয়াজ নট পয়জনিং। ক্যাম্পাসে নেশা করাটা যদি অপরাধ হয় তাহলে রোজ এই রুমে আপনাকে মিটিং ডাকতে হবে, এটা আলাদা কোনও গ্রাউন্ড হতে পারে না। বাই দ্য ওয়ে, এই ক্যাম্পাসে স্টুডেন্টদের মেন্টাল হেলথ দেখার জন্য, সমস্ত স্টিগমা সরিয়ে তা নিয়ে কথা বলার জন্য একজন কাউন্সিলরের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে স্যর এতদিনেও? যাক সে কথা, আর তার আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর দায় সত্যিই যাদের তারা কিন্তু এই রুমে উপস্থিত নেই। বা হয়তো আছেন।" দেবাদিত্য তাকায় গৌতম স্যরের দিকে। তারপর আবার বলে, "সৌর আমার, আমাদের খুব কাছের একজন স্যর। তবু বলি, ওর অ্যাকসিডেন্ট দিয়ে আপনারা নিজেদের দায়টুকু এড়িয়ে কিছু স্কেপগোট বানানোর আয়োজন ছাড়া আসলে আর কিছুই করছেন না।"

গৌতম স্যর ফুঁসে ওঠেন পাশ থেকে— "তুমি কী বলতে চাইছ সরাসরি বলো"

"বেশ, তবে তাই হোক স্যর। শুভজিতদা আর নীলাদ্রিদা যে কথাগুলো বলেছে জাভেদদাকে, আপনি একবারও ভেরিফাই না করে যে আচরণ করেছেন জাভেদদার প্রতি সেটা আপনার, আপনার ডিপার্টমেন্ট, এই কলেজের আদর্শের সঙ্গে মেলে তো স্যর? ধর্মের জায়গা থেকে আমাদেরই একজনকে আক্রমণ করা আমাদের পাঠ্যবইতে লেখা আছে তো স্যর? কোন জায়গা থেকে একটা শক্তপোক্ত মানুষ এক সন্ধেয় সুইসাইড করতে যায় সেটা বোঝার সামান্যতমও চেষ্টা না করে তাকে ওভার-রিয়্যাকশন দেগে দেওয়া অন্তত পেশাগত এমপ্যাথির জায়গা থেকেই আমাদের শূন্যতা প্রকাশ করেনা তো স্যর?"

গোটা রুম স্তব্ধ। প্রিন্সিপাল উজ্জ্বল বিশ্বাস বিস্ফারিত চোখে তাকান গৌতম স্যরের দিকে— "আপনি এই কথাগুলো আমাকে আগে বলেননি কেন?"

কলকাতার নামকরা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জেন, ডক্টর গৌতম চৌধুরি উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে। এগিয়ে এসে কলার ধরেন দেবাদিত্যর— "ডোন্ট মেক থিংস আপ ইউ রাসকল। আমি তোমাকে দেখে নেব।" তারপর উজ্জ্বল স্যরের দিকে তাকিয়ে বলেন, "স্যর আপনি এই ছেলেটার কথা বিশ্বাস করবেন? হি ওয়াজ নট ইভেন হেয়ার! জাস্ট থ্রো হিম আউট অফ দিস রুম অ্যান্ড লেটস ডু আওয়ার জবস"

"বিহেভ ইয়োর সেলফ ডক্টর চৌধুরি"—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন উজ্জ্বল স্যর, তারপর বলেন "এটা দেবাদিত্যর থাকা না-থাকার ব্যাপার নয়। ইজ় দিস ট্রু?"গৌতম স্যর কলার ছেড়ে দেন দেবাদিত্যর। তারপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে যান। দেবাদিত্য জামাটা ঠিক করে নেয়, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলে "থ্যাঙ্কিউ স্যর, সব টুকু শোনার জন্য। আমাকে এতখানি স্পেস যখন দিলেনই তখন আর একটু চেয়ে নিচ্ছি"— পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে দেবাদিত্য। তারপর প্রদীপ ভৌমিকের ফেসবুক প্রোফাইলটা খুলে এগিয়ে দেয় উজ্জ্বল স্যরের দিকে। প্রিন্সিপাল রুমের বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঋক জড়িয়ে ধরে দেবাদিত্যকে। দু'জনে কেউ কিছু বলে না, শুধু একে অপরের আলিঙ্গনে খুঁজে নেয় পুরনো সময়, বিশ্বাস, আশ্রয়। আর পরস্পরের কাছে রাখে নিজেদের কনফিউশন, ক্লান্তি আর ফুরোতে না-চাওয়া কষ্টদের।

একে একে ছুটে আসে, ওদের ঘিরে ধরে করিডর জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই। দত্ত ওদের সবাইকে ঠেলে সরায়, ঋককে সরায়। তারপর একাই কাঁধে তুলে নেয় দেবাদিত্যকে— "ভাইকে একেবারে রুমে গিয়ে ল্যান্ড করাবো, কেউ রানওয়েতে আসবি না বলে দিলাম।" সবাই হেসে ওঠে। একপাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চোখ ভিজে যায় জাভেদের। তার ঠিক পাশেই চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আরও একজন। এত হইচইয়ের মাঝেও দেবাদিত্য তার দিকে তাকায় একবার, ঘাড়টা অল্প ঝুঁকিয়ে হাসে। তারপর দত্তকে বলে, "একবার ল্যান্ড করা ভাই প্লিজ়"

ইলোরা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে দেবাদিত্যকে— "থ্যাঙ্কিউ রে"

দেবা হাসে— "ধন্যবাদটা তোর প্রাপ্য ইলোরা। সারারাত জেগে আমার লালবাজার গোছের ইন্টারোগেশন সামলানোর জন্য"

ওর কাঁধ পর্যন্ত রুক্ষ চুলে পাহাড়ের গন্ধ লেগে আছে। ইলোরা বুক ভরে টেনে নেয় সেটুকু।

## ২৪

স্থির আকাশ থেকে নেমে আসা হাওয়া বয়ে যায় গলি, পার্ক, ফুটপাথে। দুঃখ- সুখ, জোছনা-মেঘ পেরিয়ে আসা প্রাচীন হাওয়া। প্রতিবার শোক আসে নতুন নতুন পোশাকে, নতুন ঢেউ নিয়ে, অফুরান বিষ নিয়ে। মানুষ বোঝে তাকে কিছুতেই পেরিয়ে যাওয়া যাবে না, জিতে নেওয়া যাবে না। তাকে জীবনের পাশে নিয়েই বেঁচে থাকার উপায়টুকু শিখতে হবে মাত্র। এই যে ওর ঠিক পাশেই জাভেদ বসে আছে এই মুহূর্তে, ওর সঙ্গেই ভাগ করে নিচ্ছে এই সন্ধের ক্যানভাস, সিগারেটের ধোঁয়া, পাখিদের ডাক, যৌথ কষ্ট— তবু ঋক জানে খুব চেষ্টা করেও ওর শূন্যতাকে, শোককে, প্রশ্নকে ওর কাছে রাখা যাবে না। কিন্তু এই নিস্তব্ধতাটাও বড় অস্বস্তিকর। একটা মানুষকে পাশে নিয়ে, তার হাত ছুঁয়ে থেকে তারপরেও নিজের মাথার ভেতর নিজের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাওয়াটা

খুব ক্লান্তিকর।

"ভাল লাগছে না এখানে। যাবে কোথাও একটা?" ব্রিজের গায়ে জ্বলে থাকা আলোগুলোর দিকে তাকিয়েই জাভেদ বলে, "চল, ওঠা যাক"

"না, আমি বলছি এ শহরকে ভাল লাগছে না। দূরে কোথাও একটা যেতে ইচ্ছে করছে"

"শুধু তুই-আমি?"

"হ্যাঁ... আর তো কেউ পড়েও নেই যাওয়ার জন্য"

জাভেদ সিগারেটটা শেষ করে বলে, "যাওয়াই যায়।" তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ঠিক আছিস তুই?"

জাভেদের হাতে হাত রাখে ঋক, বলে "চেষ্টা করছি"

"তোর মাথার ভেতর যা চলছে সেটা চাইলে শেয়ার করতে পারিস ঋক। হেল্প করতে না পারি, শুনতে পারব অন্তত"

"তুমি সবসময় এত বড় হয়ে থাকতে চাও কেন বলবে? সবসময় অন্যকে হেল্প করতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের সামলাতে হবে, তাদের জন্য কেয়ার করতে হবে... কেন? কী হল এত কিছু করে?" চশমা খুলে পকেটে রাখে জাভেদ, তারপর দু'হাতে কপালের রগ গুলো চাপে, চুলে আঙুল বোলায় কায়দা করে— "কিছুই হল না রে, হয়ও না। কিন্তু আমি তো খুব কিছু হওয়ানোর জন্য এগুলো করি না। তোর কথামতো এগুলো যদি বড় হওয়া হয় তাহলে সেটুকু হতে ভাল লাগে আমার, জাস্ট এমনিই"

ঋক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "কেন এমন হল বলতে পারবে একটু? নিজেকে বড্ড অপরাধী লাগছে, ক্ষমা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে অনেক কিছু করতে পারতাম, পারলাম না। অসহায় লাগছে, মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই"

"সেটা কি আমারও হচ্ছে না? বাট ইয়েস, বলছিলি না সেদিন, লাইফ ইজ় হার্ড? সবসময় আমাদের অনেক কিছু করার থাকে না ঋক। সেটা মেনে নেওয়ার মধ্যেই হয়তো একটু শান্তি লুকিয়ে আছে।"

জল বেয়ে আসা আসা হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে দু'জনকে। ঋক মাথা রাখে জাভেদের কাঁধে। চোখ বোঁজে। জাভেদ নিঃশব্দে এক হাত দিয়ে আলগোছে জড়িয়ে ধরে ওকে।

সাড়ে ন'টা বেজে গেলেও এ শহরের গা থেকে সকালের আলসেমি কাটেনি এখনও। রাস্তাঘাটে বাদুড়ঝোলা হয়ে মানুষের অফিস যাওয়ার তাড়া নেই আজ। আড়মোড়া ভেঙে মেট্রোও ছোটা শুরু করেনি এখনও। লম্বা লাইন মাংসের দোকানের বাইরে। চায়ের দোকানে আড্ডা জমে উঠেছে নিজের নিয়মেই। আজ তর্ক-বিতর্ক অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিই যদিও।

মৃণাল একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে। দাড়ি কামাচ্ছিল বেসিনের সামনে। আত্রেয়ী চা বানাচ্ছে কিচেনে। কাল রাতের সোহাগের রং দু'জনেরই চোখেমুখে লেগে আছে। আত্রেয়ীর মাথার ভেতর জেগে আছে কিছু উত্তেজনা, কিছু মনকেমন আর অনেক অনেকখানি এলমেলো প্রশ্ন। তার খবর বাকি কেউ জানে না। কলিং বেল বাজছে। আত্রেয়ী রান্নাঘর থেকেই মৃণালকে বলল, "ব্রেডে জ্যাম লাগাচ্ছি... তুমি দেখবে একটু?"

সুজাতা এসেছে, আর ওর সঙ্গে গুবলুটা। আত্রেয়ী-মৃণালের খুব ন্যাওটা হয়েছে। বিশেষ করে মৃণালের। শনি-রবি ও ঘরে থাকলে সুজাতাকে রীতি মতো টেনেটুনে নিয়ে যেতে হয় শোয়াতে। দরজা খুলেই মৃণাল কোলে তুলে নেয় বাচ্চাটাকে। আর পায়ের কাছে পড়ে থাকা পেপারটা তুলে নেয়। তারপর নিজের গালে লেগে থাকা শেভিং ক্রিম লাগিয়ে দেয় ওর গালে। খিলখিল করে হেসে ওঠে তিনজনেই।

সুজাতা সোফায় বসে বলে, "আজকের খবরটা দেখেছিস আত্রেয়ী?"

"ও আর নতুন করে কী দেখার আছে বলো তো! হয় মারামারি-কাটাকাটি, নয় শ্লীলতাহানি-ধর্ষণ আর নয় তো এ নেতা ওই বলল আর ওই নেতা এই দলে গেল। বিরক্তিকর" সুজাতা কিচেনে যায়। তারপর আত্রেয়ীর গালে ঠোনা মেরে বলে, "পড়ে তো দেখ।"

মৃণাল মুখ ধুয়ে এসে পেপারটা নিয়ে আয়েশ করে সোফায় বসেছিল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর চায়ে একটা লম্বা চুমুক মেরে চোখ টিপে বলে, "সুজাতাদি ঠিকই বলেছে, পড়ে তো দেখো ইতু!"

সর্ষের মধ্যেই ভূত— শুভময় দত্ত

প্রায় একমাস পেরিয়ে গিয়েছে। তবু শহরের একপ্রান্তে ঘটে যাওয়া মন্দির ভাঙচুরের ঘটনার ক্ষত এখনও দগদগে। অবশেষে এই ঘটনায় গতকাল সন্ধেয় সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনের ফুটপাথ থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ব্যক্তিটি মানসিক ভারসাম্যহীন। তবু মন্দির ভাঙচুরের কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এবং তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঘেঁটে নগদ প্রায় দশহাজার টাকা, শিবলিঙ্গের একটা টুকরো এবং একটা নামাবলি পাওয়া গিয়েছে। লোকাল ক্লাবের দুই সদস্যকেও আটক করেছে পুলিশ। আরও কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত, তারা কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এরকম একটি ঘটনা ঘটিয়েছে তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। প্রায় এক মাসে আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটিকে নির্দিষ্ট রং দিয়ে তারই অভিঘাতে পরবর্তীকালে শহরের বিভিন্নপ্রান্তে বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক চাপানউতোরের ঘটনা ঘটে। সেই প্রেক্ষিতে গতকালের এই ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন বিশিষ্টজনদের একাংশ। একই সঙ্গে, এ শহরে যে কোনও সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কলকাতা পুলিশের সদিচ্ছা এবং সদা সক্রিয়তাও আরেকবার প্রমাণিত হল। সুজাতা আর মৃণাল চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিটিমিটি হাসছিল। আত্রেয়ী চোখ পাকিয়ে বলল, "এ তো ভাল খবর। শুধু শুধু আমার পেছনে লাগছ কেন বলো তো?"

তারপর উঠে কাপ নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায় আত্রেয়ী। গলিতে ক্রিকেট জমে উঠেছে। একটা মেয়ে গিটার শিখতে যাচ্ছে বাবার সঙ্গে। কোনও একটা বাড়ি থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসছে। রোববার সকালের গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ লাগা বাতাস ওর গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। সবাই আছে—তবু কেউ একটা নেই, কিছু একটা নেই। আর নেই ওর নিজের মাথার ভেতর একটু গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা। ইউরিন টেস্ট কিটের দুটো দাগের কথা সকাল থেকে নিজেকে এতবার বলেছে আত্রেয়ী, তবু নিজেই ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। মৃণালকে বলবে?

## ২৫

লুচি ভাজা হয়ে গেছে শ্রীতমার। এর মধ্যে তিনবার ডেকেছে, তবু এখনও ওঠেনি ইলোরা। এরপর লুচিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে সব। দেবাশিস সোফায় বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে পেপার উল্টোচ্ছিল। প্রথম পাতায় 'সর্ষের মধ্যেই ভূত', ভেতরে শব্দছক, শেষপাতায় কোহলির পড়ন্ত ফর্ম পেরিয়ে সাপ্লিমেন্টে গিয়ে চোখ আটকে গেল ওর। তিন নম্বর পাতায় ছোটগল্প কলামে জ্বলজ্বল করছে চেনা একটা নাম। খুঁটি— শ্রীতমা মুখার্জী। বাকি চা টুকু শেষ করে এক নিঃশ্বাসে গল্পটা পড়ে ফেলে দেবাশিস।

"শ্রী, তুমি লিখেছ এটা?"— দেবাশিষের গলায় কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা অবিশ্বাস আর বাকিটুকু অগাধ মুগ্ধতা।

শ্রীতমা কিচেন থেকেই হেসে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ... ভাল লেগেছে?"

দেবাশিস মুগ্ধতাটুকু চেপে রাখতে পারে না। উঠে শ্রীতমার কাছে যায়। "তুমি কবে থেকে লিখছ! অসাধারণ হয়েছে জাস্ট, দুর্দান্ত! শ্রীতমা মুখটা হাসি হাসি করেই বলে, "থ্যাঙ্কিউ।" তারপর আদুরে গলায় বলে, "মেয়েকে ডাকো একবার। লুচিগুলো জুড়িয়ে যাবে সব..."

ইলোরা ঘুম চোখে উঠে অলরেডি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। দেবাশিস হাসি মুখে পেপারটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে— "দেখ একবার বুড়ু, তোর মা কী করেছে!"

ইলোরাও এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে গল্পটা। ওর চোখে মুখে সকালের কিশোর রোদ। হাতে পেপারটা নিয়েই ও জড়িয়ে ধরে শ্রীতমাকে— "সো প্রাউড অফ ইউ মা।" শ্রীতমা হেসে বলেন, "হয়েছে, ছাড় এবার। আর মুখটা ধুয়ে আয় তাড়াতাড়ি, লুচিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে"

"উম্ম, আর কয়েকটা লুচি ভাজো মা, আরেকজন আসবে"— ব্রাশে পেস্ট নিয়ে বলে ইলোরা।

শ্রীতমার চোখেমুখে ঝিলিক খেলে যায়— "ঋক?"

"তুমি চেনো না বোধহয়। দেবাদিত্য... নন্দনের দিকে যাব একবার। ব্রেকফাস্টটা এখানেই করে যেতে বলেছি ওকে"

এই সকালে দেবাশিস, ইলোরার কাছ থেকে নিজের যেটুকু প্রাপ্তি তা সযত্নে বুকের নীচে লুকিয়ে রেখেছে শ্রীতমা। তবু ইলোরার কাছ থেকে শেষটুকু শোনার পরে কিছু বিস্ময়, মুগ্ধতা আর নস্টালজিয়া লুকোতে পারে না ও। কড়াইতে তেল দিতে দিতে বলে, "দেবাদিত্যকে চিনব না? আমার কাছে এখনও ওদের পেপার কাটিংটা রয়ে গেছে তো"

আধপাতা জোড়া একটা ছবি। নির্বাণ আর জাভেদের কাঁধে দেবাদিত্য— মুঠো করা হাত আকাশের দিকে, স্লোগান দিচ্ছে। পেছনে উড়ছে লাল আবির।

সেই ছবিতে আরও একটা ছেলে ছিল। তাকে এখনও বহুদূর যেতে হবে, একা একা। এই এত হাসি, কথা আর সুখবর মোড়া সকালে এ শহরে তাকে কেউ ব্রেকফাস্ট করে যেতে বলেনি।

ট্রেন একটু লেট ছিল। এনজেপিতে পৌঁছে ডিমটোস্ট খেয়েছে ওরা। তারপর একটা করে সিগারেট ধরিয়ে লোকজন-দোকানপাট- গাড়িটাড়ি দেখেছে কিছুক্ষণ। তারপর দু'একটা ফোনটোন করে মোবাইল সুইচড অফ করে গাড়ি ধরেছে। এই পুরো সময়টায় আঙুলে আঙুল রাখা তো ছিলই, এমনকি হাত ধরাতেও কোনও বারণ ছিল না। সেদিন প্রায় এগারোটা নাগাদ হস্টেলে ফিরে দেবাদিত্যর রুমে গিয়েছিল জাভেদ আর ঋক।

দেবা এখন অন্য কোনও মানুষ। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। কানে ইয়ারফোন। দু'দিন আগের দেবাদিত্য আর এই দেবাদিত্যর মাঝে একটা দীর্ঘ উপত্যকার দূরত্ব। সেখানে নদী বয়ে যাচ্ছে তিরতির করে। কিছু পাহাড়ি ফুল ফুটেছে। অগোছালো হাওয়ায় ভর করে ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে কিছু পাখি, প্রজাপতি।

পায়ের আওয়াজে উঠে বসে দেবাদিত্য। ইয়ারফোন খুলে একগাল হেসে বলে, "চোখমুখ দেখে তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভোলেবাবা হয়ে আছিস দু'জনেই"

বয়স্ক চেয়ারে নিজেকে গুছিয়ে নেয় জাভেদ। ঋক বিছানায় গিয়ে বসে। বলে, "তোর মতো তো আর সাহস নেই, তাই এভাবেই যতদূর পালানো যায় আর কী"

"পালাতে গেলে সাহস লাগে ঠিকই, কিন্তু ফিরতে আরও বেশি লাগে বোধহয়"— ঋকের কাঁধে হাত রাখে দেবা।

জাভেদ হেসে বলে, "এ পাপে আমি নতুন ব্রতী"

"সারাক্ষণ তোমাকে কেউ লাল কালিতে নম্বর দিচ্ছে না বস, একটু কম চাপ নাও।" তারপর দেবার দিকে ফিরে ঋক বলে, "তারপর? তোর পরিব্রাজক জীবনের গল্প শোনাবি না একটু?"

ঋকের পেটে হাল্কা ঘুষি মারে দেবা— "সবই বলব, কিন্তু তার আগে তোদের সংসার জীবনের গল্পটা শুনি"

কথায় কথায় রাত বাড়ে। বয়স বাড়ে। নেশা বাড়ে। তিনজনে মিলে ছাদে যায়, জলের ট্যাঙ্কির ওপর উঠে বসে। আকাশের গাছে তারা ফুটে আছে গোছায় গোছায়। আত্রেয়ীর কথা মনে পড়ে ঋকের। আর মনে পড়ে যে হঠাৎ পথ বেয়ে নিজেকে নিয়ে চলে গেছে নিরুদ্দেশে, কিন্তু ওর জন্য প্রতি বাঁকে বাঁকে ফেলে রেখে গেছে স্মৃতির ভিড় আর এই হু হু শূন্যতা— সেই মানুষটাকে। কিন্তু তাকে আর জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠার উপায় নেই। কিন্তু আজ ও আলগোছে হাত ধরে জাভেদের। দেবা আকাশের দিকে তাকিয়েই বলে, "আমার চেয়ে তুই অনেক বেশি সাহসী ঋক, অনেক বেশি জীবনমুখী।"

ঋক টান দেয় জয়েন্টে, বলে, "রঙ্গারুনে দিন কয়েকের ব্যবস্থা করে দিতে পারবি দেবা? যেতাম আমরা।"

জাভেদ আর ঋক যখন রঙ্গারুন পৌঁছল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঋকের পিঠে একটা রুকস্যাক। জাভেদের পিঠে গিটার। তাই ওর ব্যাগটাও ঋকেরই কাছে। কাজলদা ওদের দেখে একগাল হেসে বলল, "রাস্তায় কোনও অসুবিধে হয়নি তো? ব্যাগট্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে নিন, তারপর গরম গরম ডিমের ঝোল-ভাত খেয়ে বাকি কথা।"

রাস্তার পাশে নাম না-জানা ফুলের মেলা, ঝকঝক করছে আকাশ, উপত্যকা বেয়ে গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে হাওয়া। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে বাড়ির সামনে। আর দিগন্তজুড়ে শুয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এদের ভেতর দাঁড়িয়ে ঋকের হঠাৎ মনে হল ওকে এখুনি অনেক কিছু বলে ফেলতে হবে, জাভেদকে।

চোখ ভিজে যায় ঋকের। জাভেদ রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে গেছিল অনেকটা। ঋক চোখ মুছ নেয় তাড়াতাড়ি। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে। ঠিক তখনই রুটের বাস- হলুদ ট্যাক্সি- অচেনা লোকজন পেরিয়ে দেবাদিত্য আর ইলোরা হাঁটছিল ময়দানের সামনের ফুটপাথ দিয়ে।

"অলিতে যাবি?"

দেবাদিত্য হাসে, "গেলেই হয়। তবে হেঁটে যাব পুরোটা, বাস-টাস আর করতে পারব না"

"ডান"

"হ্যাঁ, ডানদিকেই যেতে হবে আপাতত, সিগন্যাল থামলে ক্রস করি?"

ইলোরা হঠাৎ হাত ধরে দেবাদিত্যর, রাস্তা পেরোয় দু'জনে। ওই ফুটে গিয়ে খিলখিল করে হেসে কায়দা করে টেনেটেনে বলে, "দ্য গ্রেট দেবাদিত্য বসুকে ডানপন্থী হতে বাধ্য করছি, সভ্যতার ইতিহাস আমায় ক্ষমা করবে না তো!"

দেবা হাসে, বলে "সভ্যতা বা ইতিহাস কারোই অত দায় নেই ম্যাডাম।" তারপর আঙুল জড়ানো হাতটা তুলে ধরে বলে, "জাস্ট কীভাবে?"

"হো যাতা হ্যায় স্যর... জীবন-টীবন আর কী"

একটু পরেই প্রাচীন উপত্যকার আকাশে উইম্বলডন রানার্সের রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠবে একটা। তার নীচে দিগন্ত জুড়ে কুয়াশার চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকবেন সিদ্ধার্থ। আর কাঠের বারান্দা থেকে তার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকবে ঋক। ওর হু হু মনে পড়বে আত্রেয়ীর কথা। একটা স্বপ্নের কথা। ও মাথা রাখবে জাভেদের কাঁধে। জাভেদ ওর চুল ঘেঁটে দিয়ে গিটারে গান ধরবে—

"কেন শরীর, কেমন হাওয়া,
আরশিমহল, কাকে পোড়ায়। বলা বারণ।

"দূরের স্টিমার, আলোর তারিখ,
নিজে মানুষ, কী যে কখন। বলা বারণ।"

**অলংকরণ:** সায়ন চক্রবর্তী

# ব্রিটেনের স্বাদ বাংলায়

নিজের ব্রিটিশ শিকড়কে যেভাবে বাংলার মাটির সঙ্গে একাত্ম করেছেন শেফ শন কেনওয়র্দি, তা সত্যিই নজিরবিহীন। বাঙালির উৎসবের রসনাবিলাসে সেই ঐতিহ্য, সেই স্বাদ-সম্প্রীতিকেই তুলে ধরলেন তিনি। সেই সঙ্গে ভাগ করে নিলেন ব্রিটিশ এবং ভারতীয় স্বাদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার কথা। সাক্ষী রইলেন সায়নী দাশশর্মা।

পুলড ডাক শিঙাড়া
২০১২ উইথ পাঁচফোড়ন
পাইন্যাপল চাটনি

সামনের নভেম্বরে কলকাতায় একুশ বছর পূর্ণ করতে চলেছেন সেলিব্রিটি শেফ শন কেনওয়র্দি। তাঁর রান্নায় বরাবরই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে চিরন্তন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য স্বাদের অনন্য মেলবন্ধন। অথচ তিনি নিজে নাকি ফিউশন খাবারে বিশ্বাসী নন! কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, "সব কুইজ়িনই প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। যখন যেখানে যে ধরনের উপকরণ পাওয়া যায়, তা-ই সেখানকার কুইজ়িনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বাঙালি খাবারের কথাই যদি বলি, এখন যে ধরনের পদ আমরা দেখি, তার কিছু হয়তো মাত্র বছরকুড়ি আগে তৈরি হয়েছে। একশো বছর আগের বাঙালি খাবারের সঙ্গে আধুনিক বাঙালি কুইজ়িনেরই তো কত তফাত! তাই আমার কাছে 'ফিউশন' খাবারের কোনও অস্তিত্ব নেই।" দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে কলকাতায় রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নানা কুইজ়িন নিয়ে কাজ করছেন। জানালেন, এদেশের খাবারের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় ব্রিটেনেই, আট বছর বয়সে। "সাতের দশকে ইউকে-তে যাঁরা বড় হয়েছেন, সম্ভবত প্রত্যেকেই প্রথম বাইরের খাবার খেয়েছেন কোনও ভারতীয় রেস্তরাঁয়।

এদেশের খাবারের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় ব্রিটেনেই, আট বছর বয়সে। বললেন, "সাতের দশকে ইউকে-তে যাঁরা বড় হয়েছেন, সম্ভবত প্রত্যেকেই প্রথম বাইরের খাবার খেয়েছেন কোনও ভারতীয় রেস্তরাঁয়। মনে আছে, আমার শহরে দু'টো ভারতীয় রেস্তরাঁ ছিল সেসময়। তারই একটিতে আমার প্রথম ভারতীয় খাবার খাওয়া।"

মনে আছে, আমার শহরে দু'টো ভারতীয় রেস্তরাঁ ছিল সে সময়। তারই একটিতে আমার প্রথম ভারতীয় খাবার খাওয়া। এদেশে আসার পর প্রথম খেয়েছিলাম কাশ্মীরি খাবার। আর বাঙালি খাবারের সঙ্গে তো আমার অন্যরকম সম্পর্ক। আমার স্ত্রী বাঙালি, ওঁর সূত্রে এবং কলকাতায় এতগুলো বছর থেকে এখানকার স্বাদ-সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, চিনেছি। আমিষ খাবারের চেয়ে কিন্তু নিরামিষ বাঙালি খাবারই আমার বেশি পছন্দের। এমনকী, আমি বলব এদেশের সেরা নিরামিষ খাবার বাংলার, যদিও তা ভীষণ আন্ডাররেটেড। বাংলার মতো এত স্বাদবৈচিত্র্য দেশের অন্য কোনও নিরামিষ খাবারে নেই। হবে না-ই বা কেন! কত সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হয়েছে এই বাংলায় ভাবুন তো! পর্তুগীজ়, পারসি, মুঘল, ফরাসি,

## পুলড ডাক শিঙাড়া ২০১২ উইথ পাঁচফোড়ন পাইন্যাপল চাটনি

*(২০১২ সালে ইউকে-র একটি পপ-আপে প্রথম এই পদ বানিয়েছিলাম। ডাব চিংড়ি থেকে রুবার্ব এবং কাস্টার্ড, এত বছরে বোধহয় হেন কোনও উপকরণ নেই, যা দিয়ে আমি শিঙাড়া বানাইনি! তবে হাঁসের মাংসের শিঙাড়া নিঃসন্দেহে সেরার সেরা। আর ট্র্যাডিশনাল চাটনির পরিবর্তে আনারসের চাটনির সঙ্গে এই শিঙাড়া আরও ভাল লাগে।)*

**উপকরণ:** গোটা হাঁস ১টা (স্কিনসহ, ৮০০ গ্রাম ওজনের), পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, সরষে ১/২ চা-চামচ, সাদা তেল ২ চা-চামচ, আনারস ১/২টা, আদকুচি ১ ১/২ চা-চামচ, পাটালি গুড় ৫০ গ্রাম, ভিনিগার ৪০ মিলি, হয়সিন সস ২ চা-চামচ, স্প্রিং অনিয়ন ২টো ডাঁটা (কুচনো), সেদ্ধ আলুর টুকরো ১০০ গ্রাম, ময়দা ১০০ গ্রাম, নুন স্বাদ অনুযায়ী।

**প্রণালী:** ময়দায় অল্প তেলের ময়ান দিয়ে সামান্য নুন ও পরিমাণমতো জল দিয়ে শক্ত করে মেখে রাখুন। প্রেশার কুকারে হাঁস রেখে পরিমাণমতো জল দিয়ে একঘণ্টা মতো সেদ্ধ হতে দিন। তারপর জল ঝরিয়ে হাড় আর মাংস আলাদা করে নিন। চাটনির জন্য কড়াইতে ১ চা-চামচ তেল গরম করে ওতে পাঁচফোড়ন ও সরষে দিন। ১ ইঞ্চি বাই ১/২ ইঞ্চি টুকরোয় কাটা আনারস দিন তারপর। খানিকটা আদাকুচি, গুড় এবং ভিনিগার মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। চটচটে জ্যামের মতো ঘনত্বে এলে নামিয়ে নিন। অন্যদিকে সেদ্ধ করা হাঁসের মাংস একটা বাটিতে নিয়ে ওতে হয়সিন সস, কুচনো স্প্রিং অনিয়ন, বাকি আদাকুচি মেশান। স্বাদমতো নুন মিশিয়ে আলুর টুকরো দিন। ময়দার ডো থেকে চারটে লেচি কেটে বেলে ভিতরে হাঁসের মাংসের পুর ভরে শিঙাড়ার মতো ভাঁজ করে নিন। ছাঁকা তেলে সোনালি করে ভেজে আনারসের চাটনির সঙ্গে সার্ভ করুন।

## বেঙ্গল ব্ল্যাক রাইস অ্যান্ড ক্র্যাব অ্যারাঞ্চিনি ফ্রিটার্স উইথ বেঙ্গলি টোম্যাটো কুলি

*(ভাত, কাঁকড়া এবং টোম্যাটোর চাটনি... তিনটিই বাঙালির অতিপরিচিত পদ। তবে রান্নার ধরন ব্রিটিশ কুইজ়িন দ্বারা অনুপ্রাণিত।)*

**উপকরণ:** বেঙ্গল ব্ল্যাক রাইস ২০০ গ্রাম (না পেলে অন্য চালও ব্যবহার করতে পারেন), কাঁকড়ার মাংস ১৫০ গ্রাম, সরষের তেল ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ২টো (কুচনো), কুরনো গন্ধরাজ লেবুর খোসা ১ চা-চামচ, আদাকুচি ২ চা-চামচ, টোম্যাটো ৪টে (কুচনো), ক্র্যানবেরি জুস ১০০ মিলি, পাটালি গুড় ২ টেবলচামচ, নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো স্বাদমতো, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, পাতিলেবু ১টা (রসটুকু), পারমেজ়ান চিজ় ৪০ গ্রাম, চেডার চিজ় ৪০ গ্রাম, সিজ়নড ফ্লাওয়ার ৫০ গ্রাম, ডিম ২টো (ফেটানো), ব্রেডক্রাম ১০০ গ্রাম, ভাজার জন্য সাদা তেল পরিমাণমতো।

**প্রণালী:** চাল ধুয়ে আধঘণ্টা ভিজিয়ে নুন-জলে একটু বেশি সেদ্ধ করে নিন। মাড় গেলে ঠান্ডা করুন। কড়াইতে অর্ধেক সরষের তেল দিয়ে কাঁকড়ার মাংস দিয়ে নাড়ুন। কাঁচালঙ্কাকুচি, কুরনো গন্ধরাজ লেবুর খোসা ও অর্ধেক আদাকুচি দিয়ে মিনিটদুয়েক নেড়েচেড়ে লেবুর রস মেশান। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো মিশিয়ে নামিয়ে নিন। কড়াইতে বাকি সরষের তেলে পাঁচফোড়ন, বাকি আদাকুচি, টোম্যাটোকুচি, ক্র্যানবেরি জুস এবং গুড় মেশান। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো দিনে মিনিটদশেক রান্না করে, নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্লেন্ড করে নিন। ভাতে দু'রকম চিজ়, নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো মেশান। মিশ্রণটার চারটে ভাগ করে কাঁকড়ার পুর ভরুন। বলগুলো ময়দায় কোট করে ডিমে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম মাখিয়ে নিন। মাঝারি আঁচে সোনালি করে ভেজে টোম্যাটো কুলির সঙ্গে সার্ভ করুন।

ব্রিটিশ... যখন যাঁরা রাজত্ব করেছেন, তাঁদের স্বাদ-সংস্কৃতিও মিশে গিয়েছে এদেশ, তথা বাংলার খাবারে। দোলমা, মিষ্টি পোলাওয়ের মতো চিরন্তন বাঙালি পদে যে বাদাম বা বীজের ব্যবহার হয়, তার নেপথ্যে পারসি কুইজ়িনের প্রভাব রয়েছে। আবার সরষের ব্যবহার শুরু হয়েছে ব্রিটিশদের সূত্র ধরে।" ম্যাঞ্চেস্টারে শৈশব কাটিয়েছেন। স্বভাবতই সেখানকার খাবার, ব্রিটিশ রন্ধনপ্রণালী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে ছোট থেকে। যদিও ভারতীয় তথা বাঙালি স্বাদের সঙ্গে ব্রিটিশ স্বাদের খুব একটা তফাত আছে বলে মনে করেন না শন। "ফিশ অ্যান্ড চিপস, স্টু, ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, হটপটের মতো ট্র্যাডিশনাল ব্রিটিশ পদ খেয়ে বড় হয়েছি। পরে বুঝেছি, এদেশের

## মাছের ডিমের বড়া উইথ বুরাটা, ক্র্যাকলিং পাঁচফোড়ন অ্যান্ড সুইট ম্যাঙ্গো চাটনি

*(গত দুর্গাপুজোয় একটি টেস্টিং মেনুর উপর কাজ করতে গিয়ে প্রথম এই রেসিপির আইডিয়া পাই। সেবার টাটকা বুরাটা চিজ়ের সঙ্গে মুচমুচে মৌরলা মাছের কম্বিনেশন বানিয়েছিলাম। তবে মাছের ডিমের বড়াকেও এই চিজ় দারুণ কমপ্লিমেন্ট করবে।)*

**উপকরণ:** বুরাটা চিজ় ১/২খানা, নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো স্বাদমতো।
মাছের ডিমের বড়ার জন্য: মাছের ডিম ২০০ গ্রাম, বেসন ৩ চা-চামচ, মাঝারি পেঁয়াজ ১/২টা (কুচনো), কাঁচালঙ্কা ৩টে, পোস্ত ১ চা-চামচ, পাতিলেবু ১টা (রসটুকু), নুন স্বাদমতো, ভাজার জন্য সরষের তেল বা সাদা তেল পরিমাণমতো। ম্যাঙ্গো চাটনির জন্য: পাকা আম ১টা (ক্বাথ), কুরনো আদা ১ চা-চামচ, দারচিনিগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, পাতিলেবু ১টা (রসটুকু), ভিনিগার ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো।

**প্রণালী:** আমের চাটনির সব উপকরণ একসঙ্গে মসৃণ করে ব্লেন্ড করে নিন। মাছের ডিমের বড়ার সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে নিন। মিশ্রণ বেশ আঠা-আঠা হবে। কড়াইতে তেল গরম করে ১ চা-চামচ করে মাছের ডিমের মিশ্রণ দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে ২-৩ মিনিট বা সোনালি রং ধরা অবধি ভেজে নিন। সার্ভিং ডিশের মাঝখানে অর্ধেক বুরাটা রেখে নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। উপরে মাছের ডিমের বড়া রেখে ফ্রেশ ম্যাঙ্গো চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

স্বাদ-সংস্কৃতির সঙ্গে ওদেশের কত মিল। উভয় দেশের রন্ধনপ্রণালীতে বিশেষ তফাত নেই। কোনও ধরনের রোস্টিং, কোনও ধরনের ব্রেজ়িং, কোনও না কোনওরকম ফায়ার কুকিং মেথড দু'ক্ষেত্রেই রয়েছে। যেটুকু পার্থক্য, তা মূলত উপকরণের গুণে। ইংলিশ চিকেন রোস্ট আর তন্দুরি চিকেনের কথাই

"বাঙালি, তথা ভারতীয় খাবারে মশলার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রেভি বা কারির ক্ষেত্রেও দেখবেন, সবজি বা মাংসের চেয়ে গ্রেভির স্বাদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ খাবারে সবজি-মাংসের ফ্লেভারই সব!"

ধরুন। প্রণালী কিন্তু কমবেশি একই, তবে মশলার ব্যবহার অনেকটাই ভিন্ন। বাঙালি, তথা ভারতীয় খাবারে মশলার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রেভি বা কারির ক্ষেত্রেও লক্ষ করে দেখবেন, সবজি বা মাংসের স্বাদের চেয়ে গ্রেভির স্বাদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর লজিক্যাল ব্যাখ্যাও
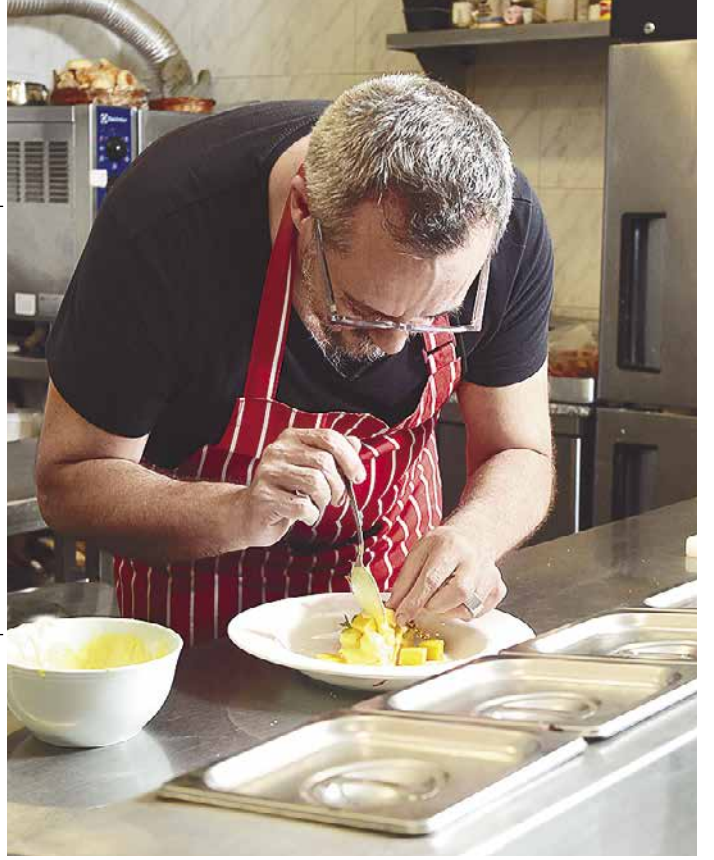
## ট্রাইফল বেঙ্গল

*(ট্রাইফল বরাবরই আমার 'গো-টু' ডেমনস্ট্রেশন ডিশ। বিশ্বের যে প্রান্তেই গিয়েছি, সেখানেই স্থানীয় বাজারে কিছু না কিছু পেয়েছি, যাকে ট্রাইফলের রূপ দেওয়া যায়। ট্র্যাডিশনাল ট্রাইফলের সব এলিমেন্টই রয়েছে এতে। স্পঞ্জ কেক, ফল, কাস্টার্ড... আর ক্রিমে রয়েছে মিষ্টি দইয়ের খাঁটি বাঙালি ছোঁয়া!)*

**উপকরণ:** স্পঞ্জ কেক ১/২ পাউন্ড, রসমালাই ৫-৬টা, পাকা আমের টুকরো ১ কাপ, হুইপড ক্রিম ১/২ কাপ, মিষ্টি দই ১/২ কাপ, ক্যারামেল সস ২-৩ চা-চামচ, ভাজা মৌরি ১ চা-চামচ, লেমনচেলো (লেবু ফ্লেভারের ভদকা, যে কোনও সুপার মার্কেটে পাবেন) ২ টেবলচামচ।

**প্রণালী:** এর সেই অর্থে কোনও রেসিপি নেই। পুরোটাই সাজানোর বিষয়। স্পঞ্জ কেক ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ১ ইঞ্চি পুরু করে গোল করে কেটে প্লেটের মাঝখানে রাখুন। উপরে লেমনচেলো ড্রিজ়ল করে দিন। তার উপরে কয়েকটা রসমালাই ও আমের টুকরো রাখুন। হুইপড ক্রিম এবং মিষ্টি দই একসঙ্গে ফেটিয়ে অল্প পরিমাণে নিয়ে রসমালাইয়ের উপরে রাখুন। ক্যারামেল সসে ভাজা মৌরি মিশিয়ে উপরে ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

## ক্রিস্প স্কিন অন কলকাতা ভেটকি উইথ সতেড আইভি গোর্ড অ্যান্ড গন্ধরাজ ফোম

*(নামে যতটা খটোমটো, বানানো ততটাই সহজ। যখন যে সবজি পাওয়া যায়, তখন তা দিয়েই বানানো যায়। ফলে এত বছরে এর অনেকগুলো ভেরিয়েশন তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাঙালির মাছ আর সবজির ক্লাসিক জুটির ব্রিটিশ সংস্করণ বলতে পারেন!)*

**উপকরণ:** তেল-সহ ভেটকি মাছের ফিলে ৪টে (প্রতিটা ১৫০ গ্রাম ওজনের), অলিভ অয়েল ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, পটল ২৫০ গ্রাম, সাদা তেল পরিমাণমতো, পাতিলেবু ১টা (রসটুকু), ডিম ১টা (সাদা অংশটুকু), গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গন্ধরাজ লেবু ১টা (রস আলাদা করে খোসা কুরিয়ে নিন)।

**প্রণালী:** মাছের গায়ে নুন মাখিয়ে নিন ভালমতো। কড়াইতে অলিভ অয়েল গরম করে মাছগুলো এপিঠ-ওপিঠ করে ভেজে নিন। তেল-সহ পিঠ মোটামুটি ৫ মিনিট বা মুচমুচে হওয়া অবধি ভাজুন, অন্য পিঠ মিনিটদুয়েক বা সোনালি রং ধরা অবধি ভাজলেই যথেষ্ট। মাছগুলো নামিয়ে ওই তেলেই আঁচ কমিয়ে অর্ধেক করে কাটা পটলগুলো দিন। মিনিটপাঁচেক বা সোনালি হওয়া অবধি ভেজে নিন। পটল একদম নরম হবে না, একটু ক্রাঞ্চি থাকলেই ভাল। স্বাদমতো নুন এবং পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নামিয়ে নিন। গন্ধরাজ ফোম বানাতে লেসিথিন ব্যবহার করতে পারেন। তবে ডিম দিয়ে বানানো বেশি সহজ। এর জন্য ডিমের সাদা বিট করে নিন, যতক্ষণ না ফোমের মতো ঘনত্বে আসে। এতে স্বাদমতো নুন, গোলমরিচ, গন্ধরাজ লেবুর খোসা আর রস দিয়ে হালকা হাতে ফোল্ড করে নিন। সার্ভিং ডিশে পটল রেখে উপরে মাছের টুকরো রাখুন। গন্ধরাজ ফোম এবং গন্ধরাজ লেবুর টুকরো দিয়ে সাজিয়ে দিন।

রয়েছে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ায়, খুব দ্রুত খাবারে পচন ধরার প্রবণতা রয়েছে। তা প্রতিরোধ করার জন্যই রান্নায় বেশি করে মশলার ব্যবহার শুরু হয়। এতে খানিকটা প্রেজ়ারভেনশনের কাজও হয়, আর খাবারের স্বাদ, স্বাদের কমপ্লেক্সিটিও বাড়ে। সেই তুলনায় ব্রিটিশ খাবারে মশলার ব্যবহার খুবই সীমিত। সেখানে আবার সবজি বা মাংসের নিজস্ব ফ্লেভারই সব। তবে ব্রিটিশরা স্পাইসি খাবার কিন্তু খুব পছন্দ করেন। ইনফ্যাক্ট, পাশ্চাত্যে ব্রিটেন অন্যতম দেশ, যাঁরা স্পাইসি খাবার এত ভালবাসেন। এর নেপথ্যে অবশ্যই ভারত আর ব্রিটেনের সম্পর্কের লম্বা ইতিহাস রয়েছে। ব্রিটেনে এখন যা যা মশলার ব্যবহার হয়, বেশিরভাগই ভারতের অনুপ্রেরণা। আর কলকাতায় ব্রিটেনের স্বাদ-সংস্কৃতি ধরে রাখার নেপথ্যে রয়েছে ক্লাব কালচার। এই শহরের বেশিরভাগ ক্লাব কুইজ়িনে এখনও ব্রিটিশ খাবারের আধিপত্য লক্ষ করবেন। ফিশ ফ্রাই, চপ, প্যাটিস, পাফ... এসবেরই উৎস কিন্তু ব্রিটেন। বা ক্রিসমাসের সময় যে ধরনের পুডিং বা প্লাম কেক তৈরি হয়, তাতে মশলার ব্যবহার শুরু হয় ভারতের অনুপ্রেরণাতেই। ইউরোপের উত্তরে

## স্মোকি ব্যান্ডেল চিজ় উইথ হোমমেড পিকালিলি অ্যান্ড ক্রিস্প হোলহুইট ওয়েফার্স

*(এখানে যখন প্রথম এইট কোর্স টেস্টিং মেনু শুরু করি, তখন থেকেই তাতে কোনও ধরনের চিজ় কোর্স রাখার পরিকল্পনা ছিল। পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য বজায় রেখে কোনও লোকাল চিজ় ইনট্রোডিউস করতে চেয়েছিলাম। তাই ব্যান্ডেল চিজ় বেছে নিই। আর পিকালিলির সঙ্গে আমার শৈশবের স্মৃতি জড়িয়ে। আমার এত প্রিয় একটি পদের কোনও বাঙালি সংস্করণ থাকবে না, তা কি হয়!)*

**উপকরণ:** লাভাস বা হোলহুইট খাকরা ২-৩টে, ব্যান্ডেল চিজ় ১/২ কাপ, টোস্ট করা কুমড়োর বীজ ২ চা-চামচ (অপশনাল)। পিকালিলির জন্য: ছোট টুকরো করে কাটা ফুলকপি ২০০ গ্রাম, বীজ বের করা শসার টুকরো ২০০ গ্রাম, গাজরের টুকরো ২০০ গ্রাম, টুকরো করা পেঁয়াজ ২০০ গ্রাম, নুন ১ টেবলচামচ + ২ চা-চামচ, মল্ট বা হোয়াইট ভিনিগার ৩৫০ মিলি, ইংলিশ মাস্টার্ড পাউডার ২ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ময়দা ২ টেবলচামচ, টুকরো করে কাটা গারকিনস ১০০ গ্রাম (শসার মতো দেখতে এক ধরনের ফল, ভিনিগারে ডোবানো থাকে, সুপারমার্কেটে পেয়ে যাবেন), চিনি ১৫০ গ্রাম।

**প্রণালী:** একটা বড় বাটিতে ফুলকপি, শসা, গাজর, পেঁয়াজ আর ১ টেবলচামচ নুন মিশিয়ে নিন। ক্লিংফিল্ম দিয়ে ঢেকে ৪ ঘণ্টা রাখুন, মাঝেমধ্যে টস করে নিন। তারপর ঠান্ডা রানিং ওয়াটারে ভালমতো ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। বড় সসপ্যানে মল্ট ভিনিগার আর ইংলিশ মাস্টার্ড পাউডার দিন। এতে হলুদগুঁড়ো, ময়দা, গারকিনস, চিনি এবং বাকি নুন মেশান। মিশ্রণ ঘন হয়ে ফুটতে শুরু করলে জল ঝরানো সবজিগুলো দিন। আরও মিনিটখানেক ফুটিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। মিশ্রণ পুরোপুরি ঠান্ডা হলে দেড় কেজি মাপের এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে ঘরের তাপমাত্রায় রাখুন একদিন। পিকালিলি তৈরি। ফ্রিজে মাসখানেক ভাল থাকবে, তাই একটু বেশি করেই বানিয়ে রাখতে পারেন। এরপর শুধু অ্যাসেম্বল করার পালা। প্লেটে খাখড়া বা লাভাস রেখে উপরে অল্প পিকালিলি দিন। ব্যান্ডেল চিজ় হাত দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে উপরে ছড়ান। চাইলে টোস্ট করা তরমুজের বীজও ছড়িয়ে দিতে পারেন উপরে।

জার্মানি, প্রাগ ইত্যাদি অঞ্চলে গেলে কিন্তু মশলার এত ব্যবহার চোখে পড়বে না। ওখানকার ফ্লেভার ব্রিটেনের থেকে একদম আলাদা। আসলে ব্রিটেন বরাবরই বিশ্বের সবচেয়ে ভাল উপকরণগুলোর অ্যাকসেস পেয়ে এসেছে। তাই ওখানকার স্বাদেও বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রভাব লক্ষ করা যায়।” দু’দেশের মধ্যে স্বাদের এই আদানপ্রদানকে কেন্দ্র করেই উৎসবের রসনাবিলাসের আয়োজন করলেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে সব বিদেশি খাবার, কিন্তু প্রত্যেকটি পদেই কোনও না কোনওভাবে বাঙালিয়ানা মিশিয়েছেন শেফ। “বাংলার চিরন্তন উপকরণ, কিছু ক্লাসিক পদের সঙ্গে ব্রিটিশ কুইজ়িনের ব্যাকরণকে মেলাতে চেষ্টা করেছি। প্রতিটা রেসিপিতেই যতটা ব্রিটিশ ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, ততটাই প্রভাব রয়েছে বাংলা তথা ভারতীয় স্বাদের। কিছু রেসিপি একদম নতুন, কিছু পদকে ভেঙে নতুন করে গড়েছি। সবক’টিই বাড়িতে বানানোর মতো। আশা করি সকলের ভাল লাগবে...”

**রেসিপি সৌজন্য:** দ্য গ্লেনবার্ন পেন্টহাউস, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা

**ছবি:** শুভেন্দু চাকী

সানন্দা
ফ্যাশন ৭
ফুলের বাজারে
রোজকার ব্যস্ততা।
সাজপোশাকেও
ধরা পড়ে তার রেশ।
সাদা-নীল ক্রপটপ-
স্কার্টে জমকালো
অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্ট।
সঙ্গে মেসি বান।
পোশাক: দেবুজ়
বাই দেবাশিস
ফোন: ৮৯১০০০৮১৯৩
এই শহরের নিজস্ব
প্রাণ আছে। কংক্রিটের
ইমারতের ফাঁক গলে সেই
প্রাণ চুঁইয়ে পড়ে শহরের
অলিতে-গলিতে। উজ্জ্বল
ফ্যাশনচিত্রে তাকেই
ছুঁতে চাওয়ার চেষ্টা।
কল্লোলিনী তিলোত্তমাকে
সানন্দার কুর্নিশ...
কলকাতা
ক্যানভাস

ব্যাকগ্রাউন্ডে আইকনিক ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল। পেস্তারঙা স্যাটিন পেপলাম টপে ফ্লোরাল প্রিন্ট। সঙ্গতে বেজ ক্রপড ট্রাউজ়ার্স। শিক অ্যান্ড স্মার্ট। ঠিক এই শহরের মতোই!

**পোশাক:** লাতিন কোয়ার্টার্স
সাউথ সিটি মল

অলস বিকেলে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখা 'সিটি অফ জয়' কলকাতাকে। পোশাকের উজ্জ্বল প্রিন্টেও যেন সেই খুশিরই প্রকাশ ঘটেছে।

**পোশাক:** শুভা ডিজ়াইন স্টুডিও
**ফোন:** ৯৬৭৪০২৪৬৩৪

কালো শর্টসের উপর
প্রিন্টেড লং জ্যাকেটে
কলকাতার ময়দানে।
শহরের চিরন্তন
আভিজাত্যকে সাক্ষী
রেখে সাহসী ও স্বতন্ত্র
স্টাইল স্টেটমেন্ট।

**পোশাক:** অরণ্য
**ফোন:** ৯৮৩১০৩৯৮২২
**গয়না:** করিশ্মাজ়
**ফোন:** ৮৬৯৭১১৩৩৬৭

ট্রামলাইন, ঘোড়ার গাড়ি, ময়দান...এই শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। সেই ঐতিহ্যকেই ছুঁয়ে দেখা। পরনে নীল-সাদা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সেট।

পোশাক: অরণ্য
গয়না: করিশ্মাজ়

শহরের ব্যস্ত রাস্তা। রঙিন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড টপ-স্কার্ট আর ব্যাকপ্যাক নিয়ে তৈরি মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়ার জন্য।

পোশাক: দেবুজ় বাই দেবাশিস
গয়না: আঁকিবুকি অদিতি

শহরের অনুপ্রেরণায় পোশাকেও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন। কালো ট্যাঙ্ক টপের উপর লাল-মেরুন ও বাদামি রঙা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্রিন্টেড জ্যাকেট। ট্রাউজ়ার্সেও একই প্রিন্ট।

**পোশাক:** লেবেল মেঘা গর্গ
**ফোন:** ৯৮৩০৪৮৮২৮২
**গয়না:** আঁকিবুকি অদিতি
**ফোন:** ৯৭৪৮৪৬১১০৫

ফ্যাশনিস্তা ‘সিটি গার্ল’। রোজনামচার জীবনে ক্ষণিকের থেমে থাকা। স্টপেজ মাছের বাজার। পরনে আকাশি ক্রপ শার্ট ও উজ্জ্বল কমলা ট্রাউজ়ার্স। শার্টে মডার্ন আর্টের প্রিন্ট।

শাড়ি ও ব্লাউজ: দেবুজ়
বাই দেবাশিস
গয়না: অ্যাডরস, জুয়েলরি
ফোন: ৮৯৮১০১১৯৮৭

মডেল: প্রিয়াঙ্কা, জুহি,
শ্রীময়ী, অনন্যা
মেক-আপ: বাবুসোনা সাহা
ফোন: ৮২৮৪০৫৫০৮৮৪
হেয়ার: গিনি হালদার
ফোন: ৭৪৩৯৭০৩৬২০
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: দীপশিখা রায়
ছবি: সোমনাথ রায়
পরিকল্পনা: সায়নী দাশশর্মা
শুটিং কো-অর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার
রূপায়ণে: পিয়ালী বালা

সানন্দা
ফ্যাশন ৮
অলওভার সিকুইন, নেকলাইনে ফ্লেয়ার কাজ ও ওয়ান স্লিভ গাঢ় নীল অ্যাসিমেট্রিকাল টপ ও ট্রাউজ়ার্সে গ্ল্যাম লুক।
পোশাক: করুণা দেওরা
ওয়েবসাইট: www.karunadeora.in
Glamorous western...
পুজো মানে শুধুই সাবেকি সাজ এমনটা একেবারেই নয়! পুজো মানে কমপ্লিট ফ্যাশন ফাইল। শারদোৎসবে সকাল, সন্ধ্যার সাজে গ্ল্যামারাস ওয়েস্টার্ন পোশাকের লুকবুক তুলে ধরলেন মৌমিতা সরকার।

মাল্টিকালার সুতো দিয়ে জোধপুরি কাজ করা বম্বার জ্যাকেট। সঙ্গে ব্লু ডেনিম। সুতো ও মিররের কাজ করা জোধপুরি ব্যাগ ও রুপোর গয়নায় পুজোর সকালের স্টাইলিশ ক্যাজুয়াল সাজ।

**জ্যাকেট ও ব্যাগ:** করুণা দেওরা
**ফোন:** ৯৮৩০৯২১৫০৮
**ইয়ারিং:** করিশ্মাজ়

ডিপ নেকলাইনে ফ্লেয়ার কাজ, পেপলাম কাটের অরগ্যানজ়া ফ্যাব্রিকের ম্যাজেন্টা টপ। টিমআপ করা হয়েছে টর্নড ডেনিমের সঙ্গে।

**পোশাক:** সাস্যা
**ফোন:** ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩

একই রং ও প্রিন্টের ট্রাউজ়ার্স ও টপ এখন ফ্যাশনে ইন। প্রিন্টেড ট্রাউজ়ার্সের সঙ্গে একই প্রিন্টের ক্রপ টপ।

**পোশাক:** করুণা দেওরা
**ইনস্টা:** karuna_deora

প্যাস্টেল শেডের
গোলাপি, কমলা
ও মেরুন কালার
কম্বিনেশনে
হল্টারনেক, ভি
নেকলাইনে শর্ট ড্রেসে
পার্টি লুক।

পোশাক: কোমল সুদ
ফোন: ৯১৬৩৪৬৯৯৮৬

লিফি গ্রিন কালার প্যান্টসুট। স্লিভসে প্লিটেড সিকুইন প্যাটার্ন ইউনিক ও ইন্টারেস্টিং লুক।

পোশাক: সাস্যা

আপারবডিতে ফ্লোরাল মোটিফের এমব্রয়ডরি কাজ করা আকাশি জাম্পসুট। বাঁদিকে অন্যজন পরেছেন মাল্টিকালার লং বেলস্লিভ জাম্পসুট।

**আকাশি জাম্পসুট ও ইয়ারিং:** ক্যারামিলা
**ফোন:** ৯৮৩১৬০৪৬৩০
**হলুদ জাম্পসুট:** সাস্যা

পুজোর সাজে গ্ল্যামারাস ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লুক। গোল্ডেন শিমারি ফ্যাব্রিকের শার্ট, সঙ্গে শিমারি অলিভ গ্রিন পালাজ়ো।

পোশাক: করুণা দেওরা
গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭

মডেল: অর্পিতা, ডিম্পল
মেক-আপ: মেঘনা বাল্মীকি
ফোন: ৯০৩৮০৪৩৮০২
লোকেশন: ক্লাব ভর্দে ভিস্তা,
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩৯৯০০

ছবি: শিলাদিত্য দত্ত

# ওরা আকাশে জাগাত ঝড়

**দিন আর রাত্রি, পুরুষ আর নারীর মতোই শেলি এবং কিটসও আজ বিশ্ব কবিতার পরম যুগল। বইয়ের পাতা পেরিয়ে, রোজনামচা-দীর্ণ জীবনেও সমান প্রাসঙ্গিক। লিখছেন বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।**

*আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?'*
*আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক।'*
*—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

## শেলি-কিটস ঘুমন্ত যেখানে

'ইয়ং রোম্যান্টিকস্'এর লেখিকা ডেইজ়ি হে তাঁর মধুচন্দ্রিমায় ইতালি গিয়েছিলেন। এই যাওয়ার পিছনে অন্যতম বড় কারণ ছিল শেলি এবং কিটসের সমাধিস্থল দর্শন করে আসা। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে হে লিখেছেন রোমের প্রোটেস্ট্যান্ট সেমেটারির কথা, যার অবস্থান শহরের মূল কেন্দ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে, প্রাচীন দুর্গপ্রাকারের ঠিক বাইরে। পায়ে হেঁটে ওখানে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য পেরিয়ে যেতে হয় বহু ধুলোময়, অসুন্দর শহরতলি। সদ্যবিবাহিতা ডেইজ়ি ও তাঁর বর দুপুরের খর রোদে অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছন, হে'র জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, বহু আগে প্রয়াত দুই কবির সমাধির সামনে। হে জানতেন যে ওই সেমেটারি কেবলমাত্র প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য সংরক্ষিত নয়, ওখানে অর্থোডক্স খৃষ্টান, ইহুদি এবং নাস্তিকদেরও সমাহিত করবার ব্যবস্থা রয়েছে (যেহেতু ওটাই গোটা রোমে অ-ক্যাথলিকদের সমাধিস্থ করবার একমাত্র জায়গা) তবু ওই চৌহদ্দির ভিতরে ঢোকার মুহূর্ত থেকে আর সব কিছু মুছে যেতে শুরু করে তাঁর বোধের আঙিনা থেকে। ১৮২১ এবং ১৮২২-এ পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়া দুই ইংরেজ কবি যে সমাধিক্ষেত্রে শায়িত (কিটস পুরোনো কবরগুলির ভিড়ে এবং শেলি পশ্চিমদিকের এক্সটেনশনে) সেখানে দাঁড়িয়ে শিরা-উপশিরায় যেন অক্ষর দৌড়ে বেড়াতে থাকে ডেইজ়ির। বাইরের যানজট

জন কিটস

পার্সি বিশ শেলি

জীর্ণ শহরে, বাস-ট্যাক্সি-গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে একটুও মেলে না সেমেটারির ব্যাপ্ত নীরবতা। সবুজ ঘাসের আচ্ছাদনে ঢাকা মাটির তলায় এত মানুষ শুয়ে আছে, বিশ্বাস হতে চায় না যে চিরনিদ্রার ভিতর থেকে তারা কেউ কখনও কথা বলবে না আর। অবশ্য কথা বলবেই বা কেন, কথা থেকেই তো কলহ। না, কেবল কলহ কেন, কথা তো কবিতাও। আর কলহ যেরকম কাছে থাকতে না দিলেও দূরে যেতেও দেয় না, কবিতাও বাঁচিয়ে রাখতে না পারলেও মরতে দেয় না। তাই হয়তো ডেইজ়ির ওই সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই মনে পড়ে যায় শেলির কয়েকটি পঙক্তি, ‘As the Moon’s image in a summer sea/ According as she smiled or frowned on me;/ And there I lay within a chaste cold bed/ Alas, I then was nor alive nor dead.’ জীবন্মৃত বহু লোকের ভিড়ে মরে গিয়েও চিরজীবিত প্রতিভাদের নিকটে দাঁড়িয়ে শিহরন জাগে ডেইজ়ির। তাঁর উপলব্ধি হয় যে শেলি কিংবা কিটস কেউই একক জিনিয়াস ছিলেন না; তাঁদের ছিল এক জ্যান্ত, জঙ্গম বন্ধুবৃত্ত। সেই বন্ধুবৃত্তে কখনও লি হান্ট, কখনও হগ, কখনও চার্লস ক্লার্ক কিংবা চার্লস ব্রাউনই শুধু নয়, বায়রনের মতো প্রবল কবি এবং প্রচণ্ড সত্তাও (শেলির শালি, মেরি শেলির সৎ বোন, ক্লেয়ারের গর্ভজাত সন্তানের পিতা ছিলেন বায়রন) শেলির জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কিটসের সঙ্গে তত নৈকট্য না থাকলেও কিটস ওই বৃত্তের বাইরে ছিলেন না বলেই ইংল্যান্ড অসহনীয় হয়ে উঠলে তাঁরও গন্তব্য ছিল ইতালি। ওই সেমেটারিতে দাঁড়িয়ে ডেইজ়ি দেখেন যে শেলি সমাধিস্থ হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু এডওয়ার্ড জন
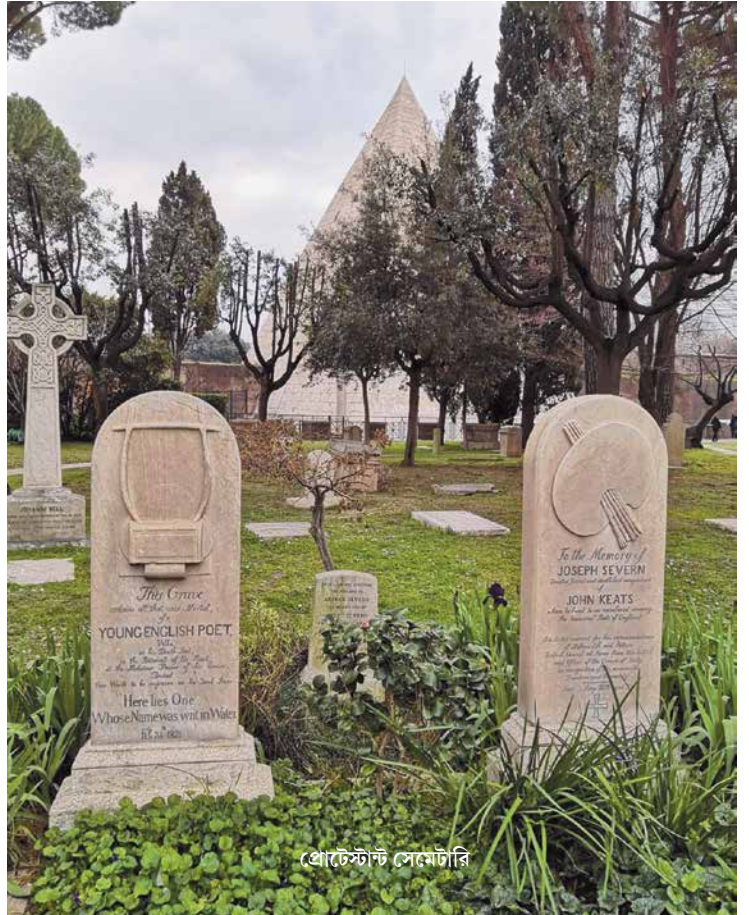
প্রোটেস্টান্ট সেমেটারি
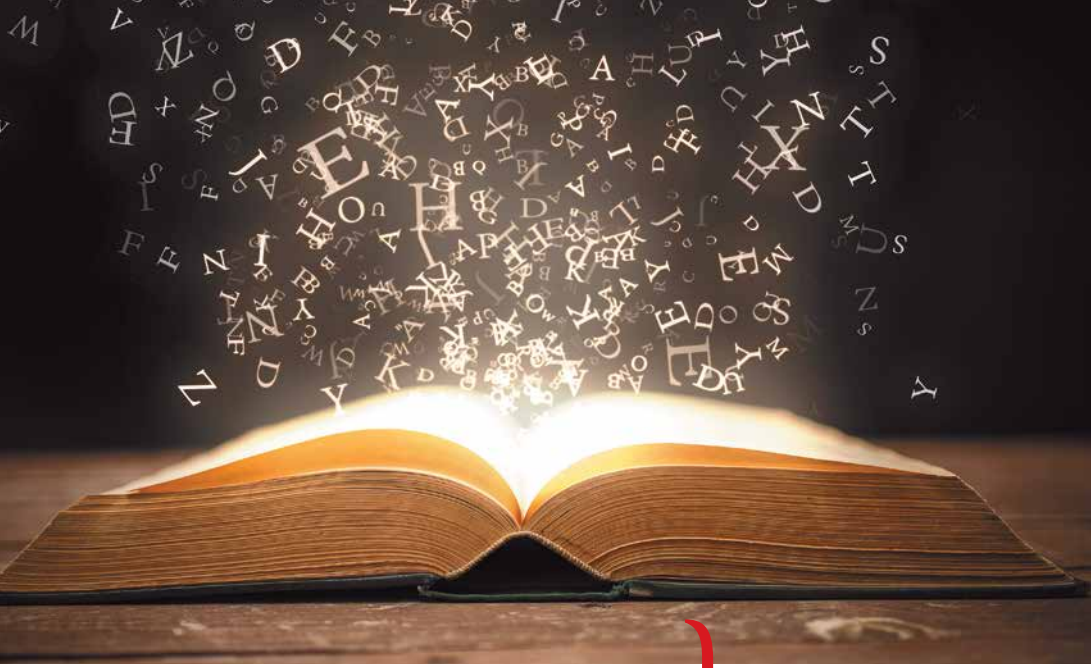
পথে মশাল নিভে গেলেও যাত্রা থামাননি শেলি বা মেরি। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছিলেন আলোর কিনারায়। সেই আলো কেবল আকাশে নয়, অক্ষরেও থাকে।

ট্রিলনির পাশে, শেলির মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগে যে অ্যাডভেঞ্চারার মানুষটি ইতালি এসে পৌঁছেছিলেন। কিটসও মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছেন, বন্ধু জোসেফ সেভার্নকে পাশে নিয়ে। চিত্রকর জোসেফ সেভার্নকে হয়তো দুনিয়া ভুলে গিয়েছে, কিন্তু কিটসের বন্ধু সেভার্নকে কারও ভোলা সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, যখন যক্ষায় আক্রান্ত কারও সংস্পর্শে এলে নিজেরও হয়ে যেতে পারে ওই রাজরোগ, তখন সেভার্ন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অসুস্থ বন্ধুর শেষ কয়েকটা দিন অন্তহীন সেবা ও সাহচর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন। ডেইজ়ির মনে হতে থাকে সেই গুহার কথা, গাইড যার ভিতরে অল্প একটু প্রবেশ করার পর হাত তুলে দিয়েছিল... কিন্তু গাইডের মশাল নিজের হাতে আর মেরিকে পাশে নিয়ে শেলি এগিয়ে গিয়েছিলেন সেই অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে অনেকটা পথ। পথে মশাল নিভে গেলেও যাত্রা থামাননি শেলি বা মেরি। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছিলেন আলোর কিনারায়। সেই আলো কেবল আকাশে নয়, অক্ষরেও থাকে। ডেইজ়ির মনে প্রতীতি জন্মাল যে ওই অক্ষরব্রহ্মের কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও শেলি এবং কিটস মানুষের মনের মণিকোঠায় ভাস্বর হয়েই থাকবেন; নীলকান্তমণির মতো তাঁদের ঔজ্জ্বল্য বেড়েই চলবে শুধু।

## রক্ত থেকে রক্তপলাশ

দক্ষিণ কলকাতার এক নামী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্তর মুখ থেকে শোনা গেল শেলি আর কিটসের প্রাণময়তার এক অন্যরকম আখ্যান, যা পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি সময় পেরিয়েও এই সেদিনের ঘটনা হয়ে রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত সাতের দশকের মাঝামাঝি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে। সেদিন কোনও এক ছাত্র সংগঠন ধর্মঘট ডাকায় সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে অনুপস্থিত। যে তিন-চারজন উপস্থিত, তাদের মধ্যে রাইকমল একজন। মাঝামাঝি একটি বেঞ্চের ধারে বসে কিটসের 'ওড'গুলির উপরে একটি বই পড়ছিলেন উনি একমনে। দীপাবলির পরের সময়টা, বাতাসে হিমেল ভাব আচমকাই চলে এসেছে।
রাইকমল কলেজ স্ট্রিটেই অনুভব করছিলেন ব্রিটিশ কান্ট্রিসাইডের 'অটাম'কে। 'Season of mists and mellow fruitfulness/ Close bosom-friend of the maturing sun...' চোখ থেকে মনে অনুরণিত হচ্ছে যখন, অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যর ক্লাসরুমে প্রবেশ। হ্যাঁ, সেই জ্যোতি ভট্টাচার্য যিনি সরকারের মন্ত্রীপদ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, পড়াবার টানে। না, চাটাই পেতে টিউশন করতেন না এই মহৎ শিক্ষকরা, পয়সা কিংবা অন্য সুবিধার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করেও দিতেন না; বিদ্যাকে বোধে ধারণ করা ব্যতিরেকে কোনও চাহিদাই ছিল না তাঁদের। প্রায় দেড়বছর ধরে শেক্সপিয়রের 'কিং লিয়ার' পড়াতেন জ্যোতি ভট্টাচার্য এমএ-র ক্লাসে, কিন্তু সেদিন মাত্র জনা তিনচার হাজির আর তার মধ্যে একজনের হাতে আবার কিটসের উপরে বই! বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম তাই অন্য এক জ্যোতি ভট্টাচার্যকে পেল সেদিন। শেক্সপিয়র ও তাঁর সময় নিয়ে যিনি একরকম অথরিটি, তাঁর যে অত কিটস কণ্ঠস্থ, কে জানত না হলে? 'ওড টু আ নাইটিঙ্গেল' থেকে 'ওড অন আ গ্রেসিয়ান আর্ন' 'এন্ডিমিয়ন' থেকে 'হাইপেরিয়ন'— অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন। আর বলার পাশাপাশি, ব্যাখ্যা করছিলেন প্রেক্ষিত, মনে গেঁথে দিচ্ছিলেন সেই সত্য যে কবি কোনও ইঞ্জিনিয়ার নন; তিনি নির্মাণ করেন না কেবল, ছাদের কোটরে জন্ম নেওয়া বটগাছের মতো তিনি ধ্বংসের ভিতর সৃষ্টি আর সৃষ্টির ভিতরে ধ্বংসের বীজ বুনে দেন।
ক্লাস চলাকালীন বাইরে বোমা পড়তে শুরু করল। চারজনের ভিতরে একজন ভয় পেয়ে ক্লাস ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু বাকি তিনজন বসে রইল, যেভাবে প্রমিথিউসের নিয়ে আসা আগুনের সামনে গিয়ে বসেছিল

শীতার্তরা। বিকেলে তাড়াতাড়ি সূর্যাস্ত হলেও রাইকমল যখন বেরিয়েছেন কলেজ স্ট্রিটে তখন ওঁর চোখে অনেক আলো। ঘোড়ার আস্তাবলের কর্মচারী টমাস কিটসের ছেলে, যেন সূর্যের সপ্তাশ্ব ছুটিয়ে দিয়েছেন শিরা-উপশিরায়। আট বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন যিনি, চোদ্দ বছরে মাকে, তেইশ বছরে এসে প্রাণপ্রিয় ভাই টমকে আর পঁচিশ বছরে পৌঁছলে পৃথিবীই হারিয়েছে যাঁকে, বোধ হওয়ার পর থেকে যিনি বেঁচে থেকেছেন মারণরোগ যক্ষায় সংক্রমিত হবার আতঙ্ক অন্তরে নিয়ে, তিনি কীভাবে এতটা দিয়ে গেলেন পৃথিবীকে? কলেজ স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাইকমলের মনে হচ্ছিল, আশেপাশের সব বাড়িই যেন 'ওয়েন্টওয়ার্থ প্লেস', যেখানে কিটস তাঁর বেশ কয়েকটি 'ওড' লিখেছিলেন। আপাততুচ্ছ সব বিষয়ের ভিতর থেকে খুঁজে নিয়েছিলেন শাশ্বত কবিতার উপকরণ। সেই সব কবিতার প্রতিটি পঙক্তি মাথার ভিতরে বেজে উঠে বলে যায় যে, যখন আর কিছুই থাকে না হারিয়ে ফেলার, তখন পায়ের তলার ঘাস, অল্প দূরে ফুটে থাকা ফুল—সবটাই চিরন্তন। শস্যক্ষেত্রে একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকা যে-কোনও অশ্রুসজল মেয়েই রুথ; আর যে রুথ, সে-ই রাইকিশোরী। বিষণ্ণতা সেখানে সৌন্দর্যের পরিপূরক, বিরহই সেখানে মিলনের ব্যাকুলতা। "Beauty is truth, truth beauty—that is all/ Ye know on earth and all ye need to know".

ঠিক তখনই পরপর দু'টো বোমা ফাটল। আর চমকে ওঠা চোখে রাইকমল দেখলেন, সন্ত্রস্ত হয়ে সরে যেতে থাকা ভিড়ের অদূরে পড়ে আছে একটি ছেলে, রক্তাক্ত। কিছুক্ষণ পরে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল কয়েকজন। কী সেই রাজনীতি, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসেও বোমা মারতে হয়? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে পড়ে গেল ক্যান্টিনে সেই ছাত্রনেতার বক্তব্য, "কতগুলো ঘুঁটি কাছে আছে, তাই নিয়ে খোকাবাবুরা মারপিট করে। সত্যিকার মাতব্বররা ঘুঁটি খুইয়ে ওপেনিং বার করতে চায় কারণ তারা জানে যে কারা হারিয়ে গেল তা মনে রাখবে না কেউ, কে জিতল সেটাই কেবল মনে রাখবে সময়।"

ভুল বলেছিল ওই নেতা, আজকের ক্লাসের পর আরও জোর দিয়ে বলতে পারবেন রাইকমল। ওই পঁচিশ বছরেই স্মৃতি হয়ে যাওয়া ছেলেটা নিজের সমাধিতে লিখে দিতে বলেছিল, 'Here Lies One Whose Name Was Writ in Water'। সঙ্গী হারিয়ে খেলায় জিততে চায়নি সে, সব যুদ্ধ থেকে সরে এসে প্রিয়জনদের আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিল। তাই কি যে জল বিস্মৃতির আকর সে-ও অশ্রু হয়ে মনে রেখেছে তাঁকে?

কে জানে কেন, এই উপলব্ধি ভিতরে জারিত হতে শুরু করল যখন, রাস্তায় পড়ে থাকা রক্ত দেখেও ভয় লাগল না রাইকমলের। মনে হল, একদিন রক্তবমি করার পরে (সেই যখন গলার রক্ত কলমের মুখে উঠে আসছে অনর্গল) কিটসের বলা কথা, 'আমি এই রক্তের রং চিনি, এই রক্ত সিধে আমার ধমনী থেকে উঠে এসেছে। এই রক্তবিন্দুই আমার মৃত্যু পরোয়ানা'। মৃত্যু তো ব্যর্থ, কিটসের গলার রক্ত আজও বসন্ত হয়ে জাগ্রত হতে পারে; তবে রাস্তার ওই রক্ত, রক্তপলাশ হবে না কেন? রাইকমল ভাবলেন।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সদ্য যৌবনে পা রাখা রাইকমল দাশগুপ্ত আজ প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েও মনে করেন, কিটসের কবিতাই পারে হিংসাকে হিমবাহর রূপ দিতে, রক্তধারাকে রক্তপলাশে বদলাতে।

## বৃষ্টি আর বেদনার মধ্যে

ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন বাচ্চুকাকু। ম্যানেজার-ট্যানেজার হননি কখনও, সাধারণ চাকরি। কিন্তু ওঁর নেশা ছিল শেলি। প্রতিবার পাড়ার পুজোর ফাংশনে একটা না একটা শেলির কবিতা বলবেনই ভদ্রলোক। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে পাড়ায় ওঁর নাম হয়ে গিয়েছিল, শেলিকাকু। তো শেলিকাকু একবার বস্তিবাসী দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে নিয়ে স্থানীয় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েগুলো বলছিল ভালই কিন্তু ওদের প্রত্যেককেই মতি নন্দীর 'কোনি' ঠাওরে, তত ভাল করতে না পারা একটা মাকাল ফল, বস্তিবাসী একটি মেয়েকে 'তোর মা তো আমাদের বাড়ি কাজ করে', বলে ব্যঙ্গ করে। ঘটনাটায় খুব আঘাত পেয়েছিল মেয়েটি। আর শেলিকাকু ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রেখে সেই মেয়েটিকে বলেছিলেন, "তোর মা যে ওদের বাড়িতে বাসন মাজে, এতে তোর মায়ের কোনও অপমান হয় না তো, অপমান ওদের; অপমান সমাজের।"

সেদিনের পর দ্বিগুণ উৎসাহে বস্তির কচিকাঁচাদের দিয়ে শেলি আবৃত্তি করানোর ঝোঁক পেয়ে বসে বাচ্চু ওরফে শেলিকাকুকে। এই পাড়ায়, ওই পাড়ায় 'মেঘোৎসব'এর খুব চল হয়েছিল সেই সময়। তার অনেকগুলোতেই দেখতে পাওয়া যেত শেলিকাকুর বাচ্চাদের (ওরা তখন ওই নামেই বিখ্যাত)। তারা মঞ্চে উঠে

কিটস হাউস
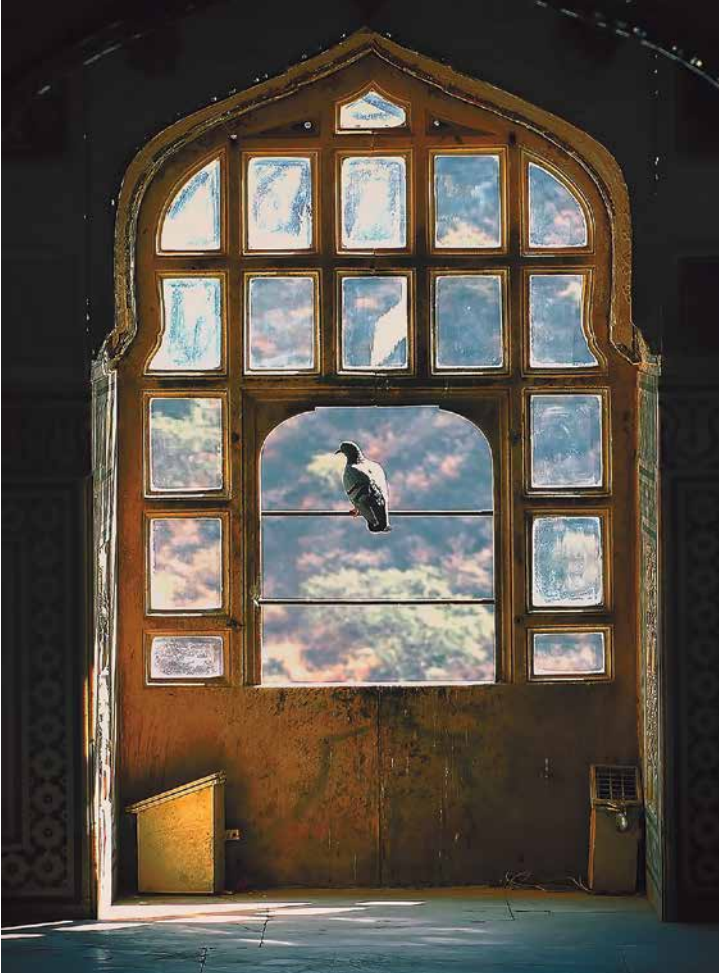
কী চমৎকার বলত, "...I silently laugh at my own cenotaph/ And out of the caverns of rain/ Like a child from the womb, like a ghost from the tomb,/ I arise and unbuild it again."
কিন্তু মেঘ-বৃষ্টির বাইরের জীবন কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। বাচ্চুকাকুকেও বলেনি। উনি যখন 'unacknowledged Legistators' বলে কবিদের অভিহিত করছেন শেলির কথাকে টিয়াপাখির মতো আওড়ে, তখন নৃশংসতা সইতে না পেরে বাপের বাড়িতে ফিরে আসা ওঁর নিজের মেয়েই প্রশ্ন করছে, শেলি কোন মহামানব ছিলেন যে তাঁকে পুজো করতে হবে? শেলির সন্তানের মা, আবারও সন্তানসম্ভবা স্ত্রী, হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুককে ফেলে রেখে শেলি পালিয়ে যাননি মেরি গডউইনের সঙ্গে? পালিয়ে গিয়ে আবার, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে, হ্যারিয়েটকেই দায়ী করে চিঠি লেখেননি, 'It is no reproach to me that you have never filled my heart with an all-sufficing passion'?
প্রাণ শরীরের বিচ্ছেদ সইতে পারে কিন্তু শরীর পারে না প্রাণের বিচ্ছেদ সইতে, সে গলে-পচে যায়। সরলা হ্যারিয়েটও পারেনি এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নিতে। আত্মহত্যা করে সে মুক্তি দিয়ে যায় শেলিকে। সেই মৃত্যু কি অপরাধবোধে ডুবিয়েছিল শেলিকে? নাকি আরও বেশি করে তাঁর ভিতরে বিশ্বাস ভরে দিয়েছিল যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন একেবারেই অসহ্য? শেলি গবেষকদের অনেকের মতে, দ্বিতীয়টাই ঘটেছিল। আসলে শেলি তখন অন্য এক ঘোরে আছেন— মেরি শেলির ঘোর। সেই মেরি যাঁর সঙ্গে মেরির মায়ের কবরের পাশে প্রথমবার ভালবাসাবাসিতে মিশে গিয়েছিলেন শেলি। অ্যান রো'র লেখায় বড় জীবন্ত বর্ণনা পাই সেই মুহূর্তের, "...26 June 1814. That was their wedding, their alter 'the grassy earth outspread', under the open sky. There were no registers or witnesses, save the stars. This love was free."
ভালবাসা কি সত্যিই 'ফ্রি' এই পৃথিবীতে? তারাভরা আকাশের আলোর উপর নির্ভর করে কি পথ চলা সম্ভব? কেন সমাজের ক্ষেত্রে যে আদর্শের রূপায়ণ চায় কবি, ব্যক্তিজীবনে তার থেকে সহস্র মাইল দূরে হাঁটে? এ এক বিরাট প্যারাডক্স যার সমাধান অসাধ্য হয়তো বা। শেলি লিখেছেন, 'Clothes, and fire and food/ For the trampled multitude'। শেলি যে-কোনও দুর্গের জেলখানার অভ্যন্তরে বন্দিদের নিঃশব্দে ফাঁসি দেওয়ার বিম খুঁজে বেড়াতেন; শেলি বেশ কয়েকজন নারী ও শিশুকে উদ্ধার করেছেন কয়েদখানার অন্ধকার থেকে। কিন্তু সেই মানুষেরই দম আটকে আসত 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটির ভিতর। প্রেম একজনের প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকবে, বা একটি বস্তুর উপর, এটাই অসহনীয় ছিল শেলির কাছে। হ্যারিয়েট বা মেরি কিংবা জেন, বারবার প্রেমে পড়েছেন তিনি, আবার বারবারই 'এক শিকলে বাঁধা' অস্তিত্বকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন; কিছুতেই প্রেম বলে স্বীকার করেননি তাকে। 'I was required to love because it was my duty to love' বলার পাশাপাশিই বলেছেন, 'Love withers under constraint: its very essence is liberty: ...'
হ্যারিয়েটের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন, মৃত আর জীবিত শরীর ভয়াবহ সংযোগে গ্রথিত আছে বলে মনে হচ্ছিল শেলির, মেরির ক্ষেত্রে অতটা হয়নি। বরং মেরিকে তিনি একাত্ম হওয়ার ডাক দিয়েছেন বারবার, মেরি ছাড়া তাঁর অস্তিত্ব অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠবে এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন চিঠিতে। তবু, মৃতবৎ বেঁচে থাকার প্রসঙ্গ সেখানেও এসেছে। আসলে শেলির হৃদয়ে মুক্তি যেমন বাঁধনের মাঝে বাসা মাগত, বন্ধও মুক্তি খুঁজে ফিরত অহরহ। এই যুগপৎ ক্লকওয়াইজ় আর অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ় চলতে থাকা হৃদয়কে হৃদয় সঁপে স্বস্তিতে থাকতে পারবে কে? হ্যারিয়েট থেকে বাচ্চুকাকুর মেয়ে, কার সাধ্য ওই অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটকানোর?
বাচ্চুকাকু তাই শেলির কবিতা শেখাতে শেখাতে, শেলির স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াকে এড়িয়ে যেতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে কীভাবে ক্ষমা করবে, সৃষ্টিশীলতাকে স্বৈরাচারের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পুরুষালি স্বার্থপরতাকে? বাচ্চুকাকুর বাড়িতে তাই শেলি আর না-শেলিতে ভাগ হয়ে থাকত মেয়ে আর বাবা।

মেঘোৎসবের তাবৎ মেঘ, বৃষ্টি আর বেদনার ভিতরকার ফাঁক বোজাতে পারেনি যে!

## ভালবাসা ছিল আগে

কেউ ধরে রাখার ভার সইতে পারে না, আবার ছেড়ে দেওয়ার বেদনা অপরিসীম হয়ে ওঠে কারও জন্য। গলা দিয়ে রক্ত ওঠার মুহূর্তে কিটস বুঝে গিয়েছিলেন, খ্যাপা নেকড়ের মতো যে পারিবারিক অভিশাপ তাড়া করে যাচ্ছে সেই কৈশোর থেকে, তা অবশেষে তাঁর নাগাল পেয়ে গিয়েছে। জীবন শেষ হয়ে আসছে, ফ্যানির সঙ্গে বিচ্ছেদ অনিবার্য বুঝতে পেরেই কি কিটস নিজের একটি চুলের বিনিময়ে ফ্যানির একটি চুল নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে? সস্তা পাথরের সেই আংটি, যা সম্পর্কের স্বীকৃতিস্বরূপ কিটস পরিয়ে দিয়েছিলেন ফ্যানির আঙুলে, আজ তা আছে কিন্তু কুশীলবরা কেউ নেই। আসলে পাথরই বেঁচে থাকে, প্রেম মরে যায়। কারণ মরে গিয়েও বেঁচে থাকার ক্ষমতা একমাত্র প্রেমেরই আছে।

শহরতলির কারও কারও কিটস আর ফ্যানির বেদনায় অবগাহন করতে করতে মনে পড়তে পারে নাড়ুদা আর টিটুদির প্রেমের গপ্পো। টিটুদিকে বরানগরের পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে, সেই উপলক্ষে বাড়িতে আসা সাত টাকা দামের রাজভোগ (আশির দশকের গোড়ার কথা। তখন সাত টাকার রাজভোগ মোটামুটি ক্যাম্বিস বলের সাইজ়) পিছনের ঘরের জানলা দিয়ে নাড়ুদাকে খাওয়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় টিটুদি। সেই পাঁকে পড়া থেকে সাতপাকে ঘোরা, জার্নি খুব সহজ হয়নি। তবু ভালবাসা ছিল আগে গো মালিক, ভালবাসা ছিল আগে... আর তাকেই খেল বাঘে!

স্থানীয় হাই-স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক নাড়ুদার গলায় দানা বাঁধল ক্যান্সার। ওদের মেয়ের তিন-চার বছর বয়স তখন। কিচ্ছু খেতে পারত না নাড়ুদা, আর খেতে পারত না বলেই হয়তো কিটসের 'দ্য ইভ অফ সেন্ট অ্যাগনেস' থেকে টিটুদিকে পড়ে শোনাত, "...While he from forth the closet brought a heap/ Of candied apple, quince and plum and gourd/ With jellies soother than the creamy curd/ And lucent syrops, tinct with cinnamon/ Manna and dates"...

টিটুদি ফার্স্ট ইয়ার অবধি পড়াশোনা করলেও ইংরেজিতে অষ্টরম্ভা। কিন্তু নাড়ুদা চলে যাওয়ার পর ঠিক বুঝে বুঝে জেলি, খেজুর ইত্যাদি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।

কীভাবে যেন, 'কার্ড' মানেও জেনে ফেলল। পাড়ার, 'দামোদর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'এ কেউ একজন অনেক করে টিটুদিকে বুঝিয়েছিল যে সাহেবদের 'কার্ড' আর আমাদের 'দই' এক বস্তু নয়। টিটুদি মানেনি। ভালবাসাই মানতে দেয়নি হয়তো।

## অন্তবিহীন

কিটসের মৃত্যুর দুশো এক বছরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, আর এই বছরই শেলির চলে যাওয়ার দু'শো বছর। তবু আজও কী জীবন্ত দু'জনই। জীবন্ত ক্লাসরুমে, জীবন্ত হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজে, জীবন্ত 'একা শয্যায় বিনিদ্র রাত' অতিবাহিত করা প্রতিটি প্রাণের কাছে। বাঁচা-মরার মাঝখানে দুলতে থাকা কিটস ইতালিতে আসছেন শুনে শেলি সংক্রমণের ভয় পাননি (পাওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল সেই সময়), উলটে তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখে কিটসকে, ওঁর কাছে পিসায় চলে আসতে বলেছিলেন। নিজের চূড়ান্ত অনিশ্চিত জীবনের ভিতরই ম্যারিয়ানকে বলেছিলেন, "I shall take care to bestow every possible attention on him"।

কিটস পিসায় যেতে না পারলেও মুগ্ধ হয়েছিলেন শেলির আন্তরিকতায়। আর সেই মুহূর্তেই যেন বিশ্ব কবিতার ইতিহাসে হাত মিলিয়েছিল, 'জিনে কি তমান্না' এবং 'মরনে কা ইরাদা'; কিংবা বলা যায়, জায়গা বদলাবদলি করে নিয়েছিল।

তারপর থেকে তারা একসঙ্গেই আছে। একে অপরের হৃদয়ে আছে, আমাদের হৃদ্‌মাঝারে আছে, একত্রে আছে 'গোল্ডেন ট্রেজারি'র পাতাতেও।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'কিটসের ডাক এসেছিল ছাব্বিশে'। তিরিশে পৌঁছে বাঙালি প্রেমিক, পাগল, কবিরা নিশ্চয়ই শেলির ডাকও শুনতে পান। কিন্তু ওই ডাকগুলো আজ আর মৃত্যুর কথা বলে না। ওরা মৃত্যুঞ্জয়ী। লি হান্ট কিটসকে লিখেছিলেন, ' ... Thy heart is in our fields: and thou will soon be back to rejoin it.'

আজ এই শব্দগুলো সমানভাবে শেলির জন্যেও প্রযোজ্য। নাইটিঙ্গেল থাকলে স্কাইলার্কও থাকবে, নিতাই ছাড়া গৌর হবেই না। দিন আর রাত্রি, পুরুষ আর নারীর মতোই শেলি এবং কিটসও আজ বিশ্ব কবিতার পরম যুগল।

বাসি মালা জলে ফেলে, তোমরা সবাই নতুন ফুল তুলে আনো।
সে ফুল দিয়ে যুগলকে সাজাই।

**ছবি:** আইস্টক ও ইন্টারনেট

# আকাশে আজ রঙের মেলা...

দেবীর মর্ত্যে আগমনে মর্ত্যবাসী তার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম দিয়ে দেবী শক্তির আরাধনা করে। প্রকৃতির বিভিন্ন রং যেন মানবপ্রকৃতিরই বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রতীক। ‘আনন্দ’ শাড়িতে হরেক রঙের বাহার নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

নীল রং মনকে করে
শান্ত, ভরিয়ে তোলে
স্নিগ্ধতায়। শরতের নীল
আকাশের মতো রঙের
শাড়িতে 'আনন্দ' হরফ
প্রিন্ট। সঙ্গে হল্টারনেক
ব্লাউজ় ও রুপোর
গয়নার সাজ।

সদা প্রাণোচ্ছলতার
প্রতীক সবুজ রং। সাদা
বাংলা হরফ লেখা
সবুজ সিল্ক শাড়ির সাজ
যেন শরতের প্রাণবন্ত
প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি।
(বাঁদিকের পাতা)

কমলা রঙের মধ্যে
আছে এক ইতিবাচক
ভাব। যা কিছু শুভ,
সবেতেই থাকে কমলা
রঙের প্রতিচ্ছবি। হরফ
লেখা কমলা শাড়িতে
শুভময় হোক উৎসব।

শক্তি, সাহস,
ভালবাসার প্রতীক
লাল রং। দেবীর
আরাধনায় তাই চাইই
রাঙা শাড়ি। বাংলা
হরফ লেখা
লাল সিল্কের শাড়িতে
উজ্জ্বল পুজোর সাজ।

**শাড়ি: আনন্দ**
কুইন্‌স ম্যানসন
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ২২২৯২২৭৫,
৯৬৭৪৩৯২২৭৫

শুটিং কোঅর্ডিনেশন:
মৌমিতা সরকার
মডেল: মুনমুন, শ্রীলগ্না
মেক-আপ, হেয়ার ও
স্টাইলিং: নবীন দাস
ফোন: ৯৮৩১২৩৩৬১৮
সহযোগী: রাজীব
ব্লাউজ়: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
গয়না: করিশ্মাজ়,
গোলপার্ক
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
ছবি: সোমনাথ রায়

সানন্দা
ফ্যাশন ১০
কমলা রঙের ট্র্যাডিশনাল তসর শাড়ি। হালকা পাড় কিন্তু আঁচলে রয়েছে সাদা সুতোর নিখুঁত বুননের কাজ।
পুজো হোক আনন্দময়
ষষ্ঠী থেকে বিসর্জন, উৎসবের দিনগুলোতে শাড়ির সাজেই সম্পূর্ণ হোক শক্তির আরাধনা। ট্র্যাডিশনাল বা হালফ্যাশনের শাড়ি, পুজোর ফ্যাশন স্টেটমেন্টে শাড়িই প্রথম পছন্দ। বাঙালির সেরা উৎসবে ঐতিহ্যবাহী ‘আনন্দ’ শাড়ির এক্সক্লুসিভ কালেকশন নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন রইল ‘সানন্দা’-য়।

রিচ পার্পল কাতান বেনারসি। শাড়ির জমি জুড়ে সিলভার ও গোল্ডেন ফ্লোরাল মোটিফ। শাড়ির চওড়া পাড় ও আঁচলের ভরাট কাজ আনে ক্লাসিক লুক।

হলদে শেডের কনটেম্পোরারি তসর শিফন শাড়ি। কনট্রাস্টে নীল সুতো ও জ়রির কাজ করা ট্র্যাডিশনাল পাড় ও আঁচল। ডানদিকে অন্যজন পরেছেন ইয়েলো ও রানি কনট্রাস্টে প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ি। পাটলিপল্লু স্টাইলে ক্লাসিক্যাল ফ্লোরাল প্যাটার্ন প্যানেল।

টোম্যাটো রেড কাতান বেনারসি শাড়ি। জমি ও আঁচল জুড়ে ক্লাসিক্যাল ফুলের বিন্যাসের ডিজ়াইন ও মাল্টিকালার্ড জরির কাজ করা ফ্লোরাল মোটিফ। সঙ্গে ভারী গয়নার সাজ।

সবুজ চেক্‌ড ট্র্যাডিশনাল গাদোয়াল সিল্ক শাড়ি। পাড় ও আঁচলে কমলা কম্বিনেশন।

উজ্জ্বল হলুদ কাঞ্জিভরম সিল্ক শাড়ি। চওড়া লাল পৈঠানি পাড়। আঁচল জুড়ে রয়েছে ক্লাসিক্যাল মাল্টিকালার্ড টিয়াপাখির মোটিফ।

**শাড়ি: আনন্দ**
**কুইন্‌স ম্যানসন**
**১৩ রাসেল স্ট্রিট**
**কলকাতা-৭০০০৭১**
**ফোন: ২২২৯২২৭৫,**
**৯৬৭৪৩৯২২৭৫**

**ছবি:** সোমনাথ রায়
**মডেল:** হিয়া, ডিম্পল, শ্রীলগ্না, স্নেহা
**মেক-আপ ও হেয়ার:** বাবুসোনা সাহা
**ফোন:** ৮২৪০৫৫০৮৮৪
**স্টাইলিং, ব্লাউজ় ও গয়না:** অয়ন হোরে
**ফোন:** ৯০০৭২২০৪৯৬
**লোকেশন:** ইকোহাব নিউটাউন
**ফোন:** ০৩৩ ৪০৩১৯০০০
**শুটিং কোঅর্ডিনেশন:** মৌমিতা সরকার

# উৎসবের উজ্জ্বল সাজ

**দৈনন্দিন জীবনে স্মার্ট ক্যাজুয়াল পছন্দ হলেও, উৎসবে চাই ঝলমলে সাজ। পুজোয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্তের এথনিক ও ফিউশন সাজের ফ্যাশন ফাইল তুলে ধরলেন মৌমিতা সরকার।**

ভরাট এমব্রয়ডারির ফ্লোরাল
মোটিফ করা লাল গাউন।
সঙ্গে স্লিক জুয়েলারি।
পুজোর সমাগমে সকলের
চেয়ে একেবারে ভিন্ন
সাজে স্বস্তিকা।
(বাঁদিকের পাতা)

গোলাপি ব্লেজ়ার কাটের
লং ড্রেস। পোশাকের প্রধান
ইউএসপি হল্ রিলওয়র্ক।
লং ড্রেসে প্রাণোচ্ছল
স্বস্তিকা।

অষ্টমীর সন্ধ্যায় চাই ঝলমলে সাজ। জ়রি, সুতোর সূক্ষ্ম এমব্রয়ডরি কাজ করা পার্পল লহেঙ্গা ও বুস্তিয়ার। সঙ্গে দোপাট্টা। সঙ্গে কুন্দনের মাথাপট্টি সাজে এনেছে আভিজাত্য।

গোলাপি সুতো ও
কপার কালার জ়রির
কাজ করা পেস্তা গ্রিন
রঙের লহেঙ্গা। সঙ্গে
বুস্তিয়ার ও ইউনিক
কাটের ফুলস্লিভ
জ্যাকেট। লহেঙ্গার
সাজকে সম্পূর্ণ করেছে
কুন্দনের গয়না।

হালকা গোলাপি লং ড্রেসের উপর কভারআপ করা হয়েছে নিখুঁত এমব্রয়ডারি করা লং জ্যাকেট দিয়ে। এলিগ্যান্ট সাজে অভিনেত্রী।

ওয়েস্টার্ন পোশাকে স্বস্তিকা খুবই স্বচ্ছন্দ। তাই উৎসবের যে কোনও একদিন তাঁর পছন্দ এমব্রয়ডারি কাজ করা বডিফিটেড ওয়েস্টার্ন কাটের লং ড্রেস। সঙ্গে হালকা জুয়েলরি।
পোশাক: সরোজ জালান
ফোন: ৯৯০৩৩৭১৮৩০
মেক-আপ: প্রীতম দাস
ফোন: ৮৬২১০২০০৬১
হেয়ার: কুশল
ফোন: ৮৭৭৭২৯৫৮৯৮
স্টাইলিং: কিয়ারা সেন
ফোন: ৯০৫১৪৭৩৬০৬
লোকেশন: নোভোতেল, কলকাতা
ফোন: ০৩৩ ৪০৩২৩৩৩৩
ছবি: শুভদীপ ধর
রূপায়ণে: বৈশালী সরকার
এই শুটের ভিডিও দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন